সৈয়দ আলী আহসান

জীবনের শিলান্যাস

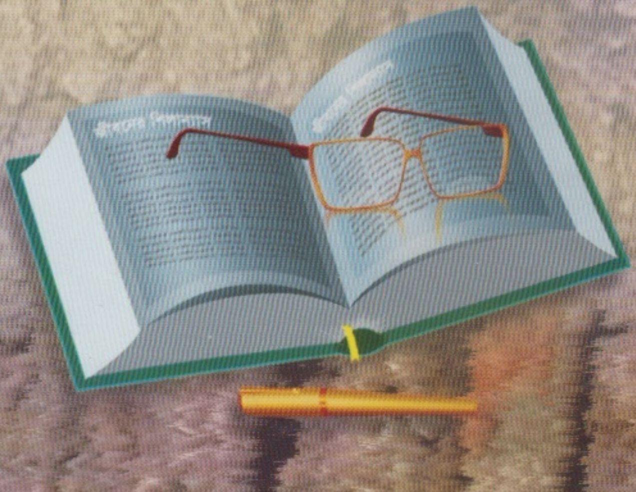

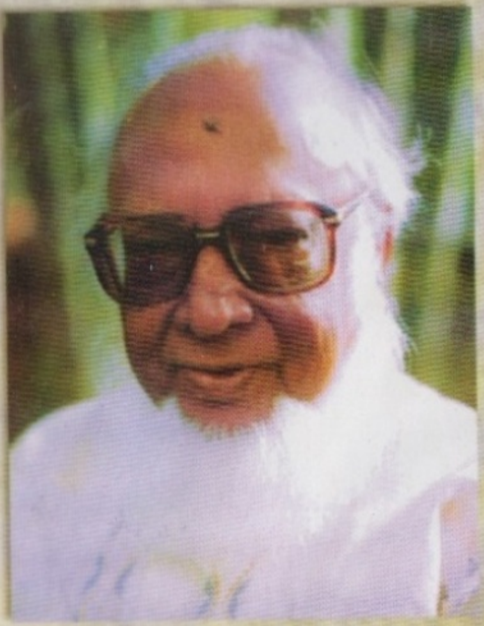

সৈয়দ আলী আহসান

সৈয়দ আলী আহসানের জন্ম ২৬ মার্চ, ১৯২২। এটা সরকারিভাবে স্বীকৃত। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, তাঁর জন্ম আরও দু'বছর আগে। যশোরের আলোকদিয়া গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত সুফী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাজীবনের পুরোটা সময় কেটেছে ঢাকায়। ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরেজীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং সেই বছরেই ঢাকা সরকারি ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমানে কবি নজরুল কলেজ) কয়েক মাস শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৫ সালে হুগলী ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। ঐ বছরের শেষের দিকে কলকাতা অল ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রোগ্রাম এ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সালে কমর মুশতারীকে বিয়ে করেন। ১৯৪৭ সালে ঢাকায় চলে আসেন এবং রেডিও পাকিস্তানে দু'বছর চাকরি করেন। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সিনিয়র লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৪-১৯৬০ পর্যন্ত করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬০ সালে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন এবং ১৯৬০-১৯৬৬ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৭-১৯৭১ পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর এবং

বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। এই সময় তিনি পরপর তিন বছর কলা অনুষদের ডীন নির্বাচিত হন। মার্চ ১৯৭১ থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রবল জনমত তৈরি করেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২-১৯৭৫ পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৫ সালে পুনরায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যায়ের পূর্ব চাকরিতে ফিরে যান। কয়েক মাস পর আবারো উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তবে এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায়ের। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮-এ আবার শিক্ষকতায় ফিরে যান ; প্রথমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক এবং পরে ইনস্টিটিউট অফ ফাইন আর্টস-এ চারুকলা বিষয়ে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে। ১৯৮৩ সালে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ঐ বছরের ২৬ মার্চ, তাঁর জন্মদিনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৮৯ সালে তিনি জাতীয় অধ্যাপক হন এবং ঐ বছরেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৯১ সালে চেয়ারম্যান পদ থেকে তিনি ইস্তফা দেন এবং সেই সময় থেকে পূর্ণভাবে লেখালেখির কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

অনেকগুলো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছেন। কবিতার জন্য ১৯৬৭ সালে পেয়েছেন বাংলা একাডেমী পুরস্কার। ১৯৮৩-তে পেয়েছেন একুশে পদক। দেশের সর্বোচ্চ সম্মান স্বাধীনতা স্বর্ণপদক পেয়েছেন ১৯৮৭ সালে। হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৭৪-এ নাগপুরের বিশ্ব হিন্দি সম্মেলন থেকে পেয়েছেন সম্মাননাপত্র। ১৯৯২ সালে ফরাসী সরকার তাঁকে দিয়েছেন OFFICIER DE L ORDRE DES ARTS ET DES LETTER-এর সনদ।

বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। তাঁর বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো– 'পদ্মাবতী', 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', 'মধুসূদন: কবিকৃতি ও কাব্যাদর্শ', 'রবীন্দ্রনাথ : কাব্য বিচারের ভূমিকা', 'আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে', 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য', 'মহানবী', 'বাংলাদেশ ১৯৭৫'।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জীবনের শিলান্যাস

আমার আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড 'স্রোতবাহী নদী'। সে গ্রন্থটি আমার শৈশবের ঘটনা। গ্রন্থটি বহুদিন যাবত বাজারে নেই। বর্তমান গ্রন্থটি দুটি পর্বে বিভক্ত। একটির নাম 'যখন বৃষ্টি নামলো', অন্যটির নাম 'যে যার বৃত্তে'। বহু পূর্বে অধুনা বিলুপ্ত দৈনিক বাংলার সম্পাদক হুমায়ুন আহমদের বিশেষ অনুরোধে তার পত্রিকার পাতায় আমি আত্মজীবনী প্রকাশ করি। সেখানকার লেখাই বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ দুটি পর্বের পর তৃতীয় পর্বটি 'যখন সময় এলো' ভিন্নভাবে গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এরপর আরও কিছু আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হবে কিনা তা এই মুহূর্তে বলতে পারি না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জীবনের শীলান্যাস

●

- যখন বৃষ্টি নামলো
- যে যার বৃত্তে

সৈয়দ আলী আহসান

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
পাঠকবন্ধু মার্কেট (৩য় তলা) | ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড)
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ | ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ ◻ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০০২
তৃতীয় মুদ্রণ ◻ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩
চতুর্থ মুদ্রণ ◻ জুলাই ২০১৮

জীবনের শিলান্যাস

সৈয়দ আলী আহসান

প্রকাশক ◻ মোহাম্মদ শিহাবউদ্দিন, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
পাঠকবন্ধু মার্কেট (৩য় তলা), ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১১৯৯৩, কম্পিউটার সেটিং ◻ বাড কম্প্রিন্ট
গ্রন্থস্বত্ব ◻ প্রকাশক, প্রচ্ছদ ◻ আইডিয়াল কম্পিউটার
মুদ্রণ ◻ বরাত প্রিন্টার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ◻ ৪০০.০০ (চার শত) টাকা মাত্র

ISBN : 984-839-009-X

www.pathagar.com

আমার সন্তানদের উদ্দেশে—

- সৈয়দা নাজ কমর
- সৈয়দা কমর যেবীন
- সৈয়দ আলী কাযেম
- সৈয়দ আলী-উল-আমীন

নিরাপদ দীর্ঘজীবেষু

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জীবনের শিলান্যাস

সৈয়দ আলী আহ্‌সান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিক

আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে মরহুম আহমদ হুমায়ূন দৈনিক বাংলায়, ধারাবাহিকভাবে আমার আত্মজীবনী ছেপেছিলেন। তাঁরই বিশেষ অনুরোধে আমি এ কাজে হাত দিয়েছিলাম। এর প্রথম পর্ব ছিল 'স্রোতবাহী নদী'। সেখানে আমার শৈশব-কাহিনী বর্ণিত আছে। 'স্রোতবাহী নদী' শেষ হয়েছিল আমার প্রবেশিকা পরীক্ষার সংবাদ বহন করে। এর পরের দুটি পর্ব এ যাবৎ মুদ্রিত হয় নি। দ্বিতীয় পর্বের নাম 'যখন বৃষ্টি নামলো'। এ পর্বে আমি আমার কলেজ জীবন, বিশ্ববিদ্যালয় জীবন এবং আমার যৌবনের আকাঙ্ক্ষার কথা লিখেছি। এ পর্ব শেষ হয় ১৯৪৭ সালে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে। সর্বশেষ পর্বের নাম 'যে যার বৃত্তে'। এ পর্বে আমি পাকিস্তানের সময়কালে আমার আগ্রহ ও অনাগ্রহ বর্ণনা করেছি। আমার মূলবক্তব্য ছিল যে আমরা একত্রিত হতে পারি নি। অর্থাৎ আমরা একই বৃত্তে মিলিত হতে পারিনি। যে যার বৃত্তে মিলিত হতে পারি নি। যে যার বৃত্ত থেকে ব্যবধানকে জাগ্রত রেখেছি। এ দুটি বই খবরের কাগজের পাতায় সীমাবদ্ধ ছিল। এতদিন পর তা প্রকাশের ব্যবস্থা করা গেল। এর পরেও আত্মজীবনীমূলক আমার অনেক লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ সময়কালীন লেখা 'যখন সময় এলো' প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া আমার অনেক কবিতা ও প্রবন্ধে আমার জীবনের অনেক স্মৃতি ধরা পড়েছে। সে সব কাহিনীর কিছু অংশ 'স্বতত স্বাগত' নামে একটি বইতে তুলে ধরেছি। সম্প্রতি 'কথাবিচিত্র ঃ বিশ্বসাহিত্য' নামে আমার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকজন লেখকের অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়েছি, যাদের পরিচয় আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম।

যদি কখনও সময় পাই তবে আমার শেষ জীবনের কথা লিখে যাব। নাম দেব 'এখন বর্তমান'। এই গ্রন্থের মধ্যে আমার চট্টগ্রামে অবস্থানের কথা, রাজশাহীতে অবস্থানের কথা এবং ঢাকায় সরকারী কর্মব্যবস্থার কথা বলবার ইচ্ছা আছে। এগুলো আংশিকভাবে লিখিত হয়েছে কিন্তু গ্রন্থাকারে সামগ্রিক রূপ পায় নি।

আমার পুরনো যে দুটি লেখা এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হল সে দুটির নাম পূর্বেই বলেছি। এ দুটি লেখা অনেক পূর্বে কাগজে বেরিয়েছিল।

www.pathagar.com

মুদ্রণের পূর্বে সংশোধনের হয়তোবা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সংশোধন করার মত সময় এবং সজীবতা এখন আমার মধ্যে আর নেই। তাই এখন পুরনো লেখাগুলোই আমার গুণগ্রাহী সকল পাঠকের সামনে তুলে ধরলাম।

জীবন অগ্রসর হয় এবং এক সময় জীবন শেষও হয়। জীবনে সংকট থাকে, অসহায়তা থাকে, কিন্তু তবুও জীবন সকল কিছুকে উপেক্ষা করে সামনের দিকে চলতে বাধ্য হয়। আমি জীবনের সকলের সকল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছি। আমি একটি কবিতায় বলেছিলাম, আমার মা আমার শৈশবকালে ভেবেছিলেন যে আমি একজন মহাপুরুষ হব। কিন্তু মহাপুরুষ হতে আমি ভয় পেয়েছি। সবুজ পাতার উপর একটি প্রজাপতি লঘুস্পর্শে যেমন বসে আমিও তেমনি পৃথিবীতে আশ্রয় পেয়েছি, এটাই আমার পরিচয়। এ পৃথিবীটাকে যতটা জেনেছি তার অংশবিশেষ তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। আমি আমার ইচ্ছাকে সকলের কাছে তুলে ধরেছি এবং সবাই যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবেই এটাকে গ্রহণ করবেন।

আমি এ পৃথিবীতে জন্মেছিলাম এবং দীর্ঘকাল পৃথিবীর বুকে হেঁটেছিলাম। পথ চলতে গিয়ে অনেক কিছু দেখেছি। তারই পরিচয় এখানে রইলো।

সৈয়দ আলী আহসান
৬০/১ উত্তর ধানমন্ডি
ঢাকা- ১২০৫
ফোন ঃ ৯১১৬৬৮৯

www.pathagar.com

যখন বৃষ্টি নামলো

॥১॥

যখন বৃষ্টি নামে তখন বিস্ময়কর একটি সিক্ততায় ভূপৃষ্ঠ স্নিগ্ধ হয় এবং দৃষ্টিতে সবকিছু নয়নাভিরাম মনে হয়। বিস্ময়কর স্বচ্ছতায় মেঘলোক থেকে বৃষ্টিবিন্দু পৃথিবীতে পতিত হয়; কখনো ঘাসের উপরে পড়ে, কখনো বা বনাঞ্চলে কখনো স্রোতবাহী নদীতে, কখনো কিশলয়ের সবুজে এবং কখনো গৃহাঞ্চলে। সর্বত্রই মহিমান্বিত প্রতাপ নিয়ে বৃষ্টি পতিত হয়। এ কারণেই রসূলে খোদা বলেছেন, বৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহর প্রসাদ এবং কৃপা। বৃষ্টিকে স্বাগত করো, অভিসম্পাৎ দিও না।

ছোট বয়সে গ্রামে থাকতে বৃষ্টি অনুভব করবার জন্য বৃষ্টিতে ভিজতাম এবং পুকুরের পাড়ে এসে পুকুরের বুকে বৃষ্টিবিন্দুর খেলা দেখতাম। শান্ত নিস্তরঙ্গ পুকুরের বক্ষ্যদেশ বৃষ্টিপতনের ফলে কল্লোলিত এবং স্ফীতকায় হত। আমি তখন আমার দৃষ্টিতে অলৌকিকের সন্ধান করতাম। সে যে কি বিস্ময়কর অনুভূতি তা ভাষায় বুঝিয়ে বলা যায় না। পুকুর এমনিতে শান্ত থাকে। কখনো বাতাসের তাড়ায় ছোট ছোট ঢেউ ওঠে। পাড় থেকে ছেলেমেয়েরা ইটের টুকরো ছুঁড়ে দিলে 'টুক' করে শব্দ হয়। এর মধ্যে যখন বৃষ্টি নামে তখন সমস্ত পুকুরে সাড়া পড়ে যায়। পুকুর যেন খুশীতে উচ্ছলিত হয়ে কথা বলতে থাকে। ঠিক এভাবেই ধানক্ষেতের উপর বৃষ্টি নামে তখনও অপরূপ দৃশ্য জেগে ওঠে। প্রবল বৃষ্টিপতনের ফলে ধান গাছগুলো নুয়ে পড়ে। আবার মাথা তুলবার চেষ্টা করে, আবার নুয়ে পড়ে। হিল্লোলিত সবুজের অভিবাদনে সে যেন বৃষ্টিকে আমন্ত্রণ জানায়। সবুজ ফড়িংগুলো লাফাতে থাকে এবং কয়েকটি কাক ভিজতে ভিজতে পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে যায়। শৈশবে নদী যেমন দেখেছি–বৃষ্টিও তেমনি দেখেছি। কিন্তু শৈশবে নদী মাতৃকতাই ছিল আমার অবলম্বন। বৃষ্টি তখন আমার জীবনকে ততটা পীড়া দেয় নি। কিন্তু শহরে এসে স্কুল জীবন শেষ হল যখন সে সময় যৌবন উন্মেষের কেমন এক প্রকার উদ্বেগে বৃষ্টিকে নতুন করে দেখলাম। বৃষ্টিকে দেখে বৃষ্টির মধ্যে আপন শরীরকে ছেড়ে দেওয়ার যে আনন্দ সেটা বিশেষভাবে আমি অনুভব করেছি বড় হয়ে। বিশেষ একটি উন্মাদনায় যৌবনের একটি আভাস আমার মধ্যে তখন জেগেছিল। আমি বৃষ্টির সঙ্গে ঐক্য অনুভব করবার চেষ্টা করেছিলাম। বৃষ্টি প্রকৃতির যে ঐশ্বর্য নির্মাণ করে তার মধ্যে যৌবনের বিকাশ অনুভব করা যায়। বৃষ্টি দেখে আমি অজ্ঞাত এবং অনুভূত অবস্থায় কাব্য অনুভব করেছিলাম। মনে হয়েছিল বৃষ্টি হচ্ছে জীবনধর্মী, বৃষ্টির বিনাশ নেই। বৃষ্টিকে স্পর্শ করবার

www.pathagar.com

জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে বৃষ্টি যেন উচ্ছলিত হয়ে হেসে ওঠে। বৃষ্টি নামে প্রবল বেগে, কতদূর আকাশ থেকে জানি না, কিন্তু নামে যখন তখন সমস্ত বাধা বন্ধনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যৌবনের লীলাও হচ্ছে বৃষ্টির মতো। শৈশব এবং কৈশোরে আমরা ভেসে চলি স্রোতবাহী নদীর মতো। কিন্তু যৌবনে বৃষ্টির প্রতাপে অধীর হই এবং কম্পমান হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করি আমি কে? আমি কোথায়? এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। এই আকুল জিজ্ঞাসায় প্রাণের একটি স্পন্দন অনুভব করা যায়।

মানুষ যৌবনকে কখন কখন কিভাবে আবিষ্কার করে, বলা কঠিন। পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করে আমার মনে হচ্ছে আমি বৃষ্টির মধ্যে যৌবনকে অনুভব করেছি। অতীতের অনুভূতিগুলো নতুন করে নির্মাণ করতে গিয়ে এভাবেই যৌবনকে বারবার বোঝবার চেষ্টা করেছি। বৃষ্টি হঠাৎ নামে, আবার হঠাৎ চলে যায়। সর্বক্ষণ বৃষ্টির ধারাপ্রবাহ থাকে না। নদী যেমন সতত সঞ্চরমান, বৃষ্টি তেমন নয়। বৃষ্টি যখন আসে সবকিছুকে আলোড়িত করে আসে। আবার যখন চলে যায় তখন তার ধারাপ্রবাহের চিহ্ন থাকে না। সে একই সঙ্গে অসম্ভারে নায়ক এবং বিস্ময়ের প্রাণদ প্রবাহ। যৌবনকালে মানুষের শরীর কেমন যেন আকুল হয়। কি যেন সে চায়। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে সে জানে না সে কি চায়। সে এলোমেলো হতে চায়, সে উৎক্ষিপ্ত হতে চায়। সে সবকিছুকে ভেঙ্গে ফেলতে চায় আবার কখনো প্রবল হতাশায় আক্ষেপ করতে চায়। কিন্তু এটা সে অনুভব করে যে তার সমস্ত শরীর নতুন রক্তস্রোতে উষ্ণ হয়েছে এবং সকল বস্তুকে নতুন করে দেখবার সে দৃষ্টি পেয়েছে। স্কুল জীবনে যা শুধু কৌতূহল ছিল পরবর্তীতে সে কৌতূহলের গভীরে প্রবেশ করবার আগ্রহে জন্মেছিল।

বৃষ্টি দেখে রমণীর যৌবনকে অনুভব করেছিলেন চণ্ডীদাস। বৃষ্টিসিক্ত শরীরে রাধিকা যখন নীল শাড়ি পরে শরীর সঞ্চালিত করে এগিয়ে যাচ্ছে তার কি অপরূপ বর্ণনা। চণ্ডীদাস বলছেন, নীল শাড়ি বেয়ে পানি যেমন চুইয়ে পড়ে তেমনি আমার হৃদয় থেকে কামনা বিগলিত হচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যে যৌবনবতী রমণী শরীর দেখে যে অপূর্ব আনন্দ জাগে একটু বড় হয়ে তা অনুভব করেছি। রমণী শরীরে একটি আন্দোলন আছে, একটি তরঙ্গিত প্রসাদ আছে, যৌবনকালে তা দৃষ্টিকে প্লাবিত করে। আমি আমার গৃহের রমণীকুলকে আত্মীয় পরিচয়ে চিনতাম রমণী পরিচয়ে নয়। কিন্তু অপরিচিতা যুবতী রমণীকে দৃষ্টির মধ্যে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম তখন মনে হয়েছিল এখানেই আমার আকাঙ্ক্ষিত ঐশ্বর্য। যৌবনের ঔদার্য নিয়ে একটি শরীরী চৈতন্য এগিয়ে চলেছে, তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক জানি না। কিন্তু মনে হত একটি সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, তা না হলে আমি সম্পূর্ণ হবো না। প্লেটো তাঁর একটি সংলাপে বলছেন, পুরুষ এবং রমণী এক সময় এক সত্তা ছিল, পরে দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং বিভক্তির পর অনবরত আকুলতা এবং আর্তি নিয়ে একে অন্যকে পাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। প্লেটো অবশ্য কথাগুলো পরিহাস করে বলেছিলেন। কিন্তু বিধাতার সৃষ্টিরহস্যের গল্পও তো এমনি। তিনি প্রথম আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন। পরে আদমের পাঁজরের একটি হাড় নিয়ে ইভ বা হাওয়াকে সৃষ্টি করেছিলেন। আদম তাঁর অস্থিখণ্ডের দাবীদার, তাই সে অনন্তকাল ধরে প্রত্যাশায় হাওয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে থাকে এবং শিহরণের সাগ্রহে হাওয়া আদমের দিকে কৌতূহলে এগিয়ে আসে। একজন ফরাসী

www.pathagar.com

কবি রমণীকে 'বরাট চলিষ্ণু হাহাকার' বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, রমণীর চলিষ্ণু শরীর পুরুষের চিত্তে হাহাকার তোলে, আর্তরোল তোলে, কামনার নতুন কম্পমানতা তোলে। যুবতী রমণীর কেশগুচ্ছ থেকে পদাঙ্গুলি পর্যন্ত একটি কম্পমান শিহরণের মতো একজন পুরুষ তার যৌবনকে আবিষ্কার করে, সে একাকী সম্পূর্ণ নয় তার অনুভূতিও নিঃসঙ্গ নয়। একটি আসঙ্গের কল্পনা নির্মাণ করে সে তার যৌবনকে অনুভব করে।

যৌবনে ফুলকে আমরা নতুন দৃষ্টিতে দেখি। আমাদের বাড়িতে গোলাপ ফুলের গাছ ছিল অনেকগুলো। হঠাৎ একদিনে লাল গোলাপগুলো আমাকে চমকিত করলো। তখন সূর্য ডুবছে। পশ্চিম আকাশ লাল হয়েছে, লাল কৃষ্ণচূড়ায় পথে পথে শোভা নেমেছে। ঠিক সেই সময় বাতাসের দোলায় গোলাপের সবুজ ডালে লাল গোলাপ ফুলগুলো আমাকে আকুল করেছিল। আমি অনেকক্ষণ গোলাপের গাছগুলোর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। স্নায়ুতে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তার রক্তিমাভা অনুভব করা যায়। গোলাপ ফুল দেখে সেদিন আমার স্নায়ু চঞ্চল হয়েছিল। আমি বিপুল অধীরতায় একটা কিছুকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে একটা কিছু যে কি, তা তখন জানতে পারি নি। গ্রীক দেবতা এপোলো কবিতার দেবতা এক ঔষধের দেবতা। মানুষের জীবনে ঔষধের প্রয়োজন আছে। কামনার নিপীড়ন মানুষকে ঔষধের জন্য আকুল করে। এপোলো সে ঔষধ এনে দেন কবিতার ব্যঞ্জনায়। তাই বোধ হয় যৌবনের উন্মেষ মানুষকে প্রথম কবি করে।

॥২॥

বৃষ্টির অবিরল ধারা দেখে মনে হত, এর শেষ নেই, আরম্ভও নেই। একটি অনাদি অশান্ত ধারাপ্রবাহ সমগ্র জীবনকে সিক্ত করছে। যৌবন উন্মেষের লগ্নে বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করতো। ইচ্ছে হত সর্ব আবরণমুক্ত হয়ে নিজেকে বৃষ্টির সঙ্গে মিশিয়ে দেই। মধ্যযুগের কবিরা বলেন যে চাতকের মতো প্রেমিক হতে হয়, প্রত্যাশী হতে হয়। চাতক বৃষ্টির পানির জন্য অপেক্ষা করে এবং সে পানি পান করে যৌবনময় হয়। চতুর্দিকে অথৈই পানি থাকলেও চাতক সে পানিতে ওষ্ঠ স্পর্শ করবে না, সে ঘাড় উঁচু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে একবিন্দু বৃষ্টির নির্যাসের জন্য। মধ্যযুগের কবিরা আরো বলেছেন, বর্ষাকাল যখন আসে, বৃষ্টি যখন শব্দ করে নামে, তখন কল্যাণী রমণী প্রিয় প্রত্যাশায় হস্ত প্রসারণ করে, কিন্তু কোথাও কাউকে না পেয়ে বিপুল হাহাকারে আর্তনাদ করে। বর্ষার বিরহবেদনা অসহনীয়। কেননা, বর্ষা আগমনের সংকেত দেয়, প্রত্যাশার অভিপ্রায় চিত্তে জাগায়। সে মুহূর্তে প্রত্যাশার পাত্রকে না পেয়ে হৃদয় অস্থির হয়। আমি এতটা বুঝতাম না, কিন্তু এটা বুঝতাম যে বৃষ্টির প্রবাহ আমার জন্য নতুন জীবনের কথা বলছে।

আমার এক বন্ধু ছিল যার কথা আগে বলি নি। কেননা, আমার স্কুল-জীবনে সে বিশেষ কোনো তাৎপর্য আমার জন্য নির্মাণ করে নি। বড়লোকের ছেলে, স্কুলে আসত। আবার চলে যেত। আমাকে খুব কাছে টানতে চাইতো। আমিও কাছে যেতাম, কিন্তু পুরোপুরি আমরা একজন আর একজনের হই নি। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর দু' মাসের অবকাশে আমি তার বাড়িতে অবস্থান করেছিলাম। বন্ধুর নাম মহবুব, মহবুব অর্থও বন্ধু। তার পিতা সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন শিক্ষা বিভাগে। সে থাকতো নীলক্ষেতে

www.pathagar.com

প্রকাণ্ড বড় একটি বাড়িতে। সরকারী দোতলা বাড়ি, লাল ইটের সামনে বড় খোলা জায়গা, বাড়ির পেছনেও অনেকটা খোলা জায়গা। সামনে প্রকাণ্ড বড় গেইট। গেইটের পশ্চিম পাশে অযোধ্যা সিং নামে এক ভোজপুরী দারোয়ান থাকতো। গেইট পাহারা দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে সে বসে বসে রামচরিতমানস সুর করে পড়তো। তার কাছেই আমি রামায়ণ কাহিনী শুনেছি। হনুমান যখন বন্দিনী সীতার কাছে এসে বলল, 'তুমি যে এখানে আছো রাম তা জানেন না। আমার কাছে সংবাদ পেয়ে শীঘ্রই সৈন্য নিয়ে আসবেন এবং শরের আঘাতে সমুদ্র স্তব্ধ করে লংকাপুরী রাক্ষসশূন্য করবেন। আমি শপথ করে বলেছি শীঘ্রই তুমি প্রস্রবন পর্বতে রামের চন্দ্রমুখ দেখতে পাবে। তোমার অদর্শনে রাম শোকমগ্ন হয়ে আছেন। রমণীয় কোন ফল পুষ্প অথবা অন্য কিছু দেখলেই তিনি 'হা প্রিয়া' বলে শোক করেন। সীতা বললেন, যদি রাম এখানে এসে দশানন এবং অন্য রাক্ষসদের বধ করে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান, তাহলে সেটা তার যোগ্য কাজ হবে।'

অযোধ্যা সিং খুবই নির্বিরোধ লোক ছিলো। আমাদের সঙ্গে হাসি-কৌতুক করতো এবং গাঁথা শোনাতো। দেখা হলেই বলতো, 'ক্যা বাবু সাব, হনুমানজী কা কিসা শুনোগে?' যদি জিগ্যেস করতাম, 'হনুমানজী কে?' অযোধ্যা সিং দাঁতে জিভ কেটে বলতো, 'ছিয়া ছিয়া, আপ নাহী জানতে হ্যায়। হনুমানজী তো মহাবীর হ্যায়' এ কথা বলে সে সুর করে পড়তো ঃ

দেখি পবন সুত কটক বিহালা/ক্রোধবন্ত জনু ধাওউ কালা/মহাশৈল এক তুরন্ত উপারা/অতিরিস মেঘনাদ পর ডারা।

অযোধ্যা সিং তারপর আমাদের সুবিধার জন্য কবিতাটি ব্যাখ্যা করে বলতো, 'ইসকা মতলব হ্যায়, জব রামচন্দ্রজী কি সারি সেনা বেহাল হো গিয়া, তব পবন পুত্র হনুমানজী বোধ করকে এ্যায়সে দৌড়ে মালুম হুয়া কিয়া কাল দৌড়ে মালুম হুয়া কিয়া কার দৌড়া আতা হ্যায়'।

মহবুবের মা ছিল না, বাড়িতে তার সৎ মা। এই সৎ মা তার পিতার তৃতীয় বিবাহ। বড়লোকের কন্যা। প্রচুর দাসী নিয়ে থাকেন। তার সর্বক্ষণ দাসী পরিবৃত মুহূর্তগুলো থাকত।

আমি মহবুবের বাড়িতে যেদিন যাই সেদিনের কথা আমার মনে আছে। দুপুরের শেষে আমরা তার বাড়ির সামনে গিয়ে পৌঁছলাম। তখনও খুব রোদ। বাড়িতে বড় একটি লোহার গেট এবং চারদিক দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতেই দারোয়ান দরোজা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকেই সামনে বড় একটি খোলা মাঠ চোখে পড়লো। মাঠের মধ্যে কৃষ্ণচূড়ার একটি গাছ এবং বাড়ির গা ঘেঁষে একটি বড় আমগাছ। বাড়িটি দোতলা, লাল ইটের বাড়ি। ঢুকবার সিঁড়ির সামনে একটি ঢাকা বারান্দা। সিঁড়ি বেয়ে একটু উঠলেই ডানে বড় একটি ঘর এবং বাঁয়েও একটি ঘর। মাঝখানে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। মহবুব আগেই আমাকে বলেছিল, আমি যেন তার পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে খুব আস্তে আস্তে চলি। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন? মহবুবের উত্তরে বুঝেছিলাম যে তার সৎ মা হয়তো ঘুমিয়ে থাকবেন। ঘুমে বিঘ্ন ঘটলে তিনি ক্রুদ্ধ হতে পারেন। এতে আমার আরো ভয় করছিল। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বাঁদিকে একটি বড় ঘর চোখে পড়ল। সেখানকার দরোজায় এবং জানালায় নীল পর্দা ঝুলছিল। এবং এ দরোজার সামনে দিয়ে যেতেই

www.pathagar.com

ঘরের ভেতর থেকে সরু কিন্তু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন এলো, ‘কে যায়?’ উত্তরে মহবুব বললো, ‘আমি’। সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রশ্ন হল, ‘তোমার সঙ্গে কে?’ মহবুব উত্তরে বলল, ‘আমার এক বন্ধু’। উত্তর এল, ‘তোমার বন্ধুকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও’।

আমি তো ভয়ে কাঠ। মহবুব সাহস দিল। জানালো যে ভয়ের কোন কারণ নেই। ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারলেই ভদ্রমহিলা সন্তুষ্ট থাকবেন।। আমি ভয়ে ভয়ে ঘরের ভেতরে গেলাম। ঘরটি বেশ বড়। আগাগোড়া কার্পেটে মোড়া। ডানদিকে একটি বড় মেহগনির খাট। খাটের ওপর একজন মহিলা বসে আছেন। মহিলার বয়স খুব বেশি নয়, কিন্তু বেশ মোটাসোটা। রঙ ফর্সা, নাকে হীরের একটি নাকছাবি জ্বলজ্বল করছিল। মাথায় প্রচুর চুল। মুখাকৃতি গোলাকার। কিন্তু যেটি আমার চোখে মারাত্মক রকম লাগলো সেটি ভদ্রমহিলার দৃষ্টি। এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এর আগে আমি কখনো দেখি নি। আজকের ভাষায় বললে আমি বলবো, মর্মভেদী দৃষ্টি। ভদ্রমহিলার সামনে খাটের বাজু ধরে একটি মেয়েলোক দাঁড়িয়েছিল। মেয়েলোকটির পরনে হলুদ শাড়ি। শাড়িটির পাড় লাল। এ মেয়েলোকটির রঙও খুব ফর্সা। কিন্তু মুখ লম্বাটে। ভদ্রমহিলা আমাকে দেখেই বললেন, ‘তুমি মহবুবের বন্ধু, না? ভয় কি আমার সামনে আসো’। আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভদ্রমহিলা আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন এবং সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েলোকটিকে।

এ বাড়িটা ছিল রহস্যময় বাড়ি। বিশেষ করে আমার বন্ধুর পিতা যখন সরকারী কাজে কলকাতা যেতেন এবং সপ্তাহখানেক সেখানে থাকতেন তখন কেমন যেন রহস্যময়তা বাড়তো। বিশেষ করে দুপুর বেলায়। দুপুরে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়তো তখন কোথায় যেন টুংটাং শব্দ হতো। গান শোনা যেত না কিন্তু ঘুঙুরের শব্দ হতো। শব্দটা খুব বড় আকারের নয়, খুব হালকা, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসতো।

একদিন দুপুর বেলা যখন বন্ধুর ঘরে শুয়ে আছি হঠাৎ এই ঘুঙুরের শব্দ পেলাম। বাতাসের প্রবাহটা আমাদের ঘরের দিকে থাকায় শব্দটি এবার সুস্পষ্ট আসছিল। মহবুব ও আমি পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরুলাম। এবার সুস্পষ্ট মনে হল যে শব্দটি বেগম সাহেবার ঘর থেকেই আসছে। আমরা আস্তে আস্তে খাবার ঘর পেরিয়ে বেগম সাহেবার ঘরের বারান্দার দিকে জানালার কাছে হামাগুড়ি দিয়ে বসলাম। জানালা খোলা ছিল কিন্তু পর্দা টাঙানো ছিল। ঘুঙুরের শব্দের মাঝে মাঝে হাততালির শব্দ এবং খিলখিল হাসির শব্দও পাওয়া যাচ্ছিল। হাততালি ও হাসির শব্দ ছিল খুব চাপা। আমাদের তখন কৌতূহল হল ঘরের ভিতরে কি করে উঁকি দেওয়া যায়। নিঃশ্বাস বন্ধ করে এক একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করছি আবার শব্দ হলো বুঝি এই ভেবে মাটিতে বসে পড়ছি। অবশেষে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে পর্দার ফাঁকে চোখ রেখে ভিতরে তাকাবার চেষ্টা করলাম। প্রথমে কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু ক্রমান্বয়ে ভেতরের অন্ধকার যখন অভ্যস্ত হয়ে এল, তখন দেখতে পেলাম বেগম সাহেবা খাটের উপরে বসে আছেন, মাথা নেড়ে নেড়ে হাসছেন এবং হাততালি দিচ্ছেন। তার দৃষ্টির সামনে দেয়াল ঘেঁষে একটি পাটাতনের উপর নূরী সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। তার কলসীর মতো পেছন দিকটা শুধু দুলছে একবার বায়ে একবার ডানে এবং দোলার সঙ্গে সঙ্গে ঘুঙুরের শব্দ হচ্ছে। ঘুঙুরের শব্দ শেষ হতেই বেগম সাহেবা তালি দিচ্ছেন এবং হেসে উঠছেন। আমার কাছে সমস্ত

www.pathagar.com

ঘটনাটি আরব্য উপন্যাসের ঘটনা বলে মনে হচ্ছিল। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না, ঘটনার অবাস্তবতায় আমরাও বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। চোখ সরাতে পারছিলাম না, আবার বেশীক্ষণ থাকতেও ভরসা হচ্ছিল না। একসময় ঘুঙুরের শব্দ থামলো। আমরা তখন মাথা নিচু করে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের ঘরে ফিরে এলাম। মহবুব তো ঘরে ফিরে এক ডিগবাজি দিয়েই বলে উঠলো, 'কি মজা'!

আমার বুক ঢিপঢিপ করছিল। এ কোন পৃথিবীতে এলাম। আমি এতোদিন যে পৃথিবীকে জানতাম, সেখানে মানুষের জীবন কতো শান্ত ও নিশ্চিত। একটি নিরুপদ্রব শান্ত জীবনধারায় আমি অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু এখানে দেখি সকল পদক্ষেপই অপ্রস্তুত পদক্ষেপ। জীবনের গতিধারা স্বাভাবিক নয় অস্বাভাবিক। মেয়েলোকের শরীর সম্পর্কে কৌতূহল সৃষ্টির সুযোগ আমার ছিলই না। মাকে দেখতাম, বোনদের দেখতাম, নিকট আত্মীয়রা বাড়িতে এলে স্নেহ-মমতার স্পর্শ পেতাম, তাদের শরীরকে পরিচ্ছন্ন আচ্ছাদিত এবং পরিশুদ্ধ মনে হতো। এখানে এসে অনাবৃত রমণী শরীর এবং তাকে বিশেষভাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা দেখে ভীত হলাম, অবশ্য কৌতূহলীও হলাম।

এই একটিমাত্র ঘটনা আমাকে কৈশোরের নিষ্পাপ কৌতূহল থেকে এক মুহূর্তে যৌবনের উন্মাদনায় পৌঁছে দিল। বৃষ্টিধারার মতো এই উন্মাদনা শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরাকে সিক্ত করলো।

॥৩॥

স্কুলে ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসকক্ষে প্রবেশ করতে হত এবং একই কক্ষে ছুটি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত। ক্লাসে শিক্ষক বদল হত, কিন্তু ছাত্র বদল হত না। এটা ছিল এক রকমের বন্ধন দশা। কিন্তু এই বন্ধন দশার মধ্যেই আমরা আনন্দের কোলাহল তৈরি করে নিতাম। ঘন্টা পড়ার আগের সময়টিতে, শিক্ষক বদলের সময়ে এবং টিফিনের সময় আমরা প্রবল উদ্দামতায় একটি স্বাধীনতায় অবগাহন করতাম। একটি ক্লাসে আবদ্ধ থাকা কখনো আমাকে নিরুৎসাহিত করে নি, কিন্তু কলেজে যখন এলাম তখন প্রথমেই যা চোখে পড়লো তা হচ্ছে স্বাধীনতার একটি উদার ব্যাপ্তি। কোনো শ্রেণীর জন্য কোনো কক্ষ নির্দিষ্ট নেই। বিষয় অনুসারে কক্ষ সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং ঘন্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক যেমন তার কক্ষ খুঁজে নিচ্ছেন ছাত্ররাও তেমনি তাদের কক্ষ খুঁজে নিচ্ছে। কোলাহল করবার মতো সময় অনেক, নানা প্রবৃত্তির কল্লোল তুলে ছাত্ররা করিডোরে ঘুরছে, কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে প্রবেশ করছে, স্কুলের তুলনায় এ এক বিস্ময়কর স্বাধীনতা। কিন্তু কেন যেন মনে হত স্কুলের কল্লোলিত প্রহরগুলো কলেজের স্বাধীনতার মধ্যে আর ফিরে পাবো না।

স্বাধীনতার সমগ্রতায় আমরা চিরদিন কারারুদ্ধ। অনেক ইচ্ছা ও আশার আগুনে আমরা সর্বকাল তাপদগ্ধ। জলাশয়ে হংসসারি, মধুকোষে মৌমাছি, অন্ধকারে বাদুড় এবং বাহুর বেষ্টনে প্রেমিক আপন আপন আনন্দের পরিসরে কারাকক্ষ নির্মাণ করছে। স্বাধীনতার অচেতনতায় আমরা অনন্তকাল ধরে বন্দিদশা কামনা করছি। আদিম গুহার নির্জনতায় সত্য আবিষ্কারের যে যন্ত্রণা, তাও এক প্রকার কারাকক্ষের যন্ত্রণা, বর্তমানে কর্মের অনিবার্যতায় অবসর-কামনায় যে পিপাসা তাও যেন এক অসহায় বন্ধনের নির্যাতন।

www.pathagar.com

স্কুলে মনে হত আমার একটি অস্তিত্ব আছে, কিন্তু কলেজ জীবনকে কেন যেন নিরপেক্ষ মনে হতে লাগলো। এই কলেজে ছাত্র-বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় এবং ইচ্ছায় আমি একাকী আমি আর থাকলাম না। তখন মনে হল আমি যেন আমার কর্মে ও ইচ্ছায় সকলের একজন। আমি একটা বিরাট অনিয়মের মধ্যে কেমন এক প্রকার নিয়মের ভগ্নাংশ হয়েছি। বর্তমান পৃথিবীতে আমরা প্রত্যেকেই আত্ম-অচেতন, এক প্রকার স্পর্শহীন নিরপেক্ষতার মধ্যে বাস করি যেখানে আমাদের অভিজ্ঞতাও আমাদের নয়, যেখানে আমরা আমাদের কর্মে ও ইচ্ছায় সকলের একজন। আমরা অন্য সকলের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত, আমি এক নেতিবাচক শূন্যতায় বিভিন্ন ঘটনা এবং কারণের শাসনে আপনাকে পরিচালিত করছি। আমার জীবন যেন আত্ম-চেতনাহীন বিভিন্ন কর্মের পরিক্রমা। অংকের হিসেবের পরিচ্ছন্ন কারণের নির্দেশে আমাদের সকল কর্ম যেন ব্যাখ্যাযুক্ত। পৃথিবীর সকল প্রাচুর্য-জ্ঞানের, অর্থের এবং বিজ্ঞানের, আমাকে প্রতিদিনের মাটিতে সমৃদ্ধমান করেছে। কিন্তু স্বপ্ন ও কল্পনায় আমি ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হতে চলেছি। আমার সকল কর্মের ব্যাখ্যাসূত্র আবিষ্কার করে আমি ক্রমশ দায়িত্বহীন হয়ে পড়ছি, কেননা আমার একার দায়িত্বে কোনও কিছুই তো ঘটছে না– আমি বিরাট একটি নিয়মের রাজ্যে অনবরত নিয়মধারার একটি অনুশাসনের ভগ্নাংশ। আমাদের সাধারণ পৃথিবীর জীবন, আবাসগৃহ এবং তাৎপর্যের অন্তরালে বিরাট অসম্ভবের রাজ্য, যেখানে বিশৃংখল সময়ের অবহেলার তরঙ্গ অনন্তকাল ধরে আবর্তিত। প্রকৃতি এবং মানুষের সকল নিয়মকে অস্বীকার করে এ অসম্ভবে মহাভূমি চিরকাল বেঁচে আছে। এ অসম্ভবের কল্পনা আছে বলেই আমাদের পৃথিবী অত্যন্ত পরিচিত হয়েও রহস্যময়। বেদনা ও সংকটের নির্যাতনের মধ্যেও আনন্দিত, অনবরত জিজ্ঞাসার সমন্বয়ে প্রহেলিকাপূর্ণ। জীবন কখন কি করে আরম্ভ হল? মানবসমাজের প্রথম চেতনা উন্মেষের সূত্রপাতেই এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল এবং এখনও এ প্রশ্নের শেষ হয় নি। এ প্রশ্নের এমন কোন উত্তর আমরা এখনও পাই নি যাকে স্বস্তিময় পরিপূর্ণ উত্তর বলা যায়। সাধারণ মানুষের জন্য সকল ধর্মেই একটা সরল ব্যাখ্যা আছে–সকল কিছুর আরম্ভে আল্লাহ ছিলেন, তিনিই আকাশ, পৃথিবী এবং গ্রহ-নক্ষত্র নির্মাণ করেছেন। এভাবে সকল প্রশ্নের নিবৃত্তি ঘটিয়ে আমরা চিরদিনের জন্য একটি স্তব্ধ বিনয় কামনা করেছি, অথচ জিজ্ঞাসার কোনো অবশেষ নেই–জিজ্ঞাসা মানব সভ্যতার সচলতার ইঙ্গিত এবং একটি অসম্পূর্ণতার বেদনা বা অসম্পূর্ণতা না থাকলে জীবনের প্রয়োজন হতো না। তাই একটি মানুষের সূচনা ধরে আমি অগ্রসর হতে চাই না। তাই চিরদিন আমার প্রশ্ন–যেখানে সবকিছুর আরম্ভ, সে আরম্ভের আরম্ভ কোথায়? যাকে উৎস বলে সকল জিজ্ঞাসাকে শেষ করলাম, সে উৎস মুখের সূচনা কোথায়?

স্কুলের সকল বন্ধুই যে কলেজে এল তা নয়। কয়েকজন কলকাতায় চলে গেল প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বে বলে। আবার নতুন নতুন ছাত্র এল বিভিন্ন স্কুল থেকে। স্কুলের ৭ বছরের নিয়মিত বন্ধন থেকে হঠাৎ মুক্ত হয়ে দেখি, এ এক নতুন রাজ্য। এখানে নতুন করে সবকিছু ভাবতে হচ্ছে। এখানে রাজনীতি আসছে, সামাজিক সম্পর্ক আসছে, নতুন ইচ্ছা এবং অহমিকা আসছে। প্রথম প্রথম আমি একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই নতুন জীবনের বিহিত কল্লোলের মধ্যে সবার সঙ্গে মিশে গেলাম। বিশেষ

www.pathagar.com

করে কলেজে প্রবেশের পরই একটি আন্দোলন আমাদের সময়কে গ্রাস করে ফেললো। আমি আন্দোলনের মধ্যে ছিলাম না কিন্তু আন্দোলনের কল্লোলের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিলাম ঠিকই। সেন্টগ্রেগরি স্কুল থেকে আবদুল হাই নামে একটি ছেলে অত্যন্ত বেশি আন্দোলন-সচেতন ছিল। সে এসেই কার ইঙ্গিতে জানি না, কলেজের অধিকাংশ মুসলমান ছেলেদের নিয়ে একটি দল গড়ে তুললো। মূল উদ্দেশ্য ছিল কলেজের স্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল চিন্তাহরণ ব্যানার্জীকে সরিয়ে ডক্টর মমতাজউদ্দীনকে প্রিন্সিপাল করা। ডক্টর মমতাজউদ্দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সবেমাত্র বিলেত থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন। আবার এদিকে প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক সরকারী চাকরিতে মুসলমান নিয়োগের পরিকল্পনা নিচ্ছেন। সুতরাং সুযোগটা অত্যন্ত সমীচীন ছিল। যে কৌশল করে চিন্তাহরণ বাবুর বিরুদ্ধে আবদুল হাই কলেজে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল সেটা হচ্ছে চিন্তাহরণ ব্যানার্জীর ইসলাম বিরোধিতা। ঘটনাটি কিন্তু সত্য নয়। চিন্তাহরণ বাবু নির্বিরোধী লোক ছিলেন। ভদ্রলোক শীর্ণকায়, ধুতির উপর আবার কোর্ট পরতেন। মুখে অপরিচ্ছন্ন দাড়ি ছিল। আমাদের তিনি ইংরেজী পড়াতেন। ইংরেজী পিরিয়ড আরম্ভ হত ১২টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। ক্লাস কক্ষটা ছিল দোতলায়, পূর্ব দিকে। এরই নিচে কলেজের দালানের বাইরে একটি জীর্ণ কবর ছিল। একদিন ক্লাস চলাকালীন সময়ে হঠাৎ আজানের শব্দ শোনা গেল। আসলে কবরের কাছে যে লোকটি থাকতো সে লোকটিকে দিয়ে ক্লাসের সময় আজানের ব্যবস্থা আবদুল হাই করিয়েছিল। হঠাৎ এই আকস্মিক আজানে চিন্তাহরণ বাবু খুব বিক্ষুব্ধ হলেন এবং আজানদাতাকে ডেকে আনলেন এবং ক্লাসেই আমাদের সামনে তাকে শাসালেন। তার বক্তব্য ছিল এটা তো মসজিদ নয় এটা একটি কবর। তাছাড়া এখানে কোনোদিনই আজান হয় নি। যাই হোক চিন্তাহরণ বাবুর এই শাসনকে কেন্দ্র করে কলেজে মুসলমান ছাত্ররা একটি প্রবল আন্দোলন গড়ে তুললো এবং কলকাতায় ডিপিআই অফিসে চিন্তাহরণ বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা হল। শেষ পর্যন্ত চিন্তাহরণ বাবুর নিয়োগ বাতিল করা হয় এবং অল্প কিছুকাল পর ডক্টর মমতাজউদ্দীন আমাদের কলেজে প্রিন্সিপ্যাল হয়ে আসেন। চিন্তাহরণ বাবু যেদিন কলেজ থেকে চলে যান সেদিন কিন্তু আমাদের খুব খারাপ লেগেছিল। তিনি বিশেষ কিছু বলতে পারছিলেন না। বারবার টেবিলে রাখা গ্লাস থেকে পানি খাচ্ছিলেন। এই দৃশ্যটা আজো আমার চোখে ভাসছে। স্বাধীনতার সমগ্রতায় মানুষ যে কিরকম কারারুদ্ধ হয় তার নিদর্শন এই আন্দোলনের মধ্যে আমি দেখেছিলাম।

॥৪॥

১৯৩৮ সাল সর্ব বিশ্বব্যাপী একটি সংক্ষুব্ধতার বৎসর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘোষিত হল ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। কিন্তু তার আগে থেকেই সর্বত্র একটি প্রবল আলোড়ন অনুভব করা যাচ্ছিল। হিটলারের প্রতাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, জার্মানীর নিজস্ব সত্তা ফিরিয়ে দেবার তৎপরতায় হিটলার একের পর এক দেশগুলোর উপর নিজের প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এবং চিত্রকলায় বিশ্বব্যাপী এই বিক্ষুব্ধতা ইতোমধ্যেই রূপ পেয়েছে। সাহিত্যে এবং সংস্কৃতিতে পরিবর্তন এসেছে প্রথম মহাযুদ্ধের

www.pathagar.com

পর থেকেই। আমাদের বয়স কম থাকলেও এই পরিবর্তনের কিছু আভাস আমরা পাচ্ছিলাম। ঢাকা শহরে কিছু ইংরেজ সেনাবাহিনীর আগমন এ শহরকে চঞ্চল করে তুলেছিল। স্কুলে যখন শেষ বছরে ছিলাম সে বছরই ইংল্যান্ডের ডরসেট রেজিমেন্ট ঢাকায় এসেছিল এবং পুরনো হাইকোর্টে বসবাস আরম্ভ করেছিল। ঢাকা শহরে সর্বত্রই এদের গতিবিধি ছিল। এরা ঘোড়ার গাড়িতে চড়তো, গাড়ি থেকে নেমে পকেটে পয়সা থাকলে একমুঠো পয়সা দিতো গাড়োয়ানকে। পয়সা না থাকলে নির্বিবাদে বেত্রাঘাত করতো। পুরনো হাইকোর্টের দালানের পেছনে একটি বড় পুকুর ছিল। সেই পুকুরে এসব সৈনিক যখন উলঙ্গ হয়ে গোসল করতো, তখন সে দৃশ্য দেখার জন্য কৌতূহলী মানুষ লোহার বেড়ার বাইরে ভিড় করতো। আমিও এ দৃশ্য দেখেছি। ছাত্রদের মধ্যে এসব ইংরেজ সৈনিকদের রক্তিমাভা নিয়ে অনেক মন্তব্য হত সেগুলো সবসময় শ্লীলতার গণ্ডির মধ্যে থাকতো না। বর্তমানে যেখানে পলাশী ব্যারাক সেখানে তখন বৃটিশ সৈন্যদের জন্য নতুন অস্থায়ী বাসগৃহ তৈরি হচ্ছিল। সে এলাকায় একটা ইংরেজী সিনেমা ঘরও সাময়িকভাবে তৈরি হয়। আমরা কখনো কখনো দল বেঁধে এই সিনেমা হলের বাইরে টাঙ্গানো অভিনেতা অভিনেত্রীদের ছবি দেখতাম। সবই ইংরেজী বই। একটি দুটি বইয়ের নাম এখনো মনে আছে। একটি বইয়ের নাম ছিল 'অক্সফোর্ডে একজন ইয়াংকী' ইয়াংকী মানে আমেরিকান। ঘটনাটা হচ্ছে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডের মতো প্রবীণ এবং সম্ভ্রান্ত বিদ্যাপীঠে একজন মার্কিন ছাত্র কি করে দিগভ্রষ্ট হয়েছিল এবং বিভ্রান্ত হয়েছিল তারই কৌতুককর কাহিনী। সেনাবাহিনীর ব্যারাক যেখানে তৈরি হয়েছিল সেখানে আবার মাঝে মাঝে খাকি ইউনিফর্ম পরা কিছু মেম সাহেবও থাকত।

এরা কি জন্য এসেছে এবং এদের দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হয়, তা আমাদের জানা ছিল না। কিন্তু এদের নিয়ে আমাদের কৌতূহল ছিল, কল্পনা ছিল। এই কল্পনা অধিকাংশ সময়েই সীমার বাইরে চলে যেত। আর কল্পনাটা একটু দৈহিক মিলনসাধনের বিষয় নিয়ে গড়ে উঠতো। এর একটা কারণও ছিল। আমরা অনেকদিন পুকুরে সৈনিকদের উলঙ্গ হয়ে গোসল করতে দেখেছি। সেখানে পুকুরের ঘাটে এসব মেয়েদের অনেককে চেয়ারে বসে থাকতে দেখেছি। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ধারণা হয়েছিল নারীসঙ্গবিবর্জিত সৈনিকদের রমণীর অভাব দূর করার জন্য এই মেম সাহেবদের আমদানি করা হয়েছে। অবশ্য পরে জেনেছি যে এসব মেম অক্সিলারী কোরের সদস্যা। এঁদের মধ্যে কিছুসংখ্যক আবার নার্সও ছিল। প্রত্যেক ব্যাপারে ফিল্ড হসপিটাল ছিল, সেখানে নার্সের প্রয়োজন হত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধলো সরকারীভাবে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে। হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করলেন ১লা সেপ্টেম্বর, খুব প্রত্যূষে। এর আগে থেকেই আমরা কাগজে খবর পাচ্ছিলাম যে পোল্যান্ডের সপক্ষে ইংরেজ বাহিনী থাকবে। ১৯৩৮ সাল সমগ্র ইউরোপে ছিল পুরোপুরি যুদ্ধপ্রস্তুতির কাল। বহুদূর থেকে আমরাও এটা অনুভব করছিলাম যে শক্তির দম্ভে জার্মানী সর্বতোভাবে প্রস্তুত। কিন্তু ইংল্যান্ড বা অন্যান্য দেশ তখনও অপ্রস্তুত। হিটলার সমরাস্ত্রের সাহায্যে সমগ্র ইউরোপকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেছিলেন। পোল্যান্ড আক্রমণ করবার পূর্বে তিনি উত্তর সমুদ্রে পোল্যান্ডের ডানজিগ পোর্ট দখল করে নিয়েছিলেন। সে সময় খবরের কাগজে প্রত্যহ পড়তাম হিটলারের প্রতিদিনকার গতিবিধির কথা। ইংল্যান্ডের

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নেভিল চেম্বারলেন। চেম্বারলেন ছিলেন জীর্ণ শীর্ণ লম্বা একজন ছাতাবাহী ব্যক্তি। আমরা কোনোদিনই ভাবতে পারতাম না এই পাতলা ছিপছিপে লোকটি কি করে হিটলারের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে। ডানজিগ হিটলারের দখলে গেলে নেভিল চেম্বারলেন বৃটিশ পার্লামেন্টে বলেছিলেন যে ইংল্যান্ড কখনো পোল্যান্ডকে পরিত্যাগ করবে না, চরম দুর্দশার দিনে পোল্যান্ডের পাশে থাকবে। আমরা তখন ভাবতাম যে চেম্বারলেন শুধু কথা বলে এবং একটি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর কথা বলে।

কিন্তু হিটলার ঘটনা ঘটিয়ে দেয়। আমাদের আকর্ষণ ছিল শক্তির প্রতি। হিটলার যে প্রবল প্রতাপে নিজের ক্ষমতাকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করছে এই প্রতাপ আমাদের মুগ্ধ করেছে। আর্মানিটোলা স্কুলের ইংরেজী শিক্ষক ড্যানিয়েল জোনসের সঙ্গে একদিন বিকেলে দেখা হয়েছিল ব্রিটানিয়া সিনেমার কাছে। ভদ্রলোক বয়সে তরুণ। আমরাও তখন সবেমাত্র কলেজে প্রবেশ করেছি। সুতরাং তিনি আমাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে কথা বললেন। যুদ্ধের কথাও হল। আমি যখন হিটলারের দম্ভ এবং শক্তিমত্তার কথা বললাম তখন ড্যানিয়েল জোনস বললেন, 'এ সময় ইংল্যান্ডে যদি লয়েড জর্জ প্রধানমন্ত্রী থাকতেন, তাহলে হিটলারের মোকাবিলা করতে পারতেন। তবে আর একজন লোক আছেন যিনি হিটলারের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন, তিনি হচ্ছেন চার্চিল। দেখবে চার্চিল কিছুদিনের মধ্যেই ক্ষমতায় আসবে। তখন যুদ্ধের চেহারা পাল্টে যাবে। ড্যানিয়েল জোনস ধীর শান্ত প্রকৃতির যুবা পুরুষ ছিলেন। অপূর্ব মধুর উচ্চারণে ইংরেজী কবিতা পাঠ করতেন এবং স্কুলে অনেকটা সমবয়সীর মতো আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। বর্তমানে জীবিত আছেন শুনেছি। ইংল্যান্ডের দক্ষিণে সাসেক্স অঞ্চলে নিজের খামারবাড়িতে শেষ জীবন কাটাচ্ছেন।

সে সময় মাঝে মাঝে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে সন্ধ্যার পর দু'এক জন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে রেডিও শুনতে যেতাম। যুদ্ধ ঘোষণার পর নিয়মিতভাবে বার্লিন রেডিও শুনেছি। বার্লিন রেডিও সর্বপ্রকার ঘোষণায় তীব্র একটা দম্ভ ছিল। এই দম্ভটি আমাদের ভালো লাগতো। বয়স কম। একটা বিরাট কিছু সংঘর্ষ ঘটুক এটা আমরা চাচ্ছি এবং প্রকাশ্যে না বললেও ইংরেজের পরাজয় ঘটুক এটাই যেন আমরা চাইতাম। বোধহয় পরাধীনতার জন্য একটি সুপ্ত অভিমান আমাদের ছিল। আমরা মনেপ্রাণে ইংরেজকে মেনে নিতে পারি নি। তাছাড়া বিভিন্ন সেনা ব্যারাকের সামনে ইংরেজ সৈনিকদের বেত হাতে নিয়ে আস্ফালন আমাদের মনকে ইংরেজের প্রতি সহানুভূতিহীন করে তুলেছিল। মদ্যপান করে সৈনিকরা ঘোড়ার গাড়িতে চরে এদিক ওদিকে যেত এবং শূন্য মদের বোতল রাস্তার উপর ছুঁড়ে ফেলতো। কাঁচের বোতল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পথচারীদের আঘাত করতো। সেনাবাহিনীর চলাফেরা, স্বভাব এবং এদেশীয়দের প্রতি তাদের আচরণ অনুকম্পা বা প্রীতির ছিল না।

এ সময় একটি ঘটনার কথা মনে আছে। একদিন আমরা খবর পেলাম যে দূরে সাতমসজিদের কাছে বৃটিশ সেনাবাহিনীর একটি মহড়া হবে। সাতমসজিদ তখনো আমরা দেখি নি এবং এলাকাটি ছিল অত্যন্ত দুর্গম। যাতায়াতের কোনো সুবিধাই ছিল না। কি করে যে পায়ে হেঁটে এবং কিছুটা পথ ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে এই মহড়া দেখতে গিয়েছিলাম আজো ভাবতে অবাক লাগে। সমগ্র শহর ভেঙে পড়েছিল সাতমসজিদ এলাকায়। কাঁচা মাটির পথ পেরিয়ে, বনজঙ্গল অতিক্রম করে ধুলায় ধূসরিত হয়ে আমরা

www.pathagar.com

মহড়া দেখবার চেষ্টা করেছি। পুরো একটি দিন আমাদের নষ্ট হয়েছিল এই মহড়া দেখার জন্য। দুপুরের রোদে মসজিদের কাছে কাছে গাছের ছায়ায় বসে আমরা এই মহড়া দেখবার চেষ্টা করেছিলাম। বন্দুকের শব্দ, সেনাবাহিনীর যান্ত্রিক গাড়ির চাকার শব্দ, এক সাথে পা ফেলার শব্দ, এসব শব্দে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে অজস্র কাক কা কা করে আকাশে উড়ছিল।

॥৫॥

কোলকাতা ছিল আমার কাছে স্বপ্নের শহর, কল্পনার শহর। শৈশবে গ্রামে যখন ছিলাম তখন গ্রামের কিছু যুবক কোলকাতায় চাকরি করতো। তাদের সৌভাগ্যে আমার ঈর্ষা হত। বিশেষ করে বছর শেষে তারা নানা উপঢৌকন সামগ্রী নিয়ে গ্রামে যখন ফিরতো তখনই আমি অভিভূত হতাম। এদের একজন একবার কলের গান এনেছিল। একটা কাঠের চৌকোণ বাক্সের উপর একটা বিরাট চোঙ লাগানো ছিল। এর মধ্য দিয়ে গানের শব্দ বেরুতো। আমরা কৌতূহলী হয়ে চোঙের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখতাম, শব্দ কোত্থেকে আসছে। গ্রামের সবাইকে আকর্ষণ করবার জন্য এটাই যথেষ্ট। আজকাল তো নানারকম গ্রামোফোন বেরিয়েছে কিন্তু তখনকার দিনে চোঙওয়ালা কলের গানই ছিল গ্রামোফোন। এখনও মনে আছে, আমাদের গ্রামের বাড়ির পুকুরের অন্য পাশে যাদের বাড়ি ছিল তাদের বড় ছেলে কোলকাতা থেকে এরকম কলের গান নিয়ে এসেছিল। গ্রামের ছেলেরা দল বেঁধে এই বিস্ময়কর বস্তু দেখতে তাদের বাড়িতে জড়ো হয়েছিল।

কোলকাতা ফেরৎ যুবকরা আরো নানা রকম জিনিস নিয়ে আসতো- যেমন চাবি দেওয়া মোটর গাড়ি, পুতুল ইত্যাদি। এগুলোও কম আকর্ষণীয় ছিল না। আমার তখনই মনে হত প্রতিদিন আমি যা দেখি না সেসব কিছুই কোলকাতায় পাওয়া যাবে। গল্পের ভুবনে যেসব অসম্ভবের কথা থাকে আমার চিন্তায় কোলকাতা ছিল সেইসব অসম্ভবের রাজ্য। আমাদের বাড়ির এক দাসীর ছেলে ছিল মোঙ্গলা। সম্ভবত, মঙ্গলবারে হয়েছিল বলেই তার নাম হয়েছিল মঙ্গল। প্রতিদিনের ডাকে মঙ্গল মোঙলা হয়েছিল। এই মোঙ্গলা একদিন কোলকাতায় চাকরি করতে গেল। মোঙ্গলা ইংরেজ সাহেবের ঘরে চাকরি পেয়েছিল। বড় হয়ে জেনেছি এক হোটেলের সাহেব ম্যানেজারের খানসামা সে ছিল। ছুটিতে দেশে বেড়াতে এসে মোঙ্গলা নানা ধরনের খাদ্যসামগ্রীর বর্ণনা দিত।

আবার ঝকঝকে পোশাকের বর্ণনাও করতো। সে কখনো কখনো ঘোড়ায় চড়ে পুলিশরা যে প্যারেড করে তার বিবরণও দিত। এক কথায় কলকাতা প্রত্যাগত বিভিন্ন লোকের কাছে কোলকাতার বিবরণ শুনে কোলকাতায় যাবার একটি আগ্রহ আমার মধ্যে তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু শৈশবে তো স্বাধীন ছিলাম না সুতরাং কোলকাতা যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারি নি। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর কিছুটা স্বাধীনতার স্বাদ পেলাম। তখন আর আমার সঙ্গে কোনো চাকর ঘুরতো না, মাকে জিগ্যেস করে একা একাই এ-বাড়ি ও-বাড়ি যেতে পারতাম। এভাবে কিছু দিন মহবুবের সঙ্গে তাদের বাড়িতেও ছিলাম। মহবুবই এক দিন কোলকাতায় যাবার কথা বলল। তার কিছু আত্মীয়স্বজন কোলকাতায় থাকতো সেখানে সে উঠতে পারবে বলল। আমারও মেজ ভগ্নিপতি কোলকাতা হাইকোর্টে চাকরি করতেন, আমিও ভাবলাম আমারও তো থাকবার অসুবিধা হবে না। অনেক কষ্ট করে মার সম্মতি নিয়ে এক দিন কোলকাতার পথে চললাম।

www.pathagar.com

তখন ঢাকা থেকে কোলকাতা যাওয়ার পথ ছিল নারায়ণগঞ্জ গোয়ালন্দ হয়ে শিয়ালদহ। ঢাকা থেকে ট্রেনে করে সকাল দশটায় নারায়ণগঞ্জ যেতে হত, নারায়ণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দগামী স্টিমারে করে গোয়ালন্দ এবং গোয়ালন্দ থেকে রাত্রিবেলা ট্রেনে করে শিয়ালদহ। পুরো যাত্রার তৃতীয় শ্রেণীর খরচ ছিল ৯ টাকা কয়েক আনা। এখন গাড়িতে করে ফরিদপুর বা যশোরে যাওয়ার পথে গোয়ালন্দ পড়ে। কিন্তু এখনকার গোয়ালন্দ আগেকার ঐশ্বর্যশালী সে গোয়ালন্দ নয়। কোলকাতা পথের যাত্রীরা জাহাজ থেকে নেমে কোলকাতাগামী ট্রেনে ওঠার আগে গোয়ালন্দ ঘাটে ভাত-মাছ খেয়ে নিত। আমরা দু'বন্ধুও এরকম একটি ভাতমাছের হোটেলে খেয়েছিলাম। সে সময় ইলিশ মাছ পাওয়া যেত খুব সস্তায়। টাকায় ১৬টার মতো মাছ পাওয়া যেত। আমরা ভাত খেলাম ভাজা ইলিশ, রান্না ইলিশ ও ডাল দিয়ে। এক একজনের পাতে দুটো করে ভাজা মাছ এক চামচ মাছভাজা তেল এবং কিছু পেঁয়াজ ও কাঁচামরিচ ভাজা। স্বাদেগন্ধে অতুলনীয় ছিল। তারপর রান্না মাছ। তাও দু'তিন টুকরো করে। পেটির মাছ, হালকা সুরুয়া সঙ্গে কয়েকটি আলুর টুকরো। এগুলো তো সুস্বাদু ছিল কিন্তু সবচেয়ে রসনা তৃপ্তিকর ঘন ডালটি। ঘাটে একটি দুটি খাওয়ার দোকান ছিল না, একসার অনেকগুলো ছিল। এবং সবগুলোতেই খাবারের জন্য লোক আসতো অনেক। এখনও ফেরীঘাটে খাবার দোকান আছে, কিন্তু আগেকার মতো জমজমাট নয়। আগে দোকানে খাওয়াটা যাত্রীদের জন্য অপরিহার্য ছিল।

দোকানে খেতে বসে বিচিত্র কল্লোল শোনা যেত। নদীতে পানির স্রোত হত, ট্রেনের হুইসেল বাজতো, কুলিদের চিৎকার শুনতাম এবং বিভিন্ন কণ্ঠের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কথা প্রহরগুলোকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। সুস্পষ্ট কোনো বাক্য বোঝা যেত না, কিন্তু অস্পষ্ট প্রতিধ্বনির মতো অনেক কথার কলগুঞ্জন বাতাসে সাড়া তুলতো। মানুষ সময়কে অতিক্রম করে চলে কিন্তু অতীতের প্রহরগুলিকে মানুষ কখনোই হারায় না। শব্দের সম্ভারে, তৃপ্তির পরিপূর্ণতায় পুরনো সংবাদগুলো আমাদের সম্পদ হয়ে থাকে। প্রথমবারের কোলকাতা যাত্রার যাত্রাপথের কথা আমার সবিশেষ মনে নেই কিন্তু গোয়ালন্দ ঘাটের সুস্বাদু খাবারের কথা আজো মনে আছে। এখনো মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় কোনো নদীর ঘাটের সাধারণ ভাতমাছের দোকানে গিয়ে বসি এবং আগের মতো তৃপ্তিস্বাদে পরিপূর্ণ হই। কিন্তু তা হয় না। অতি পরিচয়ের প্রহর। আমাকে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সুতরাং অতীতের স্মৃতিকেই সম্বল করে বেঁচে থাকার প্রয়াস পাই। ট্রেনে করে কালকাতা যাত্রা খুব মধুর ছিল না। দুটি ট্রেন তখন ছাড়তো গোয়ালন্দ থেকে। ১টি রাত ৮টায় আর একটি রাত ১২টায়। রাত ৮টার ট্রেনটি ছিল মেইল। মেইল ট্রেন সব স্টেশনে থামতো না এবং শিয়ালদহ পৌঁছতো খুব সকালে, অন্ধকার থাকতে। মিক্সড ট্রেন ছাড়তো অনেক দেরীতে এবং সব স্টেশনেই থামতো। দেরীতে ছাড়তো বলে এবং সব স্টেশনে থামতো বলে শিয়ালদহ পৌঁছতে বেলা হয়ে যেত। মেইল ট্রেনে কষ্ট হলেও প্যাসেঞ্জারদের অধিকাংশ মেইলে ভিড় করতো। ভিড়ের চাপে কষ্ট হত খুব। প্রথমবার আমি মেইল ট্রেনেই গিয়েছিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর কামড়ায় মানুষের ভিড় ছিল শ্বাসরুদ্ধকর। কোনো রকমে বসবার জায়গা পেয়েছিলাম। ঘুম আসেনি, তন্দ্রার মধ্যে এদিক ওদিক ঢুলেছি। ভিড়ের চাপে এবং গরমে প্রায় বিপর্যস্ত অবস্থায় কোলকাতায় নেমেছিলাম সকাল

www.pathagar.com

পাঁচটায়। প্রথম দৃষ্টিতে কোলকাতার চলমানতাই আমার চোখে পড়েছিল। অজস্র মানুষ ছুটছে এদিক ওদিক। প্রত্যেকেই কোনো না কোনো কাজে যেন ছুটছে। একটি অবসরহীন দ্রুত ধাবমানতার মধ্যে আমি প্রথম কোলকাতাকে পেলাম। রাস্তায় এক ধরনের গাড়ি চোখে পড়ল। যাকে ট্রাম বলে। নানাবিধ যানবাহন চোখে পড়লো। যেগুলো আগে কখনো দেখিনি। আমার মেজ ভগ্নিপতি থাকতেন ইলিয়ট লেনে। তিনি স্টেশনে এসেছিলেন। আমরা একটা ঘোড়ার গাড়ি করে তাঁর মেসে গেলাম। তিনি তাঁর কয়েকজন আত্মীয় নিয়ে একটি বাড়ির দোতলায় মেস করে থাকতেন। সেবার কোলকাতায় সেই মেসেই ৭ দিন ছিলাম এবং ভগ্নিপতির সাহায্যে আমরা দুই বন্ধু কোলকাতা শহরকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলাম। আমরা গড়ের মাঠে গিয়েছি, মনুমেন্ট দেখেছি, কালিগঞ্জ লেকে গিয়েছি, ওয়েলেসলি এবং সেরকম আরো দু একটি পার্কে গিয়েছি, জাঁ ফেশাঁ-তে কবাব-পরোটা খেয়েছি এবং আমজাদিয়ায় বিরিয়ানী খেয়েছি। সবগুলোতেই চড়েছি। আবার কিছু বড় দোকানে ঘুরে ফিরে জিনিসপত্রের বিক্রয় দেখেছি। এক কথায় বলতে গেলে অল্প সময়ের মধ্যে কোলকাতার বিচিত্রতার স্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। আমজাদিয়ায় খাওয়াটি আমার জন্য নতুন ছিল। আমি সেবারই প্রথম বিরিয়ানী খেলাম। ৮ আনা পয়সায় ১ প্লেট বিরিয়ানী ছিল। পোলাওর মধ্যে দু'টুকরো গোসত ছিল, দু টুকরো আলু এবং একটি সেদ্ধ আণ্ডা। ঢাকায় আমরা বিরিয়ানী চিনতাম না। ঢাকার সবচেয়ে সুস্বাদু খাবার ছিল মোরগ পোলাও। এখন আর সে মোরগ পোলাও হয় না। এখন ঢাকাও বিরিয়ানীর শহর হয়েছে। মোরগ পোলাও-তে প্রচুর বাদাম-পেশতা থাকতো, জাফরান থাকতো–স্বাদে গন্ধে মোরগপোলাও ছিল অতুলনীয়। আমজাদিয়ার বিরিয়ানী রকমফের হিসাবে খারাপ লাগে নি।

॥৬॥

শৈশব পার হয়ে মানুষ যখন বয়ঃসন্ধিতে পড়ে তখন সে একটি জটিল সময়ের মধ্যে উপস্থিত হয়। সে তখন আর শৈশবের বালক নয়, সে তখন যৌবনময় পুরুষও নয়, সে তখন একটা বিরাট সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে। সংঘর্ষটা হচ্ছে চৈতন্যের। এক দিকে শৈশবের দাবি ও অন্যদিকে যৌবনের প্রমত্ত আহ্বান, এ উভয়ের দ্বন্দ্বে সে বিভ্রান্ত হয়। বলা যেতে পারে এ সময়টি অদ্ভুত এক সংকটের সময়, এমন এক আনন্দের সময় যে আনন্দকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার এটা একটা বিভ্রান্তিরও সময়। এ সময় একটি বালক পৃথিবীর মধ্যে জেগে ওঠে। শৈশবকালে আমরা আমাদের সাংসারিক বৃত্তের মধ্যে জেগে উঠি কিন্তু বয়ঃসন্ধিতে জেগে উঠি পৃথিবীর মধ্যে। এ সময় নানারকম ইচ্ছা জাগে, নানারকম কল্পনা জাগে। নানাভাবে নতুন প্রাপ্ত স্বাধীনতাকে ব্যবহার করতে ইচ্ছা হয়। পাশের বাড়ির মেয়েটিকে একটু নতুন করে দেখতে ইচ্ছা হয় এবং তার মধ্যে একটি নতুন শরীরের আকর্ষণ সে অনুভব করে। অনেকগুলো ব্যাপারে তার জন্য পিতামাতা আর সিদ্ধান্ত নেন না। সে সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হয়। স্কুল থেকে কলেজে যখন এলাম তখন কলেজের কি পাঠক্রম গ্রহণ করবো, সে সিদ্ধান্ত আমার ছিল। বাবা-মা কিংবা আত্মীয়স্বজন বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করতে বলেছিলেন। আমি পুরোপুরি বিজ্ঞানের ছাত্র হই নি, আমি শুধু অংক আর ভূগোল নিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করেছিলাম। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংকতে দুশো নম্বরের দুশোই

www.pathagar.com

পেয়েছিলাম। সুতরাং অংকের ব্যাপারে আমার একটি অধিকার ছিল। মানবিক শাখার যে বিষয়গুলো আমি নিয়েছিলাম তা হচ্ছে ইংরেজী অর্থনীতি এবং বাংলা। কাজী আবদুল ওদুদ আমাদের বাংলা পড়াতেন। তিনি প্রথম দিন ক্লাসে বলেছিলেন, তোমরা এখন স্বাধীন যুবক, স্কুলের দ্বিধাগ্রস্ত বালক নও। এখন তোমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে জীবনে কি করবে এবং কোন পথে চলবে। ওদুদ সাহেবের এ কথাটি আমার মনে দাগ কেটেছিল।

এ বয়সে পিতামাতার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। স্কুল জীবনে একটি ছাত্র তার পিতামাতার নির্দেশেই চলে এবং সে বড় হয়। কিন্তু যখনই সে কলেজে আসে তখনই পিতামাতার জন্য সে সমস্যা হয়ে ওঠে। সে নিজের ইচ্ছামত চলাফেরা করতে চায়, কলেজের স্বাধীন জীবন তাকে নতুন পথের আগন্তুক করে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এ সমস্যাটা দেখা দেয় নি। আমার বাবা-মা উভয়েই আমার চলাফেরায় এবং পাঠক্রমগত সিদ্ধান্তে আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এর ফলে আমার স্বাধীন আচরণের মধ্যে আমি নিজেই শাসন প্রবর্তন করেছিলাম। অর্থাৎ কোনো কিছু করতে যাওয়ার পূর্বে অথবা কোথাও যাওয়ার পূর্বে মাকে জিজ্ঞেস করে নিতাম। মার বোধহয় বিশ্বাস ছিল যে আমি ভুল পথে যাবো না। তাই কখনো অনুমতি দিতে দ্বিধা করেন নি। কোলকাতায় যখন গেলাম তখন মার অনুমতি নিয়েই গিয়েছিলাম।

কোলকাতায় এসে এক বিস্ময়ের রাজ্যে উপনীত হলাম। অনেক কিছু চোখে পড়তে লাগলো, মানুষের স্বভাবের অনেক আশ্চর্য দিক আমার কাছে নতুনভাবে উদঘাটিত হল, যৌবনের বিবিধ আচরণের দিকগুলো হঠাৎ করে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। তখন সর্বত্র সেনাবাহিনীর লোকদের দেখা যাচ্ছিলো। ঢাকায় যেমন ছিল কোলকাতায়ও তেমনি। কোলকাতা বিরাট শহর, তাই এর সবদিকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কোলকাতা শহরে প্রত্যেক এলাকায় একটি করে বড় পার্ক ছিলো, এখনো আছে। একদিন মহবুবকে সঙ্গে নিয়ে ওয়েলেসলি পার্কে গিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে মহবুবের খালাতো ভাই গোলাম কুদ্দুস ছিল। গোলাম কুদ্দুস পরে কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গোলাম কুদ্দুস কম্যুনিস্ট পার্টির একজন খ্যাতনামা কর্মী। আমরা ওয়েলেসলি পার্কে যখন গেলাম তখন বিকেল পড়ে এসেছে। পার্কে সে সময় কয়েকটি বড় গাছ ছিল। গাছের জন্য ছায়া হতো, আড়ালও হতো। পার্কের মধ্যে কয়েকজন লোক কাঠের বেঞ্চিতে বসেছিলেন। এক দিকে তিনজন যুবতী আয়া প্যারাম্বুলেটরে করে তিনটি শিশুকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। এমন সময় হঠাৎ একটি গোরা সৈন্য পার্কের ভেতরে এল এবং আয়াদের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে শিস দিল। আমরা লক্ষ্য করলাম একটি আয়া তার প্যারাম্বুলেটরটি অন্য দুজন আয়ার কাছে রেখে গোরাটির কাছে এগিয়ে গেল। গোরা সৈন্যটি আয়াকে নিয়ে ডাইনের একটি বড় গাছের আড়ালে গেল। আমাদের কৌতূহল হল তখন প্রবল। ইচ্ছে হচ্ছিলো একটু ঘুরে গাছের আড়ালে এরা কি করে দেখতে। কিন্তু ভয়ে এগোলাম না। বরঞ্চ ওখান থেকে পালিয়ে এলাম। গোরাদের সম্পর্কে অনেক সতর্কবাণী গুরুজনরা করেছেন। সেসব কথা স্মরণ করে পার্কে বেশিক্ষণ থাকতে সাহস হল না। আরো অনেক দৃশ্য চোখে পড়েছে যে ক'দিন কোলকাতায়

www.pathagar.com

ছিলাম। রমণীর দেহগত অস্তিত্বের দিকে পুরুষের যে একটি আকর্ষণ তা অনুভব করবার বয়স তখন হয়েছে। কিন্তু এত সুস্পষ্ট এবং উন্মুক্তভাবে আগে কখনো তা বুঝি নি। আমরা কখনো কখনো একই আকর্ষণে মেট্রো অথবা লাইট হাউস সিনেমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। এ দুটি সিনেমা হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত যুবতী মেয়েদের শরীরের গতিধারা লক্ষ্য করেছি। যে জীবন এতদিন অচঞ্চল ছিল সে জীবন নতুন নতুন শিহরণে চকিত এবং অস্থির হয়ে উঠলো। গৃহের বন্ধনের বাইরে আমি আমার স্বাধীনতাকে একান্তভাবে পেলাম। এই স্বাধীনতার আমি অমর্যাদা করি নি। আমার মনে হয় গুরুজনরা যদি এ বয়সের সন্তানদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন তাহলে সাধারণত সন্তানরা সে বিশ্বাস ভঙ্গ করে না। আমার কবিতা পড়ার আগ্রহও কিন্তু এই স্বাধীনতাকে আবিষ্কার করেই দানা বেঁধেছিলো।

কোলকাতায় আমার ভগ্নীপতির এক ভাই ইসলামিয়া কলেজে পড়তেন। তিনি নজরুল ইসলামের কবিতা আবৃত্তি করতেন। আমিও তার সংস্পর্শে এসে নজরুল ইসলামের কবিতায় স্বাধীন ইচ্ছার স্বাদ পেলাম। কিছুদিন আগে একটি লেখায় পড়েছিলাম যে আমেরিকার কবি রবার্ট পেন ওয়ারেন তার যৌবনকে অনুভব করবার জন্য বয়ঃসন্ধিকালে শুধু কবিতা পাঠ করতেন। কবিতার ছন্দের স্পন্দন তার স্নায়ুশিরার স্পন্দনের সঙ্গে একাকার হয়ে যেত। ওয়ারেনের কবিতা লেখার ইচ্ছাও জেগেছিল এই বয়ঃসন্ধিকালে। তিনি কবিতা পাঠ করেন এবং কবিতা লিখে যৌবনকে অনুভব করেছিলেন এবং চিত্তের সম্ভাব্য বিক্ষিপ্ততা দূর করেছিলেন। কোলকাতায় থাকতে সে সময় মহাবোধি হলে একটি সাহিত্যের আসর বসেছিলো। সেখানে আমি গল্প পড়া শুনতে এবং কবিতা পাঠ শুনতে গিয়েছিলাম। সেদিনকার অনুষ্ঠানে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রধান অতিথি ছিলেন। প্রভাবতী দেবীর কিছু লেখা আমি ভারতবর্ষ পত্রিকায় পড়েছিলাম। সুতরাং তাকে দেখতে পেয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছিলাম। নবযৌবনের চাঞ্চল্য আমাকে বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বাধ্য করেছে ঠিক, কিন্তু আমার মূললক্ষ্য ছিল সাহিত্য, এবং সাহিত্যকেন্দ্রিক আনন্দ।

নতুন যৌবনকেও আমি সাহিত্যের তাৎপর্যের মধ্যে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছিলাম। এ সময় একটা উপন্যাস আমি পড়েছিলাম 'জীবনায়ণ' নামে। বোধহয় উপন্যাসটি তখন প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। জীবনায়ণ উপন্যাসে একটি বালকের ক্রমশ বড় হওয়ার কথা আছে। সে কাব্যের মধ্য দিয়ে নিজের যৌবনের চিন্তাকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলো। উপন্যাসের নায়কের নাম অরুণ। সে তার কলেজ জীবনের প্রথম দিনটিকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করবার ইচ্ছায় নবোদিত সূর্যকে প্রণাম করেছিলো। সেদিন ছিলো বর্ষার প্রভাত। সারারাত বৃষ্টি হয়ে চারদিক সজল স্নিগ্ধ মনে হচ্ছিলো। তালপুকুরের ওপারে নারকেল শাখার আড়ালে সূর্যোদয় হয়েছিলো। যেন নিকষ মনির পেয়ালা থেকে গলিত স্বর্ণস্রোত চারদিকে উপচিয়ে পড়ছিলো। অরুণ সূর্যের এই দীপ্তি দেখে গভীর আনন্দ অনুভব করেছিলো। আমিও সাহিত্যের মধ্যে তখন যৌবনের স্বাদ ও আনন্দকে গ্রহণ করেছিলাম।

www.pathagar.com

॥৭॥

কোলকাতায় কাক দেখে অবাক হয়েছি। যন্ত্রের বিন্যাসে যানবাহনের সচলতায় যেখানে পথগুলো সতত অধীর সেখানে কাকের আনাগোনা দেখে আমার অবাক লেগেছিলো। কাক শুধু জটলা করে থাকতো না, কখনো ওপর থেকে ডুব দিয়ে মাটি ছুঁয়ে আবার উড়ে যেতো। দুপুরের রৌদ্রে কাকের কালো পাখা চিকমিক করে উঠতো। কাকের এই কালো পাখা আমার দৃষ্টিতে গ্রথিত হয়েছিলো। অনেক পরে আমার কবিতায় আমি কাকের উপমা এনেছি বারবার। উপমার মধ্যে কাকের পাখাকে কৃষ্ণ আবরণের সঙ্গে তুলনা করেছি, রাত্রির আগমনের সঙ্গে তুলনা করেছি। আবার বৃষ্টির ছায়াছন্নতার সঙ্গে তুলনা করেছি। আবার কখনো কাক প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় এসে উপস্থিত হয়েছে। কবিতা মানুষের জীবনে যে কখন আসে এবং কোন অনুষঙ্গে আসে তা বলা কঠিন। জীবনে কোন এক মুহূর্তে হয়তো কোন ঘটনা বা দৃশ্য কারো মনে হয়তো চমক জাগায় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো তা কবিতায় রূপ পায় না। বহু বছর পরে হয়তো হঠাৎ পুরনো চিত্রগুলো চোখে ভেসে ওঠে এবং নতুন তাৎপর্যে প্রকাশিত হয়।

কোলকাতায় কোলাহলকে পেয়েছিলাম। কোলকাতার তুলনায় তখনকার ঢাকা ছিলো নির্জন দ্বীপের মতো। ঢাকায় মোটরগাড়িই ছিল মাত্র কয়েকটি। যে গুলোর চলার শব্দ সব রাস্তায় পাওয়া যেত না। কিন্তু কোলকাতায় মানুষের শব্দ, যানবাহনের শব্দ, কখনো পাখির শব্দ সবকিছু মিলে প্রহরকে উন্মাদ করে রাখতো। শেয়ালদহ স্টেশনে যখন নেমেছিলাম তখন বিচিত্র কলকণ্ঠ শুনেছিলাম। ট্রেন থেকে যারা নামছে তাদের কথাবার্তা বা খাদ্য বিক্রেতাদের চিৎকার, ভিখারীর আর্তরোল এবং ইঞ্জিনের শব্দ সবকিছু মিলে বিপুল শব্দরাজ্যে আমি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলাম। বিপুল শব্দের মধ্যে মানুষ কিন্তু সত্য নিঃসঙ্গ হয়। কোনো শব্দই যেখানে শোনা যায় না, সেখানে শব্দার্থের দায়ভাগ থাকে না। যখন আমি অজস্র শব্দের কলগুঞ্জনের মধ্যে কোনো শব্দই শুনি নি, তখন আমি নিজের মধ্যেই নিজেকে একা পেয়েছিলাম। সমস্ত শব্দকে বন্ধ করে দিয়ে নির্জনতা সৃষ্টি করা যায় না। কেননা তখন নানাবিধ চিন্তা চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে। কিন্তু যখন চতুর্দিকেই শব্দ তখন আমি একাগ্র হতে পারি। পরবর্তী জীবনে কোলাহলের মধ্যে নিঃসঙ্গ হওয়ার স্বভাবকে আমি আয়ত্ত করতে পেরেছি। প্রচন্ড কোলাহলের মধ্যেই আমি আমার চিন্তাকে সুস্পষ্ট করে গড়ে তুলতে পারি। এটা কি করে সম্ভবপর হয় জানি না কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এটা হয়েছে। বৌদ্ধরা নির্জনতা কামনা করে। তাদের মঠের অভ্যন্তরভাগ চতুর্দিকের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে নির্মাণ করা হবে। ক্ষুদ্র একটি দরোজা দিয়ে তারা তাদের কক্ষে প্রবেশ করে, যে কক্ষে আলো-বাতাস প্রবেশ করার কোনো সুযোগই যেন নেই। এভাবে নির্জনতার একটি নিবিড় নিস্তব্ধতা নির্মাণ করে ভিক্ষুগণ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে চান। এ রকম নির্জনতায় আমি ভয় পাই। আমার তখন মনে হয় নির্জনতা আমার কণ্ঠরোধ করবে। আমার কাছে মসজিদের গঠনপ্রণালী সে জন্য ভালো লাগে। মসজিদ প্রধানত উন্মুক্ত। দিনের বেলা দিনের প্রভূত আলো মসজিদকে উদ্ভাসিত করে। সমস্ত পৃথিবীর শব্দালংকারগুলো মসজিদে অনুরণিত হয়। মসজিদের অভ্যন্তরস্থ মানুষ এবং বাইরের

www.pathagar.com

মানুষ কেমন যেন এক প্রাণদসূত্রে গ্রথিত। ইসলামের জীবনদর্শন হচ্ছে একাগ্র হওয়া এবং বিপুল বিশ্বের কার্যক্রমের মধ্যেই একাগ্র হওয়া। কোলকাতায় সর্বত্রই কোলাহল। এই কোলাহল আমাকে বিক্ষিপ্ত করে নি বরঞ্চ আমার কাছে নতুন তাৎপর্যে প্রকাশিত হয়েছে। আমার তখন মনে হয়েছে চতুর্দিকের শব্দগুলো আমাকে ভাববার সুযোগ দিচ্ছে। কোলকাতার মানুষকেও দেখেছি নিশ্চিন্ততায় পথ চলতে। সেখানকার কর্মব্যস্ত মানুষের নিশ্চিন্ত পথযাত্রা আমার ভালো লেগেছিলো। ব্যস্ততার একটা ছন্দ আছে, সেই ছন্দে সমগ্র কোলকাতা আন্দোলিত। কোলকাতায় নাখোদা মসজিদ দেখতে গিয়েছিলাম। মসজিদের বাইরে প্রচন্ড ভিড়। মসজিদের নিচে এবং আশেপাশে শুধুই দোকান। ক্রেতা-বিক্রেতাদের কোলাহলে স্থানটি মুখরিত। বাইরের এই কোলাহল মসজিদের ভেতরের নামাজীদের বিব্রত করে না।

নাখোদা মসজিদের যিনি ইমাম ছিলেন তিনি একসময় আমার ভগ্নীপতির শিক্ষক ছিলেন। আমরা আছরের নামাজের পর মসজিদসংলগ্ন একটি কক্ষে গিয়ে বসলাম। সেখানে শুধু আমরাই নয়, আরো কয়েকজন লোক ছিলো যারা উর্দুভাষী। এমন সময় সেখানে জরিপাড় ধুতি পরা মাথায় পাগড়ী এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের আগমন ঘটলো। মুফতি সাহেব হাসিমুখে তাকে সংবর্ধনা জানালেন। মাড়োয়ারী হাতজোড় করে তার ব্যবসা সমৃদ্ধির জন্য দোয়া চাইলো। সে বললো যে সে কালী বাড়িতে প্রসাদ দিয়েছে, মওলা আলীতে শিরনী দিয়েছে এবং মুফতি সাহেবের কাছে দোয়ার জন্য এসেছে। এই ঘটনাটা আমার মনে থাকার কারণ এই যে যখন আমাদের সমাজে হিন্দু এবং মুসলমান বিচ্ছিন্নভাবে পুরোপুরি চিহ্নিত ছিল সে সময় একটি মসজিদের কক্ষে একজন হিন্দুকেও আপ্যায়ন করা সহজ ছিল।

বর্তমানে ধর্মের প্রশ্রয় থেকে যারা মুক্তি যাচনা করে, তারা কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের এই সম্প্রীতি নির্মাণ করে না, সে সময় প্রত্যেকেই নিজস্ব ধর্মের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে একটি উদার ধর্মীয় আবহে একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হত। এখন আর এটা হয় না।

কোলকাতায় গড়ের মাঠ আমার খুব ভালো লেগেছিলো। বিপুল জনারণ্যের মধ্যে একটি উন্মুক্ত অঞ্চল মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসকে সহজ করতো। গড়ের মাঠে বিচিত্র প্রকৃতির মানুষের সমাবেশ লক্ষ্য করেছি। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে রমণীদের গতিবিধি ভেসে উঠেছে বেশি। কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি ভ্রমণবিলাসী রমণীদলকে একাকী দাঁড়িয়ে থাকা সালংকরা কোনো রমণীকে। আবার কোথাও নিম্নশ্রেণীর যুবতীরা দু'তিনজন মিলে দাঁড়িয়ে আছে দেখেছি। এদের প্রয়োজন কি তা অনুধাবন করা অসুবিধা ছিলো না। আমাদের কিন্তু শুধুই কৌতূহল ছিল এদের শরীরী গতিবিধি লক্ষ্য করার। গড়ের মাঠে শব্দ শোনা যেত অনেক, বিভিন্ন শব্দ লঘুপ্রবাহে বাতাসে ভেসে যেত। এখানে স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ আমি লক্ষ্য করেছি।

কোলকাতা থেকে একটু দূরে শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনেও বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে শুধু গাছের সমারোহ। ছায়া এবং সবুজে আকীর্ণ বিরাট একটি অঞ্চল সৌন্দর্যের দেহলী নির্মাণ করেছে। এখানে বাতাসের শব্দ গাছের ডালে পাখির শব্দ, কখনো হঠাৎ দল বেঁধে পিকপিক করতে আসা মানুষের হাস্যকৌতুক সময়কে সচকিত করেছে।

www.pathagar.com

ঢাকা থেকে কোলকাতা একটি বিরাট পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের মধ্যে আমি কোলকাতাকে ভালোবাসতে শিখেছিলাম। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম শেষ করে কোলকাতাকেই একদিন আমার কর্মক্ষেত্র করেছিলাম। সে অন্য ইতিহাস। মনে আছে, কোলকাতা থেকে আমি যখন ঢাকায় বদলি হয়ে আসি, তখন আমি খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম তা বোধহয় সহজেই বলা যায়। যখন কোলকাতায় যাই নি তখন বিভিন্ন লোকের মুখে কোলকাতার বিবরণ শুনে সম্মোহিত হয়েছিলাম এবং যখন কোলকাতায় প্রথম গেলাম তখন বিপুল এবং বৈচিত্র্যের কল্লোল আমাকে আকৃষ্ট করলো। কোলকাতায় নিজেকে যেমন হারিয়ে ফেলা যায় তেমনি জনারণ্যের মধ্যে নিজেকে আবার একাকী আবিষ্কার করা যায়। সুন্দর অসুন্দর সবকিছুরই বর্ণাঢ্যতা কোলকাতায় দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন একটা লেখায় বলেছেন জনারণ্যের মধ্যে আমরা মিলিত হই না একত্রিত হই মাত্র। একত্রিত হওয়া মানে প্রত্যেকেই নিজস্ব সত্তা বজায় রেখে একটি গতি এবং কর্মের বৃত্তের মাধ্যমে একত্রিত হচ্ছে। কোলকাতা শহরে যারা বসবাস করে, তারা জনারণ্যের মধ্যে একাকী বাস করে। অনেক পরে একটি কবিতায় আমি লিখেছিলাম, 'আমি বিপুল জনারণ্যের মধ্যে একাকী।' আমার মনে হয় কোলকাতা আমাকে শিখিয়েছিলো যে বিচিত্র কল্লোলের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায়। সম্মিলিত শব্দের সাড়ায় কোনো শব্দই যখন সুস্পষ্ট নয় সেখানে হৃদয়ের শব্দ হৃদয়ের নিভৃতে সচকিত থাকে। আমি এভাবেই কোলাহলের মধ্যে হৃদয়ের নিভৃতলোক সুচিহ্নিত করতে পেরেছিলাম।

॥৮॥

ঢাকা কলেজে বাংলা পড়াতেন কাজী আবদুল ওদুদ। রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' আমাদের পাঠ্য ছিল। ওদুদ সাহেব সাদা শেরোয়ানী সাদা পায়জামা পরে ক্লাসে ঢুকেই অন্যদের মতো রোলকল করতেন না। রোলকল করতেন ক্লাসের শেষে। তার পড়াবার ধরনটা ছিল একটু নতুন রকমের। রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা পড়াবেন সেটা নিজেই আবৃত্তি করতেন। আবৃত্তি শেষ হলে টেবিলের উপর বই উপুড় করে রেখে হাসি মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলতেন রবীন্দ্রনাথের কবিতার কি ব্যাখ্যা হয়? মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হয়। হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি না করলে এ কবি তার অর্থ খুঁজে পাবে না। কবিতায় শব্দের মধ্যে তাৎপর্য যেভাবে সঞ্চারিত রয়েছে তা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে অনুভব করতে হবে। অবশ্য এরপর তিনি কবিতা ব্যাখ্যা করতেন। আমরা ওদুদ সাহেবের এই ভঙ্গিটা পছন্দ করতাম।

কাজী আবদুল ওদুদকে আমি জানতাম আমার স্কুল জীবন থেকে। আমি যখন আরমানীটোলা সরকারী স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন বার্ষিক মিলাদে ওদুদ সাহেব প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন। আমি ছাত্রদের মধ্য থেকে রসূলের জীবন নিয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম। সে বয়সে যতটুকু জ্ঞানের অধিকার আমার ছিলো এবং পিতামাতার কাছ থেকে যা শিখেছিলাম তার ওপর নির্ভর করে আমি রসূলকে মানবতাবাদী পুরুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলাম। মিলাদ শেষে বয়সের ব্যবধান অগ্রাহ্য করে ওদুদ সাহেব আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমাদের রসূল সর্বতোভাবে মানুষ ছিলেন,

www.pathagar.com

তিনি দেবতা ছিলেন না, দেবোপমও ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রেমে, বিশ্বাসে সততায় এবং আন্তরিকতায় একজন সর্বকালের কল্যাণব্রতী মানুষ। তাঁকে মানুষ হিসাবেই জানতে হবে।' আমার শৈশবের এ স্মৃতিটা এখনও সুস্পষ্ট আছে। স্কুল জীবনের পর ঢাকা কলেজে তাঁকে শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলাম। সে সময় তাঁর অত্যন্ত নিকটে আসতে পেরেছিলাম। যতদিন আমি তাঁকে দেখেছি আমি অনুভব করেছি যে তিনি সর্বক্ষণ মুসলমানদের কথাই ভাবেন। তিনি ভাবেন যে তাঁর গোত্রভুক্ত মানুষ যারা তারা যথার্থভাবে মানুষ হোক এবং রসূলের আদর্শ অনুসরণ করে আপন জীবনকে মহিমান্বিত করুক। তিনি 'নবপর্যায়' বলে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যে গ্রন্থের মধ্যে মুসলমানদের অধঃপতনের কথা এবং তাদের ধর্মবিশ্বাসে বিকৃতির অনুপ্রবেশের কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে। এ গ্রন্থের একটি বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। মওলানা আকরম খাঁর বক্তব্য ছিলো যে কাজী আবদুল ওদুদ আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছেন এবং একটি বিশ্বাসের স্থিতির মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছেন। ওদুদ সাহেব এ আক্রমণে ব্যথিত হয়েছিলেন এবং সবিনয়ে প্রতিবাদও করেছিলেন। প্রতিবাদে মওলানা আকরম খাঁকে 'আপনি বর্ষীয়ান এবং আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়' একথা বলে সম্বোধন করেছিলেন। আমি এ বাদানুবাদের কথা পুরনো পত্রিকার পাতায় পড়ে ওদুদ সাহেবকে এ সম্পর্কে কিছু বলতে বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, মওলানা আকরম খাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এক রকম আমার দৃষ্টিভঙ্গি অন্য রকম। আমি প্রচলিত প্রথার ওপর নির্ভর করি না। আমি যথার্থ সত্যকে আবিষ্কার করতে চাই। মওলানা আকরম খাঁ প্রচলিত প্রথাকেই সত্যের সমুচ্চয় বলে বিবেচনা করেন। এ দু ধারণার মধ্যে কোনোক্রমেই মিল হতে পারে না।

ঢাকা শহরে অবস্থানকালে ১৯১৯ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে আমি ওদুদ সাহেবকে ঢাকা শহরের একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে দেখেছি। সে সময় নাগরিক বৃত্তের মধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠাও যেমন ছিল, সমালোচনাও তেমন ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর কার্যপদ্ধতি অথবা বিশ্বাসের জন্য কখনও আক্রান্ত হন নি। তার অনুসারী বলে নিজেদের যারা প্রবলভাবে প্রচারিত করতো তাদের বিচারের বিরুদ্ধে ঢাকায় একবার কিছুটা হট্টগোল হয়েছিল। শিখা পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র অবিবেচনাপ্রসূত কয়েকটি মন্তব্য করেছিলো যার জন্য ঢাকার পঞ্চায়েতে একটা বিচার সভা বসে। শিখার মন্তব্যটি ছিল অনেকটা এ রকম যে নবীরা ভুল করেছেন ধর্ম সৃষ্টি করে। এক হাজার বছর আগে খর্জূরবৃক্ষের ছায়ায় বসে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছিল আজকের আধুনিক সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা কোথায় তার বিচার করে দেখতে হবে। উক্তিটা সম্ভবত আরও কঠোর ছিল আমি এখানে একটু লঘু করে বললাম। আমার ধারণা, ধারণা কেন বলছি, আমার এটা দৃঢ় বিশ্বাস কাজী আবদুল ওদুদ অত্যন্ত বিশ্বাসী পুরুষ ছিলেন এবং ইসলামকে তিনি তাঁর যথাযথ পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্ররূপে প্রকাশিত দেখতে চেয়েছিলেন। বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল তার তথাকথিত কয়েকজন অনুসারী। যাদের না ছিল জ্ঞানের গভীরতা, না ছিল ইসলাম সম্বন্ধে কোনো বোধ। রবীন্দ্রনাথ যাকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন 'গুরু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ'। এ ছিল অনেকটা সে রকম। কাজী আবদুল ওদুদ শেষ জীবনে কোরান শরীফের বাংলা তরজমা করেছিলেন এবং রসূলের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা

www.pathagar.com

করেছিলেন। তিনি আমাদের বলতেন যে তিনি দুটি কাজ সম্পন্ন করলেই তার জীবনের কর্তব্য শেষ হবে। এ দুটি কাজের একটি হচ্ছে রসূলের জীবনী ও অন্যটি হচ্ছে কোরান শরীফের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। আজীবন তিনি মুসলমানদের কথা ভেবেছেন এবং মুসলমানদের জীবনের উৎসমূলকে নির্ণয় করতে গিয়ে কোরান শরীফের অনুবাদ তাঁকে করতে হয়েছিল।

ওদুদ সাহেব ক্লাসে আমাদের যখন পড়াতেন তখন পরীক্ষার জন্য আমাদের প্রস্তুত করতেন না কিন্তু কবিতা বুঝবার একটি মানসিকতা তৈরি করে দিতেন। কখনো কখনো অন্য ভাষায় এবং ভিন্নতর সামাজিক ব্যঞ্জনার কবিদের কথাও বলতেন। ইকবালের কথা প্রায়ই বলতেন। মনে আছে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' পড়াতে ইকবালের গতিবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গতিবাদের তুলনা করেছিলেন। ইকবালের একটি চরণ প্রায়শঃ উচ্চারণ করতেন–আয় রাহরওয়ে ফরয়ানা রাস্তে মে তেরে গুলশান হ্যায় তো শবনম হো। সহরা হায়তো তুফান হো। অর্থাৎ হে পথচারী পথিক, তোমার পথে নিকুঞ্জ পড়লে বসন্ত-মলয় হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা কর। মরুভূমি পড়লে ঝন্‌ঝায় রূপান্তরিত হও। কখনো কখনো নজরুলকৃত হাফিজের কবিতার অনুবাদের একটি-দুটি চরণ বলতেন, যেমন অন্ধকার রাত উর্মিসংঘাত ঘূর্ণাবর্তও তুমুল গর্জে।

কলেজে থাকাকালীন আমি কলেজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকের পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলাম। ওদুদ সাহেব এটা ঠিক পছন্দ করেন নি, কিন্তু বাধাও দেন নি। আমি মাঝখানে একদিন শুনলাম কলেজ হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট ওয়ালীউল্লাহ সাহেব হোস্টেলের ছেলেদের প্ররোচিত করছেন যাতে তারা আমাকে ভোট না দেয় এবং আমার প্রতিপক্ষকে ভোট দেয়। আমার প্রতিপক্ষ ছিল ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের স্বগ্রামবাসী। আমি এ সংবাদ শুনে খুব ক্ষুব্ধ হলাম এবং ওদুদ সাহেবের কাছে গিয়ে প্রতিবিধান চাইলাম। তিনি বললেন, তুমি সরাসরি ওয়ালীউল্লাহ সাহেবকে জিজ্ঞেস করো কি ঘটেছে। আমার মনে হয় এভাবে মুখোমুখি কথাটা তুললে একটি প্রতিবিধান পাবে। আমি হোস্টেলে নাজমূল করিমকে সঙ্গে নিয়ে ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমাদের অভিযোগ শুনে তিনি কিছুক্ষণ উত্তেজনা প্রকাশ করলেন। পরে নানাবিধ ব্যাখ্যা দিয়ে বিষয়টি উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। ইলেকশনে জেতার পর আমি ওদুদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন, তুমি আবার ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা করো এবং আগের ভুল বোঝাবুঝির জন্য দুঃখ প্রকাশ করো। ওদুদ সাহেবের এই বিবেচনাটি আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। তিনি কখনো কোনো বিরোধ বাঁচিয়ে রাখতে চাইতেন না, একটি স্বস্তিতে সব সংঘর্ষের নিবৃত্তি ঘটুক এটাই চাইতেন।

আমি যখন কলেজে পড়ি তখন ওদুদ সাহেব পুরানা পল্টনে বাড়ি করেছিলেন, সেখানেই থাকতেন। অবসর সময়ে অথবা ছুটির দিনে প্রায়ই তাঁর ওখানে যেতাম নানা বিষয়ে তাঁর কথা শুনবার জন্য। ওদুদ সাহেব ধর্মের কথা বলতেন, সামাজিক জীবন যাপনের কথা বলতেন। আবার কখনো কখনো বাঙ্গালীর নিজস্ব সত্তা সম্পর্কে বক্তব্য রাখতেন। ওদুদ সাহেব বলতেন, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালীর একটা নিজস্ব অস্তিত্ব আছে। সে স্বতন্ত্র এবং স্বকীয়। সে হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়, সে বাঙ্গালী। বিভিন্ন ধর্মীয় পর্বে যে

www.pathagar.com

পার্থক্যগুলো দেখা যায় সে পার্থক্যগুলো বৈচিত্র্যের ইঙ্গিত দেয়, বিরোধের আভাস আনে না। মুসলমানদের মহররম, ঈদ এবং শবেবরাত–এই তিনটি তিন ধরনের উৎসব অথচ উৎসব ব্যসনের বৈচিত্র্যে এগুলো আমাদের আনন্দ দেয়। তেমনি হিন্দুদের উৎসব এবং মুসলমানদের উৎসব স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য রেখে একে অন্যের সঙ্গে আনন্দের উপলক্ষে মিলিত হচ্ছে। মোহিতলাল মজুমদার সম্পর্কে বলতেন, সনাতনীরা নিজেদের মন্ডপ ছেড়ে বাইরে যেতে পারে না। তারা তাদের অনুদার সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যে চিরকাল আবর্তিত হতে থাকে। ওদুদ সাহেব তাঁর সমগ্র রচনা একত্রিত করে নাম দিয়েছিলেন শাশ্বতবঙ্গ অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে শাশ্বত নয় কিন্তু ভাষা এবং মানসিকতায় একটি শাশ্বত স্বভাবের। চিরকাল এ বিশ্বাসকে তিনি আঁকড়ে রেখেছিলেন। দেশ বিভাগ হলো যখন, তখন ভয়ংকর বিচলিত হয়েছিলেন। কলকাতা থেকে একটি পত্রে আমাকে লিখেছিলেন ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানদের সঙ্গে বাঙ্গালী মুসলমানের মিল কোথায়? আমি তো প্রচন্ড ব্যবধান দেখি। কেউ কারো সম্পূরক নয়, কেউ কারো কাছে স্বাগতিক নয়।

কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন আনন্দিত চৈতন্যের লোক। তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হয়েও সে তত্ত্বকে আনন্দের উপলব্ধি হিসাবে প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি ধর্মের মানবীয় দিক উদঘাটন করার চেষ্টা করতেন। একটি হাদিসের কথা প্রায়ই তিনি আমাদের বলতেন। আরব দেশে তখন ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার রীতি প্রচলিত হয়। সে সময় একজন ব্যভিচারিণী রমণী রসূলের কাছে এসে বলে, হে রসূলে খোদা, আমি মহাপাপ করেছি আমি ব্যভিচারিণী, আমাকে শাস্তি দিন। রসূল এ কথা শুনে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দিলেন। মেয়েটি সেদিকেও গিয়ে একই কথা রসূলের কাছে নিবেদন করলো, রসূল তখন বললেন, 'তোমার সন্তানের জন্ম পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করো, তারপর এসো, মেয়েটি বৎসরান্তে নবজাত সন্তান নিয়ে রসূলের কাছে এলো এবং আবার সে শাস্তি কামনা করলো। রসূল আবার তাকে বললেন, 'তুমি ফিরে যাও। তোমার সন্তান যখন দুগ্ধপান ছেড়ে দেবে তখন এসো'। মেয়েটি কয়েক বছর পর আবার এলো। তখন রসূল প্রস্তর নিক্ষেপের সাহায্যে তাকে হত্যা করতে নির্দেশ দিলেন। মৃত্যুর পর তার জানাজা নামাজ পড়তে তিনি এগিয়ে গেলেন। একজন সাহাবী তখন বললো 'হে রাসূল, এ পাপীর জানাজায় আপনি কি করে অংশ নেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'এর মতো চরমতম শুদ্ধি কারো ঘটেনি, এর মতো তওবা কেউ করে নি।' হাদিসের এ উপাখ্যান বলে ওদুদ সাহেব মন্তব্য করতেন, 'মানবতাই হচ্ছে সকল কিছুর উর্ধ্বে। আমাদের রসূল ছিলেন এ মানবতার বিশুদ্ধতম প্রতিনিধি।'

॥৯॥

চতুর্দিকে যখন অন্ধকার তখন পায়ের কাছে কি ফুল ফুটে রয়েছে তা শুধু গন্ধ দিয়েই অনুভব করা যায়। চোখে কিছুই পড়ে না। কিন্তু সুগন্ধ একটি স্বভাব এবং জাতির বার্তাবহ হয়। এ ভাবে কিছু না দেখা গেলেও অনুভব করেই আমরা সত্যকে পাই। কোন ফুল আমার পায়ের কাছে ফুটেছে এদিক ওদিক ঝোপে কি সমস্ত ফুল ফুটে রয়েছে সেগুলো ফুলের গন্ধের সাহায্যেই আমরা অনুভব করি। দেখার চাইতে অনুভবের সাহায্যে একটি বস্তুকে জানা অনেক বেশি গভীর এবং তাৎপর্যবহ।

www.pathagar.com

আমাদের ইংরেজী সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন পরিমলকুমার ঘোষ। তিনি কবিতা লিখতেন এবং ইংরেজী কবিতা মাধুর্যমণ্ডিত করে ব্যাখ্যা করতেন। কবি কীটস এর 'নাইটেঙ্গেল পাখির প্রতি' কবিতাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি অনুভূতির কথা বলেছিলেন এবং সুগন্ধের সাহায্যে পুষ্পের স্বরূপকে অনুভব করার কথা বলেছেন। তিনি মেলীর ওড টু দি ওয়েস্ট উইন্ড কবিতাটিও সুন্দর করে ব্যাখ্যা করতেন। তিনি কবিতাটি প্রথমে পাঠ করতেন পরে কবিতাটির মূলবক্তব্য নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে শব্দের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও মন্তব্য রাখতেন। তিনি প্রথম আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে বিশেষণের উদঘাটন করা যায়। কীটস স্পর্শের উষ্ণতা এবং শীতলতা বিশেষণের সাহায্যে উপস্থাপিত করেছেন। তার এই বিশেষণগুলো অপূর্ব ব্যাখ্যাবহ। যেমন সে তার শরীর থেকে একে একে উষ্ণ অলংকারগুলি খুলে রাখলো এখানে উষ্ণ শব্দটি অসাধারণ অভিব্যক্তিপূর্ণ। পরিমলকুমার ঘোষ একটি কবিতার সূত্রে অন্য কবিতা টেনে আনতেন এবং এক কবির সূত্রে অন্য কবিকে।

পরিমলকুমার ঘোষ হিন্দু সমাজে অনেকটা সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন। কেননা সামাজিকভাবে তিনি মুসলমান সমাজভুক্ত ব্যক্তিদেরকে প্রশ্রয় দিতেন। তার গৃহে মুসলমান ছাত্রদের নিয়মিত গমনাগমন ছিল। তিনি দরিদ্র মুসলমান ছাত্রদেরকে সম্ভব হলে সাহায্য করতেন। বছরে দুটি মুসলমান ছেলেকে ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে বৃত্তি দিতেন। হিন্দুদের অভিযোগের উত্তরে তিনি বলতেন, হিন্দুদের মধ্যে বিত্তশালী অনেক আছে সুতরাং তাদের সাহায্যের অভাব নেই। কিন্তু মুসলমান ছাত্রদের সাহায্য করবার কেউ নেই। তাই আমি মুসলমান ছেলেদের সাহায্য করে থাকি। তা ছাড়া মুসলমান ছেলেরা বিনয়ী ও ভদ্র। ওদের পারিবারিক শিক্ষা ওদেরকে গুরুর প্রতি ভক্তি করতে শিখিয়েছে।' আমি তাঁর বাসায় অনেকবার গিয়েছি। তিনি থাকতেন পুরানা পল্টনে একটি দোতলা বাড়িতে। তাঁর একমাত্র কন্যা মঞ্জু তখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তো। পরিমল বাবুর বাড়িতে তার স্ত্রীর তিনটি বোন অবস্থান করতো এবং পড়াশোনা করতো। এই কারণে হিন্দু ছেলেরা পরিমল বাবুকে 'শালীবাহন' বলতো। অর্থাৎ তিনি তাঁর শ্যালিকাদের বহন করে বেড়ান। এদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠার নাম ছিল সুজাতা। সে আমার সমশ্রেণীর ছাত্রী ছিল। আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র আর সে ছিল ইডেন কলেজের ছাত্রী। পরিমল বাবুর বাসগৃহটা ছিল দোতলা। উপর তলাতেই তিনি থাকতেন। নিচের তলায় সিঁড়ির কাছে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সুজাতা গানের মাস্টারের কাছে গান শিখতো। রোববার ছুটির দিনে যখনই পরিমল বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি তখনই সুজাতাকে তার হাতের মাস্টারের কাছে হার্মোনিয়াম বাজিয়ে গান শিখতে দেখেছি। সুজাতার গলাটি খুব সুরেলা ছিল। শারীরিক গঠনের দিক থেকে সে খুব আকর্ষণীয়া ছিল না। বাঁ পায়ে সে একটু খোঁড়াও ছিল। চেহারা শ্যামলা। কিন্তু মাথায় চুল ছিল প্রচুর, একেবারে হাঁটু পর্যন্ত চুলের গোছা নামতো। প্রথম যেদিন তাকে দেখলাম সেদিন পেছনের দিক থেকে শুধু কালো চুলের রাশিই আমি দেখেছিলাম। পরে কলেজ ছেড়ে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাম তখন সুজাতা আমার সহপাঠিনী হয়েছিল। তখন তাকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ আমার হয়েছিল। এ কলেজের দু জন শিক্ষকই আমার জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। একজন কাজী আবদুল ওদুদ এবং

www.pathagar.com

অন্যজন পরিমলকুমার ঘোষ। আর একজন শিক্ষকের কথাও মনে পড়ে। তিনি ছিলেন ভূগোল শিক্ষক। বিজয়শংকর সেনগুপ্ত। তাঁর ছেলে কিরণশংকর সেনগুপ্ত বর্তমানে বাংলা ভাষার একজন উল্লেখযোগ্য কবি। বিজয় বাবু জ্যোতির্বিদ্যা বা এস্ট্রোনমি পড়াতেন। কলেজের দোতলার পশ্চিম প্রান্তে কয়েকটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে ভূগোল বিভাগ ছিল। এখানকার একটি ঘরে টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ সাজানো ছিল। আমরা এই দূরবীক্ষণের সাহায্যে আকাশের তারা দেখেছি। বিশেষ করে শনিগ্রহ দেখার কথা আজো আমার মনে আছে। শনিগ্রহের চতুর্দিকে নীল কুয়াশার একটি বৃত্ত ছিল। শনিগ্রহ আমার কাছে অলৌকিক বলে মনে হতো। বিজয় বাবু ঘরের বাইরে গেলেই মাঝে মাঝে আমরা টেলিস্কোপ ঘুরিয়ে বহু দূরের কোনো বাড়ির ভেতরের মানুষের চলাফেরা দেখবার চেষ্টা করতাম। সে অবস্থায় তিনি আমাদের দেখলে হায় হায় করে উঠতেন নষ্ট হল বলে। আবার টেলিস্কোপটি ঠিকমতো সাজিয়ে রাখতেন। বিজয় বাবুর কাছে আমরা আবার হাতেকলমে থার্মোমিটার তৈরি করা শিখতাম। কাঁচের পাত্রে তরল পারদ আমাদের সামনে রাখলেই আমরা তার মধ্যে তামার পয়সা ফেলে দিতাম। তামার পয়সাগুলো পারদের মধ্যে পড়ে রুপোর পয়সার মতো হয়ে যেত। এটা ছিল আমাদের একটি খেলা। এভাবে হৈ চৈ করে বহু পারদ আমরা নষ্ট করেছি। বিজয় বাবুর বয়স হয়েছিল। তিনি আমাদের কাণ্ডকারখানা কৌতুকের চোখে দেখতেন কখনো শাসন করতেন না। ইংরেজীর একজন শিক্ষক ছিলেন, তিনিও বিজয় বাবু। তাঁর নাম ছিল বিজয়রঞ্জন দাশগুপ্ত। তাঁর বাড়ি ছিল যশোর। সেই সুবাদে তিনি আমাদের বাসায় আসতেন এবং ছুটির দিন বাবার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতেন। শুনেছিলাম তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ছিলেন। তাঁর সহপাঠী ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। ছাত্র হিসাবে ভালো হলে কি হবে বিজয় বাবুর ইংরেজী উচ্চারণটি মোটেই ভালো ছিল না। আমার কাছে তাঁর উচ্চারণ হাস্যকর মনে হত। আমি ভাবতাম, ঠিকমতো উচ্চারণ না করতে পারলে ইংরেজী ভাষার অর্থই সুস্পষ্ট হয় না। ইংরেজী উচ্চারণ বিষয়ে আমার নিজের একটি গর্ব ছিল। আমি আরমানিটোলা স্কুলের ছাত্র হিসাবে ডক্টর ওয়েস্ট-এর কাছে ইংরেজী উচ্চারণ শিখছি। কলেজেও অল্পদিনের মধ্যে ইংরেজী ডিবেট এবং বক্তৃতায় সুনাম অর্জন করেছিলাম। এসব কারণে কারো ইংরেজী ভুল উচ্চারণ কানে খুব বাজতো। বিজয় বাবু অবশ্য বেশি দিন এই কলেজে ছিলেন না। তিনি বদলি হয়ে কৃষ্ণনগরে চলে যান। তখন জালালউদ্দীন আহমদ নামে এক ভদ্রলোক আমাদের শিক্ষক হয়ে আসেন। জালাল সাহেবের ইংরেজী উচ্চারণ ভালো ছিল। তিনি আবার কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। স্টিভেনসনের কি একটি উপন্যাস যেন আমাদের পাঠ্য ছিল। এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার গোপন সাক্ষাৎকার নিয়ে তিনি অনেক রসিকতা করতেন। আমাদের সঙ্গে খাজা খয়েরউদ্দীন পড়তো। খাজা খয়েরউদ্দীন বর্তমানে পাকিস্তানের একজন রাজনীতিবিদ। সে জালাল সাহেবের কৌতুক কথায় উচ্চৈঃস্বরে হাসতো। একদিন জালাল তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'আর ইউ ম্যারেড–তুমি কি বিবাহিত?' উত্তরে খয়েরউদ্দীন বলেছিল, 'নট একজাকটলী–না পুরোপুরি নয়।' এ কথায় ক্লাসশুদ্ধ আমরা সকলেই হেসে ফেটে পড়েছিলাম এবং জালাল সাহেব একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। খয়েরউদ্দীন মাঝে মধ্যে

www.pathagar.com

অশ্লীল উলঙ্গ ছবি এনে আমাদের দেখাতো। একদিন সে কবি বায়রনের লেখা বলে পরিচিত একটি দেহ-মিলনের ইংরেজী কবিতা আমাদের পড়িয়েছিল। ভয়ংকর কবিতা। সে যে কোত্থেকে এগুলো জোগাড় করতো জানি না। তার এই অশ্লীলতার ভাণ্ডার ছিল বিপুল। আমাদের সঙ্গে জামালউদ্দীন বলে একটি ছেলে পড়তো। তার সঙ্গে খয়েরউদ্দীনের জমতো ভালো। উভয়ই উর্দুভাষী ছিল। তারা সর্বক্ষণ ক্লাসে পাশাপাশি বসতো এবং ছুটির সময় একসঙ্গে বেরিয়ে যেত। আমাদের ভূগোল শিক্ষক বিজয়শংকর বাবু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অবসর গ্রহণ করলেন। তাঁর জায়গায় এলেন রশীদুল হাসান নামক একজন যুবক। রশীদুল হাসান আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং ভারতের মধ্য প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং স্কুলের মাঝখানে কলেজের অবস্থানটি খুব সংকীর্ণ। মাত্র দু বছর কাল কলেজে পড়েছি। হৈ চৈ করতে করতেই তো দু বছর কেটে গেল। যার ফলে কলেজের সময়কালটি সিঁড়ির একটি ধাপের মতো মনে হয়েছিল। স্কুল ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুকূলে একটিমাত্র ধাপ। সময়কাল সংকীর্ণ হলেও বিশ্ব ঘটনা প্রবাহে এ সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ সময়ই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘোষিত হয়। ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধের ঘটনাটি আমাদের মানসলোককে প্রচণ্ডভাবে আলোকিত করেছিল।

॥১০॥

মানুষ মানুষের মধ্যে থাকতে ভালোবাসে। সে সঙ্গীদের মধ্যে আশ্বস্ত থাকতে চায়। কেউ কেউ হয়তো এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে যারা একাকী থাকতে চায়, কিন্তু আমরা স্কুল এবং কলেজ জীবনে সকলের মধ্যে একটি কোলাহল-বিচিত্রিত সময়ে বাস করতে ভালোবাসতাম। আমরা মানুষ হিসাবে মানুষকে ভালোবাসি বলেই মানুষের সঙ্গ কামনা করি কিনা, সে দার্শনিক বিশ্লেষণ তখন আমাদের মধ্যে জাগে নি। কিন্তু কলেজে যাবার জন্য ব্যাকুল হতাম, বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে অস্থির লাগতো। তখন সংসার ধর্ম ছিল না, সুতরাং সংসারের কোনো কর্তব্য কর্মও আমাদের ছিল না। শুধু ছিল পাঠচর্চা আর অবসর সময়ে বন্ধুদের সঙ্গ। বড় হয়ে ভেবেছি, মানুষের প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে। কিন্তু ছাত্রজীবনে কর্তব্যের কথা ভাবি নি, সম্মিলিত জীবনের আনন্দের অর্ঘ্যের কথা ভেবেছি। এই সম্মিলিত জীবনের মধ্যে হিন্দু ছিল, মুসলমান ছিল। আমাদের দৃষ্টিতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোনো ব্যবধান ছিল না। কিন্তু তখন দেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এবং বিভিন্ন সামাজিকতায় হিন্দু-মুসলমানের ভেদ ক্রমান্বয়ে নির্ণীত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী একটি মহাযুদ্ধের ক্ষুব্ধতা আবার দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাম্প্রদায়িকতা আমার মনে হতাশা সৃষ্টি করত।

আমি 'প্রবাসী' পত্রিকার গ্রাহক ছিলাম। এই পত্রিকার বিভিন্ন গল্প, প্রবন্ধ এবং আলোচনা খুবই মনোজ্ঞ ছিল। কিন্তু পত্রিকাটির বিবিধ প্রসঙ্গ অত্যন্ত তীব্রভাবে মুসলিম বিরোধিতায় পরিপূর্ণ ছিল। বিবিধ প্রসঙ্গে হিন্দু মহাসভার সমর্থন এবং প্রচারণা প্রবলভাবে করা হত। একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু যার নাম ছিল ভিক্ষু উত্তম তাকে হিন্দু মহাসভার সভাপতি

www.pathagar.com

করা হয়েছিল। সেই সূত্রে প্রবাসী স্বস্তিবচন উচ্চারণ করেছিল। প্রবাসী বলেছিল, ভারতবর্ষের বৌদ্ধ জৈন এবং হিন্দু সকলেই হিন্দু এবং সেই অর্থে ভারতবর্ষের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকার পাবার যোগ্য। আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবাসী রামকৃষ্ণ পরমহংসের একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করেছিল। রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'এদেশের মানুষ দুর্গাপূজা করবে, মন্দিরে যাবে, পাঁঠা বলি দেবে, এটাই তো স্বাভাবিক। যাদের এগুলো পছন্দ হবে না তারা এদেশ ছেড়ে গেলেই পারে।' রামকৃষ্ণ কোন সূত্রে কথাটি বলেছিলেন তা অবশ্য আমি জানি না। কিন্তু প্রবাসী কোন তাৎপর্যে এই উদ্ধৃতিটি উপস্থাপন করেছে তা অনুধাবন করার বয়স আমাদের হয়েছিল। প্রবাসীর এ আলোচনাটি নিয়ে আমি ওদুদ সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ওদুদ সাহেব মন্তব্য করেছিলেন, 'এতে তোমার দুঃখ পাবার কি আছে? ভারতবর্ষ তো কোনো এক বিশেষ জাতির দেশ নয়। এদেশে যারা যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে, এদেশ তাদেরই। বহু আগে এ দেশে শক এসেছিল, হূনেরা এসেছিল, কুশানরা সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। এরা সবাই ছিল বহিরাগত। ক্রমান্বয়ে এরা সবাই ভারতের অস্তিত্বে বিলীন হয়ে গেছে। যে কনিষ্ককে নিয়ে ভারতীয়রা গৌরব বোধ করে তিনি ছিলেন তুর্কী বংশোদ্ভূত এবং তুখারীস্তানের অধিবাসী।

সুতরাং ধর্মের আবরণে এদেশের মানুষকে একে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেও কাউকে ভারতবর্ষ থেকে বহিষ্কার করা যাবে না। তা ছাড়া কে কাকে বহিষ্কার করবে? যে আর্যধারা থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্ভব বলে হিন্দুরা গর্ব করে, সেই আর্যরাই তো ভারতবর্ষে বহিরাগত ছিল। সুতরাং প্রবাসীর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে কোনো লাভ নেই। তোমার অধিকার নিয়ে তুমি থাকবে এবং প্রত্যেকে নিজনিজ অধিকার নিয়েই থাকবে। তবে এদেশে ক্রমান্বয়ে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দানা বাঁধছে। তার ফলে হিন্দু ও মুসলমান বিবদমান দুই পক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উভয় পক্ষের সনাতনীরা এই বিবাদকে তীব্রতর করে তুলছে।' ওদুদ সাহেব মাসিক মোহাম্মদীর সাম্প্রদায়িক বিবেচনাগুলোকেও সমর্থন করতেন না। কিন্তু সমর্থন না করলেও এটা অনুভব করেছিলেন যে প্রবাসী বা প্রবাসীর সমতুল্য কোন হিন্দু পত্রিকায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগারের ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত তরুণ সমাজ মাসিক মোহাম্মদীর সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন করছে এবং কোন প্রকার উদার মানসিকতাকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। ওদুদ সাহেব তাঁর জীবিতকালেই এ দেশের মানুষের পারস্পরিক বিরোধ লক্ষ্য করে গেছেন এবং অনুভব করে গেছেন যে সাধারণ মানুষকে তার সীমাবদ্ধ সাম্প্রদায়িক চৈতন্য থেকে উদ্ধার করা সম্ভবপর নয়। আমাদের কলেজে পাঠক্রম শেষ হবার আগেই ওদুদ সাহেব কোলকাতায় বদলী হয়ে যান টেক্সট বুক বোর্ডের সেক্রেটারী হিসাবে। আমরা তাঁর বিদায়ে খুবই দুঃখিত হয়েছিলাম। তিনি আজীবন আপন সম্প্রদায়ের কল্যাণ চেয়েছিলেন এবং তাদের জীবনধারাকে যুক্তিনির্ভর এবং কংকীর্ণতামুক্ত করতে চেয়েছিলাম। 'শিখা' নামক একটি পত্রিকা তিনি বের করতেন। উক্ত পত্রিকায় মুক্তবুদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনা থাকত, যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা থাকত এবং বাঙালী মুসলমানকে সংস্কারের সম্মোহনের প্রভাব থেকে মুক্ত করার প্রয়াস থাকত। খুব যে বেশি লোক এই পত্রিকা পাঠ করত তা নয়। তৎকালীন সমাজে এ পত্রিকাটি বহুল আলোচিত পত্রিকা ছিল না। ছাত্রমহলেও এর খুব প্রসার ছিল না। কিন্তু পত্রিকার কোনো এক

www.pathagar.com

সংখ্যার একটি বিশেষ রচনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা শহরে এই পত্রিকাটি আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ধর্ম বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখে। উক্ত প্রবন্ধে সে ইতস্তত নানা কথার মধ্যে এমন একটি কথা লেখে যা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সে লেখে যে 'নবীরা ভুল করেছেন ধর্ম সৃষ্টি করে। হাজার বছর আগে খর্জুর বৃক্ষের ছায়ায় বসে যে সত্যের কথা বলা হয়েছিল আধুনিক মানুষের কাছে সেই সত্যের কোনো গুরুত্ব আছে কিনা তা বিবেচনা করে দেখতে হবে।' এই লেখাটা নিয়ে ওদুদ সাহেবও অসুবিধায় পড়েন এবং ঢাকার পঞ্চায়েতে এই লেখাটি নিয়ে একটি বিচার সভা বসে। সেই বিচার সভার কারণে ওদুদ সাহেবকে নিয়েও ঢাকা শহরে বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। অবশেষে ওদুদ সাহেব কোলকাতায় বদলি হয়ে গেলে 'শিখা'র আন্দোলনটি চিরকালের জন্য থেমে যায়।

'শিখা' পত্রিকাটি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তীতে যাকে মুক্তিবুদ্ধি আন্দোলন বলা হয়েছে সেটাও সে সময় কোন আন্দোলনই ছিল না। ছাত্রদের মধ্যে যে তিন চারজন এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তারাই পরবর্তীতে ব্যক্তিগত জীবনে খণ্ডিত এবং প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আন্দোলন হিসাবে এমন কোনো আন্দোলন তখন গড়ে ওঠে নি। এককভাবে শুধু কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর বিবেচনাগুলো তার বিভিন্ন রচনায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

এক্ষেত্রে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার যে সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যাকে কাজী আবদুল ওদুদের প্রতিপক্ষ হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে তিনি ওদুদ সাহেবের প্রতিপক্ষ ছিলেন না। তিনি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। শহীদুল্লাহ সাহেব ধার্মিক ছিলেন কিন্তু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। ওদুদ সাহেবের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এইখানে তিনি যুক্তির সাহায্যে তাঁর ধর্ম বিশ্বাসকে বিশ্লেষণ করতে চাইতেন না। তাঁর কাছে বিশ্বাস ছিল অনুভবের বস্তু বিশ্লেষণের বস্তু নয়। ওদুদ সাহেব ছিলেন এর বিপরীত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কখনো সংঘর্ষ বাধে নি। বরঞ্চ আমি এদের উভয়কেই সামাজিকভাবে বহু ক্ষেত্রে মিলিত হতে দেখেছি। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে উভয়ে সমভাবে যোগ দিতেন। সামাজিক অনুষ্ঠানে একে অন্যকে শুভকামনা জ্ঞাপন করতেন। মিলাদ মাহফিলে একই সঙ্গে উভয়কে উপস্থিত থাকতে দেখেছি। পারিবারিক পর্যায়ে উভয় পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। অর্থাৎ এক কথায় সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে উভয়েই আপন আপন বিবেচনা অনুসারে মুসলমান সমাজের হিত সাধনের কথা ভেবেছেন। উভয়ের উদ্দেশ্য একই ছিল, শুধু পদ্ধতিগতভাবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল। ঢাকা কলেজের অনেক অনুষ্ঠানে শহীদুল্লাহ সাহেব এসেছেন এবং বক্তব্য রেখেছেন। শুধু গানের অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকতেন না। অনেক পরে শহীদুল্লাহ সাহেবকে একবার গানের অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকার কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে 'গান নাকি চিত্তের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে'। অর্থাৎ গানে চিত্ত বিচলিত হয়। কিন্তু তাই বলে তিনি গানের বিরুদ্ধে ছিলেন না। কোন প্রকার গানেরই তিনি প্রতিবাদ করেন নি, শুধু নিজেকে সেখান থেকে সরিয়ে রেখেছেনমাত্র। যাকে আমরা সহাবস্থান বলি অর্থাৎ আপন আপন অস্তিত্ব নিয়ে একত্রে বসবাস। ওদুদ সাহেব এবং শহীদুল্লাহ সাহেবের মধ্যে ছিল তাই। সেদিনকার মিলনের লগ্ন এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন প্রত্যেকেই আপন আপন দেবতাকে নিয়ে একে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে।

www.pathagar.com

॥১১॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যেদিন আরম্ভ হল সেদিনকার কথা আমার সুস্পষ্ট মনে আছে। বিকেলে আরমানিটোলা অঞ্চলে গিয়েছিলাম এক কবিরাজের কাছে। বাবা মাঝে মাঝে কবিরাজ দিয়ে চিকিৎসা করাতেন। হেকিমী চিকিৎসা তো ছিলই, এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিকও ছিল। মার মাথাধরা ছিল। এ মাথাধরা কখনো সারে নি। যখন বাড়তো তখন কখনও কখনও অজ্ঞান অবস্থায় থাকতেন। বহুবিধ চিকিৎসা করানো হয়েছে কিন্তু কোনো উপকার হয় নি। কখনো কখনো সাময়িক উপশম হয়েছেমাত্র। এক পর্যায়ে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা করিয়েছিলেন। আমি মাঝে মাঝে বাবার চিঠি নিয়ে কবিরাজের কাছে যেতাম ওষুধ আনবার জন্য। যুদ্ধ ঘোষণা হয় ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সালে। এর আগে থেকেই যুদ্ধের প্রস্তুতির খবর আমরা পাচ্ছিলাম। ঢাকা শহরে ইংলন্ডের ডরসেট রেজিমেন্টের আগমন ঘটেছিল এবং এদের আগমনে ঢাকা শহরের কর্মব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছিল।

হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করেন ১লা সেপ্টেম্বর। এ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই ইংলন্ড ইউরোপে তাদের সেনাবাহিনীকে সতর্কাবস্থার নির্দেশ দেয়। অনেক বিলম্ব হলেও ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারলেন যে পোল্যান্ড আক্রমণের পর যুদ্ধ আর এড়ানো যাবে না। বড়দের মুখে শুনতাম যে নেভিল চেম্বারলিন কোনো কাজের লোক নয়। হিটলার যতই উদ্ধত হয়, সে ততই বিনীত হয়। আমরা যুদ্ধ লাগুক এটা কেন জানি চাইতাম। সম্ভবত বিপুল সংঘর্ষের সংবাদের মধ্যে একটা মাদকতা আছে। আমরা এই সংঘর্ষের সংবাদ শুনে শিহরিত হবার বাসনা করতাম। হিটলারকে আমাদের কাছে মনে হত বিরাট শক্তিধর। অসীম সাহসী, প্রবল প্রতাপান্বিত পুরুষ। তার যে ছবি কাগজে বেরুত সে ছবি দেখেও মনে হত যে লোকটি অকুতোভয়। হিটলারের পাশে ছাতা হাতে শীর্ণকায় চেম্বারলিনকে অসহায় মনে হত। আমি খবরের কাগজে যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ পাঠ করে কেমন যেন একটা শিহরণ অনুভব করলাম। সম্ভবত আনন্দবাজার পত্রিকায় আমি খবরটা পড়েছিলাম। কাগজের প্রথম পাতায় বিরাট আকারে যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ লিখিত ছিল। এবং একপাশে ছাতা হাতে দাঁড়ানো নেভিল চেম্বারলিনের ছবি। কবিরাজের বৈঠকখানায় বসে কাগজটি দেখলাম। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক যুদ্ধের ঘোষণা পড়ে মন্তব্য করছিলেন মনে আছে, 'এবার ইংরেজরা বুঝবে, কত ধানে কত চাল। বাবা জুজু দেখেছ, তো ফাঁদ দেখ নি।' মোট কথা পরাধীন দেশের মানুষ অধিকারীর বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ থাকে। এবং ক্ষুব্ধতা প্রকাশের একমাত্র পথ অধিকারীর পরাজয়কে কামনা করা। চেম্বারলিনের ঘোষণার কথা আমার কিছু কিছু মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা যুদ্ধ ঘোষণা পূর্বে করি নি কিন্তু যুদ্ধরত অবস্থায় অনেকদিন ধরেই রয়েছি। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি যাতে যুদ্ধের সংকটকে এড়ানো যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর সম্ভব হল না। আরো কি কি তার ঘোষণায় ছিল এখন মনে নেই। কিন্তু ফ্রান্সও যে ইংলন্ডের সঙ্গে একযোগে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, সে কথা মনে আছে। ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনে আমি প্যারিস শহরের কথা ভেবেছিলাম। প্যারিসের অসাধারণ সৌন্দর্যের কথা আমি পড়েছিলাম।

www.pathagar.com

আমাদের স্কুলের একজন শিক্ষক তামসরঞ্জন রায় প্যারিসের বিভিন্ন সৌন্দর্যের বর্ণনা আমাদের দিতেন। তার মুখে ফরাসী বিপ্লবের কথাও শুনেছিলাম। যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয়েছিল, এই যুদ্ধের ফলে অনেক শহর-প্রান্তর নষ্ট হবে এবং প্যারিসও ধ্বংস হবে। প্যারিস না দেখলেও প্যারিসের প্রতি আমার একটি মোহমুগ্ধতা ছিল। একটি শহর বহু যুগের সাধনায় গড়ে ওঠে। সে শহরটি সৌন্দর্যের লীলাভূমি হিসাবে গড়ে ওঠার পর তা আর একটি দেশের সম্পদ হিসাবে থাকে না, সমস্ত বিশ্বের সম্পদে পরিণত হয়। আগেকার দিনে যুদ্ধ হত মুখোমুখি বিরাট মাঠে গিয়ে এবং তখন যথার্থ শক্তি এবং পরাক্রমের পরিচয় মিলতো। কিন্তু এখন যুদ্ধ হয় কৌশলগত পরীক্ষার মাধ্যমে। তাই আমার বর্তমানকালের যুদ্ধ সম্পর্কে সব সময়ই এ ধারণা ছিল যে বর্তমানের যুদ্ধ হচ্ছে এক ধরনের অপরাধ–মানুষকে হত্যা করার অপরাধ এবং দেশ ধ্বংস করার অপরাধ।

যুদ্ধ ঘোষণার পর পথেঘাটে নানা ধরনের আলোচনা শোনা যেতে লাগলো। দেয়ালে দেয়ালে সরকারের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি টানিয়ে দেয়া হল যে কেউ যেন যুদ্ধ বিষয়ে কোনো আলোচনা না করে। কেননা দেয়ালেরও কান আছে। নানা রকম গুজবও রটতে লাগল। একদিন খবর পেলাম, পলাশী ব্যারাকের কাছে একজন জার্মান স্পাই ধরা পড়েছে। সে নাকি একটি রেডিওযুক্ত হাতঘড়ির মাধ্যমে জার্মানীতে খবর পাঠাচ্ছিল। কোনটা সত্য কোনটা অসত্য জানার উপায় ছিল না। কিন্তু এ ধরনের রটনায় আমরা আনন্দ পেতাম প্রচুর। তখন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে সন্ধ্যার সময় রেডিও খোলা হত। এবং বহু লোক রেডিও শোনার জন্য সেখানে জড়ো হত। আমরা অতীব আগ্রহের সঙ্গে বার্লিন রেডিও শুনতাম। তাদের বিভিন্ন হাস্যকর দাবী সে সময় যথার্থই মনে হত। যুদ্ধ ঘোষণার দু-তিন দিনের মধ্যেই বার্লিন রেডিও দাবী জানালো যে টেমস নদীর মধ্যে জার্মানীর ডুবো জাহাজ ঢুকে ইংলন্ডের কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। তেমনি আরো শুনেছি যে বোমায় লন্ডন শহর একেবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এই ঘোষণাগুলো বার্লিন রেডিও প্রচন্ড প্রতাপের সঙ্গে করতো এবং আমরা যারা শুনতাম নিঃসংশয়ে বিশ্বাসও করতাম।

যুদ্ধের প্রথম দিকে অবশ্যই জার্মানীর পর পর জয় হয়েছিল। ইংলন্ড সমুদ্রপথে অনবরত পরাজয় বরণ করছিল। যুদ্ধের ফলাফল যে দ্রুত নির্ধারিত হয় না তা আমরা ভাবতে শিখি নি। আধুনিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে ধৈর্য, সহনশীলতা এবং যন্ত্রণা সহ্য করবার অপরিসীম শক্তি এবং জয়লাভের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা এগুলো যে কত প্রয়োজন তা আমরা অনেক পরে অনুভব করেছি। মূলত জার্মানীর পক্ষ থেকে যুদ্ধপ্রস্তুতি চলছিল বহুকাল থেকে। তখন জার্মানীকে ফ্রান্স এবং ইংলন্ড বাধা দেয় নি। তাছাড়া, জার্মানীর সমর প্রস্তুতির সঙ্গে তাল রেখে ইংলন্ড এবং ফ্রান্স যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় নি। সুতরাং বলা যায়, যুদ্ধ ঘোষণার পর পর প্রায় অপ্রস্তুত অবস্থায় ইংলন্ড বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে। এই ঘটনাটি বিস্ময়কর প্রচার দক্ষতার সাহায্যে জার্মানী তাদের বেতার মারফত বারবার ঘোষণা করেছে। এমনিতেই হিটলারের দাবী ছিল যে জার্মানরা হচ্ছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের কয়েকটি আংশিক বিজয় ঘোষণাই যথেষ্ট ছিল। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগে জে ডব্লিউ ফুক নামক একজন জার্মান অধ্যাপক ছিলেন। তাকে আমরা ঢাকার পথে মাঝে

www.pathagar.com

মাঝে দেখতাম। লম্বা একহারা চেহারা, দীপ্তিময় নীল চোখ এবং সুদৃঢ় চিবুক। তার সম্পর্কে অনেক গল্পও শুনতাম। আমার একজন শিক্ষক ছিলেন আবদুর রশিদ নামে। তিনি ফুক সাহেবের ছাত্র ছিলেন। তার মুখে ফুক সাহেবের অনেক কাহিনী শুনতাম। যুদ্ধ ঘোষণার পর ফুক সাহেবকে আর ঢাকায় দেখলাম না। একবার শুনলাম তাকে বন্দী করা হয়েছে। পরে জেনেছিলাম যে তিনি জার্মানীতে চলে গিয়েছিলেন।

ফুক সাহেব অল্প কিছুকাল হল পূর্ব বার্লিনে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি ঢাকার কথা তার জীবনের শেষ পর্যায়েও নাকি স্মরণ করতেন। জার্মান পণ্ডিতরা প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ে চিরকাল আগ্রহী ছিলেন। পৃথিবীর বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ এবং আরবী, ফারসী ভাষাবিদ পণ্ডিত জার্মানীতে যে কজন হয়েছে অন্য দেশে ততটা হয় নি। মহাকবি গ্যায়টে প্রাচ্যের সৌন্দর্য বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। কালিদাসের শকুন্তলা সম্পর্কে তার একটি মন্তব্যের কথা রবীন্দ্রনাথের লেখায় জানতে পারি। গ্যায়টে 'প্রাচ্য-প্রতীচ্য দীউয়ান' নামক একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন যেখানে ফারসী রচনাশৈলী অনুসৃত হয়েছে। যে জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে এতোটা পারঙ্গম সে জাতি কি করে চরমতম নিষ্ঠুরতার স্বাক্ষর রাখতে পারে এটা আমার ধারণায় আসে না। জার্মানীর দান বিশ্বসভ্যতায় অনেক। কাব্যে, সঙ্গীতে, প্রাচ্যবিদ্যা চর্চায় এবং বিজ্ঞানে জার্মানীর সমতুল্য জাতি পৃথিবীতে খুবই কম ছিল। আবার অন্যদিকে হিটলারের নিঃসংশয়, নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তুলনা করার মতো নিষ্ঠুরতা পৃথিবীতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। হিটলার যেভাবে ঘৃণা এবং বিদ্বেষকে তার সমস্ত কর্মকান্ডের প্রেরণাস্থল করেছিলেন তার তুলনা হয় না। ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর ব্যর্থতার সঙ্গে একাকার হয়ে যে ক্ষুব্ধতার জন্ম দিয়েছিল তারই পরিণতি রূপে বিশ্বব্যাপী একটি সংঘর্ষের জন্ম হল।

॥১২॥

শৈশবে এবং কৈশোরে পিতা-মাতা এবং পরিবার পরিজনবর্গের ধর্মীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে মানুষ হয়েছিলাম। ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ইতিহাস আমাদের শৈশব এবং কৈশোর জীবনকে পরিশুদ্ধ রেখেছিল এবং আমরা মানুষকে মানুষ হিসাবে বিবেচনা করতে শিখেছিলাম। আমাদের গৃহে হিন্দুদের আগমন ছিল অবাধ, বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ। এরা আমাদের বাড়িতে খাদ্যগ্রহণ করতেন না। কিন্তু এদের মধ্যে একজন দুপুর বেলায় বাবার বিছানায় শুয়েছেন। আচরণের দিক থেকে মানুষে মানুষে যত পার্থক্যই থাকুক বিশ্বাসের একটি নিবেদনের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের ব্যবধান দূর হয়ে গিয়েছিল।

কলেজে যখন এলাম তখন সর্বভারতবর্ষব্যাপী একটি সংকটের কাল যাচ্ছে। বিরাট একটি সংঘর্ষ ঘটতে যাচ্ছে। সেই বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষের পটভূমিতে ভারতবর্ষের মানুষ রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িকভাবে আন্দোলনের সূত্রপাত করছে। সে সময় আমি প্রবাসী পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলাম। প্রবাসী ছাড়া আনন্দবাজার, অমৃতবাজার এবং বসুমতী এসব পত্রিকাও পাঠ করতাম। এসব পত্রিকার বিভিন্ন লেখা পড়ে এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষণ পাঠ করে আমি ক্রমশ নিজেকে হিন্দুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবতে শিখলাম।

www.pathagar.com

বিশেষ করে প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের সর্বপ্রকার দাবী-দাওয়াকে অস্বীকার করবার যুক্তি আমাকে ক্ষুব্ধ করল। এ সময় আমরা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র নাম প্রথম শুনতে পেলাম। আমি প্রথম প্রথম ভাবতাম রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেস হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক। হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক। কিন্তু ক্রমশ এ চৈতন্য বদ্ধমূল হল যে কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক নয়, কংগ্রেস মূলত হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান। ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেশের মানুষের বিভাজন তখন ঘটেছে ধর্মগতভাবে হিন্দু–এবং মুসলমান ভাবে। হিন্দুরা হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং মুসলমানরা হচ্ছে সংখ্যালঘু। এই সময় জিন্নাহ সাহেব ঘোষণা করলেন যে কোনো দেশের স্বাধীনতার অর্থ সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসন ও স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতার অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু সকলেরই স্বাধীনতা। যে দেশে মানুষ ধর্মগত শ্রেণীতে বিভক্ত হয় একে অন্যের বিরুদ্ধে বিবদমান রয়েছে সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্ম সম্প্রদায়ের শাসনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আশংকা থাকবেই। সেই কারণে সকলের জন্য স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিত নির্ধারণ করতে হবে। জিন্নাহ সাহেব আরও বলেছিলেন যে যেহেতু ভারতীয় মুসলমানগণ হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের সততার ওপর নির্ভর করতে পারছে না তাই মুসলমানকে স্বরাজ্যের প্রশ্নে একটি স্বাধীন আন্দোলন চালাতে হবে। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বললেন যে আগে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে এবং পরে বন্টন করতে হবে এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী নন। তাঁর বিবেচনায় সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান প্রথমে করে নিতে হবে এবং সেই সূত্রে স্বাধীনতার সংগ্রাম করতে হবে। তিনি আরও বলেছিলেন, মনে আছে যে সাম্প্রদায়িক ভাগ বাটোয়ারা পূর্বাহ্নে নির্ধারণ না করে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আন্দোলন সফলকাম হবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কৃতি এবং আদর্শ সংখ্যালঘুদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার নাম স্বাধীনতা নয়। তিনি সংখ্যালঘুদের ভাষা সংস্কৃতি এবং ধর্মবিষয়ক অধিকার রক্ষার কথা বলেছিলেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র এই কথাগুলো আমার মনে প্রথমে কিন্তু দাগ কাটে নি। কিন্তু প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গ পাঠ করে আমি মুসলমান সন্তান হিসাবে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং আহতবোধ করেছিলাম। প্রবাসীর ভাষায় এটাই প্রমাণিত হয়েছিল যে মুসলমান হচ্ছে ভারতবর্ষে বহিরাগত এবং তাদের কোনো দাবীই বিবেচনা করার যোগ্য নয়। প্রবাসীর কুৎসিত সাম্প্রদায়িক বিবেচনা আমাকে দুঃখের সঙ্গে এটা অনুভব করবার সুযোগ দিল যে আমার একটি ভিন্ন সত্তা আছে, মুসলমান হিসাবে এবং ধর্মাবলম্বী হিসাবে আমার একটি ভিন্ন জাতিসত্তা তৈরি হয়েছে।

এ সময়কার আর একটি ঘটনা আমার বিশেষভাবে মনে আছে। ঢাকা মাদ্রাসায় কবি ইকবালের ওপর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমি সে সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেখানে বিখ্যাত ভেষজ চিকিৎসক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক হেকিম হাবিবুর রহমান উর্দু ভাষায় একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর সেই ভাষণে আমি প্রথম জানতে পারি যে কবি ইকবাল মুসলমানদের অধঃপতিত অবস্থা দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের সমৃদ্ধিতে তারা যেন ফিরে যেতে পারে সে জন্য প্রার্থনা করেছেন। হেকিম হাবিবুর রহমান তাঁর উদ্বেলিত কণ্ঠে 'শেকওয়া' কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন। সেই আবৃত্তি শুনে আমি অনুভব করেছিলাম যে তৎকালীন ভারতের

www.pathagar.com

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের একতাবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইকবালের কথাগুলো আমার কাছে বিশেষ তাৎপর্যবহ মনে হয়েছিল এ কারণে যে ইকবাল দেশপ্রেমিক হিসাবেই মুসলমানদের অধঃপতনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাঁর একটি কবিতার চরণ আমার এখনো মনে পড়ে যেখানে তিনি বলেছিলেন যে, 'মাতৃভূমির প্রতিটি ধূলিকণা আমার জন্য দেবতা।' বড় হয়ে এই কবিতাটি পুরো পড়েছিলাম। তিনি ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ, তুমি মন্দিরে গিয়ে প্রতিমা উপাসনা কর। তুমি ভাবো সেই তোমার দেবতা। কিন্তু আমার দেবতা তো আমার মৃত্তিকার ধূলিকণা।'

ভারতীয় রাজনীতির যে প্রেক্ষাপট ক্রমান্বয়ে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হচ্ছিল, সেখানে মুসলমানকে অগ্রাহ্য করবার প্রবণতাটা প্রবল ছিল। সে জন্য মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর যুক্তিতে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ভারতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের একটি চুক্তি হতে পারে। সেই চুক্তি হবে হিন্দু-মুসলমানদের সাম্যের ভিত্তিতে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই সাম্যটা মেনে নিলেই উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের শর্তসমূহের আলোচনা সম্ভবপর। প্রবাসী এর সমালোচনা করে বলেছিল যে একমাত্র যোগ্যতাই হবে সাম্যের ভিত্তি। অর্থাৎ চাকরি ক্ষেত্রে এবং কর্মসংস্থানের বিবিধ ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের নিয়োগ হবে একমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে। কিন্তু মুসলমানকে যোগ্য করে গড়ে তুলবার কোনো সুযোগ দিতে প্রবাসী প্রস্তুত ছিল না। কাজী আবদুল ওদুদকে আমি আমার মানসিক বিক্ষুব্ধতার কথা বলেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'এটা ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে এদেশে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন লোকরাই ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে বিরোধকে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত করছে। সনাতনীদের অপচেষ্টায় এদেশ একটি ঔদার্যের মধ্যে মিলনের ক্ষেত্রভূমি রচনা করতে সক্ষম হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ এজন্যই দুঃখ করে বলেছিলেন ঃ 'তোমার আমার মাঝে মন হো'ল কাঁটার বেড়া এ/কখন সহসা রাতারাতি।। স্বদেশের অশ্রুজলে তারেই কি তুলিব বাড়ায়ে/ওরে মূঢ় ওরে আত্মঘাতী।। এই সর্বনাশাটাকে ধর্মের নামেতে কর দামী। ঈশ্বরের কর অপমান।। আঙ্গিনা করিয়া ভাগ দুই দিকে তুমি আর আমি/পূজা করি কোন শয়তান?'

আমাদের জীবনে হিন্দু মুসলমানের বিরোধটাই এদেশে রাজনৈতিক জীবনে প্রধান উদ্যম হয়ে দাঁড়াল। আমি সে সময় আজাদ পত্রিকায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। আনন্দবাজার, অমৃতবাজার পত্রিকায় এ সমস্যা নিয়ে চিঠি ছাপিয়ে ছিলাম। কেন যেন এ বিষয়ে একটি ব্যাকুলতা আমাকে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক চিন্তানায়কদের সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আমি মানসিকভাবে পীড়িত হয়েছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত একটি ঔদার্যকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হই নি। বারবার করে প্রবাসী পত্রিকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখছিলেন যে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন যে স্বরাজলব্ধ হতে পারে না তিনি সে রূপ মনে করেন না। তিনি মনে করেন যে কেবলমাত্র হিন্দুরাই যদি স্বরাজ লাভের চেষ্টা করেন তাহলেও স্বরাজ লব্ধ হতে পারে। অন্য নিরপেক্ষভাবে, এমনকি অন্যরা বাধা দিলেও স্বরাজ লাভ করবার সামর্থ্য হিন্দুদের আছে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের এহেন বিবেচনা বাঙ্গালী মুসলমানদের মনে বিক্ষুব্ধতার সৃষ্টি করেছিল। তিনি মুসলমানকে অস্বীকার করবারই চেষ্টা করেছিলেন ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবন

www.pathagar.com

থেকে। আমাদের এদেশের মানুষের মিলিত জীবনধারাকে বিঘ্নিত করে যে অশুভ লক্ষণগুলি এদেশে প্রত্যয়িত হচ্ছিল শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সেগুলোই প্রাধান্য পেল। বিপুল ঔদার্যে দেশপ্রেমের যথার্থ আকাঙ্ক্ষায় আমরা মিলিত হতে পারলাম না।

॥১৩॥

আমাদের স্কুল জীবনের শেষ পর্যায়ে এবং কলেজ জীবনের সব সময়টাই হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটি প্রবল আকার ধারণ করেছিল। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা শুধুমাত্র ধর্মীয় নয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছিল। সর্বত্রই এটাই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। যুদ্ধের আলোচনা তো ছিলই, সে আলোচনা সূত্রে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা উত্থাপিত হলেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কথা জাগ্রত হত। সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবী মহলে এ সমস্যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুবিধ রচনায় হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য নিয়ে মন্তব্য রেখেছেন। শরৎচন্দ্র 'অবাঞ্ছিত ব্যবধান' নামে একটি প্রবন্ধে এই বিরোধের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি জাহানারা চৌধুরীর 'বর্ষবাণী' পত্রিকায় ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। বছরটি ১৯৩৭-ও হতে পারে। উক্ত প্রবন্ধের জের টেনে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এবং ইব্রাহীম খাঁ মাসিক 'বুলবুল' পত্রিকায় দুটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৩৭ সালে শরৎচন্দ্র যখন ঢাকায় আসেন তখন মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সভায় সভাপতির ভাষণে বলেন যে, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে মুসলমানদের জীবন অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করবেন।

এই ইচ্ছাটা তাঁর আন্তরিক ছিল। এই ইচ্ছাটি পূরণ করতে পারেন নি। কেননা এর অল্পদিন পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে আমি খুবই ব্যথিত হয়েছিলাম। শুধু আমি কেন, সমস্ত দেশ তাঁর মৃত্যুতে ব্যথিত হয়েছিল। একজন ঔপন্যাসিক কি করে সকল মানুষের হৃদয়কে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। শরৎচন্দ্রের ভাষা উপাখ্যান বর্ণনা করার ভাষা ছিল না, সে ভাষা ছিল মানুষের হৃদয়াবেগকে আলোড়িত করবার ভাষা। বাঙালী চিত্তে মমতা ও বেদনাবৃত্তি শরৎচন্দ্রের শব্দের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাস পাঠ করলে আমরা এই মমতা এবং বেদনার উজ্জীবনের মধ্যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের তাৎপর্য খুঁজে পেতাম। জনপ্রিয়তা সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি নয় অথবা আবেগের প্রশ্রয়ও সাহিত্যের শোভা নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর ভাষার লাবণ্যে পাঠকচিত্তকে সম্মোহিত করেছিলেন। সে সম্মোহন যে কি নিদারুণ এখনকার পাঠক তা অনুধাবন করতে পারবেন না। আমি স্কুলে থাকতেই শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীভুক্ত সবকটি উপন্যাস ও গল্প পড়ে শেষ করেছিলাম। 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসটি গ্রন্থাবলীর বাইরে ছিল। কলেজে থাকাকালীন এটা পড়ি। মানুষের চিত্তে বেদনা এবং মমতার যে অন্তর্গূঢ় আবেগ থাকে শরৎচন্দ্র সে আবেগকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তিনি পাঠকের এত প্রিয় হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর আমি ওদুদ সাহেবের বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম, কলেজের কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত রয়েছেন। তাদের মধ্যে দুজনের কথা স্মরণ করতে পারছি। একজন হচ্ছেন ডক্টর সেন অন্যজন ডক্টর মাহমুদুর রহমান।

www.pathagar.com

এঁরা উভয়েই বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। আরও কয়েকজন অভ্যাগত ছিলেন যাদের আমি চিনতাম না। সেখানে শরৎচন্দ্রের শেষ ইচ্ছা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ওদুদ সাহেব বলছিলেন, 'শরৎচন্দ্র যদি মুসলমানদের জীবনের ওপর ভিত্তি করে একটি উপন্যাস রেখে যেতে পারতেন তাহলে আমরা তাঁর লেখায় একটা নতুন অভিনিবেশ ও তাৎপর্য পেতাম। তবে এ কাজটি মুসলমান সমাজভুক্ত লেখকদের দ্বারাই সফল হতে পারে। মাহমুদুর রহমান সাহেব একটি মন্তব্য করেছিলেন মনে আছে। তিনি বলেছিলেন, 'হিন্দুর জীবনধারা এবং মুসলমানদের জীবনধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই একজন তার মানসিকতার দ্বারা অন্যকে বিচার করতে সক্ষম হবে না। তা ছাড়া মুসলমানরা হিন্দু সমাজভুক্ত মানুষকে যতটা জানে অথবা যতটা জানতে পেরেছে হিন্দুরা মুসলমান সমাজের মানুষকে ততটা জানে না। এর প্রদান নিদর্শন হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তিনি জমিদারী কর্মসূত্রে মুসলমান প্রজাদের মধ্যে কাটিয়েছেন। তাদের জীবনধারা দেখেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর বিপুল রচনাপুঞ্জের মধ্যে কোথাও হযরত মোহাম্মদ সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেন নি। তিনি বুদ্ধদেবের ওপর কবিতা লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, যিশু খ্রীষ্টকে নিয়েও তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ আছে কিন্তু হযরত মোহাম্মদকে নিয়ে তাঁর একটি বাক্যও নেই। এতে বোঝা যায় যে হিন্দু পৌত্তলিক মানস পৌত্তলিক বিরোধী মুসলিম মানসকে সম্মান করতে জানে না। সুতরাং হিন্দুরা যত মহৎই হোন না কেন, আপন সমাজের গণ্ডী তারা এড়াতে পারেন না।'

ওদুদ সাহেব এ মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হলেন মনে হল। তিনি বললেন, বুদ্ধদেবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভক্তি অথবা খ্রীষ্টের প্রতি ভক্তি হযরত মোহাম্মদের প্রতি অভক্তি বোঝায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রচনায় ঔদার্যের যে পটভূমি নির্মাণ করেছেন তাতে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সমান অধিকার আছে। 'সতী' নাটকের মধ্যে একজন মুসলমানের সঙ্গে এক হিন্দু রাজকন্যার বিবাহের কথা আছে। কন্যার পিতা এ বিবাহ মেনে নিতে পারে নি এবং মৃত্যুপথযাত্রী এক হিন্দু বৃদ্ধের সঙ্গে তাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে স্বামীর চিতায় সহমরণে যেতে বাধ্য করে। কন্যা তার মৃত্যু মুহূর্তে পিতাকে অভিসম্পাত দেয় এবং বলে, মুসলমানদের সঙ্গে তার যে বিবাহ সেটাই প্রেমের বন্ধন এবং সত্যবন্ধন। তাকে যে জোর করে হিন্দুর সঙ্গে সহমরণে যেতে বাধ্য করা হল তাতে ধর্ম অপমানিত হল। রবীন্দ্রনাথ সত্য ধর্মের পোষকতা করেছেন-হিন্দুর ধর্মকেও নয় মুসলমানের ধর্মকেও নয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যদি হযরত মোহাম্মদ সম্পর্কে কিছু নাও লিখে থাকেন, তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি তো চৈতন্যের ওপরেও লেখেন নি অথবা শ্রীকৃষ্ণের ওপর। তিনি গৌতম বুদ্ধকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করেছিলেন। এটা তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস ছিল। এটা নিয়ে আমরা তর্ক করতে পারি না।

আমাদের দেখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে এবং বিশ্বাসের প্রতিবেদনকে।'

আমরা যেকালে বাস করি সেকালের পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ বিরোধ বিসংবাদের সদ্য উৎক্ষিপ্ত ধূলির আবর্তে আবিল, এই অল্প পরিসর অস্বচ্ছকালের মধ্যে যথার্থ সত্যকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। আমাদের সময়ে রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত, মানুষে মানুষে কপটতা এবং ঈর্ষার পটভূমি নির্মাণ করেছে। একজন মানুষ অন্য মানুষের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ

www.pathagar.com

করবার জন্য উদ্যত। আমাদের কলেজ জীবনের সময়কালটি এত জটিল চিত্তবিকার এবং অপূর্ণতায় আবিল ছিল যে আমরা সে সময় ক্রমান্বয়ে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে পরস্পরের যোগ বিনষ্ট করে ফেলেছিলাম। সেজন্য কে দায়ী, তা আলোচনা করে আজ আর কোনো সুফল ফলবে না। আমাদের জীবনে রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এঁদের উভয়কেই আমরা আপনজন বলে ভাবতাম। তাই আশা করতাম, এঁরা যেন আমাদের কথাও তাঁদের সাহিত্যে বলেন। এঁদের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা ছিল। এই প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি বলেই তখনকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছি। এই ক্ষোভ কিন্তু সমালোচনা ঠিক নয়। মানুষের সৃষ্টি এখনো অসম্পূর্ণ। সব ক্ষেত্রেই একটি অসমাপ্তি রয়েছে। এই অসমাপ্তির মধ্যে মহৎ জীবন যে দু'একটি দেখি সে জীবনকে আমরা পরিপূর্ণ করে দেখতে চাই। কাজী আবদুল ওদুদ সবসময় চাইতেন, আমরা যেন অনুদারতায় অবগাহন না করি। প্রতিদিন প্রত্যূষের পরিশুদ্ধতার মতো আমাদের জীবন সর্বমুহূর্তেই যেন পরিশুদ্ধ থাকে এটা তিনি চাইতেন। কিন্তু একটি জটিল সময়ে ঘটনাবর্তে সবকিছুই নষ্ট হয়ে গেল। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বিরোধটাই প্রধান অবলম্বন হল এবং আমরা এমন একটি আবর্ত রচনা করলাম যে আবর্তের বাইরে বেরিয়ে আসা কারও পক্ষেই সম্ভবপর হল না। শরৎচন্দ্রের মৃত্যু ঘটেছে, রবীন্দ্রনাথের জীবনেরও তখন শেষ মুহূর্ত এসেছে। এঁরা উভয়েই তখন আর নেতৃত্ব দিতে পারেন নি। আমি তখন এ কথাই ভাবছিলাম যে জটিল সাম্প্রদায়িক আবর্তের মধ্য থেকে মুসলমানকে যদি একটি বিশুদ্ধ সংঘবদ্ধতায় একত্রিত করা যায় তাহলে হয়তো কল্যাণ আসতে পারে।

॥১৪॥

যে পর্যন্ত না আমরা অনুভব করতে শিখি যে কেউ না কেউ আমাদের কথা ভাবছে, ভালোবাসছে সে পর্যন্ত এ পৃথিবী আমাদের কাছে পত্রপুষ্পে সুশোভিত হয় না। মানুষ যদি জানে যে তাকে ভালোবাসবার কেউ আছে, তাকে গ্রহণ করবার কেউ আছে, তাকে আনন্দিত করবার জন্য কেউ অপেক্ষায় আছে তাহলেই মানুষ জীবনকে মূল্যবান ভাবতে পারে। আকাশে মেঘের বিভিন্ন আকৃতি, লতাপাতায় এবং বৃক্ষশাখায় নানাবিধ রূপের অভিব্যক্তি তখনই দৃষ্টিতে উজ্জ্বল দীপ্যমান হয় যখন আমাদের চিত্তে হর্ষ থাকে। আমার সবসময় একটি নির্ভরতা ছিল আমার গৃহের আপনজনের প্রতি বাইরে কোথাও গেলেও গৃহগত সৌজন্যের চিন্তায় আমি আচ্ছন্ন থাকতাম এবং প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায় থাকতাম। কলেজে যদিও একটি মুক্ততা ছিল অর্থাৎ নিজেকে স্বাধীনভাবে চলমান করবার অভিপ্রায় ছিল, তাহলেও চিত্তের নিভৃতে আমি গৃহের নির্ভরতাকে লালন করেছি। বোধ হয় এই নির্ভরতাই আমাকে পরবর্তীতে কবিতা লেখায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

এ সময় আমার প্রিয় কবিদের মধ্যে একজন ছিল কীটস। একথা পূর্বেই বলেছি। কলেজ জীবনে প্রবেশের মুখে জন্মদিনের উপহারস্বরূপ কীটস-এর কাব্যগ্রন্থ পেয়েছিলাম। এখানে একটি কবিতা ছিল, 'নির্জনতার প্রতি' এই কবিতাটি বারবার পাঠ করেও আমার তৃপ্তির পূর্ণতা আসত না। মনে হত অনবরত পড়ি। কবিতাটিতে কীটস বলছেন, 'তুমি তোমার নির্জন বেদনাকে কারো কাছে প্রকাশ করো না অথবা এমন কোনো সঙ্গী খুঁজো না

www.pathagar.com

যার সঙ্গে আলোচনায় তোমার নিঃসঙ্গতা দূর হবে। তোমার যে দুঃখ সে দুঃখ একান্ত তোমারই থাক। ছায়ায় ছায়ায় এমন একটি আচ্ছন্নতা আসবে যে আচ্ছন্নতায় বিমুগ্ধ হয়ে তুমি অচৈতন্য হয়ে পড়বে। নির্জন দুঃখটা অশ্রুসিক্ত মেঘের মতো আকাশ থেকে ঝরে পড়ে। তখন ফুলের পাপড়িগুলো নুয়ে পড়ে এবং পাহাড়ের সবুজে ঢেকে যায়। তুমি তোমার নির্জন বেদনাকে সকাল বেলার গোলাপের পাপড়িতে ধারালো করো এবং একান্তে বেদনার বল্লভ হও। আমাদের বেদনার বোধ সৌন্দর্যের মধ্যে বাস করে। যে সৌন্দর্য একদিন না একদিন মৃত্যুতে গত হবে। সুতরাং যতদিন এ সৌন্দর্য বিদ্যমান আছে ততদিন তাকে লালন করো এবং সমৃদ্ধ করো। রাত্রি যেমন অপরিসীম নৈপুণ্যের সঙ্গে সবকিছুকে নিজের পক্ষপুটে ধারণ করে তেমনি নির্জনতার পক্ষপুটে তুমি আশ্রিত হও'।

আমি বিচিত্র কোলাহলের মধ্যে আমার চিত্তের জন্য এক প্রকার নির্জনতা এবং নিভৃতি নির্মাণ করে নিয়েছিলাম। এটা সম্ভবপর হয়েছিল গৃহগত নির্ভরতার জন্য। অর্থাৎ যেখানে যে অবস্থায়ই থাকি না কেন একটি নিভৃতলোক আমার চিত্তের মধ্যে বিদ্যমান থাকতো না যেখানে গৃহের সান্ত্বনার অভয় ছিল।

ঢাকা শহরে তখন প্রচুর গাছ ছিল। আজকের তুলনায় সেদিনের শহর ছিল একটি বনভূমির মতো। আমরা কয়েকজন ছাত্র সন্ধ্যার সময় বেড়াতে বেরোতাম। আজ যেখানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান তার পিছনে ঘন বিন্যস্ত বনভূমি ছিল। সেই বনভূমির পাশ দিয়ে হাঁটতে আমাদের ভালো লাগতো। সন্ধ্যাকালে গাছের পাতার সাড়া, পাখির ডাক এবং বাতাসের দোলায় শিহরিত ডালপালাগুলো আমাকে আনন্দ দিত। মাঝেমাঝে ভাবতাম এই বনভূমির আচ্ছন্নতার মধ্যে যদি বৃষ্টি নামে তাহলে খুব ভালো হয়।

কেন ভাবতাম জানি না। তবে মনে হয় চিত্তের সকল প্রকার ইচ্ছা বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হোক এই সম্ভবত চাইতাম। কোনো কোনো দিন বৃষ্টির মধ্যে যে পড়িনি তা নয়। অপূর্ব মৃদঙ্গ বাজিয়ে বৃষ্টি নেমেছে, আমরা অর্ধসিক্ত অবস্থায় গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি এবং পর্যাপ্ত সময়ের মধ্যে জীবনের উচ্ছলতাকে প্রত্যক্ষ করেছি। তখন গৃহের কথা যে না ভেবেছি তা নয়, গৃহে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা জেগেছে কিন্তু সেই ইচ্ছাকে শাসন করে বৃষ্টির প্রতাপ দেখতে চেয়েছি। আমার মনে হয়, আমি সে সময় আমার নবোদ্ভিন্ন যৌবনের কামনা এবং ইচ্ছাকে বৃষ্টির মধ্যে প্রত্যক্ষ করতাম। তাই বোধ হয় যুবতী রমণীর প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ্যে প্রশমিত রাখতে সমর্থ হয়েছিলাম। আমার শিক্ষক পরিমলকুমার ঘোষের শ্যালিকা প্রচুর কেশগুচ্ছ নিয়ে আমার দিকে পিছন ফিরে একদিন বসেছিল। আমি তাকে আমার সম্মুখবর্তী করে দেখতে চাইনি। ঘনকৃষ্ণ কেশের আবরণের মধ্যেই আমি তাকে অনুভব করেছিলাম। মধ্যযুগের কবিরা জমাটবাঁধা ঘনকৃষ্ণ মেঘের সঙ্গে রমণীর কেশদামের তুলনা করে থাকেন। মেঘ যেমন আকাশকে আবরিত করে স্নিগ্ধতায় এবং শৈথিল্যে রমণীর কেশও তেমনি একটি যৌবনকে আবৃত্ত করে মসৃণ ও শৈথিল্যের, নির্জনতায় এবং সমর্পণের মধ্যে। সুজাতা সুন্দরী ছিল না, কিন্তু তার কেশগুচ্ছের মধ্যে আমার জন্য বিপুল আকর্ষণ ছিল।

প্রকৃতিকে ভালোবাসা যৌবনের ধর্ম, কেননা মানবজীবনের দুঃখ এবং পাপবোধ প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণকে বিলুপ্ত করে দেয়। যৌবনে রক্তের উচ্ছলতা থাকে, আশা থাকে,

www.pathagar.com

চিত্তের পরিচ্ছন্নতা থাকে এবং মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা থাকে না। তাই তখন প্রকৃতির কাছে আমরা সর্বস্ব সমর্পণ করতে পারি। আমার কাছে বন্য প্রকৃতি সবচেয়ে ভালো লাগতো। সুতরাং যেখানে প্রকৃতি তার স্বাভাবিকতায় বিকশিত সেখানকার প্রকৃতির কাছেই আমি যেতে চাইতাম। তাই সুযোগ পেলেই ঢাকার সেই সমস্ত অঞ্চলে বেড়াতে যেতাম, যেখানে বৃক্ষরাজি আপন ইচ্ছায় আকাশের দিকে ডানা মেলেছে। কয়েকবার তেজগাঁয় গিয়েছি। তখন তেজগাঁ ছিল একটি বিস্তৃত বনাঞ্চল। বর্তমানের মতো শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা নয়। সেখানে প্রচুর শালবৃক্ষ, আম্রবৃক্ষ এবং বটগাছ ছিল। এক জায়গায় প্রচুর বাবলা গাছ ছিল। বাবলা গাছগুলো ছেয়ে থাকতো উদ্দীপ্তকান্তি স্বর্ণলতায়। অবশ্য তখন তেজগাঁয় প্রচুর বানর ছিল। কিন্তু এ বানরগুলো বনভূমির শোভা বর্ধন করতো সৌন্দর্যের হানি করতো না। তারা আনন্দিত উল্লাসে গাছের শাখা ধরে ঝুলতো।

লাফিয়ে লাফিয়ে এক শাখা থেকে অন্য শাখায় যেতো এবং মানুষ দেখলে শব্দ করে উঠতো। একবার আমরা তেজগাঁয় বনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটি নির্জন গির্জার চত্বরে এসে পড়েছিলাম। হঠাৎ বনের মধ্যে উজ্জ্বল সাদা গির্জাটি ভালো লেগেছিল। গির্জায় এক বিদেশী পাদ্রী শুভ্র বেশ পরিহিত অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিলেন। আমাদের কয়েকজনকে দেখে এগিয়ে এলেন এবং হাসিমুখে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। কি কথা বললেন, মনে নেই। কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে এক গ্লাস করে বেশ ঘন গরুর দুধ খেতে দিয়েছিলেন। গির্জাটিকে ভালো লেগেছিল, কেন না প্রকৃতিকে সঙ্গত রেখেই গির্জাটি গড়ে উঠেছিল। বৃক্ষরাজিকে যতটা সম্ভব বিদ্যমান রেখেই গির্জাটি গড়ে উঠেছিল।

এখনকার দিনে আমরা বৃক্ষ কর্তন করে প্রশস্ত এলাকা তৈরি করে নেই। কিন্তু অতীতে এটা ছিল না। পাহাড় পাহাড়ের মতোই থাকতো। নদী তার নিজস্ব গতিতেই চলতো। বনভূমিতে গাছগুলো শ্রেণীবদ্ধভাবে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে থাকতো। এগলোকে নিয়েই মানুষের বসবাস ছিল। এখন আমরা সবকিছুতেই হাত লাগিয়েছি। মানুষের নিষ্ঠুর করস্পর্শে প্রকৃতি আহত হয়েছে।

আমাদের পরিবারে প্রকৃতি প্রেমটি অত্যন্ত নিবিড় ছিল। আমার নানা ছিলেন একজন সুফী সাধক। তিনি মাঝে মাঝে নির্জন বনভূমি দেখলেই সেখানে চলে যেতেন এবং মনুষ্য কোলাহলের বাইরে সুগভীর নির্জনতায় আল্লাহর ধ্যানে বসতেন। আমার মামা অল্প বয়সে মারা যান কিন্তু শৈশব থেকেই তাঁর বনভূমির প্রতি আকর্ষণ ছিল। তিনি সকাল বিকাল দুবেলাই বাড়ির কাছে বাগান অথবা নদীর তীরের গাছপালার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতেন। গাছের ফল খেতেন এবং কখনো কখনো পাখিদের ধান গম খাওয়াতেন। মার কাছে শুনেছি যে বনের পাখিরা নাকি তাকে চিনতো। অর্থাৎ প্রতিদিন তাঁর কাছে খাবার পেয়ে পাখিদের একটি অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। পাখিরা তাঁকে দেখলেই সাড়াশব্দ করে তাঁর আশপাশে ঘুরতো এবং তিনি হাতের মুঠোয় গম কিংবা চাল ছিটিয়ে দিলে সেগুলো তারা ঠোঁট দিয়ে তুলে নিত। আমার এই মামার জীবনের ওপর অনেক অলৌকিকতা আরোপ করা হয়েছে। মার মুখেই তাঁর জীবনের অনেক অলৌকিক অবাস্তব ঘটনার কথা শুনেছি। কিন্তু আমার কাছে এসব অলৌকিক ঘটনার চাইতে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর একাত্মতাই মূল্যবান বলে মনে হয়েছে। শুনেছি তিনি উজ্জ্বল দীপ্তিমান ছিলেন, তিনি

www.pathagar.com

ঘোড়ায়ও চড়তেন, তাঁর একটি সাদা ঘোড়া ছিল। আমাদের জীবনে অতীতে প্রকৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখন আর নেই। এখন নির্জনতাকে কামনা করা যায় কিন্তু পাওয়া যায় না।

॥১৫॥

আজ যেখানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান, স্কুল-কলেজ জীবনে সেখানে রেসকোর্স ছিল। শনিবার দিন সমস্ত ঢাকা ভেঙ্গে পড়তো রেসের ময়দানে। আমার রেস সম্পর্কে কৌতূহল হয়েছে এটা ঠিক, কিন্তু যে জীবনধারার মধ্যে আমি বড় হয়েছিলাম, সেখানে রেসের আনন্দ বা উৎসাহের সমর্থন ছিল না। কলেজে এসে যখন কিছুটা স্বাধীনতার আস্বাদ পেলাম তখন রেস দেখবার আগ্রহ জেগেছিল। আমাদের সঙ্গে পড়তো খাজা খয়েরউদ্দিন, বর্তমানে পাকিস্তানের একজনা খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ। খয়েরউদ্দিন সে বয়সেই রেস খেলতো। তার সঙ্গেই একবার আমি এবং আমার কয়েক বন্ধু রমনার বর্ধমান হাউসের সামনে এসে ঘোড়দৌড় দেখেছিলাম। ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা রঙ্গীন পোশাক পরিহিত জকিকে দেখে কৌতূহল হয়েছিল। জকিদের কেউ কেউ রেসকোর্সের পেছনে ঢাকা ক্লাবের পশ্চিমে থাকতো। সেখানে কয়েক ঘর জকি ছিল। কলেজে থাকতে আমার বেড়ানোর অভ্যাস ছিল। আমরা কয়েকজন ছেলে মিলে বিকেল অথবা সন্ধ্যার দিকে রেসকোর্সের সম্পূর্ণ বৃত্তটা ঘুরে আসতাম। এভাবে প্রায় প্রতিদিন বেড়াতে যাওয়ার ফলে একজন দুজন জকির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। এদের মধ্যে একজন ছিল খুব স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। তার ঘরের দরোজার সামনে ব্রীচেস পরা অবস্থায় ছোট বেতের ছড়ি হাতে সে যখন দাঁড়িয়ে থাকতো, বেশ আকর্ষণীয় মনে হত। লোকটির নাম ছিল গোলাম নবী।

সে আমাদের কাছে ঘোড়ার কথা বলতো, ঘোড়ার মসৃণ শরীরের কথা বলতো, এবং ঘোড়া যে একজন মানুষকে কতো বিচিত্র উপায়ে আনন্দ দিতে পারতো তার ব্যাখ্যান করতো। সে আরো বলতো যে সে যেসব ঘোড়ায় চড়েছে, সেসব ঘোড়া তাকে কখনো ভুলতে পারে না, সে কাছে গেলেই ঘোড়াগুলো ডেকে ওঠে। মাঝে মাঝে আমি আবার আমার এক বন্ধুর বিমাতাকে সঙ্গে নিয়েও বেড়াতে যেতাম। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তার খুব মেদবহুল শরীর ছিল। তাই ডাক্তার তাকে নিয়মিত হাঁটার উপদেশ দিত। তিনি গাড়ি করে রমনায় আসতেন। পরে গাড়িটা এক জায়গায় রেখে কিছুদূর হেঁটে আবার গাড়ি করে বাড়ি ফিরে যেতেন। সঙ্গে কোনো কোনো দিন আমাকে নিতেন কিংবা আমার বন্ধুকে। যেদিন আমরা থাকতাম না সেদিন তার এক ভাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতেন। এক অধ্যাপকের যুবতী পত্নীও কখনো কখনো তার সঙ্গে থাকতো। একদিন আমরা রেসকোর্সের পিছন দিক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। তখন গোলাম নবী রাস্তার পাশে তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। গোলাম নবী আমাকে এবং আমার বন্ধুকে দেখে মুচকি হাসলো। কিন্তু একটু পরেই লক্ষ্য করলাম তার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে অধ্যাপকের যুবতী পত্নীর উপর। মহিলাও কেমন এক বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই উজ্জ্বল দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী জকির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেদিন মেঘ করেছিল আকাশে। হঠাৎ কয়েক মিনিটের জন্য এক পশলা বৃষ্টি নামলো। আমরা তাড়াতাড়ি রাস্তার বিপরীত দিকে একটি বড় গাছের নিচে আশ্রয় নিলাম। গোলাম নবী তার টিনের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে

www.pathagar.com

লাগলো। এভাবেই আমাদের বেড়ানো চলছিল। এর মধ্যে একদিন অধ্যাপকের স্ত্রী একা আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। আমার ঘটনাটি সুস্পষ্ট মনে আছে। তিনি থাকতেন আরমানিটোলার দিকে কি একটি গলিতে। আমার বন্ধুর আম্মা মাঝে মাঝে গাড়ি পাঠিয়ে তাকে নিয়ে আসতেন এবং তারপর তারা একসঙ্গে বেড়াতে বেরুতেন। সেদিনও আগের নিয়মেই গাড়ি গিয়েছিল কিন্তু মহিলা গাড়ি নিয়ে আমাদের বাসায় চলে এসেছিলেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আমার বন্ধুর বাসায় যাবেন। কিন্তু আমার অবাক লাগলো যখন তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে রেসকোর্সের দিকে গেলেন।

আগের মতো যেখানে গাড়ি রাখা হত সেখানেই গাড়ি রেখে তিনি আমাকে নিয়ে রেসকোর্সের পিছনের দিকে গেলেন। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে তিনি এমনিতেই হাঁটতে যাচ্ছেন। কিন্তু চলতে চলতে তিনি বললেন যে গোলাম নবী জকি তার দেশের লোক, আত্মীয়। তিনি তার কাছে দেশের আত্মীয়স্বজনের সংবাদ আনতে যাচ্ছেন। গোলাম নবীর বাসার সামনে আমাকে তিনি বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে বাড়ির ভেতরে গেলেন। সেখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম মনে নেই, বোধহয় আধঘন্টার মতো। সম্পূর্ণ ব্যাপারটি আমার কাছে অসামাজিক এবং অন্যায় বলে মনে হচ্ছিল। ভদ্রমহিলার অজুহাতটিও আমার কাছে মিথ্যে বলে মনে হয়েছিল। ভদ্রমহিলা যখন এলেন তখন তাকে এক ধরনের আনন্দিত উদ্ভ্রান্ত ব্যতিব্যস্ততায় দেখলাম। এরপর আমরা আমার বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এ ঘটনাটির পর আমি আর তাদের সঙ্গে বেড়াতে যেতাম না, বন্ধুর আম্মা বেশ কয়েকবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু নানা অসুবিধার কথা বলে বলে আমি বেরুইনি। এরপর অনেকদিন গেছে। ঘটনা তখন নতুন কোনো মোড় নিয়েছে কিনা জানি না, জানবার আগ্রহও ছিল না। একদিন রোববার ছুটির দিন সকালে বাসায় ছিলাম এমন সময় সেই অধ্যাপক এবং আমার বন্ধু আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত। হতভম্ব হয়ে শুনলাম যে অধ্যাপকের স্ত্রী আগের দিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন এবং পরের দিন সকালেও বাসায় ফেরেন নি। অধ্যাপক জানালেন যে তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছিল এবং এক পর্যায়ে সেই মহিলা ক্রুদ্ধ হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

আমি একটি কথা এখনো বলি নি তা হচ্ছে যে এই অধ্যাপকের বাড়িতে আমি এবং আমার বন্ধু প্রায়ই যেতাম। সেখানে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ চলছে দেখতাম। অধ্যাপক সংস্কৃতিমনা লোক ছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের কলেজে নিয়ে নাটক করাতেন, গানবাজনার আসর জমাতেন। তার স্ত্রী এটা কখনো পছন্দ করতো না। অধ্যাপকের বাইরের পৃথিবীর উচ্ছ্বাসের মধ্যে তার স্ত্রীর কোনো স্থান ছিল না। তা ছাড়া মহিলাটি চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন এবং বাইরের পৃথিবীর স্বাদগন্ধ অনুভব করার বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। যাই হোক সেদিন অধ্যাপক আমাকে বললেন, তোমাদের নিয়ে তো উনি প্রায়ই বেড়াতে যেতেন সুতরাং তোমরা হয়তো খোঁজ পেতে পারো, কোন বাড়িতে উনি গিয়েছেন। আমার বন্ধুর একটি ছোট সাইকেল ছিল। আমরা দুজন সেই সাইকেলে করে জকি গোলাম নবীর বাড়িতে উপস্থিত হলাম। আমরা আগেই ঠিক করেছিলাম যে কোনরূপ সাড়াশব্দ না করে আমরা সরাসরি বাড়িতে ঢুকে যাবো। আমরা তাই করলাম। ভেতরে গিয়ে দেখি ভেতরকার একটি ঘরের বারান্দায় ভদ্রমহিলা মোড়ায় বসে আছেন এবং বাড়ির

www.pathagar.com

ছোট্ট উঠানে একটা ভাঙ্গা কাঠের ঘোড়ার উপর জকি বসে আছে। কি করে ভদ্রমহিলাকে সেদিন আমরা তার বাড়িতে ফেরত এনেছিলাম সে এক ইতিহাস। প্রথমে তাকে আমার বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল এবং তার পরে কি করে তার স্বামীর কাছে ফেরত গেলেন সে এক বিচিত্র ইতিহাস।

গোলাম নবীর সঙ্গে পরেও আমাদের দেখা হয়েছে। সে যে ঘোড়াটায় প্রায়ই চড়তো সেটার নাম সে জানিয়েছিল লাল বাহাদুর। তার কাছে শুনেছি যে রেসের রাজ্যে নানারকম ঈর্ষা ষড়যন্ত্র এবং কুচক্র থাকে। যেই জকি ঘোড়াকে ঠিক মতো চালিয়ে প্রথম স্থানে নিয়ে যেতে পারে সেই জকিকে জব্দ করার জন্য অন্য জকিরা ষড়যন্ত্র করে। গোপনে তার ঘোড়াকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেবার চেষ্টা হয়। আবার ঘোড়ার পিঠে অতিরিক্ত ওজন চাপানোর ষড়যন্ত্রও হয়ে থাকে। এগুলো কিছুই আমরা বুঝতাম না। তবে এটা বুঝতাম যে গোলাম নবীর নিজস্ব একটা পৃথিবী আছে এবং সে পৃথিবীর নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে। শেষ পর্যন্ত গোলাম নবীর কি হল আমি জানি না, শুনেছিলাম সে রেসের রাজ্যে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিল। তার ঘোড়ার পায়ে যে লোহার নাল ছিল, সেই নালটি বাঁকা থাকায় দৌড়ের সময় ঘোড়াটি হোঁচট খায় এবং গোলাম নবী গোড়ার পিঠ থেকে পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলে।

কি করে বাবা যেন জানতে পেরেছিলেন যে আমি দু-একবার ঘোড়দৌড় দেখতে গিয়েছি। তিনি বিশেষ কিছু বলেন নি। শুধু বলছিলেন, রেস হচ্ছে অর্থোপার্জনের একটি পাপ পথ। এটি এক ধরনের জুয়া খেলা। এই জুয়া খেলায় আমাদের দেশে অনেক লোক সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে। বাবা আরো বলেছিলেন যে এই জুয়ার টাকা দিয়ে খৃস্টানদের গির্জা পরিচালিত হয়। আমি অবশ্য জুয়া খেলার ব্যাপারটা জানতাম না। আমি শুধু কৌতূহল এবং আগ্রহে ঘোড়াগুলোর দ্রুত ধাবমানতা উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ্য করতাম।

॥১৬॥

সৌন্দর্য শব্দটির যথার্থ তাৎপর্য কি? কলেজ জীবনে আমার যে বয়স তখন এ প্রশ্নটা আমার মনে উত্থাপিত হয়েছে। দার্শনিক তাৎপর্যে উত্থাপিত হয়েছে একথা বলবো না, কিন্তু একটা আনন্দ এবং শোভার বিকাশ হিসাবে অবশ্যই উত্থাপিত হয়েছিল। মানুষের স্বাস্থ্যবান শরীর, রমণীর দেহসৌষ্ঠব, পত্রভারে সমাচ্ছন্ন বৃক্ষরাজি, কল্লোলিত নদী, সবই আমার দৃষ্টিতে সুন্দর লাগতো। বিশেষ করে আকাশে যখন মেঘ জমতো এবং নানা রকম আকৃতি গঠন করে আকাশের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতো তখন এগুলোর মধ্যে আমি সৌন্দর্যের উৎস সন্ধান করতাম। কালবৈশাখীর বিপুল বেগ এবং সমাচ্ছন্ন অন্ধকারের দ্রুত ধাবমানতা আমাকে বিহ্বল করতো। বাতাসে ধুলো উড়তো, গাছের শুকনো পাতা উড়তো, গাছের ডালে শব্দ হত এবং পাখিগুলি আর্তস্বরে পলায়নপর হত, তখন মুহ্যমান ভূখন্ডের যে চিত্র আমার সামনে উদ্ভাসিত হতো তা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না। এদেশে আমাদের জীবন হচ্ছে বৃষ্টির ঝড় এবং প্রলয়োল্লাসের জীবন। আমার কৈশোরে এ জীবনের মধ্যে জেগে উঠতে চেয়েছি। তাই বিপুল বিপর্যয়কে আমি দৃষ্টির তাৎপর্যে প্রবহমান করতে চাইতাম।

অনেকদিন পর্যন্ত গোলাম নবী জকি এবং অধ্যাপকের পত্নী আমার চিন্তাকে আলোড়িত করেছিল। এ দেশের প্রকৃতির উদ্দামতার সঙ্গে তাদের প্রণয়ের একটি সম্পর্ক

www.pathagar.com

ছিল আজ আমার মনে হয়। যখন অপরিচিত তারা প্রথম একে অন্যের দিকে দৃষ্টি মেলেছিল তখন এক পশলা বৃষ্টি নেমেছিল আমি বলেছি। মেঘ এবং বৃষ্টি আঁচলের আড়ালে দৃষ্টির উদ্ভাসনটি একটি বিচিত্র আর্তস্বর সেদিন বহন করেছিল বলে আমার মনে হয়। সেদিন সৌন্দর্য ছিল বৃষ্টির এবং সেই সৌন্দর্যের সঙ্গে মানুষের সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা মিলিত হয়েছিল তখন হয়তো আমার ঘটনাটি খুব ভালো লাগে নি। কিন্তু আজো সে ঘটনাটি ভুলতে পারি নি তাতে মনে হয় আমি সেদিন থেকে আমার চিত্তের প্রকোষ্ঠে সম্পূর্ণ ঘটনাটি লালন করেছিলাম। তবে সেদিন যদি বৃষ্টি না হত, তাহলে কোনো গতি আমি দেখতাম না, কোনো ইচ্ছার প্রকাশ আমি দেখতাম না এবং সমস্ত জিনিসটা এক প্রকার বিকারে হয়তো পরিণত হত।

প্রকৃতি মানুষের জীবনকে নানাভাবে সমর্থন করে, উদ্ভাসিত করে। আমরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে চিরদিন এ পৃথিবীতে বাস করি। যারা মরুভূমিতে বাস করে তারা আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় স্নিগ্ধতা এবং শীতলতা নির্মাণ করে গৃহের অভ্যন্তরে বাস করে এটা ঠিক কিন্তু তবু কখনো কখনো তারা তাঁবু খাটিয়ে মরুভূমির মধ্যে বাস করতে চায় এবং মরুভূমির উষ্ণতা এবং নির্জনতার স্বাদ না পেলে তারা অস্থির হয়। পাহাড়ী অঞ্চলে এরকম অনেক লোক আছে যারা প্রতিদিন সকাল বিকেল পাহাড় বেয়ে ওঠে। অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কিত রেখে বাঁচতে চায়। আমি দেখেছি আমার জীবনে নদী এবং বৃষ্টি অনেক আবেগ সৃষ্টি করেছে। আমি নদী এবং বৃষ্টির উচ্ছলতার মধ্যে বড় হয়ে উঠেছিলাম।

আমরা পৃথিবীকে আমাদের দৃষ্টির তাৎপর্যে নির্ণয় করি এবং এই দৃষ্টির সাহায্যে পৃথিবী আমাদের অন্তরতম হয়। শৈশব থেকেই দৃষ্টির কুশলতায় আমি আমার গ্রামের বাড়ির চতুর্দিকে পানি দেখেছি। আমাদের বাড়িটি মাটির ওপর একটি দ্বীপের মতো, কিন্তু তার চারদিকে পানি অর্থাৎ পানি এবং মাটি এই দুই বিপরীত শোভার মাঝখানে মানুষ। আমি শৈশব থেকেই পানির বাধা না মেনে পানির মধ্যে ভেসেছিলাম। নদী যে প্রবাহিত হয় সে কিন্তু মাটির মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয় অর্থাৎ নদী মাটিরই একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু। বড় হয়ে সমুদ্র দেখেছি এবং সমুদ্রের মধ্যে এক ধরনের অনাশ্রয় লক্ষ্য করলেও সমুদ্রকেও আমি কামনা করেছি। পৃথিবীতে যদিও মনে হয় মৃত্তিকাই স্থির এবং পানি হচ্ছে অস্থির চঞ্চল কিন্তু আসলে কথাটি ঠিক নয়। মৃত্তিকাকে স্থির মনে হয় বটে কিন্তু মৃত্তিকায় পদচারণকারী মানুষ কিন্তু চঞ্চল। আবার যখন বৃষ্টি নামে প্রচন্ড বাত্যাপ্রবাহ পৃথিবীকে আলোড়িত করে তখন নদীর সঙ্গে পৃথিবীর সাজুয্য নির্মিত হতে দেখি। বিঘ্নের কাছে মানুষ কখনো মাথা নত করে নি তাই সর্ববিধ বিঘ্নকে অতিক্রম করে মানুষ পৃথিবীতে তার সভ্যতা নির্মিত করেছে। অনবরত ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে স্থাণুকে বিপর্যস্ত করে পৃথিবীতে মানুষ নিজের সম্ভ্রম এবং সমৃদ্ধি অর্জন করেছে।

আমি সুস্পষ্টভাবে কবিতা লেখায় আত্মনিয়োগ করেছিলাম ১৯৪০-এর দিকে, যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছি। কিন্তু তার পূর্বে আমার জীবনে নানা কর্মকান্ডের বৈচিত্র্যে কবিতার পটভূমি নির্মিত হচ্ছিল। বাড়িতে ফার্সী কবিতা বাবার সুললিত কণ্ঠের আবৃত্তির মধ্য দিয়ে আমার মনোজগতে প্রবেশ করতো। স্কুল-কলেজে রবীন্দ্রনাথের

www.pathagar.com

কবিতা আমাকে নতুন জীবনবোধে সচকিত করতো এবং আমার চতুর্দিকের প্রকৃতিকে আমার বিশ্বাসের প্রকোষ্ঠে টেনে আনত। একজন মানুষের জীবনে কবিতা খুব সহজে নির্মিত হয় না। অনেক প্রস্তুতির পর কবিতার একটি ধারাপ্রবাহ গড়ে ওঠে। আমাদের দেশে আমাদের প্রকৃতি কবিতার এই ধারাপ্রবাহ নির্মাণে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশের মূলে প্রকৃতি একটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। মানুষের অন্তর এবং বাহির বলে দুটি জিনিস আছে। অন্তরের রহস্য না বুঝলে বাস্তব কখনো সত্য হয় না। কল্পনা এবং বাস্তব একে অন্যের পরিপূরক।

জীবনের বহির্দৃশ্যগুলি সত্যের ভগ্নাংশমাত্র। অন্তরের দৃশ্যগুলি তার সঙ্গে সংযোজিত হলেই পূর্ণ সত্যকে পাওয়া যাবে। আমাদের সকল অভিমত নির্মিত হয় আমাদের অন্তরের কল্পনা ও বাইরের বাস্তবের যোগসূত্রে। আমরা কখনোই অন্তরের উপলব্ধিকে অস্বীকার করে বাইরের পৃথিবীকে সমর্থন করতে পারি না। বাইরের পৃথিবী তখনই সমর্থিত হয় যখন অন্তরের উপলব্ধি বাইরের বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত হয়। পৃথিবীতে যত কিছু নির্দিষ্ট ততোধিক অনির্দিষ্ট। নির্দিষ্ট জগতে প্রথা এবং প্রণালী আছে এবং অনির্দিষ্ট জগতে আবেগ এবং কল্পনা আছে। আমাদের সকল প্রকার শিল্প প্রয়াস যেমন আবেগ এবং কল্পনার বশংবদ তেমনি প্রথা ও প্রণালীর বশংবদ। আমরা সাহিত্য যখন নির্মাণ করি তখন বহির্জগতের প্রতিলিপি অংকন করি না, মনোজগতের স্মৃতির আলেখ্যও নির্মাণ করি। এ দুয়ের সংমিশ্রণ না থাকলে শিল্প মিথ্যা ও ভঙ্গুর হয়ে যায়। কবিতা ও চিত্রকলা রচয়িতা বাস্তবের কাছে যতটা ঋণী তার চেয়ে অধিক ঋণী তার স্মৃতি ও কল্পনার কাছে। বাস্তবকে কল্পনা থেকে সরিয়ে আনলে অথবা কল্পনাকে বাস্তব থেকে সরিয়ে আনলে শিল্প হয় না। কলা লালিতা হচ্ছে বাস্তব এবং কল্পনার সমন্বয়ে। বসন্তে আমরা সবুজ পাতা দেখি শরতের মেঘের সাদা রং আমাদের অভিভূত করে, বর্ষার মেঘ লঘুহীন হয়ে দৃষ্টিতে জাগে, এবং মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণ চাঁদের রৌপ্য শোভা দেখি। এগুলো যেমন সত্য তেমনি সত্য মানুষের জীবন, যে জীবন শীতে আহত হয়, রৌদ্রে দগ্ধ হয় এবং বঞ্চনায় উৎপীড়িত হয়। পৃথিবীর এই মানুষ যখন শিল্পী হয় তখন সে তার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জীবন সত্যে অপরাজিত প্রতিনিধি হয়।

কোনটি সুন্দর এবং কোনটি সুন্দর নয় তা বলা কঠিন। কিন্তু তবু মনে হয় প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব উপলব্ধির কাছে সুন্দর অসুন্দরের একটি হিসাব ঠিক করা আছে। আমার হিসাবে যা সুন্দর অন্যের হিসাবে তা সুন্দর নাও হতে পারে। কিন্তু আমি আমার সুন্দরকে যদি যথার্থরূপে প্রকাশ করতে সমর্থ হই তাহলে অন্যের বিবেচনায়ও তা সমর্থিত হবে। আমি আমার শৈশব কৈশোর এবং যৌবন উন্মেষের সময় প্রকৃতির বিচিত্রতার মধ্যে সুন্দরকে যেভাবে দেখেছি তাকেই আমি আমার বিশ্বাসের প্রক্রিয়ায় জীবন্ত করেছি। আজ বহু দূরে দাঁড়িয়ে বর্তমান সময়ের নেপথ্যে অতীতের যে অনবদ্য প্রকাশ ছিল তাকে উদঘাটন করতে গিয়ে দেখি যে আমার জীবন তার বিশ্বাসকে সে সময়ই প্রথম পেয়েছিল। পরবর্তীতে প্রথম জীবনের বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করবার ভাষা পেয়েছিমাত্র। প্রকৃতির সত্য এবং মানুষের প্রেম উভয়ের মিশ্রিত আনন্দে জীবনকে এককালে আমি কলরবমুখর করেছিলাম। সেই জীবনের শাসন এবং অবস্থিতি এখন আর নেই, কিন্তু

www.pathagar.com

স্মৃতিগত তাৎপর্য আছে। সময়ের পদক্ষেপে অতীতকে নতুন করে নির্মাণ করা না গেলেও তাকে জাগ্রত করা যায় এবং নতুন ইচ্ছার পটভূমিও নির্মাণ করা যায়। এখনও বৃষ্টি নামে কিন্তু মনে হয় তখন বৃষ্টি শরীর এবং মনে একটি অদ্ভুত ধরনের শিহরণ নির্মাণ করতো।

॥১৭॥

কবি ইকবালের মৃত্যু হয় ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে। তখন আমি কলেজে সবেমাত্র প্রবেশ করেছি। সে সময় বিভিন্ন পত্রিকায় ইকবালের উপরে কিছু আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলো আমি পড়েছিলাম। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের শোক বক্তব্যটি আমার কাছে ভালো লেগেছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, স্যার মুহম্মদ ইকবালের মৃত্যু আমাদের সাহিত্যে এক শূন্যতা সৃষ্ট করলো এবং মর্মের এ আঘাত ভুলতে যথেষ্ট সময় লাগবে। ভারত, আজকের পৃথিবীতে যার স্থান খুবই ছোট তার পক্ষে বিশ্ববাসীর মনে যার কবিতা অনুভূতি জুগিয়েছিল এমন এক কবিকে হারানো খুবই বড় রকমের ক্ষতি। আমার এখনো মনে আছে খবরের কাগজের পাতায় আমি মহাত্মা গান্ধী, স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, সরোজিনী নাইডু, সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহেরু এঁদের শোকবাণী পাঠ করেছিলাম। সে বছর ঢাকায় ইকবালের মৃত্যুতে অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই হয়ে থাকবে কিন্তু সে রকম অনুষ্ঠানের কথা আমার সুস্পষ্ট মনে পড়ছে না। তবে পরের বছর ১৯৩৯ সালে সম্ভবত এপ্রিল মাসে ইকবালের ওপর বিরাট একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রাঙ্গণে।

আমি উক্ত সভায় শ্রোতৃমণ্ডলীতে উপস্থিত ছিলাম। বক্তাদের মধ্যে শেফাউল মুলক, হেকিম হাবিবুর রহমানের কথা আমার মনে আছে। তিনি অনবদ্য ভাষায় দীর্ঘ একটি বক্তৃতা করেছিলেন। উক্ত বক্তৃতায় ইকবালের শেকওয়া কবিতা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছিলেন। শেকওয়া কাব্যগ্রন্থে আল্লাহর প্রেমে প্রেমিক এক মুসলমান পৃথিবীতে মুসলমানদের দুর্গতি লক্ষ্য করছে এবং মানসিকভাবে বিপন্ন বোধ করছে। সে ধর্মহীন সমাজভুক্ত মানুষের পার্থিব সমৃদ্ধি লক্ষ্য করছে এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের নির্যাতিত অবস্থা লক্ষ্য করে বিভ্রান্ত হচ্ছে। সে বলছে এটা কি রকম অবস্থা যে এ পৃথিবীতে মুসলমানদের কোনো সম্ভ্রম নেই এবং সমৃদ্ধির কোনো আশ্বাস নেই অথচ অমুসলমানগণ ক্রমশ সমৃদ্ধির শিখরে উঠছে। মুসলমানদের এ অবস্থা দেখে মন্দিরের মূর্তিরা নিশ্চয়ই বলে, ভালোই হল পৃথিবী থেকে মুসলমান অন্তর্ধান হচ্ছে, কাবা ঘরের প্রহরীরা আর এখন নেই এবং যারা উটের গান গাইতো, এক সময় তারা তাদের কোরান শরীফ বন্ধ করে চলে গেছে। সে জন্য অভিমানী প্রেমিক বিশ্বপ্রভুকে প্রশ্ন করছে এ কি রকম বিচার যে হে বিধাতা তোমাকে যারা স্বীকার করে না এ পৃথিবীতে তাদেরই ভাণ্ডার ধনরত্নে পরিপূর্ণ, তারাই এ পৃথিবীতে হুর ও দৌলত পায় আর মুসলমানরা পায় শুধু সমৃদ্ধির অঙ্গীকার। সে জন্য সে বলছে যেহেতু হে বিধাতা আমি তোমার সেবক তাই আমার ক্ষোভের কথাও তোমাকে শোনাতে চাই। তোমার ভক্ত বান্দা আজ তোমার কাছে নালিশ করছে। যার স্বভাব ছিল স্তব করা। সে আজ নিন্দাবাণী উচ্চারণ করছে।

অনবদ্য কণ্ঠে হেকিম হাবিবুর রহমানের আবৃত্তি শ্রোতৃমণ্ডলীকে তন্ময় করে রেখেছিল। কলেজে আমার শিক্ষক কাজী আবদুল ওদুদ ইকবালের কথা প্রায়ই বলতেন

www.pathagar.com

এবং ইকবালের বিভিন্ন কবিতা থেকে আবৃত্তি করে শোনাতেন, দুটি লাইন তিনি মাঝে মাঝে আবৃত্তি করতেন ঃ

'পত্থর কী মূরতোঁ মে সমঝা হায় তু খুদা হায়/খাক ওঅতন কা মুঝকো হর যর্র ঃ দেওতা হায়।'

অর্থাৎ হে ব্রাহ্মণ, তুমি ভাবছো যে পাথরের মূর্তিতে খোদা আছেন কিন্তু আমার কাছে স্বদেশের ধূলিকণাই হচ্ছে দেবতা। ইকবালের একটি কবিতার অনুবাদ সে সময় মাসিক মোহাম্মদীতে বেরিয়েছিল সেই কবিতাটি হচ্ছে তারাই মিল্লী ঃ

'চীন ও আরব হামারা, হিন্দু
স্তাঁ হামারা,/মুসলিম হাঁয় হাম
ওঅতান হায় সারা জাহাঁ
হামারা।/তৌহিদ কী আমানত
সীনো মেঁ হায় হামারে/আসাঁ
নহী মিটানা নাম ও নিশাঁ
হামারা।'/

অর্থাৎ চীন এবং আরব আমাদের, হিন্দুস্থানও আমাদের। আমরা মুসলমান, আমাদের জন্মভূমি হচ্ছে সারা পৃথিবী। আমরা আমাদের বক্ষে তৌহিদ বা একাত্মবাদের সাক্ষ্য বহন করছি। সুতরাং এ ভূমণ্ডল থেকে আমাদের চিহ্ন মুছে ফেলা দেয়া সহজ নয়। মাসিক মোহাম্মদী ইকবালের ওপর তখন একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। সেখানে 'মুনাজাত' বলে আর একটি কবিতার অনুবাদ ছিল। উক্ত কবিতার প্রথম চারটি চরণ হচ্ছে ঃ

'য়া রব! দিলে মুসলিম কে
ওহ যিন্দহ তমন্না দে, /জো
কলব কো গরমা দে, জো রূহ
কো তড়পা দে।/ফির ওআদীত
ফাঁরা কে হর যর্রে কো চমকা
দে,/ফির শওকে তমাশা দে, ফির
যওকে তকাযা দে।'/

অর্থাৎ হে প্রভু, মুসলমানদের চিত্তে জীবন্ত একটি ইচ্ছা উদ্ভাসিত করো। এবং সে ইচ্ছায় তাদের হৃদয়কে উষ্ণ করো এবং মৃত আত্মাকে সজীব করো, ফারানের মৃত্তিকা কণাকে সূর্যের আলোতে উজ্জ্বল করো। তাকে কৌতূহলী করো এবং তার চিত্তে সন্ধানের ইচ্ছা উদ্দীপ্ত করো।

মাসিক মোহাম্মদীর সে সংখ্যাটি আমার কাছে নেই, অনুসন্ধান করেও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। আমি স্মৃতি থেকে যা এখনো নির্মাণ করছি তাতে কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। উক্ত সংখ্যায় কবি অমিয় চক্রবর্তীর একটি অসাধারণ আলোচনা ছিল ইকবালের ওপর। কবি অমিয় চক্রবর্তী সে সময় একমাত্র বাঙ্গালী হিন্দু লেখক যিনি ইকবালকে বাঙ্গালীর কাছে যথার্থ গ্রহণযোগ্যরূপে উপস্থিত করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এবং ইকবালের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন।

www.pathagar.com

অনেক পরে যখন অমিয় চক্রবর্তী স্থায়ীভাবে মার্কিন প্রবাসী তখন এক উপলক্ষে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমি তার কাছে ইকবাল সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি আধুনিক ভারতের প্রজ্ঞার বিভূষণ বলে ইকবালকে চিহ্নিত করেছিলেন বলে আমার মনে আছে। তিনি ভাই বীর সিং বলে আর একজন পাঞ্জাবী কবির সম্পর্কেও কিছু বলেছিলেন, তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন যে বাঙ্গালী মানস যদি অতি সহজেই ইকবালের ভাবধারা বুঝতে সক্ষম হত তাহলে ভারতের হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন ঘটতো।

অমিয় চক্রবর্তী আর একটি কথা বলেছিলেন যে ইকবাল নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসী ভাবতেন এবং নিজেকে ব্রাহ্মণের সন্তান বলে গর্ব করতেন। তিনি ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে ব্রাহ্মণ, আমি বলি না যে তুমি তোমার প্রতিমার প্রতি বিরক্ত হও, তুমি যদি যথার্থ হিন্দু হয়ে থাকো তাহলে তুমি তোমার উপবীতের উপযুক্ত হও, হে প্রাচীন সভ্যতার আমানতদার তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের পথ থেকে পশ্চাৎপদ হয়ো না। ইকবালের কবিতা বাংলা কাব্যধারায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার না করলেও যে সময়ের কথা বলছি সে সময়কালে ইকবালের বাণী বাঙ্গালী মুসলমানের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করেছিল। শেকওয়ার অনেকগুলো অনুবাদ সে সময় হয়েছে, অন্যান্য কবিতারও খণ্ড ক্ষুদ্র অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং একজন মুসলমান তরুণ কবি ইকবালের ভাবধারায় প্রভাবিতও হয়েছিলেন, তিনি আশরাফ আলী খান। তিনি শেকওয়ার অনুবাদ করেছিলেন এবং 'কঙ্কাল' বলে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'কঙ্কাল' কাব্যগ্রন্থে ইকবালের প্রথম দিককার সমাজ সচেতনতার প্রভাব আছে। মুহম্মদ সুলতান বলে আর একজন কবি শেকওয়ার অনুবাদ করেছিলেন। আর একজনের অনুবাদ মাসিক মোহাম্মদীর বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত তার নাম খলিলুল্লাহ, আমি ঠিক যথার্থভাবে স্মরণ করতে পারছি না। তিনি মরহুম প্রফেসর এ বি এম হাবিবুল্লাহর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, এটুকু পরে জেনেছি।

কবি ইকবাল হিন্দু এবং মুসলমান উভয়কেই তাদের সংকীর্ণ বন্দিদশা থেকে মুক্ত হতে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর একটি কবিতায় তিনি বলছেন ঃ

বুতখানে কে দরওআযহ পে
সোতা হায় বরহ মন, তকদীর
কো রোতা হায় মুসলমাঁ তহে
মিহরাব। মশরিক সে হো বেযার
না মগরিব কে হযর কর, ফিতরত
কা ইশারহ হায় কে হর শব কো
সহর কর।'

অর্থাৎ বুতখানার দ্বারপ্রান্তে ব্রাহ্মণ শুয়ে আছে এবং মসজিদের মিহরাবের নিচে মুসলমান নিজের ভাগ্য নিয়ে বিলাপ করছে। প্রাচ্যকে অস্বীকার করো না পাশ্চাত্যকেও নয়। প্রকৃতির ইঙ্গিতে প্রতিটি রাত্রি যেমন প্রভাত হয় তেমনি তুমি তোমার অন্ধকার দূর করে আলোতে জাগরিত হও।

আমার কাব্যকর্মের সূত্রপাতে ইকবালের প্রভাব কিছুটা এসেছিল কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। কিছুটা এই অর্থে যে, ইকবাল যে অর্থে ইসলামের মূল প্রজ্ঞায় প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রত্যেক

www.pathagar.com

মুসলমানকে নির্দেশ দিয়েছেন আমিও আমার চল্লিশের দশকে কয়েকটি কবিতায় ইসলামের প্রথম যুগের সৌরভের কাছে আত্মসমর্পণের কথা বলেছিলাম।

আমার বাবা ফার্সী কবিতা পাঠ করতেন সব সময়ই। তাঁর কাছে কিন্তু ইকবাল বিশেষ আকর্ষণীয় কবি ছিলেন। বাবা ফেরদৌসী, হাফিজ এবং রুমীর ভক্ত ছিলেন। তিনি 'শাহনামা' পড়ে আমাদের শোনাতেন, কখনো রুমীর মসনবীর কিছু উপাখ্যান পাঠ করে আমাদের বুঝিয়ে দিতেন। ইকবাল সম্পর্কে তাঁর বিপুল কোনো উৎসাহ ছিল না। আমাকে তিনি বলতেন যে ফেরদৌসী, হাফিজ এবং রুমীর কাব্যে এত বিচিত্র রত্নভাণ্ডার রয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে ইকবালের প্রতি মনোনিবেশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ বাবার চিন্তায় এবং অনুভূতিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যধারা এমনভাবে ওতপ্রোত ছিল যে তিনি তাকে এড়িয়ে বর্তমান সময়ে পদক্ষেপ করতে পারতেন না।

॥১৮॥

বাংলা কবিতায় ভারতের অন্যান্য ভাষার কাব্যকলার প্রভাব প্রায় নেই বললেই হয়। বহু প্রাচীনকালে যখন একই প্রবৃত্তির ভাষা সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল তখন বিভিন্ন অঞ্চলের রচনায় একটি ভাবাদর্শের ঐক্য লক্ষ্য করা গিয়েছে এটা ঠিক, কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিবর্তনগুলো ক্রমশ প্রকট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমাবন্ধন তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাব্যস্বভাবের পরিবর্তন সূচিত হল। তাই মধ্যযুগে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্বভাবের কবিতা লক্ষ্য করি। তবে পারস্পরিক যোগসূত্র ছিল। হিন্দী কাব্য বাংলায় অনুবাদ হয়েছে, তেমনি ফার্সীও। আবার কিছু কিছু বাংলা কবিতাও যে ভারতের অন্যান্য ভাষায় রূপান্তরিত হয় নি, তা বোধহয় নয়। তবে আধুনিক কালে প্রতিটি ভাষায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিপুল হওয়ার ফলে বিভিন্ন ভাষার পারস্পরিক সম্পর্কটা লঘু হয়ে পড়েছে। অধিকন্তু কাব্য প্রক্রিয়ার বহুলতার জন্যও কোনো একটি অঞ্চল অন্য অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল নয়। ইকবালের কবিতা যখন উত্তর ভারতে খুবই খ্যাত এবং পঠিত তখন তার বঙ্গভূমিতে কিছুসংখ্যক লোকের কাছে পঠিত হলেও বাঙ্গালী কাব্য সাধকদের কাছে ইকবালের বিশেষ কোনো প্রেরণা ছিল না।

আমার কলেজ জীবনকালে বেনজীর আহমদের কয়েকটি কবিতা আমি মাসিক মোহাম্মদীতে পড়েছিলাম। সেসব কবিতায় ইকবালের খুদীবাদ বা আত্মপ্রত্যয়ের প্রভাব লক্ষ্য করেছিলাম। ঠিক তখন যে লক্ষ্য করেছি তা নয় আরো পরে এই লক্ষ্যটা স্পষ্ট হয়েছে। বেনজীর আহমদের কবিতার একটি চরণ আমার এখনও মনে আছে– 'আমি আছি, বিশ্ব আছে, রক্তে রক্তে মুক্তি নাচে। মৃত্যু কোথা বল?' এই চরণটি ইকবালের খুদীতত্ত্বের ভাবের একটি অনুরণন বহন করে বলে আমার মনে হয়। বেনজীর আহমদ, আশরাফ আলী খান এঁরা ইকবালের কবিতা পাঠ করেছেন সুতরাং ইকবালের প্রভাব কিছুটা এঁদের উপর থাকবে এটা স্বাভাবিক। সে সময় ফজলুর রহমান বলে একজনের কবিতা মাসিক মোহাম্মদীতে খুব প্রকাশিত হত। ইনিও কিছু রুবাইয়াতের ঢঙে কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। এ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কখনো সাক্ষাৎ হয় নি। ইনি দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রাদেশিক মন্ত্রীও হয়েছিলেন। কাব্যকর্মে ইনি আর অগ্রসর থাকেন নি।

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সী ও উর্দু বিভাগের একজন অধ্যাপক ছিলেন তাঁর নাম ডঃ আন্দালীব শাদানী। এর প্রশংসা বাবার মুখে আমি খুব শুনতাম। ইনি অবাঙ্গালী ছিলেন এবং উর্দু ভাষার একজনা খ্যাতনামা কবি ছিলেন। ঢাকা শহরের বিভিন্ন সাহিত্য অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকতেন। একবার আমাদের কলেজেও এসেছিলেন এবং কবি ইকবালের উপর তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু এতদিন মনে থাকার কথা নয়, মনেও নেই। কিন্তু তাঁর সুললিত কণ্ঠে ইকবালের কিছু কবিতার আবৃত্তি আজো আমার কানে বাজছে। তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন 'হুদী' নামে। হুদী হচ্ছে উটচালকের গান। অত্যন্ত ক্ষিপ্ত দ্রুতলয়ের কবিতাটি ফার্সী ক্ল্যাসিক্যাল ঢঙে রচিত।

অন্ধকার রাত্রে মরুভূমিতে একমাত্র চাঁদের স্বাক্ষর নিয়ে উটের কাফেলা যখন এগিয়ে চলে এই কবিতাটিতে সেই এগিয়ে চলার বর্ণনা আছে। কবিতাটির প্রতি স্তবকের শেষে একটি বিশেষ চরণ বারবার করে এসেছে। সেই চরণটি হচ্ছে, 'মঞ্জিলে মা দূর নিস্ত' অর্থাৎ আমার মঞ্জিল আর দূর নয়। গোলাম মোস্তফা এর অনুবাদ করেছেন, দূর নহে পথ মঞ্জিলের। ডঃ শাদানী দীর্ঘদেহ সুপুরুষ ছিলেন। অত্যন্ত রসিক ছিলেন। আমরা তাঁকে নিয়ে বেশ কিছুটা সময় মেতে উঠেছিলাম। পুরোপুরিভাবে না হলেও উর্দু কাব্যধারার সঙ্গে আমার কিছুটা পরিচয় কলেজ জীবনে ঘটে। স্কুল জীবনে, ঠিক স্কুলে নয় বাড়িতে উর্দু পড়েছি, এবং উর্দুর উপর আমার ভালো অধিকারই ছিল।

সে সময় উর্দু কিতাবে শিশুদের প্রার্থনাসূচক একটি কবিতা পাঠ করেছিলাম। কবিতার প্রথম লাইনটি মনে আছে-'লাপপা আতী হ্যায় দোয়া বনকে তামান্না মেরী।' আমার সাংস্কৃতিক পরিবেশে আরবী উর্দু এবং ফার্সী একটি গৃহীত তাৎপর্যে বিদ্যমান ছিল। সে সময় আমি কিছু কবিতা লিখেছিলাম যেগুলোতে উর্দু কবিতার ঐতিহ্য অংশত অনুসৃত হয়েছিল। কিন্তু আমার এ সময়কার কবিতাকে আমি বাংলা কবিতার ধারার সঙ্গে সমন্বিত করতে পারি নি তাই পরে এগুলো আমার চিন্তা এবং আশ্রয়ের বাইরে চলে যায়। আমার পরিবারের ভাষা ছিল বাংলা, সুন্দর পরিশীলিত বাংলা। মা এবং বাবা ফার্সী এবং উর্দু জানলেও তারা আমাদের সঙ্গে বাংলা ভাষায় কথা বলতেন অর্থাৎ একান্তভাবে বাংলাই ছিল আমাদের পারিবারিক এবং সাংসারিক ভাষা। আমাদের বংশের কয়েকটি শাখায় আবার উর্দুর চর্চা ছিল বেশি। ঢাকা শহরে বেচারাম দেউড়ীতে আমাদের বংশের যে শাখাটি বিদ্যমান তারা এখনো উর্দুতে কথাবার্তা বলেন।

বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ঢাকা শহরের সম্ভ্রান্ত রেঈস খান সাহেব আবুল হাসনাত আমার ফুফাতো ভাই ছিলেন। তিনি প্রায় বাবার বয়সী ছিলেন। তাঁর বাড়িতে উর্দুতে কথাবার্তা হত। অবশ্য তিনি আমাদের সঙ্গে বাংলাতেই কথাবার্তা বলতেন। তাঁর বাড়িতে তৎকালীন ঢাকা সমাজে যারা বিখ্যাত ছিলেন তাদের প্রায় প্রত্যহ আগমন ঘটতো। এঁদের মধ্যে শেফাউল মূলক, হেকিম হাবিবুর রহমান এবং সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুরের কথা উল্লেখ করতে পারি। আমি সে বাড়িতে যখনই গিয়েছি তখনই এঁদের সাক্ষাৎ পেয়েছি। এঁরা উর্দুতে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতেন এবং তাঁদের আলোচ্য বিষয় ছিল প্রধানত ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস। আমার ফুফাতো ভাই পারিবারিক সূত্রে পুরনো দিনের বহু সোনা ও রুপার মোহর পেয়েছিলেন। মোহরের উপর নামাঙ্কিত পাঠগুলো তিনি উদ্ধার

www.pathagar.com

করতে জানতেন। সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর এবং হেকিম হাবিবুর রহমানও প্রাচীন মোহরের চর্চা করতেন। এঁদের পারিবারিক সংগ্রহের মোহরগুলো বর্তমানে ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। আবুল হাসনাতের পিতা আবুল খয়রাত সোনারগাঁয়ের জমিদার ছিলেন, তাঁকে আমি দেখি নি। আমি আবুল হাসনাতের মাতা অর্থাৎ আমার ফুফুকে দেখেছি এবং তাঁর স্নেহ পেয়েছি। বেচারাম দেউড়ীতে আমার অন্য একজন ফুফু ছিলেন যার বিয়ে হয়েছিল এক কাশ্মিরী পরিবারে। তাঁর স্বামী একজন সুফী তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। বাবার সঙ্গে ছোটবেলায় আমি প্রায়ই এর কাছে এসেছি। এই পরিবারটি ক্রমান্বয়ে অবাঙ্গালী হয়ে যায়। কাশ্মিরী ফুফার এক মেয়ের বিয়ে হয় আজমীর শরীফে এবং তার সন্তানাদি বর্তমানে আজমীর শরীফেই বসবাস করছে। তবে এই পরিবারের সংস্কৃতির মধ্যে সাহিত্য প্রধান স্থান অধিকার করে নি। এদের সংস্কৃতির প্রধান উপকরণ ছিল ইতিহাস এবং সঙ্গীত। চিত্রকলা ছিল কিনা জানি না তবে গৃহের শোভা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কক্ষে সুন্দর ছবি টাঙ্গানো থাকতো। অন্যদিকে আমার পিতামাতা ছিলেন কাব্যরসিক এবং সাহিত্যপ্রেমিক। আমার পিতামাতার প্রশ্রয়ে আমি সাহিত্যের একটা আনন্দলোকে নিজেকে নিমজ্জিত করেছিলাম।

বাবা গানও পছন্দ করতেন তবে সে গান হচ্ছে মরমী গান। কখনো কখনো আমাদের বাড়িতে গান গাইতে লোকেরা আসতো, বাবা তন্ময় হয়ে তাদের গান শুনতেন। এভাবে আমাদের বাড়িতে কীর্তনও শুনেছি। সে যুগের ধর্মপ্রাণতার সঙ্গে আজকের যুগের ধর্মপ্রাণতার অসম্ভব পার্থক্য। তখন ধর্মপ্রাণতা মানুষকে উদার করতো, সহনশীল করতো এবং সকলকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবার প্রবণতা সৃষ্টি করতো। আমাদের গৃহে আরবী ফার্সী চর্চার প্রবল বিকাশ ছিল। কিন্তু তাই বলে সেখানে কীর্তন অস্বীকৃতি পায় নি। বাবা কীর্তন শুনে তন্ময় হতেন এবং কীর্তনের নিবেদনের মধ্যে আল্লাহকেই খুঁজে পেতেন। কখনো কখনো দেখেছি আমাদের গৃহে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ এসেছেন এবং বাবার সঙ্গে বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমাদের স্কুলের পণ্ডিত প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ আমাদের কলেজেরও শিক্ষক হয়েছিলেন। সদাপ্রফুল্ল দীপ্তিমান পুরুষ ছিলেন তিনি। কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোক তৈরি করতেন এবং হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির বিষয় নিয়ে সংস্কৃত কবিতাও রচনা করতেন। ইনি কখনো কখনো আমাদের বাসায় আসতেন এবং বাবার সঙ্গে ধর্মবিষয়ক তর্কে লিপ্ত হতেন।

আরবী ভাষা এবং লিপির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাতে শিখেছিলাম ছোটবেলা থেকেই। মা এই সূত্রে একটি গল্প প্রায়ই বলতেন। একটি লোক খুব মাতাল ছিল, সে কোন প্রকার ধর্মকর্ম করতো না। সকলেই ভাবতো যে লোকটি পাষণ্ড এবং মৃত্যুর পর দোজখে যাবে। একদিন এই লোকটি মাতাল অবস্থায় তার পথের উপর কোরান শরীফের একটি ছেঁড়া পাতা পড়ে থাকতে দেখে। সে তখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই পবিত্র পত্রাংশ কি করে সে সরাবে। সে তখন মাটিতে উপুর হয়ে মুখ দিয়ে কাগজটি তুলে খেয়ে ফেলে। কিছুদিন পর এই লোকটির মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর অনেকে তাকে স্বপ্নে দেখে। দেখে যে সে বেহেশতের একটি শুদ্ধতম জায়গায় অবস্থান করছে। স্বপ্নের মধ্যেই লোকেরা জিজ্ঞেস করে তার এই সৌভাগ্য কি করে হল? লোকটি উত্তরে বলে যে কোরান শরীফকে

www.pathagar.com

মর্যাদা দেওয়ার জন্যই তার এই সৌভাগ্য হয়েছে। এই গল্পটা বলে মা আমাদের বোঝাতেন যে কোরান শরীফ যেহেতু আল্লাহর বাণী সেহেতু কোরানের অক্ষরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা আল্লাহর প্রতিই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। সর্বাপেক্ষা সত্য হচ্ছে এই আল্লাহর বাণী এবং সর্বাপেক্ষা নিগূঢ়তম কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা।

আল্লাহকে স্মরণ রাখা আমাদের পবিত্রতম দায়িত্ব। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান বর্ণনা হচ্ছে কোরান শরীফের বর্ণনা। এই বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার আবেশের মধ্যে আমরা আমাদের শৈশব এবং কৈশোর কাটিয়েছি, এবং যৌবন উন্মেষের মুহূর্তে বিভিন্ন চাঞ্চল্য থেকে নিজেকে রক্ষা করতে প্রয়াসী হয়েছি। আরবী অক্ষর এবং আরবী ভাষা ছিল আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা পবিত্র। কিন্তু তাই বলে মাতৃভাষাকে আমরা অবহেলা করি নি। বরঞ্চ আরবীর সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি আমরা সমভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলাম। আমাদের পরিবারে দুটি শাখার একটি ছিল ফরিদপুরের গেরদায় এবং অন্যটি যশোরের আলোকদিয়ায়। অন্যান্য শাখা প্রশাখাও ছিল বরিশালে এবং ঢাকায়। গেরদা এবং আলোকদিয়ার শাখা দুটিতে মাতৃভাষার চর্চা ছিল অত্যধিক। আমার দাদা, চাচা এবং বাবা এঁরা ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন বাংলাতে এবং গ্রামে তাঁরা যে স্কুল এবং মাদ্রাসা কায়েম করেছিলেন সেখানেও তাঁরা মাতৃভাষা চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। সে যুগে ভাষা নিয়ে কোনো তর্ক ছিল না।

হিন্দুরাও মুসলমানদের ধর্মসভায় উপস্থিত থাকতেন এবং কোরান শরীফের ব্যাখ্যা উপভোগ করতেন। বর্তমানে আমি লক্ষ্য করি যে যেখানে জ্ঞানের ব্যাপকতা নেই গভীরতা নেই, সেখানেই সংকীর্ণতা এবং স্বার্থবুদ্ধি প্রবল হয়ে ওঠে। রসূলে খোদার জীবনের অনেক কাহিনী বর্ণনা করে বাবা মাঝে মাঝে বলতেন যে তিনি বিধর্মীর কাছ থেকে এবং শত্রুর কাছ থেকেও জ্ঞানের পাঠ নিয়েছেন। তাঁর কাছে জ্ঞানের একটি অনিবার্যতা ছিল। তিনি সকল ক্ষেত্র থেকেই জ্ঞান আহরণ করতেন। পৃথিবীতে জানবার জিনিস প্রচুর। সবকিছুই আমরা জানতে পারি না কিন্তু জানবার প্রবল ইচ্ছায় আমরা আপনাকে উদার করি এবং বলিষ্ঠ করি। শেখ সাদীর গুলিস্তাঁ এবং বোস্তাঁ এ দুটি কাব্যগ্রন্থ আমাদের প্রায় সর্বসময়ের পাঠ্য ছিল। অত্যন্ত সহজ সুললিত ফার্সীতে বহুবিধ উপদেশের কথা এ দুটি কাব্যে আছে। শেখ সাদী বহু দেশ ভ্রমণ করেছিলেন এবং জীবনে বিচিত্রি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি সকল শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে সত্যের স্বরূপ জানতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের সীমাবদ্ধতা তখনই আসে যখন সে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কোনো জ্ঞানকে অপ্রয়োজনীয় বলে অস্বীকার করে। আমাদের সময়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অস্বীকৃতি ছিল না। সকল কিছুর মধ্যে শুভ এবং কল্যাণকর কিছু আছে কিন্তু শুভকে এবং কল্যাণকে আবিষ্কার করতে হয় ধৈর্য ও বিনয়ের মাধ্যমে। আমি এই ধৈর্য ও বিনয় শিখেছি আমার মা এবং বাবার কাছ থেকে। স্কুল এবং পরে কলেজের পাঠক্রম শেষ করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের মুহূর্তে জ্ঞানের বিস্তৃতি সম্পর্কে একটি মোহ এবং উচ্ছলতা আমার মনে গড়ে উঠেছিল। আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সকল কিছুকেই স্পর্শ করবার জন্য ব্যাকুল ছিলাম।

www.pathagar.com

॥১৯॥

খৃস্টান ধর্মে এবং মুসলমান বিশ্বাসে শেষ বিচারের দিন বা পুনরুত্থান বলে একটি কথা আছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে সমস্ত জীবের অবস্থানকাল যখন শেষ হবে এবং পৃথিবীর আর যখন কোনো স্থিতি থাকবে না তখন বিলয়প্রাপ্ত সকল মানুষের আত্মাকে জাগ্রত করে বিধাতার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। বিধাতা তখন মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাব করে পুণ্যাত্মাগণকে স্বর্গে প্রেরণ করবেন এবং পাপাত্মাদেরকে নরকে। ঢাকাস্থ ব্যাপ্টিস্ট মিশনের প্রদান নর্থফিল্ড সাহেব এই বিষয়ে প্রায়ই বক্তৃতা করতেন এবং অন্ধকার কক্ষে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শন করে যিশুখৃস্টের জীবনকথা বর্ণনা করতেন। শেষ বিচারের দিনের কথা আমাদের বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ নিয়ে কখনো প্রশ্ন করি নি কিন্তু বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছি। এ সময় হঠাৎ একদিন টলস্টয়ের 'রিসারেকশন' বইটি হাতে এল। প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে আমি বইটি পাঠ করলাম। তখন পর্যন্ত আমি টলস্টয়ের গল্পগুলো পড়েছি মাত্র। 'রিসারেকশনই' টলস্টয়ের প্রথম উপন্যাস যা আমি পাঠ করলাম।

'নেকলিউডভ' নামক একজন বিত্তবান জমিদার পুত্রের পতন এবং উত্থাপনের কাহিনী এই বইটিতে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম যৌবনে সে উদ্দাম আনন্দ হিল্লোলের মধ্যে সময় কাটিয়েছে এবং সর্বোতভাবে কামনাবাসনা সে চরিতার্থ করেছে। এ পর্যায়ে সে তার মাতৃগৃহের একটি তরুণী দাসীকে নিজের শয্যাসঙ্গিনী করে এবং পরে এই ঘটনা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়। দাসীটির নাম ছিল নাতাশা। সে গর্ভবতী হয় এবং গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়। নাতাশার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে কিন্তু আতুরেই মারা যায়।

যাই হোক নেকলিউডভের কারণে এভাবে যে তার অধঃপতন ঘটে তার থেকে আর নিস্তার পায় না। আশ্রয়হীন বিতাড়িত অবস্থায় সে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এ পর্যায়ে একদিন পতিতালয়ে একটি হত্যাকাণ্ডে নাতাশা জড়িত হয়ে পড়ে। তার বিচার হয়। বিচারে জুরিদের মধ্যে নেকলিউডভও ছিল। অনেকদিন পর নেকলিউডভ নাতাশাকে দেখে চিনতে পারে এবং সে নাতাশার জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তার মনে অনুভূতি জাগে যে এই মেয়েটির বর্তমান অধঃপতনের জন্য সেই দায়ী। তখন সে প্রায়শ্চিত্ত করবার সিদ্ধান্ত নেয়। নাতাশা সাইবেরিয়ায় শ্রম শিবিরে নির্বাসিত হয়। নেকলিউডভও সাইবেরিয়ায় যায় নাতাশাকে পাপমুক্ত জীবনে ফিরিয়ে আনবার জন্য। নাতাশা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। নাতাশার প্রত্যাখ্যানের পর নেকলিউডভ প্রায়শ্চিত্তের পথ বেছে নেয়। সাইবেরিয়ার বন্দীশিবির থেকে মুক্তি পেয়ে একই জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত একজন কয়েদীকে সে স্বামী হিসাবে বেছে নেয়। নাতাশা নেকলিউডভকে গ্রহণ করে না কিন্তু সংসারের একটি পবিত্র প্রত্যয়ের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। নেকলিউডভও সকল দ্বন্দ্বের অবসানে চিত্তের একটি অনাবিল প্রশান্তিতে জীবনের শেষ মুহূর্তগুলি উদযাপন করে। 'রিসারেকশন' দ্বিতীয়বার আমি পড়ি নি কিন্তু প্রথম পড়া আমাকে এত অভিভূত করেছিল যে আজো কাহিনীটি মনে আছে। এই সময় প্রবাসীতে 'জীবনায়ন' বলে একটি উপন্যাস আমি পাঠ করি। উক্ত উপন্যাসের নায়ক অরুণ তার কলেজ জীবনে 'রিসারেকশন' পাঠ করে কিভাবে অভিভূত হয়েছিল উপন্যাসটিতে তার বিবরণ আছে।

www.pathagar.com

'রিসারেকশন' উপন্যাসটি একটি রূপক। মানুষ পাপ এবং পুণ্য এ দুইয়ের সংঘর্ষের মধ্যে পৃথিবীতে বাস করে। জীবনের অন্বয় কর্ম যখন সে সংশোধন করে একটি প্রায়শ্চিত্তের পবিত্রতার মধ্যে অবস্থান করতে শেখে তখনই তার যথার্থ পুনরুত্থান ঘটে। খৃস্টান পুনরুত্থানকে টলস্টয় এই নতুন ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

টলস্টয় ছিলেন রুশ সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। জীবনকে তিনি তাঁর বিপুল বিস্তারের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর মহৎ উপন্যাস 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' বিশ্বসাহিত্যের একটি অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ পাঠের সময় আমাদের মনে হয় যে আমরা ইতিহাসের একটি বিপুল ঘটনাক্রমের মধ্যে বাস করছি। নেপোলিয়ান এক সময় রুশ দেশ জয় করতে চেয়েছিলেন। সেই ঘটনা এবং তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী প্রায় ১২ বছরের ঘটনা নিয়ে এই উপন্যাসটি রচিত। ইতিহাসকে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে তিনি পুনর্নির্মাণ করেছেন। মনে হয়, আমরা বর্তমান সময় অতিক্রম করে অকস্মাৎ একটি ইতিহাসের বিভিন্ন কার্যকারণের মধ্যে উপস্থিত হই এবং সকল ঘটনার সাক্ষ্য হই। আমি এই উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য প্রথম পাঠ করি পরে ক্রমান্বয়ে এ উপন্যাসের ভেতরে প্রবেশ করবার সাহস অর্জন করি। দুটি রুশ পরিবারের জীবনযাত্রাকে অবলম্বন করে এ উপন্যাসের ঘটনাবলী আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসটি একান্তভাবে রুশদেশীয়। তৎসত্ত্বেও এটি সকল দেশীয়। অর্থাৎ সকল দেশের মানুষই এ উপন্যাসের মাধ্যমে তার অতীতকে যেন প্রত্যক্ষ করে।

'রিসারেকশন' পাঠ করার পর প্রথমে 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' পরে 'আনা কারেনিনা' আমি পাঠ করি। 'আনা কারেনিনা' কাহিনীটিও সর্বকালের পাঠককে বিহ্বল করার মতো। 'আনা কারেনিনার' ঘটনাটি ১৮৭৬ সালের রুশ দেশের ঘটনা। সে সময়কার সেন্ট পিটারসবার্গ শহরের জীবনের সঙ্গে গ্রামীণ জীবনের একটি তুলনা এই উপন্যাসে নির্মিত হয়েছে। 'রিসারেকশনে' যে ধর্মীয় আবেশ আছে, আনা কারেনিনাতেও সে ধর্মীয় আবেশ আমরা লক্ষ্য করি। এই গ্রন্থটি অবশ্য রিসারেকশনের আগের রচনা।

এভাবেই আমি আমার কলেজ জীবনে ১৯৩৯-৪০-এর দিকে আকস্মিকভাবে টলস্টয়ের ভক্ত হয়ে পড়ি। স্কুল এবং কলেজ জীবনে আমি প্রচুর উপন্যাস পড়েছি কিন্তু টলস্টয়ের সঙ্গে কোনো লেখকের মিল খুঁজে পাই নি। টলস্টয়কে আমার সকলের ঊর্ধ্বে মনে হয়েছে। তাঁর শিল্প নৈপুণ্য কোথায় এটা তখন ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল কিন্তু তার বর্ণনার সরলতায় আমি যে প্রবাহিত হতে পারতাম এটাই আমার জন্য বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। টলস্টয়ের সঙ্গে আর কারো সঙ্গে তুলনা দেয়া যায় কিনা আমি জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় টলস্টয় নিজেই নিজের তুলনা। বাংলা সাহিত্যে টলস্টয়ের কোনো প্রভাব পড়ে নি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সকল খ্যাতিমান গল্প লেখক এবং ঔপন্যাসিক টলস্টয়ের রচনা পাঠ করে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হয়েছেন এবং অভিভূত হয়েছেন। টলস্টয়ে জটিল কোনো কলাকৌশল নেই এবং তাঁর রচনার নিশ্চিন্ত সহজতা তাঁকে একক করেছে। বলা যায় যে এই সহজতার কারণেই তাঁকে অনুকরণ করা অসম্ভব ছিল এবং এখনও অসম্ভব।

স্কুলে টলস্টয়ের কিছু গল্পের বাংলা অনুবাদ পড়েছি। কলেজে টলস্টয়ের কয়েকটি উপন্যাস পাঠের পর ওয়ার্ল্ড ক্লাসিকসে প্রকাশিত ২৩টি গল্পের সংকলন পাঠ করি। ধর্মীয় বিশ্বাস, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং কল্যাণকর্মের জীবন তাঁর গল্পগুলির প্রতিপাদ্য। কী

www.pathagar.com

আশ্চর্য সহজ উচ্চারণে এ গল্পগুলি যে রচিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে বলা যায় না। একজন নাস্তিকও এসব গল্প পড়ে অভিভূত হতে বাধ্য। নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের একটি সান্ত্বনা আছে। এ গল্পগুলো পাঠ করলে সে সান্ত্বনাকে খুঁজে পাওয়া যায়। একটি গল্পের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। গল্পটির নাম 'কতটুকু জমি মানুষের দরকার'। একজন লোক শুধু কৃষি জমি কিনতো এবং জমির সংখ্যা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়েছিল। সে একবার খবর পেল যে কোনো এক অঞ্চলে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে জমি বিতরিত হচ্ছে। পদ্ধতিটি হচ্ছে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পায়ে হেঁটে যতটুকু জমি একজন লোক বেষ্টন করে সূর্যাস্তের পূর্বে প্রথম পদক্ষেপের ক্ষেত্রে উপস্থিত হতে পারবে ততটুকু জমিই সে পাবে।

গল্পের মানুষটি এভাবে পায়ে হেঁটে প্রচুর জমির অধিকারী হল। কিন্তু পদযাত্রার ক্ষেত্রে সূর্যাস্তের পূর্বে সে পা রাখলো ঠিকই। কিন্তু ক্লান্তিতে এবং অবসাদে মৃত্যুমুখে পতিত হল। তখন দেখা গেল যে তার কবরের জন্য তার মাত্র সাড়ে তিন হাত জমির প্রয়োজন হয়েছে। আসলে অতটুকু জমিরই তার দরকার ছিল। গল্পের মধ্যে কোনো আবেগ নেই। একটি নিষ্কম্প সহজ স্বাভাবিক বার্তার মতো সমগ্র কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বাসের একটি বিনম্র সততা আছে। তাকে উপলব্ধি করতে হয় এবং আপন অন্তরঙ্গ সত্তায় জাগরুক করতে হয়। আমি আমার পারিবারিক জীবনের ধর্মীয় বিশ্বাসের পটভূমিতে মানুষ হয়েছি। তাই টলস্টয়কে গ্রহণ করতে আমার কোনো অসুবিধা হয় নি। সে সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপুল সংঘর্ষের সংবাদ অনবরত পাচ্ছিলাম। প্রতিদিন খবরের কাগজে দেখতাম বড় বড় অক্ষরে যুদ্ধের সংবাদ। সেই লেলিহান লোলজিহ্বা ধ্বংসের অনিবার্যতার মধ্যে টলস্টয় আমার চিত্তে সান্ত্বনা এনেছিলেন। টলস্টয়ের এই ২৩টি নির্বাচিত গল্প আমি বারবার পাঠ করেছি এবং যুদ্ধের অবসান কামনা করেছি। যুদ্ধের শুরুতে যুদ্ধ সম্পর্কে যে উৎসাহ ছিল ক্রমশ সে উৎসাহ ভয়ে পরিণত হয়েছিল। সে মুহূর্তে আমার মানসচৈতন্যের সামগ্রিক প্রশান্তির জন্য টলস্টয়ের আশ্বাসের প্রয়োজন ছিল। সে আশ্বাস আজো আমি অনুভব করি।

॥২০॥

মহব্বত বা প্রেমের তিনটি সংজ্ঞা সুফী তত্ত্বজ্ঞরা নির্দেশ করেছেন। প্রথমত প্রেম হচ্ছে প্রেমাস্পদের জন্য এক প্রকার অস্থির আকাঙ্ক্ষা, একটি আবেগ এবং আকর্ষণ। এ অর্থে প্রেম হচ্ছে সৃষ্ট জীবসমূহের পরস্পরের প্রতি আনুকূল্য এবং মমতা। দ্বিতীয়ত, প্রেম হচ্ছে মানুষের উপর বর্ষিত আল্লাহর করুণা। যাকে আল্লাহ্ নির্বাচন করেন তাকে তিনি মমতা করেন এবং তাকে বৈশিষ্ট্য দান করেন। আল্লাহর বিবিধ ঐশ্বর্যে তিনি বিভূষিত হন। তৃতীয়ত, প্রেম হচ্ছে কোনো কল্যাণ কর্মের জন্য প্রশংসা। মানুষ যখন কোনো কল্যাণ কর্ম সাধন করে তখন আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারিত হয়।

কোনো কোনো দার্শনিক বলেন যে আল্লাহর ভালোবাসা আল্লাহর গুণাবলীর সঙ্গে যুক্ত। আল্লাহর যে সমস্ত গুণাবলী কোরান শরীফে বর্ণিত হয়েছে যার অজস্রতা ভাষায় উল্লেখ করা যায় না সে সমস্ত অজস্রতা থেকেই আল্লাহর ভালোবাসার স্বরূপ প্রকাশ পায়। মানুষের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা মানুষের প্রতি তার সুখ কামনার মতো এবং করুণার মতো। আল্লাহর বিভিন্ন ইচ্ছার মধ্যে প্রেম হচ্ছে একটি ইচ্ছা যাকে আরবীতে বলে

www.pathagar.com

ইবাদাত। আল্লাহর ইচ্ছার ব্যাখ্যাসূত্রে আরো অনেক শব্দ আমরা ব্যবহার করি, যেমন, 'সন্তুষ্টি', 'ক্রোধ', 'করুণা' ইত্যাদি। আল্লাহর ইচ্ছা হচ্ছে একটি অনন্তকালীন প্রজ্ঞা, যার সাহায্যে তিনি তার কর্মপ্রবাহ চালিত করেন।

মানুষের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার ফলে এ পৃথিবীতে মানুষের সন্তুষ্টি বিধান ঘটে এবং পরজগতে মানুষ শাস্তি থেকে মুক্ত হয়। আল্লাহর ভালবাসা থাকলে মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং এ ভালোবাসার সাহায্যে সে সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হয়। সুফী সাধক জুনায়েদ বলেছেন যে কোনো মানুষকে আল্লাহ যখন বিশেষত্ব দান করেন, তখন সে বিশেষত্ব দানের মধ্য দিয়ে তার প্রেম প্রকাশ পায়। আল্লাহর ভালোবাসা হচ্ছে আল্লাহর বাণীর সততা এবং সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা। এ বাণীর প্রতি মানুষের যখন পূর্ণ আসক্তি দীপ্যমান হবে, তখনই মানুষ আল্লাহর ভালোবাসা পেয়েছে ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর ভালোবাসা পেলে মানুষ পবিত্র হয় পরিচ্ছন্ন হয় এবং আনন্দে দীপ্ত হয়। কিন্তু আল্লাহর প্রতি মানুষের ভালোবাসা কি করে প্রকাশ পায়? এ ভালোবাসার প্রকাশ ব্যাকুলতার মধ্যে, বিনয়ের মধ্যে, শ্রদ্ধার মধ্যে এবং সার্বক্ষণিক ধ্যাননিমগ্নতার মধ্যে।

যে মানুষ আল্লাহকে ভালোবেসেছে সে পরমকে লাভ করেছে। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর প্রতি তার আর আকর্ষণ নেই। সে সমস্ত পার্থিব আকাঙ্ক্ষা এবং কামনাকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর গুণাবলীর দ্বারা গুণান্বিত হবার জন্য ব্যাকুল হয়। পৃথিবীতে যে মানুষ মানুষকে ভালোবাসে সে ভালোবাসার শেষ তো প্রাপ্তিতে। কিন্তু আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার তো শেষ নেই। সেখানে অনবরত প্রত্যাশা হয়েছে। সুতরাং একজন সুফী-সাধক সর্বমুহূর্তে এ প্রার্থনা করেন, "হে আল্লাহ, আমাকে আরো দাও, আরো দাও। আমি অসম্পূর্ণতায় বিপর্যস্ত হচ্ছি। আমাকে তুমি প্রাণময়তায় সম্পূর্ণ কর।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসে সে আল্লাহর কায়ফিয়াত বা স্বভাবকে আয়ত্ত করতে চায় এবং মৃত্যু চিন্তায় অধীর হয় না। কিন্তু মৃত্যুকে একটি অনিবার্যতার মধ্যে আনন্দে গ্রহণ করে। এই মৃত্যু হচ্ছে পার্থিব আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু এবং পার্থিব ইচ্ছার মৃত্যু। মৃত্যুর কারণে মানুষ অনন্তের নিকটবর্তী হবার সাধনা করতে পারে। পার্থিব প্রেমে সমমনাদের মধ্যে আকর্ষণ প্রকাশিত হয়, যেখানে দৈহিক পরিতৃপ্তি রয়েছে, কিন্তু আল্লাহর প্রতি প্রেম হচ্ছে এমন একটি তাৎপর্যের উল্লাস যা আল্লাহর গুণাবলীর আসক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত সুফী-সাধক সুমনূন আল মুহীব বলেছেন যে প্রেম হচ্ছে একটা ভিত্তি, যে ভিত্তি স্থাপিত করে মানুষ আল্লাহকে পাবার চেষ্টা করবে। মানুষের বিভিন্ন আশ্রয় আছে, অর্থাৎ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন আশ্রয়ে মানুষের প্রকাশ ঘটে। সকল আশ্রয়ই হচ্ছে ধ্বংসের। একমাত্র প্রেমের আশ্রয়ই হচ্ছে প্রশান্তির। প্রেমকে 'সাফওয়াত' নামেও অভিহিত করা যায়। সাফওয়াতের অর্থ হচ্ছে 'পবিত্রতা'। সুতরাং সাফওয়াতের অবস্থা যিনি পেলেন তিনি সুফী। মনসুর হাল্লাজকে যখন ফাঁসীকাষ্ঠে জড়ানো হয়েছিল সে মুহূর্তে তিনি বলেছিলেন, "হাসব আল ওয়াজিদ, ইফরাদ আল ওয়াহিদ" অর্থাৎ এটাই যথেষ্ট যে প্রেমিক একক সত্তার সঙ্গে মিলিত হবে অর্থাৎ প্রেমিকের আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। সে প্রেমাস্পদের অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হবে। এভাবে প্রেমের বিচিত্র অভিব্যঞ্জান সূফী তত্ত্বজ্ঞরা দিয়েছেন।

www.pathagar.com

আমার জীবনে আমি একজন অনন্যসাধারণ সুফী তত্ত্বজ্ঞের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তাঁর জীবনধারার কথা স্মরণ করেই প্রেমের মহিমান্বিত রূপের কথা বললাম। তাঁকে আমি আমার শৈশব এবং কৈশোরে দেখেছি এবং আমার কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পেয়েছিলাম। তাঁর নাম সৈয়দ গোলাম মোক্তাদীর। শুভ্র কান্তি, দীর্ঘ দেহী, গৌরাঙ্গ পুরুষ তিনি ছিলেন। শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখে সর্বদাই একপ্রকার সান্ত্বনার হাসি ফুটে থাকতো। তিনি ছিলেন খুলনার সৈয়দ মহল্লার অধিবাসী। একসময় সরকারী চাকরিজীবী ছিলেন। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর পূর্ণভাবে সুফী সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আমাদের পরিবারে সুফী সাধনমার্গের অনুশীলন ছিল। আমার দাদা এবং নানা এঁরা দুইভাই সুফী সাধনায় নকশবন্দীয়ার শাখায় দীক্ষিত ছিলেন। এঁদের পীর ছিলেন ভারতের গোরক্ষপুরের অধিবাসী। আমার নানাজান এবং দাদা উভয়েই আরবী বিদ্যায় অসাধারণ ধীমান এবং অগ্রসর ছিলেন। এঁরা উভয়েই মুরীদ হয়ে একটি নতুন তত্ত্বময় জীবনযাপন আরম্ভ করেছিলেন। সৈয়দ গোলাম মুক্তাদীরই গোরক্ষপুরের পীরের মুরীদ ছিলেন, কিন্তু দীক্ষা নেবার অধিকার তিনি পেয়েছিলেন আমার নানার কাছে। এই সুবাদে তিনি আমাদের পরিবারের একান্ত আপনজন হয়ে পড়েছিলেন।

আমাদের পারিবারিক জীবনের সকল সংকটের মুহূর্তে তাঁকে আমি দেখেছি। সংসার করেছেন কিন্তু সংসারে তাঁর কোনো আসক্তি ছিল না। নিজে বাজার করতেন। ভালো খাবার পছন্দ করে আনতেন, মানুষকে আপ্যায়ন করতে ভালোবাসতেন, আন্তরিক মমতায় সকলকে গ্রহণ করতেন কিন্তু তবু যেন সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। বৈষ্ণব গানে আছে যে শ্রীরাধিকা স্নান করছেন, কিন্তু তার বেণী যেমন ছিল তেমন থাকছে, পানিতে ভিজছে না। অর্থাৎ সংসারের সকল উদ্যমের সঙ্গে জড়িত থেকে সংসারী হচ্ছেন না। সৈয়দ মুক্তাদীরকে এ উপমায় পরিচিত করতে আমার ভালো লাগছে। আল্লাহর প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল সম্পূর্ণ, যে আকর্ষণকে আমরা যথার্থ প্রেম বলে আখ্যায়িত করতে পারি। যদি আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রয়াস আমি কোনো মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে থাকি তাহলে তিনি হচ্ছেন গোলাম মুক্তাদীর। আমরা তাঁকেই যথার্থ প্রেমিক বলি যখন প্রেমিক আপন গুণাবলী সম্পূর্ণ মুছে ফেলে প্রেমাস্পদের গুণে গুণান্বিত হয়।

সৈয়দ গোলাম মুক্তাদীরকে ধ্যানরত অবস্থায় আমি দেখেছি। মনে হয়েছে তাঁর সমগ্র তনু বিগলিত হয়ে একটি অলৌকিক দীপ্তিতে ভাস্বর হয়েছে। আমার বিশ্বাস হয়েছে যে তিনি আল্লাহর সঙ্গে নির্বিরোধী তত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন। আল্লাহর রূপে প্রেমাস্পদ হচ্ছে একটি মৌল প্রজ্ঞা এবং একমাত্র অস্তিত্ব। যাকে আরবীতে বলা হয় 'বাকী'। প্রেমিক হচ্ছে 'ফানি' অর্থাৎ নিঃশেষ। তাই প্রেমের সার্থকতা নির্ভর করে মৌল অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে এবং আপন ব্যক্তি স্বরূপের গুণাবলীর বিস্মরণের মধ্যে। কোনো প্রেমিক আপন গুণাবলীকে জাগ্রত রেখে প্রেমকে বিকশিত করতে পারে না। যেহেতু প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য তার প্রয়োজন, তাই আপন সত্তার বিলোপ সাধন করে সে প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য দ্বারা অভিসিঞ্চিত হয়। আবু ইয়াজীদ বিসতামী বলেছেন, প্রেমের ক্ষেত্রে প্রয়োজন আপন বৃহৎকে ক্ষুদ্র করা এবং প্রেমাস্পদের ক্ষুদ্রকে মহৎ করা। অর্থাৎ আমি নিজেকে মহৎ ভাববো না, আমার অস্তিত্বকে তাৎপর্যপূর্ণ ভাববো না, ভাববো যে আমি

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র এবং নিঃস্ব এবং আমার সম্পূর্ণতা আসবে প্রেমাস্পদের কাছে আপনাকে সমর্পণ করলে। এ বিচারেই স্বকীয় কৃতিকে ক্ষুদ্র করে আমি প্রেমাস্পদের কৃতিকেই একমাত্র লক্ষ্যগোচর করবো।

ব্যাকুলতা প্রেমের একটি অভিব্যঞ্জনা। আমি যে মহৎ প্রজ্ঞাকে চাই তার কোনো পরিমিতি নেই। সুতরাং তাকে কেউ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারে না কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত হিসাবে আয়ত্ত করবার কামনায় অধীর থাকে। এভাবে ব্যাকুলতা আমাদের সম্পদশালী করে, কেননা ব্যাকুলতার কারণে ক্রমান্বয়ে আমরা আপনাকে অধিক থেকে অধিকতর পরিশুদ্ধ করি, পরিমার্জিত করি, পরিতৃপ্ত করি এবং পরিজ্ঞাত করি। প্রেম হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশের মান্যতা এবং অমান্যতার প্রতিকূলতা।

আমার শিক্ষা জীবনে এহেন ব্যক্তির সান্নিধ্য আমাকে অনেকভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি যে তাঁকে অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছি তা নয়। তবে পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতাকে চাক্ষুস দেখে আনন্দিত হয়েছি। সকল শ্রেণীর লোক তাঁর কাছে এসে অভয় পেত এবং আশ্বাস পেত। জনৈকা হিন্দু যুবতী বারবনিতা তার লাস্যময় জীবন পরিত্যাগ করে তার পাদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করেছিল। তিনি তখন চুড়িহাটটায় থাকতেন। যুবতী প্রত্যহ সকাল বেলা নিকটে একটি পুকুরে স্নান করতে যাবার পথে সৈয়দ মুক্তাদীরকে শিষ্য পরিবৃত অবস্থায় গৃহের বারান্দায় ধ্যানরত দেখতে পেতেন। এতেই যুবতীর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে এবং সে পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের আগ্রহ প্রকাশ করে। এভাবে তিনি বহু পথভ্রষ্ট মানুষকে সৎ জীবনযাপনের জন্য অনুকূল পরিবেশের সন্ধান দিয়েছেন। পরীক্ষার আগে যখন তাঁর কাছে দোয়া নিতে যেতাম তখন তিনি একাগ্রতার কথা বলতেন এবং পরিচ্ছন্ন স্মরণ ক্ষমতার কথা বলতেন। বলতেন তুমি যদি একাগ্র হয়ে পাঠ গ্রহণ কর, তাহলে দেখবে গ্রন্থের পাতাগুলো সুস্পষ্ট চিত্র হয়ে তোমার স্মৃতিকে আন্দোলিত করছে। তাঁর কথার তাৎপর্য যে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতাম তা নয় তবে অনুভব করতাম শিক্ষা জীবনে একাগ্রতা নিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। একদিন তিনি বলেছিলেন, তুমি যা পাঠ করবে তা তোমাকে অনুভব করতে হবে অর্থাৎ সত্যের কথা অথবা আনন্দের কথা যখন তুমি পাঠ করবে তখন সত্য এবং আনন্দকে অনুভব করতে হবে। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে প্রেমের একটি প্রত্যয়ের স্বাক্ষর রেখে গেছেন যা এখনো আমাকে উদ্বুদ্ধ করে।

॥২১॥

স্কুলে স্কুল-গৃহের নিম্নতলে আমাদের ক্লাসকক্ষগুলি ছিল। উপরতলায় ছিল ট্রেনিং কলেজের অবস্থান। ট্রেনিং কলেজের লাইব্রেরী আমি ব্যবহার করতাম। তাই সোপানাবলী অতিক্রম করে ট্রেনিং কলেজের ঊর্ধ্বতলে আমি বহুবার প্রবেশ করেছি। কলেজে আমাদের ক্লাসগুলি ছিল উপরতলায়। কিন্তু তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরতলার কক্ষগুলোতে প্রবেশের আগ্রহ আমার সব সময় ছিল। বিস্তৃত সোপানাবলী অতিক্রম করে উপরতলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকক্ষে প্রবেশ করতে কেমন লাগবে তা আমি প্রায়ই ভাবতাম। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা এমন কিছু নয় কিন্তু আমার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অট্টালিকা সোপান শ্রেণীর ব্যবধান অতিক্রম করে প্রবেশ করার একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল। আমি ভাবতাম

www.pathagar.com

সময়কে কখনো সংক্ষিপ্ত করা যায় না অথবা শাসন করা যায় না। সময় কতগুলি পদক্ষেপমাত্র। এ সমস্ত পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে আমরা একটি প্রভূত সময়ের বৈকুণ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করবো। আমার সত্যি সত্যি ধারণা ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে অফুরন্ত সময়ের ভাণ্ডার। সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে একবার এই ভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলেই সময়ের মধ্যে আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাবো।

বাবার কাছে সময়ের ব্যাখ্যা শুনতাম। তিনি বলতেন, সময়ের সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। একজন সুফীকে তার শিষ্যরা জিজ্ঞেস করেছিল 'জ্ঞান কি?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'জ্ঞান হচ্ছে সময়।' শিষ্যরা অর্থ বুঝতে না পেরে আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'প্রভু, এর অর্থতো বুঝলাম না।' সুফী উত্তর করেছিলেন, 'নিরন্তর আমরা সময়ের মধ্যে যাত্রা করছি, সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে এবং অবশেষে পৃথিবীতে আমাদের সময়কাল শেষ হচ্ছে। সত্যিকার জ্ঞান হচ্ছে–সদিচ্ছায় ব্যবহার করা এবং আল্লাহর চিন্তায় ব্যয় করা। সময় সম্পর্কে জ্ঞান অর্থাৎ ইলম-ই ওয়াকত মানুষের জন্য অপরিহার্য। এর একটি বহিঃপ্রকাশ আছে যা আমাদের কর্মের ব্যস্ততায় ধরা পড়ে, আবার একটি অন্তর্নিহিত স্বরূপ আছে যা চিত্তশুদ্ধি এবং উপলব্ধির অভিজ্ঞানে ধরা পড়ে। কিন্তু বাইরের কর্মব্যস্ততা অন্তরের ধ্যাননিমগ্নতার সঙ্গে যদি যুক্ত না হয় তাহলে নিছক কর্মব্যস্ততায় সময়ের অপলাপ এবং অপহরণ ঘটে। তিনিই যথার্থ জ্ঞানী যিনি সময়কে শুভ তাৎপর্যে বিকশিত করেন।'

সময়কে অনুভব করবার অনেকগুলো ব্যাখ্যাসূত্র সুফীরা দিয়ে থাকেন। একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে সময়ের ব্যবহারের দুটি প্রকৃতি আছে, একটি হচ্ছে প্রাথমিক এবং অন্য একটি হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ের। প্রাথমিক প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশে বিশ্বাসের দৃশ্যগত আচরণ রূপ লাভ করে, এবং অভ্যন্তরীণ রূপসজ্জায় আত্মবোধ অভিজ্ঞাত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের বহিঃপ্রকাশে বিনয়ের আচরণ রূপলাভ করে, এবং অভ্যন্তরীণ রূপসজ্জায় ইচ্ছার সততা সম্পর্কে বোধ জাগে। কিন্তু কখনই বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ অভিব্যক্তি একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বরঞ্চ একে অন্যের সম্পূরক। আমার অন্তরের বিশ্বাস বাইরের আচরণে প্রকাশ পাবে, তেমনি বাইরের আচরণ অন্তরের অভিপ্রায়কে লালন করবে।

অনন্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও মানুষ একটি সময়ের বৃত্তের মধ্যে বাস করে যা অতিক্রম করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনবৃত্তের যে ঘূর্ণায়মান পরিধি আমরা তার মধ্যেই আবদ্ধ থাকি। একমাত্র জ্ঞানের সাহায্যেই এই পরিধি অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন প্রবেশ করি তখনই বিশ্বজ্ঞানের এ পরিচয় উন্মোচিত হয়। আমার রংকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানের সেই অনন্ত মুক্ততার ইঙ্গিত বহন করতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রধান ডক্টর মাহমুদ হাসান একদিন আমাদের পরিদর্শনে এসেছিলেন। পরিদর্শন শেষে এক পর্যায়ে আমাদের অনুরোধে তিনি একটি বক্তৃতা করেছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়। তাঁর বক্তৃতার মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন একটি বিশ্ববিদ্যালয় মানুষকে শিক্ষা দেয় যে পৃথিবীকে সমগ্রভাবে দেখতে হবে আংশিকভাবে নয়। পৃথিবী শুধু মানুষের নয়, পৃথিবী খনিজ দ্রব্যের, গাছপালার, জন্তু জানোয়ার এবং মানুষের। এই চারটি ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের রাজ্য হলেও এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্বজ্ঞানের

www.pathagar.com

সাহায্যে আমরা এই সম্পর্কের ভূমিকার মধ্যে প্রবেশ করি। ডক্টর মাহমুদ হাসান নানাবিধ গল্প বলে প্রাণকণার বৈশিষ্ট্য এবং মানুষে মানুষে সম্পর্ক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি জীবন, চেতনা এবং আত্মবোধের কথা বলেছিলেন মনে পড়ে। গৌতম বুদ্ধের জীবনী পাঠ করে আমি তৃষ্ণা শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ খুঁজে পেয়েছিলাম আরো পরে। তখন জেনেছিলাম যে মানুষের জীবন আছে, জীবনের অতিরিক্ত চেতনা আছে এবং সর্বোপরি আত্মবোধ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেই আমরা একটি চৈতন্যলোকে প্রবেশ করবার অধিকার পাই।

কলেজে থাকতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো দুজন অধ্যাপক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন– তাঁরা হচ্ছেন ডক্টর সুশীলকুমার দে এবং ডক্টর ফিদা আলী খান। বিকেল বেলা অথবা সন্ধ্যায় যখন পুরনো পল্টন বা শান্তিনগর এলাকায় বেড়াতে বেরুতাম তখন প্রায়ই ডক্টর সুশীলকুমার দে-কে পথভ্রমণে দেখতাম। উজ্জ্বল সুপুরুষ, দীপ্তিময় মুখাবয়ব এবং পরিচ্ছন্ন বসন–অভিভূত হওয়ার মতো দৃশ্য। ডক্টর ফিদা আলী খানকেও দেখেছি। আরো উজ্জ্বল মুখ কান্তি ছিল এবং বলিষ্ঠ দেহ ছিল। এঁদের দুজনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক হিসাবে ধরে নিয়েছিলাম। ভাবতাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানের যে বিপুল রাজ্যপাট রয়েছে এঁরা দুজন সে রাজ্যপাটের অধিকারী। সুযোগ পেলে একদিন আমিও সে রাজ্যপাটে আপন প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই সুনির্দিষ্ট করতে পারবো।

কলেজে ভূগোল এবং গণিত আমার দুটি বিশেষ বিষয় ছিল। গণিতে আমার পটুতা ছিল, তাই আত্মীয়স্বজন ইচ্ছা করেছিলেন আমি যেন বিজ্ঞানের ছাত্র হই। কিন্তু ইংরেজী কাব্যের প্রেক্ষাপট স্কুলে থাকতেই আমার কাজে উন্মোচিত হয়েছিল। আমার চিন্তা এবং আবেগের পটভূমি নির্মাণ করেছিল শেলী এবং কীটস। এদের বিশ্বাস এবং অন্তর্জ্বালা আমি অনুভব করতে চাইতাম। তাই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী অনার্স পড়বো এই সিদ্ধান্ত নিলাম। এই সিদ্ধান্ত সে সময় এককভাবে আমারই ছিল। আনুষঙ্গিক বা সাবসিডিয়ারী বিষয় হিসাবে নিয়েছিলাম বাংলা এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান। আমার সিদ্ধান্তে বাবা কোনো অভিমত প্রকাশ করেন নি। আমি যখন তাঁকে জানালাম আমি ইংরেজী অনার্স পড়তে চাই; তখন তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, বেশ ভালো। এর বেশী তিনি কিছু বলেন নি। মা শুধু একবার বলেছিলেন, ফার্সী পড়লে হতো না? মা নিজে ফার্সী জানতেন এবং ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমাদের পারিবারিক একটি দুর্বলতা ছিল। স্কুলে আমি ফার্সী পড়েছিলাম। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সী পাঠ গ্রহণের আমি কোনো প্রয়োজন বোধ করি নি। আমার ধারণা ছিল যতটুকু ফার্সী আমার আয়ত্তে আছে তার উপর নির্ভর করেই আমি পরবর্তীতে ইচ্ছে করলে ফার্সীর অনুশীলন গড়ে তুলতে পারবো।

যেদিন আমি প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করি সেদিনটির কথা আমার খুব মনে আছে। সকালের দিকে বৃষ্টি নামলেও দশটার দিকে আকাশ পরিষ্কার ছিল। গাছপালা বৃষ্টিতে পরিচ্ছন্ন হয়েছিল এবং সকালের স্নিগ্ধ রৌদ্রে ঝিকমিক করছিল। এখন সে অট্টালিকাটি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ সেটাই তখন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের উত্তর দিক দিয়ে যে প্রবেশের পথটি ছিল সে পথ দিয়ে আমি প্রবেশ করেছিলাম। সিঁড়ি বেয়ে উপর তলায় উঠবার সময় মনে হয়েছিল আমি একটি নতুন সম্ভাবনার মধ্যে

www.pathagar.com

প্রবেশ করছি। উপরে উঠবার সিঁড়িটি ছিল খুবই প্রশস্ত, একসঙ্গে অনেকে উঠতে পারতো। কিন্তু আমি তখন ভেবেছিলাম আমিই বোধহয় একা উপরে উঠছি। অনেকের মধ্যে এই একাকীত্বের অনুভূতিটা আমার চিরকালই আছে। কিন্তু এর উদ্ভব বোধহয় খুবই সুস্পষ্টভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রথম দিনে ঘটেছিল। এর কারণ বোধহয় যারা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিল সেদিন তাদের কাউকেই আমি চিনতাম না। আমি আমার নিজের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলাম। একটি নতুন প্রত্যয়ে উপনীত হবার জন্য আমি সে দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটি নতুন সময় ও আনন্দকে প্রত্যক্ষ করছিলাম।

॥২২॥

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে যে দাক্ষিণ্য একজন যুবককে আনন্দিত করে তা হচ্ছে রমণীর সান্নিধ্য। স্কুল এবং কলেজে ছেলে এবং মেয়েরা ভিন্ন ভিন্ন থাকে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীকক্ষে ছেলে এবং মেয়ের সম্মিলন একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনা। নবযুবকের দৃষ্টিতে সংকোচ, শঙ্কা এবং কৌতূহল থাকে। অপর পক্ষকে আপন কণ্ঠস্বর শোনাবার আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং ক্লাসকক্ষের বাইরে হঠাৎ দু একটি বাক্যালাপের সুযোগ সময়কে যেন উৎফুল্ল করে।

ইংরেজী অনার্স ক্লাসে আমাদের সঙ্গে চারজন মেয়ে পড়ত– একজনের নাম স্মৃতিরেখা বিশ্বাস, অন্যজন বেলা মুখার্জী, আরেকজন প্রতিমা এবং চতুর্থজন কণিকা। প্রথম দু জনের পুরো নাম মনে আছে সম্ভবত এ কারণে যে এরা দু জনই হাস্যচটুল এবং দীপ্তকান্তি ও আগ্রহী ছিল। স্মৃতিরেখা আরমানিটোলা স্কুলের আমার পাঠজীবনের শেষ পর্যায়ের হেডমাস্টার বি কে বিশ্বাসের আত্মীয়া ছিলেন। বি কে বিশ্বাসের বাড়িতে দু একবার গিয়েছিলাম, তখন একে দেখে থাকব হয়ত। কণিকা এবং প্রতিমা উভয়েই ছিল কিছুটা স্থূল শরীরী শ্যামলা রঙের এবং নিস্তব্ধ। তবু এদের সব কজনকে নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে কৌতূহল এবং আগ্রহের অন্ত ছিল না। মুকসেদ আলী বলে আমার এক সহপাঠী ছিল, সে তো চারজনের নাম মিলিয়ে একটি ছোট কবিতাই লিখে ফেলেছিল। তার কবিতার প্রথম দু লাইন এখনো আমার মনে আছে।

'বালুকা বেলায় স্মৃতির
কণিকা জ্বলে
প্রতিমা কাহার
জাগেরে হৃদয় তলে।'

চার লাইনের এই কবিতাটি মুকসেদ আলী ব্ল্যাক বোর্ডে লিখে রেখেছিল। কিন্তু কবিতার কারণে মুকসেদ আলীর ভাগ্যপ্রসন্ন হয় নি। সে একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলবার ভরসা পায় নি একা সুযোগও পায় নি। বাংলা বিভাগে মেয়ের সংখ্যা ছিল ছেলেদের চেয়ে বেশি। বাংলা অর্থাৎ বাংলা সাবসিডিয়ারী ক্লাস। ক্লাসে বেঞ্চগুলো দু পাশে সাজানো থাকত। একদিকে মেয়েরা অন্যদিকে ছেলেরা। শ্রেণীকক্ষগুলো ছিল দু পাশে সারিবদ্ধভাবে, মাঝখানে ছিল প্রশস্ত করিডোর। কিন্তু আরও দুটি ফাঁকা জায়গা ছিল দু পাশের বারান্দার দিকে। মেয়েরা সাধারণত বারান্দার পাশ দিয়ে ক্লাসে ঢুকত। ছেলেরা

www.pathagar.com

ক্লাসে বসত প্রথম এবং মেয়েরা ঢুকতো শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে। বাংলা ক্লাসে বিনয় বলে একটি ছেলে ছিল। সে মাঝে মাঝে ক্লাস শেষ হলে মেয়েদের খালি বেঞ্চে কিছুক্ষণের জন্য বসতো। এ নিয়ে আমরা তাকে ঠাট্টা করতাম। আমাদের বাংলা পড়াতেন কবি জসীমউদ্দীন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, গণেশচরণ বসু। জসীমউদ্দীনের ক্লাসে মাঝে মাঝে কৌতূহলের ঘটনা ঘটত। তিনি মাঝে মাঝে ছাত্রদের নাম ধরে মুখে মুখে দু লাইনের কবিতা রচনা করতেন। তিনি প্রথমে একজন ছাত্রের নাম জোরে বলতে বলতেন। এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে সে নামের সঙ্গে মিলিয়ে দুই লাইনের ছন্দোবদ্ধ পদ রচনা করতেন। যেহেতু তিনি সবার নামই জানতেন সুতরাং কোন নামে কোন ধরনের মিল হবে তা তিনি নিশ্চয়ই আগে থেকে ঠিক করে আসতেন। তাঁকে কিন্তু বিপাকে ফেলেছিল সন্তোষ নামে আমার এক সহপাঠী। সন্তোষকে যখন তার নাম বলতে বলা হল তখন সে বলল, 'আমার নামে স্যার ভালো কবিতা হবে না। আমার নাম দিয়ে কি করবেন'।

জসীমউদ্দীন বললেন, 'তবু বল'। সন্তোষ তখন বলল, 'যদি ছন্দই মেলাতে হয় স্যার, তাহলে আমার নাম অসমঞ্জ। জসীমউদ্দীন একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন তিনি তো সন্তোষের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে রেখেছেন। অসমঞ্জের কথা তো আর ভাবেন নি। জসীমউদ্দীনের বিব্রত অবস্থা দেখে সমস্ত ক্লাস অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। এর পরে তিনি আর কোনোদিন নাম দিয়ে কবিতা রচনার চেষ্টা করেন নি। জসীমউদ্দীন আমাদের পড়াতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কুহু ও কেকা' বইটি। এই গ্রন্থের কিছু নির্বাচিত কবিতা আমাদের পাঠ্য ছিল। এর মধ্যে একটি কবিতার নাম ছিল 'চার্বাক ও মঞ্জুভাষা'। চার্বাক ছিলেন নাস্তিক। কিন্তু মঞ্জুভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তার চিত্তে প্রণয়ের সঞ্চার হল এবং তিনি বিশ্বাসী হলেন। জসীমউদ্দীন সুর করে কবিতা পড়তেন এবং পাঠ শেষে টেবিলে চাপড় দিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন। আমি তাঁর ব্যাখ্যা পদ্ধতি কখনই গ্রহণ করি নি কিন্তু ক্লাসে সবসময়ই উপস্থিত থাকতাম।

জসীমউদ্দীনকে ভালো লেগেছিল অন্য কারণে। তিনি ছাত্রদের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে মিলিত হতেন এবং কখনও কখনও তাদের নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন। একবার তাঁর সঙ্গে সদরঘাটে ডিঙ্গিনৌকা ভাড়া করে নদীর ওপারে জিঞ্জিরা গিয়েছিলাম। অপরিচিত জায়গা কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই জসীমউদ্দীন একটি পরিচিত পরিমণ্ডল গড়ে তুললেন। একটি মুদী দোকানের রোয়াকে বসে গ্রামের মানুষের সঙ্গে সুখদুঃখের কথা বলতে লাগলেন। মুদী দোকানের মালিক আমাদের ঝালমুড়ি খেতে দিল। জিঞ্জিরায় গ্রামের বাজারের পাশে কয়েকটি ঘরের সামনে সেজেগুঁজে কিছু মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। জসীমউদ্দীন তাদের মা-বোন ডেকে তাদের সঙ্গেও সুখদুঃখের গল্প বলতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি তার মোটা গলায় গান ধরেছিলেন মনে আছে। তারপর একটি ছিপছিপে কালো রঙের মেয়ে সুরেলা কণ্ঠে একটি গান গেয়েছিল। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার আগ্রহে জসীমউদ্দীনের চিত্তে কোনো বিকার ছিল না। তিনি সকলের সঙ্গেই সহজ হতে পারতেন। তাঁর চরিত্রের জীবনময়তা তাঁকে মানুষের খুব নিকটে পৌঁছে দিত।

তখন আমার বয়স উনিশ-কুড়ি। সে সময় আমি লেখক হিসাবে পরিচিত হয়েছিলাম। প্রথম প্রথম ক্লাসের পাঠক্রমকে অবলম্বন করে বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখতাম। কিন্তু

www.pathagar.com

সব ক্ষেত্রেই নিজের বিবেচনাকে প্রাধান্য দিতাম। সত্যেন দত্তের উপর যে পাঠ আমি জসীমউদ্দীনের কাছ থেকে পেয়েছিলাম তা আমি মান্য করতে পারি নি। আমি নিজের বিবেচনা ও বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে সত্যেন দত্তের উপর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। কোলকাতা গিয়ে সে প্রবন্ধটি সুধীন দত্তের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছিলাম। আমার এ লেখাটি তিনি পরিচয় পত্রিকায় ছেপেছিলেন। দীর্ঘ প্রবন্ধ পরিচয়ের অনেক পাতা দখল করে রেখেছিল। আমার সৌভাগ্য এখানে যে সুধীন দত্ত আমার প্রবন্ধটি ছেপে আমাকে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে স্বাগত জানিয়েছিলেন। প্রবন্ধটি মুদ্রিত হবার পর আমি অত্যন্ত দ্বিধা এবং বিনয়ের সঙ্গে সুধীন দত্তের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'প্রবন্ধটি ছাপতে গিয়ে আমি ভেবেছিলাম আপনি একজন গুরুগম্ভীর অধ্যাপক কিন্তু এখন দেখছি বালক। তবে আমি খুশী হয়েছি আপনার সাহস দেখে। সাহিত্য হচ্ছে সাহসের সামগ্রী, জীবনকে প্রচণ্ডভাবে অধিকার করবার ইচ্ছায় সাহিত্যিককে অগ্রসর হতে হয়। তাই সাহিত্যকর্মে কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হবেন না' সুধীন দত্তের এই নির্দেশ আমি সর্বদাই মেনেছি, প্রথম দেখায় সুধীন দত্তকে সংযত-বাক, পরিচ্ছন্ন এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব মনে হয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষার অনুশাসনলব্ধ একটি প্রশান্ত শৃংখলা তাকে আবরিত রেখেছিল। যেখানে বুদ্ধদেব বসু বিনয়ী ও তরল ছিলেন, সুধীন দত্ত সুদৃঢ় ব্যঞ্জনায় প্রকাশমান ছিলেন। কুশলী সুস্পষ্ট উচ্চারণ শব্দকে যেমন দৃশ্যমান করে, সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত আচরণ তেমনি সুধীন দত্তকে দৃশ্যমান করেছিল।

আমার ওপরের ক্লাসে পড়তেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। এ পার্থক্য সত্ত্বেও কিরণশঙ্কর আমার খুব অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন। অন্তরঙ্গ হবার কারণ পরিচয়ের এ প্রবন্ধটি। একই সংখ্যায় কিরণশঙ্করের একটি কবিতা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে কিরণশঙ্কর আমাকে খুঁজে বের করলেন। তার পর থেকে আমরা অন্তরঙ্গ অভিনিবিশে সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত হলাম। কিরণশঙ্করের পিতা বিজয়রঞ্জন সেনগুপ্ত কলেজে আমাদের ভূগোল পড়াতেন। কিরণশঙ্করের নবাবপুরের বাড়িতে আমি প্রায়ই যেতাম। কিরণশঙ্করের পরামর্শ মত আমি মোহিতলাল মজুমদারকে দেখতে গিয়েছিলাম। সে বয়সে মোহিতলালের সমর্থন উৎসাহ এবং আশ্বাস আমি পেয়েছিলাম। মোহিতলাল সাধারণত কাউকে বড় একটা প্রশংসা করতেন না। কিন্তু আমার লেখাটি পাঠের পর আমার প্রতি তার একটি মমতা এবং আকর্ষণ গড়ে ওঠে। আমি প্রায়ই তার বাসায় বিকেলবেলা গিয়ে বসতাম। মোহিতলালকে কখনও একা দেখি নি।

সবসময় তার আসর জমজমাট থাকত। তিনিই কথা বলতেন আর সবাই শুনত। তার ওখানে কবি জসীমউদ্দীন আসতেন, অধ্যাপক পি কে গুহ আসতেন, মাঝে মাঝে অবশ্য কিছু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আনাগোনাও দেখতাম। একদিন মোহিতলাল মজুমদার তার লেখা একটি কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। কবিতাটির নাম ছিল 'আলমগীর ঃ জিন্দাপীর।' কবিতাটি 'নাদির শাহের জাগরণ' নামক কবিতার ঢঙে লেখা। কবিতার বিষয়বস্তু এরকম ঃ কোনো এক যুদ্ধে আওরঙ্গজেব নেতৃত্ব দিচ্ছেন। যুদ্ধের মধ্যে নামাজের সময় হল এবং আওরঙ্গজেব যুদ্ধক্ষেত্রেই পশ্চিমমুখী হয়ে নামাজ পড়া আরম্ভ করলেন। আলমগীরকে ঐ অবস্থায় দেখে তার সৈন্যদের মনে সাহস জাগল। তারা দ্বিগুণ উৎসাহে 'আলমগীর জিন্দাপীর' বলে শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই কবিতাটি মোহিতলালের কোনো

www.pathagar.com

গ্রন্থে স্থান পায় নি। কেন পায় নি জানি না। সম্ভবত হিন্দু সমাজের সমালোচনার ভয়ে তিনি এ কবিতাটি পরবর্তী পর্যায়ে অস্বীকার করেছেন। মোহিতলাল মজুমদার কবি হিসাবে একটি বিশেষ পরিচয়ে উদ্ভাসিত ছিলেন কিন্তু সাহিত্যের বাইরে সামাজিক নিবন্ধ রচনায় তিনি নিজেকে মৌলবাদী হিন্দু হিসাবে প্রমাণিত করেছিলেন। মোহিতলালের দুর্ভাগ্য এখানে যে তিনি স্বেচ্ছায় তার সমাজের এবং সাহিত্যের সংস্কারের কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। কিন্তু এই নিযুক্তি কেউ মেনে নেয় নি। তার ক্রোধ এবং ক্ষুব্ধতা তাকে দূরেই সরিয়ে ফেলেছিল।

॥২৩॥

সাবসিডিয়ারী বাংলা ক্লাসে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা ছিল বেশী। ছেলেরা বসতো এক দিকে, মেয়েরা অন্যদিকে। শিক্ষকের মুখোমুখি বসতাম আমরা আর শিক্ষকের ডান দিকে আলাদাভাবে সাজানো বেঞ্চে মেয়েরা বসতো। আমরা ঘণ্টা পড়লেই ক্লাসে গিয়ে ঢুকতাম, মেয়েরা আসতো একটু পরে শিক্ষকদের সঙ্গে। ক্লাসে প্রথম দিন চোখ তুলে চাইতেই সুজাতাকে দেখলাম। আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। কলেজে থাকতে পরিমল বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কয়েকদিন সুজাতার দেখা পেয়েছিলাম। তার ঘন কালো চুলের কথা আগেই বলেছি, সে চুল আমার দৃষ্টিকে অভিভূত এবং আচ্ছন্ন করেছিল। প্রথম দিন ক্লাস থেকে বেরিয়ে করিডোর দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছি। করিডোরের শেষ প্রান্তে বারান্দার দিক থেকে মেয়েরা তখন এগিয়ে এসেছে, ওদের মাঝখান থেকে সুজাতা এক পাশ কেটে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো 'কেমন আছেন? আমাদের বাসায় আর যান না কেন? যাবেন কিন্তু।' আমি মাথা নাড়লাম শুধু। তারপর তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করলাম। তবু সঙ্গে সঙ্গে আমি যেতে পারি নি। তবে আস্তে আস্তে, দ্বিধা থাকলেও মাঝে মাঝে সুজাতাদের বাসায় যাওয়া আরম্ভ করলাম।

একদিনের কথা বেশ মনে আছে। আমি লাইব্রেরীতে বসে পড়াশোনা করছি। লাইব্রেরীর মুখে সুজাতাকে দেখলাম। মনে হল সে আমার দিকে ইশারা করছে। আমি বই ফেরত দিয়ে লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সুজাতা বললো, 'চলুন আমাদের ওখানে যাওয়া যাক।' আমরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে অপরিচিতের মতো বেশ কিছুটা ব্যবধান রেখে হাঁটতে লাগলাম। নিমতলি পেরিয়ে আমরা পাশাপাশি হলাম। তারপর হেঁটে সেগুনবাগিচায় সুজাতাদের বাসায় পৌঁছলাম। বিকেল বেলা আকাশ পরিষ্কার থাকলেও সেগুনবাগিচার কাছাকাছি থাকতেই এক পশলা বৃষ্টি নামলো। খুব বিপুল বৃষ্টি নয়, অল্প এক পশলা। আমাকে নিচের ঘরে বসিয়ে সুজাতা উপর তলায় গেল। ওরা ওপর তলায়ই থাকতো তবে নিচের তলায় সিঁড়ির নিচে একটি ঘর ছিল। সেখানে বাইরের অভ্যাগতরা এসে বসতেন। একটু পরে সুজাতা নেমে এল। এই প্রথম সুজাতাকে মুখোমুখি খুব সুস্পষ্ট দেখলাম, মনে হল। সুজাতার রঙ শ্যামলা, খুব আকর্ষণীয়া নয় কিন্তু চোখ দুটি বেশ বড় এবং টানা টানা। চোখের দৃষ্টিতে কৌতুক ছিল। তবে তার মাথা ভরা জমাট বাঁধা চুল ছিল। এই চুল তার হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তো। আমার কাছে এই চুলের আকর্ষণ ছিল মারাত্মক। অনেক পরে জীবনের অন্যবিধ লগ্নে যখন সুজাতার প্রতি

www.pathagar.com

আকর্ষণের কথা ভেবেছি তখন চিন্তা করে দেখেছি আসলে সুজাতার প্রতি হয়তো আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল না, আকর্ষণ ছিল চুলের প্রতি। কেন এই আকর্ষণ তা আমি ব্যাখ্যা করতে পারবো না। তবে আমার মনে হয় বিভিন্ন কবিতায় কেশ বিলাসের বর্ণনা আমাকে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। আমার মনে আছে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর মাঝে মাঝে সুজাতাকে তার মাথার চুল খুলে দিতে বলতাম। সেও হাসিমুখে তার মাথার চুল খুলে শাড়ির উপর দিয়ে বিছিয়ে দিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াতো। আমি অনিমেষ নয়নে কালো চুলের এই বিনম্র বিন্যাস অভিভূত হয়ে লক্ষ্য করতাম।

সে দিন সুজাতা নিচে নেমে এসে আমার সঙ্গে যেসব কথাবার্তা বললো, সেগুলো অনেকটা সামঞ্জস্যহীন বিক্ষিপ্ত কথা। আমি বুঝতে পারছিলাম সে তার বক্তব্য গুছিয়ে বলতে পারছে না অথবা হয়তো তার বক্তব্যই নেই। হঠাৎ খেয়ালের বশে সে আমাকে ডেকেছে এবং আমিও কোনো চিন্তা না করে উপস্থিত হয়েছি। এভাবেই বোধহয় জীবনে লগ্ন আসে এবং লগ্ন চলে যায়। এবং আমাদের ব্যাকুলতা পূর্বের মতোই থাকে। আমার পরিবার পরিজনদের মধ্যে আমি যেসব রমণীকুলের সান্নিধ্যে বড় হয়েছিলাম তারা আমার মা, খালা এবং বোন। এদের ঠিক আমার নিজের অস্তিত্বের অংশ হিসাবেই ভেবেছি। কখনোই ভিন্ন প্রকৃতির আকর্ষণ হিসাবে চিন্তাও করি নি। সুজাতাই আমার জীবনে প্রথম রমণী যার কাছে আমি আনন্দ এবং সম্মোহনের দীক্ষা পেয়েছিলাম। সুজাতার কয়েকজন বোন ও বাড়ীতে থাকতো। তাদের মধ্যে একজন সুযোগ পেলেই আমাকে বিরক্ত করতো। সে ভদ্রমহিলা কি কারণে যেন তার স্বামীর সঙ্গে থাকতেন না এবং আমি যখনই ও বাসায় যেতাম আমাদের কথাবার্তার মধ্যে তিনি অকস্মাৎ ঘরে ঢুকে পড়তেন। একদিনের কথা মনে আছে। সেদিন আমি সেগুন বাগিচার বাসায় গিয়ে সুজাতাকে না পেয়ে চলে আসছিলাম। তখন এ ভদ্রমহিলা আমাকে ডেকে নিয়ে ঘরে বসালেন। নিজেও ঘরে এসে আমার সঙ্গে নানা ধরনের কথা জুড়ে দিলেন। আমি মেয়েদের দিকে সরাসরি তাকিয়ে কথা বলতে পারতাম না। আমার কেমন যেন সংকোচ লাগতো। এই ভদ্রমহিলা আমার এই লজ্জিত বিনম্র ভঙ্গি দেখে বললেন, 'তুমি লজ্জা পাচ্ছো কেন? আমি তো একজন মেয়ে মানুষ, আমাকে লজ্জা পাবার কি আছে?' এ কথায় আমি আরো সংকুচিত হলাম। ভদ্রমহিলা হঠাৎ আমার সামনে এসে আমার থুতনিতে হাত দিয়ে আমার মুখ উঁচু করতে গেলেন। আমি ভীষণ বিব্রত হয়ে উঠে দাঁড়াতে গেলাম। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে ঠিক মতন উঠে দাঁড়াতে না পেরে ভদ্র মহিলার গায়ের উপর পড়ে গিয়েছিলাম। ভদ্র মহিলা তখন হেসেছিলেন আমার মনে আছে। আমি সে দিন আর ভয়ে বেশিক্ষণ বসিনি। তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিলাম।

সুজাতাদের বাসায় পুরুষ মানুষের সংখ্যা ছিল খুব কম। পরিমল বাবুই প্রধান পুরুষ। আর তার একভাই ছিল। যে এক সময় সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল। সে প্রায়ই বাসায় থাকতো। পরিমল বাবুও প্রায় অনুপস্থিতির মতোই বাড়িতে থাকতেন। বাড়িতে ছিল পরিমল বাবুর স্ত্রী এক কন্যা এবং পরিমল বাবুর স্ত্রীর তিনজন কি চারজন বোন। এক অর্থে বলা যায় গৃহটি ছিল মহিলা অধ্যুষিত। তবে এদেরও প্রায় দেখা যেত না। নিচের ঘরটিতে সুজাতার গানের মাস্টার আসতো। আমিও যখন ও বাসায় যেতাম

www.pathagar.com

তখন নিচের ঘরটিতেই বসতাম। পরিমল বাবুর কাছে যারা দেখা করতে আসতো তাদের তিনি তার শোয়ার ঘরে নিয়ে যেতেন। আমি একদিন মাত্র পরিমল বাবুর ভাইকে ও বাসায় দেখেছিলাম। ভদ্রলোক বাইরে থেকে হৈ হল্লা করে এসে মিনিট পাঁচ-ছয় পরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

সুজাতার সঙ্গে পরিচয়ের পর প্রথম প্রথম আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কথা আলোচনা করতাম, পাঠ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করতাম। আস্তে আস্তে গানের কথা বলতে লাগলাম এবং অবশেষে নিজেদের কথা। কি করে কথার পিঠে কথা আসে জানি না। কিন্তু মানুষ বোধহয় নিজের ভালো লাগা না লাগার কথা সর্বদাই বলতে চায়। সুজাতা একদিন বললো যে পুরুষ মানুষের হাত তার শরীরে লাগলে তার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে এই বলে সে তার ডান বাহুটা আমার দিকে এগিয়ে দিল, বললো, দেখুন আমার লোমগুলো কেমন 'খাড়া হয়ে গেছে'। ক্রমশ আমরা নিকটবর্তী হচ্ছিলাম দ্বিধা কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা ব্যবধান ছিল। যেটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না। আমার মনে হত বোধহয় কথার সমুদ্রের মধ্যে অবগাহন করলেই আনন্দের পরিসীমার মধ্যে থাকবো। কিন্তু তবু আনন্দ পুরোপুরি হত না। ব্যাকুলতা জাগতো।

কখনও মনে হতো হাতটা একবার হাতে তুলে নিলেই হয়। কিন্তু কেন যেন পারতাম না। পার্ল বাক-এর একটি গল্প পড়েছিলাম। একজন যুবক এক ঝড়ের রাতে তার প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলছিল। কিন্তু হঠাৎ কি হল সে ভয় পেয়ে দৌড়ে ঘর থেকে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে গেল। জীবনের শেষ পর্যায়ে এক সময় এদের আবার দেখা হয় তখন ভদ্রলোক মহিলাকে জিজ্ঞেস করেন 'সেদিন আমি যদি পালিয়ে না গিয়ে তোমাকে কাছে টানতাম তাহলে তুমি কি করতে?' মেয়েটি হাসতে হাসতে উত্তর করলো, 'আমি আনন্দে সাড়া দিতাম'। সুজাতার সঙ্গে পরিচয়ের সময় এ গল্পটি আমি পড়েছিলাম। আমি তাই ভাবতাম হয়তো অগ্রসর হওয়া উচিত। কিন্তু কেন যেন অগ্রসর হতে পারতাম না। সমস্ত শরীর বিক্ষুব্ধ হত। কিন্তু কেমন এক প্রকার সংকোচ এসে আমাকে বিকল করে তুলতো। সম্ভবত এর একটা কারণ ছিল যে আমি পিতামাতার কাছ থেকে বুদ্ধি যুক্তি এবং বিবেচনা শিখেছিলাম। এই বুদ্ধি, যুক্তি এবং বিবেচনার সাহায্যে আমি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। ছোট বেলা থেকে একটা ন্যায় ও নীতিনির্ভর কার্য পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আমি বড় হয়েছি। তাছাড়া একটি বিশ্বাসের বিপুল স্বীকৃতি নিয়ে আমরা আমাদের জীবনকে উদ্দেশ্যময় করতে চাইতাম। তাই ঠিক অপরাধবোধে নয় কিন্তু আমার জীবনবৃত্তের ধারায় আমি যে বোধের মধ্যে মানুষ হয়েছিলাম সেই বোধের শাসন আমার জন্য প্রচণ্ড ছিল।

এক দিনের কথা মনে পড়ে। সন্ধ্যার পর সুজাতাদের বাসায় গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ আগে সুজাতার গানের মাস্টার এসেছিলেন। হারমোনিয়ামটি ঘরের মধ্যেই ছিল। আমি হারমোনিয়াম দেখে সুজাতাকে গান গাইতে বললাম। সে প্রথম রজনীকান্তের একটি গান গাইল– 'তুমি নির্মল করো মঙ্গল করো।' বোধহয় সেদিনই সে ঐ গানটি শিখেছিল। তার পরে বললো 'না অন্য একটা গান গাই। আজ বোধহয় পূর্ণিমা, আকাশে চাঁদ উঠেছে।' এই বলে সে গাইতে আরম্ভ করলো, 'আকাশে উঠেছে চাঁদ ধীরে বহে দখিন হাওয়া, আজ রাতে কোনো কথা নয় শুধু চোখে চোখে চাওয়া।' গান শেষ হলে গানের রেশ অনেকক্ষণ

www.pathagar.com

পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। চলে আসবো বলে যখন উঠে দাঁড়িয়েছি তখন সুজাতা আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে গেল। উপর থেকে একটি গোলাপ ফুল হাতে নিয়ে নামলো। আমার সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে আমার হাতে গোলাপ ফুলটি দিয়ে সে তার মুখ উঁচু করে আমার মুখের দিকে তাকালো। আমার স্নায়ুর মধ্য দিয়ে কেমন একটা শীতল শিহরণ বয়ে গেল। আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে গেলাম। সুজাতা মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে আমার কাছ থেকে সরে গেল। একটি সম্ভাব্য আনন্দের লগ্ন সেদিন বিমূঢ় হয়ে হারিয়ে গেল।

॥২৪॥

যৌবনে শব্দের মহিমায় আমরা জীবনকে আবিষ্কার করি। এক একটি শব্দ মোহনীয় তাৎপর্যে আমাদের জীবনকে প্লাবিত করে। কাব্যপাঠ করতে গিয়ে এটা আমি অনুভব করেছি। দেহে যখন যৌবন, শব্দ তখন নতুন প্রাণদ ঝংকারে স্নায়ুর রক্তস্রোতকে উষ্ণ করে। রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থ আমাদের পড়াতেন মোহিতলাল মজুমদার। 'কল্পনার' অনেকগুলো কবিতায় নবীন যৌবনের রসাবেশ আছে। রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য নিপুণতায় বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে যৌবনের স্বাদকে কবিতায় পরিস্ফুট করেছেন। মোহিতলাল পড়াতেন খুব সুন্দর করে। তিনি প্রথমে কবিতাটি আবৃত্তি করতেন, পরে তার আবেগগত ব্যাখ্যা করতেন এবং অবশেষে এক একটি শব্দ ধরে তার বিশদ বিবৃতি দিতেন। কল্পনার মধ্যে অনেকগুলো কবিতা আছে যেখানে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যযুগের বিচিত্র উদাহরণ এসেছে। সে যুগের যৌবনবতী রমণীকুল ছন্দ এবং ধ্বনিতে উচ্চকিত হয়ে আমাদের দৃষ্টিতে ভাস্বর হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাদের দেহসৌষ্ঠব বর্ণনা করেছেন, তাদের শরীরের মসৃণতা ও উত্তাপ আমাদের অনুভূতির মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। 'চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে' এ চরণটি মোহিতলাল মজুমদার এত সুন্দরভাবে বুঝিয়েছিলেন যে আজো আমার সেদিনের প্রতিটি উচ্চারণ কানে বাজছে। মোহিতলাল বলছিলেন যে পয়োধর শব্দটি একটি মসৃণতা এবং পেলব মাধুর্যের সাক্ষ্য দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মাধুর্যের সাক্ষ্য দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তরলতা এবং নমনীয়তাকে দৃশ্যগোচর করে। তাছাড়া সম্পূর্ণ চরণের মধ্যে ধ্বনির দিক থেকে এ শব্দটি একটি সৌষম্য নির্মাণ করেছে। তিনি পয়োধরের সমার্থক আরো অনেক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন সংস্কৃত এবং বাংলা কাব্যে পাওয়া যায় এবং এ শব্দগুলির তিনি পারস্পরিক তুলনাও করেছিলেন। আমরা মোহিতলালের ব্যাখ্যা শুনে একটু শংকিত, একটু লজ্জিত, একটু চঞ্চল হয়েছিলাম কিন্তু প্রগাঢ় তৃপ্তি পেয়েছিলাম। তিনি 'পসারিণী' কবিতা পড়াতে গিয়ে শব্দের অর্থ বৈচিত্র্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তা আজো মনে পড়ে। 'পসারিণী'তে দুটি মানস-চৈতন্য মুখোমুখি হয়েছে, একটি হচ্ছে সমৃদ্ধমান শিক্ষিত কবির মানস-চৈতন্য আর একটি হচ্ছে লোকজীবনের সীমাবদ্ধ আকাঙ্ক্ষার একটি রমণীর মানস-চৈতন্য। রবীন্দ্রনাথ যখন নিজের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করেছেন তখন তিনি তৎসম শব্দের ধ্বনি ব্যঞ্জনায় একটি আক্ষেপকে রূপ দিয়েছেন। আবার 'পসারিণী'র জীবনের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে তার সীমিত আকাঙ্ক্ষার সতর্কতায় বিচলিত হয়েছেন। 'পসারিণী' সংক্রান্ত উক্তির মধ্যে গ্রামীণ কথকতা এবং বুলি এসে উপস্থিত হয়েছে। যেন 'থাক তব বিকিকিনি, ওগো শ্রান্ত পসারিণী এইখানে বিছাও অঞ্চল।' এই 'বিকিকিনি' কথাটি ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

করতে গিয়ে মোহিতলাল বলেছিলেন, এ কথাটি ব্যবহারের ফলে পসারিণীর জীবন যাপন এবং সীমিত আকাঙ্ক্ষা অসাধারণভাবে আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়েছে। গ্রামের বাউল গানে পাওয়া যায়, 'দধিদুগ্ধ নট হলো, 'বিকি' বয়ে যায়। এখানে বিকি শব্দটি যেভাবে নিগূঢ় উৎপ্রেক্ষায় একটি সাধারণ গোয়ালায় জীবনধারাকে উন্মোচিত করছে, তেমনি 'পসারিণী' কবিতার 'বিকিকিনি' শব্দদ্বারা রবীন্দ্রনাথ পসারিণীর জীবনক্ষেত্রকে আমাদের সামনে উদঘাটিত করেছেন।'

মোহিতলাল প্রায়ই বলতেন, 'চিরস্থির ধ্রুব বলে কিছু নেই, সবই চঞ্চল এবং পরিবর্তনশীল এবং এ পরিবর্তনশীলতার মধ্যেই যত বৈপরীত্য। যেমন সাদা কাগজে কালো রেখা টানলে রেখাটি ফুটে ওঠে, তেমনি বিপরীত অভিজ্ঞানের মধ্যেই সত্যের অভিপ্রায় প্রকাশ পায়।' এই বলে বলিষ্ঠ কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন তারই লেখা 'পুরুরবা' কবিতা থেকে ঃ

'নিত্যরে কে বাসে ভালো ? –
চিরস্থির ধ্রুব/অনন্ত-রজনী
কিংবা অনন্ত দিবস?/নহি তায়
অনুরাগী, আমি চাই আলো/
ছায়ারি পশ্চাতে, চাই ছন্দ, চাই
গতি/রূপ চাই ক্ষুব্ধ-সিন্ধু-
তরঙ্গ শিয়রে/ধরিতে না ধরা
যায়, পলকে লুটায়।'/

আমাদের সঙ্গে পড়তো ইন্দ্র সাহা। পড়ালেখায় মনোযোগ ছিল না, অভিনয় করে বেড়াত। অভিনয় কুশলতার কারণে আবৃত্তিতেও সে ছিল অত্যন্ত পারদর্শী। মোহিতলালের 'কালাপাহাড়' কবিতাটি দীপ্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করত। একদিন মোহিতলাল তার আবৃত্তির ভুল ধরলেন। আমরা নীলক্ষেতে মোহিতলালের বাসায় গিয়েছিলাম, মোহিতলাল ইন্দু সাহাকে বললেন, 'তুমি তো খ্যাতিমান অভিনেতা, আবৃত্তিও ভালো কর। শুনেছি 'কালাপাহাড়' নাকি তুমি আবৃত্তি করতে পার। শুনি একবার। ইন্দু আবৃত্তি করলো–

'ব্রাহ্মণ-যুবা যবনে মিলেছে পবন
মিলিছে বহ্নি সাথে/এ কোন
বিধাতা বজ্র ধরেছে নবসৃষ্টির
প্রলয় রাতে।/মরুর মর্ম বিদারি
বহিছে সুধার উৎস পিপ্সাহরা/
কল্লোলে তার বন্যার রোল।
কূল ভেঙ্গে বুঝি ভাসায় ধরা/
ওরে ভয় নাই, মুকুটে তাহার
নবারুণ ছটা ময়ূখ হার/কাল
নিশিথিনী লুকায় বসনে। সবে
দিল তাই নাম/তাহার কালাপাহাড়।'/

www.pathagar.com

আবৃত্তি শুনে মোহিতলাল বললেন, বক্তব্যকে গ্রহণ না করতে পারলে আবৃত্তি শুধু শব্দোচ্চারণে পরিণত হয়। তুমি অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারো নি তাই তোমার আবৃত্তি শ্রবণসুখকর হয়েও প্রাণদ হয় নি। তোমাকে কবিতাটির তাৎপর্য বুঝতে হবে। কালাপাহাড় এখানে অসত্য এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক। একজন হিন্দু রাজপুত্র মুসলমান হয়েও মন্দির ও বিগ্রহ ভাঙতে লাগল। কেননা মানুষ আচারের বন্ধনদশায় আপনাকে নিরর্থক করেছে। তাই ধ্বংসের মধ্যে তাকে সত্যকে পেতে হবে। জীব চেতনাময় কিন্তু জড় অসাড় ও চেতনাহীন অথচ প্রতিদিন পূজার্চনায় মানুষ জীবের চেতনা জড়ের উপর আরোপ করে শুক্লনিশাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে। আমি এই মোহের অবসান চেয়েছি তাই কালাপাহাড় আমার কাছে 'দেবতা-দমন যুগাবতার'।

১৯৪১ কি ৪২ হবে, ঠিক মনে পড়ছে না, নজরুল ইসলাম ঢাকা বেতার কেন্দ্রের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন। সে সময় ফজলুল হক হলে নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। নজরুল ইসলাম একের পর এক গান গেয়েছিলেন, আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে সে গান শুনেছিলাম। সেদিন মোহিতলাল ক্লাস নিতে পারেন নি। তার ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রী তার সম্ভাব্য রোষকে উপেক্ষা করে আশু আনন্দের অংশীদার হয়েছিল। বিকেলে মোহিতলালের বাসায় গিয়েছিলাম কবি জসীমউদ্দীনের সঙ্গে। মোহিতলাল গোলাপ গাছের পরিচর্যা করছিলেন, হাতে একটি কাঁচি। ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দেখলেন, কথা বললেন না। জসীমউদ্দীন বললেন, 'মোহিতদা, কেচিটা আমাকে দিন, আমি কিছু কাজ করি।'

মোহিতলাল বললেন, 'কেচি নয়–কাঁচি এবং তা তোমাকে দেওয়া যায় না।'

জসীমউদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?' উত্তরে মোহিতলাল বললেন, দেখ গোলাপ গাছ হচ্ছে সম্ভ্রান্ত গাছ। তার নাগরিক পরিচর্যার প্রয়োজন। গোলাপ হচ্ছে আর্যপারসিক সভ্যতার প্রতীক। তোমার গ্রামে এ গাছ পাবে না। তোমার কবিতায়ও এ গাছের কথা নেই। তোমার হাতে কাঁচি দিলে তুমি এ গাছ সাবাড় করে দেবে।'

জসীমউদ্দীন রুষ্ট হন নি, হেসেছিলেন। পরে আমরা যখন ঘরে গিয়ে বসলাম, মোহিতলাল জিজ্ঞেস করলেন, জসীম, আজ তোমার ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা এসেছিল?

জসীমউদ্দীন উত্তরে বললেন, 'আমি তো ক্লাস ছুটি দিয়েছিলাম, ছেলেমেয়েরা বলল নজরুল ইসলামের গান শুনবে। আমিও গিয়েছিলাম।

মোহিতলাল বললেন, গানের জন্য ক্লাস ভেঙ্গে দিতে হবে এ কোন নীতি? এভাবেই সমাজে বিশৃংখলা আসে, সত্যবোধ আহত হয় তাছাড়া নজরুল ইসলাম এমন কি মহৎ যে তার জন্য ক্লাসকে অস্বীকার করতে হবে?

নিতান্ত ক্ষোভের কথা। জসীমউদ্দীন হেসে বললেন, মোহিতদা, আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন। নজরুল ইসলামকে আপনি খুব ভালোবাসতেন তাই তার আচরণে আপনি ব্যথা পেয়েছেন। আপনি বড়, আপনি কি তাকে কাছে টেনে নিতে পারেন না?

মোহিতলাল বললেন, 'না আমি পারি না। সে তো আমার কথা শোনে নি। আমি তাকে ডিসিপ্লিনের মধ্যে আনতে চেয়েছিলাম। তার মধ্যে আশ্চর্য সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অসতর্কতার জন্য এবং নির্বুদ্ধিতার জন্য সম্পূর্ণতা এল না। সে কবিতা লিখেছে উপন্যাস লিখেছে, নাটক লিখেছে, আরও অনেক কিছু লিখেছে কিন্তু সবগুলোই সে আরম্ভ করেছে শেষ করে নি। বৃহতের সম্ভাবনা দেখলাম কিন্তু সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা পেলাম না।'

www.pathagar.com

আবার মোহিতলালের মুখে নজরুলের প্রশংসাও শুনেছি। একবার সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের আবৃত্তি প্রতিযোগিতার জন্য তিনিই বেছে দিয়েছিলেন 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদাহাম'। বলেছিলেন ছন্দ পরীক্ষার ক্ষেত্রে এ কবিতাটি একটি অনন্য নিদর্শন। বিচিত্র ধ্বনি-যমকের অকুতোভয় বিন্যাসে এর সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন আর কোনও কবিতা বাংলা সাহিত্যে নেই।

যেমন মোহিতলালের কাছ থেকে তেমনি ডক্টর সুশীলকুমার দের কাছ থেকে আমি কবিতায় শব্দ ব্যবহার এবং ছন্দের অনুবর্তন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছিলাম। সুশীলকুমার দে কবিতায় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কুশলী বিবেচক ছিলেন। বিশেষ করে ছন্দের ধ্বনিগত পরিমাপ অত্যন্ত আশ্চর্য সুষমায় তিনি নির্ণয় করতে পারতেন। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে পারঙ্গম সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাজ্ঞ অধিকারী এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দীপ্ত মননশীল গবেষক সুশীলকুমার আজো অতুলনীয়।

॥২৫॥

১৯৪০ সাল থেকেই কলকাতার সঙ্গে আমার যথার্থ মৈত্রী। স্কুলে থাকতেও এবং কলেজকালেও কলকাতায় গিয়েছি কিন্তু কলকাতা আমার একান্ত অভিনিবেশের শহর হল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পর থেকেই। তখন থেকেই কাজী আফসারউদ্দীন আহমদ, ফররুখ আহমদ এবং সিকান্দার আবু জাফর আমার সাহিত্য-সহচর। কখন কি করে এদের বৃত্তের মধ্যে এসে পড়েছিলাম মনে নেই, কি উপলক্ষে যে আমরা পরস্পরের সান্নিধ্যপ্রেমী হয়েছিলাম জানি না। শুধু মনে পড়ে এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে স্বস্তি পেতাম না। সাহিত্যের কলগুঞ্জন লিপিবদ্ধরূপে প্রকাশ পায় সত্যি কিন্তু লিপিকরণের পূর্বে বিভিন্ন পরিচয়ের সূত্রে তা সুস্থির যুক্তিতে ধরা পড়ে।

যৌবনকালে বন্ধুত্ব এবং প্রেম এসব পরিচয়ের সূত্র নির্মাণ করে। এদের তিনজনের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের একটি বিকীরণ ছিলো যা স্পর্শ করেছিলো। আফসারউদ্দীনের নীরব সমর্থনের ভঙ্গী, ফররুখের উচ্ছল প্রীতিময়তা এবং সিকান্দারের বলিষ্ঠ হস্তপ্রসারণ আমাকে তাদের নিকটের মানুষ করেছিলো। আমি জিজ্ঞাসার মাধ্যমে নয় কিন্তু নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় এদের নিকটে চলে এসেছিলাম। শওকত ওসমানের সঙ্গে পরিচয় আরও আগে। আমার ছোট ভগ্নীপতির এক ভাই ইসলামিয়া কলেজে পড়তেন। আমি যখন স্কুলে পড়ি। তারই বন্ধু শওকত এবং সে পরিচয়ে সে ভগ্নীপতির গৃহের সকলের সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্কে গৃহীত হয়েছিলো। স্কুলে থাকতেই কলকাতায় এসে শওকতকে চিনেছিলাম তখনই লক্ষ্য করেছি, তার মধ্যে দুটি মানুষ এক সঙ্গে বাস করছে–একজন সতত সাম্যবাদ প্রচারে উন্মুখ কিন্তু কর্মী নয় বলেই তা শব্দমাত্র উচ্চারণেই নিঃশেষিত, অন্যজন সরকারী কর্মজীবী মধ্যবিত্ত সংসারসেবী কিন্তু সংসারের কারোরই তার প্রতি নিরঙ্কুশ সমর্থন নেই। এহেন দ্বন্দ্বে আহত কিন্তু উত্তেজিত শওকত ওসমান কারো সঙ্গেই পরম নির্ভরতায় বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারছিল না। অন্ততপক্ষে আমার তো তাই মনে হয়েছে। তবুও শওকত ওসমানকে আমি কখনও অস্বীকার করতে পারি নি। বিরোধ এলেও পারিবারিক বেদনা এবং দুর্ঘটনায় সে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনও দাঁড়ায়। শওকত

www.pathagar.com

প্রচুর বই পড়তো বিশেষ করে মার্কসবাদ সংক্রান্ত। আমাকে প্রায়ই বলতো, 'প্রেরিত পুরুষ বা পয়গম্বরকে ঘৃণা করবে, ভালোবাসবে রাজনীতিবিদকে।' কথাটি বোধহয় লেনিনের। সে আমাকে রুশ বিপ্লবের উপর একটি চটি বই উপহার দিয়েছিলো ভিতরের সাদা পাতায় লিখেছিলো উপরের কথাগুলো। আমি তার কথায় তর্ক তুলি নি কিন্তু মেনেও নিই নি। ফররুখ শওকতের কথার পিঠে বলতো, 'শওকতের কথাটি একটু সংশোধন করলে ভালো হয়। কথাটি হবে 'পয়গম্বরকে ঘৃণা করবে এবং শয়তানকে ভালোবাসবে।' ফররুখ এভাবেই শওকতের সমাজতান্ত্রিক উষ্ণতার মধ্যে শীতল পানি ঢেলে দিত।

আহসান হাবীবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে ১৯৪৫ সালে যখন আমি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকরি করি। তবে আহসান হাবীবের কথা আগেই শুনেছিলাম। কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডে আজাদ অফিসে। হাবীবুল্লাহ বাহারকে বেশ উজ্জ্বল প্রাণবন্ত বলিষ্ঠ পুরুষ বলে মনে হয়েছিল। কথা বলতেন মোটা গলায়, কথায় কথায় হাসি ছিল। তার কথা শুনলে মনে হত অফুরন্ত ঐশ্বর্য সম্ভারে পরিপূর্ণতার আনন্দে তিনি ভরপুর রয়েছেন। অবশ্য এ ঐশ্বর্য ছিল প্রাণের ঐশ্বর্য। হাবিবুল্লাহ বাহারের মুখে মুসলমান তরুণ লেখকের গুণগান শুনেছিলাম। তিনি আহসান হাবীবের কবিতার সহজ লীলাময় ভঙ্গির প্রশংসা করেছিলেন মনে আছে। আজাদের সম্পাদক ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

তৎকালীন সময়ে তরুণ মুসলমান সাহিত্যসেবীকে সম্মুখবর্তী করার ক্ষেত্রে তাঁর প্রেরণা ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। আমাদের লেখাকে তিনি যেভাবে মমতার সঙ্গে মাসিক মোহাম্মদীর প্রতি সংখ্যায় চেপেছেন তা তাঁর ঔদার্য ও সাহিত্যপ্রীতির পরিচয় বহন করে। অবশ্য ঔদার্য না বলে বলা উচিৎ যথার্থ সাহিত্যবোধ। তিনি কবিতা বুঝতেন, কবিতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তার মূল্য নির্ধারণে সক্ষম ছিলেন। সেদিন যাদেরকে তিনি তুলে ধরেছিলেন তাদের কেউ বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে হারিয়ে যায় নি। ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, গোলাম কুদ্দুস এবং আমি। আমাদের অনেকেরই কাব্যক্ষেত্রে প্রথম মুদ্রিত প্রকাশ মাসিক মোহাম্মদীতে। আমরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে ক্রমশ ব্যতিব্যস্ত এবং জনসমর্থিত কবি হয়েছিলাম। ভালো মন্দ বিচারের কথা বলবো না, কেননা ভালোমন্দ বিচারটা সময়ে গড়ে ওঠে। প্রাথমিক অবস্থায় সমর্থনটাই প্রয়োজন। বাঙ্গালী পাঠক আমাদের প্রত্যেকের কবিতাকে সে সময় স্বাগত জানিয়েছিল। আমরা সবাই কিন্তু তখন এক প্রবৃত্তির কবিতা লিখতাম না। আহসান হাবীবের কবিতার ভঙ্গি যে রকম, গোলাম কুদ্দুসের কবিতা সে রকম ছিল না। একমাত্র ফররুখ এবং আমার কবিতার মধ্যে প্রায় একই প্রবৃত্তির ইচ্ছা এবং আনন্দ প্রকাশ পেয়েছিল। কলকাতা শহরে আমরা সবাই প্রায় একত্রিত হতে পারতাম। অবশ্য আহসান হাবীবকে আমরা কখনও আমাদের মধ্যে পাই নি।

এই সময়কালে রাজনৈতিকভাবে কোনো কোনো লেখকের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা কাজ করেছে। আবার কারো কারো মধ্যে প্রবল আগ্রহের সঙ্গে ইসলামের অতীত-পরিক্রমার একটা পরীক্ষা লক্ষ্য করি। আবু রুশদ এই দু'দলের কোনো দলের সঙ্গেই সংযুক্ত নয়। সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে সকল কর্মকাণ্ড থেকে এবং দৃষ্টিপাত করেছে কৌতুকের সঙ্গে সকলের দিকে। এর ফলে যে চিত্র সে আঁকতে সক্ষম হয়েছে তা নির্মম নির্ণেয়তার অনবদ্য এবং চাতুর্যময়।

www.pathagar.com

একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। ১৯৪১ কি ১৯৪২ সালে আমি কলকাতা গিয়ে এসপ্ল্যানেড ইস্টে এক আত্মীয়র বাসায় থাকতাম। সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে আমার সংযোগের ব্যবস্থা করতেন কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ। একদিন গোলাম কুদ্দুস এল এবং তার নব আবিষ্কৃত সমাজতন্ত্র ও শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা দিল। সে তার বন্ধু-বান্ধবকে তার বিশ্বাসের কথা জানাতে চাইছিল, সে আশা করছিল যেন সবাই তার পন্থা অনুসরণ করে। গোলাম কুদ্দুস তখন সবেমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে ওঠাবসা আরম্ভ করেছে। কর্মীপদ পেয়েছে বোধহয়। সুতরাং তার চেষ্টা ছিল তার বিশ্বাসের বৃত্তে তার বন্ধুবান্ধবকে টেনে আনবে। বাগবাজারে তার মামার বাড়িতে একটি ঘরোয়া বৈঠকের আয়োজন করেছিল এক রোববার সকাল দশটার দিকে। আমি মাহবুবুর রহমান খাঁকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। মাহবুবুর রহমান খাঁ ছিল আমার স্কুল জীবনের বন্ধু, খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁর ছেলে। মাহবুবুর রহমান ছিল আবার গোলাম কুদ্দুসের আপন খালাতো ভাই। যাই হোক আমি বাগবাজারে কুদ্দুসের মামার বাড়িতে গিয়ে দেখি সেখানে শওকত ওসমান, আবুল হোসেন, আবু রুশদ এবং গোলাম কুদ্দুস রয়েছে। আবু রুশদকে সেখানেই আমি প্রথম দেখলাম। ঘরের ভেতরে কয়েকটি মোড়া, একটি বেতের চেয়ার এবং একটি উঁচু চেয়ার ছিল। আবু রুশদ প্রথম থেকেই উঁচু চেয়ারটায় বসেছিল।

আমরা সবাই জড়ো হতে সে বললো, 'এখন আমাদের সভার কাজ আরম্ভ করা যাক। কুদ্দুস সাহেব কি একটা সমস্যার কথা বলেছিলেন। আমার মনে হয় আমরা আমাদের লেখার মধ্য দিয়ে সে সমস্ত সমস্যা নিজেদের মত করে সমাধান করতে পারবো, কি বলেন কুদ্দুস সাহেব? আমরা তাহলে এখন চায়ের প্রত্যাশা করতে পারি।' ইতিমধ্যে উপরতলা থেকে কুদ্দুসের মামা নেমে এলেন। আমাদের জন্য চা ডালপুড়ী এল। গোলাম কুদ্দুসের পরিকল্পিত রাজনৈতিক বিশ্বাসের ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ না দিয়ে আবু রুশদ সেদিন স্বাভাবিক চতুরতায় সভাকে পণ্ড করেছিল তা আমি কখনো ভুলবো না।

আবু রুশদের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায়। এ পরিচয়টি এবং অন্তরঙ্গতাটি ক্রমশ রূপ লাভ করে। বর্তমানে জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তকে যখন স্পর্শ করতে চলেছি তখনই আমরা একে অন্যের ওপর মানসিকভাবে নির্ভরশীল হয়েছি। জীবনের যে সময় একান্ত বন্ধুর প্রয়োজন ঠিক সে সময় আবু রুশদকে কাছে পেয়েছি। অন্যদের অনেকেই তো নেই। ফররুখ নেই। সিকান্দার নেই, আহসান হাবীব নেই, গোলাম কুদ্দুসও হারিয়ে গেছে। শওকত ওসমানকে আমার চিন্তা ও বিশ্বাসের বৃত্তে কখনো পাই না। একমাত্র আবু রুশদকেই পাই। ব্যক্তিগত জীবনে আবু রুশদ সুঠাম পরিচ্ছন্ন পুরুষ, যাকে বলে এ্যারিস্টোক্র্যাট। তার স্বভাবে এবং কর্মপদ্ধতিতে এর পরিচয় সবসময় পাওয়া যায়।

॥২৬॥

কলকাতায় ফররুখ প্রথমদিকে থাকতো যাদবপুরে, সেখান থেকে সকাল বেলা চলে আসতো বালুহাঁকাক লেনে সিকান্দারের বাসায়। সেখানে সারাদিন থেকে সন্ধ্যার পর ফিরে যেত। সে সময়টুকুতে সে যতটা সম্ভব কলকাতা শহরকে চষে ফেলতো। বেশ একটা

www.pathagar.com

উচ্ছলতায় এবং কৌতুকে ফররুখ তার সময়টিকে উজ্জীবিত করে রাখতো। এ সময়ে সে সাহিত্যচর্চা করতো না, অর্থাৎ সাহিত্য সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতো না। তার আলোচ্য বিষয় ছিল প্রাত্যহিক জীবনের নানাবিধ সাধারণ ঘটনা। বিশেষ করে সেইসব ঘটনা, যার মধ্যে কৌতুকের স্পর্শ আছে। সিকান্দার ছিল বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত, দীপ্তিমান। সকল ব্যাপারেই সিকান্দারের ছিল সুস্পষ্টতা। কেউ তাকে অপমান করলে সে প্রকাশ্যে তার অপমান করতো, কেউ তার সঙ্গে ছলচাতুরি করলে সে তার প্রতিশোধ নিত। কোনো এক ব্যক্তি তার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল একটি নির্দিষ্ট দিনে শোধ দেবে বলে। কিন্তু শোধ না দিয়ে সে যখন পালিয়ে বেড়াতে লাগলো তখন সিকান্দার একদিন সুযোগ বুঝে ধরে এনে প্রকাশ্যে রাস্তায় লাঠিপেটা করেছিল মনে আছে। শত্রুকে গোপনে ধরে ফেলার কৌশলও সিকান্দারের আয়ত্ত ছিল। রিকশাওয়ালা সেজে মাথায় লাল গামছা বেঁধে মুখটা কিছু আড়াল করে সেই রিকশায় সে তার বিরোধী ব্যক্তি চড়িয়ে নিয়ে আপন আস্তানায় চলে আসতো। এভাবে কলকাতা শহরে সিকান্দার বেশ একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। আমার মনে হয় শক্তিমান মানুষ তার প্রাণৈশ্বর্যের সন্ধান যখন পায় না তখন সে তার আবেগকে বিক্ষিপ্ত কুশলতার মধ্যে প্রকাশ করে। সিকান্দার তাই করতো।

তার এক বন্ধুর গন্ধতেলের দোকান ছিল। গন্ধতেলে কিছু লাভ হওয়ায় সিকান্দারের চাপে পড়ে সে একটি সেকেন্ডহ্যান্ড বেবী অস্টিন ৪০০ টাকায় কিনেছিল। গাড়িটি চলতে চলতে প্রায়ই থেমে যেত। একবার শিয়ালদার কাছে গাড়িটি থেমে যাওয়ায় সিকান্দার একটি গরুর গাড়ি বাড়া করে এনে তার পেছনে অস্টিনটি দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল এবং নিজে গরুর গাড়ির উপরে বসে বেবী অস্টিন টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। রাস্তায় ভিড় জমে গিয়েছিল মনে আছে। তার অভ্যন্তরীণ যে উত্তেজনা এবং আবেগ এভাবেই সে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রশমিত করতো। শেষ পর্যন্ত এই বেবী অস্টিনের চরম দুরবস্থা সিকান্দারের হাতেই ঘটেছিল। গাড়িটি প্রায়ই বিকল হয়ে যায় বলে সে নিজেই সেটা মেরামতের ভার নিল। নাট-বল্টু ইঞ্জিন সবকিছু খুলে নিয়ে সে গাড়ি সারাতে বসলো ঠিকই কিন্তু শেষ পর্যন্ত যন্ত্রপাতি ঠিকঠিক জায়গায় বসাতে পারলো না।

খুলে রাখা যন্ত্রপাতির সামনে নিবিষ্টমনে সিকান্দার তাকিয়ে আছে এবং চিন্তা করছে–এ দৃশ্য এখনো আমার চোখের সামনে ভাসে। সিকান্দারের এই বেহিসাবী চঞ্চল উৎক্ষিপ্ত মন ফররুখকে খুব আকর্ষণ করতো বলে আমার মনে হয়। ফররুখও চঞ্চল ছিল, অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে উঠতো এবং উচ্ছলতা ও উদ্দামতার মধ্য দিয়ে সময় কাটাতে ভালোবাসতো। কিন্তু ফররুখ সিকান্দারের মতো হাতে-কলমে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অভিনিবেশ করতো না। সে সময়ই ফররুখ উল্লেখযোগ্য কবি এবং কবিতায় একটি নতুন আনন্দের আসর বসিয়েছে। ফররুখের পিতা ছিলেন প্রতাপী পুরুষ, পুলিশের একজন বড় অফিসার। তিনি খুবই উদ্দামভাবে জীবনযাপন করেছেন। ফররুখের মুখে তার পিতার প্রতাপের কাহিনী আমরা অনেক শুনেছি। তিনি ছিলেন রমণীবল্লভ এবং এ নিয়ে তার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটেছে। ফররুখ বলতো, 'আমার পিতার একটি প্রচণ্ড মানসিক আবেগ ছিল, সেটি তার দৈহিক চঞ্চলতার মধ্যে ধরা পড়েছিল। সেটা যদি কোনো সাহিত্যকর্মে অথবা সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবহৃত হত, তাহলে জাতি তার কাছ থেকে

www.pathagar.com

অনেক কিছু পেতে পারতো।' ফররুখ তার আবেগকে প্রকাশ করেছিল বাংলা কবিতায় নতুন একটি ভাবাবহ নির্মাণ করে। ফররুখ প্রাথমিক যুগের ইসলামের উদ্দীপনা, সচলতা, আগ্রহ এবং অনেক দূরে চিত্তকে প্রসারিত করবার আকাঙ্ক্ষা তার কবিতায় প্রকাশ করেছে। বাংলা শব্দের ধ্বনির সঙ্গে আরবী-ফারসী শব্দের ধ্বনির সাযুজ্যে ফররুখ যে কবিতা নির্মাণ করলো তা আবৃত্তির জন্য একটি বলিষ্ঠ তৎপরতায় বিলাসিত হয়েছিল। এ সমস্ত আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করে ফররুখ একটি বিস্ময়কর রোমান্টিক আবহ নির্মাণ করেছিল। আমিও সে সময় আমার কবিতায় প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছিলাম একটি বিশেষ পরিমণ্ডল নির্মাণের উদ্দেশ্যে। এ শব্দগুলোর যে ধ্বনিবৈচিত্র্য কবিতার ছন্দে এবং প্রবহমানতায় প্রভাব বিস্তার করেছে তার সঙ্গে বাংলা শব্দের ধ্বনির সাযুজ্য ছিল অর্থাৎ বাংলা শব্দের যে ধ্বনি সম্পর্কে আমি অবহিত ছিলাম তার সঙ্গে যেসব আরবী-ফারসী শব্দের ধ্বনিগত সমান্তরালতা ছিল আমি সে সমস্ত আরবী-ফারসী শব্দই ব্যবহার করেছি। যেসব শব্দ তাদের নিজস্ব লৌকিক এবং ঐতিহাসিক রূপকল্পে এবং ব্যঞ্জনায় আমার কাছে উপস্থিত হয় নি সেসব শব্দের নিজস্ব ভাষাগত অর্থের বিস্তার এবং গভীরতা সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত আমি আমার অনেক কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছি। 'মক্কা মোয়াজ্জামার পথে', 'মহররম', 'কোরবানী' এ সময়কার কয়েকটি কবিতার নাম দেখেই বোঝা যাবে বিষয়ের সঙ্গে ব্যবহৃত শব্দের একটি সম্পর্ক ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগের কয়েকটি ঘটনা এবং আবেগকে শব্দের সাহায্যে উপস্থিত করবার চেষ্টায় আমি কিছুসংখ্যক আরবী-ফারসী বিশেষণ এবং নামবাচক শব্দের প্রয়োগ করেছিলাম। দু'একটি ফারসী ক্রিয়াপদও ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রথমত বিষয়ের কারণে অর্থাৎ যে পরিবেশ সৃষ্টি করা আমার কাম্য ছিল সে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কিছুসংখ্যক আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োজন হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা প্রয়োজন আমি অনুভব করেছিলাম। ধ্বনিবৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য এবং চরণান্তের জমক সৃষ্টির জন্য অনেক বিদেশী শব্দ আমি গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এ ব্যবহারে আমি সান্ত্বনা পাই নি, আমি এ শব্দগুলোর সীমাবদ্ধতা অনুভব করেছি এবং দেখেছি যে আমার শব্দের অধিকারের মধ্যে এরা কোনোক্রমেই আমার আয়ত্তগত নয়।

এক সময় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। তারা কিন্তু ব্যবহারের দ্বারা বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো বিস্তার সৃষ্টি করতে পারেন নি; একমাত্র নজরুল ছাড়া। নজরুল ইসলাম শব্দের ধ্বনিগত তাৎপর্যের ওপর নির্ভর করে বাংলা কবিতার জন্য ছন্দের হিল্লোল সৃষ্টি করেছিলেন। তার 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম' এর সাক্ষ্য বহন করে। তিনিও আরবী-ফারসী শব্দের নিজস্ব লৌকিক এবং ঐতিহাসিক সত্তা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, কিন্তু শব্দগুলোর ধ্বনি-মাধুর্য তাকে উন্মনা করেছিল এবং তার পরিচিত বাংলা ধ্বনির সঙ্গে তাদের সাযুজ্য নির্মাণ করে তিনি তার কবিতায় একটি অনবদ্য ধ্বনি-হিল্লোল সৃষ্টি করেছিলেন। আরবী-ফারসী ভাষার ওপর নজরুল ইসলামের প্রচণ্ড কোনো অধিকার ছিল না। সুতরাং একমাত্র ধ্বনিগত আবহের দ্বারাই তিনি রোমান্টিক রসাশ্রিত ভাবাবেগপূর্ণ

www.pathagar.com

কবিতা রচনায় সফলকাম হয়েছিলেন। আলোকোজ্জ্বল একটি প্রাসাদকে বাইরে থেকে দেখে অভিভূত হওয়া যায়, আনন্দিত হওয়া যায়, কিন্তু সে আলো যে কত বিচিত্র বর্ণের সংমিশ্রণে একটি বিশেষ উজ্জ্বলতায় বিকশিত, আলোর সেই উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার দরুন আমরা শুধু আলোর উচ্ছলতায় দৃষ্টিকে আপ্লুত করেছি।

আবুল হোসেনের সঙ্গে একই সময়ে আমার পরিচয়। কিন্তু কেন জানি আবুল হোসেনের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ হতে পারি নি। আবুল হোসেনকে সবসময় আমার একটু দূরবর্তী মনে হত। আমার তাকে আত্মম্ভরী মনে হত। যদিও পরে এ ধারণা পাল্টেছে। আবুল হোসেনের নানা একজন সুফী সাধক ছিলেন। তিনি আমাদের পরিবারের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আত্মীয়ের চেয়েও বেশী ছিলেন। কিন্তু সেই সুবাদে আবুল হোসেনকে নিকটের মানুষ হিসাবে গণ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। ফররুখ কিংবা সিকান্দার যে অর্থে আমার অন্তরঙ্গ বলয়ের মধ্যে এসেছিল সেই অর্থে আবুল হোসেন কিংবা গোলাম কুদ্দুস আসে নি। তবু সম্পর্ক ছিল এবং কলকাতা গেলেই সাক্ষাৎ ঘটতো। সেদিনের পর জীবনের অনেক সময় তো অতিক্রম করেছি, এখনও পুরনো পরিচয়ের বৃত্তে অনেক মানুষ বিদ্যমান আছে। কিন্তু সেই সময়কার শোভা এবং কৌতূহল এখন আর নেই। তখন আমরা কয়েকজন মিলে বাংলা সাহিত্যে যে কলগুঞ্জন তুলেছিলাম তার তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। হিন্দুশাসিত এবং হিন্দু চিন্তায় উচ্চকিত বাংলা সাহিত্যে হিন্দুদের পরিমণ্ডলে থেকে আমরা একসঙ্গে কয়েকজন মুসলমান তরুণ যে বিশ্বাস এবং চিন্তা বাংলা সাহিত্যে এনেছিলাম তাকে নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য করা যাবে না। আমরা প্রত্যেকেই যে একই স্বভাবের পরিচয়কে প্রকাশ করেছি তা নয়, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পথযাত্রী হয়েও আমরা একটি সম্প্রীতির মধ্যে নতুন ইচ্ছার কলধ্বনি প্রকাশ করেছিলাম।

॥২৭॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয় ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট। আমার এদিনটি খুবই স্পষ্ট মনে আছে। ঢাকায় এ সংবাদ এসে পৌঁছলো যখন তখন সর্বত্র যে দুঃখ এবং বেদনা প্রকাশিত হয়েছিল তার স্বরূপ বুঝিয়ে বলা আজকের দিনে একেবারেই অসম্ভব। সম্ভবত এটা এ কারণে যে তখনকার দিনে যিনি মহৎ ছিলেন তিনি এত ঊর্ধ্বে ছিলেন এবং বিরাট ছিলেন যে তার মৃত্যু একটি শতাব্দীর সকল সৌভাগ্যের অন্তর্ধানের মতো মনে হয়েছিল। আজকের দিনে ঠিক সেই পর্যায়ের মহৎ ব্যক্তি আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে না। তা ছাড়া রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততায় কোনো মহৎ স্বভাবের অনুধাবন করাও যেন অসম্ভব। তাই এখন সকল মৃত্যুই আমাদের কাছে সহজ অন্তর্ধানের মত হয়। আমরা কোনো মৃত্যুকেই একটা বিরাটের অন্তরাল গমন বলে মনে করি না।

সে সময় রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ সময়কার ঘটনাবলী খবরের কাগজে প্রায়ই প্রকাশিত হত। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথ ৮০ বছর বয়সে পদার্পণ করেন। বাংলা সন তখন ১৩৪৮। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে এ বছরেই রবীন্দ্রনাথের শেষ জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়। শারীরিক জীর্ণতার মধ্যেও সভ্যতার সংকট নামে একটি প্রবন্ধ তিনি রচনা করেন।

www.pathagar.com

স্বাস্থ্যগত দৈন্যদশার মধ্যে থেকেও ৮০ বছর বয়স্ক কবি সভ্যতার বিপুল অপলাপ লক্ষ্য করেছিলেন এবং সে জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। মৃত্যুতে সমাচ্ছন্ন প্রহরেও তিনি স্থির বুদ্ধির সাহায্যে তার সময়কালের সংকটকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং মানব সমাজকে প্রস্তুত হতে বলেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরের দিন কার্জন হলে একটি স্বতঃস্ফূর্ত শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শোকসভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিনি তার বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের কথা কয়েকবার উল্লেখ করেছিলেন।

হরিদাস ভট্টাচার্য তার বক্তৃতার এক জায়গায় বলেছিলেন, 'আমরা শব্দ উচ্চারণ করি কিন্তু শব্দকে কখনো দেখি না। আমরা সুরের ইন্দ্রজালে বশীভূত হই কিন্তু সুরের উৎসকে জানি না। রবীন্দ্রনাথ শব্দকে দেখেছেন, এবং সুরকে অনুভব করেছেন। সেই সভায় কিরণশংকর সেনগুপ্ত একটি আবেগময় কবিতা পাঠ করেছিলেন। আগের রাত্রে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে সারারাত কবিতাটি রচনা করেছিলেন। কবিতাটির প্রতি স্তবকের শেষে একই প্রশ্নবোধক চরণ বারবারই এসেছে। চরণটি ছিল, 'কোথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর? কোথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর? কিরণশংকর তার কাঁপা কাঁপা সরু মেয়েলি কণ্ঠে এই চরণটি যখন পাঠ করছিল তখন দুঃখের মধ্যেও আমাদের হাসি আসছিল। হাসি আসছিল কিরণশংকরের কম্পমান ভঙ্গি দেখে।

আমাদের সঙ্গে পড়তো আবদুর রউফ। আবদুর রউফ ঢাকার সেন্ট গ্রেগরী স্কুল থেকে মেট্রিকে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির ছিল, কখনো সুস্থির হয়ে বসে থাকতে পারতো না। আমাদের সঙ্গে ঢাকায় সে আইএ পাস করে কিন্তু বিএ পড়তে কলকাতায় চলে যায়। সেখানে বছর দেড়েক থেকে আবার ঢাকায় চলে আসে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময় সে কলকাতায় ছিল। কলকাতায় লক্ষাধিক জনতার অংশ হিসাবে সে রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখেছিল এবং সেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে ভিত্তি করে সে সেদিনকার জনারণ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ঢাকায় এসে একটি ঘরোয়া বৈঠকে সে তার বিবরণটি পাঠ করে।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথকে সামনাসামনি আমি কখনো দেখি নি। আমি যখন কলেজে পড়ি, সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রদের নিয়ে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ শান্তি নিকেতনে গিয়েছিলেন। সেই ছাত্রদের মধ্যে আবদুল হাই ছিলেন। আবদুল হাই পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহকর্মী হয়েছিলেন। একটি দুর্ঘটনায় আবদুল হাইয়ের জীবনের সমাপ্তি ঘটে। আমার সময়কালীন কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে কেউ রবীন্দ্রনাথকে সামনাসামনি দেখেছে বলে জানি না। তবে শুনেছি আবুল হোসেন নাকি একদল ছাত্রের সঙ্গে ভ্রমণে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিল। রবীন্দ্রনাথের তখন অনেক বয়স, জরাজীর্ণ অবস্থা, শারীরিক সংকটের মধ্যে ছিলেন। তাছাড়া আমাদের বয়সও ছিল অনেক কম। সুতরাং সে সময় রবীন্দ্রনাথকে চাক্ষুষ দেখা না দেখা একই কথা। তবে তখন আমরা রবীন্দ্র জীবনের সকল ঘটনাপঞ্জি কাগজে পাঠ করতাম এবং রবীন্দ্রনাথকে তার বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে অনুভব করবার চেষ্টা করতাম।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের একটি ঘটনা তৎকালীন মুসলমান সমাজে একটি বিক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। ১৯৩৫ সালের যে ভারত শাসন আইন বৃটিশ সরকার প্রবর্তন করেছিল তাতে বিভিন্ন প্রাদেশিক পরিষদে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুরা এই আসন সংরক্ষণে প্রতিবাদ জানায়। কলকাতায় টাউন হলে হিন্দুদের এক বিরাট প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ উক্ত সভায় উপস্থিত থেকে হিন্দুদের পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে মুসলমানগণ বিক্ষুব্ধ হয় এবং মুসলমানদের পত্র-পত্রিকাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের কঠোর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। হিন্দুদের প্রতিবাদটি স্বাধীনতার পক্ষে ছিল না, বরঞ্চ বৃটিশ আনুগত্যেরই সপক্ষে ছিল। তারা ১৯৩৫-এর আইনের পূর্বে শাসন পরিষদগুলিতে সম্প্রদায় হিসাবে এককভাবে যে সুযোগ সুবিধাগুলি পেত, সেটা কিছুটা খর্ব হওয়ায় তারা সাম্প্রদায়িকভাবে মুসলমানদের সুযোগ লাভের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ সে সময় বিলেতের ম্যানচেস্টার গার্ডেন পত্রিকায় হিন্দুদের সপক্ষে একটি প্রতিবাদ পত্রও প্রকাশ করেছিলেন।

এই প্রতিবাদ পত্রটি প্রকাশ হয়েছিল ১৯৩৮ সালে ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে। উক্ত পত্রে মুসলমানদের আসন সংরক্ষণ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে ইংরেজরা তাদের সংকীর্ণতা এবং অবিশ্বাস থেকেই ১৯৩৫ সালের শাসন আইন প্রবর্তন করেছে। তিনি যে কটি ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন এটা বুঝাবার জন্য তার মধ্যে 'ন্যারো কশন', এবং 'মাইজারলি মিসট্রাস্ট' কথাগুলো ছিলো। অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের পূর্বে যে ভারত শাসন আইন বলে প্রাদেশিক আইন সভাগুলো পরিচালিত হত, তাতে হিন্দুদের প্রতি ইংরেজদের যে বিশ্বাসের প্রতিফলন ছিল ১৯৩৫ সালের আইনে সে বিশ্বাসকে নষ্ট করা হয়েছে। সেই সময় মুসলমান সমাজ অর্থনৈতিক বিষয়ে এবং রাজনৈতিক বিষয়ে অত্যন্ত বেশি বিচলিত এবং অস্থির ছিল। রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্টভাবে হিন্দু সমাজপতিদের পক্ষাবলম্বন মুসলমানদের মনে ক্ষোভ এবং দুঃখের সঞ্চার করেছিল। তারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ না করে নিজেদের দুঃখের কথা পত্র-পত্রিকায় বর্ণনা করেছিল। রবীন্দ্রনাথ কেন তখন হিন্দু সমাজপতিদের পক্ষে কথা বলেছিলেন তার উত্তর আজো আমি খুঁজে পাই নি। যিনি আজীবন সর্বসংস্কারমুক্ত উদার পুরুষ ছিলেন তিনি কোন তাৎপর্যে রাজনৈতিক সুবিধাভোগের ক্ষেত্রে সে পক্ষকে অবলম্বন করে অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে গেলেন তা আজো আমার কাছে বিস্ময়ের।

'কালান্তরে, রবীন্দ্রনাথ ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের কথা স্বীকার করেছেন এবং হিন্দু সমাজকে ব্যবহার করেছেন, মুসলমান সমাজকে বিশ্বাসের বলয়ের মধ্যে আনতে। 'কালান্তর' গ্রন্থের মধ্যে যে আন্তরিকতা এবং শোভন সঙ্গতিতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান তিনি চেয়েছিলেন তার কোনো পরিচয় রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বিশ্লেষণে খুঁজে পাওয়া যায় না। ১৯৩৫-এর ইন্ডিয়া এ্যাক্টের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ একদেশদর্শী এবং দুর্ভাগ্যজনক। অনেকে বলেন যে তিনি সে সময় হিন্দু-মুসলমানদের পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধার কথা ততটা ভাবেন নি, যতটা ভেবেছিলেন বৃটিশদের কুশলী ভেদবুদ্ধির কথা। বৃটিশরা একবার হিন্দুদের সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে আর একবার মুসলমানদের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে এভাবে এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উন্মুখর করে রাখছে। হতে পারে এটাই হয়তো যথার্থ ব্যাখ্যা। তবে সে সময় আমরা এটা নিয়ে খুব আলোচনা করতাম। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুদেরই কবি নন

www.pathagar.com

আমাদেরও কবি–এ বিশ্বাসে আঘাত লেগেছিল বলেই রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে আমরা দুঃখ পেয়েছিলাম, ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে একটি বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। এটা স্বীকার করতেই হবে। শোক বিহ্বল করে কলকাতা বেতার থেকে বেদনাতুর কণ্ঠে যে সমস্ত কবিতা পাঠ করেছিলেন তার দুটি কবিতার কথা আমার মনে আছে। একটি কবিতা সজনীকান্ত দাশের, অন্যটি নজরুল ইসলামের। সজনীকান্ত দাশের কবিতাটি আমার বেশি ভালো লেগেছিল। সজনীকান্দ দাশের কবিতাটির প্রথম চরণ ছিলো–'বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?'

॥২৮॥

আমরা আমাদের শৈশব থেকেই নজরুল ইসলামের কবিতার বলিষ্ঠ উচ্চারণ শুনেছি। বাংলা সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রবল অধিকার থাকা সত্ত্বেও নজরুল ইসলামকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল বলে সহজেই ভাবতে পেরেছিলাম। তাছাড়া নজরুল ইসলাম এসেছিলেন আমাদের বিশ্বাসের অঙ্গন থেকে। তাই তাকে সহজেই আপন করে নেয়া আমাদের পক্ষে অসুবিধা ছিল না।

ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সম্ভবত এক বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৪১ সালে কলকাতা থেকে নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু এবং আরো কয়েকজন ঢাকায় আসেন। বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে যোগদানের বাইরে এ'রা ঢাকার অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। নজরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। আজ যেখানে মেডিক্যাল কলেজ সেটাই তখন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। ফজলুল হক হল তখন সাময়িকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনেই অবস্থিত ছিল। তখনকার দিনের দেওয়ানবাজার রোড এবং এখনকার দিনের নাজিমুদ্দীন রোড হয়ে রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং অতিক্রম করে একটু উত্তরের দিকে এগিয়ে পশ্চিমের দিকে মোড় ফিরলেই বাঁ দিকে একটি বড় গেইট। সেই গেইট দিয়েই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতাম।

মূল অট্টালিকার পিছনের দিকের ঘরগুলোতে ফজলুল হক হলের অবস্থান ছিল। যেটা ছিল ডাইনিং হল সেটাই আবার সময় বিশেষে বক্তৃতামঞ্চে রূপান্তরিত হত। এখানেই একটি উঁচু পাটাতনের উপর সাদা চাদর বিছিয়ে নজরুল ইসলামের জন্য গানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পাটাতন বা মঞ্চের ওপর নজরুল ইসলামের সঙ্গে কয়েকজন যন্ত্রী বসেছিলেন মনে আছে। তাছাড়া, তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সঙ্গী মঞ্চের ওপর বসেছিলেন। আমরা সামনে চেয়ারে বসেছিলাম। কবি জসীমউদ্দীনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজীর অধ্যাপক অমলেন্দু বসুও সেখানে ছিলেন। নজরুল ইসলামের সামনে একটি বড় বাসনে প্রচুর পান ছিল। গানের ফাঁকে ফাঁকে বারবার চা-ও আসছিল। নজরুল ইসলাম তাঁর কোলের কাছে হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইছিলেন। কণ্ঠস্বর বেশ সরু কিন্তু বেশ নিশ্চিন্ত। একপ্রকার তন্ময় রসাবেশে তিনি গান গেয়ে যাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে একটি বক্তৃতা করেছিলেন। বক্তৃতাটি গানের আগে না পরে আমার ঠিক মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে যে বক্তৃতাটির বিষয় সাহিত্য কিংবা কাব্য ছিল না। বক্তৃতার বিষয় ছিল ধর্মতত্ত্ব এবং সুফী মরমীবাদ। তবে আমি আজো ঠিক পরিষ্কার বুঝে উঠতে

www.pathagar.com

পারছি না, সেদিনকার নজরুল ইসলামের বক্তৃতার কি তাৎপর্য ছিল। তিনি একসময় শাশ্বত এবং অশাশ্বত নিয়ে আলোচনা করছিলেন। প্রশ্ন করছিলেন শাশ্বত কোনটি এবং অশাশ্বত কোনটি? এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আবার মানুষের জীবদেহ ধারণ বিষয়ে মন্তব্য করছিলেন। উপস্থিত সকলের কাছেই নজরুল ইসলামের বক্তব্য অসংলগ্ন মনে হয়েছিল। এক পর্যায়ে সুরা বাকারার গাভী সংক্রান্ত বক্তব্য নিয়ে তিনি তার বিবেচনাকে উপস্থিত করছিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যবান স্বর্ণকান্তি গাভীর দীর্ঘ বর্ণনাও দিয়েছিলেন। সবকিছু মিলে একটি অস্থির চিত্তের অসম্পূর্ণ একটি নিবেদন সেদিন আমরা পেয়েছিলাম। বক্তৃতার মাঝখানে কবি জসীমউদ্দীন উঠে চলে গিয়েছিলেন। আমরা গিয়েছিলাম গান শুনতে। আমরা বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। সেদিন অনেকগুলো গান গেয়েছিলেন তিনি পরপর। একটি গান আমার কানে এখনো বাজে। –শূন্য এ বুকে পাখি মোর, আয় ফিরে আয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল ইসলামের এ অনুষ্ঠান নিয়ে মোহিতলাল মজুমদার অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর ক্লাসের ছেলেমেয়েরা ক্লাস ছেড়ে গান শুনতে গিয়েছিল। এটাই তাকে ক্রুদ্ধ করেছিল বেশি। তার ক্লাসের চাইতে নজরুল ইসলামের গান কি করে বেশি আকর্ষণীয় হল, এটা তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কবি জসীমউদ্দীন আবার তাঁর ক্লাস ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন। এটাও তিনি সহজে মেনে নিতে পারেন নি।

ফররুখ সবসময় ভাবতো যে নজরুল ইসলামকে অতিক্রম করতে না পারলে সে বাংলা কাব্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। সে প্রায়ই আমাকে বলতো, "শুধু উদ্দীপনা ও গানের সম্মোহনে নজরুল ইসলাম মানুষকে বশীভূত করে রেখেছে।" সে একদিন নজরুল ইসলামের কাছে গিয়ে বলেছিল, "আমি আপনার চেয়েও বড় কবি হব।" নজরুল ইসলাম প্রচণ্ড অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলেছিলেন, "তুই কি লাফাতে পারিস, গান গাইতে পারিস।" ফররুখ অবাক হয়ে বলেছিল, "আপনাকে ছাড়িয়ে যেতে হলে লাফাতে হবে কেন, আর গানই বা গাইতে হবে কেন?" নজরুল ইসলাম আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিলেন, বলেছিলেন, "গান ছাড়া কবিতা হয় না রে। বাংলা কবিতা তো গানেরই রাজ্য।" নজরুল ইসলাম ঠিকই বলেছিলেন।

সেই প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে নজরুল ইসলাম পর্যন্ত বাংলা কবিতাতে সুরেরই ইন্দ্রজাল। চর্যাগীতিকাগুলো রাগ-রাগিনীভিত্তিক, মধ্যযুগের কবিতাও সুরে গাওয়া হত, মাইকেল মধুসূদন দত্তও সুরের প্রতাপ অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। তাই দেখি তিনি মহাকাব্যের পাশাপাশি ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনা করেছেন। ব্রজাঙ্গনা কাব্যগ্রন্থটি কীর্তনের সুরে রচিত। আধুনিককালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলাম সুরের রাজ্যে বিচরণ করেছেন। তবে ত্রিশের দশক থেকে বাংলা কবিতায় সুরের ইন্দ্রজাল ক্রমশ নষ্ট হয়েছে। যেহেতু আধুনিককালে শব্দের বিচরণভূমি হচ্ছে বিজ্ঞান এবং কর্মচঞ্চল পৃথিবী, তাই আধুনিক কবিরা সুরের সম্মোহন ছেড়ে দিয়ে গদ্যের প্রত্যয়কে অবলম্বন করেছেন। কবিতার এই পরিবর্তনটি নজরুল ইসলাম অনুভব করে যেতে পারেন নি। ফররুখ আহমদ কিছু গান লিখবার চেষ্টা করেছিলেন একসময় কিন্তু রাগ-রাগিনী সম্পর্কে তার কোনো ধারণা না থাকায় সে এক্ষেত্রে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারে নি। এখনকার দিনে যেসব কবি গান লেখেন, তারা সুরকারের ওপর নির্ভরশীল। অনেক সময় সুরকারের নির্দেশেই বাণীভঙ্গীটি তৈরি করতে হয়। নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রে এটি ছিল না। ফররুখ

www.pathagar.com

যে নজরুল ইসলামকে অতিক্রম করবে বলেছিল, সেটা নজরুল ইসলামের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল বলেই বলেছিল। সে জানতো এবং অনুভব করতো যে নজরুল ইসলামের মধ্যে এমন একটি বিশেষ প্রাণচৈতন্য রয়েছে যাকে শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

সে সময় নজরুল ইসলামের খুবই নিকটের মানুষ হিসাবে কবি জুলফিকার হায়দারকে দেখেছিলাম। জুলফিকার হায়দার ছিলেন নজরুল ইসলামের একনিষ্ঠ ভক্ত। নজরুল ইসলামকে সর্বতোভাবে গ্রাহ্য করা এবং মান্য করাই ছিল তার কাব্যজীবনের আদর্শ। জুলফিকার হায়দার ছিলেন অত্যন্ত দৃপ্ত এবং দুঃসাহসী জীবনবাদী পুরুষ। স্যুট পরিধান করতেন, সাহেবী কায়দায় চলাফেরা করতেন কিন্তু আমাদের সঙ্গে পর্যাপ্ত হাস্যরসিকতায় মিলিত হতেন। তিনি বলতেন, "নজরুল কি শুধু কবি নাকি, নজরুল হচ্ছে একটি আবির্ভাব, একটি চৈতন্য, একটি বিস্ময়।" জুলফিকার হায়দার কবিতার মতো করে কথা বলতেন। আমাদের হাসি পেত, কিন্তু আমরা উপভোগও করতাম। কলকাতায় জুলফিকার হায়দার ছিলেন একজন প্রাণবন্ত পুরুষ। ছোট-বড় বয়সের ভেদাভেদ ভুলে তিনি সকলেরই বন্ধু হতে পারতেন। একটি স্বাধীন জীবনে সর্বপ্রকার আনন্দ আকণ্ঠ পান করে তিনি আমাদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করতেন। আমি আরো পরে কলকাতায় যখন চাকরি জীবন আরম্ভ করি তখন জুলফিকার হায়দারকে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পেয়েছিলাম। তখন সর্বদা আমাদের আসরকে উচ্চকিত করবার জন্য জুলফিকার হায়দার বিদ্যমান থাকতেন। বর্তমানে জীবনের সন্ধ্যাকালে একটি সমাহিত চিত্ততায় একটি নতুন শান্ত এবং প্রীতি সুখের মধ্যে তিনি জীবন অতিবাহিত করছেন।

॥২৯॥

যে সময়ের কথা বলছি, তখন ঢাকায় রেডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি বিশ্ববিদ্যালয় মহলে খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাশীল ছাত্রদের অনেকেই মানবেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল এবং তার দলের হয়ে কাজ করতে আগ্রহী ছিল। আমার সঙ্গে এই দলের প্রাণগোপাল পালের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। প্রাণগোপাল পাল ওরফে পান্না বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহপাঠী ছিল। আমি তার সঙ্গে রেডিক্যাল পার্টির বিভিন্ন সভা সমিতিতে গিয়েছি। ওয়ারীতে এবং নবাবপুরে এ সমস্ত সভা-সমিতিতে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হত এবং সে সম্পর্কে এম এন রায়ের বিশ্লেষণ উপস্থিত করা হত। মূলত এ সমস্ত সভা ছিল বিশ্লেষণধর্মী ও শিক্ষামূলক। জ্যোতির্ময়গুহ ঠাকুরতা আমার এক শ্রেণী ওপরে পড়ত। কিন্তু রেডিক্যাল দলের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত ছিল বলে স্বভাবতই অল্প সময়ের মধ্যেই আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। একটি সভায় জ্যোতির্ময় হিউম্যানিজিম বা মানবতা সম্পর্কে বক্তৃতা করেছিল। আমাকেও সে তাতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। এভাবেই আমরা একে অন্যের সঙ্গে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। রেডিক্যাল পার্টি একটি বার্ষিক সম্মেলনেরও আয়োজন করেছিল সদরঘাটে। ব্যাপ্টিস্ট মিশন হলে এ সভা বসে। আমি সেখানে বক্তৃতা করেছিলাম। এ সমস্ত বক্তৃতা ও সভা-সমিতিতে যোগদানের মাধ্যমে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরে একটি বৃহত্তর চেতনার মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হই।

সে সময়ের লেখা আমার কিছু কিছু কবিতায় সমাজ এবং শ্রেণী সচেতনতার কিছুটা পরিচয় আছে।

www.pathagar.com

একটি কবিতার নাম ছিল 'নতুন সূর্যের দিন' কবিতাটি সওগাতে প্রকাশিত হয় এবং পাঠকদের প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়। কবিতাটি একজন পুরুষ ও একজন রমণীর সংলাপরূপে রচিত। তারা প্রেমিক-প্রেমিকা, কিন্তু প্রণয়ের সম্মোহনে আর নিমগ্ন থাকতে চায় না। দুঃখ-দুর্দশার দিনে জনতার পাশে এসে দাঁড়াতে চায়। কবিতাটিতে যা লিখেছিলাম গদ্য করে বললে তার ভাষ্য এ রকম দাঁড়াতে পারে–'আজ প্রণয়ের সকল কৌতুক ব্যর্থ হয়েছে। মিলনের অজস্র কৌতুক ধুলায় মিশেছে। বন্ধনহীন যে দিবস উন্মত্ত অধীর তা কোনো আবেশ আনে নি। মৃত্তিকার বক্ষ থেকে কল্পনার রেশ মুছে গেছে। ধনীকের সভ্যতা আমাদের মৃত্তিকাকে শ্মশান করেছে। আমরা মৃত্যুর দানস্বরূপ বুভুক্ষার শুষ্ক দীপ্তি শুধু পেয়েছি। তাই আজ প্রাণপূর্ণ রাত্রির প্রহর আমি ভুলছি। এখন শুধু রাত্রিতে নিরন্ন নগরের ক্রন্দন শুনছি। চতুর্দিকে এখন শুধু কংকাল এবং মৃত্যু।' কবিতাটি পরে আর আমার কোনো কাব্যগ্রন্থে স্থান পায় নি। দুর্বল রচনা বলে কবিতাটিকে আমি সকলের সামনে তুলে ধরতে দ্বিধাবোধ করেছি। কিন্তু আমার মনে হয়, ইতিহাসের দিক থেকে এই কবিতাটির ভাব প্রকল্প একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কেননা, তখন আমি বামপন্থী রাজনীতির প্রভাববলয়ের মধ্যে কিছুটা আবদ্ধ ছিলাম। আমি এ সময় প্রগতি সাহিত্য সংসদের সঙ্গেও কি করে জানি জড়িত হয়ে পড়েছিলাম। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এবং রণেশ দাশগুপ্ত প্রগতি সাহিত্য সংঘের উদ্যোক্তা ছিল। কিরণ শংকরই প্রগতির বিভিন্ন সভায় আমাদের নিয়ে যেত এবং বক্তৃতা দিতে বলত। আমার শিক্ষকদের মধ্যে অমলেন্দু বসু প্রগতির সভায় মাঝে মাঝে আসতেন। একদিন কাজী মোতাহার হোসেনও এসেছিলেন।

মাসিক মোহাম্মদীর ১৩৯১ বাংলার পৌষ সংখ্যায় আমার মক্কা মোয়াজ্জামার পথে কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবিতাটি ইসলামী ভাবাদর্শে রচিত এবং তা আমার কাব্যকর্মের প্রথম পট নির্দেশ করে। এ কবিতাটি সম্পর্কে আমার মনোভাব খুবই দ্বিধান্বিত ছিল। আমি তাই এই কবিতাটিকে 'কাব্যসমগ্রে' স্থান দেই নি। এই প্রকৃতির কোনো কবিতাই 'কাব্যসমগ্রে' স্থান পায় নি। একই বছরে ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি'র অনেকগুলো কবিতা মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশ পেয়েছিল। ফররুখ তার নিজস্ব প্রক্রিয়ায় এবং ভঙ্গিতে তার কবিতাগুলি লিখেছিলেন এবং আমি লিখেছিলাম আমার ভঙ্গিতে। ভাবাবহ এবং কাব্যবৃত্তি কোনদিক থেকেই আমরা একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হই নি, যদিও ধর্মীয় চিন্তা ও বিশ্বাসের দিক থেকে আমাদের মধ্যে ঐক্য ছিল।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৪-এর মধ্যে আমি কিছু গল্প লিখেছিলাম। কয়েকটি গল্প মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাতে ছাপা হয়। এ রকম কয়েকটি গল্পের নাম হচ্ছে ঃ বুদবুদ, তারা তিনজন, রহিমা, জন্মদিনে। গল্পগুলোর উপকরণ এসেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনের পরিবেশ থেকে এবং নিজস্ব পারিবারিক বৃত্ত থেকে। এ সময় 'ইহাই স্বাভাবিক' নামে একটি উপন্যাসও লিখেছিলাম। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় নি, পাণ্ডুলিপি অবস্থায় হারিয়ে গিয়েছিল। কাহিনী-সাহিত্য নিয়ে পরীক্ষা এখানেই শেষ। নিজেকে গল্প লেখক হিসাবে আমি পরবর্তীতে কখনও উপস্থিত করি নি।

সাহিত্য সমালোচক হিসাবে পরীক্ষা কর্মে আমি উত্তীর্ণ হলাম যখন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয় পত্রিকায় আমার কবি 'সত্যেন্দ্রনাথ' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। এ সময়কার

www.pathagar.com

অন্য কয়েকটি প্রবন্ধ হল ঃ রোহিনী কবিতার বিষয়বস্তু, কালি-কলমের প্রথম বর্ষ, তিনটি লেখাই সওগাতে প্রকাশিত হয়। রোহিনী প্রবন্ধে চরিত্র বিশ্লেষণে আমি কিছুটা কুশলতার পরিচয় দিয়েছিলাম বলে আমার মনে পড়ে।

এ সময়কালে আমি অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ কবি উইলিয়াম কলিনস-এর ওপর একটি পরিচিতিমূলক প্রবন্ধ লিখি। প্রবন্ধটি কলকাতার 'নবযুগ' পত্রিকায় ছাপা হয়। উক্ত পত্রিকায় পার্ল বাক-এর ওপরেও আমার একটি লেখা ছাপা হয়। পার্ল বাকের লেখার প্রতি সে সময় আমার খুব আকর্ষণ ছিল। সে সময় পর্যন্ত প্রকাশিত পার্ল বাকের সব কটি বই আমি পড়ে ফেলেছিলাম। এখন অবশ্য পার্ল বাকের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই। সম্ভবত অপরিচিত চীনা কৃষকের জীবনধারার বিবরণী ছিল বলেই তার লেখাগুলো আমাকে আকর্ষণ করেছিল। তা ছাড়া পার্ল বাকের ইংরেজী ভাষা ছিল সহজ, অনেকটা ইংরেজী বাইবেলের মত।

এ সময় সওগাত পত্রিকায় আমার যেসব কবিতা ছাপা হয়েছিল তা কিন্তু ইসলামী ভাবাদর্শের নয়। সে কবিতাগুলো ছিল প্রেমের, দেহস্বাদের এবং সমাজ-সচেতনতার। এ সময় টি এস এলিয়টের কিছু কবিতাও আমি বাংলায় অনুবাদ করি। সে সময় আমার পাঠক্রমের মধ্যে টি এস এলিয়টের কবিতা প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। উপমহাদেশের রাজনীতির দিক থেকে এ সময়কালটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু-মুসলমান বিরোধটি প্রবল আকার ধারণ করেছে। উভয় সমাজের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি হয়েছে, এর ওপর ভিত্তি করে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছে। দুটি বিরোধী চিন্তাধারা একে অন্যকে আঘাত-প্রতিঘাতে টেনে এনেছিল। এসব নিয়ে ছাত্রসমাজের মধ্যে তখন প্রচণ্ড বিক্ষোভ চলছে। পাকিস্তান আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্ররা এ আন্দোলনকে প্রচণ্ড গতি দিয়েছে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের হোস্টেলের একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পূজার্চনা বিধিকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে দাঙ্গা বাধে। এ দাঙ্গায় নজির আহমদ নামে একটি ছেলে মারা যায়। নজির আহমদ নামক পুস্তকে এ সময়কালের ইতিহাস পাওয়া যাবে। গ্রন্থটি আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থে জসীমউদ্দীনের একটি কবিতা, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের একটি প্রবন্ধ, আমার তিনটি প্রবন্ধ, বেনজীর আহমদের একটি প্রবন্ধ এবং আবদুর রাজ্জাকের একটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছিল। তা ছাড়া আমার কৃত কোরআন শরীফের কয়েকটি আয়াতের কাব্যানুবাদও ছিল। সে সময়কার আমার গদ্যভাষা কিছুটা আবেগবহুল এবং তৎসম শব্দে আকীর্ণ। অবশ্য তৎসমের ধ্বনিগত আশ্লেষ থেকে আমি কখনোই মুক্ত হতে পারি নি। সে সময়কার ভাষার নিদর্শনস্বরূপ একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি– 'ছাত্র আন্দোলন বলিতে মূলত যাহা বোঝায় তাহা কোনও সংঘাতের প্রক্রিয়া নয়, কিন্তু জীবনের সত্য পরিচয় লাভের জন্য নিবিড় আকাঙ্ক্ষা, বিক্ষোভ প্রকাশমান হয় জীবনক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য। ছাত্রজীবনে ব্যর্থতার প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তাহা আলোকের কার্পণ্য। আলোকের অচঞ্চল রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া আমাদের মনকে প্রাণচাতুর্যে স্পন্দমান করিবার মূল্যবান মুহূর্তই ছাত্রজীবন। সুতরাং সেই মুহূর্তে যদি আমাদের আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ প্রাপ্তি না ঘটে তবে যে ব্যর্থতা আসিবে তাহা

www.pathagar.com

অপরিসীম বেদনাদায়ক। এই ব্যর্থতা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাহারা চিরদিন সাধনা করিয়া আসিতেছে। যত ছাত্র আন্দোলন এ যাবত হইয়াছে ও এখনও হইতেছে তাহা এই ব্যর্থতা হইতে মুক্তির প্রয়াস। অনেক ক্ষেত্রে এই মুক্তি আন্দোলন সীমাবদ্ধ, আবার অনেক ক্ষেত্রে তাহা জাতীয় কোন আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত। যেখানে অভিযোগ শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে, সেখানে আন্দোলন সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য, কিন্তু সত্যের লাঞ্ছনা দেখিয়া তাহারা যে আন্দোলন উপস্থিত করে তাহা স্বভাবতই জাতীয় আন্দোলনের সহিত সম্পৃক্ত হইবে।'

আমি এখনও আমার আগেকার এই ভাষার শব্দগ্রন্থনা দেখে কৌতুক বোধ করি। মানুষের পরিবর্তন হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। এর মধ্যে ব্যবহার্য ভাষার পরিবর্তনটি সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। সময় এবং আবেগের শাসনে শব্দগুলো এক এক সময় এক এক রূপে উচ্চকিত হয়। আবেগ উত্তাপ এবং আনন্দ বহুবিধ বিকল্পে একটি রচনার চরিত্র গঠন করে। যে সময়কার কথা বলছি, তখন বয়স অল্প থাকায় কর্মকান্ডে এবং বক্তব্যে উত্তাপ বোধহয় একটু বেশিই ছিল। পরে ক্রমশ ইংরেজী ভাষাশৈলীর অনুশাসনে আমি যুক্তিবাদী হয়েছি এবং শব্দের প্রয়োগ বিধিতে নিজস্ব একটি ভঙ্গি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছি।

॥৩০॥

বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতেই আইরিশ লিটারেরী রিভাইবালের কথা শুনি এবং প্রবল আগ্রহ নিয়ে কবি ইয়েটস, সিন্‌জ এবং লেডী গ্রেগরি এঁদের লেখা পড়তে থাকি। বিশেষ করে সিন্‌জের নাটক আমাকে অভিভূত করে। সিন্‌জের একটি নাটক আমাকে বেদনা ও বিস্ময়ে আপ্লুত করেছিল। নাটকটির নাম 'দি রাইডার্স টু দ্যা সী'। আয়ারল্যান্ডের সমুদ্র তীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র জেলে পরিবারের কাহিনী। পরিবারে বৃদ্ধা বিধবা মা, যুবক ছেলে, পুত্রবধূ এবং মেয়ে একজনই ছিল। এ পরিবারের পুরুষছেলেরা সবাই সমুদ্রে প্রাণ হারিয়েছে। একমাত্র সক্ষম ছেলে সংসারের দেখাশোনা করছে। এই ছেলেটিও সমুদ্রে প্রাণ হারালো। এই সংবাদটি গৃহে এসে যখন উপস্থিত হল, তখন একটি অপরিসীম শূন্যতা সৃষ্টি হল। সে শূন্যতার বেদনা এবং অসহায়তা সিন্‌জ এমন একটি অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, যা বিশ্বসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হয়ে রয়েছে।

ইয়েটস-সহ সিন্‌জ এবং লেডী গ্রেগরি আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছিলেন। তাদের নেতা ছিলেন পারনেল। রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি তাঁরা সাহিত্য এবং শিল্পের একটি আন্দোলনও আরম্ভ করেছিলেন। আয়ারল্যান্ডের নিজস্ব একটি ভাষা আছে, যা ইংরেজী নয় এবং আয়ারল্যান্ডের নিজস্ব একটি ঐতিহ্য আছে–যা ইংল্যান্ড কিংবা স্কটল্যান্ডের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির। সেই প্রকৃতিকে আবিষ্কার করে তারই প্রেরণায় জাতিসত্তাকে নতুন করে নির্মাণ করার প্রয়াস ইয়েটস পেয়েছিলেন। এই প্রয়াসের নাম তিনি দিয়েছিলেন 'আইরিশ লিটারেরী সোসাইটি'। এই সোসাইটিতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন, জর্জ রাসেল, সিন্‌জ, লেডী গ্রেগরি, এলিস মিলিগান। ইয়েটস ছিলেন এই সমিতির পুরোধা। তাঁরা নতুন আদর্শে নাটক রচনা করতে থাকেন, গান রচনা করেন এবং কবিতায় আয়ারল্যান্ডের অতীতকে নতুন বিশ্বাসে আবিষ্কার করার প্রয়াস পান। রাজনৈতিক

www.pathagar.com

কর্মসাধনের জন্য জীবনগত যে প্রত্যয় প্রয়োজন সে প্রত্যয় এনেছিলেন ইয়েটস এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা। এঁদের প্রেরণা না থাকলে আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতার আন্দোলন উৎসাহিত হতে পারতো না। পুরনো আয়ারল্যান্ডকে নতুন করে চিহ্নিত করবার জন্য ইয়েটস যে সমস্ত কবিতা লিখলেন, তার মধ্যে স্বপ্নীল বর্ণাভরণ ছিল, অজানা অশ্বারোহীর কথা ছিল, প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসস্তূপের কথা ছিল এবং পরাজিত সৈন্যদের পলায়নের পদধ্বনির কথা ছিল। একটি কবিতা তিনি এভাবে করেছিলেন, "ধীরে ধীরে শিশির পড়ছে এবং স্বপ্ন সঞ্চিত হচ্ছে। অজানা ধারালো শর অকস্মাৎ আমার স্বপ্নে উন্মুক্ত চোখের সামনে ঝলসে উঠছে। পরাজিত অশ্বারোহীদের পতনের শব্দ শুনছি এবং অপরিচিত সেনাবাহিনীর পলায়নের পদধ্বনি শুনছি।"

ইয়েটস অবশ্য সবসময় এই ধরনের কবিতা লেখেন নি, ক্রমশ তিনি শব্দ ব্যবহারে নির্মম হয়েছিলেন। এ সমস্ত কবিতার মধ্য দিয়ে এবং নাটকের মধ্য দিয়ে ইয়েটস এবং তাঁর সঙ্গীরা আয়ারল্যান্ডের জন্য যে প্রাণ-উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিলেন, তা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ইয়েটস-এর কাব্যপাঠে এবং সাহিত্য বিশ্বাসের মধ্যে আমাকে যিনি বিশেষভাবে টেনে নিয়ে আসেন তিনি আমার খালাতো ভাই সাজ্জাদ হোসেন। ইংরেজী ভাষার অত্যন্ত কৃতি ছাত্র ছিলেন এবং আমার দু'শ্রেণী উপরে পড়তেন। আমরা দু'জনে প্রথমত এবং পরে আরো কয়েকজন চিন্তা করতে লাগলাম যে বাঙালী মুসলমানের জন্য আইরিশ লিটারেরী রিভাইবালের মতো একটি সাহিত্য সংস্থা গড়ে তোলা যায় কিনা। তখন রাজনৈতিকভাবে ভারতীয় মুসলমানরা স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। একটি সুনিশ্চয় বিবেচনার মধ্যে মুসলমানদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। পাকিস্তান আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে স্বতন্ত্র দেশ হিসাবে পাকিস্তান সৃষ্টি হবে কিনা তা আমরা জানতাম না। কিন্তু একটি আবেগের পরাক্রমে আমরা অনুভব করতাম যে দেশে মুসলমানদের একটি স্বাতন্ত্র্য আছে, যে স্বাতন্ত্র্য তাকে হিন্দু জাতিসত্তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন করে রেখেছে।

এ সময় একজন প্রবীণ সাহিত্যিকের আমাদের প্রয়োজন ছিল, যাঁর কাছে নানাবিধ জিজ্ঞাসার উত্তর পাবো। এই প্রবীণ সাহিত্যিক যাকে আমরা পেয়েছিলাম তিনি সৈয়দ এমদাদ আলী। তিনি থাকতেন মফস্বলে, একটি গ্রামে। সেখানেই তাঁর সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি, তিনি খুবই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। সৈয়দ এমদাদ আলী 'ডালি' নামক একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং এই একটি মাত্র গ্রন্থই তাঁকে কবির মর্যাদা দিয়েছিল। তাঁর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না, তিনি ছিলেন উদার, পরমতসহিষ্ণু এবং সর্বতোভাবে বিশ্বাসী মুসলমান। এহেন ব্যক্তির পরামর্শে এবং সহায়তায় আমরা সে সময়, যে সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তুললাম, তা কোনোমতেই সাম্প্রদায়িক ছিল না। আমরা হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করি নি। হিন্দু বিশ্বাস এবং আচরণ নিয়ে একটি কথাও বলি নি কিন্তু প্রতিবার প্রবল কণ্ঠে মুসলমানদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক অন্বয়ের কথা বলেছি। কলকাতায় আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন এবং তাঁর সঙ্গে আবুল মনসুর আহমদ এবং মুজিবুর রহমান খাঁ মিলিতভাবে 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' স্থাপিত করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে দু'জন প্রাজ্ঞ হিন্দু মনীষীও যোগ দিয়েছিলেন। এঁরা হচ্ছেন বসুধা চক্রবর্তী

www.pathagar.com

এবং অধ্যাপক সুশোভন সরকার। সাহিত্য এবং সামাজিক চিন্তায় এবং বিশ্বাসে এঁরা উভয়েই ছিলেন উদার এবং সাহসী। আমরা ঢাকায় অনুরূপভাবে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার পরিকল্পনা প্রথমে নেই, কিন্তু রেনেসাঁ সোসাইটির শাখা প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমরা থাকতে চাইনি বলে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়েছিলাম 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। আমরা আমাদের সাহিত্য সংসদের আদর্শ হিসাবে আইরিশ লিটারেরী রিভাইবালের কথা বলেছিলাম; পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে একটি ইচ্ছা মুসলমানদের মনে জেগেছিল যে হয়তো আমাদের এমন একটি সুযোগ আসতে যাচ্ছে যখন আমরা আমাদের কথা বলতে পারবো, যখন আমাদের ইতিহাসের কথা আমাদের কবিতায় থাকবে, যখন আমাদের সমাজের কথা, আমাদের আকাঙ্ক্ষা, অহমিকা ও বেদনার কথা আমাদের কবিতায় রূপলাভ করবে।

১৯৪৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ একটি বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল মিলনায়তনে প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন কবি সৈয়দ এমদাদ আলী। প্রথমে বেনজীর আহমদ-এর সভাপতি থাকার কথা ছিল, কিন্তু তিনি শেষ মুহূর্তে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। সমিতির সভাপতি হিসাবে ভাষণ দিয়েছিলেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন। সম্পাদক হিসাবে বিবৃতি দেই আমি। মূল সভাপতি ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। সম্মেলন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়ঃ ১. পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের বাহন বাংলা ভাষা হবে এ প্রশ্ন বহু পূর্বেই চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হয়ে গেছে। উর্দুকে বঙ্গদেশীয় মুসলমানের সাহিত্যের বাহন করে তোলবার আকাঙ্ক্ষা বাতুলতামাত্র। ২. সাহিত্য সৃষ্টিই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ৩. আজ আমাদের প্রচেষ্টা হবে আমাদের সৃষ্ট সাহিত্যে আমাদের জীবনের সত্যকে জাজ্বল্যমান করা। ৪. যে অতীত প্রত্যক্ষভাবে বর্তমানকে প্রভাবান্বিত করছে এবং যে অতীত ফল্গুধারার মত বর্তমানের ভিতর প্রবাহিত হয়ে আসছে–এ উভয়কেই আমাদের জানতে এবং বুঝতে হবে। ৫. সাহিত্য হচ্ছে সাহিত্যিকের স্বচ্ছতারই প্রকাশ, তার স্বকীয়ত্বেরই স্ফূর্তি।

সাহিত্য সংসদের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অধ্যাপক ছিলেন, তাঁদের একজন হচ্ছেন, মরহুম অধ্যাপক মযহারুল হক আর একজন অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক। আবদুর রাজ্জাক আমাদের মধ্যে এখনো আছেন। ঢাকা শহরের নাগরিকদের মধ্যে যারা আমাদের সাহায্য করেছিলেন তাদের একজন হচ্ছেন মরহুম সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর। আরেকজনের নাম বলার প্রয়োজন আছে। সময়-অসময়ে আমরা তাঁর কাছে গিয়েছি এবং উৎসাহ পেয়েছি। তিনি ছিলেন ফারসী বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর মুয়াইয়িদুল ইসলাম বোরা।

॥৩১॥

সাহিত্যকর্মে বিশ্বাস সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন অর্থাৎ কোনো একটি আদর্শে বিশ্বাস অথবা ধর্মে বিশ্বাস অথবা দেশের স্বার্থে বিশ্বাস। সাহিত্য যদি ব্যক্তিগত স্বার্থের কর্মকেন্দ্র হয় তাহলে সাহিত্য সফল হয় না। সাময়িক স্বস্তি বা প্রতিষ্ঠা আসতে পারে বটে কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের মাধ্যমে সাহিত্যের বিস্ময় বা অভিবাদন নির্মিত হয় না। আমরা যখন

www.pathagar.com

সাহিত্য সংসদ গঠন করি তখন আমরা আমাদের সমাজের কথা চিন্তা করেছিলাম এবং ভবিষ্যতের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেছিলাম। তার মধ্যে কোনোরূপ ভেজাল ছিল না। ফররুখ আহমদ বা আমি বা প্রবীণদের মধ্যে আবুল কালাম শামসুদ্দীন আমরা কেউ তৎকালীন রাজনীতির ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করি নি। আমরা একটি বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করেছিলাম। যে মুসলমান সমাজ বাঙালী জীবনের একটি বিরাট অংশ এবং প্রধান অংশ তার পরিচয় সাহিত্যে না থাকলে সে সাহিত্য যে অসম্পূর্ণ সে বিশ্বাস আমাদের ছিল।

আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম যে হিন্দু সাহিত্যিকরা আমাদের কথা লিখবেন, কিন্তু বুঝিনি যে অপরিচয়ের ব্যবধান যেখানে প্রবল সেখানে তাদের কাছ থেকে কি করে আমাদের কথা লিপিবদ্ধ হওয়ার আশা করতে পারি। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের কথা নেই বলে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কবি ও সাহিত্যিকদের দ্বারস্থ আমরা হয়েছি এবং তাদের অনুরোধ করেছি যেন তারা আমাদের কথা লিখেন। এর সর্বশেষ উদাহরণ হচ্ছে ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের একটি সভায় শরৎচন্দ্রের কাছে মুসলমানদের আবেদন এবং সে আবেদনের কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন যে মুসলমানদের কথা তিনি লিখবেন। এর আগেকার আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। সেটা হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহররমের কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য লিখবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর রিজিয়া নাটকটির বাংলা অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করবার চেষ্টা যখন করলেন তখন তাঁর হিন্দু বন্ধুরা তাঁকে বারণ করলো। বারণ করলো এই কারণে যে মুসলমানী পোশাক পরে মুসলমান নামের নায়ক নায়িকারা মঞ্চে উপস্থিত হলে দর্শকরা তা সহ্য করবে না। মধুসূদনের কাছে এটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছিল। মধুসূদন দুঃখ করে বলেছিলেন যে এটা কি করে সম্ভবপর হয়, তা পরে দেখা যায় যে একটি পত্রে মধুসূদন তাঁর বন্ধুকে লিখছেন যে ইতিহাসে মহররমের একটি বিষাদময় ঘটনা আছে যে ঘটনা নিয়ে মহাকাব্য রচনা করা যায় এবং তিনি আশা করছেন যে মুসলমান সমাজের মধ্যে এমন এক মহৎ কবির আবির্ভাব ঘটবে যিনি মহররমের ঘটনা অবলম্বন করে মহাকাব্য রচনা করতে পারেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সে যুগেই বলেছিলেন যে মুসলমানদের মধ্যে তিনি ভাবতে পারেন না, এর এমন এক মহৎ কবির আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল যিনি মুসলমানদের ঐতিহ্য অবলম্বন করে মুসলমানদের জীবন কথা অবলম্বন করে কাব্য রচনা করবেন। কিন্তু দেখা গেল বহুদিন পর্যন্ত শক্তির কোনো মুসলমান কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটল না। যাঁদের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁরা তীব্র ভাবাবেগে উদ্বেলিত ছিলেন কিন্তু কাব্য কুশলতায় সচকিত ছিলেন না। যেমন ইসমাইল হোসেন সিরাজী। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে একটি ইচ্ছা মুসলমানদের মনে জেগেছিল যে হয়তো আমাদের এমন একটি সুযোগ আসতে যাচ্ছে যখন আমরা আমাদের কথা বলতে পারবো, যখন আমাদের ইতিহাসের কথা কবিতায় থাকবে, যখন আমাদের সমাজের কথা, আমাদের আকাঙ্ক্ষা, অহমিকা ও বেদনার কথা আমাদের কবিতায় রূপলাভ করবে।

এই আনন্দের অভিপ্রায় তখন অনেকেই ব্যক্ত করছেন। এদের মধ্যে কবিদের চাইতে প্রবন্ধ লেখকদের সংখ্যাই ছিল বেশি। কবিদের মধ্যে যিনি অগ্রসর ছিলেন তিনি

www.pathagar.com

হচ্ছেন ফররুখ আহমদ। সেই সময় ফররুখ আহমদ ইসলামের প্রাচীন প্রাচীন না বলে বলা যায় ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস স্মরণ করতে গিয়ে একটি আনন্দময় রোমান্টিক ভাবাবহ সৃষ্টি করলেন। সে সময় আরো অনেকে এই ধারার কবিতা লেখার চেষ্টা করেছেন। তখন কবিদের মনে নতুন সৃষ্টির যে আগ্রহ ছিলো সে আগ্রহ ছিলো দ্বিধাহীন এবং আন্তরিক। এই আন্তরিকতার কারণেই কবিদের ইচ্ছাগুলো যথাযথভাবে শব্দে সমর্পিত হতে পেরেছিল। সে সময় কেউ কেউ ভেবেছিলেন যে পূর্বের কাহিনীকে নবরূপায়ণে উপস্থিত বলে আমাদের কাব্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। আমাদের দেশে প্রচুর কাহিনী-কাব্য, রোমান্টিক কাহিনী কাব্য গ্রামাঞ্চলে রচিত হয়েছে। এই সমস্ত কাহিনী কাব্যগীতও হয়ে থাকে। সে কাহিনী কাব্যগুলোর রচয়িতা অধিকাংশই মুসলমান। যদিও কাব্যভাবে সেগুলো খুব উচ্ছল নয় এবং রচনা রীতির দিক থেকেও সেগুলো অসম্ভব রকম উজ্জ্বল নয়। কিন্তু সেগুলোকে উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে নতুন কাব্য নির্মায়ণ করা যেতে পারে। এ রকম একটি চিন্তা তখনকার দিনের কোনো কোনো কবির মনে উদয় হয়েছিল। সে চিন্তার ফসলস্বরূপ আমরা পাচ্ছি দোভাষী পুঁথির 'চাহার দরবেশ' অবলম্বন করে লেখা 'চাহার দরবেশ' কবিতা। যদিও আধুনিক রীতিতে লেখা, কিন্তু মূল কাহিনীটি গ্রহণ করা হয়েছে দোভাষী পুঁথি থেকে। কবিতাটি কাব্যরীতির দিক থেকে খুব যে সফলকাম সে কথা বলছি না। শুধু ইতিহাসের ধারাক্রম আলোচনা করতে গিয়ে কবিতাটির কথা উল্লেখ করতে হল।

আমার মায়ের মুখে প্রায়ই পুঁথির গল্প শুনতাম। ঐগুলোর মধ্যে 'চাহার দরবেশের' গল্পটি আমার খুব ভালো লেগেছিল। অসম্ভবের কথা এবং অবাস্তবতার কথা থাকলেও একটি বিশ্বাসের প্রকরণ গল্পটির মধ্যে ছিল। গল্পটির মধ্যে মানুষের ইচ্ছাপূরণের কথা ছিল। এ ধরনের অনেক গল্পে তখন লোকেরা খুব আনন্দ পেত। বাবার কাছে দাস্তানে আমীর হামজা গল্পটির বিবরণ শুনেছি। আকবরের রাজদরবারের কবি আবুল ফয়েজ ফয়জী এটা লিখেছিলেন, পরে উর্দুতে এর অনুবাদ হয়। আমাদের বাড়ীতে এর উর্দু অনুবাদটি ছিল। এ কাহিনীর মধ্যে রাজপুরুষরা ছিল, দৈত্য-দানব ছিল, যাদুকর ছিল, পরীরা ছিল এবং সবাই মিলে একটি অবিশ্বাসের অবাস্তব জগৎ নির্মাণ করেছিল। অবসর সময়ে এসব গল্প মানুষের ভালো লাগতো। তখন মানুষের অবসর ছিল এখনকার চাইতে বেশি। এবং কর্মজীবনের ক্লান্তি ও প্রদাহ ভুলবার জন্য অবাস্তবতার মাধুর্যে তারা শান্তি ও বিশ্রাম পেত। এ সমস্ত কাহিনী সাহিত্যের উপকরণ হতে পারে কিনা এ প্রশ্নটা আমার মনের মধ্যে জেগেছিল ইয়েটস-এর কবিতা ও নাটক পড়ে। ইয়েটস আয়ারল্যান্ডের প্রাচীন কাহিনীকে নতুন উদ্ভাবনায় জাগ্রত করেছিলেন। তিনি সে সমস্ত কাহিনীকে স্বাধীনতার আন্দোলনের পটভূমিতে রূপকৃত ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত করেছিলেন। আমি সে সময় ভেবেছিলাম এ ধারায় অগ্রসর হয়ে আমি বাংলা সাহিত্যে নতুন কিছু দিয়ে যেতে পারবো। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমি এ ধারা থেকে একেবারেই সরে গেলাম। ফররুখ কিন্তু তার সম্পূর্ণ আবেগ নিয়ে এ ধারাকে অবলম্বন করে রইলো। তার ফলে তার একটি প্রশংসনীয় সিদ্ধি এসেছিল। আমি মূলত আমাদের পরিবারের একটি বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে লালিত ছিলাম এবং তার ফলে আমি আমার নিজের অনুভূতির কথা, বিশ্বাসের কথা ইচ্ছা ও অহমিকার কথা এবং নিবেদনের কথা কবিতায় তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। সে কারণেই

www.pathagar.com

কাহিনী-কাব্যের প্রকরণ আমার কাছে খুব সহায়ক মনে হয় নি। ত্রিশের দিক থেকেই বাংলা কবিতায় আত্মজিজ্ঞাসার বিকাশ ঘটেছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ প্রত্যেকেই আপনাপন মানসিকতার কথা বলেছেন। কখনো প্রহেলিকায় কখনো কঠিন শব্দবন্ধনে এবং কখনো যৌক্তিক বিন্যাস ভেঙ্গে পাশ্চাত্য কবিতায়ও এ সময় একই প্রবৃত্তির বিলসন ঘটেছিল।

তখনকার মুসলিম লীগ রাজনীতির সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের বা শিল্পকর্মের কোনো যোগসূত্র ছিল না। সেই কারণে আমাদের কবিতা রাজনীতির প্রচারকর্মে নিযুক্ত হয় নি। একমাত্র ফররুখ পাকিস্তানের উপর কিছু গান রচনা করেছিল কিন্তু তা অনেক পরে এবং সাময়িক উৎসাহের আনুকূল্যে। তবু একটি কথা বলবো যে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম বিভিন্ন আন্দোলনে যখন রূপান্তরিত হল তখন এসব আন্দোলনভিত্তিক কবিতা সৃষ্টির একটি উদ্যম অনেকের মধ্যে দেখা দিয়েছিল এবং আজো আন্দোলনভিত্তিক সাময়িক কবিতার ইতিহাস খণ্ডিত হয় নি। এখনো অধিকাংশ কবি সাময়িক ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখে চলেছেন।

॥৩২॥

যে সময়ের কথা বলছি সে সময় বাঙালী মুসলমানদের মনে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার মতো খবরের কাগজ, সাপ্তাহিকী ও মাসিক কাগজের খুবই অভাব ছিল। নিষ্ঠুর সাম্প্রদায়িক লীলাবিলাসে মত্ত ছিল আনন্দবাজার, যুগান্তর, প্রবাসী এবং প্রায় সব হিন্দু পত্র-পত্রিকা এর বিপরীতে মুসলমানকে আশ্বস্ত করবার মতো কিছু পত্র-পত্রিকার প্রয়োজন ছিল। এ ক্ষেত্রে আমাদের আশা পূরণ করতো আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত। 'ছায়াবীথি' বলে একটি অনিয়মিত মাসিক পত্রিকা ছিল, 'গুলিস্তাঁ' নামে একটি, 'বুলবুল' নামে আর একটি। শেষের তিনটি ছিল প্রধানত সাহিত্যবিষয়ক। ঢাকায় 'সোনার বাংলা' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা ছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ করে তৎকালীন বাঙালী মুসলমানের রাজনৈতিক চেতনা এবং বিশ্বাসের আদর্শকে অবলম্বন করে ঢাকা থেকে পাক্ষিক 'পাকিস্তান' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। এই পত্রিকাটি পরিচালনার ভার ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক এবং ছাত্রদের হাতে। শিক্ষকরা ছিলেন মরহুম মাযহারুল হক, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক এবং কবি জসীমউদ্দীন। ছাত্রদের মধ্যে ছিল শহীদ নাজির আহমদ এবং সাইফুল্লাহ। এ পত্রিকার পেছনে প্রতিষ্ঠানগত ব্যয় যা হত তার কিছুটা বহন করতেন মরহুম ফজলুর রহমান। যিনি পরে পাকিস্তানের মন্ত্রী হয়েছিলেন। সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠার পর এ পত্রিকাটি সংসদের মুখপত্র হিসাবে গৃহীত হয়। সংসদের মুখপত্র হওয়ার পর পর পত্রিকাটি কিছুটা সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক রূপ লাভ করে। মাঝে মাঝে গল্প এবং কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক বিষয়ে বিতর্কও উত্থাপন করেছিলেন মরহুম মিজানুর রহমান। তাঁর বিষয় ছিল পাকিস্তানের বাংলা ভাষার স্বরূপ কি হবে। তিনি আরবী-ফারসী মিশ্রিত এক প্রকার বাংলার সপক্ষে যুক্তি পেশ করেছিলেন। তিনি এ ভাষার নাম দিয়েছিলেন 'পাক-বাংলা'। এর প্রতিবাদ করেছিলাম আমি। আমি বাংলা ভাষাকে তার নিজস্ব স্বরূপে পরিচ্ছন্ন রাখবার পক্ষপাতী ছিলাম। আমার

www.pathagar.com

বাংলা কোনো দিনই মিশ্রিত বাংলা নয়– এখনও নয়, তখনও ছিল না। কিছু কিছু কবিতায় আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছিলাম ঠিকই। গদ্য ভাষায় মিশ্রণের পক্ষপাতী ছিলাম না। প্রতিবাদে এসব কথা লেখার পর মিজানুর রহমান ক্রুদ্ধ ভাষায় আমাকে আক্রমণ করে একটি পত্র লেখেন। এর জের অনেকদিন পর্যন্ত চলে। লক্ষ্যযোগ্য বস্তু হচ্ছে মিজানুর রহমান তার বক্তব্যের সমর্থনে কাউকেই পান নি। এই তর্কে বরিশালের একজন তরুণ যোগ দেয়। তার নাম আবুল কালাম শামসুদ্দিন। পরে তার একটি গল্পও আমরা ছাপি। তখন বোধহয় সে স্কুলের ছাত্র। সে পরে শামসুদ্দিন আবুল কালাম নামে বিখ্যাত হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা পত্রিকাটিতে শিশুদের একটি অংশ যোগ করতে পেরেছিলাম। এভাবে ক্রমশ পত্রিকাটি রাজনীতির অঙ্গন থেকে সাহিত্যের অঙ্গনে সরে আসায় ফজলুর রহমান খুব ক্ষুব্ধ হন এবং আমাদের নিয়ে একটি আলোচনায় বসেন। তিনি বলেন যে, যে সময় বাংলাদেশের মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হচ্ছে সে সময় এ পত্রিকাটির চরিত্র পরিবর্তন করা ঠিক হবে না। কবি জসীমউদ্দীন এ কথা মানেন না। তিনি তখন বলেন যে সংস্কৃতি এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিজস্ব সত্তা সম্পর্কে সচেতন করতে পারাই আমাদের মূললক্ষ্য হওয়া উচিত। রাজনীতি তার খাতে বইতেই থাকবে এবং ক্রমশ একটি উদ্বেল আবেগে আপন প্রবাহ নির্মাণ করে নেবে। সে জন্যই এ মুহূর্তে সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিকে আমাদের লক্ষ্য দেওয়া একান্ত দরকার। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় যে পত্রিকাটিতে নিয়মিতভাবে সাহিত্যের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরিক্রমা থাকবে।

ফজলুর রহমান অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। নেতৃত্ব পাওয়ার মতো দক্ষতা তার ছিল না কিন্তু কোনো নেতার নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিতেন। তিনি প্রাদেশিক পরিষদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ছিলেন আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটেরও সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান হতে যাচ্ছে এই সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিন্দু শিক্ষকরা যাতে ক্রমশ চলে যায় সেই ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করেছিলেন। সে সময় বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এস এম বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যরত ছিলেন। চাকরি থেকে তাঁর অবসরের সময় এলে সিন্ডিকেটে তাঁর চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে দেবার প্রস্তাবে প্রবল বিরোধিতা ফজলুর রহমান করেন। বিরোধিতা করতে গিয়ে এস এম বসুর বৈজ্ঞানিক খ্যাতি নিয়ে তিনি কিছু সন্দেহ প্রকাশ করেন। এর ফলে এস এম বসু আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকলেন না। তৎকালীন মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের ঘটনা খুব বেশি অস্বাভাবিক ছিল না।

তবে আমি দুঃখ পেয়েছিলাম মোহিতলাল মজুমদার যখন বিদায় নিলেন তখন। তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি আরও দু এক বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে পারবেন, তাঁকেও সে সুযোগ দেওয়া হয় নি। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, 'আমি এখানকার মানুষকে ভাষা এবং সংস্কৃতিকে সঙ্গতিপূর্ণ করতে চেয়েছিলাম। অনেকটা সফলকামও হয়েছিলাম কিন্তু আরও কয়েকদিন থাকলে আমার কাজ সফল হল ভেবে আমি স্বাচ্ছন্দবোধ করতাম। কিন্তু আমাকে সে সুযোগ দেয়া হল না।' মোহিতলাল তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে ভয় পাচ্ছিলেন। দীর্ঘকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করে একটি অভ্যস্ততার মধ্যে তিনি নিজেকে স্থির করে ফেলেছিলেন। এটা ভেঙে যাচ্ছে দেখে তিনি বিচলিত বোধ

www.pathagar.com

করেছিলেন। বিদায়ের দিন তাঁকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। যে মানুষ সব সময় অন্যকে আক্রমণ করে আনন্দ পেতেন তাঁর এই অবস্থা সত্যিই বেদনাদায়ক মনে হয়েছিল আমার। এর একটা কারণও ছিল। তাঁর সঙ্গে আমার একটি পারস্পরিক সমর্থনসূচক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কাজী আবদুল ওদুদ কলকাতায় চলে যাওয়ার পর একমাত্র মোহিতলালের বাসায় আমি নিয়মিত যেতাম এবং তাঁর আলাপ আমি শুনতাম।

আমি এ সময় জাপানী 'নো' নাটকের অনুসরণে দুটি নাটক লিখেছিলাম। একটির নাম 'কোরবানী' আর একটির নাম 'জোহরা ও মুশতরী'। 'নো' নাটকে যে বিশিষ্টতা তখন এনেছিলাম তা হচ্ছে একটি মৃত আত্মা তার অসম্পূর্ণ ইচ্ছা পূরণের জন্য পৃথিবীতে আসে এবং পরিজনদের মধ্যে কিছুটা সময় অতিবাহিত করে। আমি তখন কোনো জাপানী 'নো' নাটিকা পাঠ করি নি। আমার একমাত্র আদর্শ ছিল ডব্লিউ বি ইয়েটস। তিনি 'অ্যাট দি হক্‌স ওয়েল' নামক একটি নাটিকায় জাপানী 'নো' নাটকের কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। সে কৌশলটুকু জেনে নিয়ে আমি ইয়েটস-এর মঞ্চায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে এ দুটি নাটিকা লিখি। এ দুটি নাটিকাই মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হয়েছিল। কোরবানী নাটিকাটি পুরোপুরি ইয়েটস-এর ভঙ্গিতে রচিত। এ সম্পর্কে আমি সে সময় যে কথা লিখেছিলাম তা হচ্ছে, 'এই নাটকের অভিনয়ের নির্দেশগুলি কোন মৌলিক উদ্ভাবনা নয়। এই ধরনের স্টেজ পরিকল্পনা জাপানে বহু পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এই পরিকল্পনা সর্বপ্রথম সার্থকভাবে কার্যকরী করেন ডব্লিউ বি ইয়েটস তাঁহার অ্যাট দি হক্‌স ওয়েল কাব্য নাট্যে। তাহার অন্য আরও তিনটি নাটিকা এই রীতিতেই অভিনীত হইয়াছিল। আমার এই নাটিকাটিকে নাটিকা না বলিয়া, নাট্যরীতিতে লেখা কবিতা বলাই বোধহয় সঙ্গত।'

সম্প্রতি আমার এ দুটি নাটিকা সে সময়কার কিছু কবিতার সঙ্গে একত্রে গ্রথিত করে 'চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা' নামে প্রকাশিত হয়েছে। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ আলী আশরাফ এটি প্রকাশ করেছেন। এই লেখাগুলো সম্পর্কে আমি এখনো দ্বিধাগ্রস্ত তবে ইতিহাসের ধারাক্রম রক্ষার জন্য এবং একজন কবির মানসচৈতন্য ব্যাখ্যার জন্য এগুলোর প্রয়োজন আছে বলে এখন আমি স্বীকার করি। আবার এ নাটিকা দুটি সে সময় যাদের ভালো লেগেছিল, তারা ছিলেন সৈয়দ এমদাদ আলী, বেনজীর আহমদ এবং ফররুখ আহমদ। বেনজীর আহমদ এ ধারা অবলম্বন করেই আমাকে থাকতে বলেছিলেন, ফররুখও। কিন্তু আমি আমার কাব্যকর্মের জন্য আমার নিজস্ব কাব্যভাষা আবিষ্কারের চেষ্টায় নতুন পথ বেছে নিয়েছিলাম।

॥৩৩॥

যে সময়ের কথা বলছি তখন তেজগাঁ শিল্প এলাকা হয় নি। ঘনবিন্যস্ত গাছপালার ছায়ায় সেখানকার বাড়িঘর ঢাকা পড়ে থাকতো। ঢাকা থেকে লোকেরা তেজগাঁয় পিকনিক করতে যেত। একটি সুন্দর কৃষি ফার্ম ছিল। সেখানকার পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া সবার ভাল লাগত। সেখানেই বড় বড় গাছের ফোকর থেকে কাঠবিড়ালী এসে দ্রুত লোকালয় থেকে খাবার সংগ্রহ করত। প্রকৃতি, মানুষ এবং প্রাণী একটি নিশ্চিন্ততায় এখানে বাস করত। একবার আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনা পনের ছাত্র এখানে পিকনিক করতে এসেছিলাম, ব্যক্তিগতভাবে আমরা পিকনিকের আয়োজন করেছিলাম। ঢাকা থেকে দুটো ঘোড়ার গাড়ি

www.pathagar.com

করে আমরা তেজগাঁও নেমেছিলাম। সেখানেই রান্না করব বলে চাল, তেল, মুরগী এগুলো সঙ্গে নিয়েছিলাম। ফার্মের কাছে একটি বাড়ির পিছনে গাছগাছালির মধ্যে কিছুটা ফাঁকা জায়গা দেখে আমরা পিকনিকের জন্য জড়ো হয়েছিলাম। জিনিসপত্র নামিয়েই দেখি নুন আনি নি, লাকড়ি আনা হয় নি, খাবার কোনো পাত্রও আনা হয় নি। কলাপাতা পাওয়া যাবে ভেবেছিলাম, কিন্তু আশেপাশে কোনো কলাগাছ দেখলাম না। এখন লাকড়ি কিনতে বাজারে যেতে হবে। যে বাড়ির পেছনে বসেছিলাম সেখানকার একটি বাড়ির জানালা দিয়ে লোকেরা আমাদের দেখছিল। এক সময় এক ভদ্রমহিলা দরজা খুলে বেরিয়ে এসে হাসি মুখে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন যে আমাদের কিছু দরকার আছে কিনা। আমরা উত্তর দিতে ইতস্তত করছি দেখে তিনি বললেন, 'তোমাদের কোনো চিন্তার কারণ নেই, আমার বাসায় রান্নার লোক আছে। বাসন এবং পেয়ালারও অভাব নেই।'

আমরা ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত রাজি হলাম। ভদ্রমহিলার দুই মেয়ে রান্নাবান্নার তদারক করতে এল। বড় মেয়েটির বয়স ১৬/১৭ হবে, শ্যামবর্ণ, একটু বেঁটে কিন্তু নিটোল স্বাস্থ্যবতী। ছোট মেয়েটি ১০/১২ বছরের। এই মেয়েটি উজ্জ্বল রংয়ের খুব সুন্দরী ছিল। আমরা ছেলে বা মেয়ে দুটির আগমনে চঞ্চল হলাম। কিছুটা লজ্জিতও হলাম। কিন্তু ভালো লেগেছিল, এখনও সে কথা মনে আছে। বাড়ির কাছে একটি টিউবওয়েল ছিল। সেখান থেকে মেয়েটি আমাদের পানি এনে দিল। আমি কলে চাপ দিয়েছিলাম এবং মেয়েটি বালতিতে পানি ভরেছিল। স্বচ্ছ পানিতে সূর্যের আলো পড়েছিল এবং মেয়েটির মুখও উদ্ভাসিত হয়েছিল। আশেপাশে কয়েকটি পাখি ডেকে উঠেছিল। একটি নতুন জায়গায় সময়কে একটি অভিনব আশ্বাসের মধ্যে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। রান্নার মাঝে ছেলেরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমিও এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে করতে এক পর্যায়ে এদের বাড়ির ভেতরে ঘুরে এসেছিলাম। বাড়ির ভদ্রমহিলা আমাকে একটি আতাফল খেতে দিয়েছিলেন। বারবার করে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে দ্বিধা না করে তাদের বাড়ি যেন বেড়াতে আসি। ভদ্রমহিলার স্বামী কৃষি বিভাগে কাজ করতেন। বড় মেয়েটি, যার নাম নীলা সে দশম শ্রেণীতে পড়ত। পিকনিক শেষে আমরা ঢাকায় ফিরে এলাম। আসার সময় মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মেয়েটিও তার মার মতো তাদের বাড়িতে আসতে অনুরোধ জানিয়েছিল। ঢাকায় বাড়িতে ফিরে আমি নতুন পরিচয়ের কথা বারবার স্মরণ করছিলাম। এর পরে রোববার যখন এল তখন মার কাছে অনুমতি নিয়ে আমি তেজগাঁয় নীলাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। আমি মার কাছে কোনো কিছু গোপন করতে পারতাম না এবং মার অনুমতি ছাড়া কোথাও যেতাম না। কি বলে মার কাছে অনুমতি নিয়েছিলাম এখন সে কথা মনে পড়ছে না। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, মেয়েটির পরিচয় আমি আড়ালেই রেখেছিলাম।

তেজগাঁয় নীলাদের বাড়িতে এসে প্রথম কেমন যেন সংকোচ লেগেছিল। নীলার বাবা মফস্বলে ছিলেন এবং মা কাছের কোনো বাড়িতে যাবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমাকে দেখে আপনজনের মতোই গ্রহণ করলেন। বললেন, যে তিনি অল্প কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যাচ্ছেন, একটু পরেই ফিরবেন। আমি যেন দুপুরে খেয়ে যাই। তিনি তার মেয়েকে রান্নার ব্যবস্থা করতে বললেন এবং বাড়ির একটি ছোট চাকরকে কি যেন আনতে

www.pathagar.com

দোকানে পাঠালেন। একাকী নতুন একটি পরিবেশে একজন সদ্য পরিচিতার সাথে কিছুটা সময় কাটাব এটা আমার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা। আমি কিছুটা চঞ্চল এবং ভীত হয়েছিলাম। কেমন এক প্রকার আনন্দময় অস্বস্তি আমাকে পেয়ে বসেছিল। গাছপালা আমাদের সবসময় ভালো লাগে, নির্জন ক্ষেত্রে পাখির ডাকও ভালো লাগে। প্রকৃতির এ হেন বদান্যতার মধ্যে একজন সজীব কিশোরী যদি সামনে এসে দাঁড়ায় তখন প্রকৃতির বদান্যতা আরও বিপুল বলে মনে হয়। তার মা চলে যাবার পর মেয়েটি ঘুরে ফিরে আমাকে বাড়ির চার পাশ দেখাতে লাগল। বড় বড় গাছ ছিল, গাছের নিচে বসবার প্রশস্ত জায়গা ছিল। আমরা এ রকম একটি গাছের নিচে কিছুটা সময় বসেছিলাম। সে বয়সে কথা বলার নিয়ম শিখি নি, তাই এলোমেলোভাবে অনেক কথাই বলছিলাম। মেয়েটি তার স্কুলের সহপাঠিনীদের কথা বলছিল, আমিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছিলাম। এক পর্যায়ে একটি ইংরেজী উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনা করেছিলাম। যদ্দুর মনে পড়ে, কাহিনীটি ছিল আলেকজান্ডার ডুমার মন্টিকিস্ট্রো উপন্যাসের।

মাঝখানে উঠে মেয়েটি রান্নার তদারক করতে গেল। আমি ঘুরে ফিরে বাগানের এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম। একবার মেয়েটি ঘরের বারান্দায় এসে আমাকে ডেকে বলল, আমি ঘরের ভেতরে এসে কিছু ছবির বই এবং পত্র-পত্রিকা দেখতে পারি। সে ততক্ষণ গোসল করে নেবে। ওদের বাড়ির বাইরের ঘরটি বেশ বড় ছিল। সেই ঘরের দক্ষিণ দিকে একটি টেবিলের উপর দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রবার্ট ব্লেকের একটি উপন্যাস ছিল। আর দু'একটি কিশোর পাঠ্য ভ্রমণকাহিনী ছিল। শিশু সাথী পত্রিকার একটি বার্ষিক সংখ্যাও ছিল। সে সময় শিশুসাথী খুব জনপ্রিয় ছিল। আর রহস্য কাহিনীর মধ্যে রবার্ট ব্লেকের কাহিনীটিও খুব পরিচিত ছিল। নির্জন জায়গায় গাছের পাতায় বাতাসের শব্দ শুনছিলাম, কোথায় যেন পানি পড়ার শব্দও হচ্ছিল। আমি একা একা উঠে হাঁটতে লাগলাম। এক সময় দক্ষিণ দিকের আধা ভেজানো জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। জানালা দিয়ে বাইরে চোখ পড়তেই একটি অভূতপূর্ব দৃশ্যে আমার চোখ আটকে গেল। ঘরের বাইরের এই জায়গাটি টিন দিয়ে ঘেরাও করা। ওপরে কোনো ছাদ নেই।

এখানেই গোসলের জায়গা। মেয়েটি জানালার দিকে মুখ করে সম্পূর্ণ নিরাবরণ অবস্থায় পাশের ড্রাম থেকে পানি তুলে নিজের মাথায় ঢালছিল। পানির ধারা তার বুক বেয়ে কোমরে নেমে শরীরের নিম্নাংশে ছায়ার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিল। যৌবনবতী রমণী শরীরকে নিরাবরণ অবস্থায় আমি এর আগে কখনো দেখি নি। দৃশ্যটি আমার কাছে অপূর্ব লাগছিল। কোনো প্রকার কামনার আকর্ষণ যে আমি অনুভব করেছিলাম তা আমার মনে হয় না। একটি আকর্ষণীয় রূপের বিকাশে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম এটাই আমার মনে পড়ে। শরীরের কোনো বিশেষ অংশ যে আমার লক্ষ্যের বস্তু ছিল তা নয়। সমগ্র শরীরটি একটি অনবদ্য আনন্দের আকর্ষণ নির্মাণ করেছিল। কেশ থেকে আরম্ভ করে পায়ের পাতা পর্যন্ত একটি নিষিক্ত স্রোতধারা আমাকে বিহ্বল করেছিল।

সে সময় হয়তো জানালা একটু শব্দ হয়ে থাকবে, হয়তো জানালাটি একটু ফাঁকও হয়েছিল। মেয়েটি চমকে সরাসরি আমার দিকে তাকালো। আমি ভয়ংকর অপ্রস্তুত হয়ে ওখান থেকে দ্রুত সরে গেলাম। তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে নেমে সামনের উঠান পার হয়ে

www.pathagar.com

রাস্তায় হাঁটতে লাগলাম। একটু পরেই নীলার মাকে আসতে দেখলাম, তিনি অনুযোগ করতে লাগলেন, আমি কেন রাস্তায় বেরিয়ে এসেছি। আমি আমতা আমতা করে কি উত্তর দিলাম জানি না। পরে তার সঙ্গে আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে এলাম। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে ওদের বাড়িতে বিশ্রাম নিতে কেন যেন দ্বিধা হল। আমি সব অনুরোধ এড়িয়ে বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে বাড়ি ফিরে এলাম। তখন মন কোনো সংকল্প নির্ণয় করতে পারেনি, ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তি সুস্পষ্ট কোনো রূপ ধারণ করতে পারেনি, শুধু একটি অভিজ্ঞতা জীবনকে প্রথম বারের মতো সচকিত করেছে।

॥৩৪॥

অনেক দৃশ্য বিচ্ছিন্নভাবে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। তখন সম্ভবত দেহগত একটি বিশেষ আকর্ষণে আমার জীবনের জন্য আমি একটি নতুন ধর্ম নির্মাণ করতে চলেছিলাম। পিতামাতার শিক্ষা এবং আশ্বাস আমার মধ্যে যে প্রবৃত্তির জন্ম দিয়েছিল আমার জীবনে তারও অধিকার ছিল। সে কারণেই বোধ হয় আমি কখনো কোনো একটি বিক্ষেপে পুরোপুরি হারিয়ে যাই নি। নিষ্ঠা ও ন্যায়ের পথ অত্যন্ত দুরূহ, পর্বতে আরোহণের মতো। কিন্তু কামনার আকর্ষণের পথ কোনো উচ্চস্থান থেকে সহজে নিম্নে অবতরণের মতো। আমি এটা জীবনে বহুবার অনুভব করেছি। যেদিন আমি স্নানরতা নীলাকে দেখে চঞ্চল হয়েছিলাম সেদিন পালিয়ে এসেছিলাম ঠিকই, কিন্তু আবার একটি তীব্র আকর্ষণে তার কাছে গিয়ে পৌঁছে ছিলাম। এরকম যে কতোবার গিয়েছি তা সুস্পষ্ট মনে নেই। একদিনের কথা মনে আছে, একদিনের একটি দৃশ্যের কথা। নীলাদের বাড়িতে কোনো বই ছিল না। যে সব বই ছিল সেগুলোকে বই বলা ঠিক নয়।

আমি সেদিন নীলাকে বই সম্পর্কে অনুযোগ করায় সে মুচকি হেসে, 'একটি বই আপনাকে দেখাবো' এই বলে বাড়ির ভেতরের দিকে গেল। কিছুক্ষণ পর আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে শাড়ির আঁচলটা দাঁত দিয়ে ধরে ভেতরের ব্লাউজের বোতাম খুলে একটি বই বের করে সে অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে বইটা আমার হাতে দিল। আমি বইটি হাতে নিলাম। সে ইতোমধ্যে দাঁত দিয়ে আঁচল ধরা অবস্থায় ধীরে ধীরে ব্লাউজের বোতাম লাগাল। পাতলা নীল আঁচলের স্বচ্ছ আবরণের আড়ালে আমি তার বাম স্তনের পরিপুষ্টি সুস্পষ্ট লক্ষ্য করলাম। আমার গলা শুকিয়ে এসেছিল, কোনোক্রমে মাথা নিচু করে বইটির দিকে তাকালাম। বইটির নাম, 'চুম্বন ঃ চিত্রে ও কাব্যে।'

সম্ভবত 'চিত্র দেবী সম্পাদিত' একথাটিও নিচে লেখা ছিল। এমন কিছু ভয়ংকর বই নয় কিন্তু সে বয়সে এটাই আমার কাছে একটি নিরুদ্ধ জগতের দ্বার উদঘাটন ছিল। প্রতিটি পৃষ্ঠায় ছবি ছিল এবং নিচে একটি করে কবিতা বা কবিতার অংশবিশেষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এ বই পেলে কোথায়?' নীলা উত্তর করলো, 'জলিল চাচা আম্মাকে দিয়েছিলেন।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'জলিল চাচা কে?' নীলা উত্তর করলো, 'বাবার একজন বন্ধু, পাইওনিয়ার ফোর্সের একজন মেজর। আমাদের তেজগাঁ এলাকাতেই থাকেন।' আমার কাছে এ খবরটি নতুন অর্থ নিয়ে উপস্থিত হল। এ ধরনের বই কি করে একজন মহিলাকে উপহার দেওয়া যায় এবং যদি দেওয়াই যায় তাহলে সে উপহারদাতার

www.pathagar.com

সঙ্গে মহিলার সম্পর্ক কি। যে পরিবারে আমি মানুষ সেখানে এ ধরনের ঘটনা কল্পনাই করা যায় না। আমাদের বাড়িতে পর্দা ছিল কিন্তু আমরা কূপমন্ডুকও ছিলাম না। পরপুরুষের অবাধ গতিবিধি আমরা কল্পনাই করতে পারি না। কিন্তু নীলাদের সমাজ একটু ভিন্ন ধরনের যেখানে পুরুষ রমণীদের মেলামেশায় অতিরিক্ত স্বাধীনতা ছিল। আমার তখনই মনে হয়েছিল যে এদের সঙ্গে বোধ হয় ঘনিষ্ঠতা ঠিক হবে না। আমি বিভ্রান্তির মধ্যে পড়বো এবং আমার পরিবারের শিক্ষা প্রবাহ থেকে দূরে সরে পড়বো। কিন্তু তবু আমি নিজেকে নীলাদের কাছ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করতে পারছিলাম না।

ইতোমধ্যে নীলার বাবা বদলি হয়ে গেলেন রাজশাহীতে, রাজশাহী কৃষি ফার্মে। যাবার আগে নীলারা আমাদের বাসায় এসেছিল। নীলার মা বারবার আমাকে বলেছিলেন, অনার্স পরীক্ষা শেষে আমি যেন অবশ্যই রাজশাহীতে তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাই। একথা তিনি মা-কেও বলেছিলেন। পরীক্ষার শেষে রাজশাহী যাবার জন্য আমি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। মা প্রথমে রাজি হন নি, অবশেষে রাজি হয়েছিলেন, যখন জানলেন যে খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ রাজশাহীতেই থাকেন এবং আমি তাঁর ওখানেই উঠবো। তখন রাজশাহী যাওয়া খুবই দুরূহ ছিল। ঢাকা থেকে প্রথমে ময়মনসিংহ যেতে হত। বিকেল চারটায় ট্রেন ছাড়তো ময়মনসিংহ গিয়ে পৌঁছত পাঁচ ছয় ঘন্টা পর। সেখানে অবস্থান করতে হত বেশ অনেকক্ষণ। তারপর অনেক রাতে ট্রেন ছাড়তো জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের দিকে। খুব সকালে জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে পৌঁছে অনেকটা কাঁচা মাটির পথ হেঁটে জাহাজে উঠতে হতো। ওপারে সিরাজগঞ্জ ঘাটে গিয়ে পৌঁছতে ঘন্টা তিনেক লাগত।

সেখানেও আবার অপেক্ষা। আবার ট্রেনে চড়ে ঈশ্বরদী। ঈশ্বরদী পৌঁছতে দুপুর হয়ে যেত। সেখানে রাজশাহী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হত। বিকেল চারটায় রাজশাহীর ট্রেন ছাড়তো এবং রাজশাহী গিয়ে পৌঁছতো রাত সাতটা কি আটটায়। এভাবেই প্রায় চব্বিশ ঘন্টার অধিক যাত্রায় প্রায় জরাজীর্ণ হয়ে রাজশাহী পৌঁছেছিলাম। সেদিনকার শারীরিক অভূতপূর্ব কষ্টের কারণে এই দীর্ঘ যাত্রার কথা আমার মনে আছে। আবদুর রহমান সাহেব থাকতেন রাজশাহী কলেজের বিপরীতে একটি লাল দোতলা বাড়িতে। সেই বাড়িটি জরাজীর্ণ অবস্থায় আজো বিদ্যমান আছে। পরের দিন সকালে রাজশাহী সরকারী খামারে গেলাম। নীলারা আমাকে দেখে খুবই খুশী হল।

নীলার মা আমাকে দেখে আমাকে আপ্যায়নের জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এখনো মনে হচ্ছে সেদিনকার আন্তরিকতাটি অতিশয় ছিল। তিনি নীলাকে বারবার করে বললেন, আমাকে খামারটা ঘুরে ফিরে দেখিয়ে দিতে। বর্তমানে এই ফার্মটি আর নেই। তখন সবুজ এবং হলুদের উচ্ছল বন্যায় এই কৃষি খামারটি আমায় খুব আনন্দ দিয়েছিল। ফার্মের মধ্যে অনেকগুলো জায়গা ছিল যেগুলো ঘরবাড়ি থেকে দূরে বেশ আড়াল নির্মাণ করেছিল। সুতরাং গোপন দেখাশোনার এবং ভাববিনিময়ের সুযোগ ছিল বিস্তর। প্রথম দিন আমি খুব বেশি দ্বিধামুক্ত হতে পারি নি। তাই বেশিক্ষণ থাকতে সাহসী হই নি, দুপুরের আগেই চলে এসেছিলাম। শহরে ফিরে আবদুর রহমান সাহেবের কাছে নানাবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম। ফার্মে কে আছে, কেন সেখানে যাচ্ছি ইত্যাদি সব প্রশ্ন। আমার উত্তরের ভঙ্গি দেখে হেসেছিলেন। তিনি আমার আকর্ষণের কারণ নিশ্চয়ই অনুভব করতে পেরেছিলেন। পরের দিন আবারও ফার্মে গেলাম। সেদিন সারাটিদিন ফার্মেই ছিলাম।

www.pathagar.com

নীলার মা রাজশাহী অবস্থানকালে ফার্মের বাড়িতে তাদের সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। একবার আমি প্রায় রাজিই হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকবার প্রস্তাবটি মেনে নেই নি। বিকেল বেলা নীলার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে একটি নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেটা না বললে আমার ইচ্ছার পরিবর্তনটি পুরোপুরি বুঝা যাবে না। ফার্মের পেছনে রেললাইন। রেললাইনের ওপাশেও ফার্মের কিছু জায়গা ছিল। জায়গাটি ছিল অসম্ভব নির্জন। শুধু যখন ট্রেন যায় তখনই শুধু প্রচণ্ড শব্দে একটি কলরোল ওঠে।

তারপরই আবার সবকিছু অসম্ভব শান্ত এবং নিরুদ্ধ। রেললাইনের ওপাশে একটি পরিচ্ছন্ন টিলা ছিল। যার ওপরে বসা যায়। কিন্তু রেললাইন পেরুতে হলে এপাশে দশ/বারো ফুট হাঁটু পানি-ডোবা পার হয়ে যেতে হয়। নীলা আমাকে বারবার উৎসাহ দিচ্ছিল টিলার উপরে যাবার জন্য। আমি বলেছিলাম, 'আমি তো যেতে পারি কিন্তু তুমি যাবে কি করে?' নীলা হেসে বলছিল, বারে আমাকে তুলে নিয়ে যেতে পারেন না।' আমি একটু দ্বিধা করলাম। পরে সত্যি তাকে তুলে ওপারে ঢিবির উপর উঠেছিলাম মনে আছে। একটি উচ্ছলে যুবতীর শরীরকে পাঁজাকোলে তুলে নেয়া দুঃসাহসের ব্যাপার এবং তখন কি করে যে আমি এ কাণ্ডটি করতে পেরেছিলাম, আজ ভাবতেও অবাক লাগে। দু' হাঁটুর ভাঁজের নিচে ডান হাত দিয়ে এবং পিঠের দিকে বাঁ হাত দিয়ে একটি রমণীর যৌবনকে তুলে ধরা দিগভ্রান্তিকর অবস্থাই বটে। সঙ্গে সঙ্গে নীলার আচরণটিও আমার মধ্যে লুব্ধতার সৃষ্টি করছিল। পাখি ডাকে, গাছের পাতা বাতাসে নড়ে, বনফুলগুলি লাল-নীলের সম্ভার ছড়িয়ে ইতস্তত ফুটে থাকে এগুলো স্বাভাবিক সত্য।

সেদিন প্রকৃতির এই উচ্ছলতার মধ্যে রমণী শরীরের প্রতি আকর্ষণটিও আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। একটি দুর্লভ মুহূর্ত যেন আমার জীবনে এসেছে তখন একথাই আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু কিভাবে এ মুহূর্তকে উপভোগ করা যায়, কি করে এ মুহূর্তের স্বাদ চিরস্মরণীয় করা যায় তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল, এক সঙ্গে বোধ হয় বনাঞ্চলের সব পাখিগুলো গান গেয়ে উঠবে। কিন্তু পাখিরা এক সঙ্গে তো গান গায় না। আবার যখন পাখিদের গান শোনা যায় তখন অকস্মাৎ হয় তো মনের নিভৃত থেকে কোনো একটি শাসন শব্দ করে ওঠে। এভাবেই আমরা হয়তো কোনো মুহূর্তকেই হারাই অথবা বঞ্চনা থেকে বেঁচে যাই। আমার জন্য কোনটা যে সত্য ছিল তা ঠিক করে বলতে পারবো না। অনেক পরে সেদিনকার ঘটনাটি আমি এভাবে বর্ণনা করেছি ঃ 'কোনো চিন্তা না করে, কোনো সমস্যার কথা না ভেবে শুধুমাত্র মনের ইচ্ছায় আমি চিরদিনের জন্য অন্য একটি অনুভূতিপ্রবণ মনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চাইছি। আমার কর্মে, অবসরে, আকাশ দেখার আনন্দে, রাত্রির নিদ্রায় তাকেই আমি ভাবি। মনে হয় সকল শিহরণ যেন একটি বিশিষ্ট অনিবার্যতায় আমার জীবনের বসন্তের মাধবীলতা হয়ে আমার সর্বশরীর বেয়ে উঠেছে।'

সেদিন টিলার উপর দাঁড়াতেই আরক্তিম মুখে নীলা আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। চুম্বনে উন্মুখ ওষ্ঠ যখন তার ওষ্ঠের দিকে নেমে আসছিল তখন প্রচণ্ড বেগে একটি ট্রেন চলে গেল। আমরা চমকে ওঠে একে অন্যকে ছেড়ে কিছুটা ব্যবধানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

www.pathagar.com

॥৩৫॥

আমি 'কৃতজ্ঞতার বিড়ম্বনা' নামে একটি গল্প পড়েছিলাম প্রবাসীতে। গল্পটিতে দেখানো হয়েছিল যে কোনো বিত্তবান যদি দরিদ্র কোনো ব্যক্তির উপকার করে তাহলে সে সবসময় আশা করে, যেন দরিদ্র ব্যক্তিটি তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। আমার জীবনে আমি তথাকথিত নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষদের মধ্যেই কৃতজ্ঞতার অপূর্ব প্রকাশ দেখেছি। স্কুল জীবনের শেষ পর্বে যখন সাত রওজা এলাকায় থাকতাম তখন একদিন এক হিন্দু বিধবা মহিলা তার যুবতী কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বাবার কাছে এসেছিলেন। মহিলা কন্যাদায়গ্রস্তা ছিলেন এবং বরপণের টাকা সংগ্রহ করতে অসুবিধায় পড়েছিলেন। বাবার কাছে এসেছিলেন মাত্র ২০ টাকা সাহায্য চাইতে। বাবার হাতে তখন টাকা ছিল না। তিনি মহিলাকে বসিয়ে রেখে টাকা আনতে বেরিয়েছিলেন। ২০টি টাকা এনে যখন মহিলার হাতে দিলেন তখন মহিলা আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন। এরপর প্রতি বছর ঠিক ঐ দিনে অর্থাৎ যেদিন তিনি টাকা নিয়েছিলেন মহিলাটি কিছু আনাজতরকারি নিয়ে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বাবার পায়ের কাছে রাখতেন। কয়েক বছর পর্যন্ত এ ঘটনা আমি চোখে দেখেছি। তার পরে কি হল জানি না। তবে আজও এ মহিলার কথা আমার মনে পড়ে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এই আন্তরিকতা আমি খুব বেশি দেখি নি। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের হৃদয় বোধ হয় পরিচ্ছন্ন থাকে। সভ্যতা এবং সংস্কৃতির আবরণ থেকে তারা মুক্ত বলেই বোধ হয় তারা মানুষের উপকার যেমন করতে পারে তেমন উপকারের কথা স্মরণও রাখতে পারে।

সেবার রাজশাহী থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে আমার একটি বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। রাজশাহী থেকে যেদিন ঢাকায় রওয়ানা দেই সেদিন আমার শরীরে জ্বর ছিল। ট্রেনে উঠবার পর থেকেই শরীর খারাপ লাগছিল। আমার কম্পার্টমেন্টে রাজশাহী থেকে দুজন বাঙালী ভদ্রলোক এবং একজন মাড়োয়ারী উঠেছিল। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক সারাপথ অনর্গল কথা বলে চলেছিল। আমি ক্লান্তিতে বেঞ্চিতে শুয়েছিলাম। কখনও তন্দ্রাচ্ছন্ন হচ্ছিলাম, কখনও মাড়োয়ারীর কথায় জেগে উঠছিলাম খুব বিরক্ত বোধ হচ্ছিল। অবশ্য কিছু করবারও ছিল না। শারীরিক গ্লানির কারণে আরো খারাপ লাগছিল। বারবার ভাবছিলাম কোনোক্রমে নদীতে জাহাজে উঠলে ঠাণ্ডা বাতাসে শরীরটা বোধ হয় ভালো লাগতো। সিরাজগঞ্জ ঘাট থেকে নদী পারাপারের জাহাজে যখন উঠলাম তখন আমার পা চলতে চাইছিল না।

অত্যন্ত নির্জীব ছিলাম এবং বমি হবে মনে হচ্ছিল। আমার হাতে একটি ছোট সুটকেস ছিল। ওটা নিয়ে কোনোক্রমে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে একটি মধ্যম শ্রেণীর কামরার পাশে লোক চলাচলের জায়গায় খাকি পোশাক পরা রুগ্ন আকৃতির একটি যুবককে দেখলাম। সে অনেকটা জায়গা নিয়ে বিছানা পেতে বসেছে। আমি তার পাশেই কোনোক্রমে একটু জায়গা করে নিলাম। আমাকে তার বিছানার পাশে শুয়ে পড়তে দেখে লোকটি বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলো। এক পর্যায়ে আমাকে উঠেও যেতে বলল। আমি কি করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তবু কোনোক্রমে উঠে সরে যাবার চেষ্টা করলাম।

www.pathagar.com

কিন্তু তখন হঠাৎ বমি করে ফেললাম। লোকটির বিছানা নষ্ট হয়ে গেল। আমি ভীষণ শংকিত হয়ে বললাম, 'আমি উঠে সব ধুয়ে দিচ্ছি, কিছু মনে করবেন না।' সে সময় এই রুগ্ন আকৃতির লোকটি হঠাৎ যেন অন্য রকম হয়ে গেল। লোকটি আমাকে সঙ্গে নিয়ে নিচে একটা বিছানা পেতে আমাকে শুইয়ে দিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই জায়গাটাও পরিষ্কার করে ফেলল। লোকটি আদর আপ্যায়নের কথাবার্তা কিছুই বলে নি, বোধ হয় বলতেও জানতো না। সারাপথ আমার পাশে বসে রইল। একবার একটি কমলালেবুর কোয়া খুলে আমাকে খেতে দিল। শুধু বলল, 'এটা খেতে ভালো লাগবে। জাহাজ ঘাটে ভিড়ার পর এই লোকটি আমাকে ট্রেনের কামরার মধ্যে তুলল এবং আমার শোবার জায়গা করে আমার পাশেই বসে রইল।

ময়মনসিংহ স্টেশনে ট্রেন থামলে লোকটি একবার প্লাটফর্মে নামলো, তারপর আমার কামরায় উঠে এল। আমাকে একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল যে তার সেখানে ট্রেন পরিবর্তন করে কুলাউড়াগামী অন্য একটি ট্রেনে ওঠার কথা। এটুকুই বলল আর কিছু বলল না। এরপর কয়েকবার সে ইতস্তত করে সে ঐ ট্রেনেই রয়ে গেল। ময়মনসিংহ ট্রেন যখন আবার চলতে শুরু করলো তখন টিকেট কালেকটার কম্পার্টমেন্টে উঠলো। লোকটি ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা পর্যন্ত একটি নতুন টিকেট কিনলো। লোকটি প্রথমে নিতে না চাইলেও আমি এ টিকিটের টাকা তাকে দিয়ে দিলাম। ঢাকা স্টেশনে ট্রেন থামার পর লোকটি আমাকে প্লাটফরমে নামিয়ে দিল। নিজে আর প্লাটফরমের বাইরে এল না, বলল যে সে উল্টো ট্রেনে কুলাউড়ার পথে চলে যাবে।

অল্পস্বল্প কথা, যেটা জেনেছিলাম সেটা হচ্ছে লোকটি যুদ্ধকালীন পাইওনীয়ার ফোর্সে একজন সাধারণ সৈনিক ছিল। পাইওনীয়ার ফোর্স সেনাবাহিনীর রসদ জোগাতো এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম করে দিত। এরা যথার্থ অর্থে পেশাগত সৈনিক ছিল না। কিন্তু কিছুটা সৈনিকের ট্রেনিং নিতে হত। এ লোকের সঙ্গে জীবনে আর আমার দেখা হয় নি। তবে লোকটির কথা আমি আজো ভুলি নি। কিভাবে একটি মানুষ অন্য একজন অপরিচিত মানুষকে মমতার আশ্বাস দিয়ে স্বস্তি দিতে পারে। আমার জীবনে এ লোকটি সে নিদর্শন রেখে গেছে। বাবাকে এ লোকটির কথা বলাতে বাবা বলেছিলেন, 'লোকটি তোমার জন্য এত করলো আর লোকটিকে তুমি বাসায়ও আনলে না। এটা তো ঠিক হয় নি। তুমি তো কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করতে পারলে না। লোকটির কাছ থেকে তুমি কিছু নিলে কিন্তু কিছু তো দিলে না।

বাবার কথায় আমি চমকে উঠলাম। সত্যিই তো আমি খুব স্বার্থপরের মতো কাজ করেছি। আমার শরীর সাহায্য চাইছিল এবং সে সাহায্য না নিয়ে আমার উপায় ছিল না। তার উপর আমার নিজের স্বার্থে তার যাত্রায় বিঘ্ন ঘটিয়ে তাকে ঢাকা পর্যন্ত টেনে এনেছিলাম। আমি জোর করে নিষেধ করলে সে হয়ত ময়মনসিংহ থেকে ঢাকায় আসতো না। কিন্তু আমি নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে এ কথাটা বলতে সাহস পাই নি। শুধু টিকিটের টাকা দিয়ে দায়িত্ব শেষ করলাম, ভেবেছিলাম। তৎকালীন ঢাকায় পাইওনীয়ার ফোর্সের কিছু অফিসার ছিল। তাদের কারো কারো কাছে এই লোকটির কথা বলেছি এবং অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। কিন্তু নাম না জানা থাকায় লোকটিকে আর খুঁজে পাই নি।

www.pathagar.com

এখনো পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে ঐ লোকটি খুব উজ্জ্বল হয়ে আমার চোখে ভেসে ওঠে। বাবাই বলেছিলেন, 'লোকটির জন্য যখন কিছুই করতে পারলে না তুমি তাহলে লোকটির কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সব সময় মনে রেখো। তাহলে কর্ম সম্পাদনায় শান্তি পাবে।' আজো লোকটির কথা আমার মনে সুস্পষ্ট রয়েছে।

গৌণভাবে হলেও এই লোকটি আমার বিশেষ উপকার করেছিল। এই লোকটির চিন্তা আমাকে নীলাদের প্রভাব থেকে চিরকালের জন্য দূরে সরিয়ে এনেছিল। প্রেম নয়, একটি বাসনার হুতাসনে আমি নিজেকে সমর্পণ করতে চাচ্ছিলাম। সেই সময় মমতার মাধুর্য নিয়ে এই অপরিচিত লোকটির আবির্ভাব। তখনই আমার মনে হল, জীবন মূলত মমতার স্বরলিপি। মমতা আছে বলেই জীবন আছে এবং আমরা সচল আছি। বিভিন্ন বন্ধনে আমরা নিজেদের আবদ্ধ করি, সে বন্ধনগুলো মমতারই বন্ধন। মমতা যেখানে থাকে না সেখানে হতাশ্বাস এসে জীবনকে বিক্ষুব্ধ করে। এই পৃথিবীতে বিনয়ের বড় অভাব, মমতার বড় অভাব, তাই যথার্থ আনন্দ সহজে নির্মিত হতে চায় না। একটি সাধারণ মানুষ যে কোথায় চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল, জানি না কিন্তু আমাকে একটি চৈতন্যের মধ্যে জাগরিত করে গেল।

॥৩৬॥

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম শেষ না হতেই আমি অল্প কিছুকাল চাকরিজীবনের অভিজ্ঞতা পেয়েছিলাম। বাবা স্কুলের পরিদর্শক ছিলেন–প্রধানত প্রাইমারী স্কুল এবং কখনো কখনো এম ই স্কুল। তাঁর শরীর ক্রমান্বয়ে অশক্ত হচ্ছিল। তাই তিনি ভাবছিলেন, পেনশন নেবেন এবং তাঁর জায়গায় আমি যেন বসতে পারি সেই চেষ্টা তিনি করবেন। তখনকার দিনে কোন কোন পদ পিতার অবর্তমানে পুত্র পেতে পারতো। অবশ্য পুত্রের উপযুক্ততা প্রয়োজন হত। আমি কিছুতেই বাবার এ ব্যবস্থায় রাজী হতে পারি নি। স্কুল পরিদর্শনে গ্রামে গ্রামে ঘুরবো এটা আমার চিন্তার বাইরে ছিল। আমার কল্পনায় অন্য স্বভাবের একটি জীবন নির্মাণ করেছিলাম। বাবার ইচ্ছায় তাই আমি সায় দিতে পারি নি। কিন্তু তখন আকস্মিকভাবে এমন একটি সুযোগ আমি পেলাম যাকে আমি অস্বীকার করতে পারলাম না। ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলা শিক্ষকের পদ খালি ছিল। কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন আবদুল হাকিম নামক একজন শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি আমাদের পরিবারের সকলকেই চিনতেন।

আমাকেও চিনতেন। সে সময় সরকারী কলেজের অধ্যক্ষদের ক্ষমতা অসীম ছিল। অস্থায়ী ভাবে ছ মাসের জন্য এডহক নিয়োগ কলেজের অধ্যক্ষই দিতে পারতেন। বর্তমানে এ ধরনের নিয়োগের অধিকার কলেজের অধ্যক্ষের তো নেইই ডিপিআই-এরও নেই। এখন নিয়োগ হয়ে থাকে মন্ত্রণালয় থেকে। যাই হোক, আমার অনার্সের পাঠক্রম শেষ হতেই আবদুল হাকিম সাহেব ঢাকা মাদ্রাসা এবং ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে আমাকে বাংলার শিক্ষক নিয়োগ করলেন। আমি একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ ২য় পর্বের পাঠক্রমে ভর্তি হলাম আবার অন্যদিকে মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতে লাগলাম। শিক্ষকতার এই অভিজ্ঞতা আমার পরবর্তী জীবনে কাজ দিয়েছে। প্রাথমিক এই

www.pathagar.com

অনুশীলনটি আমার জন্য প্রয়োজন ছিল। আমি কখনো অন্যের দেয়া বিশ্লেষণ অনুসরণ করে কাজ করি নি। আমি নিজের বিশ্লেষণ নিজেই নির্মাণ করে নিয়েছি। শিক্ষকতা কর্মের সূত্রপাতে একজন শিক্ষকের সাহস, মেধা এবং বিশ্বাসের প্রয়োজন। আমার নিজের উপর বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসের বলে নিজের মত করে বিশ্লেষণ করবার সুযোগ পেয়ে আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। কলেজের ছাত্রদের জন্য কিংবা স্কুলের ছাত্রদের জন্য স্বাধীন বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। যখনই ছাত্ররা শিক্ষকের কাছ থেকে কোন স্বাধীন বিশ্লেষণ পায় না তখনই তারা নোট বইয়ের অনুসন্ধানে ধাবিত হয়। তাছাড়া দোকানে যখন ছাত্ররা পাঠ্যবই কিনতে যায় তখন দোকানদার সঙ্গে সঙ্গে একটি নোট বইও গছিয়ে দেয়। আমার ছাত্রজীবনে আমি কখনো নোট বই স্পর্শ করি নি। সুতরাং নতুন শিক্ষকতা কর্মে নিযুক্ত হয়ে আমি সর্বপ্রকার নোট বই স্বীকার করে আপন বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা দিয়ে ছাত্রদের অন্তরঙ্গ হতে সক্ষম হয়েছিলাম। অল্প কিছুদিনের শিক্ষকতা কিন্তু তাহলেও আমার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সোপান হিসাবে তার একটি দৃঢ় ভিত্তি ছিল।

আবদুল হাকিম সাহেব কলেজকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছামতো পরিচালনা করতেন। মাঝে মাঝে কলেজে ছাত্রশিক্ষককে একত্র করে নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বিষয় তিনি টেনে আনতেন এবং বক্তৃতা শেষে একটি ব্যায়ামের অনুশীলন দেখিয়ে তিনি বক্তৃতা শেষ করতেন। ব্যায়ামের পূর্বে গায়ের জামাটি খুলে ফেলতেন, পায়ের জুতো খুলতেন, শুধু প্যান্ট পরা থাকতো। এ অবস্থায় দুদিকে হাত ছড়িয়ে লাফিয়ে পা উঁচু করে মাথার উপর দাঁড়িয়ে অদ্ভুত হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করতেন। আমরা কিন্তু ভদ্রলোকের এহেন উন্মত্ততায় বিরক্ত হতাম না বরঞ্চ একটু হাস্যরসের এবং কৌতুকের সমারোহ হত ভেবে আনন্দ পেতাম। হাকিম সাহেব তাঁর বক্তৃতায় সর্বদাই একটি কথা বলতেন যে মস্তিষ্ক এবং শরীর একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। মস্তিষ্কের চর্চা করতে হলে শরীরের চর্চা করা দরকার। উভয় চর্চা ঠিক মত হলে শরীরে শক্তি এবং সাহস আসবে, মন প্রফুল্ল হবে এবং মস্তিষ্কের গ্রহণ ক্ষমতা বাড়বে। কোন কোন দিন আবার তিনি সুর করে কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। উর্দুতে কবিতা লিখতেন এবং কবিতার বিষয় থাকতো মুসলমানদের গৌরবগাঁথা।

একটি কবিতার কথা আমার আজো মনে পড়ে। ফুলস্কেপ কাগজের অনেকগুলো কাগজে জমাট করে লেখা দীর্ঘ একটি কবিতা তিনি একদিন পড়েছিলেন। এক একটি অনুচ্ছেদের শেষে 'আউর হায়', বলে তিনি চিৎকার করে উঠছিলেন এবং তারপর আর একটি অনুচ্ছেদ আসছিল। তাঁর কবিতা পাঠের ভঙ্গি এবং সুরারোপ আমাদের হাস্যোদ্রেক করলেও আমরা হাসতে পারছিলাম না। সবাই তাঁকে পাগল বলতো। একমাত্র অধ্যাপক শরাফুদ্দিন সাহেব বিপরীত ধারণা পোষণ করতেন। তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন আবদুল হাকিম সাহেব আদর্শবান ন্যায়নিষ্ঠা পুরুষ। তিনি ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের কল্যাণ চান। পদ্ধতিগত দিক থেকে তাঁর বিশ্লেষণ এবং বিচার বিবেচনা আমাদের মনঃপূত না হতে পারে তাই বলে ভদ্রলোককে উড়িয়ে দেয়া ঠিক নয়। অল্প কিছুদিন পর আমার কলেজের কার্যকাল যখন শেষ হল তখন হাকিম সাহেব তাঁর বাসায় ডেকে নিয়ে আমাকে খুব আপ্যায়ন করেছিলেন। অবশ্য আপ্যায়নের শেষে তাঁর স্বকণ্ঠে একটি উর্দু কবিতাও

www.pathagar.com

শুনতে হয়েছিল। ঢাকা মাদ্রাসা এবং ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে আমি ছাত্র হিসাবে যাদের পেয়েছিলাম তাদের মধ্যে আবদুল বারী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। বর্তমানে সে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান। নিষ্ঠাবান, জ্ঞানী এবং বিশ্বাসী ব্যক্তি হিসাবে আবদুল বারী যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। স্কুল পর্বে পেয়েছিলাম মোহর আলীকে, ইতিহাসবেত্তা হিসাবে মোহর আলী একসময় সুনাম অর্জন করেছিল। বর্তমানে প্রবাস জীবনযাপন করছে। আমার দুঃখ লাগে যে এই কলেজটির পাঠ্যসূচী এবং পাঠক্রমের ব্যবস্থাপনা বর্তমানে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। ঢাকা মাদ্রাসা এবং ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এখন আর বিদ্যমান নেই। একসময় শামসুল উলামা আবু নছর ওহীদ নামক একজন প্রাজ্ঞ মনীষী আরবী ও ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক ইংরাজী শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে একটি নতুন স্কীম প্রবর্তন করেছিলেন। সেই নিউ স্কীমের আওতায় অনেকগুলো ইসলামিক কলেজ এবং মাদ্রাসা চালু হয়েছিল। শামসুল উলামা আবু নছর ওহীদ সাহেবকে আমি দেখেছি।

অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং সাহসী পুরুষ ছিলেন। মুসলমানদের জন্য একটি নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়াসে তিনি পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছেন। তার ইচ্ছা ছিল শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মীয় ভিত্তিটা মৌলিক ভিত্তি রেখে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করা উচিত। এ ব্যাপারে তিনি সফলকামও হয়েছিলেন। দেখা গিয়েছে যে ইতিহাসে বাংলা অথবা ইংরেজীতে এদেশে যারা একসময় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তারা অধিকাংশই নিউ স্কীম মাদ্রাসার ছাত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে পাকিস্তান আমলে নিউ স্কীম মাদ্রাসা ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং তার পরিবর্তে গতানুগতিক পুরাতনপন্থী মাদ্রাসা ব্যবস্থা চালু রাখা হয়। এখনো আমাদের দেশে ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। ভাষা শিক্ষাটি আমাদের জীবন থেকে পুরোপুরি অন্তর্ধান করেছে বললেই হয়। যার ফলে ভাষার স্ট্রাকচার বা গঠন আমরা মাতৃভাষাতেও দুর্বল হয়ে পড়েছি। বিভিন্ন ভাষা জানার প্রক্রিয়া সম্পর্কে ছাত্রদের যে ধারণা জন্মাতো তার ফলে মাতৃভাষার অনুশীলনে কোন অসুবিধা ঘটত না। বরঞ্চ মাতৃভাষাকে অধিকতর মনোনিবেশের সঙ্গে ছাত্ররা আয়ত্ত করতে সমর্থ হত।

নিউ স্কীম পাঠক্রমের মাধ্যমে অতীতে যারা শিক্ষা লাভ করেছিলেন তারা বাংলার পাশাপাশি আরবী এবং ইংরাজী শিখতে বাধ্য হতেন। তাতে তাদের ওপর কোন চাপ পড়ে নি। আমি নিজে নিউ স্কীমের ছাত্র ছিলাম না, কিন্তু পারিবারিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অতি শৈশব কাল থেকেই বাংলার সঙ্গে সঙ্গে আরবী, ফার্সী এবং উর্দু শিখেছিলাম। ভাষার এই জ্ঞানটি পরবর্তী জীবনে আমাকে সাহায্য করেছে। বর্তমানে আমরা ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ না করে বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞান এবং পরিবেশ পরিচিতি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত রয়েছি। নিচের ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা এভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানে পারঙ্গম কিন্তু হতে পারে না। তবে একটি কথা ঠিকই সবকিছুই ক্রমশ যেন সহজ হয়ে আসছে। একসময় আমাদের দেশে এন্ট্রান্স পরীক্ষা ছিল। সে সময় দশম শ্রেণীর ছাত্রকে পদার্থ বিজ্ঞান যেমন শিখতে হত তেমনি মূল শেক্সপীয়ারের নাটকও পড়তে হত। পরবর্তীতে এন্ট্রান্সটি লঘু হয়ে ম্যাট্রিকুলেশনে পরিণত হয়। বর্তমানে তা আরো লঘু হয়েছে। তদুপরি নকলের প্রবণতাও বেড়েছে। অর্থাৎ আমরা শিক্ষার মানকে ক্রমশ লঘু করে আনছি।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থাতেই একবার মনে মনে ইচ্ছা করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আমি আমার কর্মজীবন অতিবাহিত করব ; এটাকে এক প্রকার মোহগ্রস্ততা বলা যেতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কত খ্যাতনামা পণ্ডিত শান্তিনিকেতনে সময়ক্ষেপণ করেছেন এ সমস্ত সংবাদ প্রবাসীতে বের হত। সেগুলো জেনেই সম্ভবত শান্তিনিকেতনের প্রতি আমার আকর্ষণ হয়েছিল। আমি তাই শান্তিনিকেতনে একটি চিঠি লিখেছিলাম। কার নামে চিঠি লিখেছিলাম মনে নেই, সম্ভবত অধ্যক্ষের নামে। উত্তর এসেছিল সুধাকান্ত নামক কোন এক ব্যক্তির কাছ থেকে। তিনি বোধহয় শান্তিনিকেতনের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'শান্তিনিকেতনে এসে এখানে অবস্থান করবার আপনার আগ্রহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অনেকেরই হয়। এক সময় যখন গুরুদেব ছিলেন তখন আগ্রহের যৌক্তিকতা ছিল।

এখন তিনি নেই, শান্তিনিকেতনেরও অনেক পরিবর্তন হতে চলেছে। এ অবস্থায় এখানে এলে আপনার কোনো উপকার হবে কিনা বলতে পারছি না। হয়তো শেষ পর্যন্ত আশাভঙ্গ হবে, দুঃখ পাবেন। এমতাবস্থায় আপনি কি করবেন আপনিই চিন্তা করে দেখুন। তিনি আরো কিছু লিখেছিলেন। লিখেছিলেন যে সবকিছু জেনেশুনে আমি যদি ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকি তাহলে আবার যেন চিঠি লিখি। আমি আর চিঠি লিখিনি। গ্রীষ্মের ছুটিতে কুষ্টিয়ায় আমার ভগ্নির বাড়িতে অবস্থানকালে এই চিঠি আমি লিখেছিলাম। তাৎক্ষণিক একটি কারণ ছিল। কুষ্টিয়ায় সরোজরঞ্জন চৌধুরী বলে অশেষ রবীন্দ্রভক্ত একজন কবির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। ভদ্রলোক যুবক, মাথায় বাবরী চুল, ধুতি-চাদরে সমাবৃত একজন বিগলিত কবি ছিলেন। বিগলিত বললাম এ কারণে যে ভদ্রলোক কথা বলতেন খুব আস্তে আস্তে, বিনয় প্রকাশ করতেন প্রতি পদক্ষেপে এবং গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকতেন।

এ ভদ্রলোক শান্তিনিকেতনের গল্প আমার কাছে করতেন। তিনি মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন এবং সেখানকার স্বপ্নময় পরিমণ্ডল তাকে অভিভূত করেছে, এ সমস্ত কথা তার মুখে শুনেছি। ভদ্রলোক সোজাসুজি কোনো কথা বলতেন না, একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতেন। যেমন 'জ্বর হয়েছে' এ কথা না বলে বলতেন, 'শরীরে তাপ অনুভব করছেন'। অথবা 'পথ চলতে ধুলো উড়ছে' একথা না বলে বলতেন, 'পদস্পর্শে উৎক্ষিপ্ত ধুলোয় ধূসরিত হলুম।' কুষ্টিয়ায় তার বাসগৃহেও আমি গিয়েছি। তার পিতা ছেলের কথাবার্তার ধরন পছন্দ করতেন না। তিনি আমাকে বলতেন, 'বলবেন না মশাই, কবিতা লিখতে লিখতে এ ছেলেটির মাথাই বোধহয় খারাপ হয়ে গিয়েছে। সবকিছু সে কাব্যি করে বলবে। পরিষ্কার বললেই তো পারিস জ্বর হয়েছে, তা না বলে বলবি শরীরে তাপ অনুভব করছি। একবার ভেবে দেখুনতো ব্যাপারটা?' সরোজরঞ্জনকে কিন্তু আমার ভালোই লাগত। যে কদিন কুষ্টিয়ার জানিপুর গ্রামে ছিলাম সে কদিন বিকেলবেলা ওকে নিয়ে নদীর ঘাটে বেড়াতে গিয়েছি এবং শান্তিনিকেতনের গল্প শুনেছি।

আমি এ সময় করটিয়ার সাদাত কলেজেও চাকরির চেষ্টা করেছিলাম। সাদাত কলেজের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল ইব্রাহীম খাঁর জন্য। তিনি তখন মুসলমান সমাজে শিক্ষাবিদ হিসাবে অত্যন্ত খ্যাতনামা পুরুষ এবং আদর্শবান ও ন্যায়নিষ্ঠ হিসাবেও পরিচিত।

www.pathagar.com

তাছাড়া তাঁর লেখা কিছু কিছু বই আমি তখন পড়েছি। তার বড় ছেলে আমার সহপাঠী ছিল। তার ডাকনাম ছিল তুলা। তুলার কাছে তাঁর পিতার অনেক কাহিনী শুনতাম। এসব কারণেই করটিয়া কলেজের প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মে। আমি ইব্রাহীম খাঁ সাহেবের কাছে চাকরির ইচ্ছা জানিয়ে একটি চিঠি দিয়েছিলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিয়েছিলেন। সুধাকান্তের মতো তিনিও আমাকে বারণ করেছিলেন করটিয়ায় যেতে। তিনি লিখেছিলেন, 'করটিয়ায় এলে আপনার ক্ষতি হবে। আপনার একটি ভবিষ্যৎ আছে এবং আমি বিশ্বাস করি আপনি একদিন খ্যাতিমান হবেন। করটিয়া আপনার খ্যাতির পথে প্রতিবন্ধক হবে। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবেন এটাই আমি কামনা করি। কিন্তু করটিয়ায় প্রবেশ করলে আপনি আপনার কাম্য অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারবেন কিনা সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।'

আমি জানি না কুষ্টিয়ায় ছুটির দিনে বসে এ সমস্ত চিঠি কেন আমি লিখেছিলাম। আমার মনে হয় আমি তখন আমার যথাযথ কর্মক্ষেত্র অনুসন্ধান করছিলাম। একটি অনুসন্ধানের বিভিন্ন পর্যায় থাকে। শান্তিনিকেতনে অথবা করটিয়ায় চাকরির চেষ্টা তারই একটি পর্যায়মাত্র। ইব্রাহীম খাঁর সঙ্গে আমার যে খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তা নয় তবে তিনি আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর ছেলের সুবাদে আমাকে কিছুটা স্নেহের চোখে দেখতেন। ইব্রাহীম খাঁর একটি বিশেষ গুণ ছিল যে তিনি বয়সের তারতম্য না মেনে ছোটবড় সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারতেন এবং ছোটদের সঙ্গেও সম্মানসূচক 'আপনি' সম্বোধন করতেন। পরবর্তীতে আমার জীবনের বিভিন্ন অবস্থানে ইব্রাহীম খাঁর সঙ্গে অনেকবার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁর সঙ্গে অনেক বিষয়ে আমার মতপার্থক্য ঘটেছে। তাঁর রাজনীতির প্রতিও আমার শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু চিরকাল তাঁর প্রতি আমার একটি কৃতজ্ঞতা ছিল। তিনি করটিয়ায় আমায় গ্রহণ না করে আমাকে যে উৎসাহব্যঞ্জক চিঠি লিখেছিলেন সে চিঠির কথা আমি কখনও ভুলি নি।

মা তার জমিদারীর অধিকার থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন অনেকদিন আগে। বাবাও অবসর নিতে যাচ্ছেন। এ অবস্থায় আমার অবিলম্বে কিছু করা দরকার। এটা সম্ভবত আমি তখন ভেবেছি। আমার এখনও মনে আছে, ঢাকা মাদ্রাসায় চাকরি করার সময় প্রথম মাসের বেতনের পুরো টাকাটা যখন মার হাতে দিয়েছিলাম তখন মা খুব খুশী হয়েছিলেন। আমার বেতনের টাকা থেকে কয়েকটি টাকা নিয়ে মা মিষ্টি আনতে দিয়েছিলেন এবং বাবার হাত দিয়ে সেই মিষ্টি বাড়ির সকলের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। উচ্ছ্বাস নয়, কোনোরকম কোলাহল নয় একপ্রকার শান্ত বিনয়ের মধ্যে আমরা আমার চাকরি জীবনের প্রথম আনন্দকে উপভোগ করেছিলাম। বাবা বলেছিলেন, 'যে মানুষ অবিনীত, যে মানুষ অনভিজ্ঞ সে মানুষ যথাবিহিতকে জানে না। মানুষকে ধর্মে সুদক্ষ হতে হবে, সত্যকে গ্রহণ করার জন্য চিত্তকে প্রস্তুত করতে হবে এবং অহমিকা ত্যাগ করে সকলকে সমানভাবে গ্রহণ করে জীবন যাপন করতে হবে। বাবা ঠিক এভাবেই কথাগুলো বলেন নি কিন্তু তাঁর বক্তব্যকে এতদিন পর এভাবেই নির্মাণ করতে আমার ভালো লাগছে। তাঁর কথা কখনো উপদেশের মত মনে হত না। তিনি আস্তে আস্তে বলতেন এবং কিছু উদাহরণ দিয়ে কথা বলতেন। তার ফলে মনে হত একটি গৃহীত স্বাভাবিক সত্যকে তিনি প্রকাশ করছেনমাত্র।

www.pathagar.com

কর্মজীবন শুরু করার আগে আমি কিছুকাল কলকাতায় গৃহশিক্ষকের কাজ করেছিলাম। এটা একটু পরের ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে কলকাতায় অবস্থানকালে কর্মজীবন শুরু করার পূর্বে আমি কয়েক মাস প্রাইভেট ট্যুশনি বা গৃহশিক্ষকতা করেছিলাম। কলকাতা হাইকোর্টে আমার ভগ্নিপতির এক বন্ধু ছিলেন ব্রহ্মণাভূষণ ব্যানার্জী নামে। এই ভদ্রলোকের জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্ত্রীর ভগ্নি ইংরেজীতে এম এ পড়ছিল। মেয়েটির নাম রমা ব্যানার্জী। মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। তার শরীর ছিল একেবারে হালকা, ইরেজীতে ফ্রেইল যাকে বলে, তাই। মেয়েটি থাকত হ্যারিসন রোডে। পোস্ট গ্রাজুয়েট হোস্টেলে। আমি সপ্তাহে দুদিন তাকে পড়াতাম। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস, চসার, রোমান্টিক কবিকুল এবং এডমন্ড বার্কের প্রবন্ধ। এগুলিই আমি তাকে পড়াতাম। মাঝে মাঝে প্রশ্নের উত্তরও লিখে দিতে হত। নিচের তলায় ভিজিটার্স রুমের একপ্রান্তে বসে পড়াতে হত। সেখানে আমার মত আরও দু'একজন শিক্ষক আসতেন, অন্য মেয়েদের জন্য। একদিন হোস্টেলে পৌঁছতেই প্রচণ্ড বৃষ্টি আরম্ভ হল। ঘণ্টাখানেক পড়ানোর পর আমার চলে যাবার সময় যখন এল তখনও মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে।

আমি বিব্রত বোধ করছিলাম, বারবার দরোজার কাছে এসে বৃষ্টি ধরল কিনা দেখছিলাম। কিন্তু বৃষ্টি থামছিল না। তখন বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। সেদিনই প্রথম রমার সঙ্গে লেখাপড়ার বাইরে সাধারণ কিছু কথাবার্তা হল। সম্ভবত পাঠ্যবইয়ের বাইরে সে কোন কোন বই পড়ে তা আমি জানতে চেয়েছিলাম। যদ্দুর মনে পড়ে সে ডিকেন্স-এর কথা বলেছিল। তখন আমরা ডিকেন্স-এর বিভিন্ন উপন্যাস নিয়ে কথা বলা শুরু করেছিলাম। রমা 'ব্লিক হাউস' উপন্যাসটির কথাই বলছিল। এভাবে বাইরে যখন বৃষ্টি পড়ছে খুব এবং ভেতরে আমরা দু'জন একাকী উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করছি, তখন দু'একবার রমার চোখে আমার চোখ পড়েছিল। সে মুহূর্তে তার স্নিগ্ধ শান্ত চোখ দুটি আমার ভালো লেগেছিল

বৃষ্টি কিছুটা কমলে আমি চলে এসেছিলাম। পথে পানি জমে গিয়েছিল, সেই পানির মধ্য দিয়ে হেঁটে ট্রামে উঠেছিলাম। রমাকে বেশিদিন আমি পড়াতে পারি নি। সে পরীক্ষার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছিল সে সময় অকস্মাৎ টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে সে মারা যায়। হ্যারিসন রোড থেকে সে অসুস্থ হয়ে ভগ্নির বাড়িতে যেদিন যায় সেদিনও আমি পড়াতে গিয়েছিলাম। সে আমাকে দু' সপ্তাহ পর হোস্টেলে আসতে বলেছিল। ইতোমধ্যে আমি কোনো খবরই জানি না। দু' সপ্তাহ পর একদিন বিকেলবেলা হ্যারিসন রোডের হোস্টেলের কাছে যখন গিয়েছি তখন উড়ে দারোয়ানের সঙ্গে দেখা হল। সে-ই আমাকে রমার মৃত্যু সংবাদ দিল। আমি সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছি, দারোয়ানটি আমার পাশে। ইতোমধ্যে উপরতলা থেকে দশ-বারোটি মেয়ে দরোজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সবকটি মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি কিছুক্ষণ ঐরকম অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্ত পদবিক্ষেপে ফিরে চললাম। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে শেষবারের মতো হোস্টেলটির দিকে তাকাতে ইচ্ছে হল। তখনও দেখি, মেয়েগুলো আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে আগ্রহ যেমন জাগে তেমনি শংকাও জাগে। সকল দায়দায়িত্বমুক্ত নিশ্চিন্ত উন্মুক্ততার পর একটি বন্ধনদশার নিপীড়ন আছে তেমনি আবার নিজস্ব অঞ্চল নির্মাণের আনন্দও আছে। বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে কর্মজীবনে প্রবেশের মুখে আমার মনে নানা প্রকার ভাবের উদয় হয়েছিল। প্রতিদিন অজস্র শব্দের ঝংকার, নতুন নতুন ইচ্ছার আনন্দ, বান্ধবীদের নতুন নতুন তাৎপর্যময় দৃষ্টি এবং আমার চিত্তে অবিরত নানাবিধ আকাঙ্ক্ষার অভ্যুদয় এই তো ছিল আমার এতদিনকার জীবন। কিন্তু তবু এই জীবনের মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্বের অভিজ্ঞতা আমার অল্প-বিস্তর ঘটেছিল। কিছুদিন কলেজে শিক্ষকতাও করলাম এবং সে সময় পিতামাতার সংসারের প্রতি কর্তব্যবোধের কথাও ভেবেছিলাম। বলা যেতে পারে যে কর্মজীবনের একটি অভিজ্ঞতাকে আমি পূর্বাহ্নেই লালন করেছিলাম।

যুদ্ধের সময় সারা দেশে রেশনিং প্রথা প্রবর্তিত হয় এবং খাদ্যসংস্থান এবং খাদ্য সরবরাহের জন্য সিভিল সাপ্লাইজ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিভাগে বহু নতুন পদ সৃষ্টি হয়। আমার সহপাঠী একজন পরীক্ষা পাসের পর পরই সিভিল সাপ্লাইজে চাকরি পান। তাদের মধ্যে একজন কবীর চৌধুরী আর একজন আজিজুল হক। এরা ডিভিশনাল কন্ট্রোলার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন সরাসরি। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের বেতন আরম্ভ হত ১২৫ টাকা থেকে এবং সরকারী কলেজের অধ্যাপকের বেতন তখন সবেমাত্র ৭৫ টাকা থেকে ১২৫ টাকায় উন্নীত হয়েছে। সিভিল সাপ্লাইয়ের ডিভিশনাল কন্ট্রোলারের বেতন তখন নির্ধারিত হয়েছিল ৫০০ টাকা। আমিও ভাবলাম আমারও এ চাকরিটা পাওয়া উচিত। সে সময় কলকাতায় সিভিল সাপ্লাইজের বড় কর্মকর্তা ছিলেন মেরাজউদ্দিন আহমেদ। তিনি আমার মা-র কি রকম যেন আত্মীয় হতেন।

আমি মেরাজউদ্দিন সাহেবের স্ত্রীর চিঠি নিয়ে কলকাতায় গেলাম। কলকাতায় উঠলাম তালতলায় আমার ভগ্নিপতির একটি মেসে। যেদিন মেরাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাব, সেদিন স্যুট পড়ে গিয়েছিলাম। সেই জীবনের আমার প্রথম স্যুট পরা। আমার ভগ্নিপতির এক ভ্রাতা এক ইংরেজ কোম্পানীতে চাকরি করতেন। তার স্যুট ছিল। ভদ্রলোক আমার চেয়ে লম্বা ছিলেন, পরিপুষ্টও ছিলেন অনেক বেশি। সুতরাং তার স্যুট আমার লাগার কথা নয়। ঢিলেঢালা হলেও এক কথা ছিল কিন্তু লম্বা হয়েছিল বেশি। কোনোরকমে খুব উপরের দিকে টেনে টাইট করে বেল্ট বেঁধে প্যান্টকে সিজিল করা গিয়েছিল। কিন্তু কোটটাকে কোনোক্রমেই শাসন করা যাচ্ছিল না।

কোটটা ঝুলে পড়েছিল হাঁটু পর্যন্ত। তবু এই কোটই পরতে হল। দেখা গেল যে কোটের বোতাম খোলা রেখে দু'হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলে সামনের দিক থেকে কোটটাকে আর লম্বা মনে হয় না। এই অপূর্ব বেশে কলকাতা কাউন্ট হলে মেরাজউদ্দিন সাহেবের অফিসে এসে হাজির হলাম। আমি সরাসরি তার ঘরে ঢুকবার অনুমতি পেলাম না। তাঁর কক্ষের বাইরে কাঠের বেঞ্চিতে অন্য অনেক মানুষের পাশে বসে থাকতে হল। বসে থাকা লোকগুলোর মধ্যে নানা ধরনের লোক ছিল। এদের সঙ্গে

www.pathagar.com

প্রার্থী হিসাবে একই বেঞ্চে বসে থাকা আমার ভালো লাগছিল না। একজন লোক পিয়নকে ঘুষ দিয়ে ভেতরে ঢুকল দেখলাম। করিডোরে যেসব লোক যাতায়াত করছিল তাদের আলোচনার দু'একটি শব্দ কানে এসে লাগছিল। এসব কথার কোনোটাই সম্ভ্রান্ত মনে হচ্ছিল না। অনেকক্ষণ পর আমার যখন ভেতরে ডাক পড়ল তখনই আমি এখানে চাকরি করব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আমাকে দেখে মেরাজউদ্দিন সাহেব যা বললেন, তাতে আমার সিদ্ধান্ত আরও সুদৃঢ় হল। তিনি আমাকে বললেন যে, আপাতত তার হাতে বড় কোনো চাকরি নেই, এখন তিনি আমাকে সাবডিভিশনাল কন্ট্রোলার পদে নিযুক্ত করতে পারেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। তিনি বললেন, আমি যে চাকরি নিলাম না, সেকথা যেন ঢাকায় জানিয়ে দেই। অর্থাৎ আমার চাকরি না পাওয়াতে আমার আত্মীয়স্বজন মেরাজউদ্দিন সাহেবের কোনো দোষ যেন না ধরেন, এই ব্যবস্থাটা তিনি করতে চাইছিলেন। আমি বললাম, 'আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি সিভিল সাপ্লাইজে কোনোদিন চাকরি করব না এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি এই মর্মে ঢাকায় চিঠি লিখে দিচ্ছি।' শিক্ষা প্রসঙ্গের বাইরে আমি একবারইমাত্র চাকরির চেষ্টা করেছিলাম এবং ক্ষেত্রচ্যুত হওয়ার কোনো সুযোগ আমি আর পাই নি।

যখন চাকরি করছি না সে সময় কয়েক মাস রমা নামক একটি মেয়েকে আমি কিছুদিন পড়িয়েছি, সেকথা আগেই বলেছি। মেয়েটির আকস্মিক মৃত্যু আমাকে দুঃখিত করেছে। শওকত ওসমান তখন কলকাতা কমার্স কলেজে বাংলার অস্থায়ী অধ্যাপক। তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি একদিন সেক্রেটারিয়েটে ডিপিআই অফিসে গেলাম। একজন ইংরেজ, 'স্টেপলটন' নাম বোধহয়, তিনি ডিপিআই ছিলেন। খান বাহাদুর আবদুর রহমান সাহেব ছিলেন এডিপিআই। তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই তিনি আমাকে হুগলী ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ইংরেজীর লেকচারার পদে সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগপত্র দিলেন। ঘটনাটি এত দ্রুত এবং আকস্মিক যে আমি চমকে উঠেছিলাম। আবদুর রহমান সাহেব বললেন, কলেজের প্রিন্সিপাল খান বাহাদুর আসাদ হুগলী মাদ্রাসার একজন শিক্ষককে এই পদে নিযুক্তির জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে। সেটা বাতিল করে তোমাকে নিয়োগপত্র দেয়া হল। সুতরাং কাজে যোগ দিয়ে আসাদ সাহেবের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখবার চেষ্টা কর।'

হুগলীর অভিজ্ঞতা আমার খুব গভীর নয়। বেশি দিন এখানে আমি চাকরি করি নি। হুগলীর কথা যতটুকু মনে আছে, সেটি একটি পরিচ্ছন্ন শান্ত জীবনধারার। তখন হুগলী ছিল কলেজের শহর। ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ছিল এবং হুগলী কলেজ ছিল। হুগলীতে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল বলে আমার মনে পড়ে না। সকাল বিকাল গঙ্গার তীরে যারা হাঁটতে বেরুতেন তারা ছিলেন কলেজ অথবা স্কুলের শিক্ষক। এদেরই প্রতাপ ছিল হুগলীতে বেশি। ছাত্ররাও গঙ্গার তীরে বেড়াতে আসত। তাদের লক্ষ্য ছিল বায়ু সেবন করা নয় স্নানরতা রমণীকুলকে দর্শন করা। কিছু কিছু যুবক অধ্যাপকও যে এদিকে নজর দিতেন না তা নয়। বিশেষ করে মেয়েরা যখন গলা পানিতে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ শাড়ি খুলে শাড়িটি ধুয়ে আবার পরত, তখন সে দৃশ্য দেখবার জন্য ঘাটে ছাত্রদের ভিড় জমত। কিছু কিছু লোক দেখতাম গঙ্গা মৃত্তিকায় সমস্ত দেহ লেপন করে নদীর তীরে রোদে শুয়ে থাকত। অনেক মেয়ে গঙ্গা তীরে পানি ভরতে আসত। হঠাৎ এক সময় অনেকগুলো

www.pathagar.com

মোষ নিয়ে দু'একটি লোক নদীতে নামত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গঙ্গা তীরের এ কলগুঞ্জন থাকত। পানির নিজস্ব একটি আদিমতা আছে। সে তার আদিম নিশ্চিন্ততায় মানুষকে উন্মত্ত করতে চায়। তাই বোধ হয় মানুষ পানির কাছে নির্লজ্জ হয়। সে সম্পূর্ণ শরীর উন্মুক্ত করে পানির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পানির এই আদিম বন্যতা উচ্ছ্বাস এবং কলগুঞ্জন আমি পৃথিবীর সর্বত্র দেখেছি। ব্রাজিলের আটলান্টিক সমুদ্র উপকূলে রৌদ্রস্নানের উদ্দেশে কত যে অনাবৃত শরীর বালুকাবেলায় শুয়ে থাকত তা গুণে শেষ করা যায় না। মানব জীবনের তাৎপর্য অনুভব করা বড় কঠিন। মানুষ বনাঞ্চলে ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষরাজির মধ্যে নিজেকে যেমন একাকার করতে চায় তেমনি আবার বিপুল বারিধির মধ্যেও মিলিত হতে চায়। তাই বোধহয় নদীতীরে অথবা সমুদ্রতীরে একটি দেশের মানবগোষ্ঠীর স্বভাব এবং চরিত্র অনুধাবন করা সম্ভবপর। হুগলীতে থাকতে প্রায়ই আমি সন্ধ্যার পর গঙ্গাতীরে আসতাম। অন্ধকার যখন নেমে আসত, পানির শব্দ তখন অন্ধকারের মধ্যে কী যেন অনুসন্ধান করত। এ সময়টি আমার খুব ভালো লাগতো।

হুগলীতে আমি ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলাম কিন্তু কলেজে এবং মাদ্রাসায় বাংলা পড়াতাম। কলেজের বাইরে একজন হিন্দু ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিচয় ঘটল। তিনি হুগলী শহরের একটি ক্লাবে আসতেন, সেই ক্লাবে কলেজের শিক্ষকরা এবং সরকারী কর্মচারীরাও আসতেন। একদিন সে ভদ্রলোকের আমন্ত্রণে তার বাসগৃহে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে তিনি আমাদের বাড়িতে তৈরি আইসক্রীম খাইয়েছিলেন। লক্ষ্মী নামক ভদ্রলোকের অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী কন্যা আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ছিল। মেয়েটি খুবই সপ্রতিভ, সদা হাস্যোজ্জ্বল এবং সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে অনুরাগিনী ছিল। হুগলীতে থাকতে এ মেয়েটির সঙ্গে গঙ্গাতীরে কোনো কোনো দিন আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। একদিনও আমরা কিন্তু নিজেদের কথা বলি নি। কবিতা ও গানের কথা বলেছি, ছবির কথা বলেছি, গঙ্গার কলগুঞ্জনের কথা বলেছি, কিন্তু কোনোদিন বলি নি, আমি কি চাই অথবা তার কাছে আমার কি প্রত্যাশা। একটি অদ্ভুত আনুকূল্য এবং সৌজন্য আমরা নির্মাণ করেছিলাম কিন্তু কেমন যেন একটা ব্যবধানও রক্ষা করেছিলাম। হুগলী থেকে চলে আসার পর মেয়েটির সঙ্গে আর কখনও যোগাযোগ হয় নি। আমরা এভাবেই অনেক কিছুকে স্পর্শ করে এগিয়ে চলি এবং করাঙ্গুলিতে পুরনো স্পর্শের শিহরণটুকু বিদ্যমান থাকে শুধু। এটাই জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য।

॥৩৯॥

এসপ্লানেড হয়ে ডালহৌসী পেরিয়ে একটি ছোট রাস্তা গারস্টিন প্লেস। এখানে অল ইন্ডিয়া রেডিওর অফিস ছিল। কলকাতা থাকাকালীন কয়েকবার এখানে কথিকা পাঠ করতে এসেছি। তখনই সেখানে পুরুষ এবং মেয়েদের বিশেষ ভঙ্গিতে আগমন ও চলাফেরা আমাকে আকর্ষণ করেছিল। আমি ভেবেছিলাম রেডিওতে চাকরি পেলে আধুনিক সংস্কৃতির একটি উচ্ছল জীবনকে আমি পাবো। শেষ পর্যন্ত রেডিওর চাকরি হল। যেদিন প্রথম কাজে যোগ দেই, সেদিনকার কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে। আমি যেদিন নিয়োগপত্র পেয়ে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে যোগ দিতে যাবো সেদিন আমার শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়রা আমাকে

www.pathagar.com

সাহেবী পোশাক পরিয়ে কর্মস্থলে পাঠাবার মনস্থ করলেন। আমি স্যুট কখনও পারি নি। আমার ভগ্নিপতির ভাইয়ে সেই হাঁটু অবদি কোট পরে কোনো রকমে বোতাম খোলা রেখে দুহাত দিয়ে কোটের দু পাস পেছনে ঠেলে কিছুটা গ্রহণযোগ্য রূপে গারস্টিল প্লেসে বেতার ভবনে উপস্থিত হলাম। বেতার ভবনের দরোজায় গোলগাল মুখ একজন ফর্সা ভদ্রলোক আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, 'দাদা বুঝি নতুন কলকাতায়?' আমি আমার নিয়োগপত্রটি তাকে দেখালাম। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে দু হাত জড়ো করে নমস্কার করে বললেন, 'আমি মুখার্জী, অপরাধ নেবেন না।' কর্মে যোগ দিয়ে জয়নুল আবেদীনের ঘরে বসে আছি। সেখানে তখন এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। ভদ্রলোকের শ্যামলা রং। স্বাস্থ্যবান কিন্তু ঢলঢলে চেহারা, ধুতির কোচা মাটিতে লুটাচ্ছে। গায়ে পাঞ্জাবী ও চাদর। মাথায় বাবড়ী চুল। কেমন যেন উদাসীন মনে হল। ভদ্রলোক আমাকে দেখেই আবেদীনকে জিজ্ঞেস করলেন, আবেদীন, এ ছেলেটি কে? আবেদীন বললেন, 'ইনি নতুন প্রোগ্রাম এসিস্ট্যান্টে যোগ দিয়েছেন, এমএ পাস, কলেজে চাকরি করতেন। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, আমাকে সবাই নৃপেনদা বলে, তুমিই তাই বলবে। তোমাকে আমি আলী বলবো।' নৃপেনদার সঙ্গে সেই যে ঘনিষ্ঠতা ঘটলো কলকাতায় যতদিন ছিলাম ততদিন ঘনিষ্ঠতা বজায় ছিল।

রেডিওতে চাকরি যখন নিলাম, তখন তালতলার গার্ডনার লেনে একটি মেসে আমি থাকতাম। মেসটা ছিল আমার ভগ্নিপতির এবং তার ভাইদের। তার মধ্যে আমিও অংশীদার হলাম।

এখান থেকে অফিসে যেতাম ট্রামে করে। কিন্তু ফিরতাম প্রায়ই হেঁটে-করপোরেশন স্ট্রীট হয়ে ওয়েলেসলী রোডে পড়তাম, সেখান থেকে তালতলা। হাঁটতে ভালো লাগতো। মানুষ-প্রাণী-যানবাহনের কল্লোলের মধ্যে একটি চিন্তার নির্জনতায় নিজেকে পেতে ইচ্ছা করতো। সঙ্গী থাকলে চিন্তাকে সংলাপে সচল করতাম, তর্ক করতাম কোনো যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। ফররুখ যখন থাকতো তখন তর্কও সম্ভব হত না। সে তার উচ্চকণ্ঠ এবং হাসিতে সবকিছু উড়িয়ে দিত। আমাদের পথচলায় কোনো লৌকিকতা ছিল না। প্রতিদিনই কোনো না কোনো চিন্তা বিশ্বাস বা আনন্দের ভেতর আমাদের যাত্রা ছিল। বিকেল বেলায় বাসায় ফিরতাম।

রাস্তায় ট্রাম, রিকশা ও গাড়ী থাকতো। মাথার উপর টানা বিজলী বাতির তার। কোনো কোনো দোকানের পাশে অযত্ন লালিত কয়েকটি গাছ প্রায়ই মাথার উপর দিয়ে কাক উড়ে যেত। রাস্তা পার হয়ে তালতলার ভেতরে এসে পড়তাম। অনেকগুলো সরু সরু রাস্তা গাছের শাখার মতো মাটিতে ছড়ানো ছিল। এগুলোকে রুদ্ধশ্বাস অবগুণ্ঠনের মতো মনে হত। যে মেসে থাকতাম সেটা ছিল শ্বাসরুদ্ধকর একটি বাড়ী। সামনের দরোজা খুললে অন্য বাড়ী। আকাশ দেখা যেত না, রাতের চাঁদ তো কোনোদিনই দেখা যেত না। সম্ভবত এ কারণেই আমি খুব হাঁটতাম। হাঁটলে বাতাসের নিঃশ্বাস গায়ে লাগতো। এদিক ওদিক দু' একটি গাছের সবুজ পাতা চোখে পড়তো, খণ্ডাংশ হলেও আকাশও চোখে পড়তো। আমার জীবনে বিশ্বাসের কোনো শিথিলতা কখনও আসে নি।

www.pathagar.com

বিধাতার অস্তিত্বে কখনও সংশয় জাগে নি। প্রকৃতির মধ্যে আমি বিশ্বাসকে খুঁজে পেয়েছিলাম। দৃষ্টির আনন্দের মধ্যে যেমন বিস্ময়ের উন্মোচন ঘটে, তেমনি বিশ্বাসের। সেজন্যই ইয়েটস লিখেছিলেন, 'বুদ্ধি ও যুক্তিবাদীরা কোন কিছুই জানে না–জানে না যা আছে তাকে অথবা যা ঘটতে যাচ্ছে এবং যে জানে তাকেও তারা জানে না এবং জানে না জানবার সামগ্রিকে সুতরাং ইয়েটস বিশ্বাসকে অবলম্বন করেছিলেন–

'আমার তৃপ্তি উৎসকে অনুসরণ করার মধ্যে/সকল ঘটনার উৎস তা সে কর্মের হোক/অথবা বুদ্ধির/ভাগ্যকে মেনে নেই, আপন ভাগ্যকে ক্ষমা করি।/এবং যখন দুঃখকে উড়িয়ে দেই/আমার চিত্তে বিশ্বস্ত প্রশান্তি বয়ে যায়-/আমাদের উচিত হেসে ওঠা এবং গান গেয়ে ওঠা।/সমস্ত কিছুই আমাদের জন্য আশীর্বচনের মতো/সমস্ত কিছুই আমাদের দৃষ্টিতে পবিত্র শুদ্ধ।'

মানুষের আনন্দ বোধ হয় তখনই যখন সে রাত্রিতে একাকী তার বিশ্বাস নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে এবং বিনম্র শিথিলতায় জেগে ওঠে ঊষালগ্নের সূর্যোদয়কে দেখে। ক্রমান্বয়ে আলো ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে এবং সকল অপ্রকাশ বিশ্বাসের মাধুর্যে স্বপ্রকাশ হয়।

অল ইন্ডিয়া রেডিওতে যোগ দেওয়ার পর ক্রমান্বয়ে অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ই প্রধান পুরুষ। তিনি ছিলেন উদারচেতা লোক হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের অত্যন্ত প্রিয়। জীবনকে অত্যন্ত সহজে গ্রহণ করেছিলেন এবং কারও প্রতি কখনও ক্রুদ্ধ হতে দেখি নি। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান, যেমন এস ওয়াজেদ আলী, শাহাদাৎ হোসেন, মোহাম্মদ সুলতান। আমি চাকরিতে যোগ দেবার পর নৃপেনদাই আমাকে বললেন, 'উপযুক্ত মুসলমান ডেকে এনে বেতারের অনুষ্ঠানের অংশভাগী করো।' তিনি বললেন, এখানে যারা আছে তারা মুসলমানকে কখনও ডাকে না। তুমি এসেছো তুমি একে একে উপযুক্ত দেখে মুসলমান সাহিত্যিকদের ডেকে আনো।' এভাবে আমি নৃপেনদার পরামর্শে ধীরে ধীরে শাহাদাৎ হোসেন এস ওয়াজেদ আলী, মীর জাহান, খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ, আবদুল কাদির, ফররুখ আহমদ এবং আরও অনেককে রেডিও অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করি। প্রথম প্রথম কিছুটা অসুবিধা হয়েছিল, পরে ক্রমান্বয়ে কৌশলে এ অসুবিধাগুলো দূর করা সম্ভবপর হয়।

চাকরিতে যোগ দিয়ে দেখি কেউ কেউ কন্ট্রাক্ট ফেরত দেন না, লেখাও সময় মতো পাঠান না, অনুষ্ঠানের দিন কন্ট্রাক্ট এবং লেখা এক সঙ্গে নিয়ে আসেন। নৃপেনদা পরামর্শ দিলেন, 'তুমি আইন অনুসারে চলো। কন্ট্রাক্ট পাঠানোর এক সপ্তাহ পর রিমাইন্ডার দেবে, তার পরও যদি উত্তর না আসে তাহলে কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল করে সেখানে নতুন লোক নেবে। খাতাপত্র ঠিকঠাক রেখে এভাবে যদি অগ্রসর হও, তাহলে তোমাকে কেউ অসুবিধায় ফেলতে পারবে না।' এ বুদ্ধিতে অগ্রসর হয়ে প্রথম যে ব্যক্তির সঙ্গে আমার প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো তিনি হচ্ছেন প্রবোধকুমার সান্যাল। ভদ্রলোক কখনও কন্ট্রাক্ট সই করে আগে পাঠাতেন না। লেখাও অনুষ্ঠানের দিন ছাড়া আগে কখনো পাঠাতেন না। তাছাড়া এমন ভাব দেখাতেন যে তিনি যেন রেডিওকে কৃতার্থ করছেন। বিদ্যার্থীমণ্ডলে দিল্লী ভ্রমণের ওপর একটি কথিকা ছিল। কন্ট্রাক্ট ফেরত আসে নি দেখে আমি প্রবোধ সান্যালকে

www.pathagar.com

রিমাইন্ডার দিলাম এবং তাতেও কাজ হল না দেখে কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল করলাম এবং সে জায়গায় খান বাহাদুর আবদুর রহমানকে আনলাম। অনুষ্ঠানের দিন প্রবোধ সান্যালও এসে উপস্থিত। আমি তাকে বললাম, তিনি কন্ট্রাক্ট ফেরত দেন নি বলে সরকারী নিয়ম অনুসারে রিমাইন্ডার দিয়ে তার কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল করা হয়েছে। প্রবোধ সান্যাল মহাক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন তার সঙ্গে গোলমাল করলে ভালো হবে না। প্রবোধ সান্যাল আমাকে শাসিয়ে প্রভাত মুখার্জীর ঘরে চলে গেলেন। অনুষ্ঠানের পর প্রভাত মুখার্জী আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং সমস্ত ঘটনা জানতে চাইলেন। আমি কাগজপত্র দেখিয়ে তাকে জানালাম যে আমি সরকারী নিয়ম মতো কাজ করেছি। প্রভাত মুখার্জী বললেন, 'যাই হোক– তুমি ভবিষ্যতে রোববারের সাহিত্য বাসরে একে ডেকে নিও।'

রোববারের সাহিত্য বাসরে প্রবোধ সান্যালকে এনেও বিপদে পড়লাম। যে রোববারে তার অনুষ্ঠান ছিল সে রোববারে মোহিতলাল মজুমদার ও অজিদ দত্তও ছিলেন। অজিত দত্তের ছিল কবিতা পাঠ, মোহিতলালের ছিল 'বঙ্কিমচন্দ্র হইতে পাঠ' এবং প্রবোধ সান্যালের ছিল স্বরচিত গল্প পাঠ। প্রবোধ সান্যাল প্রথমে এসে স্টুডিওতে বসেছিলেন, মোহিতলাল পরে এসে স্টুডিওর ভেতরে প্রবোধ সান্যালকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ফিরে এসে আমাকে বললেন, 'তোমার কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই? তুমি কি ভেবেছো একটি পাষণ্ডের সঙ্গে বসে আমি অনুষ্ঠানে অংশ নেবো?' আমি বললাম, উনি তো প্রবোধ সান্যাল। মোহিতলাল বললেন, 'তুমি ওকে কি চেনো, আমি ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি। ও একটি নির্বিকার পাষণ্ড। সাহিত্য চর্চায় মিথ্যাচারী অসৎ। যাই হোক দু'জনকে দু'ঘরে বসিয়ে সমস্যার সমাধান করা গেল। পরে নৃপেনদাকে এ সমস্ত ঘটনা বলতে তিনি হা হা করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। বললেন, 'মোহিত বাবু লোকটিকে ঠিকই চিনেছেন। লোকটির কোনো রুচি নেই, বুঝলে? ক্রমান্বয়ে তুমি সব কিছু জানতে পারবে।'

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় একদিন শাহাদাৎ হোসেনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। দীর্ঘকায় কুঞ্চিত কেশ, কৃষ্ণবর্ণের অধিকারী এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টির এই মানুষটি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিলেন। তিনি থাকতেন কলকাতার বাইরে চব্বিশ পরগনায় হাড়ুয়া নামক গ্রামে। শাহাদাৎ হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম সংলাপটি আমার মনে আছে। তিনি কেমন একটি নাটকীয় ধরনে কথা বলছিলেন। পরে শুনেছিলাম তিনি এক সময় মঞ্চে অভিনয় করেছিলেন। প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেতা দানীবাবুর অধীনে কাজ করেছিলেন। শাহাদাৎ হোসেন পুরনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে ভালবাসতেন। তিনি দানী বাবুর কথা বলতেন, শার্ঙ্গদেব নামক একজন কবির কথা বলতেন এবং এভাবে কথা বলতে বলতে অভিনয়ের কিছু বাণী উচ্চারণ করতেন এবং পুরনো কিছু কবিতাও আবৃত্তি করতেন। শাহাদাৎ হোসেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, এস ওয়াজেদ আলী এবং শাহাদাৎ হোসেন এই তিনজন ছিলেন একে অন্যের আত্মার আত্মীয়। তিনজনই অত্যন্ত উদার। এঁরা এক সঙ্গে বসে যে সমস্ত কথাবার্তা বলতেন তার মধ্যে শিশুসুলভ মনোহারিত্ব ছিল। গভীর তত্ত্বকথা তারা আলোচনা করতেন না, বাঘ এবং শেয়ালের গল্প বলতেন, 'হারাধনের দশটি ছেলে' কবিতা আওড়াতেন আবার তন্ময় হয়ে

www.pathagar.com

সমস্বরে 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল' এই পদ্যটি আবৃত্তি করতেন। সে এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। তিনজন বয়স্ক লোক শৈশবের চৈতন্যে নিজেদের আবিষ্কার করে একটি তন্ময় মুহূর্ত নির্মাণ করতেন।

॥৪০॥

অল ইন্ডিয়া রেডিওতে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর কালিদাস নাগ সর্বসময় আমাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। অর্থাৎ তারা ছিলেন অগতির গতি। যে কোন বিষয়ে তাদের কথিকা লিখতে দেয়া হলে তারা অল্প সময়ে প্রস্তুত করে দিতে পারতেন। আমার মনে আছে ইন্দোনেশিয়া নিয়ে তখন সবার মনে নানা ধরনের আগ্রহ। সে সময়ে সুনীতি বাবু সে দেশের উপর একটি প্রচুর সংবাদবহ কথিকা অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। সুনীতি বাবুর কাছেই প্রথম জানলাম যে ইন্দোনেশিয়ার ভাষায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব আছে, বিশেষ করে মানুষের নাম এবং স্থানের নামের মধ্যে এগুলো সুস্পষ্ট। সুনীতি বাবু সর্বভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে বাংলা ভাষায় সাহিত্যকে সবার উঁচুতে স্থান দিতেন। উর্দু গজল তিনি পছন্দ করতেন না, বলতেন, 'ফার্সী গজল এর চেয়ে শতগুণে ভালো।'

একদিন স্টেশন ডিরেক্টর সোমনাথ চীব ইকবালের কবিতা নিয়ে মন্তব্য করছিলেন। বলছিলেন যে ইকবাল একজন অসাধারণ কবি এবং তিনি বিশ্বের কাব্য ভুবনে ভারতবর্ষকে একটি মর্যাদার স্থানে স্থাপিত করেছেন। সুনীতি বাবু এ কথা স্বীকার করলেন না। তিনি বললেন, 'যে কবি হিমালয়কে সেন্ট্রির সঙ্গে তুলনা করে সে কি আবার কবি?' আমরা কিছুতেই সুনীতি বাবুকে বোঝাতে পারলাম না যে শান্ত্রী শব্দটি উর্দু ভাষারই একটি স্বীকৃত শব্দ এবং শব্দটি সে ভাষায় ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে ওতপ্রোত। তাছাড়া প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব গতিপ্রবাহ আছে, যার সাহায্যেই সে ভাষাকে অনুভব করতে হয়। আমি হিন্দী ভাষার কথা বললাম, যেখানে গুরু চণ্ডালি দোষ বলে কিছু নেই, কঠিন তৎসম শব্দের পাশে তরল দেশজ শব্দ অতি সহজেই বাঙ্ময় হচ্ছে।

অথচ বাংলাতে এ ধরনের প্রয়োগ প্রচণ্ড অপরাধ। কলকাতা থাকতে সুনীতি বাবুর বাসায় প্রায়ই যেতাম এবং বাংলা সাহিত্যের অতীত এবং মধ্যযুগ বিষয়ে তার কাছ থেকে পাঠ নিতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষার মধ্যে আমি সুনীতি বাবুর কাছ থেকে কিছু না নিলেও ব্যক্তিগতভাবে তার গৃহে তার কাছে বসে আরও অনেক বেশি গ্রহণ করেছি। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য চর্চায় এই জ্ঞান আমার প্রভূত সাহায্য করেছিল। কথা বলা আরম্ভ করলে তিনি আর থামতেন না। কথার পর কথা বলে চলতেন। একটি কথার সূত্রে অন্য কথা আসত। অনেক সময় একটি শব্দের সূত্র ধরে একটি দেশের ইতিহাস বলা হয়ে যেত। পাণ্ডিত্যে এমন ব্যাপকতা, গভীরতা আমি খুব কম দেখেছি। মানুষ হিসাবে তিনি সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ছিলেন। ডক্টর কালিদাস নাগও ছিলেন সদা প্রফুল্ল আনন্দময় পুরুষ। তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক শান্তা দেবীর স্বামী। আমি শান্তা দেবীকে দেখি নি। কিন্তু কালিদাস নাগকে রেডিওতে প্রায়ই বিভিন্ন বিষয় কথিকা দিতে দেখতাম। রেডিওতে থাকাকালীনই প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখন প্রেমেন্দ্র মিত্র একজন উচ্ছল যৌবনময় পুরুষ। প্রচুর কবিতা লিখছেন, গল্প লিখছেন এবং

www.pathagar.com

সিনেমা পরিচালনা করছেন। একটি আনন্দিত কর্মপ্রবাহের মধ্যে তাঁকে আমি সচ্ছল অবস্থায় দেখেছিলাম। রেডিওতে আসতেন, হাসিকৌতুকে আমাদের সঙ্গে সময় কাটাতেন, সূক্ষ্ম পরিহাসে সবাইকে আক্রমণ করতেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি আগ্রহ ছিল সাহিত্য কর্মে মুসলমানদের অধিকার সম্পর্কে কিছু জানা। তাই প্রায়ই আমার কাছে অথবা আহসান হাবীবের কাছে এসে বসতেন। নানাবিধ জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করতেন। তাঁর প্রশংসার ভাষা ছিল দ্বিধাহীন এবং পরিচ্ছন্ন। আহসান হাবীবের কবিতাকে তিনি বলতেন প্রাণের উচ্ছলতা। তার ভাষায় আহসান হাবীব একটি উচ্ছল মাধুর্যে জীবনের কথা বলবার চেষ্টা করে। পৃথিবীতে যেখানে অধিকাংশ পরিচয়ই প্রয়োজনের বন্ধনদশায় পীড়িত সেখানে প্রয়োজনের বাইরের আনন্দের দাক্ষিণ্যকে যারা তুলে ধরবার চেষ্টা করেন তারাই কবি। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলতেন বৈষ্ণব পদকর্তাদের সময় থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা কবিতা হচ্ছে উৎসারিত প্রকৃতি চর্চার ইতিহাস। আহসান হাবীবের কবিতার মধ্যে প্রকৃতির একটি মধুর রূপ ধরা পড়েছে। তিনি আরো বলতেন, পৃথিবীর সর্বত্রই একটি অভাবনীয় আছে, একটি রহস্য আছে, কবির কর্তব্য হচ্ছে, সেই অভাবনীয়কে দীপান্বিত করা।

তখন প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রেম যুগে যুগে' বইটি ছাপা হচ্ছিল। বইটি একটি সংকলন, প্রেমের কবিতার সংকলন। এখানে সে সময়কার আধুনিক মুসলমান কবিদের মধ্যে দুজনের কবিতা প্রেমেন্দ্র মিত্র নিয়েছিলেন। আহসান হাবীবের ও আবুল হোসেনের। আবুল হোসেনের 'মেহেদীর জন্য' কবিতাটি 'সেহেদীর জন্য' বলে ছাপা হয়েছিল। জিজ্ঞেস করাতে বলেছিলেন, 'ভুল সংশোধন করেছি, 'মেহেদীর' কোনো অর্থ হয় না, তাই আমি 'সেহেদী বসিয়ে দিয়েছি।' মুদ্রাকরের প্রমাদকে সমর্থনের জন্য তার এ উক্তিতে আমি কৌতুকবোধ করেছিলাম। ১৯৪৬ সালেই সম্ভবত লাহোর থেকে ফয়েজ আহমদ ফয়েজ কলকাতায় এসেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং আরও অনেকে ফয়েজ আহমদকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। সে সময় প্রেমেন্দ্র মিত্রের মুখে আমি ফয়েজ আহমদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনি। তিনি ফয়েজ আহমদকে একটি যুগের প্রতিনিধি বলে প্রশস্তি দিয়েছিলেন। অল ইন্ডিয়া রেডিওতে তখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কবি সাহিত্যিক এবং সঙ্গীত শিল্পীরা আসতেন। লক্ষ্য করেছি এদের সকলের সঙ্গেই মিত্রের আন্তরিক আলাপ আলোচনা চলত।

যে সময়কালের কথা বলছি, তখন আধুনিক কাব্যাদর্শের তিনজন প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। এদের একজন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্যজন অজিত দত্ত এবং তৃতীয় জন বুদ্ধদেব বসু। এ সময় আরও একজন কবি এসেছিলেন। যার নাম আমরা এখন প্রায় হারিয়ে ফেলেছি। তিনি সমর সেন। বুদ্ধদেব বসু ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৯৩৫ সালে। তার সঙ্গে সে সময় সহযোগী হিসাবে কাজ করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সমর সেন। পরে প্রেমেন্দ্র মিত্র ভিন্নভাবে 'নিরুক্ত' নামে একটি ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা প্রকাশে মনোযোগী হন। বলা যায় যে বাংলা কবিতায় আধুনিক ভঙ্গি প্রবর্তনার ক্ষেত্রে অথবা আধুনিকতার উন্মোচনের ক্ষেত্রে এরা সকলেই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আধুনিক কবিতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং আধুনিক কবিকুলকে সর্বাংশে সমর্থন করা এদের ব্রত

www.pathagar.com

ছিল। যে আনন্দময় অভিপ্রায়ে এবং দুঃসাহসে এরা আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা অতুলনীয়। এদের মধ্যে অজিত দত্তকে তাঁর মৃদুতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমার খুব ভাল লাগত। অজিত দত্ত কল্পনার দুর্লভ সৌন্দর্যকে আধুনিক প্রজ্ঞায় অনুভব করবার চেষ্টা করেছিলেন। তার একটি কবিতার অংশবিশেষের উদ্ধৃতি এখানে দিচ্ছি ঃ

'কন্যার সোনার দেহে হাজার
ময়ূরকণ্ঠী সাপ/
কন্যার বুকের পরে নাগিনীর
সোনার কাঁচুলী/
সাপেরা মেলিয়া ফণা দূর করে
গরলের তাপ/
কাঁপিলে কন্যার চোখ দশ লাখ
ফণা ওঠে দুলি-/
কুমারের উদাসীন মন/
সে দেশে গিয়াছে উড়ে, তাহারে
ফিরাবে কোন জন?'

অজিত দত্তকে সর্বদাই বিনম্র ও বেদনার্ত মনে হত। শান্ত শোভন মানুষটি নিরুপদ্রবে নিজের উপস্থিতি জ্ঞাপন করতেন। তবে এহেন মানুষকেও আমি রুষ্ট হতে দেখেছি। একদিন রোববারে সাহিত্য বাসরের অনুষ্ঠানে মোহিতলাল মজুমদার, প্রবোধ সান্যাল ও অজিত দত্ত ছিলেন। অনুষ্ঠানে গল্প পাঠ করেছিলেন প্রবোধ সান্যাল, 'দুর্গেশ নন্দিনী' থেকে পাঠ করেছিলেন অজিত দত্ত। অনুষ্ঠান শেষে অজিত দত্ত তার নতুন প্রকাশিত 'নষ্ট চাঁদ' বইটি মোহিতলাল মজুমদারকে উপহার দিলেন। মোহিতলালের হাতে বইটি তুলে দেবার সময় বললেন, 'আমাদের কবিতা আপনার কেমন লাগবে জানি না, তবে কৌতূহল হলে পড়ে দেখবেন। মোহিতলাল বইটি হাতে নিয়ে মন্তব্য করলেন, 'নষ্ট চাঁদ'। প্রথমেই তো ব্যাকরণের ভুল হে। নষ্ট চন্দ্রকে নষ্ট চাঁদ কেন বানালে? অজিত বাবু পকেট থেকে চুরুট বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে বললেন, 'আপনি এভাবেই সাহিত্যের গতিপথকে চিরকাল রুদ্ধ করে এসেছেন। সাহিত্য তার নিজের স্বভাবে অগ্রসর হবে ,আপনার ইচ্ছায় অগ্রসর হবে না।' মোহিত বাবু এ কথায় খুব ক্রুদ্ধ হলেন। কোনোভাবে ঘটনার মীমাংসা করে মোহিত বাবুকে বিদায় দিলাম। অজিত বাবু পরে আমাকে বললেন, 'মোহিত বাবু সকলেরই শ্রদ্ধা পেতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার স্বভাবের জন্য সকলকে শত্রু করেছেন।'

রেডিওতে আমি যখন ছিলাম তখন খুব সহজভাবে যারা রেডিও অফিসে আসতেন এবং আমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন তাদের মধ্যে পরিমল গোস্বামীও একজন। প্রবীণদের মধ্যে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ছিলেন। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী বুড়োদা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি আড্ডা দিতে বসলে সহজে উঠতেন না। গল্পের পর গল্প বলে যেতেন। সেগুলো সবই ছিল তার নিজের অভিজ্ঞতার গল্প। তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল প্রচুর। তিনি তার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা 'মহাস্থবির জাতক' গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম পর্বের কয়েকটি অধ্যায় রেডিওতে কথিকা হিসাবে প্রথম প্রচারিত

www.pathagar.com

হয়েছিল। পরে এগুলো ধারাবাহিকভাবে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হয় এবং অবশেষে পুস্তকাকারে গ্রন্থিত হয়।

বুদ্ধদেব বসুকে আমি কখনও সহজ হতে দেখি নি। তার কথাবার্তা বলার ভঙ্গি, চলাফেরা এবং আচরণবিধি আমার কাছে সবসময় অস্বাভাবিক মনে হত। তিনি উদার হাসিতে ফেটে পড়তে পারতেন না। কথাবার্তায় স্বর কখনও উচ্চগ্রামে নিতেন না। খুব মেপে মেপে কথা বলতেন। আমরাও সে কারণে তাকে অন্তরঙ্গ করে গ্রহণ করতে পারি নি। অজিত দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা পরিমল গোস্বামী যেভাবে রেডিওতে এসে গল্পগুজবে সময় কাটাতেন, বুদ্ধদেব বসুকে আমরা সেভাবে কখনোই পেতাম না। তাকে ভিন্ন গোত্রের মানুষ বলে মনে হত, কল্পনাবিলাসী স্বপ্নচারীর মত। সম্ভবত তিনি রেডিওর লোকদের ভালো লোক বলে মনে করতেন না। তিনি নিয়মিত কোনো অনুষ্ঠানেও যোগ দিতেন না। দু' একবার রবিবারের সাহিত্য বাসরে এসেছেন, একবার কি দুবার কবিতা পাঠের আসরে অংশগ্রহণ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক। কিন্তু তিনি আজীবন চেষ্টা করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে কলকাতার মানুষের ভঙ্গি আয়ত্ত করতে। কিন্তু কলকাতার মানুষ তাকে আপন বলে গ্রহণ করে নি। আর তিনি নিজেই তো পূর্ববঙ্গকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এটাই তার জীবনের চরম ব্যর্থতা।

॥৪১॥

রেডিও অফিসে গান শেখাতে আসতেন পংকজ মল্লিক। পংকজ মল্লিকের অনুষ্ঠানটি থাকত সাধারণত রোববার সকাল বেলায়। আমি সাহিত্য বাসরের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতাম, সেটাও রোববার সকাল বেলায়। এর ফলে পংকজ মল্লিকের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হত। একবার পংকজ মল্লিকের গানের আসরে একটি হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। গান শিক্ষার আসরে দর্শক ও শ্রোতার উপস্থিতি থাকত। এরাও গানে অংশগ্রহণ করত। পংকজ মল্লিক উচ্চকণ্ঠে কথা বলতেন এবং কখনও কখনও কারও কোন ভুল হলে তাৎক্ষণিক মন্তব্য করতেন। একদিন রবীন্দ্রনাথের একটি গান শেখাচ্ছিলেন–'কেন পরাণ হল বাঁধনহারা। উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুরের কিছু ভ্রান্তি লক্ষ্য করে পঙ্কজ মল্লিক বললেন, আহাহা হল না। তিনি বাঁধন শব্দের 'বা' ছেড়ে বাকী অংশ ধরে টান দিতে বললেন। পরক্ষণে পরিহাস করে বললেন, আহাহা বেশি জোরে টানবেন না। পংকজ মল্লিকের এই মন্তব্য বহু দিন পর্যন্ত রেডিও শ্রোতাদের মুখে মুখে চুটকি হিসেবে ফিরেছে। আমার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে একদিন হঠাৎ অনুষ্ঠানের শেষে চা খেতে খেতে পংকজ মল্লিক অকস্মাৎ প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি রেডিওতে কেন এসেছেন? কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারলেন না?' আমি একটু থতমত খেয়ে তৎক্ষণাৎ যা মনে এল, বললাম, 'আপনাদের মত গুণীর সাক্ষাৎ পাব বলে। পংকজ মল্লিক উদার হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'আপনি তো আর গায়ক হবেন না। সুতরাং আমার মত গুণীর স্পর্শে আপনার কোন উপকার হবে না।'

রেডিওতে বিমান ঘোষ ছিল আমার সহকর্মী। বিমান ঘোষ অসাধারণ দক্ষ সঙ্গীত শিল্পী এবং সঙ্গীতের শিক্ষক ছিল। ভিন্ন মাত্রার লোক হলেও বিমানের সঙ্গে আমার একটি ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। রেডিও অফিসে প্রতিদিন সকাল বেলা আমাদের একটি প্রোগ্রাম

www.pathagar.com

মিটিং হত। প্রোগ্রাম মিটিং-এর পর আমরা যে যার কক্ষে চলে যেতাম অফিসের কাজে। বিমান এ সময় আমাকে ডেকে নিয়ে যেত তার গানের রিহার্সেল রুমে। সেখানে সে রেডিওর শিল্পীদের গান শেখাত এবং এইচএমভি-র কিছু শিল্পীকেও রেকর্ডিং-এর জন্যে প্রস্তুত করে দিত। বিমানের কক্ষে বিখ্যাত গজলশিল্পী তালাত মাহমুদকে পেতাম। তালাত মাহমুদ কিছু বাংলা গানও রেকর্ড করেছিল। তালাত মাহমুদের পরিচয় ছিল তপন কুমার বলে। এইচ এমভি মুসলমানের নামে রেকর্ড বাজারে ছাড়তে চাইত না। কাসেম মল্লিকের ক্ষেত্রে তাদের অসুবিধা হয় নি। তাকে তারা কে মল্লিক বলে চালিয়েছিল। মল্লিক হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই উপাধি। সুতরাং কালী বন্দনার গায়ক কে মল্লিককে শ্রোতারা হিন্দু বলেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু তালাত মাহমুদের ক্ষেত্রে নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তালাত মাহমুদ ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ হাস্যোজ্জ্বল প্রাণবন্ত যুবক। তার হাসির ভঙ্গিটি এখনও আমার চোখে ভাসে। কোন একটি হাসির ব্যাপার ঘটলেই সে একটু লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে হাসতে থাকত। বিমান তাকে বাংলা কথাগুলো খুব মনোযোগের সঙ্গে শেখাত। এ নিয়ে অনেক সময় হাসির হুল্লোড় উঠেছে।

রেডিওতে সে সময় দুজন সুদর্শন মুসলমান যুবক রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাদের একজন হচ্ছেন আবদুল আহাদ আর একজন কলিম শরাফী। আবদুল আহাদ রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষক হিসাবে সেই তরুণ বয়সেই শান্তিনিকেতনে সমাদৃত ছিলেন। কলিম শরাফী উদার এবং সুস্পষ্ট কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তার কণ্ঠে এক প্রকার অনাবিল মাধুর্য ছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর নিয়ে এ সময় অল ইন্ডিয়া রেডিওর সঙ্গে শান্তিনিকেতনের কিছুটা তর্ক হয়। রেডিওর প্রধান পুরুষ আহমদ শাহ বোখারী রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের শাসন মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। তার বক্তব্য ছিল যে রাগ-রাগিনীভিত্তিক যে সমস্ত গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন তার গায়কী পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অপরিহার্য। কিন্তু শান্তিনিকেতন এক্ষেত্রে বাধা প্রদান করছে। তারা তাদের অনুমোদিত পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে গান গাইতে দেবেন না। সে সময় শান্তিনিকেতনের পক্ষে বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধক শৈলজারঞ্জন বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সে সময় কোলকাতায় তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। শেষ পর্যন্ত রেডিও কর্তৃপক্ষকে শান্তিনিকেতনের নির্দেশ মেনে নিতে হয়েছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীতের শৈলজা বাবু একজন অসাধারণ নিবেদিতপ্রাণ সাধক।

আমি সঙ্গীতের রাজ্যের লোক না হলেও রেডিওতে চাকরি করতাম, সে কারণেই ভারতীয় সঙ্গীত রাজ্যের প্রধান প্রধান পুরুষের অনেকের সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, বিনায়ক পট্রবর্ধণ এবং আরও অনেকে। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁকে একজন বিনয়-নম্র শান্ত সাধক হিসাবে আমি দেখেছিলাম। অভিমানহীন নিরুদ্বিগ্ন এবং নিবেদিতপ্রাণ এই সঙ্গীতসাধকের সঙ্গে আর কারোরই তুলনা হয় না। অহমিকা তার পূর্ণ অধিকার ছিল। কিন্তু তার অহমিকা বিনয়-লাবণ্যে পর্যবসিত হয়েছিল। একদিনের ঘটনা আমার বিশেষ করে মনে আছে। সকাল বেলা আমার ট্রান্সমিশন ডিউটি ছিল। সকালের ট্রান্সমিশনে ওস্তাদ আবদুল ওয়াহিদ খানের অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠানের ঘোষক আসতে দেরি হওয়ায় কিছুক্ষণ

www.pathagar.com

পর্যন্ত অনুষ্ঠান ঘোষণা আমিই করেছিলাম। ওস্তাদ আবদুল ওয়াহিদ খানের কাছে জেনে নিয়েও ছিলাম কিভাবে ঘোষণা করতে হবে। তিনি যা নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হচ্ছে–সাবতাজে মৌসিকী ওস্তাদ আবদুল ওয়াহিদ খান আব আপকো বসন্ত কী বাহার শোনাবেঙ্গে। আমি তো ঘোষণা করে দিলাম ঠিকই, কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যার সময় একটি বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়লাম; সেদিন সন্ধ্যায় দর্শক-শ্রোতাদের উপস্থিতিতে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর বাদন ছিল। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে স্টেশন ডিরেক্টর সোমনাথ চীব আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আজ সকালে তুমি আবদুল ওয়াহিদ খানকে সাবতাজে মৌসিকী বলে ঘোষণা করলে, এখন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁকে কি বলে ঘোষণা করবে? আমি বিব্রত বোধ করলাম।

আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব সোমনাথ চীবের পাশেই বসেছিলেন। তিনি আমার বিব্রত ভাব লক্ষ্য করে বললেন, বাবা, আমাকে ফকির আলাউদ্দীন বললেই আমি খুশি হব। ওংকারনাথ ঠাকুর ছিলেন উদ্ধত এবং প্রচণ্ড অহমিকাপূর্ণ। তার আচরণে মনে হত তিনি যেন কাউকেই মানুষ বলে গণ্য করেন না। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর মধ্যেও অহমিকা ছিল। কিন্তু অহমিকা তার শোভা ছিল। সঙ্গীতের রাজ্যে আমি কখনও প্রবেশ করি নি। কিন্তু সঙ্গীত উপলব্ধি করবার আগ্রহ আমার ছিল। আমি মনে করি, কবিতার জন্য সঙ্গীতের অনুভূতি একান্ত প্রয়োজন। কবিতায় শব্দ শুধু অভিধানগত অর্থই বহন করে না, তার অতিরিক্ত একটি বিশেষ চৈতন্যকে প্রকাশ করে।

সঙ্গীতের সুর সঙ্গীতের জন্য সেই বিশেষ চৈতন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কবিতায় যা উহ্য সঙ্গীতের সুরে তা স্বপ্রকাশ। সেই প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে আধুনিককাল পর্যন্ত বাংলা কবিতা কখনও সুরের আশ্রয়কে অস্বীকার করে নি। চর্যাগীতিকা সুরারোপিত ছিল, মধ্যযুগের কাব্যগুলোও সুরসমর্থিত, বৈষ্ণব পদাবলী তো পুরোপুরি গান। আধুনিককালে এসে দেখি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সঙ্গীত সাধনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামও সঙ্গীত সাধনা করেছেন। বহুকাল পর্যন্ত আমাদের কাব্যজগৎ সঙ্গীতজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। পাশ্চাত্যের ব্যাপারটি আলাদা। পাশ্চাত্যজগতে সঙ্গীতের একটি নিজস্ব ধারাক্রম এবং প্রক্রিয়া ছিল এবং কবিতার ধারাক্রম ছিল ভিন্ন প্রদেশের। সেখানে গান সুরারোপিত বাণী নয়। সেখানে গান হচ্ছে সুরের নিজস্ব তন্ময়তা।

কলকাতা বেতারে কখনও কখনও পাশ্চাত্য সঙ্গীতেরও অনুষ্ঠান হত। এ অনুষ্ঠানের অধিকাংশই ছিল আর্কেস্ট্রা এবং কখনও কখনও পিয়ানোবাদন। কলকাতা রেডিওতে ডক্টর আর্নল্ড বাকে নামে একজন ইংরেজ পণ্ডিতকে দেখেছিলাম। তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। ডক্টর বাকে প্রচুর লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেছিলেন। এ সমস্ত সঙ্গীতের নোটেশন তিনি প্রস্তুত করতেন নাজির আহমদের সহযোগিতায়। নাজির আহমদ কলকাতা রেডিওতে স্টাফ আর্টিস্ট ছিল। বর্তমানে সে ইংলন্ডে বসবাস করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তুলনামূলক আলোচনায় আর এক ভদ্রলোককে কলকাতায় দেখেছিলাম। তিনি ডক্টর মুখার্জী। তার পুরো নাম আজ আমার মনে নেই। ডক্টর বাকে আমাদের লোকসঙ্গীতের একজন বিমুগ্ধ শ্রোতা ছিলেন। তিনি বলতেন, 'দুনিয়ার সর্বত্র লোকসঙ্গীতের সুর একই।

www.pathagar.com

স্কটল্যান্ডের লোকসঙ্গীতে যে মেলোডী লক্ষ্য করা যায়, বাংলার লোকসঙ্গীতের মধ্যেও তা আমি লক্ষ্য করি।' ডক্টর বাকে সে সময় কি করতেন, আমি জানি না। কিন্তু কলকাতা থেকে বিদায় নিয়ে লন্ডনে যাবার পর খবর পেয়েছিলাম যে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের রীডার হয়েছেন। ১৯৪৯ সালে আমি তার মৃত্যুসংবাদ পাই। আমি তখন ঢাকায়। সঙ্গীত আমার উপজীব্য না হলেও এবং ব্যক্তিগতভাবে সঙ্গীত আমার সাধনায় অগ্রসর না হলেও সঙ্গীতের মূর্ছনা এবং প্রত্যয় আমাকে চিরকাল অভিভূত করেছে। মুখ্যভাবে না হলেও গৌণভাবে আমি আমার ভাষার প্রকাশ রূপের মধ্যে সঙ্গীতের অনুভূতিকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি। শব্দ কবিতাকে তখনই যথার্থরূপে বাত্ময় করে যখন শব্দের সূক্ষ্মতর ধ্বনি মাধুর্য বিভিন্ন অনুরণনের মাধ্যমে একটি বিশ্বাসের জন্ম দেয়।

॥৪২॥

মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে রহস্যময়তা নামে এবং কখনও কখনও রোমাঞ্চ তাকে স্পর্শ করতে চায়। এগুলো কখনও প্রত্যাশিত থাকে না কিন্তু যৌবনের যাত্রারম্ভে এগুলো তৈরী হয় কখনও কল্পনায় কখনও বাস্তবে। বয়স কম বলেই হয়তো এবং অভিজ্ঞতা কম বলেই হয়তো আমরা যৌবনের কিছু লীলা চাঞ্চল্যকে রোমাঞ্চ বলে মনে করি এবং রহস্যময়তা এসেছে বলে উৎফুল্ল হই। পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করে আমি অতীতের প্রেক্ষাপটে অনেক কিছু আজ দেখছি যেগুলো এক সময় খুবই অভিনব মনে হয়েছিল। রেডিওতে থাকতেই আমার জীবনে সিনেমা সিনেমাসদৃশ একটি চঞ্চলতার উৎক্ষেপণের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। আমি সাহিত্য বাসর দেখতাম উন্নয়নমূলক কথিকা দেখতাম এবং 'বিদ্যার্থীমণ্ডলের' পুরো দায়িত্ব আমার ওপর ছিল

বিদ্যার্থীমণ্ডলের পরিকল্পনা বেশ আগে থেকেই করতে হত। এবং তিন মাসের অনুষ্ঠানসূচী মুদ্রণ করে বিভিন্ন স্কুলে পাঠান হত। তাছাড়া অনুষ্ঠানটি যেহেতু কম্পোজিট ছিল তাই অনুষ্ঠানের উপস্থাপনাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম ছিল। অনুষ্ঠানের মধ্যে কথিকা থাকত, নাটক থাকত, গান থাকত এবং প্রশ্নোত্তর থাকত। আরও কিছু থাকত এখন সেগুলো মনে পড়ছে না। এই কম্পোজিট বা সমন্বিত অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন আহসান হাবীব এবং নৃপেনদা চিঠিপত্রের উত্তর দিতেন। আমার দায়িত্ব ছিল স্ক্রিপ্টগুলো সাজিয়ে আহসান হাবীবকে দিয়ে দেওয়া এবং উপস্থাপনার সময় স্টুডিওতে উপস্থিত থাকা। কিন্তু আর একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ ছিল অনুষ্ঠানসূচী প্রস্তুত করা। কি কি ধরনের অনুষ্ঠান হবে এবং একটি বিষয়ে কটি আলোচনা হবে এবং আলোচনার বিষয়বস্তু কি সেগুলো বেশ আগে থেকে তৈরি করতে হত।

এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করবার জন্য একজন স্টাফ আর্টিস্ট থাকতেন। সে স্টাফ আর্টিস্ট-এর আবার জনসংযোগেরও দায়িত্ব ছিল– অর্থাৎ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা হয়ে গেলে বিভিন্ন স্কুলের হেড মাস্টারদের ডেকে পরামর্শ করতে হত। আমি যখন রেডিওতে যোগ দিলাম এবং বিদ্যার্থীমণ্ডল আমার ওপর ন্যস্ত হল তখন এ কাজের জন্য স্টাফ আর্টিস্ট ছিল না। পদ ছিল কিন্তু পদ পূরণ করা হয় নি। আমি স্টেশন ডিরেক্টর সোমনাথ চীবকে এ কথা বলতেই তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে অবিলম্বে একজন স্টাফ আর্টিস্ট নিযুক্ত করা

www.pathagar.com

হবে। সপ্তাহান্তে তিনি একদিন দুপুর বেলা তার ঘরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকেই টেবিলের ডান পাশে এক মহিলাকে দেখলাম। মহিলা যুবতী, অসাধারণ উজ্জ্বল তার গায়ের রঙ। অপূর্ব লাবণ্যবতী। মহিলার পরনে টকটকে লাল শাড়ি ছিল। আমাকে স্তব্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সোমনাথ চীব বসতে বললেন এবং মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে বললেন, 'এর নাম বিজলী বিশ্বাস। ইনি একটি ইংরেজী স্কুলে পড়িয়ে থাকেন। বিদ্যার্থীমণ্ডলের অনুষ্ঠানসূচী তৈরী করবার জন্য একে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। তুমি একে তোমার ঘরে নিয়ে যাও এবং কি ভাবে অনুষ্ঠানসূচী করবে, একে বুঝিয়ে দাও।' ভদ্রমহিলা খুব সপ্রতিভ। আমি একটু দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলাম দেখে তিনি আমাকে বললেন, 'আমি খুব দ্রুত হাঁটতে পারি না।'

আমি লজ্জিত হয়ে ভদ্রমহিলার পাশাপাশি হেঁটে আমার ঘরে এলাম। যে ঘরে আমি বসতাম সে ঘরে আমার বিপরীত দিকে আলাদা টেবিলে বসত রণেন আচার্য। তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করলে বলত আমি আচারিয়া। ইংরেজীতে যখন এ কথাগুলো বলত তখন লোকে মনে করত সে অবাঙালী। এ মহিলাকে আমার ওখানে বসতে দেখে আচারিয়া একটু চঞ্চল হল এবং একসময় অপ্রাসঙ্গিকভাবে একটি প্রয়োজনীয় সংবাদ দিচ্ছে এভাবে বলল, 'মিঃ আলী, কল্যাণী টেলিফোন করেছিল'। কল্যাণী বলে একটি মেয়ে ঠিকই ছিল, সে রেডিওর অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য আমাদের সবাইকে বিরক্ত করত। সুতরাং কল্যাণীর টেলিফোন করাটা এমন কোনো সংবাদ নয়। যাই হোক ভদ্রমহিলা খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে আমাকে বললেন, 'অফিস টাইমে বোধ হয় প্রোগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করা অসুবিধা হবে। আমাকে যে কয়দিন আসতে হবে সে ক'দিন আমি যদি বিকেলে আসি তাহলে বোধহয় আপনার অসুবিধা হবে না। আমরা আলোচনাক্রমে দুটো দিন ঠিক করে নিলাম যে দুটো দিনে তিনি বিকেল চারটায় আসবেন, ঠিক হল। ভদ্রমহিলা দেখতে যেমন লাবণ্যময়ী তেমনি তার কণ্ঠস্বরও ছিল সুন্দর। কয়েকটি সোনার চুড়ি একে অন্যের সঙ্গে হালকাভাবে লাগলে যেরকম শব্দ করে ওঠে ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বরও ছিল তেমনি।

ভদ্রমহিলা এভাবে নিয়মিত আসতে লাগলেন এবং আমরা অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করার ফাঁকে ফাঁকে কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথাও বলতে শুরু করলাম। ভদ্রমহিলা সব কথাতেই 'সুন্দর' এই কথাটি ব্যবহার করতেন। যেমন 'ছোট্ট ইঁদুরটি কেমন সুন্দর' ইত্যাদি। আমি বিব্রত বোধ করতাম কিন্তু মজাও লাগত। ভদ্রমহিলা মাঝে মাঝে রান্নার কথাও বলতেন। চীনা রান্না তার খুব পছন্দ ছিল। বিভিন্ন ধরনের চীনা রান্না কত যে সুন্দর হয় সেগুলো তিনি অনবদ্যভাবে বলতেন। বিশেষ করে মুরগী রান্নার বিভিন্ন পদ্ধতির বিবরণ তিনি দিতেন। রান্নার ব্যাপারে আমিই সম্ভবত একদিন কথা তুলেছিলাম। তার ফলে ভদ্রমহিলা সংলাপের উপকরণ হিসাবে রান্নাকেও ধরে নিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি একটি দুটি আইটেম রান্না করে নিয়েও আসতেন।

ইতোমধ্যে আমার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। সে ব্যাপারে রেডিওর লোকজন কিছুই জানত না। জানার কথাও নয়। আমি ভেবেছিলাম সব ঠিকঠাক হলে সবাইকে বিয়ের কার্ড পৌঁছে দেব। বিয়ের দিন তারিখ ঠিকঠাক যখন হয়ে গেল তখন আমার শ্বশুর বাড়ির পক্ষ থেকে একজন ভদ্রলোক এসে আমার বাঁ হাতের অনামিকায় একটি হীরের আংটি পরিয়ে

www.pathagar.com

দিয়ে গেল। এ আংটি হাতে নিয়ে রেডিও অফিসে যেদিন গেলাম তখন প্রথমে কারও দৃষ্টিতেই পড়েনি কিন্তু বিকেল বেলা বিজলী বিশ্বাসের চোখ পড়ল। আমার বাঁ হাতটি টেবিলের ওপর ছিল। ইচ্ছে করেই রেখেছিলাম হয়ত। বিজলী বিশ্বাস হঠাৎ তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার আংটিটি স্পর্শ করল। বলল, 'দেখি দেখি, খুব সুন্দর তো।' আমি লজ্জিত বোধ করলাম। কেন যেন বলতে পারলাম না যে আংটিটি আমার শ্বশুর বাড়ির কাছ থেকে পেয়েছি। আমি একটু বিব্রতভাবে হাসলামমাত্র। ভদ্রমহিলা আবার বললেন, 'এতদিন কেন পরেন নি? কি সুন্দর মানিয়েছে দেখুন তো' – এই বলে আস্তে আস্তে আমার হাতের ওপর হাত বুলাতে লাগলেন। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে তার এই সৌজন্য উপভোগ করতে লাগলাম। কেমন যেন একটু তন্ময়ও হয়েছিলাম। এক সময় হঠাৎ তন্ময়তা ঝেড়ে ফেলে বলে ফেললাম যে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে এবং আংটিটি আমার হবু শ্বশুরের দেওয়া। ভদ্রমহিলা হঠাৎ তার হাত সরিয়ে নিলেন এবং কি একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে নিজের ব্যাগ গুছিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমার বিয়েতে রেডিও অফিসের সকলেই প্রায় এসেছিলেন। কলকাতা শহর থেকে দূরে হাওড়ার বাওড়িয়া থানায় বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল। রেডিও অফিস থেকে প্রভাত মুখার্জি, বিকাশ, বিমান, নীলিমা এবং আরও অনেকে যোগ দিয়েছিলেন। বিয়ের পর আমি আমার নব-পরিণীতাকে নিয়ে ঢাকায় এলাম এবং এক সপ্তাহের ছুটি ফুরালে চাকরিতে যোগ দিলাম। ছুটির পর যেদিন রেডিওতে প্রথম এলাম, দেখি বারান্দায় ফুলের গুচ্ছ হাতে নিয়ে নীলিমা এবং আরও অনেকে আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। সকলেই হৈচৈ করে উঠলো। আমি কিছুটা বিব্রত ও লজ্জিতভাবে এদের পুষ্প উপঢৌকন গ্রহণ করলাম। এদিক ওদিক তাকিয়ে আমি বিজলী বিশ্বাসকে খুঁজছিলাম। নীলিমা হঠাৎ হেসে বলল, 'আলী, তোমার বিজলী চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।'

আমার দৃষ্টি তখন আমার অজ্ঞাতসারে, বিদেশী পুরুষদের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে অনেক চটুল গল্প কলকাতা শহরে প্রচলিত ছিল। যৌবন পড়ে এসেছিল তার কিন্তু সাজসজ্জায় তাকে উদ্ভিন্ন যৌবনাই মনে হত। তার ব্যক্তিগত জীবনের রসাবেশটি যে রকমেরই হোক তিনি শিল্পী সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তরুণ শিল্পীদের মর্যাদা সৃষ্টির জন্য তিনি তার বিত্ত নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। তার বৈভব ছিল প্রচুর এবং ক্ষমতাও ছিল প্রচুর। ক্ষমতা না বলে বলা যায় প্রভাব। তিনি টাটা এবং বিড়লার কাছ থেকে টাকা নিয়ে কলকাতায় মাঝে মাঝে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। তারই চেষ্টায় টাটা প্রতি বছর 'আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রি' এই নামে একটি চিত্র প্রদর্শনী নিয়মিতভাবে করতে থাকে। এ সমস্ত একজিবিশনে তখন কয়েক জন মুসলমান শিল্পী স্থান পেয়েছিলেন। তারা হচ্ছেন জয়নুল আবেদীন, আনওয়ারুল হক এবং শফিউদ্দিন আহমদ। আনওয়ারুল হক পোর্ট্রেট আঁকতেন আর শফিউদ্দীন সবেমাত্র উডকাঠে দক্ষতা অর্জন করেছেন। আবেদীন তখন দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। লেডী রানু মুখার্জি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক চতুর এবং হাস্যোজ্জ্বল মহিলা। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের মধ্যমণিও ছিলেন বলা যায়। শিল্পীদের প্রতি তার মমতা ছিল আন্তরিক এবং তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। অনেক দিন পর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৭২ সালে লেডী রানু মুখার্জির সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তখনও দেখেছি তিনি শিল্পীদের প্রদর্শনী করে বেড়াচ্ছেন।

www.pathagar.com

কলকাতায় থাকতে লেডী রানু মুখার্জির চাঞ্চল্যকর জীবন যাপনের মাঝে মাঝে মুখরোচক সংবাদ পেতাম। এসব সংবাদে আমার আগ্রহ ছিল না কিন্তু তখনকার বয়সে যৌনতা এবং প্রেম সমার্থক থাকে। তাই বোধহয় লেডী রানু মুখার্জির জীবন যাপনের সংবাদ শুনবার জন্য আগ্রহ খুব হত।

কলকাতার ইঙ্গবঙ্গ সমাজে আরও দুজন মহিলার খুব প্রতাপ ছিল। এদের একজনের নাম ছিল ইলা রীড এবং অন্যজনের নাম মৃণালিনী এমারসন। এরা উভয়েই অতি উচ্চ শিক্ষিতা ছিলেন এবং বিবাহ করেছিলেন বিদেশী পুরুষকে। যে কোনো উৎসবকে উচ্ছ্বলিত করবার জন্য এদের প্রয়োজন হত। এরা অকাতরে ইংরেজী বলতেন, পুরুষের সঙ্গে বাহুবন্ধনে নৃত্য করতেন এবং প্রচুর মদ্যপান করতেন। এই দুজনের মধ্যে মৃণালিনী ছিলেন উচ্ছল যৌব-অনামিকার হীরার ওপর পড়েছিল। এটাও নীলিমার দৃষ্টি এড়াল না। সে হেসে বলল, 'তোমার হীরার মধ্যেই তুমি বিজলীর প্রভা দেখতে পাবে।'

কলকাতার আধুনিক সামাজিক জীবনে সে সময় বিত্তশালী একজন মহিলার খুব প্রতাপ ছিল। তার নাম লেডী রানু মুখার্জি।

রেডিওতে বিজলী বিশ্বাসকে এই প্রকৃতির একজন মানুষ হিসাবে পেয়েছিলাম। পরে তার মধ্যে একটি হৃদয়াবেগের স্ফূরণ লক্ষ্য করেছিলাম এবং সেই হৃদয়াবেগের আভাস দিয়েই সে আমার জীবন থেকে চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়।

॥৪৩॥

কলকাতা রেডিওতে আমি যখন ছিলাম তখন সহকারী স্টেশন ডিরেক্টর ছিলেন লুথরা বলে একজন পাঞ্জাবী। ভদ্রলোকের শখ ছিল ফটো তুলবার। তার একটি দামী ক্যামেরা ছিল। একটি তেপায়া স্ট্যান্ডের ওপর ক্যামেরাটি সর্বক্ষণ ফিট করা থাকত। তিনি ফিল্ম আর্টিস্টদের ফটো তুলতে ভালোবাসতেন। তিনি প্রমথেশ বড়ুয়া, অহীন্দ্র চৌধুরী, যমুনা এরা কোন অনুষ্ঠানে রেডিওতে এলে এদের ছবি তুলেছেন। তিনি এদের বলতেন আর্টিস্ট। একদিন আমি জয়নুল আবেদীনকে তার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম ছবি তুলবার জন্য। এ কথায় পরে আসছি, তার আগে রেডিও অনুষ্ঠানে আবেদীন কি করে এলেন সে কথাটি বলে নেই। আমাদের অনুষ্ঠান পরিকল্পনার জন্য আমরা কখনও কখনও পণ্ডিতগণের দ্বারস্থ হতাম।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এভাবেই কিছু কথিকার পরিকল্পনা করে দিয়েছিলেন, শিল্পকলার জন্য আমি দ্বারস্থ হয়েছিলাম ও সি গাঙ্গুলীর কাছে। ভদ্রলোক এটর্নী ছিলেন ব্যবসা সূত্রে। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের একজন অসাধারণ মর্মজ্ঞ ছিলেন। তিনি হিন্দু-মন্দির এবং দেবমূর্তি আবার বৌদ্ধমূর্তি এগুলো সম্পর্কে অনেক জ্ঞান রাখতেন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ে কটি কথিকার নামকরণ করেছিলেন আমার মনে আছে। এর মধ্যে একটি বিষয়ে বক্তব্য রাখবার জন্য আমি শিল্পী জয়নুল আবেদীনের কাছে কন্ট্রাক্ট পাঠিয়েছিলাম। আবেদীন তো কন্ট্রাক্ট পেয়ে কলকাতায় আমার মেসে এসে হাজির। এসেই বললেন, 'এটা কি পাঠিয়েছেন, বুঝিতো না।' আমি হাতে নিয়ে দেখি 'অবলোকিতেশ্বর' অর্থাৎ একটি বিশেষ প্রজ্ঞার বুদ্ধমূর্তি। আমি আবেদীনকে বললাম, 'চলুন ও সি গাঙ্গুলীর কাছে গিয়ে এর তাৎপর্য বুঝে আসি, তারপর লেখাটি তৈরি করা

www.pathagar.com

যাবে। গাঙ্গুলী মশায় প্রয়োজনীয় উপকরণ দিলেন এবং মূর্তিটির ছবিও দেখালেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত লেখাটি তৈরি করা গেল। ফটক দিয়ে বেরিয়ে এসে আবেদীন বলল, ভাই 'অবলোকিতেশ্বর' মাথায় থাকুন, আমি আমার গ্রামের মানুষগুলো নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই।' আমি আবেদীনকে লুথারার কামরায় নিয়ে গেলাম ছবি তুলবো বলে। ছবি তোলা হলে লুথরা আবেদীনের নাম লিখে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে ইনি কোন ফিল্মে অভিনয় করেছেন এবং কি ধরনের অভিনয় করে থাকেন? ব্যর্থ প্রেমিকের ভূমিকায় নামেন কি? দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন আবেদীন দাড়ি কামিয়ে আসেন নি, একদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছিল, চুলও উসকো-খুসকো ছিল। হতাশ প্রেমিকের মতোই দেখাচ্ছিল কতকটা। যাই হোক, আমি লুথরাকে বুঝিয়ে বললাম, ইনি একজন শিল্পী। চিত্রশিল্পী।

তখনকার দিনে রেডিও জগতে বিশেষ মর্যাদা পেতেন সিনেমা শিল্পীরা, চিত্রশিল্পীদের এমন কোনো মর্যাদা ছিল না। দু-একজন ছাড়া শিখরে উঠেছেন তাদের কথা আলাদা, যেমন যামিনী রায়। কলকাতায় তখন শিল্পী যামিনী রায়ের খুব প্রতাপ। বাংলার আদি পটচিত্রকে অবলম্বন করে এবং মাটির পুতুলের ধারাক্রমকে অনুসরণ করে তিনি এক নতুন চিত্রকলার জন্ম দিয়েছিলেন। প্রফেসর শাহেদ সোহরাওয়ার্দী একটি ইংরেজী প্রবন্ধে পৃথিবীর শিল্পজগতে যামিনী রায়কে স্বাগত জানিয়েছিলেন। মূলত শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর প্রারম্ভিক বিবেচনায় যামিনী রায়ের প্রতি পৃথিবীর বাির শিল্প রসিকদের দৃষ্টি পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে কলকাতায় বহু বিদেশী সৈনিক ছিল। এদের মধ্যে অনেকেই সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। শিল্প-সাহিত্যের প্রতি এদের আগ্রহ ছিল। যামিনী রায়ের ছবি এরা কিনতে লাগল।

এদের চাহিদা মেটাবার জন্য যামিনী রায় আর্ট স্কুলের কিছু ছাত্রকে তার ছবি নকল করার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একটি ছবি এঁকে দিতেন এবং এরা সেই ছবির নকল তৈরি করত। যামিনী রায় আবার সবগুলো পরীক্ষা করে প্রয়োজনবোধে সংশোধন করে দিতেন এবং স্বাক্ষর দিতেন। এ ভাবে নকল ছবিও মৌলিক বলে বিক্রি হত। যামিনী রায়ের এক ছেলের সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা ছিল। আজ তার নামও ভুলে গেছি। সে রেডিও অফিসে আমার সঙ্গে আড্ডা দিত। আমাকে গ্রেট ইস্টার্নে নিয়ে খাওয়াত, বিকেলে কোনও কোনও দিন সিনেমায়ও নিয়ে যেত। শিল্পী পিতার ব্যবসা প্রক্রিয়ার নব নব উদ্ভাবন রীতি ছিল এই ছেলেরই। যামিনী রায় কখনও রেডিওতে আমার সময়ে এসেছেন কিনা মনে নেই। আমার মনে হয়, আসেন নি। তবে আমি তার বাসায় গিয়েছি এবং তাকে কাজ করতেও দেখেছি। যামিনী রায় এককভাবে ভারতের শিল্পকে আধুনিক সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আপন ঐতিহ্যের সঙ্গে বিজড়িত করেছিলেন। রেডিওতে যামিনী রায়ের শিল্পকর্ম সম্পর্কে একটি আলোচনা করেছিলেন বিষ্ণু দে। আলোচনাটি খুবই মনোজ্ঞ হয়েছিল।

শিল্পজগতের লোকেরা সিনেমার জগতের সঙ্গে মুখ্যভাবে না হলেও কখনও কখনও গৌণভাবে যুক্ত হয়েছেন। সেটের ডিজাইন করা, কস্টিউমের ডিজাইন তারপর পরিচয়লিপি উদ্ভাসনা এ সমস্ত ক্ষেত্রে শিল্পীরা নিযুক্ত হয়েছেন এবং সেজন্য তারা টাকাও পেয়েছেন। কোনও কোনও শিল্পী সিনেমা হাউসে পোস্টারের কাজে নিযুক্ত হয়েও অর্থ উপার্জন করেছেন।

www.pathagar.com

তবে এগুলো খুব ব্যাপক হারে নয়, কেননা তখন ব্যবসার চাইতে শিল্পগত সৌষ্ঠব নির্মাণটাই শিল্পীদের কাছে প্রধান ছিল। সুতরাং নামকরা শিল্পীরা কখনও পোস্টারের কাজে নামেন নি। শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তিনি এ সমস্ত কাজকে ঘৃণাই করতেন। তবে জীবন যাপনের জন্য এ সমস্ত কর্মোদ্যমের প্রাসঙ্গিকতা আছে। জীবনকে সুন্দর করাও শিল্পীদের দায়িত্ব। মুসলমান শিল্পীদের মধ্যে এ সমস্ত ডিজাইনের কিছু কাজ বন্দে আলী মিয়া এবং আবুল কাসেম করেছিলেন। অনেকে জানে না যে বন্দে আলী মিয়া শিল্পীও ছিলেন। তিনি সাইনবোর্ড লেখার কাজও করেছেন এবং কখনও কখনও কোনও প্রাইভেট ফার্মের চেয়ার, টেবিল ও সেলফের পেছনের নম্বর লিখে দেয়ার কাজও করেছেন। যে সময়ের কথা বলছি, তখন কলকাতায় মাঝে মাঝে খ্যাতনামা চলচ্চিত্র শিল্পী, নাট্যকার এবং লেখক আসতেন। স্টেটসম্যান কাগজে এদের আসার খবর পেলে আমরা অল ইন্ডিয়া রেডিওর পক্ষ থেকে তাদের কারও কারও সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সাক্ষাৎকার প্রচার করতাম। এরা প্রায়ই এসে উঠতেন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। হোটেলটি আজও আছে। কিন্তু সেদিনকার মত তাৎপর্যবহ আর নেই। সে সময় ছিল তৎকালীন সময়ের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হোটেল আর এখন একটি তৃতীয় অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেল বলা যেতে পারে। যাই হোক, এক দিন কাগজে দেখলাম, ব্রিটিশ নাট্যকার নওয়েল কাউয়ার্ড গ্রেট ইস্টার্নে অবস্থান করছেন। জয়নুল আবেদীন ইংরেজী কথিকা দেখতেন। তিনি নওয়েল কাউয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

সে সময় কলকাতায় নওয়েল কাউয়ার্ডের একটি বই প্রদর্শিত হচ্ছিল। বইটির নাম মনে নেই। কিন্তু গল্পটি কিছু কিছু মনে আছে। লন্ডন ছাড়িয়ে শহরতলির একটি রেলওয়ে স্টেশনে একটি রেস্তরাঁ। এই রেস্তরাঁকে কেন্দ্র করে সকল ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। ট্রেনের যাত্রীরা রেস্তরাঁয় খেতে আসে, স্থানীয় লোকেরাও আসে। সব সময় নেপথ্যে বাজনা বাজে এবং রেস্তরাঁর পরিচারিকারা অতিথিদের খাদ্য পরিবেশন করে এবং হাসিঠাট্টা করে। এখানে একটি মেয়ে কাজ করত। সম্ভবত কলদেৎ কলবার্ট এ মেয়েটির ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। মেয়েটির স্বামী যুদ্ধে গিয়েছিল এবং অনেক দিন তার খবর নেই। মেয়েটি স্বামীর অপেক্ষায় থাকে এবং রেস্তরাঁর কাজ করে। অতিথিদের আপ্যায়ন করে কখনও কখনও কিছুটা ঘনিষ্ঠও হয়, কিন্তু পুরোপুরি হয় না। এ সময় এ এলাকায় একটি নতুন লোক এল। লোকটি শহরের রাস্তাঘাট তত্ত্বাবধানের কাজে সরকারী কর্মচারী হিসেবে এসেছিল। আকস্মিকভাবে এ লোকটি প্রথম যেদিন ট্রেন থেকে নামে, সেদিন এ রেস্তরাঁয় খেতে বসে এবং পরিচারিকার সাথেও পরিচিত হয়। এভাবে প্রতিদিন লোকটি আসতে থাকে, পরিচয় ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়। মেয়েটি স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে করতে তখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে। লোকটির আমন্ত্রণে ক্রমশ মেয়েটি সাড়া দিতে থাকে। অবশেষে মেয়েটি এই লোকটির সঙ্গেই চলে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। শেষ দৃশ্যে মেয়েটি যখন লোকটির হাত ধরে রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে ট্রেন লাইন ধরে এগিয়ে চলেছে, তখন কে যেন দূর থেকে মেয়েটিকে ডাকে। মেয়েটি ফিরে তাকিয়ে দেখে যে তার স্বামী এসেছে। ছেলেটি মেয়েটির হাত ছেড়ে দেয়। মেয়েটি কিছুক্ষণ অভিভূত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। অবশেষে ক্লান্ত পায়ে

www.pathagar.com

স্বামীর দিকে এগুতে থাকে। আর প্রণয়ী লোকটি দাঁড়িয়েই থাকে। যখন মেয়েটি স্বামীর কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন লোকটি পেছনে ফিরে রেস্তরাঁর দিকে এগিয়ে যায়। রেস্তরাঁয় ঢোকার মুখে আবার মেয়েটির দিকে দেখে। মেয়েটি তখন স্বামীর কাছাকাছি এসেছে কিন্তু স্বামীর বাড়িয়ে দেয়া হাতটি তখনও ধরে নি। ছেলেটি রেস্তরাঁয় ঢুকে তাড়াতাড়ি এক কাপ চায়ের অর্ডার দেয়। গল্পটি এখানেই শেষ।

নওয়েল কাউয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় আবেদীন আমাকে সঙ্গে নিল। আমাদের সঙ্গে রইল নির্মলা দে। নির্মলা দে ইংরেজী অনুষ্ঠান করত। নির্মলা দে ছিল একজন ব্যারিস্টারের পত্নী, বিত্তশালিনী কিন্তু গৃহসংসারে বিমুখ। বালিগঞ্জে তাদের বাড়ি ছিল। কিন্তু ডালহৌসী স্কোয়ারের কাছে সে নিজের জন্যে একটি আলাদা ফ্লাট নিয়ে রেখেছিল। সেখানে সে তার পুরুষ বন্ধুদের নিয়ে কখনও কখনও রাত কাটাত। এসব ব্যাপারে তার কোনও রকম বিকার ছিল না। নওয়েল কাওয়ার্ডের ইন্টারভিউ নির্মলাই নেবে, এটাই ঠিক ছিল। আমরা যখন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে এলাম, তখন বেলা ১১টা বা সোয়া ১১টা হবে। তখন সম্ভবত জুলাই মাস। খুব গরম ছিল। আমরা দোতলায় নির্দিষ্ট কক্ষে নক করতেই দরজা খুলে গেল কিন্তু যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমি হতভম্ব হয়ে পেছনে সরে গেলাম। দেখি, দীর্ঘদেহী নওয়েল কাউয়ার্ড সম্পূর্ণ দিগম্বর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কোনরূপ বিব্রত না হয়ে আমাদের ঘরের ভেতর ঢুকতে বললেন এবং সোফার ওপর ফেলে রাখা ড্রেসিং গাউনটা জড়াতে জড়াতে বললেন, 'তোমাদের দেশে কি প্রচণ্ড গরম গায়ে জামা রাখা যায় না!' নওয়েল কাউয়ার্ডের সঙ্গে আমরা কিছুক্ষণ বসে তার অনুষ্ঠান বিষয়ে আলোচনা করলাম। যতদুর মনে পড়ে সেদিন রাতেই অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়েছিল। নওয়েল কাউয়ার্ড সাহিত্য বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করলেন না এবং এ বিষয়ে আমাদের আগ্রহ দেখে তিনি তেমন সাড়া দিলেন না। তৎকালীন সিনেমা এবং মঞ্চাভিনয় সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন, মনে পড়ে।

॥৪৪॥

তালতলায় যে বাসায় থাকতাম তার পাশেই আর একটি বাড়ি ছিল একই ধরনের। আমাদের মেস বাড়ির দোতলায় একটি মাত্র ঘর ছিল, সে ঘরের সামনে খোলা আঙ্গিনা। ছাদে বুক সমান উঁচু দেয়াল দেয়া ছিল। সেখানে চোখ রেখে বাইরের পৃথিবী দেখা যেত। পাশের বাড়ির ছাদটা ছিল অবিকল একই রকম, তবে দেয়ালটা ছিল নিচু। ছাদের একপাশে আমাদের বাসার দিকে একটি চারপায়া ফ্রেমের উপর বড় একটি খাঁচা ছিল, সেখানে একটি টিয়া থাকত। টিয়াটি বেশ পরিপুষ্ট। গলায় লাল রঙের মোটা একটি রেখা। আমি প্রায়ই দেখতাম একটি যুবতী সকালবেলা ভেজা চুলে টিয়ার কাছে এসে দাঁড়াত, টিয়াটির সঙ্গে কথা বলত এবং খাবার দিত। মেয়েটির শাড়ির আঁচল ঘাড়ের উপর দিয়ে পেঁচানো থাকত এবং আঁচলে গিঁটে একগুচ্ছ চাবি ঝুলত। মেয়েটি নড়াচড়া করত যখন, তখন চাবিটি শব্দ করত। টিয়াটি শব্দ শুনে উৎকর্ণ হত এবং মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকত। কখনও কখনও খাবার দিতে দেরি হলে টিয়াটি তারস্বরে চিৎকার করত। আমি প্রায়ই ছুটির দিনে অথবা রোববারে সকালবেলা ছাদে উঠে টিয়াটির সঙ্গে মেয়েটির অভিনয় দেখতাম।

ফররুখ এবং মতিউল ইসলাম আমার মেসে প্রায়ই আসত। একদিন এই টিয়াটির

www.pathagar.com

কথা ওদের বললাম। মতিউল ইসলাম হা হা করে হাসতে লাগল। সে টিয়াটির কথা জিজ্ঞেস করল না, বারবার মেয়েটি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল। তার ধারণা মেয়েটিকে দেখতে আমি ছাদে যাই, টিয়াটিকে নয়। ফররুখ টিয়াটিকে দেখতে চাইল। আমি ওদের দু'জনকে নিয়ে ছাদে গেলাম এবং আমরা দেয়ালের পাশে বসে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে টিয়াটিকে দেখতে লাগলাম। এ সময় মেয়েটি কাপড় শুকাতে ছাদে এল। মেয়েটির কপালে সিঁদুর। ফররুখ মেয়েটির সিঁদুরের দিকে লক্ষ্য করল এবং টিয়ার গলার লাল রেখাটিও লক্ষ্য করল। হঠাৎ যেন সে একটা কিছু আবিষ্কার করেছে।

এমনভাবে বলল, "আলী, টিয়াটি পুরুষ টিয়া"। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কি করে বোঝা গেল"? ফররুখ বলল, "টিয়ার গলাটি বেশ মোটা। তার ওপর আবার লাল রেখাটি আছে। পুরুষ টিয়ারই এরকম থাকে।" আমি অবশ্য কথাটিকে খুব গুরুত্ব দিলাম না।

আমাদের মেসের বাসার পাশেই একটি ছোট ডালপুরির দোকান ছিল। আমরা মাঝে মাঝে বেঞ্চে বসে ডালপুরি খেতাম। ফররুখ আবার একটি বিশেষ ধরনের ডালপুরি বানাতে বলত। একটু বেশি ময়দা দিয়ে ভেতরে বেশি ডাল এবং ঝাল-মশলা দিয়ে সে ডালপুরি বানাবার হুকুম দিত। এজন্য অবশ্য একটু বেশি দাম দিতে হত। এমনি ডালপুরি ছিল চার পয়সা অর্থাৎ এক আনা আর এই স্পেশাল ডালপুরির জন্য তিন আনা কি চার আনা দিতে হত। একদিন রোববার সকালবেলা ফররুখ আর আমি ডালপুরি খাচ্ছি, এমন সময় প্যান্ট-শার্ট পরা একজন লম্বাটে লোক দোকানে এল। লোকটির এক পা একটু খোঁড়া তাই টেনে টেনে হাঁটত। চেহারাটা উজ্জ্বল, কিন্তু চোখ দুটো খুব ধূর্ত। দোকানদার লোকটিকে দেখে বিরক্ত হল বলে মনে হল। লোকটি এসেই দোকানদারকে বলল, "দাওতো মহাজন, দুটো ডালপুরি।" দোকানদার বলল, "বাবু, আপনার আগের পয়সা বাকি আছে।"

লোকটি ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল, "আমি কি তোমার পয়সা মেরে দেব নাকি হে? এই নাও আগের পয়সা, এই বলে পকেট থেকে কয়েকটি আনি দোকানদারের দিকে ছুঁড়ে দিল। লোকটি চলে যেতে ফররুখ দোকানদারকে লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। দোকানদার বলল, "আর বলেন কেন বাবু, বেপাড়ার লোক এ পাড়ায় আসে ফষ্টিনষ্টি করতে। পাড়ার ছেলেদের বলে দিলে, ওর আর এক ঠ্যাং-ও ভেঙে দেবে।" দোকানদারের কাছে আরও শুনলাম যে আমাদের পাশের বাসার যে মেয়েটি টিয়াকে খেতে দিতে ছাদে আসে, সে মেয়েটির স্বামী বহুদিন যাবৎ বোম্বাই আছে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর দুঃসম্পর্কের এই ভাইটি মেয়েটির খবরাখবর নিতে আসে। ফররুখ আমার দিকে একবার তাকালমাত্র। এরপর আরও বেশ কয়েকদিন চলে গেছে, একদিন রোববার সকালবেলা আমি ছাদে উঠে আগের মতোই দেয়ালের ফাঁক দিয়ে টিয়াটি দেখছিলাম।

টিয়াটি তার খাঁচার মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। মেয়েটি তখনও খাবার দিতে আসে নি। কিছুক্ষণ পর মেয়েটি চাবির শব্দ করতে করতে খাঁচার কাছে এসে দাঁড়াল। একটু পরেই খোঁড়া যুবকটি ছাদে উঠে এল। এই প্রথমবার লোকটিকে আমি ছাদে দেখলাম। আমি হয়ত কিছুটা অন্যমনস্ক ছিলাম, হঠাৎ টিয়াটির তারস্বরে চিৎকার শুনে দৃষ্টি ফেলে দেখি, লোকটি মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করছে এবং টিয়া দৃশ্য দেখে তারস্বরে প্রতিবাদ করছে। এটাকে প্রতিবাদই বলতে হয়। সূর্যের আলো তখন মেয়েটির কপাল ছুঁয়ে টিয়ার গায়ে এসে

www.pathagar.com

পড়েছে এবং মেয়েটির সিঁদুরের রেখা টিয়ার গলার লাল রেখার সঙ্গে যেন একাকার হয়েছে। আমি পরে এই ঘটনাটি ফররুখকে বলেছিলাম। এ বিষয়ে ফররুখের একটি নিজস্ব মতামত ছিল। ফররুখ বলেছিল, পাখি অথবা প্রাণী তাদের নিজস্ব বোধ দিয়ে অথবা অনুভূতি দিয়ে তাদের নিজের জন্য একটা বিশ্বাসের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই বিশ্বাসের মধ্যেই তারা বাস করে। যদি কোনদিন এই বিশ্বাস ভেঙে যায় তবে তারা প্রতিবাদ করে। টিয়াটি মেয়েটির সঙ্গে একটি বন্ধন নির্মাণ করে নিয়েছিল। অপরিচিত পুরুষটির আগমনে সেই বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছে, তাই তার এত প্রতিবাদ। জানি না ফররুখের বিবেচনা ঠিক কিনা। তবে এই ব্যাখ্যাটি মেনে নিতে আপত্তি করবার কিছু ছিল না।

রেডিওতে চাকরি করবার সময় রেডিওর অনুষ্ঠানে অংশ নেবার জন্য অনেকে আমাকে বিরক্ত করত। এদের মধ্যে কল্যাণী নামে একটি মেয়ে সময়ে অসময়ে আমাকে এবং আহসান হাবীবকে টেলিফোন করত। মেয়েটির কণ্ঠস্বরটি ছিল খুব সুন্দর এবং মেয়েটি বোধহয় এটা জানত। তাই বোধ হয় সে দেখা সাক্ষাতের চাইতে দূর থেকে টেলিফোনে কথা বলতে ভালবাসত। কথাবার্তাও সে বলত দীর্ঘ সময় ধরে। কথাবার্তা ছিল প্রায়ই অর্থহীন অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় হলেও আহসান হাবীব টেলিফোনটা ছাড়তে পারত না। মেয়েটি মাঝে মাঝে তার সঙ্গে বেড়াতে যেতে বলত। আহসান হাবীব এ আমন্ত্রণে শংকিত হত। সে একটু ভীতু ছিল এবং শালীনতার বাইরে অগ্রসর হতে দ্বিধাবোধ করত। ফররুখ এজন্য তাকে খুব ঠাট্টা করত। বলত, "হাবীব পানিতে ডুব দেবে অথচ কাপড় ভেজাবে না, এ কেমন কথা। হয় ঠিকমত ডুব দাও, নয় একেবারে ও পথ মাড়িও না।" আহসান হাবীব বিব্রত হয়ে বলত, "না না ওসব কিছুই নয়, টেলিফোন করে তাই উত্তর দেই, এর বেশি কিছু নয়।"

একটি স্বাদু বৈকল্যের সম্ভাবনা আমরা সবাই সে সময় এড়াতে সক্ষম হয়েছিলাম। যেভাবে তখন নানাবিধ আকর্ষণ আমাদের মনকে বিচলিত করবার জন্য প্রস্তুত ছিল, সে সময় সব আকর্ষণকে উপেক্ষা করে আপন কর্মে নিমগ্ন থাকা খুবই কঠিন ছিল। আমাদের সমষ্টিগত বিবেচনা সব সময়ই আমাদের কিছু কিছু কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করত, যার ফলে সম্ভাব্য বিপদ আমরা এড়াতে সক্ষম হয়েছিলাম। অহেতুক প্রবণতা যৌবনকালে অনেক সময় জাগে, তার সক্ষম নিবৃত্তির প্রয়োজন। আমরা জাতি এবং সমাজ জীবনের একটি সন্ধিলগ্নে বাস করতাম। তাই সর্বদা সজাগ থাকতে হত, ভুল পদক্ষেপের সম্ভাবনায় শংকিত থাকতে হত।

একদিন এক ভদ্রলোক রেডিও অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ভদ্রলোক বেশ লম্বা, স্বাস্থ্যবান, গোলগাল মুখ, ফর্সা। প্যান্ট-শার্ট পরা ছিলেন। ভদ্রলোকের কাঁধে ছিল একটি চটের ঝোলা। এটাই একটু বেমানান লাগছিল। ভদ্রলোকের নাম হোসেন সাহেব। পরিচয়ে বললেন, "আমি আপনার ভগ্নিপতি– ফুপাতো বোনের স্বামী। হাওড়ার বাউড়িয়ায় থাকি। পরিচয় করতে এলাম।" অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর ভদ্রলোক তাঁর থলে থেকে কাগজ বের করলেন আমার মেসের ঠিকানা লিখবেন বলে। কাগজের সঙ্গে কয়েকটি ব্লাউজ বেরিয়ে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এগুলো কি?" ভদ্রলোক বললেন, "বাউড়িয়া থানার ওসি জামান সাহেবের মেয়ে এগুলো তৈরি করেছে। আমাকে দিয়েছে একটি প্রদর্শনীতে দেবার জন্য। থানার ওসিতো, তাই একটু খাতির রাখতে হয়। কিছু কাজকর্ম করে দিতে হয়।" কামরায় আমার বিপরীতে বসতো রণেন আচার্য, যাকে সবাই

www.pathagar.com

আচারিয়া বলতো। সে এসময় হঠাৎ উঠে এসে ব্লাউজগুলো হাতে নিয়ে বলল, "বাহ্, বেশ কাজ। তা মেয়েটির বয়স কি রকম?" হোসেন সাহেব বললেন, "এই আঠারো ঊনিশ হবে। খুবই গুণী মেয়েটি।" আচারিয়া বলল, "গুণীই তো মনে হচ্ছে। কি বলেন আলী সাহেব?" আমি বললাম, "এসব গুণ বহন করে যার আনন্দ তাকেই জিজ্ঞেস করুন।" এরপর হোসেন সাহেব প্রায়ই আসতেন। ক্রমশ সুস্পষ্ট হল যে ওসি জামান সাহেবের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে চান।

জীবনের মুক্ততার পর একটু বন্ধন আমরা সবাই মেনে নেই। একজন ইংরেজ কবি লিখেছেন যে বিয়ের বাক্যটি আকাঙ্ক্ষার সমুদ্রের মধ্যে একটি দ্বীপের মত। দ্বীপে দ্বীপে ঢেউয়ের ধাক্কা লাগে, শরীর কেঁপে ওঠে অন্ধকারে ভাসমান নৌকার মত। একটি নতুন সময়ের লীলায় জীবনে পরিবর্তন আসে।

সুনীতিবাবুকে বিয়ের দাওয়াত দিতেই তিনি ভর্তৃহরির একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে ব্যাখ্যা করলেন। "বিরুদ্ধতার সম্মুখে সাহস, ঐশ্বর্যের সম্মুখে নির্লোভ ধৈর্য, প্রশংসায় আনন্দ, প্রেমে বশংবদ এবং ধর্মগ্রন্থপাঠে বিনয়, এগুলো হচ্ছে মহৎ ব্যক্তির লক্ষণ।" আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, "আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, সেটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া হবে।"

আমার বিয়েতে অনেকে এসেছিলেন। রেডিওর বিমান ঘোষ, প্রভাত মুখার্জী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সান্যাল, আশরাফউজ্জামান, জয়নুল আবেদীন, সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে ফররুখ, সিকান্দর আবু জাফর, রশীদ করীম। শওকত ওসমান যেতে পারে নি কিন্তু মাসখানেক পরে এক সপ্তাহ বাউড়িয়ায় আমার সঙ্গে ছিল। গঙ্গার তীরে বৃক্ষসমাকীর্ণ শান্ত ছায়ায় বিবাহ উৎসবটি আমার জন্য একটি নতুন জীবনের দ্বার উদ্ঘাটন করেছিল। সেদিন ছিল ৭ই জুলাই ১৯৪৬ সাল।

বিয়ের পর কনে দেখার মুহূর্তে ক্রন্দনরতা নত-দৃষ্টির মেয়েটির ডান হাত আমি আমার কম্পিত হাতে গ্রহণ করেছিলাম। আমার স্নায়ুতে আশ্বাস এবং নির্ভরতার একটি শিহরণ অনুভব করেছিলাম। রেডিওর শিশু-অনুষ্ঠানের পরিচালিকা ইন্দিরাদি একটি লালপেড়ে গরদের শাড়ি উপহার দিয়েছিলেন আমার স্ত্রীকে। বলেছিলেন "লাল রং একটি উচ্ছলতার প্রতীক। তোমাদের দাম্পত্য জীবন এই লাল রং-এর মতই প্রাণবন্ত ও উচ্ছল থাকুক এটাই কামনা করি।" বিখ্যাত উর্দু কবি খান বাহাদুর রেজা আলী ওহাসাৎ বলেছিলেন "জিন্দেগী বছর করনে কি লিয়ে ঔর জিন্দেগীকো সমঝনে কি লিয়ে শাদী জরুরৎ হ্যায়।" অর্থাৎ জীবনযাপন এবং জীবনকে অনুভব করার জন্য বিয়ের প্রয়োজন আছে। আরও অনেকে কল্যাণ ও স্বস্তিবচন উচ্চারণ করেছিলেন। উচ্চারণগুলো প্রথাগত, কিন্তু ভালোলাগাটা ব্যক্তিগত। এই ব্যক্তিগত ভালোলাগাকে সম্বল করে একসঙ্গে বহুদিন আমরা পৃথিবীর বুকে পা ফেলেছিলাম।

আজ নিঃসঙ্গতায় জর্জরিত মুহূর্তে সেদিনের সে ভালোলাগাকে স্মরণ করছি।

॥৪৫॥

যে সময়ের কথা বলছি তখন ভারতের ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর অস্থিরতার কাল। আমরা রেডিও অফিসে বসে এই অস্থিরতার ঝাপটা অনুভব করতাম। বিভিন্ন ধরনের

www.pathagar.com

লোক এখানে আসতো বিভিন্ন ধরনের মনোবৃত্তি নিয়ে এবং তারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা এবং স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকতা কি তা নিয়ে কথা বলত। আমার খুব সুস্পষ্ট মনে আছে, সরোজকুমার রায় চৌধুরী নামক একজন লেখক আমাদের এখানে প্রায়ই আসতেন, গল্প করতেন। ভদ্রলোক বেশ মোটাসোটা, গোলগাল মুখ, শ্যামলা রং। দু নাকে প্রচুর নস্যি নিতেন এবং কোচার খুঁট দিয়ে নাক মুছতেন। কথা যখন বলতেন তখন কিছুটা নাকি সুর ধরা পড়ত। একদিন এসে বললেন, 'জানেন আলী সাহেব, জিন্নাহ হচ্ছে ব্রিটিশের দালাল'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি তাহলে কিসের দালাল?' সরোজ বাবু রাগত স্বরে বললেন, 'আমি কেন দালাল হব?' আমি বললাম, 'এই জন্য হবেন যে দালাল না হলে আর একজন দালালকে আপনি চিনলেন কি করে?' এর পরে দেশে কয়েকটি ঘটনা ঘটে। ভারতবর্ষে তখন ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে একটি ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব এসেছে। মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এর পরে কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের এমন একটি ব্যাখ্যা প্রদান করে যাতে ভারতীয় মুসলমানদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। মুসলিম লীগ তখন তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে। পুনর্বিবেচনার পর তারা সামগ্রিকভাবে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে এবং পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সারা দেশব্যাপী ১৬ অগাস্ট তারিখে 'ডিরেক্ট এ্যাকশন ডে' উদযাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ডিরেক্ট এ্যাকশন ডে অর্থাৎ সক্রিয় কর্মদিবস উপলক্ষে সারা দেশে হরতাল হবে এবং সভা সমিতি হবে, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঠিক একই সময় ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর পরই কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং বড় লাট কর্তৃক আহূত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করে। এই সমস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের জীবনে একটা বিক্ষুব্ধ অবস্থা বিরাজমান ছিল। কখনও সওগাত অফিসে কখনও মাসিক মোহাম্মদী অফিসে এই সমস্ত বিষয় আলোচিত হত এবং আমরা প্রবল উত্তেজনার মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করতাম।

১৫ আগস্ট তারিখে রেডিওর স্টেশন ডিরেক্টর সোমনাথ চীব আমাদের সবাইকে ডেকে একটি আলোচনায় বসলেন। আলোচনায় সাব্যস্ত হল যে ১৬ আগস্ট তারিখে পুরোপুরি ছুটি থাকবে এবং যারা গারস্টিন প্লেসের নিকটে থাকেন তারাই শুধু ট্রান্সমিশন পরিচালনার জন্য ১৫ তারিখ রাত থেকেই রেডিও অফিসে অবস্থান করবেন। মিটিং শেষে নৃপেনদা আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, তুমি আজ রাতেই কলকাতার বাইরে চলে যাও। কাল খুব গোলমাল হবে বলে আমি শুনছি। তিনি সুস্পষ্টভাবেই আমাকে বললেন যে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুরা সংঘবদ্ধ হচ্ছে এবং এর ফলে একটি প্রচণ্ড হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধবে সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত। রেডিও অফিসের আরও অনেক হিন্দু কর্মচারীর কথাবার্তায় আমি আভাস পেলাম যে পরের দিন অর্থাৎ ১৬ তারিখে মুসলমানরা যখন মিছিল করে মনুমেন্টের কাছে যাবে সে সময় অরক্ষিত মুসলিমগৃহ হিন্দুরা আক্রমণ করবে। রেডিওর জয়নুল আবেদীনকে এসব কথা বলতে তিনি খুব চিন্তিত হলেন। তার সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের যোগাযোগ ছিল কিন্তু ১৫ তারিখ রাত্রে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে কোথাও পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার সময় আমি চিন্তিতভাবে তালতলার মেসে ফিরে গেলাম। একটু পরে ফররুখ এল, মতিউল ইসলাম এল, তাদের

www.pathagar.com

সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলাম। ফররুখ আমার ভয়ের কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। সে বলল, হিন্দুরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। ফররুখ ১৬ আগস্ট উপলক্ষে একটি কবিতা লিখেছিল, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। কবিতাটি আবেগবহুল এবং উদ্দীপনাময়। কবিতাটি পরের দিন আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল মওলানা আকরম খাঁর নামে। পরবর্তীতে এ নিয়ে একটি জটিলতার সৃষ্টি করেছিল।

১৬ আগস্ট সকাল বেলা আমি প্যান্টশার্ট পরে ছোট একটি ব্যাগ হাতে নিয়ে হাওড়ার দিকে চললাম। তখন সকল পথ জনমানবশূন্য। ওয়েলেসলীর রাস্তায় ট্রাম নেই। ট্রাম লাইনের ওপরের তারে কাক বসে আছে। ধর্মতলার সকল দোকানপাট সম্পূর্ণ বন্ধ। আমি কমলালয়ের পাশ দিয়ে অ্যাসপ্লানেডে এলাম। সেখান থেকে ডালহৌসী হয়ে হাওড়া ব্রীজ। হাওড়া ব্রীজে প্রথম একদল মুসলমানকে মিছিল করে শহরের দিকে আসতে দেখা গেল। ব্রীজ পার হয়ে হাওড়া স্টেশনে বাউড়িয়ার টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসলাম। যত সহজে কথাটি বললাম ঠিক তত সহজ এবং নিশ্চিন্তায় এতটা পথ এগিয়ে যেতে পারি নি। আমার বিশ্বাস ছিল যে মিছিল বেরুনোর পরই গোলযোগ আরম্ভ হবে তার আগে নয়, সুতরাং মিছিল বেরুনোর আগেই আমাকে বাউড়িয়ায় পৌঁছে যেতে হবে। পথে কোনো যানবাহন পাইনি তাই আমাকে হেঁটে যেতে হয়েছে। সে সময় আমি খুব হাঁটতে পারতাম। বাউড়িয়ায় আমাকে দেখে আমার শ্বশুর শাশুড়ী খুবই আশ্বস্ত হলেন। পরের দিন কলকাতায় কি ঘটবে তা নিয়ে সকলেই চিন্তিত ছিলেন। অনেক রাত্রে বাউড়িয়া থানায় খবর এল যে গঙ্গা নদী দিয়ে অনেক মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে

রাত তিনটে কি চারটের দিকে আমার শ্বশুর এ খবর পেয়ে পুলিশ সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে গেলেন। আমিও তার সঙ্গে গেলাম। তখন আকাশে আলো দেখা দিয়েছে। বাউড়িয়ার প্রধান রাস্তাটা গঙ্গার তীরে। সেখানে দাঁড়িয়ে গঙ্গার স্রোতের দিকে তাকিয়ে শুধু দরিদ্র মুসলমানের মৃতদেহ দেখতে পেলাম। শংকিত এবং বিক্ষুব্ধ চিত্তে ঘরে ফিরে এলাম। মুসলমানরা যখন মিছিল করে প্রতিবাদ সভায় গেল সেই সুযোগে কলকাতা শহরে যে তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হল তা ভারত ইতিহাসের এক কলংক। অরক্ষিত মুসলমান গৃহগুলি হিন্দুদের আক্রমণে ধ্বংস হল এবং মুসলিম হত্যার যে নরাধম যজ্ঞ আরম্ভ হল তার মতো ঘৃণ্য এবং পাশবিক ঘটনা ভারতের ইতিহাসে ঘটেছে কিনা সন্দেহ আছে। কলকাতায় এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অগ্নিদাহন, নারীহরণ এবং নারী ধর্ষণও ছিল। ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল কলকাতার দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকা যখন দেখতে এসেছিলেন তখন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার লোকেরা ওয়াভেলের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছিল। একজন প্রশ্ন করেছিল, এ দাঙ্গার জন্য দায়ী কে? আর সবাই সমস্বরে উত্তর করেছিল, লর্ড ওয়াভেল।

বীভৎসতার প্রেক্ষাপটের বাইরে বাউড়িয়ায় প্রায় এক সপ্তাহ আমি আবদ্ধ ছিলাম। কলকাতায় ফিরে এসে রেডিও অফিসে অন্য একটি দুর্ঘটনার মুখোমুখি হলাম। তখন মহাহত্যাকর্মটি কিছুটা থিতিয়ে এসেছে। আমি ভয়ে ভয়ে আফিসে আসছি। এ সময় ইন্দু সাহা নিহত হয়। ইন্দু সাহা ও অমর এরা দুজন ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু অকস্মাৎ প্রেমের একটা অঘটনে এরা একে অন্যের রাইভেল হয়ে বসে। একদিন ইন্দু এবং অমর এক সঙ্গে বেরিয়ে গেল দেখলাম, ঘণ্টাখানেক পর অমর ছুটে এসে খবর দিল ইন্দুকে মুসলমান গুণ্ডারা হত্যা করেছে। পোস্টমর্টেম হয়ে দুদিন পর ট্রাকে করে লাশ গারস্টিন

www.pathagar.com

প্লেসে আনা হল শেষ দর্শনের জন্য। আমি এবং আবেদীন নিচের তলায় একটু দূরে সবার থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় কোত্থেকে নৃপেনদা এসে আমাদের দুজনকে প্রায় টানতে টানতে ওপর তলায় একটি ঘরে বন্ধ করে রাখলেন। আমরা কিছু না বুঝে ভয়ে অস্বস্তিতে সময় কাটাতে লাগলাম। লাশ চলে যাবার পর নৃপেনদা দরোজা খুলে দিলেন। বললেন, 'তোমরা কি নির্বোধ বল তো? যদি অঘটন ঘটত, জানো, ইন্দুকে তো হত্যা করা হয়েছে। পথ পরিষ্কারের জন্য। এখন তো অমরের জন্য কোনও সংকট রইল না। যারা এভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সুযোগে নিজের পথ নিষ্কণ্টক করতে পারে তারা ইচ্ছে করলে সাম্প্রদায়িক বিষয়টাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রতিশোধের ভান করে হঠাৎ গিয়ে তোমাদের দুজনকেও তো আক্রমণ করতে পারত।' সেদিন নৃপেনদাকে নির্লিপ্ত দেখিনি, একজন সজাগ-সচেতন মানুষ শুধু মানবতার দাবীতে আমাদের দুজনকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

কলকাতায় দাঙ্গা প্রশমিত হলেও মাঝে মাঝে অঘটন ঘটেই চলেছিল। যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছিল সে বিদ্বেষ থেকে মানুষকে কোনও প্রকার সম্প্রীতিতে টেনে আনা সম্ভব হচ্ছিল না। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সে সময় ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। বলেছিলেন যে বেয়নেটের সাহায্যে ব্রিটিশরা যদি ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সমর্থন যোগাতে থাকেন তবে সে অবস্থায় সহ্য করবার শক্তি মুসলমানদের আছে। তবে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটবৃটেন এবং রাশিয়ার সম্পর্কের যদি কখনও অবনতি ঘটে তবে সেই সংকটকালে মুসলমানদের মনোভাব যে কি হবে তা এখন বলা কঠিন। জিন্নাহর এই সতর্কবাণী ব্রিটিশ সরকারকে সচকিত করেছিল এবং তারা মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে লন্ডনে এক কনফারেন্সে আহ্বান করেছিলেন।

॥৪৬॥

কলকাতায় মহাহত্যাযজ্ঞ আমার সাংস্কৃতিক চিন্তার মধ্যে একটি বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। আমি সব সময় জেনেছি যে মানুষের পরিচয় মানুষ হিসেবে, জাতি বা রাষ্ট্র হিসাবে নয়। শৈশবে পিতার মুখে শুনতাম যে পৃথিবীতে প্রত্যেক শিশু ইসলামের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ জন্মসূত্রেই প্রতিটি মানুষ শান্তি ও মানবতার অধিকার পায়। ক্রমশঃ সে বড় হয়, তখন তার পরিমণ্ডল তাকে লালন করে–তার পরিবর্তন ঘটায়। সুতরাং ইসলামের শান্তির এবং মানবতার মধ্যে একজন জন্মগ্রহণ করলেও বড় হয়ে সে হয়ত হিন্দু হয়, বৌদ্ধ হয় বা খৃস্টান হয়। বাবা বলতেন যে, যদিও মানুষের সামাজিক এবং ধর্মীয় পরিবর্তন হয় তবু সে জন্মসূত্রের অধিকার হারায় না। অর্থাৎ সে জীবনে যে কোন সময় ইচ্ছা করলে আবার ইসলামের পরিমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারে। বাবার এই দার্শনিক বিশ্লেষণ আমার ভাল লাগত এবং আমি বাবার জীবনযাপন-পদ্ধতির মধ্যে কখনও ভেদবুদ্ধির স্বীকৃতি দেখি নি। হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান নির্বিশেষে সকলকে তিনি একই পর্যায়ভুক্ত করে দেখতেন। তার বন্ধুবান্ধবদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। কলকাতার এই মহাহত্যাযজ্ঞ আমাদের জীবনে বিরাট একটি ভেদবুদ্ধির জন্ম দিল। কলকাতার পরপরই বিহারে ভয়াবহ দাঙ্গা হল। বিহারের পর নোয়াখালীর দাঙ্গার সংবাদ পেলাম। মাখনলাল

www.pathagar.com

বন্দোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। তিনি রেডিওতে প্রায়ই আসতেন। ভদ্রলোককে আমার কখনও জ্ঞানী এবং পণ্ডিত বলে মনে হয়নি। আমার কাছে তার বোধশক্তিও নিম্নমানের মনে হত। ভদ্রলোকের বাড়ি ছিল নোয়াখালী। নোয়াখালীর দাঙ্গার বিস্তারিত বিবরণ তিনি একদিন আমাকে দিলেন। তিনি বললেন, 'জানেন আলী সাহেব, নোয়াখালীতে মুসলমানরা হিন্দুদের গোমাংস খাইয়েছে এবং মুসলমান বানিয়েছে।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু হত্যা তো করে নি।' তিনি বললেন, 'হত্যা করলে তো ভালই হত। ধর্মের জন্য প্রাণ যেত। কিন্তু এতো চরম সর্বনাশ।' আমি তখন বুঝলাম ইসলামের প্রতি হিন্দু সমাজের বিদ্বেষ কত প্রচণ্ড। এর কারণ বোধ হয় এই যে একজন মানুষ ইসলামের ছত্রচ্ছায়ায় এলে সঙ্গে সঙ্গেই তার আচরণবিধির পরিবর্তন ঘটে এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নতুন একটি বিশ্বাসের জন্ম হয়। সে বিশ্বাসটি একটি আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতমণ্ডিত। এবং তাই সর্বাংশে ভারতীয় নয়। শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে এই চিন্তাটা খুবই প্রবল, অন্ততপক্ষে ৪৬ সালে খুবই প্রবল দেখেছি। ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে মানুষকে বিচ্ছিন্নকরণের যে বিপুল প্রক্রিয়া তখন চলছিল, সেই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

সুতরাং আত্মরক্ষা এবং স্বার্থরক্ষার জন্য মুসলমানদের চেষ্টা করতে হয়েছিল। আমি সেই সময় কবি সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই এই ব্যাপারে আলোচনা করেছি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে বঙ্গভূমির পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের বিচ্ছিন্নকরণ পছন্দ করেন নি। শুধু সুধীনদত্ত বলেছিলেন, 'হয়ত বা রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে বাঙ্গালী মুসলমানরা নতুন একটি সাহিত্যের জন্ম দিতে পারবে।' কিন্তু বুদ্ধদেব বসু অন্য রকম ভাবতেন। তিনি বলেছিলেন, 'সাহিত্যে পাকিস্তান অসম্ভব। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে হিন্দু বিশ্বাস এবং সংস্কৃতি এত বেশি ওতপ্রোত যে এগুলোকে বাদ দিলে কোনো সাহিত্যই গড়ে উঠতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিতে গিয়ে আমি বলব, তিনি আমাদের সিদ্ধিদাতা গণেশ এই একটি কথায় সব কথাই বলা হল। এটাই আপনি অন্য কোনোভাবে প্রকাশ করতে পারবেন কি।'

ফররুখ আহমদ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই চিন্তায় খুবই উৎসাহিত বোধ করত। ফররুখের কাব্য প্রক্রিয়ায় একটি বিশ্বাসের উন্মুখরতা ছিল। দুর্গম পথযাত্রায় তৃপ্তি, সমুদ্র পথে নতুন দ্বীপভূমি আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা, রাত্রির অন্ধকার এবং বিভীষিকা অতিক্রম করে একটি স্বপ্নরাজ্যে উপস্থিত হওয়ার কল্পনা–এ সমস্ত আবহে ফররুখ আহমদের কবিতা বুদ্ধদেব বসুর হিন্দু আবহের পরিমণ্ডল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ফররুখ আহমদ তার 'সাত সাগরের মাঝি কাব্যগ্রন্থে বাংলা কবিতার জন্য একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছিল। আমাদের জীবনে সে সময় যে নতুন সম্ভাবনাময় পৃথিবীর জন্ম হচ্ছিল সেখানে ফররুখ একটি সুকুমার মোহমুগ্ধতার সৃষ্টি করেছিলেন।

একদিন তালতলার মেসে বিকেল বেলা পীযূষ এসে উপস্থিত। পীযূষ অর্থাৎ কবি পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়। পীযূষ এখন আর জীবিত নেই। পীযূষ একটি বার্ষিকী প্রকাশ করবার পরিকল্পনা নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। বার্ষিকীর নাম দিয়েছিল 'পৃথিবী'। বার্ষিকী

www.pathagar.com

পরিকল্পনার কথা আমার সামনে উপস্থিত করে সে বলেছিল। 'আলী সাহেব, সম্মিলিত সাহিত্য চর্চার এই বোধ হয় শেষ। চতুর্দিকে যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হয় এই দেশে হিন্দু মুসলমান আর মিলিতভাবে বসবাস করবে না। তবে একদিক থেকে হয়ত ভালই হবে। হিন্দুদের একটি পরিবর্তন আসতে পারে। তারা আর মুসলমানকে প্রতিপক্ষ ভেবে সাহিত্য সৃষ্টি করবে না। কিছুটা আন্তর্জাতিক হওয়ার প্রয়াসী হবে।

অন্যদিকে মুসলমানরাও হিন্দু আবহ থেকে মুক্ত হয়ে একটি নতুন সাহিত্যের জন্ম দিতে পারবে।' ১৯৪৭-এর পর থেকে পীযূষের সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পীযূষের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল, আনন্দবাজার অফিসে। তারপর গত বছর তার মৃত্যুসংবাদ পাই। পীযূষ অত্যন্ত উদার, বুদ্ধিমন্ত এবং মানবীয় বোধসম্পন্ন পুরুষ ছিল। দেশ বিভাগের পূর্বে আমি যখ·ন অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকরি করতাম, তখন সে আমার এখানে প্রায়ই আসত। সে সময় আরও একজন তরুণ কবি আমার ওখানে আসতো। তার নাম নরেশ গুহ। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন সংস্কৃতিবান পুরুষ হিসাবে তাকে আমি দেখেছি। নরেশ গুহ সম্পর্কে সে সময় বুদ্ধদেব বসু আমাকে বলেছিলেন, 'নরেশ গুহ সুন্দর কবিতা লেখে, তার কবিতাগুলো বেশ মিষ্টি স্বাদের।' রেডিওতে বিদ্যার্থিমণ্ডল এবং সাহিত্য বাসরে কখনও কখনও কবিতা পাঠের ব্যবস্থা থাকত। সেখানে কবিতা পাঠের জন্য তরুণ কবি কাদের ডাকা যায়, এ অনুসন্ধানের উত্তরে বুদ্ধদেব বসু নরেশগুহ সম্পর্কে এই কথাগুলো বলেছিলেন। নরেশ গুহ বর্তমানে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র অধ্যাপক।

কলকাতায় দেশ বিভাগের পূর্ব মুহূর্তে যে সমস্ত মুসলমান রয়ে গেল তাদের মধ্যে একজন বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির কথা আমার বেশ মনে পড়ে। ভদ্রলোকের নাম রেজাউল করিম। তিনি নিয়মিতভাবে আনন্দবাজার, প্রবাসী, বসুমতি ইত্যাদি পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রমাণ করবার চেষ্টা করতেন যে, হিন্দুদের মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িকতা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র একজন উদার পুরুষ ছিলেন। কংগ্রেস একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। ভদ্রলোক কংগ্রেসের বেতনভুক লেখক ছিলেন। তার কথা মনে থাকার কারণ, তার বিশেষ আকৃতি এবং পোশাক। তার বিপুল দাড়ি ছিল, অশোধিত দাড়ি। ধুতি পরতেন। এমনিতে ভদ্রলোক অত্যন্ত নিরীহ এবং দুর্বল ছিলেন। রেডিওতে আমার যোগ দেবার পূর্বে তিনি নিয়মিতভাবে কথিকা পাঠ করতেন। আমি যোগ দেবার পর তাকে নতুনভাবে রেডিওর চুক্তিনামা দেয়া হয় নি। পুরনোদের মধ্যে একমাত্র এস ওয়াজেদ আলী এবং শাহাদত হোসেনকে আমি রেখেছিলাম এবং নতুন অনেকের আগমন ঘটেছিল।

কলকাতার মহাহত্যাযজ্ঞের পর একদিন রেজাউল করিম আমার তালতলার মেসে একটি অনুযোগ নিয়ে এসেছিলেন। তার অনুযোগ ছিল যে তিনি আর রেডিওতে কথিকা প্রচারে সুযোগ পাচ্ছেন না। আমি উত্তরে বলেছিলাম, 'আপনি যে ধরনের কথিকা প্রচার করতেন তার সুযোগ এখন আর নেই। এখন নতুন ধরনের কথিকা আমরা প্রচার করছি। যেখানে আপনি ঠিক মানানসই হবেন না।' ভদ্রলোক মনঃক্ষুণ্ন হয়ে চলে গিয়েছিলেন।

১৯৪৬ সালেই সর্বদেশে যে বিপুল পরিবর্তন এল সে পরিবর্তনের পটভূমিতে অবস্থান করে কেউ নিজেকে নিরপেক্ষ বলে দাবী করার সাহস করতো না। বিচ্ছিন্ন হওয়াকেই আমরা সকল বিরোধ নিষ্পত্তির সমাধান হিসাবে মেনে নিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

আমরা ভাষা যখন ব্যবহার করি তখন আপন অনুভূতিকে প্রকাশ করবার জন্য তা ব্যবহার করি অথবা অন্য লোকের মনোরঞ্জনের জন্য তা ব্যবহার করি অথবা কোনও ঘটনা বা অবস্থানকে বর্ণনা করবার জন্য তা ব্যবহার করি। এই তিনটি ব্যবহারের মধ্যে উচ্চারণগত এবং আঙ্গিকগত পার্থক্য আছে। আমি সর্বদাই আপন অনুভূতি প্রকাশকে গুরুত্ব দিয়েছি। আমরা প্রতিদিন সময় অতিক্রম করি দিন চলে যায় রাত্রি আসে, আবার রাত্রি চলে যায় দিন আসে। এভাবে কালস্রোতের ধারায় আমরা সময়কে হারাই। একমাত্র অনুভূতি এবং উপলব্ধির সাহায্যেই সময়ের এই পরিবর্তনটি বোধের আয়ত্তে আসে। কলকাতায় ১৯৪৬ সালে সময়ের এই পরিবর্তনটি আমি অনুভব করছিলাম। ভাববার চেষ্টা করছিলাম যে এদেশের বিচিত্র মানুষের বিভিন্ন দলগত অভিপ্রায় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ঘটাতে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছা এবং অহমিকারও পটভূমি পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। একজন শিল্পী এ অবস্থায় কি করবেন? এই প্রশ্ন আমার মনে একটি প্রধান প্রশ্ন হয়ে উপস্থিত হচ্ছে। আমি কখনও কোনও গোত্রগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে বাস করতে শিখিনি, আমার কল্পনা ছিল অপরিসীম এবং আমি আমার জন্য আমার অনুভূতির ক্ষেত্রে একটি নিজস্ব ভূমণ্ডল নির্মাণে ব্যস্ত ছিলাম।

শিল্পক্ষেত্রে যামিনী রায়কে দেখেছি, তিনি প্রথাগত আলিম্পন অস্বীকার করে একটি নিজস্ব অনুভূতির রাজ্য নির্মাণ করেছিলেন। তার ছবিতে মডেলিং নেই, আলোছায়ার খেলা নেই, শুধু দ্বিমাত্রিক রেখার টানে এক একটি বিশ্বাস মূর্ত হয়েছে। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেমন আবেগ বা অনুভূতিকে প্রকাশ করা শব্দের একটি লক্ষ্য চিত্রকলার ক্ষেত্রেও অন্তর্লীন ভাবাবেগকে উৎসাহিত এবং জাগ্রত করা যামিনী রায়ের রেখাঙ্কনের লক্ষ্য। হস্তলিখন বা ক্যালিগ্রাফীতে রৈখিক যে অভিনিবেশ থাকে যামিনী রায়ের ছবিতে আমরা সেই অভিনিবেশ লক্ষ্য করি। তার উদ্দিষ্ট হল একটি অনুভূতি পশ্চাদভূমি অথবা আনুষঙ্গিক পরিবেশন নয়, উদ্দিষ্ট বস্তুকে তিনি তার রেখার সাহায্যে পূর্ণতা দিয়েছেন। আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রেও শব্দ ব্যবহারের এই পরিবর্তনটা ঘটতে যাচ্ছিল। সে সময় রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা খুব বেশি অভিভূত করে নি। আমি যামিনী রায়ের ছবিগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতাম, এবং ভাববার চেষ্টা করতাম যে, কবিতার শব্দরাজ্যে এই রেখাঙ্কনের প্রতিবিম্ব নির্মাণ করা যায় কিনা। যামিনী রায়ের বান্ধব যারা ছিলেন তাদের মধ্যে বিষ্ণু দে যথার্থই কবিতার রূপকল্পে একটি পরিবর্তন এনেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু যদিও যামিনী রায়ের একজন নিকটতম প্রশংসাবাদ উচ্চারণকারী ছিলেন কিন্তু বুদ্ধদেবের কবিতার মধ্যে প্রথাগত অতিকথন এবং বাহুল্য ও বিস্তার এত অধিক পরিমাণে ছিল যে যামিনী রায়ের রেখাঙ্কনের সঙ্গে তার মোটেই কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

উচ্চারণের অন্য যে বৈশিষ্ট্যের কথা আমি বললাম, পাঠকের মনে বা শ্রোতার মনে আবেদন সৃষ্টি করে সেটাকে কিন্তু আমি কখনও কাব্য সৃষ্টির মূললক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করি নি। পাঠককে অভিভূত করবার ইচ্ছায় কাব্য নির্মাণের যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় তা কবিতাকে উপস্থিত ক্ষেত্রে আবেদনমুখর করে কিন্তু কখনই গভীর ব্যঞ্জনাবহ করে না।

www.pathagar.com

আমি আমার কবিতার এই সহজ আবেদনের দিকটাকে পরিহার করেছি অনেকভাবে। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল, কবিতায় আমার নিজস্ব কণ্ঠস্বরকে আবিষ্কার করা। প্রথম দিকে লঘু ছন্দ চাপল্যে এবং বিদেশী শব্দের সঙ্গে বাংলা শব্দের ধ্বনিসাম্য নির্মাণ করে যে সমস্ত কবিতা লিখেছিলাম সে কবিতাগুলোর উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে বাংলা কবিতায় একটি পরিবর্তন নির্মাণ করা। এই পরিবর্তন নির্মাণ করতে গিয়ে দেখলাম যারা আমার কবিতার প্রশংসা করছেন, তারা যথার্থ দৃষ্টিতে কবিতার পাঠক নন। তারা একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের জন্য একটি নতুন বিশ্বাস ও অলঙ্কারের রাজ্য তৈরি করার কথা ভাবছেন। সে রাজ্যে আমার অধিকার জন্মেছিল ঠিকই কিন্তু আমার নিজের কাব্যকুশলতায় আমি তখন সন্তুষ্ট হতে পারি নি। ফররুখের ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। সে একটি বিশ্বাস এবং তত্ত্বকে আগ্রহের সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছিল এবং সে জন্য একটি বিশেষ ধরনের শব্দের ভূমণ্ডল নির্মাণ করেছিল।

আমি এক সময় কবিতায় প্রচুর আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছি একটি বিশেষ পরিমণ্ডল নির্মাণের উদ্দেশ্যে। এ শব্দগুলোর যে ধ্বনিবৈচিত্র্য কবিতার ছন্দে এবং প্রবহমানতায় প্রভাব বিস্তার করেছে তার সঙ্গে বাংলা শব্দের ধ্বনি সাযুজ্য ছিল অর্থাৎ বাংলা শব্দের যে ধ্বনি সম্পর্কে আমি অবহিত ছিলাম তার সঙ্গে যেসব আরবী ফারসী শব্দের ধ্বনিগত সমান্তরালতা ছিল আমি সে সমস্ত আরবী-ফারসী শব্দই ব্যবহার করেছি সেসব শব্দ তাদের নিজস্ব লৌকিক এবং ঐতিহাসিক রূপকল্পে এবং ব্যঞ্জনায় আমার কাছে উপস্থিত হয় নি। সেসব শব্দের ভাষাগত অর্থের বিস্তার এবং গভীরতা সম্পর্কে আমার কোনও জ্ঞান ছিল না।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত আমি অনেক কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছি 'মক্কা মোয়াজ্জামার পথে', 'মহররম', 'কোরবানী' এ সময়কার কয়েকটি কবিতার নাম দেখেই বোঝা যাবে বিষয়ের সঙ্গে ব্যবহৃত শব্দের একটি সম্পর্ক ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগের কয়েকটি ঘটনা এবং আবেগকে শব্দের সাহায্যে উপস্থিত করবার চেষ্টায় আমি কিছু সংখ্যক আরবী-ফারসী বিশ্লেষণ এবং নামবাচক শব্দের প্রয়োগ করেছিলাম। দু'একটি ফারসী ক্রিয়াপদও ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রথমত বিষয়ের কারণে অর্থাৎ যে পরিবেশ সৃষ্টি করা আমার কাম্য ছিল সে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কিছুসংখ্যক আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োজন হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি প্রয়োজন আমি অনুভব করেছিলাম ধ্বনিবৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য এবং চরণান্তের যমক সৃষ্টির জন্য অনেক বিদেশী শব্দ আমি গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এ ব্যবহারে আমি সান্ত্বনা পাই নি। আমি এ শব্দগুলোর সীমাবদ্ধতা অনুভব করেছি এবং দেখেছি যে আমার শব্দের অধিকারের মধ্যে এরা কোনক্রমেই আমার আয়ত্তগত নয়। এক সময় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। তারা কিন্তু ব্যবহারের দ্বারা বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও বিস্তার সৃষ্টি করতে পারেন নি, একমাত্র নজরুল ছাড়া। নজরুল ইসলাম শব্দের ধ্বনিগত তাৎপর্যের ওপর নির্ভর করে বাংলা কবিতার জন্য ছন্দের হিল্লোল সৃষ্টি করেছিলেন। তার 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম'-এর সাক্ষ্য বহন করে। তিনিও আরবী-ফারসী শব্দের নিজস্ব লৌকিক এবং ঐতিহাসিক সত্তা সম্পর্কে

www.pathagar.com

অবহিত ছিলেন না, কিন্তু শব্দগুলোর ধ্বনিমাধুর্য তাকে উন্মনা করেছিল এবং তার পরিচিত বাংলা ধ্বনির সঙ্গে তাদের সাযুজ্য নির্মাণ করে তিনি তার কবিতায় একটি অনবদ্য ধ্বনিহিল্লোল সৃষ্টি করেছিলেন। আরবী-ফারসী ভাষার ওপর নজরুল ইসলামের প্রচণ্ড কোনও অধিকার ছিল না। সুতরাং একমাত্র ধ্বনিগত আবহের দ্বারাই তিনি রোমান্টিক রসাশ্রিত ভাবাবেগপূর্ণ কবিতা রচনায় সফলকাম হয়েছিলেন। আলোকোজ্জ্বল একটি প্রাসাদকে বাইরে থেকে দেখে অভিভূত হওয়া যায়, আনন্দিত হওয়া যায়, কিন্তু সে আলো যে কত বিচিত্র বর্ণের সংমিশ্রণে একটি বিশেষ উজ্জ্বলতায় বিকশিত, আলোর সেই উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার দরুন আমরা শুধু আলোর উচ্ছলতায় দৃষ্টিকে আপ্লুত করেছি।

কাব্যক্ষেত্রে ফররুখের পদক্ষেপ কিন্তু সুনিশ্চয় ছিল। আধুনিক কবিতায় বিচিত্র কৌশলকে সে কখনই উল্লেখযোগ্য বলে স্বীকার করে নি। চিত্রকলার কথা উত্থাপন করলে বলেছে, 'ছবি তো আঁকবো আমি, চিত্রকর আমার ছবি পড়ে তার রঙের ছবি আঁকবে। চিত্রকরের ছবি আঁকা দেখে আমি কবিতার শব্দ সাজাব না। রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মিল আছে? মোটেই না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তার নিজস্ব ছবি নির্মাণ করেছে। কিন্তু তার চিত্রকলা তার কবিতায় ছাপ রাখতে পারে নি।' ফররুখের এই সুনিশ্চয় ভঙ্গি তার নিজের কাব্যধারার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল আমি সে সময় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। চতুর্দিকে আধুনিকতার নানাবিধ প্রয়াস, যেমন শিল্পকর্মে তেমনি কবিতায়। সেসব প্রয়াসের দ্বারা আমি অভিভূত ছিলাম। আবার সঙ্গে সঙ্গে আপন ঐতিহ্য সন্ধানে বিশেষভাবে মুসলমান হিসাবে আমার অস্তিত্ব সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলাম। সে সময় আমি এ উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারি নি। তাই আমার দ্বিধা। তবে একটি ধারণা আমার সে সময় বদ্ধমূল হয়েছিল আমরা যে ধরনেরই কবিতা লিখি না কেন এবং যে ভঙ্গিতেই তা আত্মপ্রকাশ করুক না কেন,আমাদের সকলের কবিতাই আত্মগত সংস্থিতিতেই এই কবিতাগুলির যা কিছু মূল্য।

॥৪৮॥

'আমি সাক্ষ্যস্বরূপ উপস্থিত করছি যা তোমাদের দৃষ্টিতে পতিত হচ্ছে এবং সে সমস্ত কিছু, যা তোমাদের দৃষ্টির বাইরে থাকছে। যে শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে সে উচ্চারিত শব্দ একজন সম্মানিত প্রেরিত পুরুষের। এই শব্দ কোন কবির উচ্চারিত ধ্বনি ব্যঞ্জনা নয় এটা বিশ্বাসীদের জন্য স্মারকস্বরূপ। এ শব্দ ভবিষ্যৎ বক্তা কোনও অবিচারকারীর নয়। এটা একটা বাণী যা এসেছে মহাপ্রভুর কাছ থেকে পৃথিবীর জন্য।'

কোরান শরীফের সুরায় হাক্ক থেকে পাঠ করছিলেন মওলানা কাশগরী। রেডিওতে সপ্তাহে দুদিন ব্যাখ্যাসহ কোরান শরীফ পাঠের ব্যবস্থা ছিল। একদিন ব্যাখ্যা হত উর্দুতে আর একদিন বাংলায়। বহুদিন পর্যন্ত উর্দু ব্যাখ্যা দিয়েছেন মওলানা কাশগরী। তিনি ছিলেন মধ্য এশিয়ার কাশগরের অধিবাসী। ধর্মপ্রাণ পরিবারের সন্তান কৈশোরে ইসলাম ধর্মের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি কাশগর থেকে ভারতের দেওবন্দে আসেন। সেখান থেকে শিক্ষা সমাপ্তির পর মুদাররেস হিসাবে চাকরিতে প্রবেশ করেন। আমি যখন তাঁকে পাই তখন তিনি কলকাতার আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক। হালকা শরীর গাত্রবর্ণ আরক্তিম এবং

www.pathagar.com

চোখ দুটি আকাশের মত নীল; সব সময় ওষ্ঠ দুটি হাসিতে উদ্ভাসিত থাকত। আজীবন কুমার ছিলেন। আলীয়া মাদ্রাসায় একটি বাসকক্ষে একা একা থাকতেন। খুব আগ্রহের সঙ্গে রেডিওতে কোরান শরীফের ব্যাখ্যা দিতেন। অল্প কথা বলতেন, হাস্যপরিহাসে যোগ দিতেন এবং নানাবিধ গুরুপাক খাদ্যের প্রতি আগ্রহ ছিল। তিনি যেদিন সুরা হাক্ক থেকে এখানে উদ্ধৃত ব্যাখ্যাটি দিচ্ছিলেন তখন তাঁর বলার ভঙ্গিতে সবাই অভিভূত হয়েছিল। আমার মনে আছে, বিখ্যাত উর্দু কবি খান বাহাদুর রেজা আলী ওহাসাত টেলিফোনে আমাকে বলেছিলেন যে কোরান শরীফের এত অপূর্ব ব্যাখ্যা তিনি অনেকদিন শোনেন নি। কাশগরী সাহেব নিজেও কবি ছিলেন, তাই কবিতা কি এবং ঐশীবাণীই বা কি তিনি তার ব্যাখ্যাসূত্রে তাঁর উত্তর উপস্থিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে কবিতা একটি নির্মাণ পদ্ধতিতে পাঠক বা শ্রোতার সামনে উপস্থিত করা হয়। সুতরাং সেখানে নিয়ম বন্ধনের একটি শৃংখলা আছে। কবিতার উপলব্ধি থেকে কবিতা নির্মাণ করেন। সুতরাং নির্মিত বিষয়টি সেখানে কখনই উপেক্ষিত থাকে না। কিন্তু ঐশীবাণী একটি আবির্ভাব। একটি অপরিসীম তন্ময়তার মধ্যে এই বাণী মানুষের অস্তিত্বকে সচকিত করে। তদুপরি এই বাণী কোনও বিশেষ সময়ের কোনও বিশেষ ব্যক্তির জন্য নয়, সর্বকালের মানুষের জন্য। কবিতার প্রতি মাওলানা কাশগরীর দুর্বলতা ছিল। তিনি কবিতাকে ভালবাসতেন এবং কবিতা একপ্রকার নির্মিত বলেই সেই নির্মিতের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা, আবেগ এবং দক্ষতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। সেদিন ব্যাখ্যাসূত্রে তিনি বলেছিলেন যে আল্লাহ তায়ালা কোরান শরীফের বাণীর বিশিষ্টতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কবিতার কথা বলেছেন। তাতেই বোঝা যায় যে বিশ্ববিধাতার কাছে কবিতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ। যদিও বলা হয়েছে যে কোরান শরীফের বাণী কবিতা নয়, কিন্তু এই নেতিবাচক উচ্চারণের মধ্য দিয়েই কবিতার প্রতি এক বিশেষ ধরনের প্রশান্তি এসেছে।

মাওলানা কাশগরীকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করবার জন্য আমরা কৌশল কম করিনি। কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হই নি। মাওলানা হাসিমুখে সব সময়ই বলতেন, 'আপনারা চেষ্টা করতে থাকুন না, ভাল সম্পর্ক পেলে আমার রাজি হতে অসুবিধা কি।' জয়নুল আবেদীন এ ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস ছিলেন। তিনি একদিন সত্যি সত্যি কয়েকটি প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলেন। উক্ত প্রস্তাবের সঙ্গে সম্ভাব্য পাত্রীদের ফটোগ্রাফও ছিল। এসব ফটো নিয়ে আমি এবং আবেদীন কাশগরীর কক্ষে গেলাম। তিনি প্রচুর গ্রন্থ সমাবৃত হয়ে তাঁর ঘরে বসে কাজ করছিলেন। আবেদীনের প্রস্তাবগুলো হাসিমুখে শুনলেন। নিজ হাতে আমাদের চা বানিয়ে খাওয়ালেন, শাল পাতার ঠোঙ্গায় করে নিকটের একটি দোকান থেকে মিষ্টি আনিয়ে খাইয়েছিলেন মনে পড়ে, হাসিমুখে ছবিগুলোও দেখলেন কিন্তু কোনরূপ অনুকূল সাড়া না দিয়ে শুধু প্রশ্ন করলেন, 'আমার যে এতসব বই আছে যেগুলো নিয়ে দিনরাত আমি থাকি সেগুলোর চেয়ে ঐ মেয়েগুলোর ছবি কি বেশি সুন্দর? কাশগরীর প্রশ্ন শুনে আমরা প্রথম হতভম্ব হলাম। পরে হাসতে লাগলাম। কাশগরীও আমাদের হাসিতে যোগ দিলেন। এরপর আর কোনদিন আমরা কাশগরীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেই নি।

কাশগরী পাকিস্তান হওয়ার পর ঢাকায় এসেছিলেন। তখন প্রথম প্রথম তিনি একবার দেশে যেতে পারেন কিনা সেই প্রশ্ন উত্থাপন করতেন। এর আগে কোনোদিন তাঁকে দেশের কথা বলতে শুনি নি। পাকিস্তান হওয়ার পর প্রথম শুনলাম। তিনি আমাকে

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘পাকিস্তানের সঙ্গে তো রাশিয়ার একটি কূটনৈতিক সম্পর্ক ঘটেছে। মধ্য এশিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির কি পাকিস্তানের প্রয়োজন নেই? তারা তো আমাকেও পাঠাতে পারে।’ আমি এর কোন উত্তর না দিয়ে কাশগরী সাহেবকে তাঁর দেশ সম্পর্কে বলতে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ‘আমি পাহাড়ের দেশের লোক, নদীমাতৃক সমতলের মানুষ নই। পাহাড়ের দুর্গমতার মধ্যে এক প্রকার একান্ত আচ্ছন্নতা আছে, যা সমতলে পাওয়া যায় না। পাহাড়ের দেশে সর্বদাই উর্ধ্বলোক আমাদের দৃষ্টি সর্বদাই আকাশের দিকে, আমাদের অঞ্চলে আকাশের প্রহরী হিসাবে পাহাড়ের চূড়ায় ঈগল পাখি এসে বসে। এটুকু বলেই কাশগরী সাহেব আমার দিকে মন্তব্য করলেন, ‘জীবন শেষ হওয়ার আগে মানুষ তার মাতৃক্রোড়ে ফিরে যেতে চায়। আমার ইচ্ছাটি কি অন্যায়?’ কাশগরীর ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। তিনি ঢাকা শহরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আমার বিয়ের সময় দু ধরনের চিঠি ছাপিয়েছিলাম। একটি বাংলাতে আর একটি ফার্সীতে। ফার্সী চিঠিটির মুসাবিদা করে দিয়েছিলেন কাশগরী সাহেব। সেখানে দু ছত্রের একটি কবিতা ছিল। কবিতাটির অর্থ হচ্ছে– বসন্তের স্পর্শ আসুক, পাখি ডাকুক আনন্দের হিল্লোলে আমার চিত্ত উন্মুক্ত হোক। কখনও কাশগরীকে দূরের মানুষ হিসাবে ভাবতে পারি নি। কোনদিন ক্রোধ প্রকাশ করতে দেখি নি। যার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সেই তাঁকে অকৃত্রিম বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। কলকাতা অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ইসলামী ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিবেশনার জন্য কাশগরীকে আমরা বহুবার পেয়েছি। একবার ফাতেহা-ই দোয়াজদাহম উপলক্ষে সম্পূর্ণ আরবীতে ৩০ মিনিটের একটি অনুষ্ঠান তিনি করেছিলেন যার সুর ঝংকার অন্য ভাষাভাষী লোকদের কাছে অনবদ্য মনে হয়েছিল। বিভিন্ন সুরে তিনি তন্ময়তা এবং উচ্ছ্বাসকে পরিবেশন করেছিলেন। তিনি একা ছিলেন না, সঙ্গী হিসাবে আরো কয়েকজনকে নিয়েছিলেন। স্টেশন ডিরেক্টর সোমনাথ চীব অনুষ্ঠানের সুর ব্যঞ্জনায় মুগ্ধ হয়ে কাশগরীকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন।

কলকাতা থাকতে কাশগরী ছাড়াও আর যে আলেমদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল তার মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন মুফতী আমিমূল এহ্‌সান। গোলগাল বেঁটে মানুষটি, লাল আপেলের মতো গায়ের রঙ। সব সময় হাসিমুখে কথা বলতেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর মত পারঙ্গম লোক খুবই কম জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁকে প্রথম আমি দেখি কলকাতার নাখোদা মসজিদে। ঈদের চাঁদ উঠেছে কিনা সেটা জানবার জন্য রেডিওর পক্ষে আমি এবং আশরাফুজ্জামান সাহেব নাখোদা মসজিদে গিয়েছিলাম। মুফতী সাহেব সেখানকার ইমাম ছিলেন। মাগরেবের নামাজের শেষে তিনি আমাদের দুজনকে তাঁর কক্ষে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং এলাচি-দারুচিনির গুঁড়ো মিশ্রিত এক ধরনের কফি পান করতে দিলেন। সেখানে আরও কিছু লোক ছিল। তাদেরকে ধর্মসংক্রান্ত কিছু প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছিলেন, মনে পড়ে। তাঁর বক্তব্য খুবই সুস্পষ্ট ছিল এবং স্মৃতিশক্তি আশ্চর্যরূপ প্রখর ছিল। বিভিন্ন হাদীসের সূত্র যেভাবে তিনি ব্যাখ্যা করে যেতেন তাতে শ্রোতা অভিভূত হয়ে যেতেন। নাখোদা মসজিদে প্রথম দর্শনের পর আমি সুযোগ পেলে প্রায়ই তাঁর ওখানে যেতাম। তিনি হাসিমুখে আমাকে আপ্যায়ন করতেন এবং কোন জিজ্ঞাসা থাকলে তার খুব সহজ ব্যাখ্যা উপস্থিত করতেন। দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় আসেন এবং বায়তুল মোকাররম মসজিদে প্রথম খতিব নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি লোকান্তরিত।

www.pathagar.com

আমি প্রচণ্ডভাবে আধুনিক সময়ের কল্লোলের মধ্যে বাস করতাম। সেই কল্লোল থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে আসা কঠিন ছিল। কিন্তু আমি কখনই পুরাপুরিভাবে রেডিওর জীবনের সঙ্গে নিজেকে ওৎপ্রোত করতে পারি নি। এবং এই বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়ে কল্যাণ কণ্ঠ হিসাবে মাওলানা কাশগরী এবং মুফতী আমিমূল এহ্সানকে পেয়েছিলাম।

॥৪৯॥

বৃষ্টি যেমন ভূমিকে নিষিক্ত করে, বৃষ্টি তেমনি প্রচণ্ড আবেগে একপ্রকার প্রমুক্ততায় সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। বৃষ্টি একদিকে যেমন সৃষ্টিকে সজীব এবং উৎফুল্ল করে তেমনি আবার অন্যদিকে সৃষ্টিকে ধ্বংস করে। ভূ-প্রকৃতি এই ধ্বংস এবং উজ্জীবন লীলার মধ্যে প্রাণ পায় সমৃদ্ধি পায় এবং উর্বরা শক্তিতে প্রাণদ হয়। মানুষের যৌবনকে আমি বৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করেছি। শৈশবকালটি প্রবাহিত নদীর মত। আমার কিছু করবার ছিল না তখন আমি শুধু প্রবাহিত হয়েছি। আমার প্রবহমানতাকে রক্ষা করেছেন আমার পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজন। আমি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে মানুষের যাত্রা অবগাহন এবং আনন্দকে দেখেছি। সে সময় আমি দর্শকমাত্র। কিন্তু যৌবন যখন এল এবং যখন পিতা মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপন ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হলাম তখন সময় একটি বৃষ্টির তাৎপর্যে নিষিক্ত করল। আমি এখানে সে সময়ের কথাই বললাম। এ সময় আমার জীবনে প্রেম এসেছিল, অভিমান এসেছিল, বিশৃংখলায় বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা এসেছিল আবার বিশ্বাসের চৈতন্যে আত্মস্থ হবার শক্তি এসেছিল। বহুদিন পর কল্লোলিত সে অতীতের বর্ণনায় আমি বর্ণনার ধারাক্রম রক্ষা করতে পারি নি। বিক্ষিপ্তভাবে এবং বিচ্ছিন্নভাবে যে দৃশ্যগুলো আমার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে তাকেই আমি বর্ণনা করেছি। অনেকের কথা বাদ পড়েছে যারা আমার জীবনে পর্যাপ্ত আনন্দ এনেছিল। কিন্তু যেহেতু আমার নিজস্ব বিশ্বাসের পরিমণ্ডল নির্মাণের ক্ষেত্রে তাদেরকে আমার প্রয়োজন হয়নি তাই হয়ত তাদের কথা বাদ পড়েছে। আমি যদি বেতার জগতের উচ্ছলতার মধ্যে নিজেকে পুরোপুরি নিঃশেষ করতাম তাহলে সে রাজ্যে আমার একটি অধিগম্যতা নির্মিত হত। কিন্তু যেহেতু সে রাজ্যকে আমি পশ্চাতে ফেলে রেখে এসেছিলাম তাই সেখানকার জীবন আমার পরবর্তী জীবনের সঙ্গে সাযুজ্য আর রক্ষা করে নি।

সে সময় অল ইন্ডিয়া রেডিওতে আমার সহকর্মী হিসাবে দুজন অসামান্য শিল্পীকে পেয়েছিলাম। তাদের একজন বিকাশ রায় অন্যজন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ভানু একসময় আমার সহপাঠী ছিল পরে রেডিওতে কর্মক্ষেত্রে কিছুকাল একত্রিত হয়েছিলাম। বিকাশকে প্রথম সহকর্মী হিসাবে পেয়েছিলাম। পরে সে সিনেমা এবং মঞ্চের ভুবনে চলে যায়। ভানুর সদা চঞ্চলতা, উচ্ছ্বাস এবং বাকপটুতা রেডিও অফিসকে সদা হাস্যমুখর করে রাখত। তার উপস্থিতি আমরা সর্বদাই অনুভব করতাম। যে অপরূপ নিশ্চিন্ততায় সে তার কৌতুক বাক্যগুলো ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় পরিবেশন করত তা অতুলনীয় বললে অন্যায় হয় না। পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে পড়া উপল খণ্ডের মত তার শব্দরাজি বাধাবন্ধনহীনভাবে ছুটে চলত। আমাদের রেডিওর অবস্থানটি ভানুর সাহচর্যে প্রাণবন্ত হয়েছিল। আমি যখন রেডিওতে যোগ দেই তখন বিকাশ তার স্বাভাবিক দায়িত্বের

www.pathagar.com

অতিরিক্ত একটি দায়িত্ব পালন করত। কলকাতা রেডিওতে প্রতিদিন সকালে ট্রান্সমিশন খোলার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আজকের ভাবধারা নামক একটি বাণী পাঠ করা হত। এই বাণী নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল বিকাশের। একটি মোটা খাতা স্টুডিওতে থাকত সেখানে তারিখ অনুযায়ী প্রতিদিনের বাণী লিখিত থাকত। আমি যোগ দেওয়ার পর এ দায়িত্বটি পড়ল আমার উপর। বাণী-খাতার পুরনো পাতাগুলো উল্টিয়ে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। বিভিন্ন লোকের নামে যে সমস্ত বাণী লিখিত আছে সেই সমস্ত লোক আদৌ পৃথিবীতে ছিলেন কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়ত বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিদের নামে যে সমস্ত বাণী জুড়ে দেওয়া হয়েছে তাঁরাও সেসব বাণী কখনও দিয়েছিলেন কিনা তা নিয়েও আমার সংশয় জেগেছিল। একথা বিকাশকে বলতেই বিকাশ প্রবলবেগে হাসতে লাগল। বলল, 'মশায়, গবেষণা করে বাণী উদ্ধার করতে গেলে অন্য কাজ করার আপনি সময় পাবেন কোথায়? তাছাড়া কয়েক সেকেন্ডের বাণী যারা শোনে তারা সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে যায়। সুতরাং আমি নিজেই পুরনো কালের মহাপুরুষদের দায়িত্ব আপন স্কন্ধে নিয়ে এই সমস্ত বাণী তৈরি করে দিয়েছি। আপনি তাই করবেন।

বেশি সাধু সাজতে গেলে বিপদে পড়বেন। আমি কিন্তু বিকাশের কথা মেনে নিতে পারি নি। আমি যথার্থই পরিশ্রম করে বাণী উদঘাটনে প্রয়াসী হয়েছিলাম। আবার বিপদে পড়েছিলাম এ কারণেই। রবীন্দ্রনাথের একটি বাণী একদিন পাঠ করা হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে। তা নিয়ে প্রবল প্রতিবাদ আসে খগেন সেন নামক এক কংগ্রেসী নেতার কাছ থেকে। এবং তার পরপরই আরও কয়েকজন নেতা প্রতিবাদ জানান। তাদের বক্তব্য ছিল যে ঐ ধরনের কথা রবীন্দ্রনাথ কখনই বলতে পারেন না। তখন সবেমাত্র কলকাতার মহাহত্যাযজ্ঞ শেষ হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে এই প্রতিবাদগুলো বেতার কর্তৃপক্ষের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। এরপর বাণী নির্ধারণের দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। বিকাশ রেডিও ছেড়ে দিলেও রেডিওর লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ সে অক্ষুণ্ন রেখেছিল। কলকাতা থেকে চলে আসার কয়েকদিন আগে বিকাশ আমাকে নিয়ে একটি রেস্টুরেন্টে খেতে বসেছিল। নীলিমাও সঙ্গে ছিল। সেদিন বিকাশের একটি কথা আমার মনঃপূত হয়েছিল।

সে বলেছিল, 'জীবনে যা ঘটবার তা তো ঘটবেই। ও নিয়ে একেবারেই চিন্তা করবেন না। আপনি কিছু ঘটাতে পারেন কিনা তাই চেষ্টা করবেন। কক্ষণো সাধু সাজতে যাবেন না। পৃথিবীতে কেউ সাধু নয়। সুতরাং আপনি যদি সাধু সাজতে যান অসাধুরা মিলে আপনার গায়ে কাদা ছুঁড়বে। আমি আপনাকে অসাধু হতে বলছি না। কিন্তু অন্য থেকে আপনি আলাদা এ ভাবটা আপনি কখনও দেখাবেন না।'

সে সময় রাধারানী নামক একজন কীর্তন গায়িকা রেডিওতে প্রায়ই আসতেন। সাঁওতাল রমণীদের মত পাথরে খোদাই করা শরীর। অটুট যৌবনা এই রমণী রেডিওতে কীর্তন গাইতেন। শ্রী রাধিকার মতই তার আবহ এবং রসাবেশ ছিল। ভদ্রমহিলা দেহপসারিনী ছিলেন এবং নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গিনী ছিলেন। নৃপেনদা সংসারযাত্রায় একাকী পুরুষ ছিলেন। রাধারানীর সঙ্গে তার সম্পর্ককে তিনি আড়াল করতে চান নি আবার প্রকাশও করতে চান নি। এটি একটি স্বাভাবিক অস্তিত্বের মত ছিল। রাধারানীর জীবনযাপন নৃপেনদার চিত্তে কোনও বিকার বা গ্লানি উপস্থিত করে নি। তিনি

www.pathagar.com

সহজেই তা মেনে নিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তার উদাসীনতাও যেমন ছিল তেমনি সূক্ষ্ম একটি মমতাও ছিল। আমার মনে হয় তিনি সমস্ত ঘটনাকে ভাগ্যের একটি লীলাবিলাস মনে করেছিলেন। রাধারানী ছিলেন অসাধারণ কীর্তন গায়িকা। রাধারানীর কীর্তনের সুরের সম্মোহনে নৃপেনদা সর্বক্ষণ যেন বিভোর থাকতেন। সুতরাং রাধারানীর দৈহিক বৃত্তিটা তার কাছে কোনোদিনই বিচার্য হয় নি। রাধারানীর কণ্ঠে গোবিন্দ দাসের একটি পদ এখনও আমার কানে বাজে ঃ

'আধক আধ-আদ দিঠি-অঞ্চলে/
যব ধরি পেখলু কান।/
কত শত কোটি কুসুম-পরে
জরজর/
রহত কিরাত পরাণ।।
সজনী–জালু'র বিহি মে হ
বাম।/
দুহ'- লোচন ভরি যো হরি
হেরই/
তছু পায়ে মঝু পরনাম।।'/

রাধারানীর কণ্ঠে বৈষ্ণব পদাবলীর শব্দলালিত্য এবং ভাবের চমৎকারিত্ব অপূর্ব ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেত। এবং রাধারানী যখন গান গাইতেন তখন তা হৃদয় থেকে নিঃসৃত হচ্ছে বলে মনে হত। এত মর্মস্পর্শী ধর্মভাবের অভিব্যক্তি তার কণ্ঠে ছিল যে তাকে কখনও নিম্নমানের রমণী বলে মনে করতে পারতাম না।

আরও অনেকের সঙ্গে সে সময় রেডিওতে দেখা হয়েছে, পরিচয় হয়েছে, ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। এদের মধ্যে যোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত অন্যতম। অত্যন্ত সাদাসিধা, গ্রামীণ সহজতার মানুষ ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন নিরহংকার সাহিত্য কর্মী। জ্ঞানের অভিমান ছিল না। চলাফেরায় অলংকরণ ছিল না, এক প্রকার নিরাসক্ত ভিক্ষুর মতো। বিদ্যার্থীমণ্ডলের অনুষ্ঠানে নিয়মিত যোগ দিতেন।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে সে সময় ডক্টর আবদুল ওয়াহেদ নামক একজন অত্যন্ত সজ্জন এবং বিজ্ঞ মুসলমান চিকিৎসক ছিলেন। কালীঘাটে তাঁর নিজস্ব বাড়ি ছিল। তাঁর দুটি সুন্দর মেয়ে পরিস্ফুট পুষ্পের মত দেখাত। বড়টির নাম ছিল বেবী, সে দশম শ্রেণীতে পড়ত, ছোটটির নাম রোজী, সে ষষ্ঠ কি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ত। একটি শান্ত নিরুপদ্রব সংসার যাত্রায় ডঃ ওয়াহেদকে আমরা দেখেছি। রেডিওতে বিদ্যার্থীমণ্ডলে তাঁর বড় মেয়েকে আমরা ডেকেছি ও ওয়াহেদ সাহেব চিকিৎসা সংক্রান্ত বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বেতার ভাষণে অংশ নিয়েছেন–এভাবেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। ক্রমশ এ পরিচয় অন্তরঙ্গ হয় এবং ছুটির দিনে অথবা অবসর সময়ে তাঁর সঙ্গে একত্রে সময় যাপন করা আমার এবং জয়নুল আবেদীনের প্রায় অভ্যাসে পরিণত হয়। মাঝে মাঝে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে রোগী দেখতেও গিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমার প্রবল প্রতিবাদ থাকলেও ওয়াহেদ সাহেব বলতেন, 'এ সমস্ত রোগীর আচরণের মধ্যে আপনি সাহিত্যের অনেক উপকরণ

www.pathagar.com

পাবেন। এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে নতুন নতুন রহস্যের স্বাদ পাবেন। আমি তখন তালতলায় থাকি। সে সময় একদিন ওয়াহেদ সাহেব গাড়ি নিয়ে এসে বললেন, 'চলুন এক জায়গায় যাওয়া যাক।' আমরা মানিকতলা অঞ্চলে একটি পুরনো বাড়িতে প্রবেশ করলাম। পুরনো হলেও স্বচ্ছতা যে আছে এটা বোঝা যায়। খবর দিতেই আমাদের দোতলার একটি বড় ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে প্রশান্ত একটি উঁচু খাটে এক ভদ্রলোক শুয়েছিলেন। বুঝলাম তিনিই রোগী। কিন্তু একটু বিমর্ষভাব ছাড়া রোগের কোনো লক্ষণ তার মধ্যে দেখলাম না। ওয়াহেদ সাহেব রোগীকে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর খাটের পাশে দাঁড়িয়ে অতি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'আপনার তো কোনো অসুখ নেই, একটু জ্বর এসেছিল, তা সেরে গেছে, আপনি নিজেকে অসুস্থ ভাবেন, এই ভাবনাটাই হচ্ছে আপনার রোগ।

আমরা যখন রোগীর ঘরে ছিলাম তখন একজন যুবতী এবং একজন যুবক পুরুষ ঘরের মধ্যে কয়েকবার এসে চলে যাচ্ছিল। কথাবার্তায় বুঝলাম মহিলাটি ভদ্রলোকের স্ত্রী এবং পুরুষটি ভদ্রলোকের দূর সম্পর্কের শ্যালক। ওয়াহেদ সাহেব এক পর্যায়ে বললেন, 'আপনি কলকাতার বাইরে কোথাও আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যান না।

এতে আপনার উপকার হবে।' আমরা রোগী দেখে গাড়িতে করে যখন ফিরছিলাম তখন ওয়াহেদ সাহেবকে আমি বললাম, 'আমার মনে হয় কি জানেন? লোকটি স্ত্রীর ভালবাসা আদায়ের জন্য অসুস্থতার ভান করেছে।' এর অল্প কিছুদিন পরই ওয়াহেদ সাহেবের কাছে জানলাম যে স্ত্রীলোকটি তার তথাকথিত ভাইকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। আর বিত্তবান যুবকটি হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। লোকটির এহেন অবস্থায় আবার ওয়াহেদ সাহেবের ডাক পড়েছিল, সেবারও আমি সঙ্গে ছিলাম। ওয়াহেদ সাহেব খুবই নিষ্ঠুর ভাষায় লোকটিকে শাসন করেছিলেন। বলেছিলেন, 'আপনি পুরুষত্বহীন একজন দুর্বল ব্যক্তি আপনাকে কোনো রমণী গ্রহণ করতে পারবে না। নিজেকে দুর্বল করে অসুস্থতার ভান করলে ভালবাসা আদায় করা যায় না। আপনার জন্য ভালই হল। আপনি মুক্ত হলেন। এখন আপনার অসুস্থতার কারণ দূর হয়েছে।' ম্রিয়মান নির্জীব লোকটি ওয়াহেদ সাহেবের শাসনে হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল, বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার দোষেই সবকিছু হয়েছে। আমি এর প্রতিশোধ নেব।' ওয়াহেদ সাহেব বললেন, 'প্রতিশোধের কথা বাদ দিন, নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করুন।'

ওয়াহেদ সাহেবের সঙ্গে আমি আলীপুরের জেলখানায়ও গিয়েছি, সেখানে তিনি কিছু সন্ত্রাসবাদী কয়েদীর চিকিৎসা করতেন। ওয়াহেদ সাহেব একজন অসাধারণ মানবপ্রেমিক কৌতূহলী ব্যক্তি ছিলেন। চিকিৎসক হিসাবেও অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তিনি চিকিৎসা করতে এসে রোগীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার অনুসন্ধান করতেন। তাঁর এই অনুসন্ধানটি বিশেষ প্রকৃতির জ্ঞানান্বেষণের উপায়ের মত ছিল। জীবন সম্পর্কে একটি সূক্ষ্ম অনুভূতির চৈতন্যোদয় হিসাবে তাঁর চিকিৎসা বিদ্যাকে ব্যাখ্যা করা চলে। ব্যক্তিগত জীবনে ওয়াহেদ সাহেব অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এবং আত্মস্থ প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর মধ্যে কখনও উচ্ছলতা বা উচ্ছ্বাস দেখি নি। অথচ তিনি সহজেই মানুষকে আকর্ষণ করতে পারতেন। চতুর্দিকের পৃথিবীতে আনন্দের যে সমস্ত উপকরণ ছিল, সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি পড়ত। তাঁর গাড়িতে

www.pathagar.com

করে যতবার বাইরে গিয়েছি ততবারই দেখেছি, জানলা দিয়ে তাকিয়ে মানুষের যাতায়াত তিনি নিগূঢ়ভাবে লক্ষ্য করতেন। বিপুল জনারণ্যের মধ্যে হঠাৎ কোনো একটি রঙ তাঁর চোখে পড়লে সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। আমার এখন মনে হয় দৃশ্যমান সব কিছুর মধ্যেই ওয়াহেদ সাহেব সঙ্গীতের সুষমা খুঁজতেন। ওয়াহেদ সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগে আমি জীবনের একটি দিককে উন্মোচিত হতে দেখেছি। জীবনের যান্ত্রিকতার মধ্যে একটি হৃদয়ের সাড়া তিনি এনেছিলেন।

॥৫০॥

অল ইন্ডিয়া রেডিওতে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর কালিদাস নাগ সর্ব সময় আমাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। অর্থাৎ তারা ছিলেন অগতির গতি। যে কোন বিষয়ে তাদের কথিকা লিখতে দেয়া হলে তারা অল্প সময়ে প্রস্তুত করে দিতে পারতেন। আমার মনে আছে ইন্দোনেশিয়া নিয়ে তখন সবার মনে নানা ধরনের আগ্রহ। সে সময় সুনীতি বাবু সে দেশের উপর একটি প্রচুর সংবাদবহ কথিকা অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। সুনীতি বাবুর কাছেই প্রথম জানলাম যে ইন্দোনেশিয়ার ভাষায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব আছে, বিশেষ করে মানুষের নাম এবং স্থানের নামের মধ্যে এগুলো সুস্পষ্ট। সুনীতি বাবু সর্বভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে বাংলা ভাষা সাহিত্যকে সবার উঁচুতে স্থান দিতেন। উর্দূ গজল তিনি পছন্দ করতেন না, বলতেন, 'ফার্সী গজল এর চেয়ে শতগুণে ভালো।' একদিন স্টেশন ডিরেক্টর সোমনাথ চিব ইকবালের কবিতা নিয়ে মন্তব্য করছিলেন। বলছিলেন যে ইকবাল একজন অসাধারণ কবি এবং তিনি বিশ্বের কাব্য ভুবনে ভারতবর্ষকে একটি মর্যাদার স্থানে স্থাপিত করেছেন। সুনীতি বাবু এ কথা স্বীকার করলে না। তিনি বললেন, 'যে কবি হিমালয়কে সেন্ট্রির সঙ্গে তুলনা করে সে কি আবার কবি? আমরা কিছুতেই সুনীতি বাবুকে বোঝাতে পারলাম না যে শান্ত্রী শব্দটি উর্দূ ভাষারই একটি স্বীকৃত শব্দ এবং শব্দটি সে ভাষার ধ্বনি প্রবাহের মধ্যে ওতপ্রোত। তাছাড়া প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব গতিপ্রবাত আছে, যার সাহায্যেই সে ভাষাকে অনুভব করতে হয়। আমি হিন্দী ভাষার কথা বললাম, যেখানে গুরু চন্ডলি দোষ বলে কিছু নেই, কঠিন তৎসম শব্দের পাশে তরল দেশজ শব্দ অতি সহজেই বাঙ্ময় হচ্ছে। অথচ বাংলাতে এ ধরনের প্রয়োগ প্রচন্ড অপরাধ। কলকাতা থাকতে সুনীতি বাবুর বাসায় প্রায়ই যেতাম এবং বাংলা সাহিত্যের অতীত এবং মধ্যযুগ বিষয়ে তার কাছ থেকে পাঠ নিতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষার মধ্যে আমি সুনীতি বাবুর কাছ থেকে কিছু না নিলেও ব্যক্তিগতভাবে তার গৃহে তার কাছে বসে আরও অনেক বেশি আমি গ্রহণ করেছি। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য চর্চায় এই জ্ঞান আমায় প্রভূত সাহায্য করেছিল। কথা বলা আরম্ভ করলে তিনি আর থামতেন না। কথার পর কথা বলে চলতেন। একটি কথার সূত্রে অন্য কথা আসত। অনেক সময় একটি শব্দের সূত্র ধরে একটি দেশের ইতিহাস বলা হয়ে যেত। পাণ্ডিত্যে এমন ব্যাপকতা, গভীরতা আমি খুব কম দেখেছি। মানুষ হিসেবে তিনি সর্ব প্রকার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ছিলেন। ডক্টর কালিদাস নাগও ছিলেন সদা প্রফুল্ল আনন্দময় পুরুষ। তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক শান্তা দেবীর স্বামী। আমি শান্তা দেবীকে দেখি নি। কিন্তু কালিদাস নাগকে রেডিওতে প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে কথিকা দিতে দেখতাম। রেডিওতে

www.pathagar.com

থাকা কালীনই প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখন প্রেমেন্দ্র মিত্র একজন উচ্ছল যৌবনময় পুরুষ। প্রচুর কবিতা লিখছেন, গল্প লিখছেন এবং সিনেমা পরিচালনা করছেন। একটি আনন্দিত কর্মপ্রবাহের মধ্যে তাঁকে আমি সচ্ছল অবস্থায় দেখেছিলাম। রেডিওতে আসতেন, হাসি কৌতুকে আমাদের সঙ্গে সময় কাটাতেন, সূক্ষ্ম পরিহাসে সবাইকে আক্রমণ করতেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি আগ্রহ ছিল সাহিত্য কর্মে মুসলমানদের অধিকার সম্পর্কে কিছু জানা। তাই প্রায়ই আমার কাছে অথবা আহসান হাবীবের কাছে এসে বসতেন। নানাবিধ জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করতেন। তাঁর প্রশংসার ভাষা ছিল দ্বিধাহীন এবং পরিচ্ছন্ন। আহসান হাবীবের কবিতাকে তিনি বলতেন প্রাণের উচ্ছলতা। তার ভাষায় আহসান হাবীব একটি উচ্ছল মাধুর্যে জীবনের কথা বলবার চেষ্টা করে। পৃথিবীতে যেখানে অধিকাংশ পরিচয়ই প্রয়োজনের বন্ধনদশা পীড়িত সেখানে প্রয়োজনের বাইরের আনন্দের দাক্ষিণ্যকে যারা তুলে ধরবার চেষ্টা করেন তারাই কবি। প্রেমেন্দ মিত্র বলতেন বৈষ্ণব পদকর্তাদের সময় থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা কবিতা হচ্ছে উৎসাহিত প্রকৃতি চর্চার ইতিহাস। আহসান হাবীবের কবিতার মধ্যে প্রকৃতির একটি মধুর রূপ ধরা পড়েছে। তিনি আরো বলতেন, পৃথিবীর সর্বত্রই একটি অভাবনীয় আছে, একটি রহস্য আছে, কবির কর্তব্য হচ্ছে, সেই অভাবনীয়কে দীপান্বিত করা তখন প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রেম যুগে যুগে' বইটি ছাপা হচ্ছিল। বইটি একটি সংকলন, প্রেমের কবিতার সংকলন। এখানে সে সময়কার আধুনিক মুসলমান কবিদের মধ্যে দু'জনের কবিতা প্রেমেন্দ্র মিত্র নিয়েছিলেন। আহসান হাবীবের ও আবুল হোসেনের। আবুল হোসেনের 'মেহেদীর জন্য' কবিতাটি 'মেহেদীর জন্য' বলে ছাপা হয়েছিল। জিজ্ঞেস করাতে বলেছিলেন, 'ভাল সংশোধন করেছি, 'মেহেদীর' কোনো অর্থ হয় না, তাই আমি 'সেহেদী বসিয়ে দিয়েছি।' মুদ্রাক্ষর প্রমাদকের সমর্থনের জন্য তার এ উক্তিকে আমি কৌতুকবোধ করেছিলাম। ১৯৪৬ সালেই সম্ভবত লাহোর ফয়েজ আহমদ ফয়েজ কলকাতায় এসেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র এবং আরও অনেকে ফয়েজ আহমদকে সংবর্ধনা জানিয়ে ছিলেন। সে সময় প্রেমেন্দ্র মিত্রের মুখে আমি ফয়েজ আহমদের উচ্ছসিত প্রশংসা শুনি। তিনি ফয়েজ আহমদকে একটি যুগের প্রতিনিধি বলে প্রশস্তি দিয়েছিলেন। অল ইন্ডিয়া রেডিওতে তখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কবি সাহিত্যিক এবং সঙ্গীত শিল্পীরা আসতেন। লক্ষ্য করেছি এদের সকলের সঙ্গেই মিত্রের আন্তরিক আলাপ-আলোচনা চলত।

যে সময়কালের কথা বলছি, তখন আধুনিক কাব্যাদর্শের তিনজন প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। এদের একজন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্যজন অজিত দত্ত এবঙ তৃতীয়জন বুদ্ধ দেব বসু। এ সময় আরও একজন কবি এসেছিলেন। যার নাম আমরা এখন প্রায় হারিয়ে ফেলেছি। তিনি সমর সেন। বুদ্ধদেব বসু ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৯৩৫ সালে। তার সঙ্গে সে সময় সহযোগী হিসাবে কাজ করেছিলেন প্রেমেন্দ্রে মিত্র ও সমর সেন। পরে প্রেমেন্দ্রে মিত্র ভিন্নভাবে 'নিরুক্ত' নামে একটি ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা প্রকাশে মনোযোগী হন। বলা যায় যে বাংলা কবিতায় আধুনিক ভঙ্গি প্রবর্তনার ক্ষেত্রে অথবা আধুনিকতার উন্মোচনের ক্ষেত্রে এরা সকলেই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আধুনিক

www.pathagar.com

কবিতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং আধুনিক কবিকূলকে সর্বাংশে সমর্থন করা এদের ব্রত ছিল। যে আনন্দময় অভিপ্রায়ে এবং দুঃসাহসে এরা আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা অতুলনীয়। এদের মধ্যে অজিত দত্তকে তাঁর মৃদুতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমার খুব ভাল লাগত। অজিত দত্ত কল্পনার দুর্লভ সৌন্দর্যকে আধুনিক প্রজ্ঞায় অনুভব করবার চেষ্টা করেছিলেন। তার একটি কবিতার অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি এখানে দিচ্ছি ঃ

'কন্যার সোনার দেহে হাজার
ময়ূর কণ্ঠী সাপ
কন্যার বুকের পরে নাগিনীর
সোনার কাঁচুলী
সাপেরা মেলিয়া ফণা দূর করে
গরলের তাপ
কাঁপিলে কন্যার চোখ দশ লাখ
ফণা ওঠে দুলি–
কুমারের উদাসীন মন
সে দেশে গিয়াছে উড়ে, তাহারে
ফিরাবে কোন জন?

অজিত দত্তকে সর্বদাই বিনম্র ও বেদনার্ত মনে হত। শান্ত শোভন মানুষটি নিরূপদকে নিজের উপস্থিতি জ্ঞান করতেন। তবে এহেন মানুষকেও আমি রুষ্ট হতে দেখেছি। একদিন রোববারে সাহিত্য বাসরের অনুষ্ঠানে মোহিতলাল মজুমদার, প্রবোধ সান্যাল ও অজিত দত্ত ছিলেন। অনুষ্ঠানে গল্প পাঠ করেছিলেন প্রবোধ সান্যাল, 'দুর্গেশ নন্দিনী' থেকে পাঠ করেছিলেন অজিত দত্ত। অনুষ্ঠান শেষে অজিত দত্ত তার নতুন প্রকাশিত 'নষ্ট চাঁদ' বইটি মোহিতলাল মজুমদারকে উপহার দিলেন। মোহিতলালের হাতে বইটি তুলে দেবার সময় বললেন, 'আমাদের কবিতা আপনার কেমন লাগবে জানি না, তবে কৌতূহল হলে পড়ে দেখবেন।' মোহিতলাল বইটি হাতে নিয়ে মন্তব্য করলেন, 'নষ্ট চাঁদ'। প্রথমেই তো ব্যাকরণের ভুল হে। নষ্ট চন্দ্রকে নষ্ট চাঁদ কেন বানালে? অজিত বাবু পকেট থেকে চুরুট বের করে তাতে অগ্নি সংযোগ করে বললেন, আপনি এভাবেই সাহিত্যর গতিপথকে চিরকাল রুদ্ধ করে এসেছেন। সাহিত্য তার নিজের স্বভাবে অগ্রসর হবে নিজের ইচ্ছায় অগ্রসর হবে না।' মোহিত বাবু এ কথায় খুব ক্রুদ্ধ হলেন। কোনোভাবে ঘটনার মীমাংসা করে মোহিত বাবুকে বিদায় দিলাম। অজিত বাবু পরে আমাকে বললেন, 'মোহিত বাবু সকলেরই শ্রদ্ধা পেতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার স্বভাবের জন্য সকলকে শত্রু করেছেন।

রেডিওতে আমি যখন ছিলাম তখন খুব সহজভাবে যারা রেডিও অফিসে আসতেন এবং আমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন তাদের মধ্যে পরিমল গোস্বামীও একজন। প্রবীণদের মধ্যে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ছিলেন। প্রেমাঙ্কুর আথর্তী বুড়োদা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি আড্ডা দিতে বসলে সহজে উঠতেন না। গল্পের পর গল্প বলে যেতেন। সেগুলো সবই ছিল তার নিজের অভিজ্ঞতার গল্প; তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল প্রচুর। তিনি তার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা 'মহাস্থবিরা জাতক' গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। এই

www.pathagar.com

গ্রন্থের প্রথম পর্বের কয়েকটি অধ্যায় রেডিওতে কথিকা হিসাবে প্রথম প্রচারিত হয়েছিল। পরে এগুলো ধারাবাহিকভাবে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হয় এবং অবশেষে পুস্তকাকারে গ্রন্থিত হয়।

বুদ্ধদেব বসুকে আমি কখনও সহজ হতে দেখিনি। তার কথা-বার্তা বলার ভঙ্গি, চলাফেরা এবং আচরণবিধি আমার কাছে সবসময় অস্বাভাবিক মনে হত। তিনি উদার হাসিতে ফেটে পড়তে পারতেন না, কথাবার্তায় স্বর কখও উচ্চগ্রামে নিতেন না, খুব মেপে মেপে কথা বলতেন। আমরাও সে কারণে তাকে অন্তরঙ্গ করে গ্রহণ করতে পারি নি। অজিত দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা পরিমল গোস্বামী যেভাবে রেডিওতে এসে গল্পগুজবে সময় কাটাতেন, বুদ্ধদেব বসুকে আমরা সেভাবে কখনোই পেতাম না। তাকে ভিন গোত্রের মানুষ বলে মনে হত, কল্পনা বিলাসী স্বপ্নাচারীর মত। সম্ভবত তিনি রেডিওর লোকদের ভালো লোক বলে মনে করতেন না। তিনি নিয়মিত কোনো অনুষ্ঠানেও যোগ দিতেন না। দু' একবার রবিবারের সাহিত্য বাসরে এসেছেন, একবার কি দুবার কবিতা পাঠের আসরে অংশগ্রহণ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক। কিন্তু তিনি আজীবন চেষ্টা করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে কলকাথার মানুষের ভঙ্গি আয়ত্ত করতে। কিন্তু কলকাতায় মানুষ তাকে আপন বলে গ্রহণ করেনি। আর তিনি নিজেই তো পূর্ববঙ্গকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এটাই তার জীবনের চরম ব্যর্থতা।

॥৫১॥

আমরা তখন একটি বিস্ময়কর বিব্রত সময়ের মধ্যে বাস করছিলাম। দিনযাপনের মধ্যে ক্ষুব্ধতা ছিল, অসহায়তা ছিল এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ছিল। ১৯৪৫ সালেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়। এই যুদ্ধের প্রধান স্থপতি হিটলারের মৃত্যুসংবাদ আমরা পাই মে মাসের দিকে। হিটলারের মৃত্যুসংবাদ ভারতীয় জনসাধারণ নিশ্চিত মনে গ্রহণ করতে পারে নি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মানসিক বিরুদ্ধতার কারণেই হয়ত অনেকেই ধারণা করেছিল যে হিটলার বেঁচে আছে এবং আত্মগোপন করে আছে। আবার কোনো একদিন আসরে উপস্থিত হবে। ঠিক এমনিভাবে সুভাষ বসুর মৃত্যুকেও তারা মেনে নিতে পারেনি। কলকাতা রেডিওতে বীরেনদা অর্থাৎ বীরেন ভদ্র এবং সিনেমাশিল্পী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ছিলেন সুভাষ প্রেমিক। তারা বলছিলেন, 'সুভাষ বসুর খবর বেরুতে না বেরুতেই সুভাষ বসুকে এরা মেরে ফেলতে চাচ্ছে। সুভাষ বসুকে মেরে ফেলা এত সহজ না। বুঝলে, এটা একটা বিরাট ষড়যন্ত্র। ইংরেজদের সাহায্যে যারা ক্ষমতা দখল করতে চাচ্ছে তাদের ষড়যন্ত্র।' সে সময় সুভাষ বসুর সঙ্গী এবং আই এন এর অর্থাৎ সুভাষ বসুর জাতীয় সৈন্য দলের চিকিৎসক কর্নেল চ্যাটার্জী কলকাতায় ছিলেন। তার মেয়ে প্রিয়া চ্যাটার্জী পাশ্চাত্য সঙ্গীতে একজন বিবেচক শিল্পী।

কর্নেল চ্যাটার্জীরও ধারণা ছিল যে সুভাষ বসুর মৃত্যুসংবাদটি অস্পষ্ট এবং অপরিচ্ছন্ন। তার বিশেষ ধারণা ছিল সুভাষ বসু সম্ভবত মিত্রশক্তিদের হাতে বন্দী হয়েছেন এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সুভাষ বসুকে চিরকাল আড়ালেই রাখা হবে। হিটলার সম্পর্কেও একই ধরনের ধারণা এবং জিজ্ঞাসা চতুর্দিকে ছড়িয়েছিল। তবে হিটলারের

www.pathagar.com

মৃত্যুর ঘটনা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক জার্মানী আত্মসমর্পণ করেছিল ৭ মে তারিখে। জার্মানীর আত্মসমর্পণের ঘটনায় হর্ষোৎফুল্ল বৃটিশ সেনাবাহিনী কলকাতা নিউএম্পায়ারে এক বিরাট নৃত্যোৎসবের আয়োজন করেছিল। কলকাতা রেডিওর ইংরেজ ঘোষিকা ফ্রেডা রে আমাদেরকে নিউএম্পায়ারের অনুষ্ঠানে থাকার সুযোগ দিয়েছিলেন। মঞ্চে একগুচ্ছ স্বল্পবাসা ইংরেজ রমণীর নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল, মনে আছে।

যুদ্ধ শেষ হবার পরে ভারত বিভক্তির চাঞ্চল্যকর ঘটনা পরম্পরার মধ্যে আমি নতুন সংসার পাতার চেষ্টা করছিলাম। আমার প্রথম সন্তান জিনাত জন্মগ্রহণ করে ১৫ মার্চ ১৯৪৭। জিনাতের জন্মের ৪০ দিনের মধ্যেই আমি ঢাকায় বদলী হয়ে আসি। আমি তখন ঢাকায় আসতে চাইনি। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিভক্ত হবে জানতাম তবে কলকাতা থেকে আমরা বঞ্চিত হব এটা ধারণা করতে পারি নি। ভাল হোক মন্দ হোক কলকাতা শহরের আকর্ষণীয় একটি সত্তা ছিল। সর্বদাই এ শহর কর্মচঞ্চল এবং জীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তির লীলাকেন্দ্র। নির্জন অন্তরাল থেকে প্রচণ্ড উন্মুক্ততা কলকাতা শহরকে একটি বিপুল বিস্ময়ের রাজ্যে পরিণত করেছিল। যাকে বলে পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিত্ব, কলকাতা শহরের তেমনি একটি ব্যক্তিত্ব ছিল। এ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ভয়ংকর এবং সর্বগ্রাসী। আমি এই ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ ছিলাম। আমার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের প্রথম উদ্দীপ্ত ক্ষেত্র ছিল কলকাতা। শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের বহু বিচিত্র কল্লোল কলকাতা শহরে উচ্চারিত হত প্রতি মুহূর্তে। সে তুলনায় ঢাকা সেই সময়ে ছিল নিষ্প্রাণ এবং নিরুদ্বিগ্ন।

দেশবিভাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বেই আমি ঢাকায় বদলী হয়েছিলাম। তখন ভাল লাগেনি। কিন্তু পরে বুঝেছিলাম যে এ ব্যবস্থাটাই আমার জন্য কল্যাণকর ছিল। আমাকে কোনো প্রকার অপসনের দায়দায়িত্বের মধ্যে পড়তে হয় নি। স্বাধীনতার ঘোষণার পর প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীকে অপসন বা ইচ্ছা প্রকাশ করতে হয়েছিল যে সে ভারতে থাকবে না পাকিস্তানে যাবে। কলকাতা অবস্থিতিকালে আমাকে এ অপসনের দায়দায়িত্বে পড়তে হয় নি। আমার ক্ষোভ এবং বেদনা ছিল শুধু একটি বিষয়ের জন্যই। জীবনে সর্বপ্রথম ছোট্ট একটি সংসার পেতেছিলাম।

সে সংসারটি একটি আনন্দের বিগ্রহরূপে গড়ে ওঠার সুযোগ হতে না হতেই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে, এটাই আমার কাছে বেদনার বিষয় হয়েছে। আমার সে মুহূর্তে মনে হয়েছিল যে একজন মানুষ তার প্রথম জীবনে যদি একটি সংসারকে গড়ে তুলতে না পারে তাহলে হয়ত বা পরবর্তীকালে তার চলার পথে বিভ্রান্তি আসে। কেন মনে হয়েছিল জানি না, কিন্তু আমি নিজেকে তখন একজন অসহায় হৃদয়বান ব্যক্তি হিসাবে ভাববার চেষ্টা করছিলাম। কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের উন্মুখরতা আমার হৃদয়কে যখন একটি আনন্দের প্রদীপ করতে যাচ্ছিল তখন সে সময় আমাকে কলকাতা ছাড়তে হল। আমার মনে আছে আমি আমার বদলীপত্র বাতিল করবার জন্য স্টেশন ডিরেক্টর অশোক সেনের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। অশোক সেন ছিলেন, এক ধরনের নকল মানুষ যাকে ইংরেজীতে বলে আর্টিফিসিয়াল। মেপে মেপে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলতেন। হিসেব করে হাত নাড়তেন অর্থাৎ তার অঙ্গভঙ্গি এবং কথাবার্তা কোনোটির মধ্যেই সচল স্বাভাবিকতা ছিল না। ভদ্রলোকের কাছে কোনো প্রকার আশ্বাস পেলাম না। কিন্তু আমার একটি চৈতন্যোদয়

www.pathagar.com

হল। অকস্মাৎ আমার মনে হল এই চাকরি থেকে আমার সরে যাওয়া প্রয়োজন। কেননা যে সমস্ত নিম্নমানের লোকের সামনে আমাকে বিনীত হতে হচ্ছে, আরও কিছু দিন থাকলে এর ফলে আমি ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়ব।

রেডিওর পক্ষ থেকে আমাকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু সংবর্ধনাটি আমি গ্রহণ করি নি। গ্রহণ করব না এ কথা বলি নি কিন্তু সংবর্ধনার দিন উপস্থিত হই নি। আমি জীবনে রেডিওর কর্মকাণ্ড থেকে সরে আসার সময় রেডিও অফিসের কাছ থেকে কোনও রূপ সংবর্ধনা নেই নি, কলকাতায় যেমন নয় ঢাকায়ও তেমনি নয়।

আবদুল হালিম গজনবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। রেডিওর সুবাদেই তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। অত্যন্ত সজ্জন হাসিখুশী ব্যক্তিটি কথাবার্তায় কিন্তু গ্রামীণ। আমার ঢাকা যাওয়ার কথা শুনে খুব খুশী হলেন। বললেন, 'এখানে থেকে কি করবেন। এখানে তো আস্তে আস্তে হারিয়ে যাবেন। ঢাকায় গেলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।' আবদুল হালিম গজনবীর বাসায় শিল্পপতি নলিনী রঞ্জন সরকার ছিলেন, তাকে বাসায় আগেও আমি দেখেছি। তিনিও আমার ঢাকা যাওয়াটাকে সমর্থন করলেন।

একজন মানুষের জীবনে বিভিন্ন ঘটনা এবং কর্ম নানারকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সব প্রতিক্রিয়াই যে চিরস্থায়ীভাবে থাকে তা নয়। কিন্তু কোনো কোনো প্রতিক্রিয়া আমাদের চিন্তায় সর্ব সময়ের জন্য গ্রাহ্য মানবিক বোধে রূপান্তরিত হয়। এ সমস্ত প্রতিক্রিয়া একজন মানুষের জীবনে স্বার্থ ও স্বস্তির জন্য আদর্শস্বরূপ হয়। এগুলো তার বিশ্বাসে পরিণত হয়ে একটি নতুন তাৎপর্যে গুণান্বিত হয়। আমি যখন কলকাতা ছেড়ে চলে আসছি আমার মনে নানা রকমের প্রতিক্রিয়া জেগেছিল। তার মধ্যে একটি প্রধান প্রতিক্রিয়া ছিল যে আমাকে একটি নতুন ভূমণ্ডলে নতুন জীবনের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। এটা ক্রমশ একটি বিশ্বাস এবং প্রতিজ্ঞায় রূপান্তরিত হয়েছে। তাই ফিরে যাবার মুহূর্তে কলকাতা বেতারের কোন কলগুঞ্জন শুনতে চাই নি। একজন মানুষকে সময়ের নির্দেশ মানতেই হয়। আমাদের কর্মের পৃথিবীতে বিভিন্ন কর্তব্যের সময়রেখা আঁকতেই হয়। তা না হলে বিশৃংখলা আসে, অব্যবস্থা আসে। আমি আমার পিতামাতার কাছ থেকে ধর্মের অনুশাসন পেয়েছি। এ অনুশাসন মান্য করে দেখেছি যে সমাজে যত অকুশলতা আছে, তাকে দূর করতে গেলে ধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রয়োজন। সকল অবস্থানে সন্তুষ্ট থাকা এবং এই বিশ্বাস মনে রাখা যে বিধাতা যা করেন তা ভালর জন্যই করেন। এটাই কিন্তু জীবনে অগ্রসরমানতার সোপান। তাই মনকে স্থির করে নতুন জীবনের দিকে পা বাড়াবার মনস্থ করলাম। আমি আমার একটি কবিতায় লিখেছিলাম যে 'আমি কোন অসম্ভব যন্ত্রণায় শেষ হব জানি না, শুধু প্রার্থনা করি নিঃশেষিত হবার পূর্বে একটি চরম প্রশান্তিতে অপরাহ্নের নির্জনতায় কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম ফুলের মত যেন ঝরে পড়তে পারি। মানুষ হিসাবে আমার সকল আনন্দ যেন বাতাসে ছড়িয়ে যায়।

এভাবেই ১৯৪৭ সালে কলকাতা ত্যাগের প্রাক্কালে একটি নতুন জীবনের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হবার জন্য আগ্রহী হলাম।

www.pathagar.com

যে যার বৃত্তে

॥১॥

কলকাতায় থেকে ঢাকায় এলাম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তিন মাস পূর্বে। একটি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তা আমার জন্য ভালই হয়েছিল। নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশে আমরা কয়েকজন মিলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। নাজির আহমদ ও আবদুল আহাদ তখন ঢাকায়। পাকিস্তানে রেডিওর প্রারম্ভিক দিনগুলোতে কি গান প্রচারিত হবে অথবা কি ধরনের কথিকা প্রচারিত অথবা কি ধরনের নাটক পরিবেশিত হবে সেজন্য বিশেষ পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল। একাজ নাজির আহমদ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছিলেন। নাজির আহমদ অনেক গান রচনা করেছিলেন। সেগুলোতে সুর দিয়েছিলেন আবদুল আহাদ, সাঈদ সিদ্দিকীও কিছু গান রচনা করেছিলেন। এভাবেই নতুন সম্ভাবনার মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। যেদিন বেতার ভবনের উপরে পাকিস্তানের পতাকা উড়লো সেদিন আমরা অনেক আশা নিয়ে নতুন সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। ঢাকা থেকে হিন্দু কর্মচারীরা বদলী হয়ে ভারতে চলে গেলেন। আবার কলকাতা ও দিল্লী থেকে মুসলমান কর্মচারীরা ঢাকায় এলেন। আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একজন ছিলেন বাঙালী। রেডিওর কর্মকাণ্ড শুরুর পর এ লোকটির সঙ্গে আমাদের বিশ্বস্ততার অভাব ঘটে। এ লোকটির নাম ছিল মুলতান এফ. হোসেন। তিনি আমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন। কিন্তু একটি বিশেষ সুযোগ পেয়ে তাকে আমরা জব্দ করেছিলাম।

দেশ বিভাগের কয়েক মাস আগে আমি ঢাকায় বদলি হয়ে আসি– কলকাতার অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে ঢাকার অল ইন্ডিয়া রেডিওতে। তখন ঢাকার রেডিও অফিস ছিল নাজিমউদ্দীন রোডে। এ বাড়িটা আমি শৈশব থেকেই চিনি। আমার বন্ধু জামালউদ্দিনের পিতা খান বাহাদুর নাজিমউদ্দিন আহমদের বাড়ি এটা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ছিলেন। শান্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ তাঁকে দেখলেই শ্রদ্ধা হত। গেট দিয়ে ঢুকলেই হাতের ডান পাশে পরিচ্ছন্ন লনে তিনি বিকেল বেলা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়তেন। ঢাকা রেডিও অফিসেও এসে আমি কেমন যেন অন্ধকারে পড়লাম। কলকাতার উচ্ছ্বাস উৎসব এবং বিস্তার ঢাকায় ছিল না। কিন্তু সংকীর্ণতা ছিল ঈর্ষাকাতরতা ছিল এবং অশ্লীল ইঙ্গিতময়তা ছিল। অবশ্য সম্ভ্রম এবং আনন্দ কখনও কখনও উচ্চকিত হত না, তাও নয়। প্রথম থেকেই আমি ঢাকা রেডিওর আচ্ছন্নতা থেকে বেরিয়ে আসার কথা ভাবতে লাগলাম।

এ অফিসে একজন প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ ছিলেন তার নাম শামসুর রহমান। ভদ্রলোকের বাড়ি ছিল সম্ভবত যশোরের দিকে। লম্বাটে মুখ, ফর্সা দাড়িগোফ কামানো। কিন্তু জুলফিটা একটু লম্বা। ভদ্রলোক তার জুলফি নিয়ে বহুবিধ কারুকর্ম করতেন। কখনও চিন্তিত হলে জুলফি টানতেন এবং দু-একটা চুল হাতে এলে চোখের সামনে

www.pathagar.com

ধরতেন অবশেষে তা একটি কৌটায় ভরতেন। কেন এ কাণ্ড করতেন, জানি না, কিন্তু এটাই ছিল ভদ্রলোকের মুদ্রাদোষ। উপরওয়ালাকে তোষণ করবার আশ্চর্য ভাষা ভদ্রলোকের ছিল। স্টেশন ডিরেক্টরের সামনে বিগলিত ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়াতেন। ভদ্রলোকের অবিকল বিপরীত চরিত্রের ছিলেন সাদেকুর রহমান বলে একজন প্রোগ্রাম এসিস্ট্যান্ট। অত্যন্ত চঞ্চল, চলছেন যেন দৌড়চ্ছেন এবং সদাসর্বদা ঢাকাইয়া ভাষায় কথা বলতেন। একদিন ঘোষক আসে নি। সুতরাং ডিউটি অফিসার হিসাবে সাদেকুর রহমান ঘোষকের বুথে বসে গ্রামফোন রেকর্ড চালিয়ে বলেছিলেন– 'এবার একখানা গ্রামোফোন রেকর্ড চাপান দিলাম। ভদ্রলোক রেডিওতে বেশিদিন থাকেন নি। আগে থেকেই তার ব্যবসা ছিল। রেডিও ছেড়ে পুরোদমে ব্যবসায় নেমে পড়লেন। ব্যবসায় প্রভূত উপার্জন করেছিলেন, শুনেছি সে সময় একদিন রেডিও অফিসে এসে তার ঐশ্বর্যের ছটা দেখিয়ে গিয়েছিলেন। তখন তার দুহাতে ছিল আটটি সোনার আংটি– একেকটি আংটিতে একেক রঙ্গের পাথর। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, এতগুলো আংটি পরছেন কেন? ভদ্রলোক উত্তরে বলেছিলেন, বুঝলে তো কামই হইত। এগুলোতেই আমার ভাগ্য ফিরছে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আংটিতে টাকা এসেছে, না টাকা আসার পর আংটি পরেছেন? ফররুখ সেখানে ছিল। ফররুখকে দেখে ভদ্রলোক অপরিসীম ঔদার্যে বলেছিলেন, তোমার টাকা পয়সার দরকার থাকলে বইল, জোগাড় কইরা দিমুনি। ফররুখ উত্তরে বলেছিল, আমার দরকার একটা লাঠির। ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছিলেন, লাঠি দিয়া কি কোরবা, লাঠির কি কাম? ফররুখ উত্তরে বলেছিল, আপনার মাথায় ভাঙ্গবো। এরপর আর আমাদের সংলাপ ভালো জমে নি। কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে বিমলদা এসেছিলেন, নির্মলেরও আসার কথা ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসে নি।

তখন ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানের জন্য প্রস্তুতি চলছে। বিমল দাও সেই প্রস্তুতিতে অংশ নিয়েছিলেন। পাকিস্তানের ঘোষণা হয়ে যাবার পর কলকাতা থেকে আরও অনেকে চলে এলেন, আবদুল আহাদ, ফতেহ লোহানী, আব্বাস উদ্দীন এবং আরও অনেকে। শামসুল হুদা চৌধুরী তখন এল না। সে প্রথমে অপ্ট করেছিল ভারতে থাকবে বলে এবং কলকাতা রেডিওর প্রথম স্বাধীন ভারতীয় উদ্বোধনে অংশগ্রহণ করেছিল। ব্রিটিশ সরকার দুবার অপসনের সুযোগ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বারের অপশনে শামসুল হুদা ঢাকায় চলে আসে।

আমি থাকতাম রেডিও অফিসের কাছেই হোসেনী দালান রোডে। কলকাতার মত এখানেও বাংলা, ইংরেজি কথিকা এবং রোববারের সাহিত্য বাসরের ভার পড়ল আমার উপর। এ কাজগুলো আমার জন্য খুব সহজ ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছিলেন, যারা পূর্বে কোনদিন রেডিওতে আসেন নি, তারা ক্রমান্বয়ে রেডিও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লাগলেন। সাহিত্য বাসরের জন্য আমি পেলাম ত্রিপুরা শংকর শাস্ত্রী অর্জিত গুহ, কিরণশংকর সেন গুপ্ত, কাজী মোতাহার হোসেন প্রধানত এই কয়জনে। ত্রিপুরাশংকর সেন ছিলেন জগন্নাথ কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক। চিবিয়ে চিবিয়ে খুব সুস্পষ্ট আড়ম্বরে কথা বলছেন। এ কথা বলার সময় মাঝে মাঝে তার দাঁতে দাঁতে শব্দ হতো। তাতেই বুঝতে পারতাম তার দাঁত ছিল নকল। ভদ্রলোক গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতা খুব সুন্দর আবৃত্তি করতে পাতেন। অজিত গুহ একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন পরে তিনিও জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক হন। কিরণশংকর বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রবীণ কবি। সাহিত্য বাসরে একদিন আলোচনার বিষয় ছিল ইকবাল ও নজরুল

www.pathagar.com

ইসলাম। আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন, অজিত গুহ এবং ত্রিপুরা বাবু। রিহার্সেলের সময় কাজী সাহেব হঠাৎ এক পর্যায়ে বললেন, ইকবালকে আমি কবি বলেই মনে করি না, যে কবি একটি রাজনৈতিক চিন্তার জনক তাকে কি করে কবি হিসাবে স্বীকার করা যায়? তাছাড়া যিনি নিজের মাতৃভাষায় কবিতা না লিখে ফারসী ভাষায় কবিতা লেখেন তাকে আর যাই হোক দেশপ্রেমিক বলা যায় না। যে সময়ের কথা বলছি তখন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এবং সংস্কৃতিবান ব্যক্তিবর্গ ইকবালকে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। দেশ বিভাগের পূর্ব থেকে আমরা যে ইকবালকে জানতাম সেই ইকবাল এবং পাকিস্তানের ইকবালকে আমাদের কাছে ভিন্ন মনে হচ্ছিল। ইকবালের সঙ্গে কবি আমির চক্রবর্তীর সাক্ষাতের বিবরণ আমরা পড়েছি, তাঁর কিছু অনুবাদও আমরা দেখেছি। তাঁর লেখায় ইকবালকে আমরা মানবতাবাদী কবি হিসাবেই পেয়েছিলাম।

তাই হঠাৎ করে ইকবালকে পাকিস্তানী আদর্শের কবি বলে আমরা মেনে নিতে পারি নি। পাকিস্তান আমলের এই ভুল বিবেচনাটি পূর্ব-পশ্চিম উভয় অঞ্চলের মধ্যে মিলনের অন্তরায় হয়েছিল। অনেক পরের ঘটনা হলেও এই সূত্রে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। পাকিস্তানের একজন শিক্ষা সচিব একবার প্রস্তাব করেছিলেন যে ইকবালের সমাজতান্ত্রিক কবিতা এবং মানবতাবাদী কবিতাগুলো বাঙ্গালীদের চোখে যাতে না পড়ে সে চেষ্টা করা দরকার এবং প্রচুর পরিমাণে ইকবালের ইসলামী কবিতাগুলোর বাংলা অনুবাদ পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে দেয়া দরকার। যিনি বলেছিলেন তার নাম ওয়াহেদ বখশ কাদরী এবং যার সামনে এ কথাটি বলেছিলেন তিনি কাজী আনোয়ারুল হক, সে সময়কার শিক্ষামন্ত্রী। কাব্যকে এবং সাহিত্যকে একটি নির্লজ্জ ধর্মীয় প্রচারের বাহন করবার যে অপচেষ্টা তখন হয়েছিল, তাতে আমরা একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম। ইকবালের মত একজন মহৎ কবিকে একটি ক্ষুদ্রগণ্ডির মধ্যে টেনে এনে দেশের মধ্যে একটি বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছিল। পাকিস্তানের শুরুতেই এই বিভাজনের প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করেছিলাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

বিয়েট্রিস ওয়েব তাঁর মাই এপ্রেনটিস নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে মানুষের আত্মগত অনুভূতির দুটি দিক আছে– একটি স্বীকৃতির পক্ষে এবং অপরটি অস্বীকৃতির পক্ষে। যেদিকটি স্বীকৃতির পক্ষে সে দিকটিকে আঘাত করলে অস্বীকৃতির দিকটি প্রাধান্য নিয়ে জেগে ওঠে। আমাদেরও হয়েছিল তাই। ইকবালের যে দিকটিকে আমরা স্বীকার করতাম সে দিকটির সমর্থন আমরা পাই নি তাই সামগ্রিকভাবে ইকবালকে পাকিস্তানের ভাষান্তর ধরে নিয়েছিলাম। এভাবে ইকবাল আমাদের চৈতন্যকে আলোড়িত করতে পারেন নি। ইকবালের বিভিন্ন গানে এবং কবিতায় মানুষের আত্মবিশ্বাসের যে স্ফূর্তি আছে তাকে অবলম্বন করে মানুষের চিত্ত প্রসন্ন হয়। তাঁর তুলু-এ-ইসলাম গানটি এক্ষেত্রে অনবদ্য। তিনি প্রথাগত অর্থে ধার্মিক ছিলেন না। কিন্তু মৌলিক অর্থে যথার্থ ধার্মিক ছিলেন। মানুষের পাপবোধ এবং অসহায়বোধ সত্যের স্পর্শে দূর হয়। ইকবাল সেই সত্যের স্পর্শে উজ্জ্বল হয়েছিলেন। ফার্সী ভাষা তাঁকে সেক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল।

পারিবারিক পরিবেশে এবং ঐতিহ্যগত দিক থেকে ফার্সী ভাষা আমাদের আয়ত্তে এসেছিল। এ কারণে ইকবালের মূলকাব্য পাঠ করতে আমার কখনও অসুবিধা হয় নি।

www.pathagar.com

আমি অনেক দিন ধরে চিন্তা করেছিলাম ইকবালের কিছু অনুবাদ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে। সেটি সম্ভব হয় ১৯৫২ সালে। ১৯৪০-এর পর থেকে ফররুখ এবং আবুল হোসেন ইকবালের কিছু অনুবাদে হাত দিয়েছিল। আমিও কিছু অনুবাদ করেছিলাম। আসরারে খুদীর সূত্রপাতের কবিতাটি আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমি সেটির অনুবাদ করেছিলাম। এ সমস্ত অনুবাদ সংগ্রহ করে বাংলাবাজারের প্যারাডাইস লাইব্রেরীর প্রকাশনায় এবং আমার সম্পাদনায় 'ইকবালের কবিতা' নামক সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে আমার একটি ভূমিকা ছিল এবং গ্রন্থের শেষে ইকবালের একটি জীবনপঞ্জী ছিল। এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় ইকবালের ওপর যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে এ গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা আধুনিক এবং বাঙ্গালী মানসের সমর্থক। বিশেষ করে আবুল হোসেনের অনুবাদগুলো বাংলা ভাষার স্বভাব এবং রুচির সঙ্গে সহজে মিলিত হতে পেরেছিল। আবুল হোসেন স্বচ্ছ ও ঋজু ভঙ্গিতে ইকবালের কয়েকটি খণ্ড কবিতার অনুবাদ করেছিল। মূলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আমাদের নৈমিত্তিক বাচনভঙ্গিকে অবলম্বন করে আবুল হোসেন ইকবালের ভাষান্তর ঘটিয়েছিলেন।

এ সময়কালে সম্পর্কে একটি চিন্তা মনে দানা বেঁধেছিল। চিন্তা পূর্ব থেকেই ছিল। কিন্তু একটি বিশেষ রূপ ধারণ করে ১৯৪৮ সালের দিকে। তখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক প্রকার বিস্ময়কর "আলোচনা এজন্য যে আমাদের উচিত বাংলা ভুলে যাওয়া।" এই বলে তিনি মৌলবী জুলফিকার আলীর দিকে লক্ষ্য করে বললেন "এই যে মৌলবী সাহেব বহুদিন ধরে আরবী অক্ষরে বাংলা পত্রিকা চালিয়ে যাচ্ছেন, এতেই বোঝা যায় যে আরবী অক্ষরে বাংলা লেখা যায়। তাছাড়া আমি শুনেছি এক সময় মুসলমানরা আরবী অক্ষরে পুঁথি রচনা করত। কি বলেন শহীদউল্লাহ সাহেব?"

শহীদুল্লাহ সাহেব এতক্ষণ ফজলুর রহমান সাহেবের দীর্ঘ বক্তৃতা শুনছিলেন। এবার তিনি ধীরে ধীরে মন্তব্য করলেন, "সিন্ধী ভাষার জন্য আরবী অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছিল, কিন্তু সিন্ধী ভাষায় এমন কতকগুলি ধ্বনি আছে যেগুলো আরবী বর্ণমালার সাহায্যে পরিস্ফুট করা যায় না"। তাই তাদের নতুন কিছু চিহ্ন উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। যার ফলে সিন্ধী লিখন পদ্ধতি আরবী লিখন পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও বর্তমানে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলার জন্য যদি আরবী হরফ ভিত্তি করতে হয়, তাহলে সিন্ধীর মত সেখানে অনেক নতুন চিহ্ন এবং সংকেত সৃষ্টি করতে হবে, যার ফলে আরবী বর্ণমালা আর আরবী থাকবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার অধিকাংশ ধ্বনি বাংলায় বর্ণলিপির সাহায্যে ব্যক্ত করা যায়। সুতরাং এই বর্ণলিপি অস্বীকার করবার কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাকতে পারে না। আরবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আমরা আরবীকে বিশ্ব মুসলমানের রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করতে পারি। কিন্তু তাই বলে একটি সুস্থির বর্ণলিপি অগ্রাহ্য করে অন্য একটি অপরিস্ফুট বর্ণলিপি গ্রহণ করার কোন যুক্তি হয় না।

কবি জসীমউদ্দীন এতক্ষণ কিছু বলেন নি। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ হাস্যচঞ্চল ভঙ্গিতে বললেন, "আমার কবিতা আরবীতে লিখলে কবিতার ছন্দ নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া মিলেরও গণ্ডগোল হবে বলে মনে হচ্ছে। আমার মনে হয় বাংলা কবিতা বাংলা অক্ষরেই লিখতে হবে, অন্য কোনো অক্ষরে লেখা যাবে না।"

www.pathagar.com

আমি সেদিন এই আলোচনাকে উপভোগ করেছিলাম কিন্তু একেবারেই অংশগ্রহণ করি নি। কেননা সমগ্র বিষয়টি আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল ফজলুর রহমান সাহেব আরবী হরফ প্রচলনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে সরকারি পয়সায় হুরুফুল কোরান সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হল। এবং শিক্ষা বিভাগের একজন স্কুল ইন্সপেক্টরকে এর দায়িত্বে নিযুক্ত করা হল। তাছাড়া সরকারিভাবে পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ডক্টর শহীদুল্লাহকে অনুরোধ করা হল, বৈজ্ঞানিকভাবে আরবী বর্ণমালা বাংলা ধ্বনির উপযুক্ত করতে গেলে কি কি সংশোধন প্রয়োজন তা যেন তিনি পরীক্ষা করে সরকারকে জানান। চিঠিটা লিখেছিলেন ডক্টর মাহমুদ হাসান। তিনি তখন ছিলেন পাকিস্তানের শিক্ষা উপদেষ্টা অর্থাৎ শিক্ষাসচিব। শহীদুল্লাহ সাহেব এই চিঠি পেয়ে খুবই ক্ষুব্ধ হন এবং ঢাকায় উপস্থিত আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে আরবী হরফে বাংলা লিখবার সরকারি প্রয়াসকে নিন্দা করে বিবৃতি দেন। এর পরবর্তী ঘটনার কথা আমার মনে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব শেষে উপাচার্য ডক্টর মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসগৃহে বিকেলবেলা একটি সংবর্ধনা ছিল। উক্ত সংবর্ধনায় ডক্টর হাসান উপস্থিত ছিলেন। সংবর্ধনা উৎসবে শহীদুল্লাহ সাহেবকে দেখে ডক্টর হাসান দ্রুত এগিয়ে গিয়ে শহীদুল্লাহ সাহেবকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, ইউ শহীদুল্লাহ ইউ আর এ ট্রেটর। আপনি একটি বিদেশী পত্রিকায় দেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন।: মোয়াজ্জেম হোসেন তাড়াতাড়ি এসে শহীদুল্লাহ সাহেবকে সরিয়ে নিলেন।

এর পরবর্তী ঘটনা রেডিওর জন্য উল্লেখযোগ্য। আমরা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিষয়ে কথিকা পাঠের জন্য শহীদুল্লাহ সাহেবকে ডাকতাম। কিন্তু অকস্মাৎ নিষেধাজ্ঞা এল যে, শহীদুল্লাহ সাহেবকে রেডিওর কোনো অনুষ্ঠানে ডাকা যাবে না। এই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল আরও একজন প্রসিদ্ধ বাঙালীর বিরুদ্ধে। তিনি হচ্ছেন ডক্টর কুদরত-ই খুদা।। পাকিস্তানের রেডিওর কর্তৃপক্ষের এই বিস্ময়কর উন্মত্ততার কথা আমি কখনও ভুলব না। সে সময় করাচীর 'ডন' পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছিল যে শহীদুল্লাহ সাহেব ইচ্ছা করলে তার নিজের দেশ পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে পারেন। যেহেতু সে দেশের প্রতি তার প্রধান আকর্ষণ। এ মন্তব্যে শহীদুল্লাহ সাহেব খুব দুঃখ পেয়েছিলেন।

তিনি একদিন কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন, "আমি রাজনীতি করি না, রাজনীতির কলা-কৌশলও জানি না, ভাষার ক্ষেত্রে যা ন্যায়সঙ্গত এবং বৈজ্ঞানিক তা আমি বলেছি এবং চিরকাল বলবো।"

সে সময় একটি চরম নির্বুদ্ধিতা এবং বিকারগ্রস্ততা পাকিস্তানী প্রশাসকদের পেয়ে বসেছিল। তারা ভবিষ্যতে কি হতে পার- সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন নি, কল্পনাও করতে পারেন নি। তারা উঠেপড়ে লেগেছিলেন, সর্বক্ষেত্রে বাঙালীর নিজস্বতা নষ্ট করতে। কিন্তু তা যে অসম্ভব তা তাদের বুদ্ধির অধিগম্য ছিল না।

আনন্দের উৎসর্গ হচ্ছে ইসলাম এবং ইসলামের অন্তর্নিহিত ভাবাবেগ। যে কোনও পরিবেশে ইসলামের বিকাশ ঘটতে পারে এবং যে কোনোও বিরুদ্ধ পরিবেশকে ইসলাম পরিবর্তিত করতে পারে। আমার পারিবারিক বিশ্বাসের পটভূমি ছিল সুফী মতবাদের অসাম্প্রদায়িক বিনয়, মমতা এবং আত্মনিবেদন। এর ফলে কোনও ধর্মের প্রতিই আমার

www.pathagar.com

বিতৃষ্ণা ছিল না, আবার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের মধ্যেই সকল ধর্মের সারতত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করতাম। সংস্কৃতি নিয়ে নানা ধরনের চিন্তা যখন আমার মনের মধ্যে কাজ করছে তখন গল্প লেখক মখদম এবং আহসানউল্লাহ্ লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ কাশেম আমাকে দশম শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী একটি বিশেষ ইংরেজি পাঠ্যগ্রন্থ রচনার অনুরোধ করেন।

সে অনুরোধেই আমি আওয়ার হেরিটেজ বা আমাদের ঐতিহ্য নামক গ্রন্থটি রচনা করি। গ্রন্থটিতে প্রথমপর্বে রাসূলে-খোদা, আবু বকর, ওমর, ওসমান এবং আলী এঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত এবং আদর্শের কথা ছিল। দ্বিতীয় পর্বে যার নাম দেয়া হয়েছিল ধারাক্রম, ইমাম আবু হানিফা আল-গাজ্জালী রুমী এবং ইবনে খালদুনের জীবনী ছিল। তৃতীয় পর্বে যার নাম দেয়া হয়েছিল শেষ উচ্ছলতা, আলোচিত হয়েছিল আলফই-সানি, আলমগীর এবং ইকবালের কথা। এ গ্রন্থ রচনার সময় হাবিবুল্লাহ বাহারের সঙ্গে আমি আলোচনা করেছিলাম। তিনি আলমগীরের কথা বাদ দিয়ে দারাশিকোহ এবং আকবরের কথা লিখতে বলেছিলেন। ফররুখ কিন্তু এতে রাজী হয় নি। হাবিবুল্লাহ বাহারের বক্তব্য ছিল যে দারাশিকোহ ছিলেন উদার মুসলমান, পণ্ডিত তত্ত্বজ্ঞ এবং সূফী রাজপরিবারে ব্যাপক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। কোরান শরীফ শিখেছিলেন শৈশবেই, কাব্য ও ইতিহাসে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। ক্রমশ আরবী হস্তলিখনে পারদর্শী হয়েছিলেন। ভাষাজ্ঞানও তাঁর ছিল অসাধারণ। মাতৃভাষা ফার্সী ছাড়াও আরবী শিখেছিলেন, তুর্কী ও সংস্কৃত শিখে ছিলেন সংস্কৃত থেকে উপনিষদের অনুবাদ করেছিলেন ফার্সীতে। ধর্ম, দর্শন এবং মরমীবাদে দারাশিকোহর আনন্দ ছিল। তিনি সূফীচর্চায় দীক্ষালাভ করেছিলেন লাহোরের বিখ্যাত দরবেশ মিয়া মীরের কাছে।

বাবা বলতেন যে আলমগীর ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে বিশ্বাস করতেন যে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহই তাঁর একমাত্র রক্ষাকারী। তিনি আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে মৃত্যু চেয়েছেন এবং সৎকর্মশীলদের সঙ্গী হতে চেয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে যদি আল্লাহ তাঁর সাহায্যকারী হন তাহলে কেউ তাঁকে পরাজিত করতে পারবে না। বাবার এসব কথায় আমি বিশেষভাবে অভিভূত হয়েছিলাম। তাছাড়া তৎকালীন সময়ের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিক্ষুব্ধতার পটভূমিতে আলমগীরকে সমর্থন করাই আমি সমীচীন বিবেচনা করেছিলাম। দারাশিকোহর পাণ্ডিত্য ও ঔদার্যের প্রতি আমার দুর্বলতা ছিল ঠিকই কিন্তু তৎকালীন সময়ের অনুশাসনে আলমগীরকে উপস্থিত করাই আমি প্রয়োজন বোধ করেছিলাম।

১৯৪৮-এর শেষে সম্ভবত কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মাহমুদ আলী কাসুরী নামক খ্যাতনামা আইনবিদ ছিলেন। এঁরা যতদূর মনে পড়ছে মুসলিম লীগের কোনও একটা মিটিং-এর জন্য ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁদের আপ্যায়নের জন্য কার্জন হলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান, যে-রকম সাধারণত আমাদের দেশে হয়ে থাকে। অনুষ্ঠান শেষে কাসুরী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। ধন্যবাদের এক পর্যায়ে বলেছিলেন যে বাঙালী নৃত্যগীত দেখে তাঁরা খুব আনন্দিত হয়েছেন। তবে তাঁরা আশা করেন যে আগামীতে যখন আসবেন, তখন বঙ্গাল মুলুকে তাঁরা পাকিস্তানী নৃত্যগীত দেখতে পাবেন। কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালীর সঙ্গে তাঁদের নৃতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্যটি মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা ঐক্য সন্ধান করেছিলেন পার্থক্যকে দূর করে। এটা যে কোনও ক্রমেই

www.pathagar.com

সম্ভবপর নয়, তা তাঁরা বুঝতে চাননি এবং সরকারী ব্যবস্থাপনায় চেষ্টা করেছিলেন ঐক্য নির্মাণ করতে। ন্যাশনাল ইনটিগেশেন বা জাতীয় সংহতির নামে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তা ছিল অবিবেচনা এবং নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত তবে পশ্চিম পাকিস্তানের সবাই যে একই মনোবৃত্তির ছিলেন তা নয়। কিন্তু তারা সরকার বিরোধী ছিলেন বলে অথবা বলা যায় সরকারি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না বলে তাদের ইচ্ছা বা বিবেচনার কোনও গুরুত্ব ছিল না। মনে আছে মিয়া ইফতিখারুদ্দীনের সঙ্গে এ সময় আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের বিত্তবান জমিদার।

পাকিস্তান টাইমস পত্রিকার মালিক কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এক ধরনের মার্কসবাদী। কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। মাওলানা আকরম খাঁ তখন ঢাকেশ্বরী এলাকায় জমি বরাদ্দ পেয়ে ঢাকায় আজাদের কল্পনা করেছেন এবং একটি অস্থায়ী বাসস্থানও গড়েছেন। সেখানে একদিন সকালে গিয়ে মিয়া ইফতিখারুদ্দীনের সঙ্গে পরিচিত হই। তিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কথায় কথায় পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির কথা উঠল। মিয়া সাহেব বললেন, আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আছে। সে বৈচিত্র্যকে যদি আমরা সম্মান না করতে পারি, তাহলে দেশের জন্য শুভ হবে না। মিয়া সাহেবের কথার কেউ মূল্য দেয় নি। একই সময়ে সরকারি খরচায় ঢাকায় এসেছিলেন পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীতের কবি হাফিজ জলন্ধরী। ভদ্রলোককে আমার খুব নিম্নমানের মনে হয়েছিল, কেমন এক প্রকার অশ্লীল ও ক্লেদাক্ত ভঙ্গীতে ভদ্রলোক ঘাড় বাঁকা করে কথা বলতেন। অহমিকা ছিল প্রচণ্ড। বাঙালীদের প্রতি তার কোন শ্রদ্ধাবোধ ছিল না।

ইতিহাস রচনা করেছিলেন 'শাহনামা-ই-ইসলাম' নামে। মধ্যযুগীয় স্থূলতা নিয়ে উর্দু কাব্যক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করতেন। ঢাকায় এসে বাঙালীদের মনে পাকিস্তানের প্রতি প্রেম জাগরিত করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। সে সময়কার আর একটি ঘটনার কথা বলি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী রানা লিয়াকত আলী ঢাকায় এসেছিলেন। তিনি ছিলেন 'আপওয়া' নামক একটি মহিলা সংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী। ঢাকায় আপওয়ার একটি শাখা ছিল, সেখানে একটি সমাবেশে বক্তৃতা করেছিলেন। বাঙালী মুসলমান মহিলাদেরকে হিন্দুত্ব বর্জন করে যথার্থ মুসলমান হতে বলেছিলেন। বলে ছিলেন, 'আপনারা শাড়ির মতো নাঙ্গী পোশাক বাদ দিয়ে গারারা-কামিজ পরুন। তখন উপস্থিত মহিলাদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন, 'হযরত আয়েশা সিদ্দিকা কি গারারা-কামিজ পরতেন? বেগম লিয়াকত আলী জানতে চেয়েছিলেন, 'আয়েশা সিদ্দিকা কোউন থি?' অর্থাৎ আয়েশা সিদ্দিকা কে ছিলেন ?

মানুষের পরিচয়ের মণ্ডল বা বৃত্ত সীমাবদ্ধ থাকে। এ বৃত্তের সম্প্রসারণও ঘটতে পারে আর সংকোচনও ঘটতে পারে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের বৃত্ত সম্প্রসারিত হবে ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখা গেল, আমরা নিজ নিজ বলয়ের মধ্যেই আবর্তিত থাকলাম। একটি বৃহত্তর বলয়ে আবর্তিত হতে পারলাম না। প্রথম প্রথম যে কারণগুলো ধরা পড়ল তা হচ্ছে অহমিকার প্রাবল্য এবং ত্যাগ ও অনুভূতির অভাব। সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতির দায় ভাগে যে সম্প্রসারণ এবং সম্মিলনে সম্ভব ছিল তাও তখন ঘটল না। যারা চিন্তাশীল ছিলেন তাঁরা বিক্ষুব্ধ চিত্তে শুধু ভাবতে লাগলেন, কি করে সম্প্রীতিটা নির্মাণ করা যায়।

www.pathagar.com

॥২॥

পাকিস্তান আমলের সূত্রপাতে রেডিও পাকিস্তান ছিল উর্দু ভাষার আদর্শ এবং তাৎপর্য প্রচারের কেন্দ্রভূমি। সে সময় প্রায়ই একজন ভদ্রলোকের নাম শুনতাম মৌলবী আবদুল হক, তাকে বলা হত, রাবায়ে উর্দু অর্থাৎ উর্দু ভাষার পাতা বা পিতৃপুরুষ। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফললুর রহমান সাহেব শিক্ষাবিষয়ক একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনের নাম ছিল এডুকেশন অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল। বৈঠকগুলো হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের বাসগৃহে। আমি রেডিওর তরফ থেকে বৈঠকগুলোতে উপস্থিত ছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল বৈঠকের কর্মকাণ্ডের বিবরণ রেডিওর মাধ্যমে প্রচার করা। উক্ত বৈঠকে আমি উক্ত মৌলবী আবদুল হককে প্রথম দেখি। সাদা দাড়ি, সাদা চুল, শেরোয়ানী পরিহিত দীর্ঘকায় মৌলবী আবদুল হককে দেখতে সৌম্য সাধক মনে হয়েছিল। মৌলবী আবদুল হক পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে ভারতের আঞ্জুমান-এ তারাক্কী উর্দুর প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। লেখক এবং পণ্ডিত হিসেবে তাঁর পরিচয় একটি বিখ্যাত উর্দু অভিযানের সম্পাদক হিসেবে। সে সময় শুনেছিলাম, ভদ্রলোক উর্দু ভাষার উন্নতির জন্য তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ডকে ব্যবহার করেছেন। মৌলবী আবদুল হক এর সম্মানার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী ও উর্দু বিভাগের প্রধান তাঁর বাসগৃহে একটি নৈশভোজের আয়োজন করেন। নৈশভোজে ফজলে আহমদ করিম, ফজলী ইশরাত রহমানী, রাজ মুরাদাবাদী এবং ওয়াহেদ বখ্‌শ্ কাদরী উপস্থিত ছিলেন। রেডিওর পক্ষ থেকে আমি এবং রাজ মুরাদাবাদী উপস্থিত ছিলাম। সে সময় কথায় কথায় মৌলবী আবদুল হক বলেছিলেন যে পাকিস্তানবাসী সকলকেই উর্দু শেখার দরকার।

কেননা তা না হলে জাতি হিসেবে আমাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন সৃষ্টি হবে না। যেহেতু পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী লোক রয়েছে সে কারণে তাদের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে একটি ভাষার প্রয়োজন এবং সে ভাষা হচ্ছে উর্দু ভাষা। এভাবে কথা বলতে বলতে হঠাৎ মৌলবী সাহেব সিন্ধীদের উর্দু বিরোধিতার কথা বললেন এবং সেই সূত্রে বললেন, "উর্দুর বিরোধিতা করার অর্থ হচ্ছে ইসলামের বিরোধিতা।" আমি তখন প্রতিবাদ করতে বাধ্য হলাম। আমি বললাম, "আমার তো মনে হয় এই ধরনের উক্তি করাই ইসলাম বিরোধিতা। কেননা আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে মাত্র একটি ভাষায়ই কোরআন নাযিল হয়েছে আর সে ভাষা হচ্ছে আরবী ভাষা। সুতরাং সেই সূত্রে যদি কোন ভাষাকে একান্তই ইসলামের ভাষা বলা হয় তাহলে আরবীকেই বলতে হবে।" মৌলবী আবদুল হক আমার কথায় বিরক্ত হলেন মনে হল এবং কোন একজন অপোগণ্ড একটি মন্তব্য করেছে এই রকমভাবে দেখিয়ে বললেন, "এ উপমহাদেশে ইসলামের কাজ উর্দুভাষাতেই হয়েছে তাই ইসলামী ভাষা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার অধিকার উর্দুর আছে।" আমি তখন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু রাজমুরাদাবাদী আমাকে থামিয়ে দিল। সে আমার কানে কানে বলল, "খামোশ যাও ভাই।"

পরের দিন বিকেলে নাজিমুদ্দীন রোডের পাকিস্তান ভবনে মৌলবী আবদুল হকের রিসেপশন ছিল। রিসেপশন মানে চা-বিস্কিট খাওয়া এবং ঘরোয়া কথাবার্তা। কোনোরূপ বক্তৃতার আয়োজন ছিল না। মাঠের মধ্যে এদিক ওদিক চেয়ার-টেবিল বসানো ছিল।

www.pathagar.com

রেডিওর কর্মচারী হিসেবে আমরা কয়েকজন এদিক ওদিক ঘোরাফিরা করছিলাম। কোন এক ফাঁকে দেখলাম যে মৌলবী আবদুল হক সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন এবং বাগানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। সে সময় রেডিও ভবনে প্রচুর গাছ ছিল। তাতে বেশ কিছু জায়গায় বেশ আড়াল তৈরি হয়েছিল।

এরকমই একটি আড়ালের দিকে মৌলবী সাহেবকে এগোতে দেখে আমি এবং রাজ কৌতূহলবশত অনুসরণ করলাম। হঠাৎ গাছের আড়ালে পানি পড়ার শব্দ শুনে আমরা চমকে উঠলাম। পাতার আড়াল থেকে দেখলাম মৌলবী সাহেব ইজারবন্দ খুলে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই পশ্চিম দিকে মুখ করে পেশাব করছেন। পানি নেওয়ারও কোন ব্যবস্থা নেই। আমি রাজকে নিয়ে সরে এলাম। বললাম, দেখো, "তোমাদের ইসলামের তল্পিবাহক বাবায়ে উর্দুর কীর্তি।" রাজ তওবা করল। আমি এ ঘটনাকে উল্লেখ করলাম শুধু এটা বুঝাবার জন্য যে তৎকালীন সময়ে পাকিস্তানে বলিষ্ঠভাবে ইসলামের সপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানীরা যারা কথা বলতেন, তাদের অধিকাংশের ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী আচরণবিধি ছিল না। সমস্ত দেশকে আপন ক্ষমতার কুক্ষিতে আবদ্ধ করবার কৌশল হিসেবে তারা ইসলামের নাম ব্যবহার করেছেন। এ সমস্ত লোকের চরিত্র সম্পর্কে খুব সুস্পষ্ট ধারণা ছিল বলেই আল্লামা ইকবাল এক সময় মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন কিন্তু তিনি মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন একথা বলে যে এ প্রতিষ্ঠানটি ভূস্বামী এবং বিত্তবানদের প্রতিষ্ঠান হয়ে পড়েছে। তাই তিনি এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না।

উর্দুর সঙ্গে আমাদের কখনই কোন বিরোধ ছিল না। বরঞ্চ উর্দু ভাষার সম্পদকে বাংলাতে আহরণ করবার আমাদের সদিচ্ছা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দুভাষী প্রশাসকবৃন্দ বাংলার বিরুদ্ধাচরণ করার ফলেই সাধারণ মানুষের মনে উর্দুর প্রতি একটি বিতৃষ্ণা জাগতে থাকে। উর্দুকে রাজনীতির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার এবং উর্দুর সাহায্যে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে একটি ঐক্যতত্ত্ব নির্মাণের চেষ্টা আমাদের কাছে উর্দুকে অপ্রিয় করে তুলল। ফজলুর রহমান সাহেবের শিক্ষাসংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি উর্দুর সপক্ষে বক্তব্য রেখেছিল। এই কমিটির নাম ছিল 'পাকিস্তান এডুকেশন অ্যাডভাইজরি বোর্ড।' একটি সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসগৃহে। বোর্ডের বক্তব্য ছিল যে দেশ বিভাগের পূর্বে ইংরেজি ভাষা ভারতবর্ষে যে দায়িত্ব পালন করবে, পাকিস্তানে উর্দু সে দায়িত্ব পালন করবে। তত্ত্বগত দিক থেকে এটা শুনতে ভাল লাগলেও বাস্তব প্রক্রিয়ার দিক থেকে এই যুক্তিটি অসম্ভব ছিল। তার কারণ আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি তো আমাদের রাখতেই হচ্ছে এখন উর্দু এসে পড়বে একটি অতিরিক্ত বোঝা হিসেবে। অর্থাৎ পূর্বতন দুটি ভাষার পরিবর্তে এখন তিনটি ভাষা শিখতে হবে। তাছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে সংস্কৃতিগত সমঝোতার জন্য ভাষাগত পারস্পরিক লেনদেন প্রয়োজন। তাই সিন্ধীরা যদি বাঙালীদের জানতে চায় তাহলে বাংলা তাদের শিখতে হবে। এভাবে সিন্ধীদের ইংরেজি উর্দু বাংলা এবং সিন্ধী এই চারটি ভাষার শিক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ভাষা নিয়ে পাকিস্তানী শাসকবৃন্দ চিন্তা করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাদের চিন্তাকে বৈজ্ঞানিক বিবেচনায় যাচাই করেন নি। তার ফলে ভাষা উভয় অঞ্চলের সংযোগের কারণ না হয়ে বিরোধের কারণ হয়েছিল।

www.pathagar.com

আমি রেডিওতে থাকতেই এই বিরোধের কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। পারস্পরিক সাহচর্যের মাধ্যমে প্রীতির বন্ধন নির্মাণ না করে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ বিরোধকে তীক্ষ্ণ এবং প্রবল করেছিলেন। সে সময় নতুন পরিচয়ের উপকরণ নিয়ে উর্দু ভাষীদের কেউ কেউ বাঙালীদের কথা তাদের উপন্যাস এবং গল্পে বলবার চেষ্টা করেছেন। ফজলে আহমদ করিম ফজলী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পটভূমিকায় উর্দুতে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। কিন্তু সে উপন্যাসে বিকৃত রুচির পরিচয় ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের নালা, আবর্জনা, ইঁদুর, শৃগাল এবং তাদের মধ্যে মানুষ– এভাবেই তিনি এখানকার মানুষকে চিহ্নিত করেছিলেন। যাই হোক তার গ্রন্থ বহুল প্রচারিত হয় নি। আমি একথা এখানে উল্লেখ করলাম শুধু এটা দেখাবার জন্য যে পাকিস্তানের সূত্রপাত থেকেই আমরা কোন প্রকার পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ নির্মাণ করতে সক্ষম হই নি। রেডিওতে বাঙালীদের আরবী উচ্চারণ নিয়ে উর্দুভাষীরা হাসিঠাট্টা করত। মনে আছে একবার এক ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন, তোমরা নিজেদের নামগুলোকেও ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পার না। আবদুর রহমানকে বলো 'আবদুল রহোমান।' এটা কি রকম কথা?' আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর করেছিলাম, "তোমরা যেভাবে ফুটবলকে ফুটবাল বলো আমি তেমনি 'আবদুর রহমানকে 'আবদুল রহোমান' বলি। উচ্চারণের পার্থক্যের জন্য এ ধরনের বিকার ঘটতেই পারে।" রেডিওতেও চেষ্টা চলেছিল 'নজরুলগীতি'কে 'নযরগীতি' বলে চালাতে। কেননা আসল শব্দটা হচ্ছে 'নযর-উল-ইসলাম' কিন্তু বাংলাতে নজরুলটাই সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা অবশ্য নজরুলগীতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

ফজলুর রহমান সাহেব যখন শিক্ষামন্ত্রী তখন ঢাকায় তাঁর প্রথম সফরে তিনি বাংলা ভাষার বর্ণমালা শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ায় লেগে পড়েছিলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর ইনফরমেশন অফিসার্স মোহাম্মদ হোসেন। ঘটনাটি ১৯৪৮ সালের শুরুর কথা অথবা '৪৭-এর শেষ হতেও পারে। তিনি যথারীতি ফুলবাড়িয়া রোডে তাঁর বন্ধু মওলা মিঞার বাড়িতে উঠেছিলেন। মোহাম্মদ হোসেন আমাকে খবর দিল যে মন্ত্রী সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সকাল দশটার দিকে আমি সেখানে গেলাম এবং কয়েকজনকে সেখানে উপস্থিত দেখলাম। ডঃ মুহম্মদ শহীদউল্লাহ ছিলেন, কবি জসীমউদ্দীন ছিলেন, শিক্ষাসচিব ফজলে আহমদ করিম জফলী ছিলেন, ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ওসমান গনি ছিলেন, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন ছিলেন এবং আরও একজন ভদ্রলোক ছিলেন, যাকে আমি চিনতাম না। শুনলাম তাঁর নাম মৌলবী জুলফিকার আলী। তিনি চট্টগ্রাম থেকে একটি মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হুরুফুল কোরআন' নামে বের করতেন। আরবী হরফে বাংলায় লেখা। আলোচনার বিষয়বস্তু প্রথমে আমি অনুধাবন করতে পারি নি। পরে ফজলুর রহমান সাহেবের বক্তৃতায় সব কিছু পরিষ্কার হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "আরবী হচ্ছে আল্লাহর ভাষা এবং আরবী অক্ষর হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া অক্ষর। সুতরাং অলৌকিক অক্ষর। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের ঘরে আরবী অক্ষর সকলেরই চেনা। সুতরাং আরবী অক্ষরে বাংলা লিখলে অতি সহজে শিক্ষার প্রসার ঘটান যাবে এবং ইসলামেরও প্রভাব বাড়বে। এ কথা শুনে জসীমউদ্‌দীন বললেন, "যারা আরবী জানে না তারাও তো মুসলমান। সুতরাং আরবী যে জানতেই হবে তার কোন মানে নেই। যার যে ভাষা সে ভাষা চর্চা করলেই যথেষ্ট এবং সে ভাষার মাধ্যমে ধর্মের চর্চা করা যায়।"

www.pathagar.com

॥৩॥

কাশ্মীরের কথা আমি ছোট বয়সে পড়েছিলাম এবং জেনেছিলাম যে কাশ্মীর একটি অনবদ্য ভূখণ্ড যেখানে সদাসর্বদা প্রস্তর ও উপলখন্ডের উপর দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয়, যেখানকার আবহাওয়া স্বাদু ও মনোরম, যেখানে বসন্তকালে একটি আশ্চর্য লাবণ্যপত্রগুচ্ছে এবং পুষ্পসম্ভারে ধরা পড়ে এবং যেখানে স্বর্গের সৌন্দর্য অনবরতভাবে প্রবাহিত হয় সদাসর্বদা। এ বর্ণনায় কাশ্মীর কিন্তু আমার হৃদয়ের দেশ হয়নি কিন্তু যে কোনো একটি সুন্দর দেশের মতো দেশ হয়েছিল। পাকিস্তান হওয়ার পর কাশ্মীরের কথা নতুন করে শুনতে লাগলাম। ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান এ দুটি নতুন দেশে কাশ্মীর নিয়ে বিরোধ লাগলো। জন্মলগ্নের এ বিরোধটি যদিও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু কাশ্মীর সমস্যা এখনও সমস্যা হয়ে রয়েছে। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে কাশ্মীর উপজাতীয়রা অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে কাশ্মীরের কিছুটা অঞ্চল দখল করে। শ্রীনগরের কাছাকাছি তারা এসেছিল বটে কিন্তু পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ব্রিটিশ কমান্ডার জেনারেল গ্রেসী পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কাশ্মীরে পাঠালেন না। জিন্নাহ সাহেবের আদেশ ছিল কিন্তু সে আদেশ তিনি অমান্য করলেন। এর ফলে কাশ্মীরের প্রধান অংশটি ভারতের হাতে রইল এবং পর্বতসংকুল ক্ষুদ্র একটি অংশ পাকিস্তানের রইল।

এ সময় পাকিস্তানের কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ কাশ্মীর নিয়ে উপন্যাস এবং কবিতা লিখতে লাগলেন। কিন্তু বাংলাদেশের কোনো কবি সাহিত্যিক কাশ্মীরের ব্যাপারে খুব বেশি উৎসাহবোধ করেন নি, তাই কোনো কবিতাও লেখে নি। এ সময় বাংলাদেশের কবি সাহিত্যিকদের কাশ্মীরের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হাফিজ জলন্ধরী ঢাকা এসেছিলেন। জলন্ধরীকে নিয়ে খুবই ব্যতিব্যস্ত থেকে ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা, মিজানুর রহমান এবং ইব্রাহীম খাঁ। কার্জন হলে একটি বিরাট মুশায়েরার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে জলন্ধরের বাংলাদেশ সফর সফলকাম হয় নি। প্রথমত, লোকটি ছিল অসম্ভব অহংকারী এবং তার কথাবার্তা এবং চালচলন আমাদের কাছে অশ্লীল মনে হত। দ্বিতীয়ত কাশ্মীর সম্পর্কে আমাদের স্নায়ুতে কোনো উত্তেজনা জাগত না। ফররুখের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কয়েকবার কথাবার্তা হয়েছে। ফররুখ জিজ্ঞেস করেছিল "কাশ্মীরে তো খুব শীত, তাই না?" আমি উত্তর করেছিলাম "শীতকালে খুব শীত, বরফ পড়ে।" ফররুখ বলেছিল, কিন্তু কাশ্মীরের শীত তো আমাদের গায়ে লাগে না। কাশ্মীরের শীত কাশ্মীরেই থাকে। আমি হেসে বলেছিলাম "কাশ্মীর তো অনেক দূরের পথ। আমাদের দেশ পর্যন্ত কাশ্মীরের সাড়া জাগে না।" ফররুখ বলেছিল 'তাহলে কাশ্মীর নিয়ে কবিতা লেখা আমাদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না।' কবিতা লেখার কথাটা এ জন্য এল, গোলাম মোস্তফা চেয়েছিলেন আমরা যেনো কাশ্মীর নিয়ে কবিতা লিখি। গোলাম মোস্তফাও কাশ্মীর নিয়ে কোনো কবিতা লেখেন নি। কিন্তু ফজলে আহমদ করিম ফজলীর একটি উর্দু কবিতার বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। কবিতাটির ভাব হচ্ছে হে মুসলমান, চলো, কাশ্মীর চলো। কবি রাজমুরাদাবাদী আমাদের সঙ্গে রেডিওতে চাকরি করতেন। সেও কিছু কবিতা লিখেছিল। কিন্তু কাশ্মীর নিয়ে আমরা যখন কেউ কিছু

www.pathagar.com

লিখলাম না তখন সে খুব দুঃখ পেয়েছিল। তার চোখে পানি দেখেছিলাম। সে দুঃখ করে বলেছিল "এটা কি রকম হল যে একই দেশে আমরা বসবাস করি, কিন্তু একইভাবে কোনো বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হয় না। ধর্মও আমাদের একে অন্যের কাছে টেনে নেয় না।" রাজ একান্তভাবে পাকিস্তানী ছিল। ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তাকে পুরোপুরি পাকিস্তান মনা করেছিল। কিন্তু সে কিছুতেই বাঙালীদের স্বভাব এবং আচরণ বিধি বুঝে উঠতে পারত না। রাজকে নিয়ে একটি মজার ঘটনা আছে সেটা এখানে বলি। রেডিও অফিসে গান গাইতে যে সমস্ত মেয়েরা আসত তাদের সঙ্গে রাজ ভাব করবার চেষ্টা করত। কিন্তু ভাষার অসুবিধার জন্য সে কিছুতেই এগোতে পারত না। অবশেষে হতাশ হয়ে একদিন সে বলেই বসল "বাঙালী আওরাৎ জবান নেহি সমঝতি হায়, তো দেগী কেয়সি?" অর্থটা একটু আদি রসের তাই আর ব্যাখ্যা করলাম না। একথা শুনে আমি হেসে তাকে বললাম, দেখ আকবর বাদশার কথাবার্তার কোনও বালাই ছিল না। যাকে পছন্দ হত, হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতেন। চারণ কবিদের গানেই আছে–

সহি আকবর বাল কি বাঁহ/ অচিন্ত্য গাই চলি ভিতর ভৌনে/সুন্দরী দিঠী লাগায়েকো/ ভাগিবেকো/ ভ্রম পাবত গৌনে।'

একটি রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্যে পাকিস্তান ভারত বিভক্ত হল। একটি অন্ধ আবেগের তাড়নায় লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হলো এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে সমস্ত দেশ অস্পষ্টতায় ঢেকে গেল। কতো শিশু, নারী এবং পুরুষ যে এই হত্যাযজ্ঞে আহুতি হয়েছে তার কোনো অন্ত নেই। কাশ্মীরের বিরোধটি এরই একটি অংশ। এ বিরোধ এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। পাকিস্তানের অসম্পন্নতার মধ্যে জিন্নাহ্ সাহেবের মৃত্যু হল ১৯৪৮ সালে। এর আগে গান্ধী নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের অবস্থাকে শাসিত রাখার জন্য নেহেরু ছিলেন, প্যাটেল ছিলেন এবং আরও অনেকে ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের জন্য বিশেষ কেউ ছিলেন না।

রাজনৈতিকভাবে গান্ধীকে আমরা কতোটা দূরের মানুষ বলে ভেবে থাকি না কেন তাঁর মৃত্যুতে আমি খুবই বেদনার্ত হয়েছিলাম। যেভাবে তাঁর মৃত্যু হল সেটা খুবই অস্বাভাবিক এবং সে কারণেই বেদনার ছিল। তা ছাড়া শেষ উপবাস তিনি পালন করছিলেন পাকিস্তানীদের প্রাপ্য সম্পদ ভারতবর্ষ যাতে ফেরত দেয়, সে জন্য। শেষ পর্যন্ত গান্ধীর উপবাসের জন্যই নেহেরু পাকিস্তানের কিছুটা প্রাপ্য পরিশোধ করেছিলেন।

গান্ধীর মৃত্যুর খবর আমরা পেয়েছিলাম সন্ধ্যার সময়। তখন থেকেই একটি কথিকা লিখতে বসে গিয়েছিলাম। আমি, ফররুখ, নাজির আহমদ ও ফতেহ লোহানী। আমাদের সম্মিলিত মেধার একটি ঐকান্তিকতার সুর ছিল। রাত দশটায় কথিকাটি প্রচারিত হয়। এজন্য কেন্দ্রের কোনো অনুমতি আমরা চাই নি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথিকাটি আমরা রচনা করেছিলাম এবং মানবতার অধিকারে তা প্রচার করেছিলাম। ফররুখ একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখেছিল যার শেষ চরণটি ছিল "তোমার জীবন নিয়ে মৃত্যুও মহান হল আজ"। পরের মাসে পাকিস্তান বেতারের প্রধান পুরুষ জুলফিকার আলী বোকারী ঢাকায় এসে গান্ধীর এই কথিকার জন্য আমাদের খুব শাসন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "মালুম হোতা হায় কি তুমহারা আপনা কোঈ গুজর গিয়া। ইয়ে রনজ তো তুমহারা রনজ নেহি।" অর্থাৎ মনে

www.pathagar.com

হচ্ছিলো তোমাদের অত্যন্ত আপন কেউ মারা গিয়েছে। এই বেদনা তো তোমাদের বেদনা নয়। যাই হোক সে সময় সকল নেতার বিয়োগই আমাদের কাছে আত্মীয় বিয়োগের মতো মনে হতো। জিন্নাহর মৃত্যুতেও আমরা একইভাবে শোকাবিভূত হয়েছিলাম। বরঞ্চ আরও একটু বেশি। জিন্নাহর মৃত্যুতে আমি "কায়েদে আযম" নামে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলাম। কবিতাটি আবু জাফর শামসুদ্দীন সম্পাদিত 'নয়া সড়ক' নামের একটি বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

কবিতাটির প্রথম চার লাইন আমার এখনও মনে আছে– 'আমাদের জীবনের স্বচ্ছন্দ চলায়/ বিপুল ব্যর্থতা ছায়া নামিতে পারেনি কোনও দিন।/ আমাদের জীবনের শেষ রশ্মি পাতে/ নেমেছে রাত্রির চাঁদ, অন্ধকারে হয়নি মলিন।/ কিরণশংকর সেন গুপ্ত তখনও ঢাকায়। সেও একটি কবিতা লিখেছিল। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে যে শোকসভা হয়, সেখানে আমরা দুজনই আমাদের কবিতা পাঠ করেছিলাম। সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত আমার এ কবিতাটি অত্যন্ত আন্তরিক ছিল। শব্দ যদি কখনও মানুষের হৃদয়ের বার্তাবহ হয়, তাহলে এ কবিতাটির শব্দগুলো আমার হৃদয়ের বেদনার বার্তাবহ ছিল। আমি পিছনের দিকে দৃষ্টিপাত করে সেদিনের আমি কে অনুভব করবার চেষ্টা করছি। নেতা হিসেবে জিন্নাহ সাধারণ মানুষের হৃদয়ের কতো যে গভীরে প্রবেশ করেছিলেন তা আমার সেদিনকার অনুভূতি বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে। সাধারণ মানুষ জিন্নাহর নিকটে কখনও পৌঁছতে পারে নি, তার জীবনধারা ছিল মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্রষ্টাব্যক্তিক জীবনধারা। অথচ সকল মানুষ তাঁর মৃত্যুতে আর্তরোলে ক্রন্দন করেছিল।

এই দুই পরস্পর বিরোধী নেতা তাদের মৃত্যুতে জনগণের খুব নিকটে এসেছিলেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে দীর্ঘকাল বিদেশী শাসনের অসম্মান থেকে আমরা যে স্বাধীন সত্তাকে আবিষ্কার করেছিলাম তার জন্য এঁদের উভয়ের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ ছিলাম। সম্প্রদায়গতভাবে আমরা এঁদের মৃত্যুতে বেদনার্ত হইনি, স্বাধীনতার অগ্রনায়ক বলেই এঁদের মৃত্যু আমাদের জন্য বিপুল বেদনার কারণ হয়েছিল। কিন্তু সময়ে সবকিছুরই পরিবর্তন হয়। বেদনার তীব্রতা আমরা হারিয়ে ফেলি এবং আবেগের উচ্ছলতা নিষ্প্রভ হয়। কয়েক বছর পরে রাওয়ালপিণ্ডিতে ষোলই অক্টোবর ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলী আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। সে মৃত্যুতে আমরা কিন্তু জিন্নাহ বা গান্ধীর মৃত্যুর মতো অধীর হই নি। ততোদিনে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা ক্রমশ পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছ থেকে দূরে সরে এসেছি মনের দিক থেকে। তাছাড়া রাজনৈতিক নেতা হিসেবে লিয়াকত আলী আমাদের কাছে থেকে এমনিতেই অনেকটা দূরে ছিলেন। লিয়াকত আলীর মৃত্যু পাকিস্তানের জন্য একটি চরম হতাশার কারণ হয়েছিল। মূলত সেদিনই পাকিস্তানে গণতন্ত্র হত্যার পরিকল্পনা লালিত হয়। পরবর্তীকালে যে আউয়ুব খান ক্ষমতা দখল করলেন তখন তিনি লন্ডনে চিকিৎসাধীন ছিলেন। লন্ডনে পাকিস্তানের হাইকমিশনার ছিলেন হাবীব ইব্রাহীম রহমতউল্লাহ। আইয়ুব তাঁর আত্মজীবনীতে পরিষ্কারভাবে বলছেন যে লিয়াকত আলীর মৃত্যুতে তিনি অনুভব করলেন যে পাকিস্তানকে পরিচালনা করবার মতো শক্তি ও সামর্থ্য আর কারও নেই। সুতরাং তখন থেকেই নিজেকে তিনি ক্রমশ প্রস্তুত করতে লাগলেন ক্ষমতা অধিকার করবার জন্য। আইয়ুবের

www.pathagar.com

কথায় এটা স্পষ্ট হয় যে তিনি সেনাবাহিনী প্রধান হওয়ার পর থেকেই দেশের ক্ষমতা দখলের গোপন আশা মনে মনে পোষণ করছিলেন।

একটু পরের কথা হলেও লিয়াকত আলীর কথাটি এখানেই বলে নিচ্ছি। আমি তখন গোপীবাগে একটা বাসা নিয়ে থাকি। আবুল হাশেম সাহেব নিকটেই থাকতেন। লিয়াকত আলী হত্যার পর হাশিম সাহেবের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার আলোচনা হয়েছে। হাশিম সাহেব সে সময় বলেছিলেন, 'ক্ষমতা লিপ্সু পাঞ্জাবীরা বিদেশী লিয়াকত আলী খানকে হত্যা করে নিজেদের পথ সুগম করে নিল। এখন থেকে এদেশে গণতন্ত্রের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্য থাকবে না। তখন যদি সত্যিকারের কোনো বাঙালী নেতা থাকতো তাহলে বাঙালীরা এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করতে পারতো"। আমি আমার নিজের মানসিকতা পরীক্ষা করতে গিয়ে অনুভব করি যে জিন্নাহর মৃত্যুর তিন বছরের মধ্যেই আমার মানসিকতার অনেকটা পরিবর্তন হয়েছিল। আমি আর আগের মত পাকিস্তানের প্রতি আসক্ত ছিলাম না। ততোদিনে আমি পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছ থেকে কিছুটা যেন দূরে চলে এসেছি। কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল পুরোপুরি আরও পরে। আমার পারিবারিক জীবনে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল ১৯৪৮ সালেই। আমার দ্বিতীয় সন্তান সৈয়দা কমরজবীন-এর জন্ম হয় ২৫শে মার্চ ১৯৪৮। আমার স্ত্রী তখন ছিলেন নেত্রকোনায় আমার শ্বশুরের বাসায়। আমি ছিলাম চট্টগ্রামে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে তাঁর প্রচার কার্যে। চট্টগ্রামে আমার কাছে খবর যায় নি। দুদিন পরে ঢাকায় ফিরে কন্যার জন্মসংবাদ শুনি এবং আমি নেত্রকোনায় যাই। নেত্রকোনা আমার কাছে খুবই পরিচ্ছন্ন শান্ত শহর মনে হয়েছিল। কেনও যেন আমার মনে হয়েছিল শান্ত এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশে যে মানুষের জন্ম হয় সে আজীবন পরিচ্ছন্নতা এবং নির্বিরোধের বরাভয়ে থাকে। আমার কন্যাটির ডাক নাম রাখা হয়েছিল 'নাসরীন'। তার জীবনে আমার এই পরিচ্ছন্ন চিন্তাটি কার্যকর হয়েছে। সে সত্যিই পরিচ্ছন্ন এবং শান্ত।

সে সময় নানা কারণে আমি রেডিও অফিস ছেড়ে দেবার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু বিকল্প কি পারছিলাম না। 'আজাদ' পত্রিকায় চাকরি পাব তা চিন্তা করতে যোগ দেবার একটি সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সাংবাদিক জীবনের প্রতি আমার খুব আকর্ষণ ছিল না। সাংবাদিকদের মধ্যে যে দু'জনকে খুব ঘনিষ্ঠ জানতাম, যেমন আবুল কালাম শামসুদ্দীন এবং মজিবুর রহমান খাঁ। এঁদের জীবন সচ্ছল ছিল না। সুতরাং এ জীবনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি নি। সরকারি প্রচার দফতরে 'কপিরাইটার' এর চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সেটাও কি কারণে যেন বাদ পড়ে গেল। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসাইন আমাকে একদিন তাঁর বাসায় ডেকে আনেন। তিনি ছিলেন আমার বাবার সহপাঠী এবং বাবার প্রতি আন্তরিক প্রীতিযুক্ত। তিনি আমাকে বললেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর হিন্দু শিক্ষকদের অনেকেই চলে গেছেন। যারা আছেন তারাও যে বেশিদিন থাকবেন তার ভরসা নেই। সুতরাং তিনি মুসলমান সমাজ থেকে ভালো শিক্ষক অনুসন্ধান করছেন। তিনি চিন্তা করছেন তিনি আমাকে নিতে পারেন কিনা। আমি খুব খুশী হলাম। কিন্তু মন্ত্রী ফজলুর রহমান সাহেবের জন্য আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়া একটু পিছিয়ে গেল। তিনি তখন তথ্যমন্ত্রী। তিনি আমাকে তথ্য বিভাগে একটি উন্নত

www.pathagar.com

পদের আশ্বাস দিলেন। সেই আশ্বাসে বিভ্রান্ত হয়ে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়া বছর খানিক পিছিয়ে গেল। তাছাড়া তখন পাকিস্তান সরকার রেডিওর চাকরি প্রয়োজনীয় ঘোষণা করেছিলেন। এর ফলে রেডিওতে অবস্থান করে কোথাও দরখাস্ত করা সম্ভব ছিল না। আমি তাই মোয়াজ্জম হোসাইন সাহেবকে বললাম যে, তিনি যদি আমাকে চাকরির অফার দেন, তাহলে স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে আমি রেডিও থেকে পদত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে পারব। সংক্ষিপ্ত হলেও লেখক হিসেবে আমার একটি পরিচিতি তখন ঘটেছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' পত্রিকায় আমার একটি দীর্ঘ প্রবন্ধও ছাপা হয়েছে। আরও একটি বড় কথা ছিল যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিষয়ের জন্য কোন এম এ ডিগ্রীর প্রয়োজন হত না। তাই শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে সাহিত্য কর্মে খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব আমার জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করেছিলেন। নির্বাচন কমিটি প্রথম সভায় কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি। তাই কাজী মোতাহার হোসেনের ওপর আমার নিয়োগ বিষয়ে মন্তব্য করবার দায়িত্ব পড়ে। তিনি আমার সাহিত্য কর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এবং লিখিত মন্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে জানিয়ে ছিলেন যে আমার নিয়োগের ফলে বাংলা বিভাগ সমৃদ্ধশালী হবে।

নিয়োগের পর বাংলা বিভাগের প্রধান গণেশচরণ বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তখন সেখানে বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী এবং আবদুল হাই ছিলেন। এঁরা কি যেনো কথাবার্তা বলছিলেন। আমাকে দেখেই থেমে গেলেন। তাতে মনে হলো এঁরা আমার সম্পর্কেই বলছিলেন। গণেশ বাবু আমাকে জানালেন যে আমাকে চৈতণ্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত বৈষ্ণব পদাবলী, এগুলো পড়াতে হবে। আমি একটু দ্বিধা করেছিলাম প্রথমে। কেননা এগুলো আগে আমি কখনও পড়ি নি। কিন্তু গণেশ বাবু বললেন, আমি বাংলার শিক্ষক যখন হয়েছি তখন পাঠ্যতালিকাভুক্ত সব কিছুই আমাকে জানতে হবে। আমি তাঁর কথা মেনে নিলাম এবং এগুলো পড়ানো চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করলাম। গণেশ বাবু আমার উপকার করেছিলেন এই অর্থে যে আমি বৈষ্ণব পদাবলীর মূলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। ডক্টর সুশীলকুমার দেব বৈষ্ণব মতবাদসংক্রান্ত গ্রন্থরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল নীলমণি নামক সংস্কৃত গ্রন্থ, পদকল্পতরু সব কিছু আমি পড়তে থাকি এবং ক্রমশ নিজস্ব একটি বিবেচনা নির্মাণ করতে সক্ষম হই। এভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করার অধিকার অর্জন করি এবং অল্পকালের মধ্যে ছাত্রদের কাছে সমর্থন লাভ করি।

জীবনে বিরোধের মুখোমুখি হয়েই আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। কোন কিছু অগ্রাহ্য করবার প্রবণতা নিয়ে নয়। কিন্তু জানবার প্রবণতায় আমি সকল সংকটের মুখোমুখি হয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে নতুন একটি পৃথিবী আমার কাছে উন্মোচিত হল।

॥৪॥

ফিরোজ খান নুন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হয়েছিলেন। পাঞ্জাবের অধিবাসী, দীর্ঘদেহী পুরুষ। তাঁর উচ্চারণগুলো অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং প্রতাপের ছিল। তাঁর স্ত্রী বেগম নুন ইংরেজ মহিলা ছিলেন। বেগম নুন শিল্পরসিক এবং শিল্পী ছিলেন। তিনি লন্ডনের স্লেইড স্কুল অব

www.pathagar.com

আর্ট-এ লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং জলরংয়ের শিল্পী হিসেবে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ভদ্র মহিলা বড় আকারের ক্যানভাসে কাজ করতেন। বেগম নুন ঢাকার শিল্পীদের সন্ধান রাখতেন এবং সেই সুবাধে আবেদীনের সঙ্গে এবং আমার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সে পরিচয়ের সঙ্গে ঢাকার তৎকালীন শিল্প আন্দোলনের একটি সংযোগ আছে। সে সম্পর্কে আমি পরে বলব। এখন ফিরোজ খান নুনের কথায় আসি।

ফিরোজ খান নুন ডঃ শহীদুল্লাহকে বলেছিলেন একটি ক্ষুদ্র অভিধান তৈরি করতে যেখানে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী ফারসী এবং উর্দু শব্দের তালিকা থাকবে। শহীদুল্লাহ সাহেব এ কাজের দায়িত্ব আমাকে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি রাজী হইনি তবে এই সূত্রে ফিরোজ খান নুনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে এবং তাঁকে বাংলা শিখাবার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করি। ফিরোজ খান নুন লিখিতভাবে বাংলা ভাষার সাথে পরিচিত হতে চাইছিলেন না তিনি মুখে মুখে বিভিন্ন বস্তুর বাংলা নাম জানতে চাইছিলেন। আমি প্রথম যেদিন তাঁকে পড়াতে যাই, সেদিন তিনি বিভিন্ন জিনিসের বাংলা নাম আমার কাছে জিজ্ঞেস করেন। এক পর্যায়ে গভর্নর হাউসে যে সমস্ত গাছ ছিল সেগুলোর বাংলা নাম জিজ্ঞেস করেন। একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "বাংলাতে এ গাছের কি নাম?" আমি বললাম, 'আমরা একে কৃষ্ণচূড়া বলি।' তিনি চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন, 'হিন্দু দেবতা কৃষ্ণের পাগড়ী?' আমি হেসে উত্তর করলাম, "কৃষ্ণের শিরস্ত্রাণ লাল রংয়ের ছিল। তাই এ গাছের ফুলের লাল রং দেখি এর নামকরণ করা হয়েছে কৃষ্ণচূড়া।" ফিরোজ খান নুন বললেন, 'আমরা এ গাছের ফুলকে বলি 'গুল নোহর।' আপনারা হয়তো গুলমোহর বলতে পারেন।' আমি বললাম, 'নামকরণগুলো বিভিন্ন অঞ্চলের স্বভাব এবং ঐতিহ্য থেকে গড়ে ওঠে। এর নামকরণের মধ্যে হিন্দু মুসলমান বলে কিছু নেই। অন্তত আমরাতো তাই মনে করি।' আরেক দিন ফিরোজ খান নুন বাংলা অক্ষর সম্পর্কে একটি অশোভন মন্তব্য করলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে বাংলা ভাষা শিখতে হলে মুখে মুখে শিখে খুব বেশি লাভ হবে না। বাংলা লিখন রীতিও শেখা দরকার। ফিরোজ খান নুন উত্তরে বলেছিলেন যে তিনি কুফরী 'হরফে' শিখতে চান না। আমি এর পর থেকে আর পড়াতে যাই নি।

ফিরোজ খান নুন সব কিছুর সরলীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ভাবতেন এবং বহুবার বলেছেনও যে বাংলা এবং উর্দু একে অন্যের খুব কাছাকাছি আসতে পারে, যদি বাংলার মধ্যে উর্দুর মতো প্রচুর পরিমাণে আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করা যায়। আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'ভাষার ক্ষেত্রে উচ্চারণটি একটি প্রচণ্ড বিষয়। বাংলা উচ্চারণ পরস্পর বিরোধী। যার ফলে বাংলাতে যে ভাষারই শব্দ আসুক তার চেহারা পাল্টে যাবে। আরবী ফারসী শব্দ এমনভাবে বাংলা চেহারা নেবে যে সেগুলোকে আর আরবী-ফারসী বলে সনাক্ত করা যাবে না।

ফিরোজ খান নুন একথা মেনে নিতে পারেন নি। তিনি ভাবতেন, যে সরলভাবে যে জিনিসটা সমাধান করা সম্ভবপর সেগুলোতে বোধ হয় বাংগালীরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

এ সময় আর একটি ঘটনা ঘটে, যার ফলে ফিরোজ খান নুন বাংগালীদের কাছে অপ্রিয়ভাজন হয়ে উঠেন। কোনো এক ঘরোয়া বৈঠকে গ্রামবাংলার মুসলমানদের পরিচয়

www.pathagar.com

তুলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, গ্রামাঞ্চলে বাঙালী মুসলমানরা হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত। তিনি আরও বলেছিলেন যে তিনি শুনেছেন অনেক জায়গায় মুসলমানদের খাৎনাও হয় না। তাঁর এ বক্তব্য খবরের কাগজে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার এর প্রতিবাদ করেন। এ সম্পর্কে একটি মুখরোচক গল্প ঢাকায় প্রচলিত হয়েছিল তখন। গল্পটি চালু করেছিলেন হাবীবুল্লাহ বাহার। একজন কেউ বাহার সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'নুন সাহেব কি করে জানলেন যে গ্রামের বাঙালী মুসলমানের খৎনা হয় না? তিনি তো আর দেখেন নি।' বাহার সাহেব উত্তরে বলেছিলেন। 'তাঁর বেগম সাহেবা দেখেছিলেন হয়তো। তাঁর কাছ থেকেই তিনি জেনেছেন।'

বাংলাদেশের মুসলমান যুবকরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ভেবে ফিরোজ নুন ঠিক করলেন যে তিনি তাঁর ফাণ্ড থেকে নিয়ে যুবকদের মধ্যে কোরান শরীফের ইংরেজি অনুবাদ বিতরণ করবেন। এটাও তাঁর এক ধরনের সরলীকরণ পদ্ধতি ছিল। ঠিক হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন গ্রাজুয়েটদের মধ্যেই বিতরণ সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু এ-বিতরণের ফল শুভ হয় নি। অনেক ছেলেই কোরান শরীফ বিক্রয় করে লুঙ্গি কিনেছে, সিনেমা দেখেছে। মানসিকভাবে অপ্রস্তুত অবস্থায় তাদের কাছে কোরান শরীফ এসেছিল, তার ফলে শুভবুদ্ধির জাগরণ ঘটে নি। অন্যদিকে যে অনুবাদটি বিতরণ করা হয়েছিল সেটি ছিল মোহাম্মদ আলীর অনুবাদ। মোহাম্মদ আলী ছিলেন ক্বাদিয়ানীদের কাহোরী জামাতের লোক। সুতরাং কেউ কেউ প্রচার করতে লাগলেন যে নুন সাহেব সম্ভবত ক্বাদিয়ানী। শেষ পর্যন্ত কোরান শরীফ বিতরণের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বাতিল হয়।

এত করেও নুন সাহেব ক্ষান্ত হলেন না। তিনি চিন্তা করলেন ইকবালকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এখানেও তাঁর পদ্ধতিগত একটা ভুল হল। তিনি রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে ইকবালকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেন। ইকবাল পরিচিত হবেন তাঁর স্বভাবে এক বিশিষ্টতায়, রবীন্দ্রনাথের বৈপরীত্যে নয়। তিনি একটি ঘরোয়া বৈঠক ডাকলেন গভর্নর হাউজে। সেখানে শহীদুল্লাহ সাহেব ছিলেন, ডঃ শাদানী ছিলেন, মৌলানা আবদুর রহমান বেখুদ ছিলেন, আমি ছিলাম এবং আরও কয়েকজন ছিলেন যাদের নাম আমি মনে করতে পারছি না। তিনি তাঁর প্রস্তাব খুব সরলভাবে আমাদের সামনে পেশ করলেন। তিনি বললেন যে ইকবালের ইসলাম ভিত্তিক কবিতাগুলো বাংলাতে অনুবাদ করে তরুণ সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। এ অঞ্চলের তরুণ সমাজ বড় বেশি হিন্দু আদর্শে প্রভাবিত। তাদেরকে হিন্দু আদর্শ থেকে মুক্ত না করতে পারলে এদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। তিনি আরও বললেন এ অঞ্চলের তরুণরা রবীন্দ্রনাথকে দেবতা জ্ঞান করে এবং মান্য করে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে এ দেশে তরুণ সমাজ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এ অবস্থার আশু সংশোধন প্রয়োজন। ইকবালের দ্বারাই সে সংশোধন সম্ভবপর। আমরা নুন সাহেবের সরলীকৃত বিশ্লেষণে হতভম্ব হলাম। কি বলবো বুঝে ওঠতে পারলাম না। তখন শহীদুল্লাহ সাহেব কয়েকবার শব্দ করে গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের জায়গায় আছেন, ইকবাল সাহেবও তাঁর জায়গায় আছেন। দু'জনকেই আমাদের প্রয়োজন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ হলেন বাংলা ভাষার কবি। তাই রবীন্দ্রনাথকে আমরা কোনো ক্রমেই বাদ দিতে পারি না। আবার ইকবাল হচ্ছেন

www.pathagar.com

ইসলামী ভাবনার কবি। সুতরাং ইকবালের আদর্শ আমাদের অনুসরণ করা কর্তব্য। ইকবালের কবিতা অনুবাদ করে এদেশে তাঁর বাহন প্রচার করা দরকার। আমি তখন বললাম 'ইকবালের অনুবাদ যদি প্রতিষ্ঠিত বাংগালী কবিরা করেন, তাহলে তা জনপ্রিয় হবে। কিন্তু মৌলবী সাহেবরা অনুবাদ করলে তা জনপ্রিয় হবে না। তাই অনুবাদটা কবিদের মন এবং মানসিকতার উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। নুন সাহেব তখন বললেন, 'আমি শুনেছি যে বাঙালী কবিরা ইকবালের তরুণ বয়সের বিপ্লবী এবং সমাজতন্ত্রী কবিতাগুলিই পছন্দ করে। এটা ঠিক নয়। ইকবালের সাহায্যে তারা ইসলামের ভিতর প্রবেশ করবে, এটাইতো আমরা চাই।'

আলোচনার মোড় এভাবে অন্যদিকে ঘুরে গেলো। এর মধ্যে শহীদুল্লাহ সাহেব আবার জানালেন যে তিনি ইকবালের শিকওয়াহ ও জবাব-ই-শিকওয়াহ্‌র অনুবাদ করেছেন। তাঁর বইগুলো সরকার ইচ্ছে করলে কিনে নিতে পারেন। শেষ পর্যন্ত এ আলোচনার মাধ্যমে আমরা কোনো সমাধানে আসতে পারলাম না। তবে একটি জিনিস বুঝতে পারলাম যে অবাঙালীরা বাঙালীদের মন এবং মানসিকতা অথবা স্বভাব বুঝবার চেষ্টা না করে সমালোচনা করছে। এর ফলে প্রত্যেকেই নিম্ন বৃত্তেই থাকছে একটি বৃত্তের মধ্যে আমরা সবাই একত্রিত হতে পারছি না।

বাঙালী এবং অবাঙালীদের এ ব্যবধান অবাঞ্ছিত কিন্তু পরিচয়ের সাহায্যে এবং পারস্পরিক সমর্থনের সাহায্যেই আমরা এ ব্যবধান দূর করতে পারতাম। কিন্তু তা পারি নি। কেন পারি নি, ফিরোজ খান নুনের উপরের আলোচনায় তা সহজেই সুস্পষ্ট হবে। ফিরোজ খান নুনের সরলীকরণ পদ্ধতিটাই আমাদের পারস্পরিক সমঝোতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। তিনি একটু অনুসন্ধান করলে এবং ভালোবাসার সাহায্যে এ অঞ্চলের মানুষের কাছে এসেই বুঝতে পারতেন যে এখানকার মানুষ ধর্মপ্রিয় কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। এ অঞ্চলে সুফী মতামতের প্রভাব পড়েছিল প্রচুর। এই সুফী বিশ্বাসের ফলে এ অঞ্চলের মানুষ উদার এবং সহনশীল। এখানকার মুসলমান সকল প্রকৃতির সাংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু ইসলাম থেকে কখনই সরে যায় নি।

পাকিস্তান আমলের শুরুতে ঢাকায় তবলীগ জামাত ক্রমশ প্রসার লাভ করে। সরকারি মহলে এ জামাতের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কারণ ছিল একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার সহযোগিতায়। তিনি ছিলেন তৎকালীন একাউন্ট্যান্ট জেনারেল। ভদ্রলোকের নাম আমি এখন মনে করতে পারছি না। ভারতের মধ্যপ্রদেশে তার বাড়ি ছিল। দেখতে সুন্দর, হাস্যোজ্জ্বল এবং স্ফূর্তিবান লোক ছিলেন। মুখে চাপ দাড়ি ছিল। দুপুর সাড়ে বারোটা বাজতেই তিনি সেক্রেটারিয়েট থেকে বেরিয়ে পড়তেন কাকরাইলের মসজিদে জোহরের নামাজ আদায় করতে। তারপর ছিল আছরের নামাজ। এতটা সময় পর্যন্ত তিনি সেক্রেটারিয়েটের বাইরেই থাকতেন। এর ফলে সরকারি কর্মচারীদের অনেকেই তাঁর অনুরাগী হয়ে পড়েন। তারাও তার সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারিয়েট থেকে বেরিয়ে পড়তেন এবং জোহরের নামাজ শেষে মসজিদ থেকে একেবারে বাড়ি চলে যেতেন আর অফিসে ফিরতেন না। এই একাউন্ট্যান্ট জেনারেল গভর্নর সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। একদিন এর বাসায় এক অনুষ্ঠানে গভর্নর সাহেব এসেছিলেন। সে অনুষ্ঠানে অন্য অনেকের মধ্যে

www.pathagar.com

শহীদুল্লাহ সাহেব ছিলেন, আমিও ছিলাম। খাওয়া-দাওয়ার মাঝখানে গভর্নর সাহেব কবি রবীন্দ্রনাথের জমিদারী সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের জমিদারী ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। তাঁর প্রজারা ছিল অধিকাংশ মুসলমান। এই প্রজাদের কথা রবীন্দ্রনাথ কি কোথাও লিখেছেন? শহীদুল্লাহ সাহেব উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ লিখেছেন, তাঁর গল্পের মধ্যে তাঁর মুসলমান প্রজাদের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। নুন সাহেব তখন জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে মুসলমানদের বিশ্বাস আচার আচরণের কথা কি এসেছে? শহীদুল্লাহ সাহেব বললেন 'তা অবশ্য আসে নি।'

নুন সাহেব তখন বললেন, 'বিলকুল বিপরীত দেখনু আল্লামা ইকবালের লেখা। তাঁর কবিতায় মন্দিরের কথা আছে, ভারতের কথা আছে গঙ্গার কথা আছে। মুসলমানদের কথাতো থাকবেই কিন্তু হিন্দুদের কথা তিনি ভোলেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর কবিতায় উপমা হিসেবে ঈদের চাঁদ কিংবা রমজানের চাঁদ আনেন নি। তাহলে তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আদতে হিন্দু কবি। তিনি মুসলমানদের কবি হতে পারেন না।

শহীদুল্লাহ সাহেব তখন বললেন, 'আপনি যেভাবে বললেন তাতে অবশ্য কথাটা তাই দাঁড়ায়। তবে সুস্পষ্টভাবে না হলেও আমরা গীতাঞ্জলিতে অনুভব করতে পারি যে রবীন্দ্র সুফী মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করতেন না এবং তাঁর কবিতায় একেশ্বরবাদিতার অনেক প্রমাণ আছে। আলোচনা যদ্দুর মনে পড়ে এই পর্যায়ে এসে থেমে গিয়েছিল। এটা অবশ্য সত্য যে রবীন্দ্রনাথ ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হননি। তিনি চিরকাল বেদ এবং উপনিষদের আয়ত্তে বসবাস করেছেন। ধনে ঔদার্যে ও যেটা তাঁর মধ্যে এসেছে, সেটা বেদ এবং উপনিষদ থেকেই এসেছে। নুন সাহেব যেভাবে তাকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন সেভাবে আমরা তাকে বিশ্লেষণ করি না। কিন্তু এটা আমি সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনি বস্তুগত স্থূলভাবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ইসলামের উপাদান অনুসন্ধান করে ব্যর্থ হয়েছেন।

নুন সাহেব এবং বেগম নূন সাহেবের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য ছিল। শুনেছিলাম, নুন সাহেব অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করেছেন, ইংরেজিতে লেখা তাঁর একটি উপন্যাস বিলেতেই ছাপা হয়েছে আর বেগম নুন ছিলেন ক্যাবারে নৃত্য শিল্পী। পরিচয়ের পর দেখলাম নুন সাহেব, স্থূল বুদ্ধির লোক। বাংলাদেশের মুসলমানদের প্রতি কেমন যেনো একটু অশ্রদ্ধার ভাব। কিন্তু বেগম নুন ছিলেন শিল্পরসিক এবং শিল্পতত্ত্বজ্ঞ। তিনি আমার সঙ্গে এবং জয়নুল আবেদীনের সঙ্গে এমনভাবে বিনয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন যে মনে হত, বাঙালীদের শিল্পী মানসের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। এ অঞ্চলে শিল্প আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর সহানুভূতি এবং প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল। জয়নুল আবেদীনকে তিনি খুবই উৎসাহিত করতেন এবং তাঁরই চেষ্টায় এবং সমর্থনে জয়নুল আবেদীন লন্ডনে প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ পান। ঢাকায় আমরা একটি আর্ট গ্রুপ গড়ে তুলেছিলাম। সেই আর্ট গ্রুপের কার্যক্রমে বেগম নুনের সহানুভূতি এবং সমর্থন ছিল। তিনি উপমহাদেশের শিল্প সাধনার সন্ধান রাখতেন এবং বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। কলকাতা থেকে আমাদের শিল্পীরা ঢাকায় এসে বিভিন্ন স্কুলের ড্রয়িং টিচার হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অনেক সংগ্রাম করে এদের জন্য আর্ট স্কুল

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয়। আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবার পর বেগম নুনের সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে শিল্পীরা সান্ত্বনা পেয়েছিলেন এবং শিল্পকর্মে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। আর্ট ইনিস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আরম্ভ করেন। সে আন্দোলনে আমিও জড়িত হয়েছিলাম। এ আন্দোলনের একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসটি আরো একটু পরে বলব।

সময়কে আগলে রাখা যায় না, কালের প্রতাপে সবই হারিয়ে যায়। আমি আমার জীবনে দেখেছি যে সময়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি যে সময় প্রতিদিন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কোনো কিছুকেই চিরকালের জন্য ধরে রাখা যায় না। আজ একটি বয়সে এসে পিছনের দিকে দৃষ্টিপাত করে শুধু একথা ভাবতে চাচ্ছি যে সময়ের পশ্চাৎমুখিতায় আমি যেনো কখনও অচৈতন্য না হই। আমি যেন অতীতের জীবন থেকে সকল অবলম্বনকে অমৃত্যের উৎস বলে তুলে আনতে পারি।

॥৫॥

কলকাতা থাকতে তরুণ মুসলমান শিল্পী জয়নুল আবেদীন ৪২-এর মন্বন্তরের অযাচিত মৃত্যুর দৃশ্যপট উন্মোচন করেছিলেন। মৃত্যুময়তায় মৃত্যু পথযাত্রায় অথবা বুভুক্ষায় দুর্বল অসহায় শরীরগুলো বিচিত্র আকৃতি নিয়ে আবেদীনের দীপ্ত মোটা তুলির টানে প্রকাশিত হয়েছিল। নতুন বিষয়ের নতুন আবেদনে আবেদীন সকলকে অভিভূত করেছিলেন। এ চিত্রগুলোতে সমাজের কোনও সমালোচনার অথবা রাজনীতির কোনও প্রেক্ষাপট ছিল না, শিল্পী আবেদীনের স্বকীয় জীবনগত কৌতূহলের উপস্থাপনাই ছিল। সে সময় আরও কয়েকজন তরুণ মুসলমান শিল্পী অনেকের দৃষ্টিতে পড়েছিলেন, তারা হচ্ছেন আবক্ষ প্রতিকৃতি শিল্পী আনওয়ারুল হক, কাঠ খোদাই শিল্পী শফিউদ্দীন আহমদ এবং রেখাঙ্কনে সুদক্ষ কামরুল হাসান। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর এঁদের নিয়েই চিত্রজগতে আমাদের প্রথম যাত্রা।

একটি শিল্পের বিশিষ্টতা এবং সম্পন্নতা নির্ভর করে বহুলাংশে শিল্পীর ব্যক্তিগত অনুভূতি, কৌশল এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর। চিত্রটির বিষয়গত আর্যবৃত্তি শিল্পীর মানসলোকের চৈতন্যের উপর স্থাপিত। বাস্তবের কোনও আকৃতি ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিতে শিল্পের যাথার্থ্য নয়, শিল্পের যাথার্থ্য হচ্ছে কণ্ঠের উচ্চারণের মতো শিল্পীর অঙ্কন শৈলীর স্বকীয়তা। এ স্বকীয়তাই জয়নুল আবেদীনকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল। শিল্পীর তুলির টানে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তা এক ধরনের ট্রান্সফরমেশন। আবেদীন এ রকম ট্রান্সফরমেশন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর চিত্রে পরিপ্রেক্ষিতগত গভীরতা নেই, পূর্ণাঙ্গ মডেলিং এর কারুতা নেই, গঠিত আকৃতির একটি স্তব্ধতা আছে। মোটা তুলির টানের পৌনঃপনিকতা তাঁর চিত্রগুলোতে এক ধরনের রিদম বা ছন্দ এনেছে। তাঁর দুর্ভিক্ষকালীন চিত্রগুলোর ফোরগ্রাউন্ড বা নিম্নভাগটি খুবই সংকীর্ণ কিন্তু উপরিভাগে শূন্যতার একটি বিস্তার আছে। এ কৌশলের ফলে তাঁর এ সমস্ত চিত্র আলেখ্যগুণ পেয়েছে, আমরা আকৃতিগুলোকেই একমাত্র দেখি। মোটা মোটা বলিষ্ঠ রেখায় আবেদীন এক পৃথক স্বভাবের চিত্র সৃষ্টি করলেন।

আমি আবেদীন সম্পর্কে এতোটা কথা বললাম এ জন্য যে ঢাকা শহরে এসে পাকিস্তানে আবেদীনের শিল্পী অস্তিত্ব হারিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। এখানে কোনো

www.pathagar.com

সরকারি আর্ট স্কুল ছিল না। যার ফলে সরকারিভাবে আবেদীনকে এবং তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন শিল্পীকে ঢাকার বিভিন্ন স্কুলে চিত্রকলার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এটা ছিল জাতি হিসেবে আমাদের জন্য অসম্মানজনক। এক দিনের কথা মনে আছে, রেডিও অফিসে আমাদের সঙ্গে আবেদীনের আলাপ আলোচনা চলছে। সে সময় কে যেন আবেদীনকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি এখন কি আঁকছেন?" আবেদীন উত্তর করলেন, "আমি ছাগল আঁকছি, শুধুই ছাগল।" প্রশ্নকর্তা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তার মানে?' আবেদীন উত্তরে বললেন, আমি নর্মাল স্কুলের ড্রয়িংটিচার হয়েছি। যা আঁকতে বলা হয় তাই আঁকি। ছাগল যেভাবে নির্বিবাদে ঘাস খায়, আমিও তেমনি নির্বিবাদে ছাগল আঁকি। আবেদীনের উক্তিতে ক্ষোভ ছিল যন্ত্রণা ছিল।

ঢাকায় তখন শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক চলছে। শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান সাহেব ঢাকায়। আমি আবেদীনের ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম, আমাদের এখানে আর্টস্কুল নেই। অবিলম্বে একটি আর্টস্কুল হওয়া দরকার। পাঞ্জাবে আর্টস্কুল আছে। তাদের গৌরব করার মতো শিল্পীও আছে– আবদুর রহমান চুগতাই। আমাদের গর্ব করবার মতো শিল্পী আবেদীন কিন্তু তাকে আমরা স্কুল মাস্টার বানিয়েছি। এটা কি ঠিক হয়েছে? ফজলুর রহমান সাহেব চটে উঠলেন। তিনি বললেন, 'আবদুর রহমান চুগতাই পাঞ্জাবের শিল্পী হবেন কেন? তিনি পাকিস্তানের শিল্পী। তিনি তো পাকিস্তানের গৌরব। তুমি যা বললে তার মধ্যে প্রাদেশিকতার গন্ধ আছে।" আমি অন্য পথে অগ্রসর হলাম। আমি বললাম, 'আপনার কাছে আমরা কেন আসি? আপনি বাঙালী সে জন্যই তো আসি। আপনি পাকিস্তানী সেটা ঠিক, কিন্তু আপনি আবার বাঙালীও। আবদুর রহমান চুগতাই তেমনি একই সঙ্গে পাকিস্তানী এবং পাঞ্জাবী এভাবে আবেদীনও একই সঙ্গে পাকিস্তানী এবং বাঙালী। সুতরাং আবেদীনের জন্য কিছু করলে বাঙালীর জন্য যেমন কিছু করা হবে তেমনি আবার পাকিস্তানের জন্যও কিছু করা হবে।" তখন ফজলুর রহমান সাহেব একটু বিগলিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'আমাদের উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে ইউনেস্কোর একজন প্রতিনিধি এসেছেন। ভদ্রলোক চীনা। তার সঙ্গে তুমি কথা বলো। তারপরে দেখা যাক কি হয়।" আমি ইউনেস্কোর ভদ্রলোকের জন্য রেডিওতে একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলাম এবং আবেদীনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও করিয়ে দিলাম। আবেদীনের দুর্ভিক্ষের ছবির কতকগুলো ফটোগ্রাফ দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। এবং অনেকটা সময় বসে আমরা আমাদের সমস্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলাম। তিনি আমাদের কোনো রকম আশ্বাস দিলেন না। কিন্তু শুধু এইটুকু বললেন যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন। ভদ্রলোক কিন্তু তাঁর কাজ ঠিকই করেছিলেন। করাচী ফিরে গিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছিলেন যে ঢাকায় আর্টস্কুল হওয়া প্রয়োজন, যাতে আবেদীনের মতো শিল্পীরা সেখানে স্থান পেতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেই মর্মে প্রাদেশিক সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল।

কিন্তু এর আগেরও একটি কথা আছে। আবদুল গনি হাজারী আর্টস্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ঢাকায় একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। সে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলাম আমি অজিত গুহ, খাইরুল কবীর এবং আরও অনেকে। তবু ঘোরাঘুরির কাজটা প্রধানত

www.pathagar.com

করেছিল আবদুল গনি হাজারী। বহু সংখ্যক স্বাক্ষর সংগ্রহ করে সরকারের কাছে দাবীনামা পেশ করা হয়েছিল। প্রয়োজনবোধে আবেদীনও বিভিন্ন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। আমিও করেছিলাম। একথা অবশ্য এখানে স্বীকার করতে হবে যে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু শিল্পী এ আন্দোলনে আমাদের সমর্থন জানিয়েছিলেন।

আমরা সে সময় একটি আর্ট গ্রুপ গঠন করি। 'ঢাকা আর্ট গ্রুপ নামে। এ গ্রুপের সভাপতি হয়েছিলেন জয়নুল আবেদীন। সহকারী সভাপতি হয়েছিলাম আমি, শফিউদ্দীন আহমদ, আনোয়ারুল হক এবং অজিত গুহ। কামরুল হাসান হয়েছিলেন সম্পাদক। আর্ট গ্রুপের আন্দোলনে জয়নুল আবেদীন শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকতে পারেন নি। তিনি লন্ডনে পড়াশুনা করতে চলে গিয়েছিলেন। তখন আমি এর সভাপতি হিসাবে কাজ করেছিলাম। সে সময় আর্ট গ্রুপের একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন আমরা করি। প্রদর্শনীতে এ অঞ্চলের সকল শিল্পীই অংশগ্রহণ করেছিল।

যেহেতু প্রদর্শনীটি প্রতিষ্ঠানগতভাবে হয়নি সুতরাং যারা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিল্প দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তাদেরকেও অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়েছিল। প্রথাগত শিল্প প্রশিক্ষণের বাইরে যিনি সে সময় খ্যাতিমান ছিলেন তিনি হচ্ছেন আবুল কাসেম। তাঁরও চিত্র এ প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। লেডী নুন তাঁর দুটি ছবি প্রদর্শনীতে দিয়েছিলেন। একটি ছিল বুড়ীগঙ্গা তীরের নিসর্গ চিত্র। ছবিটি তৈল রংয়ের। এবং তাতে দক্ষ কারুকর্মের পরিচয় ছিল। প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে আমি বেগম নুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। আলোচনাকালে লেডী নুন আমাকে বলেছিলেন, "আমি উপমহাদেশের শিল্প সাধনার সন্ধান রাখবার চেষ্টা করেছি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্প আমি দেখেছি। আমার একটি কথা সব সময় মনে হয়েছে যে এ দেশের শিল্প যদি পুরোপুরি এদেশেরই শিল্প থাকত তাহলে শিল্প প্রক্রিয়ায় আমরা নতুন জিনিস পেতাম। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাব এসে পড়াতে এদেশে শিল্প প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। তবুও মাঝে মাঝে দু একজন শিল্পী আপন স্বকীয়তাই জেগে উঠেছেন। তারাই নতুন ঐতিহ্য নির্মাণ করবেন বলে আমার বিশ্বাস। আবেদীন এঁদেরই একজন।" তিনি আমাকে প্রচুর উৎসাহ দিলেন এবং বললেন যে সরকারের পক্ষ থেকে কিছু সাহায্যের ব্যবস্থাও তিনি করবেন। আমি তাঁর কথা মতোই কিছুদিন পরে ফিরোজ খান নুনেরও সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। নুন সাহেব একটি পুরস্কার দেবেন বলে স্বীকৃত হন। সিদ্ধান্ত হয় যে পুরস্কারটি দভর্নরের পুরস্কার নামে পরিচিত হবে। ফিরোজ খান নুন অবশ্য ইসলামী শিল্প সম্পর্কে কিছু বলবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলবার চেষ্টা করেছিলেন যে আমরা পূর্ব পাকিস্তানে যেন ইসলামী শিল্প পদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা করি। তাহলে পূর্বে ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প পদ্ধতির মধ্যে একটি মিল গড়ে উঠবে। আমি এ ব্যাপারে নুন সাহেবের সঙ্গে কোনো আলোচনায় যাই নি।

সে সময় আর্ট স্কুলের শেষ পর্বের ছাত্র আমিনুল ইসলাম শিল্প সাধনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। সে নানাবিধ শিল্প মাধ্যম নিয়ে পরীক্ষা করেছিল। 'মোজায়িক' পদ্ধতি নিয়েও কিছু শিল্প সৃষ্টি তার প্রয়াস ছিল। সে তেল রং জল রং এবং টেম্পারা অবলম্বন করে ছবি আঁকছে। এক কথায় বলা যায় বিবিধ অনুশীলনের মাধ্যমে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

করে তুলেছিল। আর্ট গ্রুপের প্রদর্শনীর কাজে সে সর্বতোভাবে আমার সাহায্য করেছিল। তার সাহায্য না পেলে প্রদর্শনীর আয়োজন করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। ছবি মাউন্ট করা, দেওয়ালে ছবি টাঙ্গানো, ঘরের মধ্যে হার্ডবোর্ডের নানা রকম পার্টিশন সাজিয়ে সেখানে ছবি লাগানো– এগুলি সবই ছিল কৌশলের কাজ এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাজ। এ কাজগুলো আমিনুলের নেতৃত্বেই হয়েছিল। আমি আমিনুলকে জানতাম শৈশব থেকে। তার পিতা এবং আমার পিতা এক সঙ্গেই কাজ করতেন।

তারা উভয়ই স্কুল পরিদর্শক ছিলেন। এক সময় আমরা ঢাকা শহরে কাছাকাছি বাসায়ও থাকতাম। এর ফলে আমিনুলের প্রতি আমার একটি স্নেহ এবং মমতা গড়ে উঠেছিল। আজও আমিনুল শিল্প সাধনায় অগ্রসর। কিন্তু যে খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা তার হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। শিল্পকর্মে সে অনবরত নতুন নতুন মাধ্যম নিয়ে কাজ করেছে। কিন্তু কোনো একটা মাধ্যমের চূড়ান্তে যেতে চেষ্টা করে নি। তাঁর শিল্পকর্মের ব্যাপকতা আছে, বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু একই পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণের শেষ সীমানায় পৌঁছাবার ধৈর্য নেই। আমি এখানে আমিনুল সম্পর্কে এতটা বললাম তার একমাত্র কারণ হলো, আমাদের শিল্প সাধনার প্রথম পর্যায়ে আমিনুলের আত্মপ্রকাশ বিচিত্র সম্ভাবনাময় ছিল। একটি ইংরেজি কবিতায় পড়েছিলাম ঃ 'যদি তুমি সময়ের সম্ভারকে/ খুঁজে পেতে চাও/ তোমাকে জানতে হবে/ তারা কোথায় আছে/ কোথায় আছে শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধানে তুমি বিরত হবে না।'/

অর্থাৎ শিল্পীকে সততই অনুসন্ধানে তৎপর থাকতে হয়। অতর্কিতে থেমে গেলে অনুসন্ধান হারিয়ে যায় এবং নতুন পথে সবকিছু আবার নতুন করে শুরু করতে হয়। এতে বিপদ আছে। একটি পর্বের শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে হবেই। আবেদীনকে প্রশংসা করি এই জন্য যে আবেদীন একই রেখাঙ্কনের পথ বেয়ে চরমতম সিদ্ধিতে পৌঁছেছিলেন। কলকাতায় থাকতে ১৯৪৬ সালে টাটার শিল্প প্রদর্শনীতে তার একটি ছবি খুব প্রশংসিত হয়। ছবিটি ছিল একজন কাবুলী ওয়ালার পোর্ট্রেট। ঢাকায় এসেও বিভিন্ন লোকের পোর্ট্রেট এঁকে তিনি অর্থ উপার্জন করেন। শিল্প হিসেবে এ পথেই তাঁর থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি নানাবিধ ব্যর্থ পরীক্ষায় অগ্রসর হয়ে পোর্ট্রেটের ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত অচল হয়ে পড়লেন।

শিল্পী শফিউদ্দীন আহমদ ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে কলকাতা থাকতেই দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। তার ছাপচিত্রের মধ্যে ক্রমান্বয়ে এচিং ও লিথোগ্রাফিও এসেছে। শফিউদ্দীন আহমদ প্রথমে কাঠের ছাপচিত্রে একক বা দ্বৈত মূর্তি উদঘাটন করার কৌশল আয়ত্ত করেন, পরে অলঙ্করণ প্রক্রিয়ায় কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রিন্ট শিল্প-প্রক্রিয়ায় সাময়িক ঘটনার লিপিকরণ ঘটেছিল এক সময়, কিন্তু বর্তমানে নিছক শৈল্পিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ হিসেবে তা গৃহীত হচ্ছে। অন্যান্য মাধ্যমের মত, যেমন তেল রং, জলরং, প্রিন্টের ক্ষেত্রেও বাস্তবের প্রচণ্ড ভঙ্গুরতা এবং বিভাজন ঘটেছে। আমাদের দেশের শিল্পকর্মেও এর প্রতিক্রিয়া এসেছে। শফিউদ্দীনের হাতে তা রৈখিক অলঙ্করণে পরিণত হয়েছিল।

চিত্রকর্মের একটি প্রধান ধর্ম হচ্ছে প্রকাশময়তা অর্থাৎ শিল্পী যা অনুভব করেছে, তা তিনি প্রকাশ করতে সক্ষম হচ্ছেন কিনা অর্থাৎ তিনি তাঁর উদ্দেশ্য স্বপ্রকাশ করতে

www.pathagar.com

পেরেছেন কিনা। প্রাথমিকভাবে এবং আমি বলবো চূড়ান্তভাবে শিল্পকর্ম হচ্ছে শিল্পীর বোধ এবং সিদ্ধান্তের মহত্তম প্রকাশ। দুর্বল শিল্পী হলে তাঁর প্রকাশক্ষমতা থাকবে না এবং সার্থক শিল্পী হলে তা থাকবে। প্রকাশ ক্ষমতার কারণেই একটি শিল্পকর্ম কালাতীত হয়। তাই আমরা দেখি প্রকাশের সফলতায় কত শিল্পী যুগোত্তীর্ণ ও কালজয়ী। একটি শিল্পকর্ম তখনই শিল্পকর্ম হিসাবে গ্রাহ্য যখন আমরা অনুভব করব একটি দৃশ্য গ্রাহ্য আকৃতিতে শিল্পী তার চিন্তা, ধারণা ও আবেগকে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। এই দৃশ্যযোগ্য আকৃতি গড়ে ওঠে দেশকাল, সময় ইতিহাস এবং শিল্পীর সমাজগত চেতনায়। আমাদের প্রবীণ শিল্পীরা শিল্প প্রক্রিয়ার একটি প্রত্যয় দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তিনি বহুবিধ পরীক্ষা করেছিলেন ঠিকই কিন্তু যে রেখায় তাঁর শিল্পকর্মের সূত্রপাত সে রেখাতেই তাঁর শিল্পকর্মের অবশেষ। আমাদের অঞ্চলের কোনো শিল্পী কোনো একটি ধারায় বিশিষ্ট সিদ্ধির পথ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন না। দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণ তাদের বিকাশের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে।

আর্ট গ্রুপ যখন ঢাকায় শিল্প আন্দোলন আরম্ভ করে তখন এ দেশের মানুষের শিল্প ক্রয় করবার কোনো ইচ্ছা তৈরি হয়নি এবং শিল্প প্রদর্শনীও ছিল তাদের জন্য নতুন। তবুও একটি জিনিস আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে শিল্প প্রদর্শনীতে দর্শক আসছে প্রচুর। তখন শিল্পীদের অধিকাংশ ছবিই ছিল নিসর্গ-চিত্র অথবা বাস্তব অনুগত চিত্র। এর ফলে সাধারণ দর্শক আনন্দ পেয়েছে এবং আপন জীবনের প্রতিবিম্ব দেখে কৌতূহলী হয়েছে। বলা যেতে পারে, ঢাকা আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এবং আর্ট গ্রুপ গড়ে তোলার প্রবণতায় এ অঞ্চলের মানুষের মনে শিল্পের প্রতি একটি আগ্রহ ক্রমশ গড়ে উঠতে থাকে।

কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে কামরুল হাসান নানাভাবে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। তার মধ্যে একটি ব্যস্ততা ব্রতচারী নিয়ে। কামরুল কলকাতা থাকতেই 'ব্রতচারী' প্রশিক্ষণ পাস এবং সেখানেই গুরুসদয় দত্তের প্রিয়পাত্র হন। ঢাকা এসে কিছু ছেলে যোগাড় করে তিনি ব্রতচারী' প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। কার্জন হলের মাঠে প্রায়ই তাঁকে সকালবেলা একদল ছেলেকে প্রশিক্ষণ দিতে দেখা যেত। একদিন পথ দিয়ে যেতে ফররুখ কামরুলের সঙ্গে এই ছেলেগুলোকে দেখে এবং কৌতূহলী হয়ে লক্ষ্য করতে থাকে। পরে ঠাট্টা করে বলে, যেখানে একটি ছেলে হলেই কাজ চলে, সেখানে এতোগুলো ছেলে যোগাড় করেছে কেন ?'

শিল্পী আনোয়ারুল হক পোর্ট্রেট আঁকায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

॥৬॥

দেশ বিভাগ হওয়ার পর বহু কিছুই বিভক্ত হল, কাম্য অকাম্য অনেক কিছু। বিভাগজনিত ব্যাপারটি এমন একটি আবেগের বিষয় ছিল যে বিভাগটি কোন পর্যায়ে আমরা নিয়ে যাব তাও ঠিক করতে পারছিলাম না। অনেকে দ্বিমত পোষণ করলেও সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভাজনটা ১৯৪৭ সাল থেকে। অন্ততপক্ষে এ দুটি ক্ষেত্রে '৪৭-এর পূর্বেকার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারাকে আমরা মোটামুটি আমাদের উত্তরাধিকারের মধ্যে ধরে

www.pathagar.com

নিয়েছিলাম। কিন্তু তবুও প্রশ্ন উঠেছে এমন কি রবীন্দ্রনাথ নিয়েও নানাবিধ জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু হিসাবে চিহ্নিতকরণের একটি প্রবল প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। আবুল মনসুর আহমদ একদিন আলোচনাক্রমে বলেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের কাব্য সামগ্রিকভাবে না হলেও অংশত পক্ষপাতদুষ্ট। সে অংশগুলো পাঠ করলে সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় যে তিনি হিন্দু। তাঁর যে পরিচয় আমাদের সামনে আছে অর্থাৎ সম্প্রদায়-নিরপেক্ষতা সেটা সত্য বলে মনে হয় না। তিনি আজীবন বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে জমিদারী পরিচালনা করলেন সে অঞ্চলের মানুষ প্রধানত মুসলমান ছিল, কিন্তু তাদের জীবনধারা, বিশ্বাস এবং আবেগ তাঁর কবিতায় রূপ পায় নি।

মুসলমানদের ঈদ উৎসব এদেশের হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছে একটি আনন্দ উৎসব। কিন্তু তার পরিচয়ও তাঁর কাব্যে নেই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে আমরা আমাদের কবি বলতে পারি না। অবশ্যই তিনি বাংলা ভাষার কবি। এবং সে অর্থে তাঁকে আমরা গ্রাহ্য করবো। একান্ত আপন বলে মান্য করবো না।" ফররুখ একদিন বলেছিল, "আমাদের কবিতাকে নতুন খাতে এবং নতুন বিশ্বাসে প্রবাহিত করতে হলে রবীন্দ্রনাথকে ভুলে যেতে হবে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাববলয় থেকে সরে যেতে না পারলে আমরা একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নির্মাণ করতে সক্ষম হব না।" যে বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছিল সে বিতর্ক সহজে মুছে যাবার ছিল না। রাজনৈতিকভাবে অনেকে এ বিতর্ককে কাজে লাগাচ্ছিলেন। ফিরোজ খান নুনের কথা আমি আগেই বলেছি। তিনি এ রাজনৈতিক বিতর্ক উত্থাপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। আবার একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে ভারতের জাতীয় কবি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সুতরাং স্বতঃই প্রশ্ন উঠেছিল যে অন্য একটি রাষ্ট্রের জাতীয় কবি আমাদের রাষ্ট্রের জাতীয় কবি কি করে হতে পারেন। আমার বিশ্লেষণটা ছিল অন্য রকম। আমি রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর মহৎ কবিদের সঙ্গে তুলনা করতাম এবং এখনও করি।

যে কবি মহৎ কবি বলে স্বীকৃত এবং সর্বত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্চিত সে কবির কাব্য পরীক্ষা করা দুরূহ কর্ম। কাব্য পরীক্ষা একটি বিচার, একটি মীমাংসা এবং শব্দ প্রয়োগ-বিধির মধ্যে জীবনের অবস্থিতি আবিষ্কার। যাকে আমরা শ্রদ্ধা করি তাকে মূলত শ্রদ্ধার সঙ্গে দূরেই সরিয়ে রাখি। একই কারণে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে তার অধিকাংশই দেব-বন্দনার স্তোত্রের মত। মনে রাখতে হবে যে কবি মহাপুরুষ নন, দেবতা নন অথবা ভগবানও নন। সুতরাং বিশ্লেষণ-পরান্মুখ হয়ে কবিকে আবিষ্কার করা যায় না। কবিকে আবিষ্কার করতে হবে তাঁর শব্দ প্রয়োগের মধ্যে যে শব্দ প্রয়োগ দ্বারা তিনি একটি রসাবেশ সৃষ্টি করেছেন। বিদেশে কবিকে একই সঙ্গে শিল্পী এবং স্রষ্টা হিসাবে বর্ণনা করা হয়। তাই শিল্পীর দক্ষতা পরীক্ষা করতে তাঁদের কখনও দ্বিধা হয় না। রবীন্দ্র-আলোচনায় অগ্রসর হবার পূর্বে আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাংলা ভাষার একজন কুশলী কবি। সুতরাং বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর কাব্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে হবে। বক্তব্যের দ্বারা কবির রহস্য নির্ণয় করা যায় না। অথবা কবিতার তাৎপর্য আবিষ্কার করা যায় না, বক্তব্যের যা অবলম্বন অর্থাৎ যাকে অবলম্বন করে বক্তব্য অভিষিক্ত হয়েছে সেই শব্দকে পরীক্ষা করেই কবিতার তাৎপর্য নির্ণয় করতে

www.pathagar.com

হয়। যেমন দেহকে অগ্রাহ্য করে চিন্তার স্থিতি নেই, তেমনি শব্দকে অগ্রাহ্য করে বাণীর প্রকাশ নেই। গৌতম বুদ্ধ দেহ এবং চিত্ত পরস্পর সাপেক্ষ বলেছেন। তিনি বলেছেন যে দেহ হচ্ছে চিত্তের অবলম্বন এবং চিত্ত হচ্ছে দেহের অবলম্বন।

বস্তুত এই অবলম্বন গ্রহণ এবং তার প্রতি চিত্তের ধারণার উপরই চিত্তের কুশলা কুশল নির্ভর করে। বুদ্ধের বিবেচনায় চিত্ত রূপ, শব্দ এবং গন্ধের অবলম্বনে উৎপন্ন হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, চিত্তের অনুভূতি দেহের উপর নির্ভরশীল আবার দেহের বিবিধ প্রকার বিবেচনাও চিত্তের অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল। মানুষের ক্ষেত্রে যেমন দেহ এবং চিত্ত, কবিতার ক্ষেত্রে তেমনি শব্দ এবং ভাব অর্থাৎ শব্দকে অবলম্বন করেই ভাবের উৎপত্তি এবং শব্দকে সর্বতোভাবে গ্রাহ্য করেই ভাবের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ তদগত কবি ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সজাগ কুশলী শিল্পী ছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য পরীক্ষা করতে গিয়ে আমাদের রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক কবিতায় শব্দ ব্যবহারের কৌশল এবং দক্ষতা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এই পরীক্ষা দ্বারাই আমরা প্রমাণ করতে পারব যে রবীন্দ্রনাথ কবিতার ক্ষেত্রে যথার্থ অসাধারণ ছিলেন।

একটি ভাষার কাব্যধারার কোনও কবিই একাকী নন অর্থাৎ উক্ত ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোনও কবিকেই বিশ্লেষণ করা চলে না। তাঁর বিশিষ্টতা, তাৎপর্য এবং শ্রোত্রবোধ যে ভাষার তিনি কবি সে ভাষার অতীতের সকল কবির কাব্যকীর্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। ইতিহাসের দিক থেকেই এ সম্পর্ক নয়, কবিতার সৌন্দর্যবোধের দিক থেকেও এ সম্পর্ক নিগূঢ়। যখনই একটি ভাষার একজন মহৎ কবির আবির্ভাব ঘটে তখনই সঙ্গে সঙ্গে নতুন নিরিখে অতীতের প্রধান প্রধান কবির মূল্যায়ন আরম্ভ হয়।

বাংলা কবিতায় একবার বিরাট চাঞ্চল্য এসেছিল। মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাবের সময়। মধুসূদনের কাব্য পাঠ করে আমরা নতুন তাৎপর্যে কৃত্তিবাসকে আবিষ্কার করেছিলাম আরও আবিষ্কার করেছিলাম নতুন লালিত্যে বৈষ্ণব পদকর্তাদের। মধুসূদনের শব্দ-ব্যবহার, উপমা রূপক প্রয়োগ বাংলা কবিতার জন্য বহুলাংশে নতুন ছিল। এই নতুনত্বের স্বাদ পেয়ে আমরা পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করেছি। এই তুলনায় অতীতের কবিরা নতুন বিচারের সম্মুখীন হয়েছেন, যার ফলে সমগ্র বাংলা কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে আমাদের নতুন বিবেচনা আরম্ভ হয়েছিল। বিশেষ করে কৃত্তিবাসের রামায়ণ যা এতদিন পর্যন্ত বটতলার পুঁথি হিসাবে গ্রাহ্য ছিল। মধুসূদনের আবির্ভাবের পর তা নতুন তাৎপর্যে উন্মোচিত হল। এভাবে 'ব্রজাঙ্গনা' সৃষ্টির ফলে বৈষ্ণব পদাবলী নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হল। আমরা শ্রী রাধিকাকে আরো অন্তরঙ্গভাবে পেলাম অথবা বলা যায় একটি নতুন পরিমণ্ডলের মধ্যে পেলাম। ঠিক এইভাবে রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে নতুন শক্তি নিয়ে প্রকাশিত, তখন রবীন্দ্রনাথের কারণে সমগ্র বাংলায় একটি নতুন বিবেচনা আরম্ভ হল। আমরা বৈষ্ণব গীতি কবিতাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম। সংস্কৃত কাব্য নতুনভাবে রূপময় হল।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ফলে বাংলা কাব্যে এই বিপুল প্রসারী পরিবর্তন ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের কারণে আমরা অতীতকে নতুন করে প্রত্যক্ষ করলাম এবং কবিতার যে

www.pathagar.com

স্রোতধারার সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটেছিল সেই স্রোতধারায় আবার নতুন করে প্রবাহিত হলাম। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিচারের সময় সমগ্র বাংলা কাব্যের অতীতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে। এই সম্পর্ক নির্ণয় না করে রবীন্দ্রনাথকে যথার্থভাবে জানা সম্ভবপর হবে না। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা কবিতার অতীত সম্পর্কে আমরা যথার্থরূপে সজ্ঞান ছিলাম না।

এই অতীত এক একটি রূপমণ্ডলে আমাদের সামনে আবির্ভূত হত, আমরা সমগ্রভাবে আমাদের কাব্যের অতীতকে প্রত্যক্ষ করতে পারি নি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠের ফলে আমাদের মানসলোকের পরিবর্তন ঘটল এবং আমরা সমগ্র বাংলা কাব্যকে একটি ক্রমধারার মধ্যে আবিষ্কার করতে শিখলাম। এটা সত্য যে যুগে যুগে ভাষার পরিবর্তন ঘটে, এটা অধিকতর সত্য যে যুগে যুগে মানুষের চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটে, এক যুগে যা গ্রহণযোগ্য এবং রুচিসম্মত অন্য যুগে তা হয়ত নীতিবিরোধী কিন্তু তৎসত্ত্বেও একটি ভাষার কাব্যধারার অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত একটি নিগূঢ় রহস্যময় সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্ক কবিতার ধ্বনির সাহায্যে নির্মিত কাব্যের মানস প্রতিমা। রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠের ফলে আমাদের কাব্য-বোধের প্রসার ঘটেছে। আমরা পূর্বে যে সমস্ত চিন্তা এবং আবেগের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলাম, রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠের ফলে সেই আচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত হলাম। এই যে নতুন করে আমাদের মধ্যে একটি বোধের প্রসারতা ঘটল, এটা ঘটল রবীন্দ্রনাথের কারণে। এর ফলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার অতীতের কাব্যধারার সম্পর্কে আমাদের বিবেচনার আমূল পরিবর্তন হল। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বাংলা কাব্যের ওপর এইভাবে তাঁর স্বাক্ষর রেখেছেন।

আমাদের জীবনে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র প্রত্যয়ে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু মূলত একজন মহৎ বিশ্বকবির পরিপ্রেক্ষিতে। পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্রনাথের এহেন প্রবল প্রভাবের কারণে তাঁর কোনও কোনও হিন্দুত্বের সংস্কার আমাদের ব্যথিত করত। কেউ কেউ তাই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব-বলয় অস্বীকার করার কথা বলতেন। আমিও একদিন বলেছিলাম। আজ এখানে সে কথাই আলোচনা করব।

পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির জন্ম কলকাতায়, কার্যক্রম কলকাতায় এবং বিনিঃশেষিতও হয় কলকাতায়। ঢাকায় একে আবার পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা করেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে মুহম্মদ কাশেমের বাড়ীতে এক ঘরোয়া বৈঠক বসে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মজিবর রহমান খান, ইদরিস আলী, আকবর আলী, আবু জাফর শামসুদ্দীন , জহুর হোসেন চৌধুরী, সৈয়দ নূরুদ্দীন খায়রুল কবীর, মোহাম্মদ মোদাবের, ফররুখ, আমি এবং আরও কয়েকজন। স্থির হয় রেনেসাঁ সোসাইটি নতুন করে গঠন করতে হবে। সোসাইটির মেনিফেস্টো কি হবে তা নিয়েও আলোচনা হয়। লোককাহিনীর উপকরণ, পল্লীজীবনের ইচ্ছা ও আনন্দ ইসলামের প্রত্যয় এগুলোর কথা মেনিফেস্টোতে থাকবে, ঠিক হয়। এটাও ঠিক হয় যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী মেনিফেস্টোতে থাকতে হবে। মেনিফেস্টো লিখার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

আমি একটি দীর্ঘপ্রবন্ধের আকারে মেনিফেস্টো লিখি। ঘটনাটি ১৯৫০ সালের। তখন আমার বয়স ২৭/২৮ বছর। আমি আমার প্রথম যৌবনের বিবেচনাহীন সাহসিকতায় অনেক কথাই লিখি যা আমি আমার জীবনে কখনই অনুসরণ করি নি। আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের কথা লেখি যা আমার চিন্তাধারায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। রাষ্ট্রের সংহতি এবং আদর্শের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার কথা লিখি কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল আমি পাকিস্তানকেই অস্বীকার করলাম, রবীন্দ্রনাথকে নয়। মেনিফেস্টো সোসাইটির একটি সভায় পাঠ করা হয় এবং উৎসাহের সঙ্গে গৃহীত হয়। জহুর হোসেন চৌধুরী সমর্থন করে একটি বক্তৃতাও করেন। তবে রেনেসাঁ সোসাইটি উজ্জীবিত হল না কিন্তু আমার লেখাটি এক কালের বিশ্বাসের সাক্ষ্য হিসাবে রয়ে গেল। বেশ কিছুকাল পরে 'মাহে নও' পত্রিকায় লেখাটি আমার নামে ছাপা হয়।

লেখাটি শামসুদ্দিন সাহেবের কাছে ছিল, তিনিই 'মাহে নও' সম্পাদক মুহাম্মদ মনসুরউদ্দীনকে দিয়েছিলেন। এ লেখাটির প্রতিবাদ কখনও করি নি, লেখাটি গ্রহণ করি নি। আমার কোনও গ্রন্থে লেখাটি স্থান পায় নি। এতেই স্পষ্ট যে আমি লেখাটি এককালের মানসিকতার সাক্ষ্য হয়ে থাকুক তা চাই নি। রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে মেঘনাথবধ কাব্যের সমালোচনা করে হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারকে মর্যাদা দিয়েছিলেন। রচনাটি বালকসুলভ চাপল্যে ভরপুর এবং হাস্যকর। এ রচনার সাহায্যে রবীন্দ্রমানসের চরিত্র নির্ধারণ আমরা করি না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও কোনও কোনও মহাশয় ব্যাপ্তি আমার বালসুলভ রচনার উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে আক্রমণ করে থাকেন। বলা হয়ে থাকে যে আমি যা কিছুই লিখি না কেন সব রচনার পাশ্চাতেই নাকি রবীন্দ্রবিরোধী মানসিকতা কাজ করছে। চর্যাপদের ক্ষেত্রেও সম্ভবত।

১৯৫০ এর দৈনিক বাংলাদেশ এলাকায়, বিশেষ করে ঢাকা শহরে রবীন্দ্রনাথ বামপন্থীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছিলেন। তারা ঘটা করে সভাসমিতি করে রবীন্দ্র দিবস পালন করত এবং সেখানেই রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া ও পুঁজিপতি বলে আখ্যায়িত করত এ রকম একটি সভায় প্রধান অতিথি হবার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল। ঢাকা বার লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত সে সভার উদ্যোক্তা ছিল অলি আহাদ এবং মুস্তফা নূরউল ইসলাম। উদ্যোক্তারা রবীন্দ্রনাথকে সংকীর্ণ বুদ্ধির মানুষ হিসাবে উপস্থিত করে বলেছিল যে তিনি বিত্তের অহংকারে নির্মমতায় সাধারণ মানুষকে অবহেলা করে শুধু তাদের জন্য শব্দ ও সুরের আশ্বাস এনেছিলেন। প্রধান অতিথি হিসাবে আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। বলেছিলাম, 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা সর্বকালীন তাঁর কাব্যে সমকালীন অপেক্ষা চিরকালীন বোধ প্রবল। কবি বিশেষ সময় এবং কালের পরিধিতে যে সমস্ত চৈতন্য বর্তমান সেগুলোকে অতিক্রম করে চিরায়ত কতকগুলো অনুভূতিকে লালন করেছেন। মানুষের মধ্যে জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত যে সমস্ত বোধ আছে সেগুলো একই সঙ্গে সনাতন এবং সাময়িক। সনাতন বোধের দ্বারা মানুষ সর্বযুগের সর্বকালের মানুষের সঙ্গে একত্রিত হচ্ছে, আবার প্রাত্যহিক জীবনের সংস্কারের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে সেই বোধ একটা বিশেষ সময়ে বিশেষ চৈতন্যের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে।

www.pathagar.com

যেমন মাতৃস্নেহ অথবা নরনারীর প্রেম, এগুলো একই সঙ্গে সনাতন এবং সাময়িক। মাতৃস্নেহের অনিবার্যতা এবং সর্বকালীনতার কথা আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি। আবার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃস্নেহ বিশেষ পরিবেশে অর্থবহ হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ মানবতানুভূতির এই সর্বকালীন তাৎপর্য আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কবি প্রাণের যে অবাধ স্ফূর্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেই অবাধ স্ফূর্তির উৎস-মূলে আমরা বিশেষ দেশের অথবা অঞ্চলের মনুষ্য জীবনের সাধারণ কর্মচৈতন্যকে পাই না ঠিক এ ভাষায় আমি কথাগুলো বলিনি কিন্তু ভাষাটি আমার বর্তমান সময়ের ভাষা। রবীন্দ্রনাথের বৃত্তে কটি সহজাত বিস্তার ছিল যা সর্বকালের রেখাস্কেলের পরিধি নির্ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি জীবনের গণ্ডি এবং সংসারের দ্বারা বিচলিত না হয়ে একটি বিশেষ সত্যের বৃত্ত আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন যে সত্য অবিনশ্বর, সুন্দর এবং সর্বসম্যকের যে সত্যবোধটা হচ্ছে 'নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মুরতি।'

॥৭॥

মানুষ যখন তার চাকরি জীবনের কর্মকাণ্ডে প্রচণ্ডভাবে জড়িয়ে পড়ে তখন তার অন্তঃকরণে জড়তা আসে। এই জড়তায় একজন মানুষের জীবনে প্রভূত ক্ষতি হয় এবং সে ক্ষতিপূরণ করবার কোনো উপায় থাকে না। আমি রেডিওতে যতদিন চাকরি করেছি, ততদিন প্রতিদিন এই জড়তার ভয়ে ভীত ছিলাম এবং এই জড়তা যাতে আমাকে স্পর্শ না করে সে জন্য রেডিওর কর্মকাণ্ডে আমি নিজেকে মোহলুপ্ত করি নি। আমি আমার সাহিত্য বোধ এবং সজাগ মানসিকতাকে সব সময় জাগ্রত রেখে রেডিওর বিভ্রম থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছিলাম। জড়তা অর্থাৎ জড়িয়ে পড়া অথবা বলা যায় পুরোপুরিভাবে একটি চৈতন্যের মধ্যে চিরকালের জন্য স্তব্ধ করে রাখা। এক্ষেত্রে তিনজন লোক আমাকে খুব সাহায্য করেছিলেন। এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ডক্টর সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং আমার পিতার সহপাঠী হিসাবে আমার প্রতি মমতাময়। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন মরহুম ডক্টর নসিফ আহমদ। তিনি সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি হলেন প্রফেসর আতোয়ার হোসেন। আতোয়ার হোসেন ছিলেন অর্থনীতির প্রফেসর। রেডিওতে বিভিন্ন কথিকার জন্য এঁদের আমি অনেক সময় বিরক্ত করতাম। এ'রা নিয়মিত আমাকে কথিকা দিয়ে বাধিত করতেন। সাক্ষাত হলেই আতোয়ার হোসেন বলতেন, 'আপনি কেন রেডিওতে পড়ে আছেন? বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসুন।' নফিস আহমদ বলতেন, আপনি কেন গোলাকার ছিদ্রের মধ্যে ঢোকানো পেরেক হয়ে থাকবেন? রেডিও আপনাকে মানায় না। ওখান থেকে বেরিয়ে আসুন।' অবশেষে বেরিয়ে আসা সম্ভবপর হল ভাইস চ্যান্সেলর সৈয়দ মোয়াজ্জেম সাহেবের অনুকম্পায়। তিনি একদিন আমাকে বললেন, 'পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিন্দু অধ্যাপকরা চলে যাচ্ছেন।' সেসব যায়গার জন্য আমাকে লোক খুঁজতে হচ্ছে। এভাবে আমি আবদুল হাইকে এনেছি সরকারি কলেজ থেকে, সাজ্জাদ হোসেনকে এনেছি সরকারি কলেজ থেকে, আপনি চলে আসুন।' এভাবে তাঁরই উৎসাহে এবং আন্তরিক ইচ্ছায় আমার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ

www.pathagar.com

করা সম্ভবপর হয়েছিল। আমি ইংরেজির ছাত্র, কিছুকাল ইংরেজির অধ্যাপনা করেছি ঢাকা মাদ্রাসা এবং হুগলীতে। কিন্তু আমি আমার সাহিত্য কর্মের সমর্থন স্বরূপ বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হলাম।

সে সময় আমি কবি এবং সমালোচক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি, আমার লেখা প্রবন্ধ সুধীন সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় ইচ্ছা করলে আমার প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ আমাকে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত করতে পারে। কিন্তু এই নিয়োগ খুব সহজে হয় নি। বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে প্রবল প্রতিবাদ এসেছিল। নির্বাচনী কমিটি বা সিলেকশন কমিটি তিনটি বৈঠকের পর অবশেষে আমার নিয়োগ অনুমোদন করে। আমি তখন জানতাম যে, এই নিয়োগের ফলে অনেক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন আমি হবো। কিন্তু সকল বিরোধিতার বাধা অতিক্রম করে শিক্ষক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল। এ সম্পর্কে আমি পূর্বেই কিছুটা আলোচনা করেছি। আমি এমন ছিলাম না।

সুতরাং আমি আলাদীনের প্রদীপের সন্ধান করি নি। কোথায় যেন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে আলাদীনের প্রদীপের মতো এমন আশ্চর্য সুবিধার জিনিস পৃথিবীতে আর নেই। কেবল একটিমাত্র অসুবিধা যে, ওই জিনিস কোথায়ও পাওয়া যায় না। কিন্তু পাওয়া যে যায় না একথা সে ব্যক্তি কিছুতেই বলতে পারে না যার লোভ বেশি, সামর্থ্য কম। আমি সে সময় প্রাচীন অথবা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পড়ি নি। অথচ শিক্ষক হয়েই আমার ওপর পড়ানোর দায়িত্ব পড়ল। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, পদাবলী এবং চৈতন্য ভগবত। যারা এগুলো আগে পড়েন নি। যারা পড়েন তাদের পক্ষে এগুলোর ভাবসত্তার মধ্যে প্রবেশ করা খুবই কঠিন। কিন্তু এই সুযোগে আমি আমার পাঠ্যাভ্যাসকে বিস্তারিত করে এবং বাংলা কাব্যধারার প্রাচীন ও মধ্যযুগের বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করে নিজেকে আনন্দিত করতে পেরেছিলাম। আমি জানতাম যে, আমি শূন্যহাতে প্রবেশ করেছি, সুতরাং ঐশ্বর্যকে গ্রহণ করার সুযোগ এবং সুবিধা আমার আছে। সেই সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করে আমি বঞ্চনার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলাম। জীবন তো লৌকিকতার নয়, জীবন হচ্ছে শিক্ষার এবং আগ্রহের। পরিপূর্ণ হৃদয় দিয়ে যদি কোনো প্রার্থনা করা যায় তবে ফললাভ অকিঞ্চিতকর হয় না। আমার জীবনে তার প্রমাণ পেয়েছি।

রেডিও জীবনে যারা আমাকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিলেন তাদের আনন্দ আমাকে চিরদিন প্রেরণা এবং উপলব্ধির উপঢৌকন দিয়েছে। এদের কারো কারো নাম আমি আগেই বলেছি কিন্তু আরো অনেকে ছিলেন যাদের সকলের কথা বলা হলো না। একজন গল্প লেখকের কথা মনে পড়েছে। তার নাম ফজলুল হক। অত্যন্ত দক্ষ গল্পশিল্পী ছিলেন। রেডিওর চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন, নির্বাচিতও হয়েছিলেন কিন্তু নিয়োগপত্র আসতে বহু বিলম্ব হওয়ায় একদিন হতাশাগ্রস্ত হয়ে ট্রেনের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! যে দিন তিনি আত্মহত্যা করেন, সে দিনই করাচী থেকে তার নিয়োগপত্র আসে। ফজলুল হক ছিলেন শামসুদ্দীন আবুল কালামের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শামসুদ্দীন তাকে যতই ধৈর্য ধরতে বলেছেন সে কিন্তু ধৈর্য ধরতে পারত না, সে

www.pathagar.com

ভেবেছিল আমরা তাকে প্রবোধ দিচ্ছি মাত্র। ফজলুল হকের মৃত্যুর পর অনেক দিন ভেবেছি, মানুষ তো নিজের শক্তিতেই বড় হয় এবং সে শক্তি হচ্ছে দুঃখ সহ্য করার অপরিসীম শক্তি। বয়স কম ছিল এবং ফজলুল হকের পারিবারিক জীবনে হয়ত অবিবেচনাও ছিল। এ সমস্ত কারণে সে হারিয়ে গেল।

ফজলুল হকের নিয়োগপত্র এসেছিল অনেক পরে। একই সময়ে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের তিনজন প্রার্থীর এবং পূর্ব পাকিস্তানের একজন প্রার্থীর। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রার্থীদের নিয়োগপ্রাপ্ত নিয়োগপত্র দেয়া হয়েছিল যখন তখন ফজলুল হক নিয়োগপত্র পায় নি। তার নিয়োগপত্র এল আরও তিন মাস পর। পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়োগ পত্রের খবর ফজলুল হক যখন পেল, তখন সে স্বাভাবিক ধরে নিয়েছিল যে তার নিযুক্তি ঘটবে না এবং হতাশাগ্রস্ত হয়ে সে আত্মহত্যা করে। দেখা গেল চাকরির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন বৃত্ত আপন আপন ঘূর্ণনের মধ্যেই লিপ্ত থাকে। একই ঘূর্ণনে সব বৃত্তই সচল থাকে না।

এ সময়কার একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একজন প্রবীণ অর্থনীতিবিদ ঢাকায় এসেছিলেন ঃ লোকটির নাম আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না। এর কারণ বোধ হয় লোকটিকে আমার আদপেই পছন্দ হয়নি। শ্যামলা রং, বলিষ্ঠ লম্বাটে চেহারা, কথাবার্তায় চরমতম বাক্য উচ্চারণ করতেন। ভদ্রলোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানের অর্থনীতির বিষয়ে বক্তৃতা করছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে পাকিস্তানের অর্থনীতি বিশ্বের অর্থনীতির ইতিহাসে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করবে। উভয় অঞ্চলের ভৌগোলিক ব্যবধান সত্ত্বেও একক অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে উভয় অঞ্চলকে গড়ে তোলা হবে।

বক্তৃতার শেষে আলোচনা পর্বে একজন অধ্যাপক প্রশ্ন করেছিলেন, ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের অর্থনীতির কাঠামো ভিন্ন, ব্যাংকিং ব্যবস্থাও ভিন্ন। আমাদের সে রকম হতে অসুবিধা কি? উত্তরে ভদ্রলোক টেবিলে একটি প্রচণ্ড ঘুষি দিয়ে বলে উঠলেন, 'আমরা পৃথিবীতে একটি নজির স্থাপন করতে চাই। আমরা পৃথিবীর লোককে দেখাতে চাই যে আমরা একটি বিস্ময়কর ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা এক, সামাজিক ব্যবস্থাপনা এক, অর্থনৈতিক এক, আমরা কোনোরূপ বিরোধী সত্তাকে লালন করব না।' ভদ্রলোক চলে গেলে পর ডঃ মাজহারুল হক মন্তব্য করেছিলেন 'ঘুষি দিয়ে ভাঙা যায়, মিলানো যায় না। ভদ্রলোক আলোচনার একটি পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আইয়ারকেও অপমান করেছিলেন। আমার কাছে এখনও অবাক লাগে পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানীদের মুখোমুখি হয়েছিল বিশেষ ধরনের ঔদ্ধত্যে। তাদের মধ্যে সহনশীলতা ছিল না। এভাবে সহনশীলতার অভাবের জন্য একদিন যে পাকিস্তানই ভেঙ্গে যাবে সে সময় কেউ তা ধারণাই করতে পারে নি। ভদ্রলোককে আর একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল, সেটারও কোনও উত্তর তিনি দেন নি। প্রশ্নটি ছিল এ রকম– 'পূর্ব পাকিস্তানের উৎপন্ন দ্রব্যের দাম পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়েও বেশী এ অদ্ভুত বৈষম্যের কারণ কি?' তখন সম্ভবত কর্ণফুলি পেপার মিল স্থাপিত হয়েছে। কর্ণফুলির কাগজ বস্তাবন্দী হয়ে প্রথমে করাচী যেত, পরে সেখান থেকে ঢাকায় আসতো।

www.pathagar.com

এর ফলে ঢাকায় কাগজের দাম বেশি ছিল করাচীর চেয়ে। ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে উত্তর করেছিলেন, 'আপনাদের প্রশ্নে প্রাদেশিকতার গন্ধ আছে। কিছু বৈষম্য যদি কোনও ক্ষেত্রে থেকেও থাকে সেগুলো নিশ্চয়ই সময়ে দূর হবে।'

১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে সম্ভবত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন সাহেব ঢাকায় ছিলেন। নাজিমুদ্দীন পুরানো ঢাকায় একটি বক্তৃতা করে রাষ্ট্রপতির প্রশ্নে আবার সংঘাতের সূত্রপাত করলেন। জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতার প্রতিবাদ উঠেছিল তার পরে এ বিষয়ে আর কোন বিতর্কও উত্থাপিত হবে এই সবার ধারণা ছিল। তবে ক্রমাগত উভয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে বাংলাদেশের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। একটি প্রতিবাদের আবহ সর্বত্র বিরাট হয়েছিল। কিন্তু উভয় দলের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধের সম্ভাবনা আমরা দেখি নি। কিন্তু নিজামুদ্দীন সাহেব এসে এ বিরোধটা নতুন করে সৃষ্টি করে চলে গেলেন। রেডিওর জয়নুল আবেদীন আমাকে অনুরোধ করলেন প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ পরীক্ষা করে দিতে।

যে দিন বক্তৃতা হবে সেদিন সকাল এগারটায় আমি গভর্নর হাউজে গেলাম। ইংরেজি বক্তৃতার পাতা নিয়ে একে একে আসছিল। এ আসার মধ্যে উন্নয়নের কথাবার্তা ছিল বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চীফ সেক্রেটারী হাফিজ আহমদের কাছে যাচ্ছিল, সেটা দেখে গভর্নর হাউজে তার দফতরের অনুবাদ সেলের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। সেখানে তিন অনুবাদক উপস্থিত ছিলেন। সে অনুবাদ করে আবেদীনের নিকট দিচ্ছিলেন এবং আবেদীনের কাছ থেকে আমি দেখছিলাম। এভাবেই অনুবাদকর্ম এগোচ্ছিল। গতানুগতিক বক্তব্য, উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু ছিল না এমন সময় প্রায় একটা দেড়টার দিকে স্ক্রিপ্ট কয়টি এল সেগুলো আবেদীন সাহেব পড়ে চমকে উঠলেন। তিনি আমাকে কাছে ডেকে ইংরেজি পাতাগুলো দেখলেন। সেখানে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আবেদীন বললেন, প্রধানমন্ত্রী জানেন না তিনি কি বক্তৃতা করতে যাচ্ছেন। এদিকে আজিজ আহমদ সর্বনাশের কথাগুলো প্রধানমন্ত্রীর মুখে গুঁজে দিচ্ছেন। আবেদীন চিন্তিত হয়ে কিছু একটা ভাবলেন। পরে আমাকে বললেন, 'আমার মনে হয় আপনি এ অনুবাদের সঙ্গে জড়িত নাইবা থাকলেন। আমি দেখি কিছু করা যায় কিনা!' কিন্তু আবেদীন কিছু করতে পারে নি। প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা করেছিলেন এবং তাঁর বক্তৃতার ফলে সারা দেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল। যার ফলস্বরূপ একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা ঘটে। আমি গভর্নর হাউজ থেকে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে চলে এসেছিলাম। সেখানে রাজ্জাক সাহেব ছিলেন এবং মরহুম মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী ছিলেন।

এর পরের ঘটনা ক্রমশঃ প্রতিরোধের অঙ্গীকারে পরিণত হয়। সেই ইতিহাস সবাই জানেন। আমি শুধু সেই ইতিহাসের যে অংশটুকু সাক্ষী সে সম্পর্কে কিছু বলব। ঢাকা আর্ট গ্রুপের কথা পূর্বেই বলেছি। আর্ট গ্রুপের দ্বিতীয় বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনী ২৬শে ফেব্রুয়ারিতে হবে এরকম কথা ছিল। নিমতলীর কাছে পুরনো ঢাকা যাদুঘরের প্রকোষ্ঠে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমরা বাইরের আলো পুরোপুরি বন্ধ করে ভিতরে আলোর ব্যবস্থা করেছিলাম। ঠিক হয়েছিল গভর্নর ফিরোজ খান নুন প্রদর্শনী উদ্বোধন

www.pathagar.com

করবেন। লেডী নুন নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেছিলেন। আয়োজন যখন চলছিল তখন প্রায় প্রতিদিন আমরা কয়েকজন সকাল-বিকাল যাদুঘর প্রাঙ্গণে আড্ডা দিতাম। আমরা অর্থাৎ আমি, কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক, শফিউদ্দীন, আমিনুল ইসলাম। তাছাড়া আর্ট স্কুলের ছাত্রদের মধ্য থেকেও কেউ কেউ আসতো। একুশে ফেব্রুয়ারির দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের হরতাল ছিল। সুতরাং ক্লাশ হবে না জানতাম। লাইব্রেরী খোলা ছিল আমি সকাল ন টায় লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম।

সেখান থেকে দশটা সাড়ে দশটার দিকে বেরিয়ে যাদুঘরের দিকে গেলাম। লাইব্রেরী থেকে বেরিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বটগাছের নিচে ছাত্রজটলা দেখলাম। ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্ররা মিছিল করে আসছে। ভিড়ের মধ্যে আমি গাজীউল হককে দেখলাম। গাজীউল হক ছাত্র হিসাবে আমার পরিচিত ছিল। উপাচার্য সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসাইন সেখানে উপস্থিত রয়েছেন দেখলাম। আমি ওখানে অপেক্ষা না করে সরাসরি যাদুঘরে চলে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে পুলিশ পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করছিল। যাদুঘরে বসে আমরা চিন্তা করছিলাম যে ২৬ তারিখের অনুষ্ঠানটি নির্বিঘ্নে হতে পারবে কিনা। ইতোমধ্যে পুরস্কারের জন্য ছবি নির্বাচনের কাজও শেষ হয়ে গেছে। নির্বাচন কমিটিতে বেগম নুন ছিলেন। যাই হোক আমরা গল্প গুজব করছি এমন সময় সাইকেল নিয়ে মুনীর চৌধুরী খবর দিয়ে গেল যে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গুলি চলেছে এবং বেশকিছু হতাহত হয়েছে। আমরা তখনই প্রদর্শনীর তারিখ পিছানোর সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমি, কামরুল হাসান এবং অজিতগুহ গভর্নর হাউজের গেইটের বাইরে যে পুলিশ প্রহরীর ঘর ছিল সেখান থেকে মিলিটারী সেক্রেটারীকে টেলিফোন করলাম; টেলিফোনে ইংরেজ মিলিটারী সেক্রেটারীকে জানালাম যে ২৬ তারিখে প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে না। নতুন তারিখ পরে জানানো হবে। গভর্নর সাহেবকে তিনি যেন এই মর্মে অবহিত করেন। সেখান থেকে আমি অজিতবাবু এবং কামরুল হাসান পায়ে হেঁটে ওয়ারীতে অজিতবাবুর বাসায় গেলাম। সেদিন বিকেল বেলা ফজলুল হক হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল। উক্ত সভায় শিক্ষক সমিতির সভাপতি হিসেবে ডঃ জুবেরী সভাপতিত্ব করেন। আমরা চাইনি যে জুবেরী সাহেব আসুন তাকে খবরও দেওয়া হয় নি। কিন্তু তিনি কোনো সূত্রে খবর পেয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন মোজাফফর আহমদ চৌধুরী বক্তৃতা করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনে নিহত ছাত্রদের পক্ষে একান্ত আন্তরিক এবং সর্বস্ব সমর্পিত উচ্চারণ মোজাফফর আহমদের কণ্ঠে সেদিন আমি শুনেছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সভায় তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিবাদের ভাষা এখনও আমার কানে বাজছে। তিনি যেন তার সকল অস্তিত্ব দিয়ে একটি চরম যন্ত্রণায় নিপীড়িত হয়ে একটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আর্তরোল নয় বরঞ্চ অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে সুস্পষ্ট বাক্য রেখেছিলেন। জীবনে দেখি যে মানুষ সমস্যা এড়াতে চায়, শব্দ ব্যবহারের কৌশলে মুহূর্তের উৎক্ষেপকে সংযত করে এবং অবশেষে ঘটনার প্রবাহ থেকে নিজেকে সম্মানের সঙ্গে সরিয়ে নেয়। এ স্বভাব চিরাচরিত এবং প্রাত্যহিক। কিন্তু মুজাফফর আহমদ সাহেব এর বিপরীত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ অধ্যাপক। শিক্ষাকর্মের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল সর্বক্ষণের। কোনও আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন

www.pathagar.com

না কিন্তু এমনি মমতার দাবীতে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি নিষ্ঠুরতার প্রতিকার চেয়েছিলেন। সরকারি শাসনের নির্বুদ্ধিতা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখার কথা বলেছিলেন, সমাধান চেয়েছিলেন সকল সমস্যার। আমি এতদিন পর তাঁর বক্তব্যকে যথাযথভাবে হয়তো উপস্থাপিত করতে পারছি না, কিন্তু সুনিশ্চয়তার সঙ্গে একটি কথা বলতে পারি যে তাঁর বলার ভঙ্গীর মধ্যে আমি তাঁর মর্মযাতনাকে চাক্ষুষ করেছিলাম। এ ঘটনার ফলে তিনি কারারুদ্ধ হন।

এই সূত্রে আমি মুজাফফর আহমদ সম্বন্ধে আমার নিজস্ব মতামত এখানে লিপিবদ্ধ করতে চাই। আমরা একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম যদিও একই বিষয়ের নয়। তবুও পরিচয় ছিল এবং তার বাল্য নাচনভঙ্গী, দ্রুততা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাহীনতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ছাত্রজীবনে কর্মের দায়ভাগ থাকে না এবং সংসার জীবনের দায়িত্বগত কোনো সচলতা থাকে না। কিন্তু মুজাফফর আহমদ চৌধুরীর মধ্যে আমি একটি প্রচণ্ড দায়িত্বজ্ঞান লক্ষ্য করেছি এবং আদর্শগত একনিষ্ঠতার প্রকাশ দেখেছি। আমাদের অসম্পূর্ণ জীবনে জীবিত মুহূর্তে আমাদের যে গতিবিধি, তার যে সম্মুখবর্তিতা ছাত্রজীবনেই মুজাফফর আহমদের মধ্যে তার একটি নিরঙ্কুশ সম্ভাবনা সতীর্থগণ আবিষ্কার করেছিলেন। এই সম্মুখগামিতার দ্রুততায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যেন তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের বৃত্তায়ন সম্পূর্ণ করে জীবন থেকে অন্তর্ধান করলেন। এখন তাঁর মতো আর কাউকে আশপাশে দেখছি না– যিনি সিদ্ধির জন্য নয়, কিন্তু শুধুমাত্র কর্মসিদ্ধির জন্য সদাব্যস্ত এবং সদাচঞ্চল।

কর্মজীবনের সূত্রপাতেও আমরা একই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন ছাত্রদের কল্যাণকামী যথার্থ সুহৃদ হিসাবে। ছাত্ররা তাঁকে তাদের একান্ত আপনজন মনে করতো আবার সমীহও করত। জ্ঞানের অনুশীলনে স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রদের সঙ্গে একটি ব্যবধান ছিল যাকে বলা যায় সম্মানজনক সম্ভ্রান্ত দূরত্ব আবার সেই জ্ঞানকে ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করবার চেষ্টায় তিনি তাদের নিকটতম বন্ধু ছিলেন। শিক্ষক জীবনে তাঁর সার্থকতা এখানেই।

॥৮॥

পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয় ১৯৫৪ সালে যখন আমি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করি। ১৯৫৩ সালের শেষে প্রথমবারের মতো বিমানে চড়ে করাচী গিয়েছিলাম ইন্টারভিউ দিতে। তখন করাচীর সঙ্গে সরাসরি বিমান যোগাযোগ ছিল না। ঢাকা থেকে কোলকাতা গিয়েছিলাম ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের একটি ছোট বিমানে করে। সেখানে ৪/৫ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর এয়ার ফ্রান্সের একটি আন্তর্জাতিক রুটে করাচী পৌঁছেছিলাম রাত ৩টায়। আমার সঙ্গে ছিলেন মরহুম প্রফেসর আবদুল হাই। করাচী বিমানবন্দরে এয়ার ফ্রান্সের হোটেলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে প্রাতরাশ সেরে আবদুল হক ফরিদীর বাসায় উঠেছিলাম। আবদুল হক ফরিদী তখন করাচী সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডের সেক্রেটারী। যে কয়দিন করাচী ছিলাম সে কয়দিন ফরিদী সাহেবের আপ্যায়নে এবং ভদ্র আনুষ্ঠানিকতায় সময় সুন্দরভাবে কেটেছিল। তিনি

www.pathagar.com

করাচীর বিভিন্ন জায়গা ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। ক্লিফটনে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখেছিলাম। আমার জীবনে এই দ্বিতীয়বার সমুদ্র দেখা। বিশাল এবং অবর্ণনীয় সমুদ্রের স্বাদ মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে কিন্তু শব্দে তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমি অভিভূত বিস্ময়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিলাম। আমার কবিতায় সমুদ্রের উপমা এসেছে বহুবার। সমুদ্রের বিশালতা, অতলস্পর্শী কল্লোল একটি বিমুগ্ধতা নির্মাণ করে।

এই বিমুগ্ধতাকে শব্দে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিশেষ করে সমুদ্রের তটপ্রান্তে সমুদ্রের যে বিক্ষুব্ধ রূপ তা ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। বারবার তটপ্রান্তে সমুদ্র আঘাত করছে। জলস্রোত বহুদূর পর্যন্ত তটরেখা ছুঁয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে এবং একটি শব্দ কেমন একটি হুংকারে সামনের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। সমুদ্র এর পরে আরও অনেকবার দেখেছি কিন্তু করাচীর সমুদ্র দেখাটি আমার বহু দিন মনে থাকবে। বাংলা কবিতায় সমুদ্র খুব ব্যাপকভাবে আসে নি। মধ্যযুগের কবিতায় সমুদ্রের বর্ণনা আলাওলের পদ্মাবতীতে পাই। কিন্তু পদ্মাবতীতে সমুদ্র একটি সীমাবদ্ধ প্রকোষ্ঠের মতো। যার তলদেশ স্পর্শ করা যায় এবং যেখানে একটি অনিন্দ্যসুন্দর রাজ্য।

একমাত্র মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথমবারের মতো সমুদ্রকে সম্ভাষণ করেছিলেন তাঁর 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে। মধুসূদনের কাব্যে সমুদ্রের উদ্দামতা আবার একই সঙ্গে প্রশান্তির সংবাদ আছে। সেখানে সমুদ্রের বিশালতার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমুদ্র তেমনভাবে আসেনি অবশ্য সমুদ্র সম্পর্কে তাঁর কিছু কবিতা আছে এটা ঠিক। জাপানী কবিতায় সমুদ্র এবং পাথর বারবার এসেছে। জাপানীরা সমুদ্রবেষ্টিত হয়ে বাস করে এবং সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে নানা রকমের নুড়ি খুঁজে পায়। তাই তাদের কবিতায় সমুদ্র এবং পাথর একবার ভয়ানকের স্বাদ নিয়ে আসে আর একবার আশ্বাসের আমন্ত্রণ আনে। আমি আমার কবিতায় সমুদ্রকে একটি অতলস্পর্শী গভীরতার উপপ্লব হিসাবে দেখেছি। প্রস্তর এসেছে আমার কবিতায় সময়ের গতিধারা হিসাবে। পাথর একে একে গড়িয়ে যাচ্ছে– যেন সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। করাচীতে সমুদ্র যখন প্রথম দেখলাম তখন সেই সমুদ্র আমাকে দীর্ঘকালের জন্য আকর্ষণ করেছিল। করাচীতে দীর্ঘকালের জন্য যখন বাস করতে এলাম, তখন সপ্তাহান্তে সমুদ্রের তীরে আমি আসতাম।

করাচীতেই প্রথম বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আমার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বিশ্ব সাহিত্য সংস্থা আন্তর্জাতিক 'পিইএন'-এর সঙ্গে পরিচিত হই। ১৯৫২ সালে 'পিইএন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন ঢাকায় তার একটি শাখা স্থাপিত হয়েছিল। আমি সেই শাখার সম্পাদক ছিলাম; উক্ত শাখায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে সভাপতি করা হয়েছিল। পাকিস্তানের মূল অংশটি ছিল করাচীতে। জালালউদ্দীন আহমদ নামক একজন প্রচার বিভাগের কর্মকর্তা 'পিইএন'-এর সেক্রেটারী ছিলেন। প্রতিষ্ঠার পর যে'কটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পাকিস্তান যোগ দিয়েছিল, ঢাকায় বসে আমরা তার সংবাদ পাই নি। সেবার করাচী এসে জালালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম যে ভবিষ্যতে 'পিইএন'-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। ডাবলিনে একটি সম্মেলন হয়েছিল, সেখানে সম্ভবত যোগ দিয়েছিলেন মিঃ এস এম ইকরাম এবং তাঁর সঙ্গে কিছু সরকারি কর্মচারী। 'পিইএন' তখন সরকারি প্রচার দপ্তরের কুক্ষিগত হয়েছিল।

www.pathagar.com

করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারভিউতে আমিই নির্বাচিত হলাম। নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলাম তিনজন। আমি, মরহুম আবদুল হাই এবং ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ। কি কারণে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম জানি না। তবে সম্ভবত আমার ইংরেজি পাঠক্রমের পশ্চাদভূমি আমার নির্বাচনের জন্য সহায়ক হয়েছিল।। করাচী বিশ্ববিদ্যালয় তখন শহরের মাঝখানে কয়েকটি ভাড়াটে বাড়িতে অবস্থিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন তখনও স্থাপিত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়টি ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্থাপিত হয়। নামে ফেডারেল হলেও কার্যত ফেডারেল ছিল এটা বলা কঠিন। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী অধ্যাপক ছিলেন দুজন কি তিনজন। বিভাগীয় প্রধান একজনও ছিলেন না। আমিই প্রথম বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগদান করি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সমস্ত সরকারি কর্মচারী করাচীতে চাকরি পেয়েছিলেন, তারা একটি বিশেষ ভাতা পেতেন। যাকে 'স্থানচ্যুতি ভাতা' বলা হত। তাছাড়া তারা কয়েক বছর পর অর্থাৎ একটি নির্দিষ্টকালের পরে দেশে আসবার খরচ পেতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালীদের জন্য এই ভাতা এবং খরচের ব্যবস্থা ছিল না। একটু পরের কথা বলি। একবার আমরা এই ভাতার জন্য দাবী জানাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিহারী শিক্ষকগণ সকলেই নিজেদের বাঙ্গালী বলে ঘোষণা দেন এবং ভাতা দাবী করেন এবং যার ফলে শেষ পর্যন্ত এই ভাতাটি দেওয়াই হয় নি। যাই হোক, এ সম্পর্কে কিংবা এই ধরনের ঘটনা সম্পর্কে পরে আমি আলোচনা করব।

আমি করাচীর চাকরিতে যোগ দিলাম সম্ভবত জুলাই ১৯৫৪ সালে। বাংলা বিভাগে তখন মুস্তফা নুরউল ইসলাম কার্যরত ছিল। আমি একটি ছোট হোটেলে গিয়ে উঠেছিলাম। হোটেলটি একেবারে রাস্তার পাশে। আমি রাস্তার পাশে দোতলার একটি ঘরে ছিলাম। সেখান থেকে রাস্তার নানারকম শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বিশেষ করে ফল বিক্রেতারা ফলের গুণগান করছিল। আমি ঘরে বসে শুনছিলাম আট আনা সের আঙ্গুরের কথা এবং বারো আনা সের আনারের কথা। একবার নিচে নেমে এসে কিছু আঙ্গুরও কিনেছিলাম। ঢাকা থেকে যখন আসি তখন মওলানা আবদুর রহমান বেখুদ কিছু পান আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন মওলানা এহতেশামুল হক থানবীকে দেওয়ার জন্য। থানবী সাহেব সে সময় পাকিস্তানে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। আলেম হিসাবে তাঁর একটি সম্মান ছিল এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও তাঁর একটি বক্তব্য ছিল। তাঁর মামা মওলানা জাফর আহমদ ওসমানীকে আমরা খুব ভালোভাবে চিনতাম। জাফর আহমদ ওসমানী ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় মোদাররেস ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি ক্লাস নিতেন। হাদীসের ব্যাখ্যাকার হিসাবে তিনি খুব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'হাদীসের কথাগুলো শুনে সেগুলো পালন করার চাইতে রসূলে খোদা যেভাবে জীবনযাপন করেছেন, সেই রীতি অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য। হাদীস তো তাঁরই কার্যক্রম, তাঁরই আচরণ এবং তাঁরই বিশ্বাসের প্রকাশ। সুতরাং এই আচরণ, বিশ্বাস এবং কার্যক্রম তাঁর জীবনে কিভাবে প্রকাশ পেয়েছিল সেগুলো যতক্ষণ না আমরা অনুভব করতে পারবো, ততক্ষণ হাদীসকে অনুসরণ করতে পারব না। হাদীসকে অনুসরণের জন্য রসূলের জীবন পরিচ্ছন্নভাবে আমাদের দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত থাকা উচিত।'

মওলানা এহতেশামুল হক রাজনীতিতে বেশি জড়িয়েছিলেন তাই তাঁকে ঠিক ধর্মীয় নেতা বলা চলে না। তবে সকল বিষয়ে তাঁর একটি বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি ছিল। যেদিন আমি

www.pathagar.com

করাচী পৌঁছলাম সেদিনই সন্ধ্যায় মুস্তাফা নূরউল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে জেকবলাইন্সে মাওলানা সাহেবের বাসায় গেলাম। মাগরেবের নামাজের পর তিনি তাঁর হুজরায় বসে লোকদের সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন। আমাদের পরিচয় পেয়ে আমাদের খুব খাতির করলেন। আমাকে তাঁর ওখানে থাকতে বললেন। থাকতে বললেন কথাটি ঠিক বলা হল না। তিনি নিজে আমার সঙ্গে হোটেলে গিয়ে আমার সামান নিয়ে আসবেন, এমন অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। আমি শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুরোধে রাজী হলাম।

আমার রাজী হওয়ার একটি বিশেষ কারণও ছিল। এ অঞ্চলের মানুষ কি খায়, কিভাবে চলাফেরা করে এগুলো জানার আমার আগ্রহ ছিল। সুতরাং একজনের বাসগৃহে থেকে এটা আমার সুবিধা হবে ভেবে, আমি মাওলানা সাহেবের ওখানে থাকতে রাজী হয়েছিলাম। এক মাস আমি মাওলানা সাহেবের ওখানে ছিলাম। পরে নাজিমাবাদে একটি বাসা ভাড়া নিয়ে চলে যাই। সে বাসাটিও মওলানা সাহেব আমাকে খুঁজে দেন। এখানে এক মাস থেকে আমার ধারণা হয়েছে যে, বাঙ্গালীদের সঙ্গে এদের খাদ্যস্বভাবের মিল নেই, আচরণ বিধির মিল নেই এবং সাংস্কৃতিক আকর্ষণের মিল নেই। এরাও মানুষ, আমরাও মানুষ এবং একটি ধর্মীয় বন্ধনে আমরা একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু বিচিত্রকর্মসাধনের ক্ষেত্রভূমিতে এরা এবং আমরা অভিন্ন নই।

সামাজিক বিচার আনন্দের উপঢৌকন, ইচ্ছা অনিচ্ছার বিচিত্র লীলা কোনদিক থেকেই এদের সঙ্গে আমাদের মিল হয় না। এখানে অবস্থানকালে আমার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা হচ্ছে সিন্ধু প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ। মওলানা সাহেবের সঙ্গে তাঁর গাড়িতে করে সিন্ধু নদী পার হয়ে হায়দরাবাদ শহর অতিক্রম করে টুন্ডু-আল্লাহইয়ার শহরে একবার গিয়েছিলাম। সে যাত্রার বর্ণনা আমার সিন্ধুর মরুমধ্যে কবিতাটিতে আছে। কবিতাটিতে যে বর্ণনা দিয়েছিলাম সে বর্ণনাটি আক্ষরিক অর্থে সত্য। গাড়ি দিয়ে চলার সময় দুদিকে দিগন্ত বিস্তৃত শূন্য নির্বিকার উদাসীন বালুভূমি দৃষ্টিতে পড়েছিল। আমার তখন মনে হয়েছিল এই ধুঁ ধুঁ বিস্তীর্ণ, ভূমি সব সময়ই নির্বিকার থাকে– সংকটে যেমন নির্বিকার থাকে, উচ্ছ্বাসেও তেমনি নির্বিকার থাকে, মৃত্যুতেও তেমনি নির্বিকার থাকে। আকাশকে উদাসীন মনে হয়, মেঘশূন্য আকাশ, মেঘশূন্য বলেই নীল। মাঝে মাঝে বাতাস প্রবাহিত হয়, তখন সমস্ত প্রান্তর যে জেগে ওঠে। বালুকা কণাগুলি উড়ে উড়ে কুয়াশার কুণ্ডলী তৈরি করে। কণ্টকে কঠিন সবুজ গুল্মগুলো বালুকায় ঢেকে যায়। যে মানুষের চক্ষু চিরকাল সবুজে লালিত সে মানুষ এখানে এমন এক বিশ্ব দেখে যে বিশ্ব বর্ণ-গন্ধহীন। গাড়ি করে চলতে চলতে সন্ধ্যা যখন হল, তখন লক্ষ্য করলাম যে, বালুর রঙের পরিবর্তন ঘটেছে। দুধ ঘন করলে যেমন এক ধরনের হালকা হলুদ রঙ হয়, বালুর মধ্যে তেমনি রঙ চোখে পড়ল। অকস্মাৎ সূর্যের তাপ ফুরিয়ে গেল। শীতল হাওয়ায় আমেজ লাগল গায়ে। রাত যখন হল, তখন চতুর্দিকে শুধু অন্ধকার চোখে পড়ল। কোথাও কোন কুটির নেই, কুটিরে কোন প্রদীপ নেই, কোথাও আশ্রয়ের আমন্ত্রণ নেই, অথচ আকাশে অজস্র তারা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। সে সময় ঢাকায় আমি বন্যা দেখে গিয়েছিলাম, সে কথা আমার মনে পড়েছিল। আমি কবিতায় লিখেছিলাম যে বাংলাদেশে যখন মাতার দুগ্ধের মতো অফুরন্ত পানির প্রবাহ, তখন আমি নির্জনে সিন্ধুর মরু মধ্যে রুক্ষ রিক্ত অবস্থার পথ পার হচ্ছি।

www.pathagar.com

সে সময় বারবার আমি বাংলাদেশে ফিরে আসতে চেয়েছি এবং ফিরে আসার অনুভূতিকে এ কথায় প্রকাশ করেছিলাম যে, স্বপ্নেও কোন এক মুহূর্তে বাংলাদেশের মানুষের স্পর্শ যদি পাই– তাহলে আমার বেদনার্ত রিক্ত প্রাণ আনন্দে নবীন হবে। সে সময় আর একটি কবিতা লিখেছিলাম 'বৈশাখ' নামে। কবিতাটি এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ 'প্রতিদিন তাপদগ্ধ মধ্যাহ্ন যেখানে/খররৌদ্র বঞ্চনার ইঙ্গিত ছড়ায়/রুক্ষতার হতাশ্বাসে নিষ্ঠুর মাটিতে/রেণু রেণু ধূলিগুলি কুয়াশা ছড়ায়/, অথবা নির্মম ভাগ্য অস্বীকার আনে/ রোমাঞ্চ, যৌবন আর সহানুভূতিতে–/ সে দেশে বৈশাখ কোথা ঋতুচক্র শেষে/ প্রত্যহ যেখানে জ্বালা বিভ্রান্ত অশেষে?

একদা বৈশাখ ছিল বসন্তের স্বপ্ন/ ক্ষান্ত বিদ্রোহ দিবসে, পরিবর্তনের/ সূত্রে যে বৈশাখ আনলো প্রলয়-ঝড়/ আর বজ্র-বহ্নি, নির্যাতনের আচ্ছন্ন/ প্রদোষে আনলো অধৈর্য মুক্তি। দিনের বিলাস শান্তিতে এলো প্রলয়ের ঝড়/।'

॥৯॥

করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন উপাচার্য ছিলেন প্রফেসর এ বি এ হালিম। অত্যন্ত সজ্জন বিনয়ী এবং নির্ভেজাল ভদ্রলোক। তাঁর কাছে আমার পরিচয় পেশ করলাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে এবং ভদ্রতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। সেখান থেকে যোগদানপত্র দিতে গেলাম ডেপুটি রেজিস্ট্রার নাজিমুদ্দিনের হাতে। নাজিমুদ্দিন আমার যোগদানপত্র ফাইলজাত করে আমাকে বললেন, "আপনি ভাল দিনেই এসেছেন। আজ একাডেমিক কাউন্সিলের অধিবেশন আছে। আপনি এখান থেকে সরাসরি মিটিং-এ চলে যান। মিটিং-এ আর কিছু করতে না পারেন ভাইস চ্যান্সেলরের পক্ষে হাত তো তুলতে পারবেন।" তার এই কথায় বিরক্ত হলাম, ক্রুদ্ধও হলাম। আমি একটু রাগত স্বরেই বললাম, "আপনার এ কথার অর্থ কি?" ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে সুর পালটে ফেললেন এবং ঘোলাটে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি আপনাকে একাডেমিক কাউন্সিলে যেতে বলছিলাম।" একাডেমিক কাউন্সিলেও একটি নাটক অভিনয় হয়েছিল। সভার শুরুতে প্রথাগতভাবে উপাচার্য আমাকে স্বাগত জানালেন ইংরেজিতে। আমিও ধন্যবাদ প্রদান করলাম ইংরেজিতে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত আলোচনা উর্দুতে হতে লাগল। এবং সে এমন উর্দু যা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভবপর হচ্ছিল না। এক পর্যায়ে আমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করা হলে আমি উঠে দাঁড়িয়ে সরল বাংলায় বললাম, "আপনারা এতক্ষণ কি বললেন আমি কিছুই বুঝিনি।" ডক্টর মাহমুদ হোসেন হেসে উঠে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে বললেন, "এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা যা বলছিলেন তা আলী আহসান কিছুই বোঝেনি, আপনাদের উচিত ছিল এমন ভাষায় কথা বলা যা পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মানুষের কথা চিন্তায় রেখে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যবিধি পরিচালিত হওয়া দরকার। ভবিষ্যতে এদিকে খেয়াল রাখলে ভাল হবে।" এর পর থেকে কার্যাবধি ইংরেজিতেই চলতে লাগল এবং আমি যতদিন করাচীতে ছিলাম ইংরেজি এবং উর্দু উভয় ভাষাই একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটে ব্যবহৃত হত। একাডেমিক কাউন্সিলে সিন্ধু মুসলিম কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফার সঙ্গে পরিচয় হল। ভদ্রলোক সিন্ধী।

www.pathagar.com

এ পরিচয় পরে সখ্যায় পরিণত হয়েছিল। তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন, "বাঙ্গালীদের যেমন নিজস্ব একটি সংস্কৃতি আছে, সিন্ধীদেরও তেমনি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। আমাদের নৃত্যগীত আছে যা একান্তভাবে আমাদের। আমাদের ভাষাও উর্দু ভাষার কাছাকাছি নয়। আমাদের মানুষের ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষাগুলো আমাদের অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই উচ্চারিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা খাঁটি মুসলমান। আমাদের কবি শাহ্ আবদুল লতিফ একজন মহৎ সুফি সাধক ছিলেন। তাঁর তুল্য সাধক এবং কবি এ উপমহাদেশে দ্বিতীয় নেই।" গোলাম মোস্তফাকে একাডেমিক কাউন্সিলে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ হিসাবেই দেখেছি। তিনি সিন্ধীদের স্বপক্ষে এবং সিন্ধী ভাষা ও সাহিত্যের স্বপক্ষে খুবই জোরালো বক্তব্য রাখতেন। করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ কর্মচারী এবং শিক্ষক ছিলেন বিহারের। এরা আমাদের প্রতি এবং সিন্ধীদের প্রতি কেমন একটি অবজ্ঞার ভঙ্গিতে কথা বলতেন। অথচ এই অবজ্ঞা করবার অধিকার তাদের ছিল না। করাচীতে যদ্দিন ছিলাম একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি যে মোহাজির মুসলমানরা যারা ভারত থেকে পাকিস্তানে এসেছে, তারা নিজেদেরকে খুবই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বলে জ্ঞান করত। যেহেতু পাকিস্তানের ভূমির সঙ্গে তাদের সংযোগ ছিল না তাই একটু দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেদের প্রতিষ্ঠা ঘটাবার চেষ্টা করত। এই কারণেই তারা বাঙ্গালীদের অথবা সিন্ধীদের অবজ্ঞা করত। তারা ভাবত এই দুটি জাতি হিন্দু সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত।

মওলানা সাহেবের ওখানে থাকতে আমি সিন্ধু দেশের ভেতরে টুন্ডুআল্লাহইয়ারে গিয়েছিলাম সেকথা পূর্বেই বলেছি। সেখানে একটি বড় মাদ্রাসা ছিল। সেই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। সেখানে প্রচুর খাসি জবাই হয়েছিল। রান্না যখন হচ্ছে, তখন মওলানা সাহেবের একজন সঙ্গী আমাকে একটি পাত্রে কিছু গোসত দিয়ে চেখে দেখতে বললেন। পাত্রটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেন, "চেখে দেখুন এরকম জিনিস আর কখনও খাননি। একেবারে মাখখন।" আমি পাত্র হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে বললাম, 'আমাদের ওখানে ভাল রান্না হয় এবং সে রান্নাও উপাদেয়।" আমি ঘটনাটি উল্লেখ করলাম শুধু এটা বুঝাবার জন্য যে পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা প্রথম থেকেই বাঙ্গালীদের প্রতি একটি অবজ্ঞার ভাব পোষণ করত। নতুন মানুষকে জানবার আগ্রহ তাদের ছিল না। আপন বৃত্তের বাইরে তারা এক পা-ও রাখে নি। এর ফলে ক্রমশ বিরুদ্ধবাদিতা পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং সংক্ষুব্ধতা সৃষ্টি হয়।

মওলানা সাহেবের বাসায় থাকতেই আমার অনেক অভিজ্ঞতা জন্মে। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। এক দিল্লীওয়ালা ভদ্রলোক খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবকে খাওয়াবেন বলে মনস্থ করলেন। তিনি মওলানা সাহেবের কাছে এসে অনুরোধ জানালেন যেন মওলানা সাহেব তাকে নাজিমুদ্দিন সাহেবের বাসায় নিয়ে যান। নাজিমুদ্দিন সাহেব তখন হাউজিং সোসাইটিতে থাকতেন এবং অবসর জীবনযাপন করতেন। আমরা সেখানেই গেলাম। নাজিমুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি জানালেন যে, তার কাশি হয়েছে। তবে তিনি নাতীদের নিয়ে আনন্দেই আছেন। তিনি কথাটি উর্দুতে ব্যবহার করলেন এবং কাশির প্রতিশব্দ হিসাবে 'খাসি' কথাটি ব্যবহার করলেন। এক ফাঁকে নাজিমুদ্দিন সাহেব যখন বাড়ির ভেতরে গেলেন তখন মওলানা সাহেব দিল্লিওয়ালা ভদ্রলোককে বললেন, "নাজিমুদ্দিন সাহেব বাঙ্গালী তো, তাই খালেস উর্দু বলতে পারেন না।

www.pathagar.com

নোয়াসে'কে বলেন নাতী এবং 'জোখাম'কে বলেন খাসি। আমি একথা শুনে বললাম 'আপনাদের নোয়াসে এবং জোখাম কেউ বুঝতে পারবে না কিন্তু নাতী এবং খাসি এটা আমরা বুঝতে পারব।" করাচীতে থাকাকালীন বিভিন্ন জায়গায় উর্দুর দাপট এবং অত্যাচার লক্ষ্য করেছি। বাসের গায়ে লেখা থাকত 'আরায়েশে হেফাজতে জিসম ফরজে আউআলিন হায়','নাপিতের দোকানের নামকরণ করা হত 'আরায়েশে গেছু'। আরও অনেক উদাহরণ আমি দেখেছি। সেগুলো আলোচনা করে লাভ নেই। উর্দুকে সহজ করে সকলের বোধগম্য করে আনার কোন প্রয়াস ছিল না। বরঞ্চ দুর্বোধ্য এবং কঠিন করে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রয়াস ছিল। তাছাড়া বাঙ্গালীদের উচ্চারণকে তারা ব্যঙ্গ করত। একদিন মওলানা সাহেবের কাছে একজন শিক্ষিত পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় হতেই ভদ্রলোক বললেন, "কিছু মনে করবেন না, আমি একটি কথা বলতে চাই। আপনারা বাঙ্গালীরা নিজেদের নামও ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারেন না, এটা কি রকম? 'আবদুর রহমানকে বলেন 'আবদুল রহমান', 'নযর-উল-ইসলামকে বলেন নজরুল ইসলাম। আমি উত্তরে বললাম, "আপনারা যেমন 'ফুটবল'কে 'ফুটবাল' বলেন আমরাও তেমনি 'অ' ধ্বনিটা স্পষ্ট উচ্চারণ করি। আপনারা 'অ'-এর বদলে 'আ' বলেন, আমরা 'অটাকে খুব বেশি করে উচ্চারণ করি। উচ্চারণের হেরফেরেই এটা

॥১০॥

১৯৫৬ সালে আমি প্রথম বিদেশ যাই। তখনকার দিনে বিদেশে বিমানযাত্রা দীর্ঘ সময় নিত। মনে আছে আমি করাচী থেকে বৈরুত, বৈরুত থেকে কায়রো, কায়রো থেকে রোম এবং সব শেষে রোম থেকে লন্ডনে গিয়ে পৌঁছি। বিভিন্ন শহরে যাত্রা বিরতিই শুধু ছিল না বিমানের পরিবর্তন করতে হয়েছিল। কায়রোতে রাত্রি যাপন করেছিলাম এবং রোমে নতুন বিমানের জন্য প্রায় ছ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এখনকার দিনে আমরা খুবই দ্রুত এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পৌঁছে যাই কিন্তু সেকালে নতুন নতুন জায়গার মনোহর দৃশ্যাবলী যাত্রীকে অভিভূত করতো। লন্ডনে সেবার আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থকে খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিক এসেছিলেন।

আমি আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে বার্ষিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গিয়েছিলাম। আমার দৃষ্টিতে লন্ডন শহর অপূর্ব হয়ে দেখা দিয়েছিল। জুলাই মাসের আরম্ভ চতুর্দিকে -াদ, যেখানেই দৃষ্টি পড়ে উচ্ছ্বলিত সবুজের উপর রৌদ্র ঝলমল করছে। অবিরাম -হনের চলাচল, মানুষের অক্লান্ত পদযাত্রা এবং সমস্ত কিছু মিলিয়ে অফুরন্ত শব্দের সেবার আমার দৃষ্টিতে চতুর্দিকে বিস্ময়ের সাগর ছিল।

-নফারেন্সে পৃথিবীর বহু খ্যাতিমান ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছিল। বেডফোর্ড -সভাগুলো বসত। আমার সঙ্গে হুমায়ুন কবিরও ছিলেন। একদিন একটি সভাপতিত্ব করছিলেন। একজন ভারতীয় লেখক সম্ভবত গোকাক -য প্রবন্ধ পাঠ করছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল শ্রী অরবিন্দ একজন -র পটভূমিতে তিনি একজন মহৎ কবি। অথচ পাশ্চাত্য

www.pathagar.com

জগতে তাঁর কাব্যকর্ম নিয়ে কোন প্রকার আলোচনা নেই, কোন প্রকার জিজ্ঞাসা নেই। গোকাকের প্রবন্ধের উপর কেউ কোন মন্তব্য করেনি, সকলেই তার বক্তব্যকে ভারতীয় চরিত্রের স্বাভাবিক অতি ভাষণ হিসাবে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু সভাপতির ভাষণে ই এম ফরস্টার বলেছিলেন 'কবিতা কি করে কখন আবিষ্কৃত হয়, বলা কঠিন। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রজ্ঞায় এবং অনুভূতিতে কবিতার প্রকাশ ঘটে।

এভাবে প্রতিটি প্রকাশের একটি নিজস্ব স্বভাব এবং তাৎপর্য আছে। আমরা ইংলন্ডে বসে মনে করি আমরাই কবিতার এবং সাহিত্যের একমাত্র অধিকারী। অন্য দেশের লোকেরা ইংরেজী ভাষায় যখন লেখে তখন আমরা তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করি কিন্তু তাঁদের কবি স্বভাবের প্রতি সহানুভূতিশীল হই না। আমাদের কর্তব্য যথার্থ কবিতাকে নির্ণয় করা এবং এই নির্ণয় করার জন্য পৃথিবীর সকল দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করা।' তিনি আরো কি কি বলেছিলেন, আমার মনে নেই কিন্তু একথাগুলো ব্যতিক্রমী স্বভাবের বলেই আমার ভাল লেগেছিল। স্টিফেন স্পেন্ডারও কিছু মন্তব্য করেছিলেন, কিন্তু তা পুরোপুরি আমার মনে নেই। একজন যেন বলেছিলেন, 'ভারতীয়রা বড় গম্ভীর বড় তত্ত্বপ্রেমিক, জীবনকে তারা দর্শনের অভিধানে ব্যাখ্যা করতে চায়।'

সভার শেষে ফরস্টার মঞ্চ থেকে যখন নামছেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। বললাম, কলকাতায় তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৯৪৬ সালে তিনি যখন সেখানে গিয়েছিলেন। প্রফেসর আহমদ আলীর বাড়িতে ছিলেন। তিনি সব কথা স্মরণ করতে পারলেন না, কিন্তু আহমদ আলীর কথা জিজ্ঞেস করলেন। একটু মন্তব্য করলেন 'আহমদ আলী বেশ লিখত। তাঁর 'টুইলাইট ইন দিল্লী' বইটি আমার ভালো লেগেছিল।' তিনি আমার ঠিকানা নিলেন এবং তাঁর ওখানে আমাকে ডাকবেন বললেন। দুদিন পরে আমি তাঁর কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম কিংস কলেজে স্টৈয়ার কেইস-এ যদি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তবে তিনি খুশী হবেন।

কেমব্রিজের কিংস কলেজ একটি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সবচেয়ে অনবদ্য হচ্ছে, কিংস কলেজের মাঠের ঘাসের আস্তরণ। এত আশ্চর্য সবুজ, এত অনিবার্য সবুজ এত বিপুল তরঙ্গের মত সবুজ আমি আর কোথায়ও দেখি নি। সকাল বেলার সূর্যের আলোয় এই সবুজগুলো মমতার আশ্রয়ের মতো মনে হয়। আমরা প্রতিদিনের ব্যবহারের উপকরণ থেকে উপমা সংগ্রহ করি তাই হয়ত ঘাসকে ভেলভেটের গালিচার সঙ্গে তুলনা করি। কিন্তু সেদিন আমার মনে হয়েছিল, এ সমস্ত তুলনা দিয়ে কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করা যায় না। লনের ঘাসগুলো পরিশুদ্ধ এবং আনন্দময় ছিল।

ই এম ফরস্টারের কক্ষে যেতেই একটি আলোচনার গুঞ্জন কানে এল কয়েকজন লোক সেখানে এবং ফরস্টার তাঁর অনবদ্য বাচনভঙ্গীতে কবিতা সম্প করছিলেন। বলেছিলেন, 'মানুষ কি করে কখন যে কবিতাকে আবিষ্কার ক কেউ হয়তো নির্জনে সাধনা করছে এমন সময় কোন নিষ্ঠুর দৃশ্য তাকে করলো তখন তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া যেসব শব্দের সাহায্যে প্রক কবিতার রূপ ধারণ করল। হয়ত একটি অনিবার্য অভিব্যক্তি

www.pathagar.com

ভাস্বর হল। সে অভিব্যক্তি যেমন সংহত হবে, তেমনি প্রচণ্ড হবে যেমনি আকস্মিক হবে, তেমনি স্বাভাবিক হবে কিন্তু দ্বিধা তার মধ্যে থাকবে না, হতাশা থাকবে না–সুস্পষ্ট উচ্চারণের স্বাক্ষর নিয়ে তা একটা চিরকালীনতা বহন করবে। কথা বলেই ই এম ফরস্টার থামলেন। শান্ত বিনম্র পুরুষ, ইংরেজী সাহিত্যের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ফরস্টার। 'এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া' এবং 'হাউয়ার্ডস এন্ড' লিখে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর রচনার একটি বিশিষ্ট স্বাদ, বৃত্তিমত্তা এবং দক্ষতা অনুভব করা যায়, সর্বোপরি তার একটি ইনটিগ্রিটি বা সততা ছিল।

ফ্ল্যাটে আরও কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন–আকাদেমী ফ্রঁসের শঁসো, সিংহলের টিম্বোন টটু, ইংরেজ কবি রিচার্ড চার্চ ও ডেনী অ্যাকসে, কয়েকজন ভারতীয় লেখক এবং আরও অনেকে। বিনয়ের একটি বিচলিত ভঙ্গী আছে, ফরস্টারের সবাইকে অভ্যর্থনা করার মধ্যে তা লক্ষ্য করলাম। যে ঘরে আমরা বসেছিলাম সে ঘরে সর্বত্রই বই, দেয়াল আলমারিগুলো ছাদ পর্যন্ত ছুঁয়েছে, টেবিলে কার্পেটে সর্বত্রই বই–একটি গ্রন্থরাজির অরণ্য যেন। আমি প্রশংসার দৃষ্টিতে চতুর্দিকে তাকিয়ে কি একটি মন্তব্য যেন করেছিলাম। ফরস্টার উত্তরে বলেছিলেন এ বইগুলো আমার আবেগ এবং চিন্তা দ্বারা আচ্ছাদিত– ক্লোথড উইথ ম্যাই প্যাশন এন্ড থট। তিনি আরও বলেছিলেন এরা আমার লাভজনক সঙ্গী প্রফিট্যাবল কম্প্যানিওন্স। পিছনের দিকে তাকিয়ে আমার কোন দুঃখ নেই। আমার আনন্দই অত্যধিক, কেননা আমি গ্রন্থপাঠে অনেক কিছু জেনেছি যা জীবনের জন্য প্রয়োজন যা নিশ্চয়তা দেয় এবং যা অসাধারণ। এ কারণেই আমি মনে করি আমি মৃত্যুতে নিঃশেষ হব না। কথাগুলো কিন্তু বলেছিলেন তিনি অত্যন্ত নিম্নস্বরে কিন্তু সুস্পষ্ট বিশ্বাসে।

আমি কবিতা লিখি শুনে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'কবিতাকে তুমি কি করে আবিষ্কার করলে?' আমি বলেছিলাম, 'কবিতা তো একই সঙ্গে আবেগ এবং শিল্প। মানুষ হিসাবে আমার আবেগকে যদি নির্ণয় করতে পারি এবং শিল্পজ্ঞান যদি আমার থাকে তা হলে কবিতা তো স্বাভাবিকভাবেই নির্মিত হবে।'

ফরস্টার তখন বলেছিলেন, "মানুষ যে কি করে কখন কবিতাকে আবিষ্কার করে বলা কঠিন। সূর্যের বর্ণবিভাগও একজনকে কবি করে, প্রেমের ব্যঞ্জনাও একজনকে কবি করে, আবার মানুষের দুঃখকে অনুভব করেও একজন কবি হয়। তবে যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, একটি তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে না গিয়ে কারও পক্ষে যথার্থ কবি হওয়া সম্ভবপর হয় না।" আমি তখন বলেছিলাম, "কবি কালিদাস বলেছেন, কবিতা হচ্ছে শব্দ ও অর্থের নিত্য সংবদ্ধতায় ... ও অর্থের প্রতিপত্তি। তিনি আরও বলেছেন, বাক্যের দ্বার উন্মোচন করে আনন্দের ... প্রবেশ করা যায়। তিনি আজন্ম বিশুদ্ধতার কথা বলেছেন।"

...র বলেছিলেন, "কালিদাস ছিলেন একটি সমৃদ্ধকালের পরিতৃপ্ত কবি। তাই তাঁর ... বিশেষ অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা বলছি, বর্তমানকালের ...ব দৃষ্টিকোণ একটু ভিন্ন রকমের হবে।"

... একাডেমীর সদস্য ছিলেন। তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে কথা ... ও বিজ্ঞানী সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন। আমি লন্ডন

www.pathagar.com

থেকে প্যারিসে গিয়ে শাঁশোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাব পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাই। ফরস্টারের লেখা বইয়ের সংখ্যা খুব বেশি নয়। অল্প কয়েকটি বই তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে উঠিয়েছিল। সেবার আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে তার সময়কালের লেখকরা তাঁর প্রতি অসম্ভব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এর কারণ, সম্ভবত তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, মমতা এবং অন্তর্দৃষ্টি। পৃথিবীতে মানব জীবনে পাপ এবং পুণ্যের মধ্যে একটি বিপুল সংঘর্ষ আছে। এই সংঘর্ষটি ফরস্টারের অধিকাংশ উপন্যাসের উপজীব্য। ফরস্টারের মত মহিমময় পুরুষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি আমার লন্ডন যাত্রাকে যথার্থই সফল ভেবেছিলাম।

লন্ডনে পিইএন কনফারেন্সে আরও একজন লেখকের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁর নাম স্যার কম্পটন মেকেঞ্জী। শ্মশ্রুমন্ডিত গোলাকার চেহারা। প্রশস্ত ললাট, এমনিতেই লালচে মুখ কিন্তু নাসা খুব বেশি লাল। চোখ তীক্ষ্ণ কিন্তু কৌতুক মিশ্রিত। বেডফোর্ড কলেজের মাঠে যখন তখন ঢলঢলে কোটপরা ছিল, গলায় টাই ছিল না। মাঠের মধ্যে বিকেল তিনটের দিকে রোদের পিছনে ফিরে বসেছিলেন, হাতে একটি খবরের কাগজ। সম্ভবত 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান'। আমি এবং হুমায়ুন কবির কথা বলার জন্য এগিয়ে গেলাম। আগের দিন পরিচয় হয়েছিল সুতরাং সেই সূত্রে এভাবে হঠাৎ যেয়ে উপস্থিত হওয়াটা অন্যায় হবে না ভাবলাম। আমাদের দেখে চেয়ার থেকে উঠে ঘাসের ওপর বসে পড়লেন এবং আমাদেরও বসে পড়তে বললেন। জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগছে লন্ডন?' আমি উত্তর করলাম, 'আমার কাছে তো সবাই নতুন, কিন্তু ইনি, হুমায়ুন কবিরকে দেখিয়ে বললাম, এদেশেই পড়াশুনা করেছেন এবং এদেশের জীবন যাত্রার সঙ্গে পরিচিত।' কম্পটন মেকেঞ্জী হেসে বললেন, 'এখানে কিন্তু সবই খেলা, সাহিত্যও খেলা, প্রেমও খেলা এবং সেমিনার এবং কনফারেন্স হচ্ছে সবচেয়ে বড় খেলা।' আমি বললাম, আমরা এখানে এসেছি সাহিত্যের বিভিন্ন দিক আলোচনা করতে এবং জানতে।' মেকেঞ্জী বললেন, 'তোমরা এসেছ দেশ দেখতে, খুশি হতে এবং একটু যদি এদিক ওদিক জীবনের স্বাদ পাওয়া যায় সেই চেষ্টা করতে।' হুমায়ুন কবির হেসে ফেললেন, বললেন, 'আমরা ভারতীয়রা গভীর প্রজ্ঞায় বিশ্বাসী, লঘু স্পর্শে আমরা বিশ্বাস করি না।' মেকেঞ্জী প্রশ্ন করলেন 'অর্থাৎ হুমায়ূন কবির বললেন, 'আপনাদের প্রেম যেমন একটি শরীরী খেলা, আমাদের প্রেম কিন্তু তা নয়। আমাদের প্রেম হচ্ছে শরীরের সর্বপ্রকার চৈতন্যের অনুশীলন।' মেকেঞ্জী বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমাদের বাৎসায়নের নাম শুনেছি, পড়ি নি। কিন্তু টি এস এলিয়টের কাছে শুনেছি, বাৎসায়ন নাকি প্রেম কলাকে একটি অসাধারণ শিল্পকলায় মণ্ডিত করেছেন।' আরও অনেক কথা হল। কিন্তু আমার যদ্দুর মনে পড়ে, সাহিত্য নিয়ে কোন কথাই হয়নি। একবার এক পর্যায়ে যৌনবোধ এবং যৌন অভিজ্ঞতা আহরণের পদ্ধতি নিয়ে মেকেঞ্জী কিছু বলছিলেন মনে পড়ে। তিনি একটি বাক্য ব্যব করেছিলেন–ট্রাই ইট আউট। অর্থাৎ চেষ্টা করে দেখ। বিয়ের আগে যুবক যুবতী মিলনের অনুশীলন। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না কি করে দেহচর্চার ছাড়া বিবাহের প্রস্তুতি ঘটতে পারে।

১৯৫৬ সালে আন্তর্জাতিক পিইএন-এর ২৮তম কংগ্রেসে আমি কংগ্রেসের উদ্বোধন হয় ৯ই জুলাই রয়েল কলেজ অব সার্জনস আমি এবং হুমায়ূন কবির পাশাপাশি বসেছিলাম। আ

www.pathagar.com

কম্পটন মেকেঞ্জী বসেছিলেন। তখনও তার সঙ্গে পরিচয় হয় নি। উদ্বোধনের পরিচয়ের আসরে প্রথম পরিচয় হল। পরের দিন থেকে আলোচনাসভাগুলো অনুষ্ঠিত হয় বেডফোর্ড কলেজে। এখানেই লনের মধ্যে আমি এবং হুমায়ূন কবির তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলি। ১১ই জুলাই গিল্ড হলে একটি সংবর্ধনা ছিল এবং তার পরের দিন স্যাভয় হোটেলে আনুষ্ঠানিক নৈশভোজ ছিল। স্যাভয় হোটেলটি ইংল্যান্ডের একটি বহু পুরনো হোটেল। শুনলাম ওখানে নাকি চসার তার ক্যান্টারবারী টেলস লিখেছিলেন। কম্পটন মেকেঞ্জীকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেছিলেন, ইংল্যান্ডের লোকেরা সবকিছুতেই ইতিহাসের সাক্ষ্য খোঁজে। পুরনো কথা কে লিখে রেখেছে বলো? কিন্তু পুরনো কথা তো বানানো যায়, তাই না? আমি লক্ষ্য করলাম যে কম্পটন মেকেঞ্জী হাস্যকৌতুকের মধ্যে তাঁর সমস্ত বক্তব্য লঘু পরিবেশনায় উপস্থাপিত করেন। কৌতুকপ্রিয়তা ইংরেজদের এক স্বভাব। কম্পটন মেকেঞ্জীর মধ্যে তা একটু অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করেছি।

পিইএন কনফারেন্সে সে বছর অনেক উল্লেখযোগ্য লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল যেমন টি এস এলিয়ট, চার্লস মর্গান, ই এম ফরস্টার প্রমুখ। আরও অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এদের মধ্যে কম্পটন মেকেঞ্জীকে খুব সজীব এবং সতেজ মনে হয়েছিল। টি এস এলিয়ট একটি সম্মানিত দূরত্বে থাকতেন। কিন্তু মেকেঞ্জী একটি হাস্যোজ্জ্বল প্রভায় আশেপাশের সকলকে উদ্ভাসিত করতেন। কনফারেন্সের সময় তিনি ডিনারে একজন ভারতীয় মহিলাকে কম্পটন মেকেঞ্জী স্টবেরির সঙ্গে ক্রীম কি করে মেখে খেতে হয় তা দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। মোট কথা একটি কনফারেন্স কি করে প্রাণবন্ত ও স্মরণীয় করতে হয়, তা মেকেঞ্জী জানতেন। শুধু আলোচনায় মানুষ ক্লান্ত হয় এবং কেমন যেন অসহায়বোধ করে। কিন্তু দু' একজন লোক তাদের উচ্ছলতায় সময়কে কৌতুকে বিচলিত করে। এদের উপস্থিতিতেই একটি কনফারেন্স উপযোগ্য হয়। কম্পটন মেকেঞ্জী এ রকমই একজন লোক।

কম্পটন মেকেঞ্জী কনফারেন্সের মধ্যে একদিন অবকাশকালে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমাদের দেশে আকাশে সব সময় মেঘ থাকে, তাই না? তোমরা দিগবলয়ে সব সময় মেঘের আনাগোনা দেখ। মেঘের আনাগোনায় মেয়েদের শরীর ভেসে চলে মনে হয়।' তিনি ফেমিনিন ফর্ম কথাটি বলেছিলেন মনে পড়ছে। আমি উত্তরে বলেছিলাম, 'আমি যা কল্পনা করব, তাই তো দেখব, আমার বয়সে আমি হয়ত মেয়েদের শরীর দেখব কিন্তু আপনিও কি তাই দেখবেন?' মেকেঞ্জী হেসে বলেছিলেন, 'আমিও তাই দেখি। আমার বয়সে যৌবনের ইচ্ছাগুলোকে আমি স্মৃতিতে ধারণ করে রাখি।' সত্যিই তাই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যৌবনময় ছিলেন।

॥১১॥

লন্ডনে আন্তর্জাতিক পিইএন-এর সম্মেলন শেষে আমি প্যারিসে গিয়েছিলাম। প্যারিসে যাবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম ক্লেয়ার গল-এর কাছ থেকে। ক্যামব্রিজের কিংস কলেজে ফরস্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে ক্লেয়ার গলের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ক্লেয়ার গল দুপুরের রোদে কিংস কলেজের লনের পাশে বসেছিলেন। দৃষ্টি সামনের দিকে নিবদ্ধ। অকস্মাৎ আমার মনে হয়েছিল তিনি তার অভ্যন্তরস্থ জীবনসত্তাকে অবলোকন করছেন এবং সময়ের অভিঘাতকে গণনা করছেন।

www.pathagar.com

লন্ডন থেকে সর্বপ্রথম প্যারিসে এলাম ব্রিটিশ এয়ারলাইন্সের বিমানযোগে দুপুর ১২টায়। তারিখটি সম্ভবত ১৩/১৪ই জুলাই ১৯৫৬। আমার থাকার জায়গা ঠিক হয়েছিল মেইজ ইন্টারনেশিওনালে। খণ্ডকালীন যাত্রাবিরতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের লেখকরা অবস্থান করতেন। আকাদেমী ফ্রাঁসের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক পিইএন বা লেখক সংঘের নামে ফ্লাটটি বরাদ্দ ছিল। শুধু রাত্রিবাসের জন্য কক্ষ ছিল, আহার বাইরে করতে হত। বিভিন্ন সময়ে আমি এখানে এসে থেকেছি। অবস্থানকালে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছে উমাশঙ্কর যোশীর সঙ্গে, পোল্যান্ডের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক লুই প্যার্‌য়নভস্কের সঙ্গে, ইটালীর আলবার্তো মোরাভিয়ার সঙ্গে। তাছাড়া এখানে কখনও বিকেলবেলা অথবা সন্ধ্যায় এসেছেন রোজার কাইওয়া, আঁদ্রে শাঁসো এবং আরও অনেকে।

অরলি থেকে আঁভালিদে হয়ে সাঁজালিজের পথে প্রায় মাঝামাঝি বাঁদিকে র‍্যু পীয়ের শারোঁ। এখানেই মেইজ'র অবস্থান ছিল। আঁভালিদে যুদ্ধাস্ত্রের যাদুঘর আবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের ইতিহাসের বহু যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নের ধারক। চতুর্দশ লুই-এর সময় অক্ষম সৈনিকদের অবস্থানের জন্য একটি হোটেল হিসাবে এটাকে নির্মাণ করা হয়। আঁভালিদের মার্বেল পাথরের গম্বুজের ঠিক নিম্নভাগে নেপোলিয়ঁর সমাধি। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট লুই ফিলিপের আন্তরিক চেষ্টায় ইংরেজদের অনুমোদনক্রমে নেপোলিয়ঁর দেহ সেন্ট হেলেনা দ্বীপ থেকে প্যারিস আনয়ন করা হয়। আর্ক দ্য এয়ম্ফ থেকে বিরাট একটি মৌন মিছিল সর্বকালের ফ্রান্সের প্রতীক নেপোলিয়ঁকে বহন করে আঁভালিদে সমাধিস্থ করে। এখন ডোমের অভ্যন্তরে ঘূর্ণমান রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে শরীর আনত করে সমাধি দেখতে হয়। এক মহৎ পুরুষের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মত। আমি প্রথমবারের যাত্রায় আঁভালিদে দেখবার সুযোগ পাই নি, পরের বছর দেখেছিলাম।

বিকেল পাঁচটায় সেইজুঁতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন এক মহিলা। অনেকটা জিপসি ধরনের চেহারা, সুস্পষ্ট চোয়াল, প্রশস্ত ললাট, সুচিহ্নিত কণ্ঠাস্থি, আয়ত নেত্রের মণি নীল। কালো জামা গায়ে, জামার প্রান্তদেশ সোনালী সুতোর কাজ করা, গলায় কাঠের গোলকের মালা অনেকটা আমাদের দেশের রুদ্রাক্ষের মালার মত। এসেই সম্ভাষণ করলেন, আপনিই মঁসিয়ে আহসান। মঁসিয়ে দ্য বীয়র আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলেছেন। তার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবে রাত ১১টায় কাফেরয়ালে। আমিই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব। আমার নাম মাদমোয়াজেল মেইতরে। পুরো নাম লুসক্রুদ মেইতরে। আমি বাংলা কবিতা খুব ভালবাসি। অনুবাদ পড়েছি।

ভদ্রমহিলা খুব নিম্নস্বরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা উচ্চারণে কিন্তু শুদ্ধ ইংরেজীতে কথাগুলো বললেন। আমি উত্তরে বললাম 'লন্ডন থেকে দ্য বীয়রের কাছে চিঠি দিয়েছিলাম, তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য খুবই ব্যগ্র রয়েছি। যাক আপনার কথায় সংশয় কাটল। দেখা হচ্ছে তাহলে, কিন্তু অত রাতে কেন?'

'রাত আর কোথায়? প্যারিস শহর সারা রাত জেগে থাকে। তাছাড়া যারা থিয়েটারে কাজ করেন তাদের প্রধান কাজ রাতের বেলায়। নাটকের জন্য কুশলীব নির্বাচন, রিহার্সেল–এসব কাজ রাতেই হয়। আপনি জানেন নিশ্চয় দ্য বীয়র একটি নাট্যগোষ্ঠীর জন্য নাটক লেখেন, নাটক নির্বাচন করেন এবং অভিনয় কর্মের সকল অবস্থার সঙ্গে তিনি জড়িত।

www.pathagar.com

মঞ্চায়নের জন্য নাট্যকর্মের প্রারম্ভিক দিকগুলো খুবই উৎসাহব্যঞ্জক এবং কুশল ব্যস্ততার মধ্যে সমর্পিত। মঁসিয়ে দ্য বীয়রের মধ্যে এ ব্যস্ততা আমি সব সময়েই লক্ষ্য করেছি।'

আনন্দের যে একটি গণতান্ত্রিক অভিব্যক্তি আছে–ফরাসীদের নাট্যচর্চা ও শিল্পচর্চার মধ্যে তা লক্ষ্য করা যায়। এ সমস্ত শিল্প অনুরাগের ক্ষেত্রে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এবং অনুশীলনের ক্ষেত্রে যেমন শালীন আবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বসাধারণেরও। অর্থাৎ একদিকে যেমন এরিস্টোক্রাসির জন্য শিল্পচর্চা ঘটেছে আবার সঙ্গে সঙ্গে এসব শিল্পের একটি গুণগ্রাহ্য দিকও আছে। অবশ্য মূলত ফরাসী ট্রাডিশন হচ্ছে ক্লাসিকাল নাটকের যেগুলোর অনুরাগীর দল হচ্ছে পরিশীলিত ও রুচিবান শিক্ষিত সম্প্রদায়। সরকারী সমর্থনে পরিশীলিত নাট্যচর্চার কেন্দ্রভূমি হচ্ছে কমেডি ফ্রাঁস। দ্য বীয়র কমেডি ফ্রাঁসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। পিপলস থিয়েটার যাকে বলে সরকার সমর্থিত তার একটি জাতীয় রূপ হচ্ছে থিয়েটার ন্যাশনাল পপুলেয়ার। এরই সঙ্গে দ্য বীয়রের যোগাযোগ এবং শিল্পগত ঘনিষ্ঠতা। জনসাধারণের কাছে দেশী ও বিদেশী নাটককে পৌঁছে দেবার জন্য দ্য বীয়রের চেষ্টা ছিল অপরিসীম।

লুস মেইতরে পাকিস্তান এমবেসিতে কাজ করতেন। মিশনে তার দায়িত্ব ছিল ফরাসী ভাষায় একটি বুলেটিন প্রকাশ করা আর কিছু অনুবাদের কাজ করা। পাকিস্তান মিশনের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে ফরাসী ভাষায় কবি ইকবালের উপর পরিচিতি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

লুস মেইতরে বললেন, "মিশনে পাকিস্তানী যারা আসেন তাদের অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানী। এঁরা খুব বুদ্ধিমান। আধুনিককালের সংলাপের রীতি প্রকরণ জানেন কিন্তু শিল্প ও সাহিত্য থেকে এক রকম বিচ্ছিন্ন। প্যারিসে যে সমস্ত থিয়েটার মেয়েদের শরীরকে বিচিত্ররূপে দর্শনীয় করে অর্থ উপার্জন করে সে সমস্ত থিয়েটারের প্রতি এদের আগ্রহ অসীম। অপর পক্ষে যে ক'জন বাঙালী দেখেছি তারা খুব চতুর নন, নিরীহ ও আন্তরিক। মঁসিয়ে দ্য বীয়র ঢাকায় গিয়েছিলেন দু' বছর আগে। তিনি কাছ থেকে বাঙালী কবি ও সাহিত্যিকদের গল্প শুনে আমি মনে ভেবেছি যে তারা আমাদের সমমনা। ভাগ্যচক্রে আপনার সাথে দেখা করার কথা দ্য বীয়রই বললেন। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি খুশী হয়েছি।'

ফরাসী রমণীরা পোশাক পরিচ্ছদে খুব মনোযোগী। কিন্তু এ ক্ষেত্রে লুসকে ব্যতিক্রম হিসাবে লক্ষ্য করেছি সব সময়। প্রথম বারের পর আরও অনেকবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। সর্বশেষ সাক্ষাৎকার ১৯৭৩ সালে নিজেকে দ্রষ্টব্য বা আকর্ষণীয় করে তোলার যে ফরাসী শিল্পচাতুর্য লুসের মধ্যে তা ছিল পোশাক কিংবা অলংকারে নয়–সংলাপের অন্তরঙ্গ বাচনভঙ্গিতে এবং দৃষ্টির স্নিগ্ধ মাধুর্যে। প্রথম সাক্ষাৎকালে তার বয়স ছিল পঁচিশ-ছাব্বিশের মত। তখন সে ইচ্ছে করলে ফরাসী রমণীর আনন্দ প্রকাশের প্রক্রিয়ায় নিজেকে সুশোভিত করে উপস্থিত করতে পারত, কিন্তু সে তা করে নি। সে বারবার চেয়েছে ফরাসীদের চিত্তলোককে উদঘাটন করতে। তার উপকরণ ছিল সীমিত, সাধারণ রমণী হিসাবে সাধারণভাবেই সে থাকতে চেয়েছে কিন্তু স্বল্পবিত্তের সাহায্যেই সে ফরাসী চিৎপ্রকর্ষের প্রতিনিধিত্ব করতে চেয়েছে।

www.pathagar.com

লুস অল্পস্বল্প সাহিত্যচর্চার সঙ্গে একান্ত ব্যক্তিগত চিত্তবিনোদনের সঙ্গে সঙ্গীতচর্চাও করত। ব্যালে নৃত্যের শিল্প কৌশল সম্পর্কে বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য করতে পারত। প্যারিস অপেরার একটি নৃত্যানুষ্ঠানে আমি তার সঙ্গী হিসাবে উপস্থিত ছিলাম। অনুষ্ঠান চলাকালীন মাঝে মাঝে সে আমাকে গল্পের গতিধারা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। দেহ ভঙ্গি মাধ্যমে আবেগ কি করে স্পষ্ট হয় তাও বুঝাবার চেষ্টা করেছে। আমি ঘটনাটি উল্লেখ করলাম শুধুমাত্র একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেবার জন্য-ফরাসী মানসে শিল্পবোধ কত গভীরভাবে প্রোথিত।

প্রথম সাক্ষাৎকালে লুস আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ছিল। মেইজ থেকে বেরিয়ে কাছের একটি রেস্তোঁরায় রাতের খাবার খেলাম। পরে সে আমাকে নিয়ে গেল তুইলরীর বাগানে। সেখানে ঝরাপাতার ওপরে হেঁটে যেতে বেশ রহস্যময় লাগল। রাত দশটার পর লুস আমাকে কাফে রয়ালে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিল। জাঁ দ্য বীয়র এল ১১টায়। ফরাসীদের আন্তরিকতার একটি বহিঃপ্রকাশ আছে-দ্য বীয়রের মধ্যে তা আমি প্রচুর লক্ষ্য করেছি। দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরবে, গালে চুমু খাবে, রহস্য করবে, রসিকতা উপভোগ করে প্রাণখোলা হাসি হাসবে। ইংরেজরা যেখানে আত্মশাসিত, ফরাসীরা সেখানে আত্মমুখর। সে রাতেই বীয়র আমাকে রাতের প্যারিসের একটি বিশিষ্ট রূপ দেখাবার জন্য নিয়ে এল মঁমার্তে। পৃথিবীর শিল্পানুরাগীদের কাছে তুলুস লুত্রেকের বিচরণভূমি হিসাবেই মঁমার্তের প্রসিদ্ধি। দ্য বীয়রের সঙ্গে যখন এলাম তখন মধ্যরাত্রি বারটা হলেও প্রচুর বিদ্যুতের আলোয় মঁমার্তের প্রায় অঞ্চলেই যেন পর্যাপ্ত দিবস।

দ্য বীয়র হৃদয়বান বন্ধু। কর্মব্যস্ততার খণ্ডকালীন অবসরে সে আমাকে সঙ্গ দিয়েছে এবং প্যারিসের পরিচয়কে আমার জন্য অন্তরঙ্গ ও হৃদয়বেদ্য করেছে। শুধু প্রথমবার নয়, পরেও যতবার প্যারিসে এসেছি দ্য বীয়রের সাহচর্য পেয়েছি।

ফ্রান্সে এসে ফরাসী কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে একটি ধারণা আমার জন্মেছে যে এখানকার মানুষ চিন্তারাজ্যের সতত পরিবর্তনশীল জিজ্ঞাসার মধ্যে বাস করে। বিভিন্ন অবস্থাকে এঁরা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে এবং প্রত্যহই নতুন নতুন সমস্যার আবিষ্কারের মধ্যে, জিজ্ঞাসার উপস্থাপনার মধ্যে চিত্তকে এরা সচল ও সঞ্জীবিত রাখে। শ্রেয় কোনটা, সে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে না, জীবনকে উৎসব হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে না, শুধু দুর্বিষহ অস্তিত্বের সমর্থনে কবি ও সাহিত্যিকগণ শব্দ প্রয়োগ করে চলেছেন। প্যারিসে এসে কবিতায় শব্দ প্রয়োগ সম্পর্কে আমার মনে নতুন চিন্তা জাগল। ফরাসী কবিগণ মূলত ফরাসী ভাষার দক্ষ কারুকর্মী। তারা ভাষাকে এক একটি বিশিষ্ট সত্তায় সচল ও সংক্রামক দেখতে চান। একটি কথাই আমার কাছে চূড়ান্ত বলে মনে হয়েছে যে ফরাসীরা ভাষাকেই সর্বপ্রকার প্রকাশের জয়শ্রী ভেবেছেন। কবিতার ক্ষেত্রে বোদলেয়াব থেকে আরম্ভ করে পীয়ের ইমানুয়েল পর্যন্ত শব্দের উত্তাপে উষ্ণ হয়েছেন এবং পরিচ্ছন্ন উচ্চারণে জীবনকে বাঙময় করেছেন।

দ্য বীয়র যেভাবে সমবয়সী বন্ধু হিসাবে ফ্রান্সের সঙ্গে আমার একটি হৃদয়গ্রাহ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল অঁদ্রে শাঁসো তেমনি আবার পরিশীলিত সম্ভ্রান্ত এবং সম্পন্ন

www.pathagar.com

একটি ফরাসী চিত্তকে আমার সামনে উদঘাটন করেছিলেন। তিনি আকাদেশী ফ্রান্সের সদস্য হিসাবে ফরাসী দেশের একজন সম্মানিত নাগরিক ছিলেন। তিনি একবার বাস্তিল দিবসের উৎসব শোভা দেখবার জন্য প্লাদ্য কঁকর্দে উৎসবের জন্য নির্মিত গ্যালারীতে বসবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সীন নদীতে নৌকা ভ্রমণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে সাজালিজের নামকরা রেস্তঁরায় ফুকেৎ-এ খাবার নিমন্ত্রণে মিলিত হয়েছিলাম।

মানুষ প্রায়ই পুরনো কথা ভুলে যায়। সে বর্তমানে সঙ্গতি সন্ধান করতে গিয়ে শুধু মুহূর্তের মধ্যে সঞ্চরণ করে কিন্তু যখন কর্মের দায়ভাগ কমে আসে, যখন অবশের বিস্তার স্বল্প থেকে ক্রমান্বয়ে বিপুল হতে থাকে তখন একমাত্র স্মৃতির সঞ্চয়গুলোই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। এ সঞ্চয়ের কোন অবক্ষয় নেই। প্যারিস আমার জীবনকে নতুন মূল্য দিয়েছিল। প্যারিসের জীবনের ঘটনাগুলো আমার বর্তমানের সময়ের দিল গণনায় নতুন করে মূল্য পাচ্ছে।

যাই হোক অপ্রাসঙ্গিক হলেও দিল্লিওয়ালার আপ্যায়নের কাহিনীটা এখানে বলা দরকার। দিল্লিওয়ালার বাসায় এক দ্বিপ্রহরে নাজিমুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে খাদ্য গ্রহণ করতে গিয়ে নাজিমুদ্দিন সাহেবের আহার্যের যে কারুকর্ম দেখলাম তা জীবনের কখনও ভুলব না। প্রথম আইটেম ছিল শিরমল, টিকিয়া ও পনির। নাজিমুদ্দিন সাহেব ৬টি শিরমল খেলেন এবং ১২টার মত টিকিয়া, তৎসঙ্গে প্রচুর পনির। দ্বিতীয় আইটেম ছিল খোসকা ও তিতিরের গোসত। নাজিমুদ্দিন সাহেব এটার সদগতি করলেন। তৃতীয় আইটেম ছিল বিরিয়ানী এবং রেজালা। এখানেও কার্পণ্য লক্ষ্য করলাম না। সঙ্গে রোস্টও ছিল। তাও তিনি খেলেন। এর পরে এল মিষ্টি। বাড়িতে তৈরি ফিরনি ছিল এবং আহমদ হালুয়াই-এর মিষ্টি ছিল। সবই তিনি খেলেন। এরপর ফল এল। আঙ্গুর আপেল তিনি খেলেন এবং একটি বড় গ্লাসে করে এক গ্লাস আনারের রস তাকে দেয়া হল। তিনি তা গলাধঃকরণ করলেন। এতসব খাওয়ার পর তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হল যে তিনি এক বোতল সোডা খাবেন কিনা। তখন তিনি নিষেধ করলেন। তার খাদ্য গ্রহণ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। খাদ্যগ্রহণের সময় মাঝে মাঝে তিনি মন্তব্যও করছিলেন। তিতিরের গোসত বেশি গলে গেছে বলে তিনি মন্তব্য করছিলেন। ফজলুল হক সাহেবকেও আমি খেতে দেখেছি।

নাজিমুদ্দিন সাহেবের মতই তারও পরিপাকের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ।

করাচীতে বিভিন্ন কলেজে বাঙ্গালী ছাত্র থাকলেও বাংলা পড়ানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। সিলেবাস সূচিতে উর্দু বাংলা এবং সিন্ধির কথা লেখা ছিল ঠিকই কিন্তু সিন্ধি ও উর্দু পড়ানো হত, বাংলা পড়ানোর কোন আয়োজন কোন কলেজে ছিল না। সিন্ধু কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফার সঙ্গে আলোচনাক্রমে আমি সে কলেজের জন্য একজন বাংলা অধ্যাপক এনে দিলাম। মোহাম্মদ ফারুক আমার ছাত্র ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে বাংলা অধ্যাপক হিসাবে উক্ত কলেজে যোগ দিল। ইসলামিয়া কলেজে বাংলার অধ্যাপক নিয়োগ করতে একটু সময় নিয়েছিল সেখানেও শেষ পর্যন্ত মুজিবর রহমানের যোগ দেয়ার ব্যবস্থা করিয়েছিলাম। কিছুদিন পর করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুমকে রিসার্চ ছাত্র হিসাবে নিয়ে আসি। অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলার একটি পরিমণ্ডল আমরা সেখানে গড়ে তুলি।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার সিলেবাস এবং কলেজগুলোর বাংলা সিলেবাস নতুন করে সাজানোর জন্য ডক্টর শহীদুল্লাহকে আমন্ত্রণ জানাই। তিনি এসে আমাদের সঙ্গে বসে সিলেবাসগুলো একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসেন। শহীদুল্লাহ সাহেব যে কয়দিন করাচী ছিলেন সে কয়দিন আমরা তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেছি এবং তিনিও তাঁর সময়কে আনন্দে কাটিয়েছেন। জু'মার নামাজের দিন তাঁকে নিয়ে জ্যাকব লাইন্সে মওলানা এহতেশামুল হক থানবীর মসজিদে নামাজ পড়লাম। নামাজের শেষে থানবী সাহেবের বিশেষ কক্ষে আমরা এলাম। সেখানে আরও অনেক লোক ছিলেন। প্রতি জু'মার নামাজের পর মওলানা সাহেব এই কক্ষে সকলকে সাক্ষাৎকার দিতেন। আমাদের সবার জন্য মিষ্টি এল। মিষ্টি খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে নানারকম আলোচনা চলতে লাগল। মিষ্টির শেষে মওলানা সাহেবের ছোট মেয়ে তাঁর পিতার জন্য একটি পানের খিলি হাতে করে নিয়ে এল। শহীদুল্লাহ সাহেব ভাবলেন সম্ভবত পানটি তাঁরই জন্য। তিনি মেয়েটির হাত থেকে পানটি নিয়ে মুখে দিলেন এবং অন্যমনস্কভাবে চিবোতে লাগলেন। পানের মধ্যে প্রচুর কিমাম দেওয়া ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিমাম তাঁর কার্যকারিতা ঘোষণা করল এবং শহীদুল্লাহ সাহেব বমি করে ফেললেন। বমির সঙ্গে তাঁর একপাটি নকল দাঁত খুলে পড়ল। কক্ষে উপস্থিত একজন বৃদ্ধ পাঠান বলে উঠলো, "কেয়া সদ্‌মা, দাঁত ভি গির গিয়া"। ভদ্রলোক ভেবেছিলেন শহীদুল্লাহ সাহেবের আসল দাঁতই খসে পড়েছে। যাই হোক অনেক পরিশ্রমে শহীদুল্লাহ সাহেবকে সুস্থ করা হল। তাঁকে এক গ্লাস শরবত পান করতে দেয়া হল। বিশ্ববিদ্যালয়েও শহীদুল্লাহ সাহেবকে আমি একটি সংবর্ধনা দিয়েছিলাম। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ বিভাগীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

করাচী অবস্থানকালে প্রাথমিক পর্যায়ে সমারসেট হাউস ছিল পাকিস্তান পার্লামেন্টের বাঙ্গালী সদস্যদের আবাসস্থল। সেখানে আমরা মাঝে মাঝে আড্ডা দিতে যেতাম। বিশেষ করে ইব্রাহীম খাঁ সাহেবের কক্ষে আমাদের যাতায়াত ছিল বেশি। একবার একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতে একজন বাঙ্গালী মহিলা গান করেছিলেন, এই সংবাদ শুনে পরের দিন মওলানা থানবী সাহেব সমারসেট হাউসে ইব্রাহীম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে তিরস্কার করেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মওলানা সাহেব বলেছিলেন, 'চুল ছেড়ে একজন বেগানা আওরত আপনার সামনে গান করল আর আপনি বসে বসে দেখলেন, এটা কি রকম হল।' ইব্রাহীম সাহেব তাঁর স্বভাবসুলভ রসিকতায় মওলানা সাহেবকে বললেন, 'মওলানা সাহেব, আমি তো তার গান শুনেছি কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি তাকে কল্পনায় খুঁটে খুঁটে দেখছেন। ঘটনাটি অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু এর মধ্য দিয়ে একটি মানসিকতা স্পষ্ট হয়।

অবাঙ্গালীরা বাঙ্গালীদের আচরণের মধ্যে বিশেষ করে সাংস্কৃতিক প্রত্যয়ের মধ্যে সব সময় ইসলাম বিরোধিতা লক্ষ্য করত। তারা কিছুতেই আমাদের মানসিকতা এবং চিন্তাবিধি বুঝবার চেষ্টা করত না। তবু আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন করাচীতে সচল রেখেছিলাম। বিখ্যাত সরোদ শিল্পী তিমিরবরণ করাচীতে থাকতেন, সঙ্গীত শিল্পী দেবু ভট্টাচার্যও সেখানে ছিলেন। এদের নিয়ে আমরা অনুষ্ঠান করতাম এবং সেসব অনুষ্ঠানে

www.pathagar.com

পশ্চিম পাকিস্তানীরা শ্রোতা এবং দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকতেন। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক ধারাক্রমের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানীদের পরিচিত করিয়ে দেওয়া। মানুষের সংস্কৃতি তার জীবনের অন্তস্থল থেকে প্রকাশিত হয়। সংস্কৃতি কোন বহিরঙ্গ বিষয়ক বস্তু নয়। সংস্কৃতির একটি অন্তরঙ্গ স্বরূপ।

সেই অন্তরঙ্গ স্বরূপের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি একজন মানুষের অন্তরাত্মার চিত্র পরিস্ফুটিত করে। এখানে ধর্মের কথাটি একেবারেই গৌণ। ধর্মের খুঁটিনাটি নিয়মকানুন সংস্কৃতিগত আচরণের সঙ্গে সবসময় যে সঙ্গতি রক্ষা করে তা নয় কিন্তু উভয়েই আপন আপন ক্ষেত্রে স্বস্তিতে বাস করে। এখানে প্রশ্ন উত্থাপন করলেই জটিলতার সৃষ্টি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানীরা প্রায়শ এই প্রশ্নটি উত্থাপন করতেন। যার ফলে বিরোধ এবং বিসংবাদ সৃষ্টি হত। বাংলা বিভাগে আমরা একটি সাহিত্য সমিতি গঠন করেছিলাম। মাঝে মাঝে এ সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতাম এবং এক পর্যায়ে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ করাচীতে বাঙ্গালীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কর্মস্থল হিসাবে গড়ে ওঠে। একটি ইচ্ছা সে সময় আমার মনে কাজ করেছিল তা হচ্ছে একটি পরিচয়ের বিমণ্ডনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে মিলিত করব। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এটি সম্ভবপর হল না। একটি অপরিচয়ের ব্যবধান আমাদের মধ্যে থেকে গেল। পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদের নাচ গানকে একটি বিরোধী সততার প্রকাশ হিসাবে বিশ্বাস করল। আমাদের অনুষ্ঠানে তারা এসেছে, অনুষ্ঠান উপভোগও করেছে কিন্তু অনুষ্ঠানকে গ্রহণ করে নি। কোনক্রমেই তাদের মানসিকতাকে আমাদের বিশ্বাসের পটভূমিতে আমরা টেনে আনতে পারি নি। মাঝে মাঝে এ ব্যাপারে ডক্টর মাহমুদ হোসেনের সঙ্গে আলোচনা করতাম। তিনি বলতেন, 'যে কারণে পাকিস্তান হয়েছে, সে কারণটি যদি সবসময় মনের মধ্যে প্রখর থাকে, তাহলে সব কিছুতেই দ্বৈত জাতিসত্তার প্রকাশ ধরা পড়বে। রাজনীতিতে যাই থাকুক না কেন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি সমঝোতার প্রয়োজন। গ্রহণ না হলেও সমর্থনের প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙ্গালী সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে পারছে না এটা বোঝা যায়, কিন্তু সমর্থন কেন করতে পারছে না এটা আমি বুঝে উঠতে পারি না।'

॥১২॥

প্যারিসে ক্লেয়ার গল থাকতেন সীন নদীর পূর্ব তীরে কুয়ে আনাতোল ফ্রাঁসে অবস্থিত পালা দরসি হোটেলে। হোটেলের একটি কক্ষে তিনি অনেক দিন স্থায়ীভাবেই থাকতেন। লন্ডন থেকে প্যারিসে পৌঁছেই ক্লেয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তখন জুলাই মাস, শীতের আর্দ্রতা কোথায়ও নেই, গ্রীষ্মের তাপও প্রচণ্ড নয়, পথে পথে পুষ্পের সম্ভার। প্যারিস শহরকে সুন্দর করবার জন্য প্রকৃতিকেও ব্যবহার করা হয়েছে–গাছ এবং নদী আপন আপন সম্পন্নতায় অট্টালিকা এবং রাজপথকে সমৃদ্ধ এবং সুন্দর করেছে। আমি উঠেছিলাম ইন্টারন্যাশিওনালে। শাঁ জালিজে থেকে একটি পথ এতোয়ালের দিকে যাত্রা করলে বাঁ দিকে পড়ে, নাম র‍্যু পীয়ের শারোঁ। এ পথেই সেইজঁর অবস্থান ছিল।

www.pathagar.com

হোটেল পালা দ্য অরসে সীন নদীর অপর পারে। সাঁ জালিজে হয়ে লুভরের দিকে যেতে ডান দিকে মোড়া ঘুরলেই পঁত আলেকসাঁন্দর। সীন নদীর উপরের এ সুন্দর সেতুটি অতিক্রম করলেই বিখ্যাত রাজপথ কুয়ে আনাতোল ফ্রাঁস। এ পথের উপরেই হোটেলটি। টেলিফোনে ক্লেয়ার গল লোকেশান বুজিয়ে বলেছিলেন, "তুমি পায়ে হেঁটেই চলে আসতে পার। চারদিকের দৃশ্য ভালো লাগবে। প্যারিসের শোভা অনুসন্ধান করতে হয় পায়ে হেঁটে–গাড়িতে বসে নয়। একটু থেমে হঠাৎ প্রশ্ন করেছিলেন। "তোমার কি রং পছন্দ? আমি চিন্তা না করে বলেছিলাম, "নীল। ক্লেয়ার গল বলেছিলেন, আমার প্রিয় রং হচ্ছে লাল। যাই হোক, তুমি দুপুরের আগেই চলে আসবে। আমার এখানেই খাবে।"

রং-এর কথা আমার কাছে কেমন যেন অসংলগ্ন মনে হল। মেইজঁ থেকে বেরুবার মুখে সৌভাগ্যক্রমে মাদ মোয়াজেল কঁ তা সুঁর সঙ্গে দেখা হল। তাকে ক্লেয়ার গলের লাল রংয়ের কথা বললাম। সে হেসে বলল, "তুমি এক গুচ্ছ লাল ফুল নিয়ে ক্লেয়ার গলের সঙ্গে দেখা করবে। তবে আমি বলি, লালের সঙ্গে হলুদ এবং নীল রং-এর ফুলও নেবে।" –কঁ তা সুঁ মেইজর কেয়ার-টেকার ছিলেন।

হোটেল সুইটের বাইরের কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে হাসিমুখে ক্লেয়ার এগিয়ে এসে হাতের ফুলগুলো নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন। ঘরে প্রবেশ করলাম। চতুর্দিকের দেয়ালে অনেক চিত্রকর্মের বিচিত্র রূপসজ্জা। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আধুনিককালের যে কজন মহৎ এবং কুশলী শিল্পীর কথা আমরা শুনি তাদের প্রত্যেকের অরিজিনাল ড্রইং, রেখাচিত্র, স্কেচ, লিথোগ্রাফ এবং তুলির বিন্যাস ক্লেয়ারের বসবার কক্ষকে বাঙময় করেছে। আমার বিস্ময় দেখে ক্লেয়ার বললেন, "এগুলো সব ইভানের স্মৃতি চিহ্ন। ইভান এবং আমি এসব শিল্পীর সঙ্গে একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত ছিলাম। সে ঐক্য বন্ধনের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য মায়াকোভস্কিও এসেছিলেন। আমার জীবন তো এখন স্মৃতি এবং অতীতের দিকে দৃষ্টিপাতের জীবন। দেয়ালের ছবিগুলো অতীতকে বর্তমান মুহূর্তে কলরবমুখর রেখেছে।"

আমি ঘুরে ঘুরে ছবিগুলো দেখতে লাগলাম। ক্লেয়ার বললেন, "আমি এখন একমাত্র ইভানের রমণী। এখনও প্রতি মুহূর্তে তার কামনার স্পর্শ পাই। ইভানের কাব্যধারার সঙ্গে পরিচিত হলে তুমি আনন্দে ও শংকায় সচকিত হবে। আজ থেকে তুমি ইভানের অভীপসা ও বেদনার রাজ্যে প্রবেশ করলে।"

১৯৪৪ সালে জার্মান সেনাবাহিনী পরাজয়ের প্রাক্কালে প্যারিস শহরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে পারতো। জার্মান জেনারেল ফন চোলচিতৎস ১৭ই আগস্ট গ্রীষ্ম সন্ধ্যায় গোধূলির লগ্নে তার বাসগৃহের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তুলীয়রের বাগানের দিকে দৃষ্টি ফেললেন, দেখলেন লুভর-এর জানালাগুলো সোনার মতো জ্বলছে, রুঁ্য দ্য রিভোলিতে ছেলেমেয়েরা খেলা করছে, একটি মেয়ে পানিতে কাগজের নৌকা ভাসিয়েছে। সে মুহূর্তে জার্মান জেনারেল অনুভব করলেন যে প্যারিস কোনো দেশের সম্পত্তি নয়, সমস্ত বিশ্বের সম্পত্তি। তিনি প্যারিসের কাছে পরাজয়বরণ করলেন। তিনি মিত্র বাহিনীর মুখোমুখি হলেন না, সৈন্যসামন্ত নিয়ে প্যারিস ছেড়ে চলে গেলেন। চলে যাওয়া ঠিক নয়,

www.pathagar.com

তিনি ফরাসীদের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন, তার হেড কোয়ার্টার হোটেল মরিস ফরাসীদের দখলে এল। পরের দিন সাঁ জালিজের মধ্য দিয়ে জয়যাত্রাসহ মার্শাল দ্য গল প্লা দে লা কুঁর্কদ নতরদম গির্জায় গিয়ে প্রার্থনায় আনত হলেন।

প্যারিসে থাকতে এ পথ দিয়ে কতবার হেঁটেছি এবং একটি জাতির স্বাধীনতার জয়যাত্রার কথা ভেবেছি। স্বাধীনতার আনন্দ এবং সৌভাগ্যের সমারোহ এখনও সাঁ জালিজে বিশ্ববাসীর কাছে অনিন্দ্য সুন্দর।

প্যারিস একটি পায়ে হাঁটার শহর, হেঁটে হেঁটে ইতিহাসকে স্পর্শ করে যাওয়া যায়। শহরের মধ্যে সীন নদী বয়ে চলেছে, নদী স্রোতের মন্থরতাকে অনুসরণ করেই যেন পথচারীদের ধীরগতি। প্যারিস একটি আন্তরিক এবং ঘনিষ্ঠ শহর।

ক্লেয়ারের হোটেলে যেতে পঁত আলেকসান্দার অতিক্রম করতে হয়। নদীর উভয় তীরকে সংযোজিত করেছে এ রকম অনেকগুলো সাঁকো। কবিরা এগুলো নিয়ে কবিতাও লিখেছে। মিরাপো সেতু নিয়ে গীত্তম এপোলীনিয়র একটি সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন, আমি এখানে কবিতাটির অনুবাদ উপস্থিত করছি ঃ 'মিরাবো সেতুর নিচে সীন প্রবাহিত হচ্ছে। এবং আমাদের প্রেম? আমাকে কি তা মনে করতে হবে? আনন্দ সর্বদাই আসে বেদনার পরে। রাত্রি আসুক, সময় গড়িয়ে যাক, দিবস রাত হোক, আমি শুধু থেমে থাকছি। হাতে হাত রেখে চল আমরা বসে থাকি, আমাদের বাহুবন্ধন যে সেতু নির্মাণ করেছে তার নিচে ক্লান্ত দৃষ্টির তরঙ্গ বয়ে যাক। প্রেম বয়ে চলে নদীর স্রোতের মত, প্রেম বয়ে যায়। জীবনের গতি অত্যন্ত মন্থর এবং মানুষের আশা ভয়ঙ্কর প্রবল। দিবস বিগত হয়, তেমনি সপ্তাহ। অতীতের সময়গুলো আর ফিরে আসে না, তেমনি সে সময়কার প্রেমও কিন্তু প্রতিক্ষণ মিরাবো সেতুর নিচে সীন নদী বয়ে যায়।

ক্লেয়ার বলেছিলেন, "প্যারিস প্রেমের শহর এবং কবিতার শহর। প্যারিসকে নিয়ে অজস্র কবিতা লিখিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ফ্রাঁসোয়া ভিঁলো, জাঁ রেসি ভিক্টর হিউগো, থিয়োফিল গেতিয়ের, জাঁ ককতু পল ইলুয়ার্দ, জাক প্রেভেরে এরা সবাই প্যারিস নিয়ে কবিতা লিখেছেন, এখনও অনেকে লিখছেন। চার্লস পেও প্যারিসকে সকল সৌন্দর্যের মূলাধার বলেছেন। বলছেন যে চিরকালের জন্য আত্মার স্বাধীনতাকে সংস্থাপিত করে, ব্যবসা প্রেম, অগ্নিশিখা এবং ভস্ম, আবেগের প্রত্যাশা সব কিছুকে আপন অস্তিত্বে বিলীন করে চিরকালের জন্য প্যারিস জাগ্রত হয়েছে। তুমি যতই প্যারিসকে দেখবে, অভিভূত হবে, তোমার কাব্যরীতি বদলে যাবে, তোমার উপমায় নতুন বিস্ময়ের সঞ্চার ঘটবে।

ক্লেয়ারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি প্যারিসকে চিনেছিলাম। অনুভব করেছিলাম কি করে ইতিহাসের সংগ্রাম, সাধনা এবং নির্মিত আধুনিক জীবনবোধের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়, জেনেছিলাম সময় একটি অফুরন্ত অনুজ্ঞা যার কোন স্থিতি নেই অথচ যার কোনও বিনিঃশেষ নেই। একটি প্রবল সময়ের প্রবাহে সর্বকালের চৈতন্যকে স্পর্শ করেই একজন কবি তার বর্তমানকে প্রাণবন্ত করেন। আমি ক্রমান্বয়ে বিশ্বাস ও প্রত্যয়কে নতুন করে আবিষ্কার করলাম।

ক্লেয়ার বলতেন, পৃথিবীর সকল কিছুর মধ্যে প্রেমই হচ্ছে চরমতম আনন্দ অথবা বেদনা। তাই কবিতার প্রেমের তাৎপর্য অন্বেষণ করতে হয়, প্রেমের শোভা ও বৈচিত্র্য

www.pathagar.com

সন্ধান করতে হয়। আমি কবিতার পরিধিকে অস্তিত্বের তাৎপর্য প্রেমের বৈভবেই ধরা পড়ে। কখনও আশা কখনও হতাশ্বাস, কখনও দারিদ্র্য, কখনও ঐশ্বর্য, কখনও সংগ্রাম, কখনও পরাভব, কখনও শ্রেণীস্বার্থ কখনও মানবিক সহমর্মিতা সমস্ত কিছুই প্রেমকে প্রস্তাবিত করেই কবিতায় রূপ লাভ করে। শুনেছি প্রাচ্যে নাকি ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগকে পুরুষ ও রমণীর দেহ সঙ্গতি ও অভিসারকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে।

ক্লেয়ার ইভানের উদাহরণ দিতেন, বলতেন, 'ইভান' তার জীবনের সমস্ত সমস্যার সূত্রে রমণী প্রেমকে টেনে এনেছে বারবার। বাস্তবের সঙ্গে তার সম্পর্কের মাধুর্য রমণীই ঘটিয়েছে এবং রমণীই ছিল তার জীবনযাপনের একমাত্র অচঞ্চল উপকরণ। ক্লেয়ার ইংরেজীতে বলেছিলেন, 'দি স্ট্যাবল এলিমেন্ট ইন হিজ লাইফ। আমি এটাই বাংলাতে বললাম "তার জীবন-যাপনের একমাত্র অচঞ্চল উপকরণ।' আমি অর্থের কিছুটা প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছি কেননা বিভিন্ন সময়ে ক্লেয়ারের সঙ্গে আলোচনাক্রমে যতটা আমি বুঝেছি তাতে একমাত্র কথাটি যোগ করলে অন্যায় হয় না।

ক্লেয়ার ইভানের স্মৃতিকে তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন করে অনেক দিন বেঁচে ছিলেন। ইভানের মৃত্যু হয় ১৯৫০ সালে, ক্লেয়ারের জীবনাবসান ঘটে ১৯৭৮ সালে। এ দীর্ঘকাল তিনি ইভানের কবিতাকে পৃথিবীর সর্বত্র আলোচিত এবং সম্মানিত করবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ইভানকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল প্যারিসের প্রসিদ্ধ সমাধিক্ষেত্র পেরে লাশেইজ-এ ফ্রান্সের বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী ও সাহিত্যিক এখানে শায়িত আছেন, যেমন লোপা, দেলাক্রোয়ে, বালজার্ক, সারা বানহার্ড। লোপার কবরের পাশেই ইভানের কবর। আমি ক্লেয়ারের সঙ্গে এ সমাধি ক্ষেত্রে বেড়াতে এসেছিলাম। তখন ক্লেয়ার থাকতেন র‍্যু ভানুতে একটি অ্যাপার্টমেন্টে। ক্লেয়ারের ঘরের জানালা খুললে কবরটি দেখা যেত। ভিক্টর হিউগো বলেছিলেন যে এখানে সমাধিস্থ হবার অর্থ মৃত্যুর পরও ঐশ্বর্যের দ্বারা আবরিত থাকা। সমাধি ক্ষেত্রে সারি সারি একেশিয়া ও পপলার গাছ এবং এরই মধ্যে বিন্যস্ত রয়েছে কবরগুলো। সমাধিক্ষেত্রের চ্যাপেসি থেকে সমগ্র এলাকাটি মনোমুগ্ধকর মনে হয়। একটি শান্ত গম্ভীর নির্জনতার সময় যেন এখানে স্তব্ধ হয়ে আছে। যখন একটু বাতাস প্রবাহিত হয় তখন পপলার একেশিয়ার পাতা নড়ার শব্দ শোনা যায়।

ক্লেয়ার বলেছিলেন একদিন, "ফরাসীরা প্রেম এবং মৃত্যুকে একই সঙ্গে উচ্চারণ করে। মৃত্যু যেহেতু জীবনের সঙ্গে একটি বিচ্ছেদ রচনা করে সেহেতু প্রেমের উজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদের ভয়টিও মনে জাগে। ইভানের প্রেমের কবিতায় একটি অধ্যায় মৃত্যুকে নিয়ে আমাদের সম্মিলিত প্রেমের কবিতাগুলো তিনটি ভাগে বিভক্ত। পরে সবগুলোকে একত্র করে প্রকাশ করি 'পয়েমস দ্য আমুর' নামে ফরাসী ভাষায় 'আমুর' একটি বিস্ময়কর শব্দ– 'এর অর্থ শুধু প্রেম এই একই সঙ্গে স্নায়ু চৈতন্য, মাধুর্য, লীলা বিলাস ও আনন্দ। আমরা জীবনের সর্ব অবস্থাকে গ্রাহ্য করি, মৃত্যুকেও।'

আমি বলেছিলাম, 'সংস্কৃতে 'রতি' বলে একটি শব্দ আছে, যার অর্থ অবিকল 'আমুর'-এর মতো। রতি একই সঙ্গে যৌনতা, প্রেম, স্বপ্নাচ্ছন্নতা এবং আনন্দ। এ শব্দের মধ্যে অশুভ এবং অশ্লীল কিছু নেই।'

www.pathagar.com

ক্লেয়ার বলেছিলেন 'আমি একটি সংস্কৃত কাব্যের ফরাসী অনুবাদ পড়েছিলাম 'চৌর' নামে। খুবই সুন্দর। তুমি সে কাব্যের কথা জান?'

আমি প্রথমে 'চৌর' কথাটি বুঝিনি, পরে জেনেছি একাদশ শতকের কাশ্মীরী কবি বিলহন রচিত বিলহন চরিত্র থেকে অংশবিশেষ নিয়ে চৌর কাব্য নামে ফরাসীতে অনুবাদ হয়েছে। ক্লেয়ার এ কাব্যের কথাই বলেছিলেন। গল্পাংশটি নিম্নরূপ ঃ মহিলপত্তন দেশের নৃপতি বীর সিংহের কন্যা শশিকলা। রাজদরবারের কবি ছিলেন বিলহন। শশিকলার সঙ্গে বিলহনের প্রণয় হয়, এবং নিশাযোগে তস্করের মত গোপনে বিলহন শশিকলার শয়নকক্ষে তার সঙ্গে মিলিত হয়। এ ঘটনা একদিন প্রহরীর দৃষ্টিতে পড়ে এবং নৃপতি সকল ঘটনা জানতে পারেন। বিলহন বন্দী হয় এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দণ্ড কার্যকর হয়নি এবং বিলহন মুক্ত হয়ে রাজকন্যাকে বিলহনের ক্ষেদোক্তি অসাধারণ সুন্দর ঃ 'আজ আমি সুবর্ণ চুম্পক মালার মতো গৌরী ফুল্ল কমলমুখী, নবীণ রোমপংক্তি যুক্ত কাম বিহ্বলা বিদ্যাধরীর কথা চিন্তা করছি। অন্যত্র বলছে– 'হে কৃষ্ণ নেত্রযুগলের অধিকারিণী যদি তোমার জন্য আমার শিরশ্ছেদ ঘটে, ঘটুক। সীতার জন্য দশাননের দশটি আননইতো নষ্ট হয়েছিল। এখানে প্রেম এবং মৃত্যু একই সঙ্গে উচ্চারিত।

ইভান গলের কবিতার বিষয় ছিল মূলতঃ দুটি, প্রেম এবং মৃত্যু। একটি ট্রাজিক অনুভূতির কারণে প্রেম এবং মৃত্যু একাকার হয়েছে। এমন এক ব্যক্তির কথা ইভানের কবিতায় উদ্ভাবিত হয়েছে যার কোনও আশা নেই, মধ্যবিত্ত জীবনের বিশ্বাসের ভ্রান্তি নেই, বিস্ময়বোধের অবলম্বন নেই–এক প্রকার রোমান্টিক নিহিলিজমএ যে আক্রান্ত। মূলত ইভান গল তাঁর সময়কালের সমস্যার প্রতিনিধি ছিলেন এবং সেসব সমস্যাকে ব্যক্তিগত সমস্যার সঙ্গে সমন্বিত করে উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সমাধির পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কিউনারাল ওরেশনে জুল রোমে এ কথাই বলেছিলেন ঃ ক্লেয়ারের কাছ থেকে তারিখটা জেনেছিলাম, ২রা মার্চ ১৯৫০।

বিশ শতকের শুরু থেকেই শিল্পকলায় এবং কবিতায় বিভিন্ন প্রকারের বিশ্বাস এবং মতবাদ গড়ে ওঠে। মূলত ইমপ্রেশনিজম এবং প্রতীকবাদের বিরুদ্ধেই প্রধান মতবাদগুলো গড়ে উঠেছিলো, সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও রাজনীতিতে বিশৃংখলা এবং কর্মের দায়ভাগে আদর্শের অভাব শিল্পী ও কবিদের মনে ক্ষোভ এবং অস্থিরতা এনেছিল। জার্মেনীতে অভিব্যক্তিবাদীরা অনেকদিন থেকেই শিল্পের জন্য নতুন প্রকাশভঙ্গী সৃষ্টির কাজে তৎপর ছিল। তাদের মূললক্ষ্য ছিল সকল কিছুর অন্তর্নিহিত স্বভাব আবিষ্কার করা। কিন্তু কবিতায় অভিব্যক্তিবাদী বা এক্সপ্রেসনিজমের প্রথম প্রকাশ ১৯১৩ সালে। ইটালীতে মারিনেত্তি ভবিষ্যৎবাদ বা ফিউচারিজম প্রবর্তন করেন ১৯০৮ সালে।

একই সময়ে ফ্রান্সে চিত্রকর্মে ফিউচারিজম এর আদর্শের প্রকাশ ঘটেছে। একই সঙ্গে ইংল্যান্ডে রূপবাদী বা ইমেজিস্টরা কাব্যকর্মে নতুন সম্ভাবনার কথা ভাবছিল। ১৯২০ সালের দাদাবাদের প্রতিষ্ঠায় শিল্প ও কাব্যকর্মে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে –দাদাবাদ সকল প্রকার বিশ্বাস ব্যাকুলতা এবং শৃংখলার নির্বাসন চায় ঃ যেহেতু যুদ্ধের পর জীবনে কোথাও সমগ্রর স্বাদ নেই, সদিচ্ছার আগ্রহ নেই, সুতরাং স্বস্তির বৈভবকে বিনষ্ট করতে হবে। দাদাবাদ কিন্তু প্রলম্বিত হয়নি, নতুন সৌষ্ঠবের কামনায় শিল্পী সম্প্রদায় পরাবাস্তববাদের জন্ম

www.pathagar.com

দিয়েছে। মূলত এ সমস্ত আন্দোলন ছিল কবিতাকে ছন্দ ও সুরের প্রথাগত সম্মোহন থেকে মুক্ত করা এবং চিত্রকর্মকে ললিত বিন্যাস ও রং-এর মুগ্ধতা থেকে মুক্ত করা। কবিতায় আরও একটি জিনিস লক্ষ্যগোচর হল, তা হচ্ছে ইংরেজীতে যাকে বলে অকাল্টটিজম এক প্রকার ঐন্দ্রজালিকতা নির্মাণের চেষ্টা চলল বাস্তবকে স্বল্পমূল্য দিয়ে। অর্থাৎ অভিচার, সম্মোহন যা ছিলো আদিম মানুষের বিশ্বাস ও কুশলতার সঞ্চয় এবং যা এখনও আফ্রিকার অনেক অঞ্চলে জীবনের সমস্যা সমাধানের উপকরণ। কবিতা তাকেই স্বাগত করলেন। ডি এইচ লরেন্স একেই বলেছেন আদিম মৌলিক শুচিতা। এ সমস্ত কিছুই ছিলো বাস্তবের মূল্য নির্ধারণের জন্য এবং বাস্তবের সত্তার গভীরে প্রবেশের জন্য।

১৯২০ সালে কুর্ট পিনথুস অভিব্যক্তিবাদের একটি ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন 'মানবগোষ্ঠীর গোধূলি' নামক সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায়। তিনি বলেন যে অভিব্যক্তিবাদীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান সময়ের বিস্ফোরণোন্মুখ বিক্ষুব্ধ এবং সংকটের সমগ্রতাকে প্রকাশ করা সভ্যতার ধ্বংসলীলার বিপর্যস্ত ঝংকার এক প্রকার ব্যঙ্গ এবং বিকারের আকৃতিতে চিত্রকলায় অভিব্যক্তি পেল, তেমনি কবিতাতেও।

ক্লেয়ার বলেছিলেন, 'ইভান পুরোপুরি এ ব্যাখ্যাটি মেনে নিতে পারে নি। শিল্পের জন্যই শিল্প এ তত্ত্বকে সে মানত না। সে বলত যে অভিব্যক্তিবাদ একটি অভিজ্ঞতা হিসাবে শিল্পের আকর কিন্তু একান্ত কোনও শিল্পভঙ্গী নয়। বুদ্ধি এবং যুক্তির সাহায্যে এর বিকাশ ঘটেছে, ব্যক্তিগত ফ্যাসি এর উপপাদ্য নয়।'

অভিব্যক্তিবাদীদের অনেকে কবিতায় রাজনীতি এনেছিলেন পৃথিবীর জন্য নতুন বিশ্বাস এবং সান্ত্বনার আশ্রয় হিসাবে। এভাবেই দেখি কার্ল ওটেন নামক একজন কবি সামাজিক বিপ্লবের কথা বলছেন। ইভান গল তাঁর একটি উপন্যাসে রাজনীতি এনেছেন ঠিকই এবং জাঁ সাঁ তেরে কাব্যে পৃথিবীর রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা এসেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইভান ব্যক্তিগত উদ্বেগ নিয়েই বেশি বিচলিত ছিলেন। জার্মান ভাষায় লেখা তাঁর এ সময়কার একটি কবিতায় ব্যক্তিগত উদ্বেগ একটি ভাব প্রকল্পের উন্মেষ ঘটিয়েছে। কবিতাটির নাম ওআলড অর্থাৎ বনভূমি। কবিতাটির প্রথম চরণের অংশবিশেষের অনুবাদ দিচ্ছি–'আমি দুজন একে অন্যের চক্ষুর সাহায্যে একে অন্যকে আলোকিত করি এবং উচ্ছলতায় উদ্ভাসিত হই। ......মধুর সন্ধ্যায় স্বর্ণাভ চাঞ্চল্য ঝরে পড়ে, সূর্যের শেষ রশ্মি সিঁড়ি বেয়ে রক্তিম ব্যস্ততায় দোদুল্যমান হয় এবং পরীরা তাদের রূপালী শরীর নিয়ে তোমার নৌকোয় হাল ধরে থাকে।

এ প্রকৃতির কল্পনায় অভিচার কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি উচ্চাশা এবং সর্বনাশের জন্ম দিচ্ছে : হয়ত কোথাও একজন মানুষ জানালা দিয়ে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল একটি নক্ষত্র ধরবার ব্যাকুলতায়, কিন্তু পারল না, সরে গেল।

॥১৩॥

ক্লেয়ার বললেন, 'আমার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল অনেকের–মায়কোভস্কি, মার্ক শাগাল, আঁদ্রে মালরো, ইভান গল, কিন্তু আমরা সবাই ছিলাম একটি ললিতবৃত্তের আনন্দের মধ্যে। আমাদের মধ্যে ঈর্ষা ছিল না। একদিন সকলের মধ্য থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিল ইভান গল তার পরাবাস্তব এবং ভবিষ্যতবাদের রূপব্যঞ্জনার মধ্যে। তার পর

www.pathagar.com

থেকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ইভানের। তুমিতো দেখলে কত বিশেষ্যরূপে কত বিশেষণের অলঙ্কারে কত অলৌকিক উপমায় সে আমাকে বরণ করেছে। ১৯৫০ সালে ইভানের মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার শরীরে কোনও পুরুষের স্পর্শ লাগে নি। আমি ইভানের স্পর্শের স্বাদ নিয়ে আজও বেঁচে আছি।'

মায়াকোভস্কি ও ইভান সমবয়সী ছিলেন। মায়াকোভস্কি তীব্র আবেগময় প্রেমের কবিতায় একটি অসহায়তা ও বঞ্চনার বেদনা আছে। এ অসহায়তা ও বঞ্চনা ক্লেয়ারের জন্য কি? ১৯৩০ সালে মায়াকোভস্কি আত্মহত্যা করেন। মায়াকোভস্কি তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন 'যখন একটি ষাঁড় কঠিন পরিশ্রমে ক্লান্ত হয় সে শুয়ে পড়ে ঠাণ্ডা পানিতে। কিন্তু তোমার প্রেম ছাড়া আমার জন্য অন্য কোন সাগর নেই। আমি অশ্রুপাত করেও তোমার প্রেম থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছি না। যখন একটি ক্লান্ত হাতি বিশ্রাম চায় সে সম্রাটের মত শুয়ে পড়ে গরম বালুতে। কিন্তু তোমার প্রেম ছাড়া আমার জন্য কোনও সূর্য নেই। আমি জানি না তুমি কোথায় কার সঙ্গে সময় যাপন করছ।'

দুপুরে ক্লেয়ারের সঙ্গে খেলাম। আমাকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলের কাছ থেকে কিছু খাদ্যসামগ্রী কিনলেন–একটি মুরগী, পনীর, রুটি, এক বোতল শেরী, এক বোতল মোজেল ওয়াইন, এক বোতল পেরিয়ার বা মিনারেল ওয়াটার। ক্লেয়ারের নির্দেশে মুরগীটি আমিই রান্না করলাম। ক্লেয়ারের সুইটে দুটি ঘর– একটি বসবার, একটি শোবার। শোবার ঘরে কাবার্ড এবং কিচেনে বেঞ্জ আছে। ক্লেয়ারের নির্দেশে ধারালো সরু ছুরি দিয়ে মুরগীর গায়ে ফুটো করে প্রতিটি ফুটোর মধ্যে একটি রসুনের কোয়া ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর শুকনো আদার গুঁড়ো লবণ এবং পানির সঙ্গে মিশিয়ে মুরগীর সারা গায়ে মাখানো হল। কিছুক্ষণ এ অবস্থায় মুরগীটিকে রেখে দেয়া হল তারপর ফ্রাই প্যানে মার্জারিন দিয়ে অল্প আঁচে ভাজা হল। রান্নার কথাগুলো না বললেও হয়তো হোত কিন্তু ফরাসী সংস্কৃতির একটি প্রধান দিক হচ্ছে সুখাদ্যের প্রতি আসক্তি। বিচিত্র রন্ধন কৌশল জানে ফরাসীরা এবং স্বাদে গন্ধে ও পরিবেশনায় খাদ্যসামগ্রীর প্রতি মানুষকে তীব্রভাবে রসনালোলুপ করে তোলে। খাবার শেষে ক্লেয়ার একটি প্লেটে করে কয়েক রকমের ফ্রোমাজ বা পনীর সাজিয়ে আমার সামনে রাখলেন। যেমন বন্ধনবৈচিত্র্যে তেমনি পনীরের ইতিহাসে ফরাসী কুশলতার অন্ত নেই। দক্ষিণ ফ্রান্সের রকফোর্ড অঞ্চলের পনীর তো বিশ্ববিখ্যাত।

বিকেলে ক্লেয়ারের সঙ্গে গেলাম লা জারদিঁ দ্য প্লঁৎ নামক বোটানিকাল গার্ডেনে। এখানে একটি চিড়িয়াখানাও আছে। বাগানটি খুব প্রাচীন ১৬৫০ খৃস্টাব্দে এটি প্রথম জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত করা হয়। সে বছর বাগানে ছিল আড়াই হাজার দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষ। এখন তো আরও অনেক। কম্পমান ছায়া, ঝরাপাতার শব্দ, পাখীর কোলাহল এবং ঘাস ও মাটির গন্ধ বাগানটিকে একটি বিশেষ ধরনের সমৃদ্ধি দিয়েছে। জারদি দ্য প্লঁৎ এ চিড়িয়াখানার দালানের ঠিক পিছনে একটি সুন্দর মসজিদ বাগানের শোভা বর্ধন করেছে। নির্মাণ পদ্ধতিতে মরক্কোর স্থাপত্য নিদর্শন দেখা যায়। মসজিদের সঙ্গে একটি রেস্তরাঁ আছে সেখানে অনেকেই আসেন মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ধরনের খাবারের স্বাদ নিতে।

ক্লেয়ার মসজিদকে বলছিলেন টেম্পল। আমি সংশোধন করে বললাম, 'আমরা টেম্পল শব্দটি মসজিদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি না। টেম্পলে মূর্তি থাকে কিন্তু মসজিদে সেসব থাকে না।'

www.pathagar.com

ক্লেয়ার প্রশ্ন করলেন তোমার মুসলিম বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্যতা কি?

আমি বললাম, 'এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়-পরিচ্ছন্নতা। কর্মে ও সাধনায় চিন্তায় ও বিশ্বাসে, মানবিক সম্পর্কে বিশুদ্ধ হওয়া।'

ক্লেয়ার বললেন, খুব সুন্দর কথা। সকল ধর্মবিশ্বাসীই বিশুদ্ধতার কথা বলেন কিন্তু বিশুদ্ধতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রক্রিয়াগত যে সমস্ত পার্থক্য বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে সেসব পার্থক্যের জন্যই যুগে যুগে কোলাহল ও সংকটের চিত্রপট অনবরত উন্মোচিত হতে দেখি। ইভান প্রথাগত ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। সে চেয়েছে আদিম মানুষের নিষ্কলুষতা তাদের সহজ বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত অবিচার ও সম্মোহন।

কিন্তু আমরা বর্তমানের বিজ্ঞানের এমন এক জগতে বাস করি যেখানে সব কিছুই অস্বাভাবিক এবং সহজ উন্মেষের পরিপন্থী। আমাদের জীবন যাপনের রীতিপ্রকৃতির মধ্যে আড়ম্বর এবং প্রাচুর্যের আচ্ছন্নতা এতটা সম্পূর্ণ এবং ব্যাপক যে আমাদের পক্ষে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করাই অসম্ভব কিন্তু তোমার কথায় মনে হচ্ছে ইভান বর্তমান সভ্যতার মধ্যে বাস করেও সভ্যতার শাসন থেকে মুক্ত একটি আদিম চিত্তকে উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছিলেন চিত্রকর্মে যেমন পিকাসো, ক্লী, মাতিস আদিম গুহার অনুভূতিকে বর্তমান সভ্যতার গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে এনেছেন, তেমনি ইভান প্রাগৈতিহাসিক চৈতন্যকে বিশেষ করে অভিচার ও মন্ত্রের চৈতন্যকে কাব্যের লোকাতীত ব্যঞ্জনার মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।'

ক্লেয়ার মাথা নেড়ে সমর্থন জানালেন। ধীরে ধীরে বললেন অনেকটা স্বগতোক্তির মতো, ইভান বলত যেমন রাত্রিবেলা ঘন বনানীর মধ্যে চলতে গেলে মনে হয় তারার আলো বারবার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, বর্তমান সভ্যতা তেমনি মানুষকে পরিচ্ছন্ন থাকতে দিচ্ছে না। আকাঙ্ক্ষা ও কর্মের বাধ্যবাধকতায় আমরা সত্যকে পাই না। ইভানের ভাষায় সত্য হচ্ছে এক প্রকার পরিচ্ছন্ন শীতলতা।

প্যারিসের কয়েকটি অঞ্চলের ছবি যখন চোখে ভাসে তখন ক্লেয়ারের কথা খুব মনে পড়ে। সেদিন অপরাহ্নে পায়ে হেঁটে হেঁটে আমরা জারদি দ্য প্লঁৎ-এ অনেকক্ষণ কাটিয়েছিলাম। আমি আর একটি অঞ্চলে ক্লেয়ারের সঙ্গে ঘুরেছি সেটা হচ্ছে বুলভার্দ সাঁ মিনোলা। এটি একটি প্রাণবন্ত অঞ্চল সীন নদী থেকে দক্ষিণে বুলভার্দ মঁপারনাসের সঙ্গে মিশেছে। এখানকার পায়ে হাঁটার পথে অথবা জনাকীর্ণ কাফেতে অফুরন্ত উজ্জ্বলতার উৎস। আবার পুরনো বইয়ের দোকানেও লোকের ভীড়। এখানে একটি পুরনো বইয়ের দোকানে ক্লেয়ার পরিচয় করিয়ে দিলেন মাদাম গেইত ফ্রোজের সঙ্গে। মহিলাটি বোহমিয়ান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মমতাময়ী বন্ধু। আমরা যখন দোকানে এলাম তখন সেখানে বেচাকেনা দেখলাম না কিছু। কয়েকজন যুবক গল্পগুজব করছে এবং মাদাম ফ্রোজ চা পরিবেশন করছেন। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, ঘরের ভিতরে তামাকের ধোঁয়া-দুটো মিলে জানালার কাছে এক ধরনের কুয়াশা সৃষ্ট হয়েছে। হেমিংওয়ে সাঁ মিশেলের একটি কাফে সম্পর্কে বলেছেন, 'এখানে এলেই আমার মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, আমি আনন্দিত হই এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পনা নিতে থাকি। তার ভাষায় এমটি ফিলিং আর থাকে না, এ কথাটা অত্যন্ত সত্য।

www.pathagar.com

ফ্রান্সে যারা এসেছেন, বিশেষ করে প্যারিসে তাদের একজনের অভিজ্ঞতা অন্যজনের অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন। প্যারিসে বসবাসের আমার যে স্মৃতি তার সঙ্গে অন্যের স্মৃতির সঞ্চয়ের মিল নেই। প্রত্যেকের অভিজ্ঞতাই অনন্য। আমি যে প্যারিস দেখেছি উমাশংকর যোশী তা দেখেনি, প্রভাকর পাধ্যায় আবার অন্য অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে গেছে। প্যারিসের সঙ্গে সকলেরই শুভ সম্ভাষণ ঘটেছে।

১৯৫৯ সালে দ্বিতীয়বার প্যারিসে কিছুদিন ছিলাম। ক্লেয়ার তখন হোটেল ছেড়ে রুয় ভানুতে একটি এপার্টমেন্ট নিয়েছেন পাঁচতলায়। প্রথম সাক্ষাতে ক্লেয়ারের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম পোয়েমস দ্য আমূর-এর অনুবাদ করবো বাংলাতে। ১৯৫৮ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে অনুবাদটি প্রকাশিত হয়। ইভানের কবিতাংশ আমি অনুবাদ করেছিলাম। ক্লেয়ারের সম্ভাষণের অনুবাদ করেছিলেন সৈয়দ আলী আশরাফ। ক্লেয়ারকে লক্ষ্য করে ইভান লিখেছিলেন ঃ

'তারা সব বিরাট চলিষ্ণু হাহাকার / তারা চিন্তাতাপিত মেঘ / তারা সাব-ওয়ের জানালায় দেখা স্বপ্ন / তারা তুষার গরম হাতের ছোঁয়া লেগে গলে যায় / তারা বাগানের বেড়ার বাইরের গোলাপ গাছ / তারা বৃষ্টি সন্ধ্যার বেদনা / তারা এসেছে প্রাচীন ভারত থেকে / অথবা ভেগা থেকে / তারা অর্থাৎ মেয়েরা / কিন্তু আমি তোমাকে কি করে বর্ণনা করি / তুমি-যে আমার সর্বস্ব / এবং যাকে না পেলে সব কিছু মিথ্যে হয়ে যায়।' /

ক্লেয়ারকে দেখি আমি তাঁর জীবনের অপরাহ্নে কিন্তু তখনও সূর্যের অন্তরালের মতো তাঁর দৃষ্টিতে এবং কথা বলায় সৌন্দর্যের সাড়া ছিল। ইভান লিখেছিলেন যে ক্লেয়ারের হাসি 'আমার গোধূমচূর্ণ' এবং তার কথা 'আমার প্রতিদিনের রুটি'। ক্লেয়ারের নীল চোখের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তার যৌবনকালের উচ্ছলতার কথা কল্পনা করা যায়। বইটি পেয়ে ক্লেয়ার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন 'আমি খুব খুশী হয়েছি। ইভানও খুশী হয়েছে।'

আমি বললাম, 'ইভান খুশী হয়েছে একথা কি বলা যায়?'

ক্লেয়ার বললেন কেন যাবে না? আমার মধ্যেই তো ইভান আছে। কবিতা অনুবাদ করলে আর এটুকু বুঝলে না। ইভান আমার ওষ্ঠে হেলান দিয়ে দেবতাদের স্বাগত শুনেছে আবার কখনও আমার চোখে হেলান দিয়ে পিছনে দেখেছে বাণীর উন্মেষ। আমাকে সে ভালোবেসেছিল যখন পাহাড়ের নিচের দামী পাথরগুলো ছিল সকালবেলার কম্পমান আলো। এভাবেই আমরা একাত্ম হয়েছিলাম। আমার এবং ইভানের পদচিহ্ন এক হয়ে গিয়েছিল। বিনিঃশেষ বিন্দুতে। এখন আমি ও ইভান অভিন্ন।

আমি তন্ময় হয়ে শুনছিলাম, ইভানের ভাষায় বার্চের শাখায় পাখীর কলকণ্ঠের মতো ক্লেয়ারের কণ্ঠস্বর।

আনন্দ প্রকাশ, উচ্ছ্বাস এবং সম্ভাষণের শেষে ক্লেয়ার আমাকে তার শোবার ঘরে নিয়ে বসালেন। ক্লেয়ারকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন। হঠাৎ তাঁর পায়ের দিকে নজর পড়ল হাল্কা এবং ধবধবে সাদা রক্ত নেই মনে হয়। আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে ক্লেয়ার বললেন ইভান আমার পায়ে আদর করে হাত বুলিয়ে দিত। মৃত্যুর আগে সে বলেছিল ঃ আমার দুঃখ হয় আমার মৃত্যুর পর তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দেবার কেউ থাকল না। আসল কথা কি জান, জান দু পায়ের পাতায় একটি অস্বস্তিবোধ আছে, একবার অপারেশনও করা হয়েছিল কিন্তু কোন উপকার হয় নি।

www.pathagar.com

॥১৪॥

(ক)

বহু আগে ১১১৫ সালে প্যারিসে সীন নদীর পূর্ব প্রান্তে কবি পিটার ড্যাবেলার্ড বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে যুক্তিতে আমি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে প্যারিসে উপস্থিত হলাম সে যুক্তিকে আমি ব্যাখ্যা করতে পারি মমতা এবং বিনয় বলে।' তিনি বলতেন যে যথার্থ জ্ঞানের জন্য যুক্তি এবং যুক্তির সঙ্গে আনন্দ অপরিহার্য। তিনি বলতেন, মানুষ চিন্তার সাহায্যে যেভাবে সত্যকে স্পর্শ করতে পারে এবং যুক্তির সাহায্যে যেভাবে বিনয়কে প্রতিষ্ঠা করতে পারে অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় তা পারে না। তার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তখন নতসরদম গির্জার কেনন ফুলবার্ড তার এক আত্মীয়াকে এ্যাবেলার্ডের ছাত্রী করলেন। এ্যাবেলার্ড আনন্দের সঙ্গে এই ছাত্রীর প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ছাত্রীর নাম ছিল হেলোয়িস। হেলোয়িস ছিল সুন্দরী, চতুর এবং মর্মজ্ঞ। সে শুনতে ভালবাসতো এবং যা শুনতো তা স্মরণ রাখত। এ্যাবেলার্ডের কাছে তার শিক্ষা পরিপূর্ণ হয়েছিল। এ্যাবেলার্ডের কাছে হেলোয়িস এ্যারিস্টলের তত্ত্বকথা শুনেছে এবং খৃস্টান ধর্মগ্রন্থে মানব প্রেমের উল্লেখযোগ্য কাহিনী শুনে আনন্দিত হয়েছে। কিন্তু নৈকট্য প্রেমের অগ্নিদাহন সৃষ্টি করে, তাই এ্যাবেলার্ড এবং হেলোয়িসের মূলে প্রেমের আভরণ তৈরি হয়েছিল। সমগ্র প্যারিস শহর এদের প্রণয়ে গুঞ্জরিত হতে লাগল। এ্যাবেলার্ডের প্রতি অনেকেই ঈর্ষিত হলেন। এ্যাবেলার্ড বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'যদি কেউ আমার মত প্রেমের গভীরে প্রবেশ করতে পারে তাহলেই বুঝতে পারবে যে প্রেম থেকে সঙ্গীতের জন্ম হয় এবং সে সঙ্গীত পৃথিবীকে আন্দোলিত করে এবং পরিচ্ছন্ন করে।

এ্যাবেলার্ড হেলোয়িসকে নিয়ে পালিয়ে যান, গোপনে তারা বিবাহ করেন এবং তাদের একটি সন্তান হয়। ক্যানন ফুলবার্ড এতটা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি প্রতিশোধ নেবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। শংকাকুল প্যারিসের জনসাধারণ এই প্রতিশোধের কথা শুনল। ক্যানন ফুলবার্ড হেলোয়িসের মস্তকে আবরণ দিলেন এবং তাকে একটি নাগরীতে চিরকালের জন্য আবদ্ধ করলেন। নাগরী হচ্ছে যেখানে ধর্মসাধিকারা পার্থিব আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বর প্রেমে আত্মবিলুপ্তির চেষ্টা করে। এ্যাবেলার্ডও সাংসারিক জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে গির্জার চত্বরে নির্জন জীবনের উপাসনা আরম্ভ করলেন।

ইংরেজ কবি আলেকজান্ডার পোপ এ কাহিনী অবলম্বন করে একটি প্রণয় গাঁথা রচনা করেছিলেন। তার গাঁথায় হেলোয়িস স্বাগত উক্তি করছে ঃ প্রেমের উষ্ণতা নিয়ে শরীরের জীর্ণতা সয়ে / নির্জন প্রকোষ্ঠে আমি দিবারাত্র প্রহর হারাই। / তবুও যখন আমি বেদীর সম্মুখে গিয়ে / যীশুকে দেখতে গিয়ে দেখি তোমাকেই / তোমার নামের শব্দে নিঃশ্বাসের দুঃখ নামে / তোমার ছবিটি ভাসে ঈশ্বরের ছবির উপর।/

এ্যাবেলার্ডের মৃত্যু হয় ১১৪২ খ্রীস্টাব্দে। হেলোয়িস তখন যীশুর সেবিকা হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি এ্যাবেলার্ডের মৃতদেহকে তার কনভেন্টে নিয়ে আসেন এবং সেখানে সমাধিস্থ করেন। হেলোয়িসের মৃত্যু হয় ১১৬৪ খ্রীস্টাব্দে। তাকেও

www.pathagar.com

সমাধিস্থ করা হয় এ্যাবেলার্ডের পাশে। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে এদের উভয়ের কবর প্যারিসে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে একটি মুসোলিয়াম তৈরি করা হয়। এদের প্রণয় কাহিনী পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কাব্যের উপকরণ হয়েছে। ফরাসী স্পীনাস এবং ইংরেজী সব ভাষাতেই এদের প্রণয় গাঁথা চিরদিন মর্মরিত এবং গুঞ্জরিত হচ্ছে। এখনো প্যারিস শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলে এসব লোকগাথা গাওয়া হয় এবং জনসাধারণ উন্মুক্ত আগ্রহে তা শোনে এবং আনন্দিত হয়। আমি একবার সাঁ লিসে গিয়েছিলাম। সাঁ-লিস প্যারিসের দক্ষিণ দিকে একটি পুরনো শহর। এখানে জোয়ান অব আর্ক শেষ বারের মত ইংরেজ বাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিলেন। এ শহরে বাড়িঘরের চাইতে উন্মুক্ত প্রান্তরের সংখ্যাই বেশি। সেখানে গ্রীষ্মকালে নানারকম ফুল ফুটে থাকে। কত বিচিত্র রংয়ের যে দৃষ্টি তা ব্যাখ্যা করতে পারে না। বিধাতার আশ্চর্য কারুকর্মে রঙের বিচিত্র বর্ণবিন্যাসে একটি শোভমান প্রদর্শনী গড়ে ওঠে। এখানকার লোকেরাও প্রেমের কথা বলে এবং এ্যাবেলার্ডের প্রেমের কথা বলে।

সেই সুদূর অতীতে প্যারিস শহর প্রেমের জন্য বিখ্যাত হয়েছিল। এই প্রেমের সম্ভ্রম এবং অভিনন্দন নিয়ে ১১৮০ সালে সিংহাসনে বসেছিলেন ফিলিপ অগাস্ট। তিনি যেমন প্রেমিক ছিলেন তেমনি সৌন্দর্য পিপাসু আনন্দের প্রত্যাশী পুরুষ ছিলেন। তিনি বললেন যে প্যারিস শহর এ্যাবেলার্ডের প্রেমে ধন্য হয়েছে সে শহরকে আমি মহিমান্বিত করব। রাত্রিতে তাকে আমি আলোকিত করব, ঝর্ণার কলোচ্ছ্বাসে তাকে মুখরিত করব এবং লতাগুল্মের বিলসিত বিস্তারে তাকে উজ্জ্বল করব। সম্রাটের প্রধান কর্মই হল প্যারিস শহরকে শোভমান করা। প্লান্টাজেনেটদের সঙ্গে তার যুদ্ধ চলছিল, সেই যুদ্ধ বিজয়ী হয়ে তিনি তার সর্বস্ব যেন সমর্পণ করলেন প্যারিসের শোভা বর্ধনের জন্য। মানুষ তার প্রেয়সীকে যেভাবে সর্বহৃদয় দিয়ে ভালোবাসে ফিলিপ প্যারিস শহরকে তেমনি সর্বহৃদয় দিয়ে ভালোবেসে ছিলেন। রাজধানীকে কেন্দ্র করে তার চতুর্দিকে একটি দুর্ভেদ্য বেষ্টনি তিনি নির্মাণ করলেন। বেষ্টনির আকৃতি ছিল হৃৎপিণ্ডের মত। অর্থাৎ একই সঙ্গে তিনি হৃদয়কে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করলেন আবার নগর রক্ষারও ব্যবস্থা করলেন। তার সময়কালের সেই বেষ্টনি এখন আর নেই। এখন বিদেশীদের কাছে স্থানীয় লোকেরা এই প্রাচীন ইতিহাসগুলো কখনো কখনো বলে। যেখানে সেনারা এসে তাঁবু পেতেছিল তারই নিকটে ফিলিপ এক বিপুল দুর্গ নির্মাণ করলেন। বহু সময় অতিক্রান্ত হবার পর এই দুর্গ আজ লুর্ভ মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। ফিলিপের রাজত্বকালে প্যারিসের বিখ্যাত নতরদম গির্জার গথিক স্তম্ভগুলো নির্মিত হয়। নতরদম গির্জা ১৩৪৫ সালে পুরোপুরি গড়ে ওঠে। ভিক্টর হিউগো এই গির্জাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে এটা হচ্ছে সুরারোপিত প্রস্তরের বিন্যাস। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বহু সুরের সমন্বয়ে যেমন একটি সিম্ফনী গড়ে ওঠে নতরদম গির্জাও তেমনি বিভিন্ন স্তম্ভ এবং আকৃতিগুলোর বিচিত্র সমন্বয়ে একটি প্রস্তরের সিম্ফনী গড়ে তুলছে।

ক্লেয়ার গলের সঙ্গে আমি এখানে এসেছি এবং বিস্মিত নয়নে গির্জার চূড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করেছি। আমার মনে হয়েছে যথার্থ প্রেমের অভিব্যঞ্জনা যদি থাকে তবে তা বিভিন্ন সঙ্গতির সমন্বয়েই সম্ভব। একজন পুরুষ একজন রমণীকে ভালবাসে। এটা এমন কিছু কথা নয়। কিন্তু একটি হৃদয় তার নানাবিধ ইচ্ছার আকুলতা নিয়ে অন্য একটি হৃদয়ের

www.pathagar.com

ইচ্ছার সঙ্গে সমন্বিত হচ্ছে এটাই তো আসল কথা। ক্লেয়ার গল বিশ্ববিখ্যাত প্রেমিকা ছিলেন তাঁর যৌবনকালে। ফরাসী দেশের সকল বিখ্যাত শিল্পী এবং কবির সঙ্গে তার সহৃদয়তা ছিল। তিনি তার কবিতায় গুহা ও গহ্বরের কথা বলেছেন এবং তটপ্রান্তে সমুদ্রের উপপ্লাবনের কথা বলেছেন। এ সমস্ত কিছুই তাঁর প্রেমের অভিজ্ঞতা থেকে এসেছিল। তিনি গৌরব করে বলতেন, "ইভান আমাকে বলিষ্ঠ দু'বাহু দিয়ে আকর্ষণ করে সকলের থেকে দূরে সরিয়ে এনেছিল – পিকাসোর কাছ থেকে, দেলোনোর কাছ থেকে, মার্ক সাগালের কাছ থেকে, মায়াকোভস্কির কাছ থেকে। এরা প্রত্যেকেই আমাকে চেয়েছিল আমার শরীরকে চেয়েছিলো, আমার দৃষ্টিকে চেয়েছিলো এবং আমার অহমিকার সঙ্গে তারা তাদের অহমিকাকে মিলাতে চেয়েছিল। কিন্তু ইভান যে দিন আমাকে সকলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে এনে নতরদম গির্জার সম্মুখে উপস্থিত করলো এবং বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো যে আজ আমরা যে অলৌকিক প্রজ্ঞার সামনে দাঁড়িয়ে আছি তার সঙ্গে কি পুরোপুরি মিলিত হতে পারি না? আমি উত্তর দেই নি। কিন্তু অভিভূত ব্যাকুলতায় তাকে আকর্ষণ করে চুম্বনে চুম্বনে আপ্লুত করেছিলাম। প্রেম তো এভাবেই আসে। প্রেম ক্ষুদ্রকে গ্রহণ করে না, মহৎকে গ্রহণ করে। তুমিতো সূর্যোদয় দেখেছো, যখন নির্ভাবনায় সূর্যের রক্তগোলক পূর্বের আকাশকে তরঙ্গিত করে তখন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলোকে বাষ্পমান হয়। যথার্থ প্রেম হচ্ছে সূর্যের অভ্যুদয়ের মতো। ইভান তার একটি কবিতায় প্রেমকে অগ্নিদাহনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আমরা আজীবন সেই অগ্নিদাহনের চর্চা করেছি। অগ্নির উষ্ণতা নয় কিন্তু অগ্নির আলোকিত অভিসার।"

ক্লেয়ার গলকে যতবার দেখেছি ততবার তাকে অতীতের প্রেমময় স্মৃতির মূর্ছনার মধ্যে উদ্ভাসিত দেখেছি। র‍্যাভানুতে তিনি যেখানে থাকতেন সেখানে একটি প্রজাপতি প্রতিদিন সকালে জানালা খুললেই ঘরের ভেতর এসে তার হাতের উপর বসতো। প্রতিদিন এসে বসতো। তারপর একদিন প্রজাপতিটি হারিয়ে গেলো। এ ঘটনা বর্ণনা করে তিনি বলতেন, সকল দেশেই প্রজাপতিকে প্রেমের প্রতীক বলে। আমার মনে হয় এই প্রজাপতিটি আমাকে জানাতে চাচ্ছিলো আমি যেন বিস্মরণের অতলে হারিয়ে না যাই।

তার কক্ষে আমি পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পীদের অনেক ছবির প্রারম্ভিক রেখাঙ্কনগুলো দেখেছি। এসব শিল্পীর মধ্যে ছিলেন, ফারনদ লেজার, লিও ফেনী, সালভাদর দালি, সাফশাগাল এবং পিকাসো। মার্ক শাগালের একটি বিখ্যাত ছবি আছে–একটি টেবিলের ওপর একটি ঘড়ি গলে মাটিতে ঝুলে পড়েছে। ছবিটির অর্থ সময় একটি বিগলিত প্রবাহের মতো, এ কখনো স্থির থাকে না এবং জীবনকে স্তব্ধ রাখে না। এই বিচলিত এবং বিগলিত সময়ের প্রবাহকে তিনি একটি তরল ঘড়ির রূপকের মধ্যে প্রকাশ করছেন। আমি এই ছবিটা দেখে আমার একটি কবিতায় লিখেছিলাম, সময়কে বিগলিত নিদ্রার মতো ভাবলাম।" একদিন ক্লেয়ারের কক্ষে মার্ক শাগালকে দেখেছিলাম। আমার সঙ্গে কথা হয়নি। পরিচয়ও হয়নি। তিনি তখন চলে যাচ্ছিলেন। ক্লেয়ারের গণ্ডে চুম্বন করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। মার্ক শাগাল ইভান গল এবং ক্লেয়ারগলের প্রেমের কবিতার বইটি চিত্রাংকন করেছিলেন। ছবিগুলোতে লক্ষ্য করা যায় যে নায়ক নায়িকা পৃথিবীর আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে শূন্যের মধ্যে নিশ্চিন্তে প্রবাহিত এবং আবর্তিত হচ্ছে। এভাবে মাধ্যাকর্ষণের বিমুক্তির মাধ্যমে প্রেমের যে অভিব্যঞ্জনা শাগাল নির্মাণ করেছিলেন

www.pathagar.com

তা অনন্যসাধারণ। ইভান গল তার একটি কবিতায় ক্লেয়ারকে ইট অতুলনীয় ভালবাসার নিবেদন রেখেছেন—আমি তোমাকে ভালো বেসেছিলাম / যখন পাহাড়ের নিচের দামী পাহাড়গুলো ছিলো / সকাল বেলাকার কম্পমান আলো / এবং বন কন্যাদের চোখের পানি / ধুলো থেকে যতবার গোলাপ জেগে উঠেছে / ততবার আমার হৃদয়ের রক্ত উজ্জ্বল হয়েছে / লুকানো কূপের উপর তার লৌহ যষ্ঠির মতো / তোমার আগমনে আমার মেরুদণ্ড কেঁপে ওঠে / আমি বহু সহস্র শেষহীন নিদ্রাহীন পথ হেঁটেছি / অবশেষে আমার তোমার পদচিহ্ন এক হয়ে গেল / বিনিঃশেষ বিন্দুতে।”/

॥খ॥

আমি মেইজোঁ ইনতারনেশিওনাল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠবো এমন সময় এক পশলা বৃষ্টি নামলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার সব পরিষ্কার হয়ে গেল। আমাদের দেশে বৃষ্টি থাকে অনেকক্ষণ তার ফলে পথচারীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কিন্তু প্যারিসে দেখেছি বৃষ্টির ঝাপটা হঠাৎ আসে আবার চলে যায়। কাপড় ভেজে ঠিকই, কিন্তু শুকিয়েও যায় তৎক্ষণাৎ। এখানে বৃষ্টি সব কিছুকে পরিচ্ছন্ন করে দেয়। ফরাসীরা বলে যে তাদের দেশের বৃষ্টি হচ্ছে মিনারেল ওয়াটারের মতো। যাকে ওরা আখ্যা দিয়েছে ভিশি ওয়াটার। সোডার পানির মতো এক পানিতে ঝাঁঝ আছে এবং পান করলে পেটের গোলযোগ সেরে যায়। অর্থাৎ এ পানি পাকস্থলীকে পরিচ্ছন্ন করে দেয়। যেমন বৃষ্টির ঝাপটা রাস্তাঘাটকে ঝকঝকে করে দেয় তেমনি মিনারেল ওয়াটার পাকস্থলীকে পরিষ্কার করে দেয়। আমার সঙ্গে ছিলেন বাদমোয়াজেল কো তা সু। তিনি একটি যাদুঘরের রক্ষিকা। ভদ্রমহিলা রসিকা এবং সর্বদাই হর্ষোৎফুল্ল। তিনি আমাকে বলছিলেন, “আজকে তুমি অনেক সুন্দরী মহিলার সাক্ষাৎ পাবে। সাগরে দূরে যে রেস্তরাঁয় তুমি খেতে যাচ্ছো সেখানে অনেকে আমন্ত্রিত হয়েছে। তোমার বন্ধু জাঁ ফ্রাসোয়া সাগাঁকেও নেমন্তন্ন করেছেন এবং যাতে তিনি আসেন সে ব্যবস্থাও করেছেন। তুমি ফ্রাঁসোয়ার সাথে কথা বলে অভিভূত হবে।

জাঁ হচ্ছে আমার বন্ধু ফরাসী নাট্যকার এবং চিত্রপরিচালক জাঁ দ্য বীয়র এবং ফ্রাসোয়া সাদা হচ্ছেন ফরাসী দেশের বিখ্যাত লেখিকা। ফ্রাসোয়া খুব অল্প বয়সে লেখিকা হিসাবে নাম করেছিলেন। তার উপন্যাসে অল্প বয়সী মেয়েদের যৌন অভীপ্সা এবং অভিব্যক্তির মনোজ্ঞ চিত্র আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তার উপন্যাস যৌনতাসর্বস্ব নয়। একটি মেয়ে ক্রমশ বড় হচ্ছে এবং পুরুষের আগ্রহকে বুঝতে শিখছে তখন তার মধ্যে কৌতূহলটাই প্রবল থাকে। ফ্রাঁসোয়া এই কৌতূহলকেই মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তার উপন্যাসে যৌনতার অভিক্ষেপ আছে, কিন্তু সিদ্ধি নেই। এক সময় তিনি অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরিণত বয়সে তিনি জীবনের তাৎপর্যকে উদঘাটন করতে সক্ষম হন নি। তাই তিনি প্রায় হারিয়ে গেছেন বলা যায়। আমি যে সময়ের কথা বলছি ১৯৫৬/৫৭ তখন ফ্রাঁসোয়াসাগার বয়স ৩৫/৩৬-এর মতো। সাহিত্য জগতে তখনও তিনি প্রতিশ্রুতিশীল প্রতাপশালী সুতরাং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে ভেবে আমি খুব উল্লসিত হয়েছিলাম। মাদ মোয়াজেল কোঁত স এর সঙ্গে আমি মোমাখত খরিয়ায় আকরে কুরের কাছে একটি রেস্তঁরায় এলাম, এখানেই আমাদের নৈশভোজের ব্যবস্থা করা

www.pathagar.com

হয়েছে। লন্ডনে আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনের পর ফরাসী কবি ও সাহিত্যিকরা সম্মেলনের পরবর্তী পর্যায়ে এখানে মিলিত হতে যাচ্ছেন। লন্ডন কনফারেন্সে শাঁদ্রে শাসোর ট্যাভেরনিয়র জাঁ দ্য বীয়র এরা উপস্থিত ছিলেন। এদেরই উদ্যোগে প্যারিসে সে দিনকার নৈশভোজের ব্যবস্থা। হলটি বড় ছিল। গোলাকারভাবে টেবিলের চারপাশে চেয়ার সাজানো ছিলো। আমরা আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় বসে পড়লাম। ফরাসীরা মদ্যপানে খুব বেশী আগ্রহী। জার্মানরাও। এই মদকে উপলক্ষ করে তাদের একটি বিশেষ ধরনের সাহিত্যও গড়ে উঠেছে। শতাধিক ধরনের মদ তারা তৈরী করে। এক এক ধরনের মদের সঙ্গে এক এক ধরনের খাদ্যও নির্দিষ্ট আছে। যেমন লাল মদের সঙ্গে মাছ চলবে না, আবার হোয়াইট মদের সঙ্গে সামুদ্রিক মাছ সঙ্গত।

তেমনি শ্যাম্পেন চলবে সব কিছুরই সঙ্গে। আরো মজা হচ্ছে কেসি মদ পরিবেশন করা হয় অসম্ভব ঠাণ্ডা অবস্থায়, আবার কোন মদের তাপ থাকে গৃহের অভ্যন্তরস্থ তাপের মতো যাকে বলা হয় রস টেম্পারেচার। মদের বোতল বেতের একটা বাস্কেটের মধ্যে বরফের সঙ্গে থাকে। বাস্কেট থেকে তুলে মদ্য পরিবেশন করা হয়। জাঁ দ্য বীয়র মদের বিশিষ্টতা নিয়ে অনেক গল্প আমার সঙ্গে বহুদিন করেছেন। তার পছন্দ ছিল রেড বাগান্ডী। এই মদটা নাকি ভিল রোস্টের সাথে খেতে খুব সুস্বাদু। ভিল মানে বাছুর। আমি অবশ্য মদ্যপান করি না, কিন্তু সব কিছু জানার আগ্রহ প্রবল থাকায় আমি যখনই ফরাসী বা জার্মানীতে গিয়েছি তাদের বিভিন্ন ধরনের ইতিহাসও আগ্রহের সঙ্গে শুনেছি। আমাদের সেদিনকার নৈশভোজে ফ্রাঁসোয়া সাগা এসেছিলেন এবং প্রচুর মদ্যপান করেছিলেন। টেবিলে আমার কাছ থেকে দূরে ফ্রাঁসোয়া বসেছিলেন। তার পাশে এক বৃদ্ধা মহিলা এবং অন্য পাশে একজন ইংরেজ গল্প করছিলেন ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে, ইংরেজ ভদ্রলোকের সুবিধার জন্য। আমরাও কিছু কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম। এক পর্যায়ে ফ্রাঁসোয়ার পাশের বৃদ্ধা মহিলাটি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠেছিলেন। আমরা খুব কৌতূহলী হয়েছিলাম। হাসতে হাসতে বৃদ্ধা মহিলা বলছিলেন, "ফ্রাঁসোয়া বলে কি! প্রেমের মুহূর্তে নাকি পুরুষের চরিত্র উদঘাটন করা যায়। সে সময় তো সব পুরুষই বোকা হয়ে যায়। চোখ জ্বলজ্বল করে এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত আধো আধো কথা বলে। ফ্রাঁসোয়া, আর কটা পুরুষ মানুষ দেখেছো? আমি আমার বয়েসে অনেক দেখেছি।

॥১৫॥

প্রফেসর শাহেদ সোহরাওয়ার্দী স্পেনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি নিজেই স্পেনকে তার অবস্থান কেন্দ্র বেছে নিয়েছিলেন। এক সময় মুসলিম সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে স্পেন বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিল। স্থাপত্য শিল্প, সঙ্গীত এবং কাব্যকলায় মুসলমানগণ স্পেনে একটি নতুন শিল্পাদর্শ নির্মাণ করেছিলেন। প্রফেসর সোহরাওয়ার্দী শিল্পরসিক ছিলেন। সুতরাং স্পেন তাঁর জন্য একটি অনুকূল ক্ষেত্র হয়েছিল। স্পেনে থাকতেই তার সঙ্গে আমি চিঠিপত্র যোগাযোগ রক্ষা করেছিলাম। এরপর তিনি স্থায়ীভাবে করাচীতেই বসবাস আরম্ভ করেন। অবসর গ্রহণের পর লন্ডন অথবা কোলকাতায় বাকী জীবন-যাপনের অনুমতি সরকারের কাছে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে অনুমতি না পাওয়ায় শেষ জীবনটি

www.pathagar.com

করাচীতেই কাটাতে বাধ্য হন। করাচীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার আগে তিনি কয়েক মাস কলকাতায় এবং শ্রীলংকায় কাটিয়েছিলেন। পদ্মজা নাইডু তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। তাঁর অতিথি হয়ে কলকাতায় তিনি কয়েক সপ্তাহ এবং তার পরে শ্রীলংকায় বন্দরনায়েকের অতিথি হয়ে আরও কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে ছিলেন। করাচীতে থাকতে তিনি তাঁর ভাইয়ের মেয়ে বেগম আখতার সুলায়মানের বাসা 'লখম হাউসে' থাকতেন। আমি সেখানে প্রায়ই যেতাম। তিনিও আমার নাজিমাবাদের বাসায় আসতেন। আমরা উভয়েই একে অন্যের সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলাম।

অকৃতদার শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর শেষ জীবনের সঙ্গী ছিল কয়েকটি কুকুর। আমি লখম হাউসে দুটি কুকুর দেখেছি। এই কুকুর দুটিকে নিয়ে তিনি গাড়ি করে ক্লিফটনে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতেন। এটা ছিল প্রতিদিনের একটি ব্যবস্থা। প্রায়ই সকালে যেতেন। যেদিন সকালে যেতে পারতেন না, সেদিন বিকেলে যেতেন। এই কুকুর সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন–'এই প্রাণীটির সাধারণ একটি বোধ আছে সে তার সঙ্গীকে চেনে এবং তার আনুগত্য স্বীকার করে। সে তার সঙ্গীকে অনেক কিছুই দেয়। স্বীকৃতি, সমর্থন এবং আনুগত্য ছাড়াও ভালবাসা দেয়। মানুষের সাহচর্যের চাইতে কুকুরের সাহচর্যে নিশ্চিন্ততা আছে। কুকুর সর্বস্ব দিয়ে আনুগত্যকে মূল্যায়ন করে। আমি আমার জীবনের শেষ লগ্নে এসে সময়কে গণনা করছি কুকুরের সঙ্গে সাহচর্যের মাধ্যমে। মাঝে মাঝে মনে হয় দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত করি। কিন্তু দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত হতে চায় না। তার কারণ অতীতের অজস্র স্মৃতি আমাকে গ্রাস করে রেখেছে। আমি এখন সামনের দিকে না তাকিয়ে অতীতের স্মৃতিকে পশ্চাদভূমি করে কয়েকটি প্রাণীর সঙ্গে সহবাস করছি।'

শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর একটি কুকুর আমাকে একবার কামড়িয়েছিল। একদিন বিকেলে 'লখম হাউসে' তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি ঘরের মধ্যে ইজি চেয়ারে বসেছিলেন এবং তাঁর দুটি কুকুর ঘরের মধ্যে শুয়েছিল। আমাকে দেখেই কুকুর দুটো উঠে দাঁড়াল এবং সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু যতক্ষণ আমি শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম কুকুর দুটি কোন সাড়াশব্দ করে নি। কিন্তু যেই আমি বিদায় নেব বলে উঠে দাঁড়িয়েছি এবং শাহেদ সোহরাওয়ার্দী আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে অগ্রসর হচ্ছেন তখন একটি কুকুর গাঁ গাঁ করে দৌড়ে এসে আমার পা কামড়ে ধরল। আমার পায়ে সেন্ডেল ছিল। সুতরাং আমি আহত হলাম। কুকুরটি মনে করেছিল আমি বোধহয় শাহেদ সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে যেতে এসেছি। সে জন্য সে ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে আক্রমণ করেছিল। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখন কুকুরটিকে শাসন করতে লাগলেন। কিন্তু এমন ভাষায় তাকে তিরস্কার করতে লাগলেন যে দুর্দশার মধ্যেও আমার হাসি পেল। তিনি কুকুরকে লক্ষ্য করে বললেন–ইউ নটি গার্ল। তোমাকে ভাল সব খাবার দিয়েছি, তারও মধ্যে তুমি মানুষকে খেতে গেলে এটা কি রকম কথা। তোমাকে সন্ধ্যার সময় আর কিছু খেতে দেব না। পরে আমাকে গাড়ি করে করাচী কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে ইনজেকশনের ব্যবস্থা করে দিলেন।

www.pathagar.com

এক সময় শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর বন্ধু ছিলেন দীলিপকুমার রায়। দীলিপকুমার তার মনের পরশ উপন্যাসে শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর একটি চরিত্র চিত্রণ করেছেন। উক্ত চরিত্রটি অত্যন্ত সজাগ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন সুচতুর এবং রসিক। শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে শুনেছি যে উক্ত চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা চিত্রিত হয়েছে। দিলীপকুমারও ছিলেন শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর মত। জীবন রসিক একটি সহজ নির্বিঘ্ন জীবনের আস্বাদন করতে করতে হঠাৎ এক সময় তিনি ভক্তিবাদে দীক্ষিত হন। এবং শ্রী অরবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি অসাধারণ সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন এবং সঙ্গীতের লালিত্যের মধ্য দিয়ে বিবিধ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত দিলীপকুমার পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ব্যঞ্জনার সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের সংমিশ্রণ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। সংসারত্যাগী হয়েও শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। পন্ডিচেরী থেকে তিনি মাঝে মাঝে শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে চিঠি লিখতেন। সেই চিঠিও আমি দেখেছি। দিলীপকুমার সম্পর্কে শাহেদ সোহরাওয়ার্দী বলতেন স্বল্পকালীন জীবনে মানুষের আকুল বাসনা হচ্ছে আপন পরিচয়কে খুঁজে বের করা। কেউ কেউ কর্মের মধ্য দিয়ে এই পরিচয়কে অন্বেষণ করে, কেউ বা ধ্যানের মাধ্যমে। কেউ কিছু পায় কিনা জানি না। কিন্তু অনুসন্ধান যে রকমই হোক যদি কেউ এই অনুসন্ধানে তৃপ্তি পায় তাহলেই তো যথেষ্ট। আমরা একটি স্বস্তি নির্মাণ করতে চাই। সংক্ষুব্ধতাকে দূর করে, সংকটের বিমোচনে একটি স্বস্তি গড়ে তোলা খুব সহজসাধ্য নয় যদি কেউ এ স্বস্তি পান তবে তাকে আমি সমালোচনা করব না। দিলীপ ভক্তির মধ্যে স্বস্তি খুঁজছে। স্বস্তি পেয়েছে কিনা জানি না। কিন্তু সে মনে করাটাকে আমি সম্মান করি। আমি আমার জীবনধারায় ভক্তিকে গ্রহণ করি নি। আমি আমার কর্মধারার বিভিন্ন পর্যায়ে সময়কে অনুভব করবার চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্বাস করি যে কোন কিছুর পূর্ণতা একজন মানুষের জীবনে হয় না। পূর্ণতা নিজস্ব ভঙ্গীতে চলে। একজন মানুষের মধ্যে তার কিছুটা বিকাশ ঘটে। কিন্তু পূর্ণতার ধারা এগিয়ে চলে। এজন্য ধৈর্য ধারণ করতে হয়, অপেক্ষা করতে হয়। আমি অপেক্ষা করতে শিখেছি।

শাহেদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে বলতেন–শহীদ বড়ই অধৈর্য। সে রাজনীতি করে বলে সবকিছু দ্রুত পেতে চায়। এবং এ দ্রুত পাবার জন্য যা পায় তা সে ধরে রাখতে পারে না। এর পরে হাসতে হাসতে বলতেন– আমি অপেক্ষা করতে জানি, এমন কি মৃত্যুর পরও। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম–সেটা কি রকম অপেক্ষা? তিনি উত্তরে বলেছিলেন–ব্রাউনিং তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন যে একটি বৃত্তকে সম্পূর্ণ করবার সফলতা কারও আসে না। কিন্তু একাগ্রতায় বৃত্তকে সম্পূর্ণ করবার আগ্রহে সে হয়তো বৃত্তাংশ নির্মাণ করে। সেখানেই তার সফলতা। একজনের জীবনে না হোক ধারাটি যদি অগ্রসর থাকে, তাহলে অনেক পরে গিয়ে বৃত্তটি হয়ত সম্পূর্ণ হবে। আমি এটাকেই বলি অপেক্ষা করা।

শাহেদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর পরিচিত জনের ধর্মীয় আচরণ নিয়ে পরিহাস করতেন। পরিহাসটা হত অত্যন্ত লঘু ও উপভোগ্য। অর্থাৎ ধর্মকে নিয়ে তাঁর পরিহাস নয়। পরিহাসটা ছিল কারও কারও ধর্মগত আচরণের প্রতি। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ এক সময় করাচীতে কিছুকালের

www.pathagar.com

জন্য ছিলেন। তিনিও থাকতেন নাজিমাবাদে। মাঝে মাঝেই তিনি আমার বাসায় আসতেন। সে সময় যদি শাহেদ সোহরাওয়ার্দী থাকতেন তখন শহীদুল্লাহ সাহেব শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর হাস্যরসের পাত্র হতেন। শহীদুল্লাহ সাহেব অনাবিল মুগ্ধতায় এই পরিহাসকে গ্রহণ করতেন। এক দিন শাহেদ সোহরাওয়ার্দী প্যারিসের গল্প বলছিলেন। তিনি যখন এক সময় প্যারিসে অবস্থান করছিলেন তখন শহীদুল্লাহ্ সাহেব সেখানে পড়াশুনা করতে আসেন। তিনি সে সময় কয়েকদিন শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে ছিলেন। শহীদুল্লাহ সাহেবের হালাল গোস্তের অনুসন্ধান নিয়ে অনেক গল্প শাহেদ সোহরাওয়ার্দী আমাকে বলেছিলেন। জ্যান্ত মুরগী কিনে এনে বেসিনের মধ্যে জবাই করে তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার যে বিবরণ তিনি দিয়েছিলেন তা খুব হাস্যকর। বলা যেতে পারে শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর পরিহাস ছিল নিষ্পাপ এবং গ্লানিমুক্ত। মনে আছে, একবার তিনি করাচী থেকে ঢাকায় এসেছিলেন পাকিস্তান এয়ার লাইনসে একদল প্রত্যাগত হাজীর সঙ্গে। যারা তাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে এসেছিলেন তারা তাঁকে বলেছিলেন, আপনি খুব সৌভাগ্যবান। আপনার যাত্রা খুবই পবিত্র ছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করেছিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো ঠিকই, আমি সারা পথ পবিত্রতায় সুগন্ধ অনুভব করেছি। অর্থাৎ হাজী সাহেবরা বিমানে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে ফেলেছিলেন সেই দুর্গন্ধের কথাই তিনি বলছিলেন।

তিনি প্রায়ই বলতেন, পৃথিবীতে আদিমতাই পবিত্র, কেননা আদিমতা অকৃত্রিম। পিকাসো তাঁর শিল্প সাধনায় আদিমতাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। পিকাসো তাঁর সময়কালকে অতিক্রম করে মৌল পবিত্রতা আবিষ্কারের চেষ্টায় আফ্রিকার প্রাচীন কালের ভাস্কর্যকে প্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। পিকাসোর সময়ে আদিমতার প্রতি আকর্ষণ শুধু যে চিত্রকর্মেই সীমাবদ্ধ ছিল তাই নয়, সঙ্গীত এবং কাব্যেও তা প্রকাশ পেয়েছিল। পিকাসোর আগেও আদিমতাকে রূপ দেবার চেষ্টা কোন কোন শিল্পী করেছিলেন তাদের মধ্যে রুশো একজন। রুশো একটি বর্ণাঢ্য সজীবতায় বৃক্ষলতা মানুষ এবং প্রাণীকে একত্রিত করেছিলেন। রুশোর চিত্রকর্মে আদিমতার এই অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে পিকাসো একটি উ ৎসবের আয়োজন করে রুশোর চিত্রকর্মকে সম্মান জানিয়েছিলেন। আমাদের জীবনে আদিম পবিত্রতা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। বর্তমান সভ্যতা এই পবিত্রতা থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে এনে আমাদের জীবনকে সমস্যাসংকুল করে ফেলেছে। আমাদের কর্তব্য হবে আদিমতার মধ্যে বিদ্যমান সহজতা ও পবিত্রতাকে আবিষ্কার করা এবং তাকে কাম্য করা।

শাহেদ সোহরাওয়ার্দী বিশ্ববাসীর কাছে শিল্পী যামিনী রায়কে প্রথম পরিচিত করিয়ে ছিলেন। যামিনী রায় রং এবং রেখার শুদ্ধির পথে অগ্রসর হয়ে গ্রামীণ জীবনের সহজতা ও আদিমতার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। বাংলার গ্রামগুলি বহমান শতাব্দী ধরে নাগরিক সভ্যতার চাপের মুখে নিজস্ব আদিমতা বজায় রেখেছিল। সেই আদিমতার মধ্যে যামিনী রায় নতুন প্রত্যাশা আবিষ্কার করেছিলেন। গ্রামীণ পটচিত্রের মধ্যে যে শক্তি স্পন্দমান সেই শক্তিকে তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। নগরের জীবন হচ্ছে পরাজিতের জীবন কিন্তু গ্রামের মানুষ স্বাধীনতার সন্তান। যামিনী রায় আঁকতে চেয়েছিলেন গ্রামের মানুষের ইতিহাস এবং তিনি চেয়েছিলেন গ্রামের মানুষকে রূপ দিতে। গ্রামের মানুষকে রূপ দিতে

www.pathagar.com

গিয়ে তিনি উপকরণ গ্রহণ করেছিলেন গ্রামের জীবন থেকেই। তিনি নিজেই রং প্রস্তুত করেছিলেন মাটি থেকে, সিঁদুর থেকে, খড়ি থেকে এবং এভাবে এই সমস্ত উপকরণ দিয়ে কর্মরত সাধারণ গ্রাম্য মানুষকে তিনি নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন। শাহেদ সোহরাওয়ার্দী শিল্পক্ষেত্রে যামিনী রায়ের এই পথযাত্রাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন একটি প্রবন্ধ লিখে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল মূলকরাজ আনন্দের 'মার্গ' নামক একটি শিল্প পত্রিকায়। শাহেদ সোহরাওয়ার্দী প্রমাণ করেছিলেন যে যামিনী রায় তার চিত্রকর্মে আকার ও বর্ণের একটি অখণ্ড ভাস্বরতা নির্মাণ করেছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। উভয়েই ছিলেন অসামান্য বিশ্লেষণ ক্ষমতার অধিকারী, প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ও মনস্বী। উভয়ের পঠনের পরিধি ছিল বিরাট এবং বিপুল। উভয়েই প্রখর ব্যক্তিত্বশালী এবং আলাপ দক্ষ রসিক ছিলেন। কলকাতা থাকতে উভয়ের সাক্ষাৎ হত প্রায় প্রত্যহ। শেষ জীবনে উভয়েই একে অপরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫৯ সালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের শেষে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জাহাজে করে দেশে ফিরেছিলেন। ফিরতি পথে করাচীতে কয়েক ঘণ্টার যাত্রাবিরতিতে তিনি লখম হাউজে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সে সময় দুই বন্ধু গভীরতম নিষ্ঠায় একে অন্যকে শেষবারের মত জানবার চেষ্টা করেছিলেন। যতদূর মনে পড়ে সেবার সুধীন্দ্রনাথ দত্তের স্ত্রী রাজেশ্বরী বাসুদেব তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এর কিছুদিন পরেই কলকাতায় অবস্থানকালে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু ঘটে। পরের বছর জুন মাসের শেষে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর সংবাদ করাচী পৌঁছে। আমি এ সংবাদ জানতাম না। একদিন নাজিমাবাদের বাসায় দোতলার পড়ার ঘরে বিকেল বেলা আমি বসে আছি এমন সময় দোতলার সিঁড়িতে শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর পায়ের শব্দ পেলাম। তাঁর পায়ের শব্দ আমি ধরতে পারতাম। তিনি ধীরে ধীরে পা ফেলতেন এবং একটু থেমে থেমে সিঁড়ি বেয়ে উঠতেন। তাঁর চলার মধ্যে একটি ধীর মন্থরতা ছিল। আবার দৃঢ় স্পষ্টতা ছিল। আমি তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে তাঁকে ওপরে নিয়ে এলাম। তিনি কেমন যেন ক্লান্তভাবে চেয়ারে বসে পড়লেন। এবং কিছুক্ষণ কোন কথা বললেন না। তাঁকে কেমন যেনো বিহ্বল এবং বেদনার্ত মনে হচ্ছিলো আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। সুধীন ইজ ডেড। তারপর অনেক্ষণ ধরে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বহুবিধ নৈপুণ্যের কথা বলছিলেন, মনে আছে।

এরপর শাহেদ সোহরাওয়ার্দী যথার্থই নিসঙ্গ হয়ে পড়েন। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি চিরকালের জন্য করাচী ছেড়ে চলে আসি। তারপর থেকে শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর নিঃসঙ্গতা চরমে পৌঁছে।

॥১৬॥

আমি ১৯৫৭ সালে প্রথমবারের মতো জাপানে যাই আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য।

ইম্পিরিয়াল হোটেলের লাউঞ্জে অপেক্ষা করছিলাম পিইএন সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যাব বলে। অনুষ্ঠান ক্ষেত্র হচ্ছে সনেকী-কাইকান ভবন। হোটেল থেকে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য বাস আসবে। আমার পাশে ডোনাল্ড কীন খবরের কাগজ দেখছিলেন। কি

www.pathagar.com

একটা খবর পড়ে হঠাৎ হেসে উঠলেন। আমি ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করতেই কাগজটি আমার হাতে দিয়ে বললেন–'বাঁ কলামের ছবিটা দেখ।' দেখি, জনস্টাইনবেক ছোট্ট একটি ছড়ি হাতে কাউকে যেন তাড়া করছেন। নিচের ক্যাপশানে লেখা, মাতাল স্টাইনবেক ফটোগ্রাফারদের তাড়া করছেন। ডোনাল্ড কীন বললেন, 'গতকাল হানেদা বিমান বন্দরে প্লেন থেকে স্টাইনবেক যখন নামছিলেন তখন বহু ফটোগ্রাফার তাকে ঘিরে ফেলেছিলেন, স্টাইনবেক একটু রসিকতা করে তাদের দিকে ছুটে গিয়েছিলেন। তারই ফটো। মাতাল কথাটি অতিরিক্ত–এটি মইনিচির অটোগ্রাফারের রসিকতা।

সনেকী কাইকান ভবনে আন্তর্জাতিক পিইএন এর ২৯তম কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় ১৯৫৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বর সোমবার সকাল দশটায়। বক্তা ছিলেন জাপানী পিইএন এর সভাপতি য়ু সুনারী কাওয়াবাতা, জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আইচিরো ফুজিয়ামা। আন্তর্জাতিক পিইএন সভাপতি মঁসিয়ে আঁদ্রে শাঁসে, ভারতীয় পিইএন এর প্রতিষ্ঠাতা মাকস সোফিয়া দিয এবং জন স্টাইনবেক। কায়াবাতা তাঁর বক্তৃতা একথা বলে শেষ করলেন যে অতীত সকল সভ্যতা এবং ধর্ম তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করছিল। বর্তমানে একই পৃথিবীতে তারা পারস্পরিক সম্পর্কে আবর্তিত হচ্ছে। বর্তমানে নতুন হচ্ছে সগ্রুবয়ের, যার ফলে বিশ্বব্যাপী একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সম্মুখীন হচ্ছি আমরা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফুজিয়ামা জাপানের সঙ্গে বহির্জগতের বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতের একটি সম্পর্কের ঐতিহাসিক বিবরণ দিলেন। প্রথম সম্পর্ক ঘটে ষষ্ঠ শতকের মধ্যবর্তীকাল থেকে অষ্টম শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে যখন বৌদ্ধ বিনয় ও মুক্তির বাণী ভারতবর্ষ থেকে চীন দেশ হয়ে জাপান প্রবেশ করে। প্রাচীন জাপানের রাজধানী নারা শহরের অজস্র বৌদ্ধ মন্দির এবং গৌতমের ব্রোঞ্জ মূর্তি এ সম্পর্কের স্বাক্ষর বহন করছে। কিছুটা দূরাগত হলেও এটা অংশত সত্যি যে, গ্রীক প্রভাবে ভারতের বৌদ্ধ ভাস্কর্যে সৌন্দর্যগত যে নতুন প্রভা এসেছিল জাপানে তারই অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ষোড়শ শতকের মাঝখানে পাশ্চাত্য সভ্যতা সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে জাপানকে স্পর্শ করল। এ সময় থেকে প্রায় একশ বছর পর্যন্ত পর্তুগীজ, স্পেনীয় এবং ওলন্দাজ বণিকরা জাপানের সঙ্গে বিবিধ বাণিজ্য কর্মে যুক্ত হল। বাণিজ্যের অর্থকরী দিক ছাড়া ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যসূত্রে পাশ্চাত্য মুদ্রণশিল্প, চিত্রকর্ম, নাট্যশিল্প, সঙ্গীত, চিকিৎসা বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, ভূগোল, নৌযান নির্মাণ এবং যুদ্ধবিদ্যা জাপানে প্রবেশাধিকার পায় এবং প্রসার লাভ করে। জেসুইট মিশনারী ফ্রান্সিস জেভিয়ার জাপানে এসেছিলেন ১৫৪৯ খৃস্টাব্দে।

বৌদ্ধ ধর্ম বাইরে থেকে এলেও মহাযান বৌদ্ধ চিন্তার সঙ্গে শিষ্ট বিশ্বাসের কোনও সংঘর্ষ বাধে নি। কেননা উভয় মতবাদেই বহু দেবদেবীর প্রশ্রয় আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য থেকে যে রোমান ক্যাথলিক মতবাদ এলো তৎকালীন জাপানী অভিব্যক্তির সঙ্গে তার বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে ভেবে তবুগ্রওয়া শগুনাতের ফিউডাল শাসনামলের সরকার বিদেশীদের জাপানে আসা বন্ধ করে দেয়। পরবর্তী দু'শ বছর জাপান পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং জাতীয় নিরাপত্তা সন্ধান করতে থাকে।

১৮৫৩ খৃস্টাব্দে কমোডোর পেরী তাঁর নৌবাহিনী নিয়ে জাপানের উরাগা উপসাগরে উপস্থিত হন। পেরীর আবির্ভাবে জাপানের রাজনীতিতে পরিবর্তন সূচিত হয়। শগুনাতের

www.pathagar.com

পতন ঘটে এবং ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে মেইজি রাজ্যশাসন স্থাপিত হয়। মেইজি শাসনামলে জাপান একটি আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে নবজন্ম লাভ করে।

ফুজিয়ামার বক্তৃতার পর আকাদেমী ফ্রাঁসের সদস্য খ্যাতনামা ফরাসী ঔপন্যাসিক এবং আন্তর্জাতিক পিইএন এর সভাপতি মঁশিয়ে আঁদ্রে শাঁসো একটি আবেগপ্রবণ দীর্ঘ বক্তৃতায় সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন কি করে সম্ভবপর হতে পারে, সে সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া সম্মেলনকে বরণ করলেন আশীর্বাণীর মতো কতগুলো কথা বলে। তিনি কামনা করেন যেন সত্যের আলো, শান্তি এবং শক্তি সকলের উপর ছড়িয়ে পড়ে।

জন স্টাইনবেক এক মিনিট কি দু মিনিট সময় বললেন, এবং তাও বললেন আদ্যান্ত রসিকতায়। এতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন সারগর্ভ ভাষণে সম্মেলনে যে গাম্ভীর্য সৃষ্টি হয়েছিল স্টাইনবেকের কৌতুকে তা লঘুহাস্যে ভেঙ্গে পড়লো। স্টাইনবেক বললেন 'এখানে দাঁড়াতে পেরে আমি আনন্দিত হয়েছি, সম্মানিত হয়েছি এবং কিছুটা বিব্রতও বোধ করছি। আজকের সকাল পর্যন্ত আমি জানতাম না যে আমাকে বক্তৃতা করতে হবে। এখন এই জানার ফলে আমার উপর একটি গুণ আরোপিত হল। যদিও এ গুণটি আকস্মিক, কিন্তু এ মুহূর্তে তা আমার জন্য মারাত্মক রকম সত্য। আমার মন্তব্য খুব সংক্ষিপ্ত হবে। বর্তমান সম্মেলনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটেছে। এশিয়ায় এ ধরনের সম্মেলন এই প্রথম এবং আমার জীবনে একমাত্র সম্মেলন। অজানা সম্পর্কে শংকা নিয়ে যখন আমি নিউইয়র্ক ত্যাগ করছিলাম, আমার জনৈক প্রিয় বন্ধু বললেন, তোমার ভয়ের কোনও কারণ নেই। তুমি শুধু শুনে যাবে। কিন্তু এখন দেখছি শুনতে পারাই যথেষ্ট নয়, বুঝতেও হয়। কানে তো আমরা অনেক কিছু শুনতে পাই, শুনতে হয়-কিছু হয়ত এর মধ্যে শ্রবণযোগ্য, কিছু হয়তো নয়। কিন্তু শুনে বুঝতে পারাটাই হল আসল কথা। জাপানের পিইএনকে ধন্যবাদ দেই তাদের আতিথেয়তার জন্য। এখন আমি শুনতে বসব এবং হয়ত কিছুটা বুঝবো। স্টাইনবেক লিসন এবং হিয়ার এ শব্দ দুটো বারবার উচ্চারণ করছিলেন। আমি লিসন এর অর্থ করলাম শোনা এবং হিয়ার এর অর্থ করলাম বুঝা। ঠিক হলো কিনা জানি না।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর চা-পর্বকালে এক সময় স্টাইনবেককে কাছে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার লিসন এবং হিয়ার শব্দ দুটোর অর্থ পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। একটু ব্যাখ্যা করবেন কি?' স্টাইনবেক বললেন 'শব্দ দুটো নিজেদের জায়গায় ঠিকই আছে-লিসন মানে লিসন এবং হিয়ার মানে হিয়ার। আশপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই হেসে উঠলেন। আর অধিক জিজ্ঞাসাবাদ হলো না।

সেদিন বিকেলে অথবা সম্ভবত পরের দিন বিকেলে একটি রিসেপশন ছিল। শরীর ক্লান্ত থাকায় আমি সে রিসেপশনে যাইনি। সন্ধ্যার সময় ইম্পিরিয়াল হোটেলের শপিং আরকেইড এলাকায় ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। বিক্রয়ের দ্রব্যগুলো সুন্দর করে সাজানো এবং প্রতিটি পণ্য আকাঙ্ক্ষিতরূপে পরিবেশিত ও উন্মোচিত। কিনবার ইচ্ছায়, শুধু দৃষ্টি দিয়ে স্পর্শ করার আনন্দে আমি তন্ময় হয়ে একটি দোকানের জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ বাঁ কাঁধের উপর একটি ভার হাতের চাপ অনুভব করে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি জন স্টাইনবেক

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে। বললেন, 'তুমি রিসেপশনে যাওনি দেখছি, আমিও যাই নি।' বললাম, আমি তো ক্লান্ত বলে যাই নি। আপনি কেন যান নি?

রিসেপশনে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, সেখানে আমি মানুষ দেখতে পাই না, মুখোশ দেখি। একটু পরে বললেন, 'চল, লুকিয়ে একটি জাপানী সিনেমা দেখে আসি।'

হোটেলের পিছনেই একটি সিনেমা ছিলো। টিকেট কিনে ভিতরে গিয়ে বসলাম। সিনেমার গল্পটি হোকাইডা অঞ্চলের একটি দরিদ্র কৃষক পরিবারের। এক বৃদ্ধ কৃষকের সাতটি ছেলে। সব কটি ছেলেই যুবাবয়েসী এবং অবিবাহিত। বিত্তহীন কৃষক কোনও ক্রমে বড় ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারল। আর ছ'জন ছেলের বিয়ে দিতে পারবে না জেনে কিন্তু সবাইকে খুশী রাখবার ইচ্ছায় কৃষক এক অদ্ভুত নির্দেশ জারি করে। সব কটি ছেলেকে ডেকে সে বলে, 'বড় ছেলেকে আমি বিয়ে দিয়ে বউকে এ পরিবারের সম্পত্তি করে দিলাম। এ সম্পত্তি তোমরা সবাই ভোগ করতে পারবে।' সিনেমার পর্দায় দেখা গেল কিমানো পরা একটি রমণী-দেহ সন্ধ্যার পর খড়ম পায়ে হেঁটে যাচ্ছে এক এক রাত্রে এক এক ভাইয়ের ঘরে। এ পর্যন্ত দেখার পর স্টাইনবেক উঠে পড়লেন। আমাকে বললেন, 'আর দেখার প্রয়োজন নেই। যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি।'

স্টাইনবেক যে কদিন টোকিওতে ছিলেন, এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনও অনুষ্ঠানে উপস্থিত হননি। শেষ সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয় সানেকী কাইকান ভবনের কোকুসাই কক্ষে। সভাপতি ছিলেন কবি স্টিফেন স্পেন্ডার। জন স্টাইনবেকের বক্তৃতা করার কথা ছিল, কিন্তু তিনি এলেন না জন ডদ প্যাসোল সভায় স্টাইনবেকের পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। জানালেন, স্টাইনবেকের ফ্লু হয়েছে, কিন্তু চিকিৎসা হচ্ছে অন্য একটি অসুখের, সে অসুখ তাঁর হয়নি। তাঁকে এখন ভুল চিকিৎসা থেকে ক্রমান্বয়ে আরোগ্য লাভ করতে হবে। অসুস্থ অবস্থায় স্টাইনবেক কিছু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, যা সভায় পাঠ করে শুনানো হয়।

এক নম্বর মন্তব্য হচ্ছে, 'আমি জানতাম না যে আমার উচ্চাশা আছে। কিন্তু মনে হচ্ছে যে আছে, তার কারণ আমি অসুস্থ।' অন্য একটি হচ্ছে, পাশ্চাত্য দেশে পদাঘাত করলে বিনয়ের জন্ম হয়। যদি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করতে পারত, তাহলে বোমাগুলো বোমা না হয়ে শান্তির কপোত হত। অন্য একটি মন্তব্য, 'আতিথেয়তা হচ্ছে সভ্য মানুষ কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি মারাত্মক মধুর অত্যাচার। চার নম্বর হচ্ছে, 'যদি ভালবাসা পেতে চাও এবং মানুষকে এড়াতে চাও, অসুস্থ হও।' অন্যান্য মন্তব্য হচ্ছে–'একটি সম্মেলন এবং কুকুরের লড়াইয়ের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে কুকুরের লড়াইয়ে নিয়ম-কানুন আছে।' 'ভাষা হচ্ছে কোলাহলের জননী কখনো বললে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে না। সব মানুষের মধ্যে একটি বিষয়ে আশ্চর্য মিল আছে– প্রত্যেকেই নিজেকে মহৎ মনে করে এবং অন্য সবাইকে মনে করে নরাধম। 'সৎ এবং নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করার অর্থ হচ্ছে মরে যাওয়া।' স্টাইনবেকের মন্তব্য আমরা সবাই উপভোগ করলাম। স্পেন্ডার এগুলোকে এফরিজম বলে আখ্যায়িত করলেন। এফরিজমকে বাংলাতে সংজ্ঞা বলা যায় অথবা সূত্র, কিন্তু আমি মন্তব্য বলাই সঙ্গত মনে করছি।

আমাদের কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘটে কিয়োটো শহরের তেনরিওজি মন্দির চত্বরে রোববার ৮ই সেপ্টেম্বর। স্টাইনবেক আমাদের সঙ্গে ছিলেন না তিনি টোকিও থেকেই

www.pathagar.com

নিউইয়র্কে ফিরে গিয়েছিলেন। টোকিওতে স্টাইনবেকের বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হয়েছিলাম।

আমি সে সময় য়ুসুনাবী কাওয়াবাতার সঙ্গে পরিচিত হই। টোকিও সানেকী কায়কান ভবনে ককুসাই কক্ষে জাপানী পিইনএন ক্লাবের সভাপতি হিসাবে বিদেশী অভ্যাগতদের সংবর্ধনা জানাচ্ছিলেন। একটি কিমোনো পরিহিত শীর্ণকায় কাওয়াবাতাকে নিঃসঙ্গ ও নিরুত্তাপ মনে হচ্ছিল। দৃষ্টিতে শান্তি এবং বিনয় যাকে বলা যায় প্রথাগত ভদ্রতার সফল প্রতিচ্ছবি।

কাওয়াবাতার জন্ম ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ওসাকা শহরে। তিনি টোকিও ইম্পিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হন ১৯২৪ সালে। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি জাপানের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ঔপন্যাসিক ও সাহিত্য সমালোচক ছিলেন। তিনি এবং তানিজাকি জাপানী ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করেছেন তাঁদের বিভিন্ন রচনায়। তখন অবশ্য ক্রমান্বয়ে পাশ্চাত্য প্রভাবে জাপানী কথাসাহিত্যে প্রবল পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে এবং জাপানী ও পাশ্চাত্য ভাব প্রকল্পের সংমিশ্রণে নতুন স্বাদের কাহিনী লিখছেন জুন তাকামি, কিনোপিতো ও মিশিমা। 'বরফের দেশ' এবং সহস্র সারস কাওয়াবাতার দুটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। প্রাচ্যের ক্রমবিবর্তনশীল ঐতিহ্যের চিত্রপট সমতা ও মানবীয় করুণায় উন্মোচনের জন্য কাওয়াবাতা নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

কাওয়াবাতা এবং তানিজাকির উপন্যাসের প্রথাসিদ্ধ জাপানি রুচি, সম্ভ্রম বোধ এবং সামাজিক আচরণের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার পূর্বে জুতো খুলতে হবে এবং জুতোর মুখ ঘুরিয়ে রাখতে হবে বাইরের দিকে তাতামি মাদুরের উপর পা ফেলতে হবে সতর্কতার সাথে, খেয়াল রাখতে হবে, যেন যেখানে একটি মাদুরের সঙ্গে অন্য একটি মাদুরকে সেলাই করে জুড়ে দেয়া হয়েছে সেখানে পা না পড়ে। কক্ষের রূপসজ্জার প্রশংসা করতে হবে। দেয়ালে যে 'তাকেনোমো' ঝুলছে তার প্রশংসা করতে হবে। 'তাকেনোমো হচ্ছে এক ধরনের স্ক্রোল, তাছাড়া আনত হয়ে অভিবাদন করতে হবে। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে তন্ময় হয়ে পেয়ালাটির সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে হবে। 'সহস্র সারস' (জাপানী নাম সেমবাজরু) উপন্যাসের নায়ক কিকুজি কালো তরিবে (ষোড়শ শতকের গঠন রীতির মৃৎপাত্র) হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে বলছে, 'পাত্রটি চারশ বছরের পুরনো-চা অনুষ্ঠানের অগ্রনায়ক নোমোইয়মো এবং সেনরিকীয়োর সময়কার। এক হাত থেকে অন্য হাতে বাহিত হয়ে বহু দূরের ইতিহাস ধারণ করে আজ আমার হাতে এসে পৌঁছেছে উপন্যাসটির ঘটনা পরস্পর বিস্তারিত এবং বিলম্বিত লয়ের।

জাপানে কাওয়াবাতাকে অনেক ভিড়ের মধ্যে একাকী ও বিচ্ছিন্ন দেখেছি, একান্তে পাইনি। একদিন শুধু আমরা কয়েকজন মিলে তাঁর সঙ্গে জাপানী প্রথাগত জীবন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিকেল বেলা ইম্পিরিয়াল হোটেলের লাউঞ্জে আমি আলবার্তো মোরাভিয়া এঙ্গাস উইলসন সেই ইতো এবং আরও কয়েকজন একটি রিসেপশনে যাব বলে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় কাওয়াবাতা সেখানে এসে অভিবাদন করে আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। আরবার্তো মোরাভিয়া জানালেন যে, জাপানী অভ্যর্থনায় আমরা অভিভূত হয়েছি কিন্তু নিয়মকানুন ঠিক মত জানি না বলে প্রয়োজন ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করতে পারছি না। জাপানী অধ্যাপক ইতো কাওয়াবাতাকে কি যেন বললেন, কাওয়াবাতাও উত্তর দিলেন। সেই ইতো মোরাভিয়ারও দিকে ফিরে বললেন, 'কাওয়াবাতাসান জানাচ্ছেন যে, জাপানীরা নিয়ম এবং রীতি প্রকরণের মধ্যে থাকেন এবং কোনরূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন না, কিন্তু তাই বলে আপনারা ভাববেন না যে আমাদের হৃদয় নেই।'

'আচ্ছা, যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কি আপনাদের সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে? এক সময়ে জাপানে য়ুরোপে মধ্যযুগের নাইটদের মত সামুরাইদের খুব প্রতিপত্তি ছিল। সামুরাই হচ্ছে বীরযোদ্ধা, আত্মসম্মান রক্ষার জন্য যারা প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। সর্বক্ষেত্রে তারা অগ্রগণ্যতা পেয়েছে। দাইমিয়ো অথবা সম্রাটের সুযোগ্য অনুসারী ছিল এরা। এদের কারণেই যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষরা প্রাধান্য পেয়েছে, রমণী হয়েছে অনুসরণকারিণী। কিমোনো পরিহিত কোন রমণী তার পুরুষ সঙ্গীর সামনে যাবে না, পাশাপাশিও হাঁটবে না, পিছনে থাকবে।' সেই ইতো বললেন, 'অবশ্য পাশ্চাত্য জীবনধারার যুক্তি নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে জাপানী সমাজ জীবনেও অনুপ্রবেশ করছে। বিজ্ঞান চর্চায় জাপানের অগ্রগতির ফলে রমণী ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান থাকছে না। আধুনিক য়ূরোপের মত এদেশে রমণীরাও পশ্চাদবর্তিনী না থেকে পার্শ্ববর্তিনী হচ্ছেন বলে মনে হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও প্রাচীন প্রথাবদ্ধ জাপানী শৃংখলাবোধ আমাদের সমাজ জীবনকে সূক্ষ্মভাবে শাসন করছে।

এঙ্গাস উইলসন ইংরেজ ঔপন্যাসিক, এক সময় অ্যাংরি ইয়ংম্যান বলে পরিচিত হয়েছিলেন। প্রথাবদ্ধ জীবনকে পছন্দ করেন না চিরাচরিত রীতি ভেঙ্গে ফেলতে পারলে আনন্দিত হন। তিনি বললেন, 'মানুষের অস্তিত্বটাই যেখানে অস্বাভাবিক সেখানে একটি বিশেষ ধরনের শৃংখলিত এবং নিয়মানুগ কার্যকারণ তৈরী করা যায় কি?

কাওয়াবাতা বললেন, 'জাপানী বিবেচনায় অস্তিত্ব অস্বাভাবিক নয়, অনিত্য এবং আমাদের চৈতন্যে একমাত্র মৃত্যুরই একটি অবিনশ্বরতা আছে। আমরা মৃত্যুকে সম্মান করি এবং মৃত্যুকে সচেতনভাবে গ্রহণ করি। ফিউডাল যুগের উপন্যাসে দেখা যাবে একটি ব্যর্থ প্রেমের কারণে দুটি আত্মহত্যা ঘটেছে। এ আত্মহত্যা একটি বিশেষ ধরনের মানসিকতাকে উন্মোচিত করে, যেখানে প্রেম নামক চৈতন্যকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে মৃত্যুকে গ্রহণ করা হচ্ছে। চিত্তকে নিষ্কলুষ রাখার জন্য মৃত্যুকে আমরা সহজেই বেছে নিই।

সেই ইতো আরো একটু ব্যাখ্যা করে বললেন, 'কাওয়াবাতাসান এক ধরনের অনুভূতির কথা লিখেছেন। তাঁর ভাষায় তা হচ্ছে 'সাৎসুগো নো মে' এর তাৎপর্য হচ্ছে 'মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে বাস্তবতাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা। জাপানী বৌদ্ধচর্চায় 'মুজো' বলে একটি শব্দ আছে যার অর্থ হচ্ছে অস্থায়ী। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতায় নশ্বরতা বা অস্থায়িত্বকে একমাত্র মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত করেই আবিষ্কার করা সম্ভব।

কাওয়াবাতার 'সহস্র সারস' উপন্যাসে একটি আত্মহত্যা আছে। উপন্যাসের নায়ক কিকুজি আমন্ত্রিত হয়েছে একটি চায়ের অনুষ্ঠানে। আমন্ত্রণ করেছেন তাঁর মৃত পিতার স্বল্পকালীন রক্ষিতা বিকাকো। উদ্দেশ্য বিবাহ বন্ধনের সম্ভাবনায় একটি মেয়ের সঙ্গে কিকুজির পরিচয় করিয়ে দেয়া। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিসেস ওতা ও তার কন্যা ফুমিকো। মিসেস ওতাও কিকুজির পিতার সঙ্গিনী ছিলেন। কিকুজির মধ্যে অকস্মাৎ মিসেস

www.pathagar.com

ওতা কিকুজির পিতাকে যেন দেখলেন এবং কিকুজিকে অভিভূত করে তার সঙ্গে গোপনে দেহ সম্পর্কে মিলিত হলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁর গ্লানি উপস্থিত হল। তিনি গ্লানিমুক্ত পবিত্রতা সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় আত্মহত্যা করলেন। সর্বশেষে দেখি কিকুজি ফুমিকোকে পাবার ইচ্ছায় পথে বেরিয়েছে। চোখ তুলে তাকিয়ে সে আকাশে একটি নক্ষত্র দেখতে পেল।

কাওয়াবাতা ব্যক্তিগত জীবনে যেন সামাজিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। বুদ্ধিজীবী হিসাবে তিনি নিজের জন্য একটি নিঃসঙ্গ অন্তরাল নির্মাণ করেছিলেন দেশ ও পৃথিবীর রাজনৈতিক আবর্ত থেকে মুক্ত এবং পারিবারিক বন্ধন থেকে নিরুপদ্রব দূরত্বে স্থিত, ইংরেজীতে যাকে বলি পারসনাল ইনটেগরিটি অর্থাৎ একান্ত ব্যক্তিগত সততা এবং নিষ্ঠা, কাওয়াবাতার জীবনে এবং উপন্যাসে তারই প্রতিচ্ছবি পাই।

কাওয়াবাতা আপন জীবনেও মৃত্যুর আবিষ্কারকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সামুরাই নীতিবোধ দ্বারা সমর্থিত এবং অভিসিক্ত হারাকিরির দ্বারা তিনি মৃত্যুকে গ্রহণ করেন। কেন জানি না। হয়তোবা জীবনের অনস্তিত্বের অন্তরঙ্গ রূপকে শেষ মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করবার ইচ্ছায়।

॥১৭॥

কিছুদিন আগে অন্নদাশংকর রায় তার টলস্টয়ের ওপর লেখা চটি বইটি আমাকে পাঠিয়েছেন। বইয়ের শিরোনামের নিচে নিজ হাতে লিখে দিয়েছেন 'জাপানের কথা আজো ভুলিনি'। হঠাৎ মনে পড়লো ১৯৫৭ সালে আমরা জাপানে কিছুদিন একসঙ্গে ছিলাম। আন্তর্জাতিক লেখক সংঘের একটি সম্মেলনে আমরা টোকিওতে মিলিত হয়েছিলাম। সে সময় অন্নদাশংকরকে দেখেছিলাম অসম্ভব কৌতূহলী, জীবনময় এবং তরুণের মতো সর্বমুহূর্তে আগ্রহে প্রদীপ্ত। যা চোখে পড়ছে তাকে ভালো করে দেখছেন, যা দেখছেন তাকে ভালো করে জানবার চেষ্টা করছেন এবং সবকিছুতে উল্লসিত হচ্ছেন। তিনি একসময় কোন একটি প্রবন্ধে যেন লিখেছিলেন, 'যা সনাতন তা নতুনের মধ্যে ফিরে ফিরে প্রকাশ। মানুষের চোখ নিত্যনতুনের প্রেমিক। যে তার প্রেমের মূল্য বোঝে সে তাকে নিত্য নতুন করে দেখায়। এভাবে নতুন করে দেখার মধ্যে আনন্দকে একজন মানুষ আকাঙ্ক্ষা করে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

টোকিওতে একদিন একটি পুরনো মন্দিরের সামনে অনেক ছোট ছোট পাথর পড়ে আছে দেখলাম। পথচারীরা যারা যাচ্ছে এক একটি পাথর মন্দিরের ছাদে ছুঁড়ে চলে যাচ্ছে। অন্নদাশংকর জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন এ প্রথাটির তাৎপর্য কি? লোকটি বলল, যিনি পাথর ফেলছে তিনি এ আশায় ফেলছেন যে তিনি আবার এখানে ফিরে আসবেন। অন্নদাশংকর বললেন, 'বেশ ভাল প্রথা তো। ফিরে আসি বা না আসি ফিরবার প্রত্যাশাটি বেঁচে থাকুক।' এই বলে তিনি একটি পাথর মন্দিরের ছাদে ছুঁড়ে দিলেন। এভাবে শিন্টো মন্দিরের চত্বরে মানুষ সমান উঁচু পাথরের প্রদীপ-আধার দেখে তিনি কৌতূহলী হয়েছেন, জিজ্ঞেস করেছেন, 'এগুলো কিসের জন্যে?' স্থানীয় লোকেরা বলেছে, 'পিতৃপুরুষকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এই প্রদীপাধারের মধ্যে উত্তর-পুরুষেরা প্রদীপ জ্বেলে যায়।' অন্নদাশংকর জিজ্ঞেস করলেন, 'আমিও কি একটি প্রদীপ জ্বালাতে পারি না।' মন্দিরের পুরোহিত তাকে

www.pathagar.com

বললেন, 'দিতে পারেন, তবে কেন দেবেন? যার স্মৃতিতে প্রদীপ জ্বালবেন তিনি তো আপনার কেউ হন না।' অন্নদাশংকর বললেন, 'মানুষ হিসেবে তিনি আমার পূর্বপুরুষ তাই তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবো। অন্নদাশংকর একটি নীল রংয়ের মোমবাতি কিনে প্রদীপাধারের একটি প্রকোষ্ঠে জ্বালিয়ে দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'নীল রংএর কেন', তিনি বললেন, নীল হচ্ছে সান্ত্বনার রং, বরাভয়ের রং। আমি অতীতের কাছ থেকে সান্ত্বনা চাই, বরাভয় চাই। অন্নদা শংকরকে এইভাবে জাপানে প্রাণের বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে আমি আবিষ্কার করি। জাপানেরই আর একটি ঘটনার উল্লেখ করব যে ঘটনার মধ্য দিয়ে অন্নদাশংকরের অসীম সাহস এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা সুস্পষ্ট হয়। কনফারেন্সে আগত এশীয় দেনসমূহের প্রতিনিধিদেরকে ভারতের রাষ্ট্রদূত একটি মধ্যাহ্ন ভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসাবে আমি নিমন্ত্রিত হই নি।

ইমপেরিয়াল হোটেল থেকে অন্নদাশংকর রায় যখন ভোজে যাচ্ছেন, তখন আমাকে তিনি তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায়?' কেননা তখনও আমি এই নেমন্তন্নটার ঘটনা জানি না। অন্নদাশংকর রায় পরে কথা হবে এই বলে চলে গেলেন। বিকেলে প্রভাকর আমাকে বললো, 'আজ দুপুরে অন্নদাশংকর এক মারাত্মক কাজ করেছেন। খেতে বসে রাষ্ট্রদূতকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পাকিস্তানের প্রতিনিধি উপস্থিত নেই কেন? আরো বললেন, 'যিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসাবে এসেছেন, তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং এশীয় প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত থাকার অধিকার আছে। যদি তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে আমন্ত্রণ জানানো না হয়ে থাকে তাহলে তিনি খাদ্য গ্রহণ করবেন না।' রাষ্ট্রদূত তাঁর অফিসের গাফিলতির জন্য এ ত্রুটিটি ঘটেছে এই বলে রেহাই পেলেন। আমি সন্ধ্যার দিকে অন্নদাশংকরকে খুঁজে বের করে এইজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। কিন্তু জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা করার কি দরকার ছিল?' তিনি বললেন, 'আমি রাজনীতিবিদ নই, তবে মানব হিতৈষণা ক্ষেত্রে যা অপরাধ তাকে আমি অপরাধ বলেই মনে করি এবং প্রতিবাদ করি।' সে সময় অন্নদাশংকরকে খুব ক্ষুব্ধ দেখা যাচ্ছিল। একজন মানুষকে শিরায় শিরায় অক্ষয় যৌবনের উষ্ণ রক্ত প্রবাহ না থাকলে এ প্রকার আচরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। অন্নদাশংকর অস্তিত্বকে জরাগ্রস্ত করতে চাননি এবং প্রেমে সকল মানুষকে আপন বলয়ের মধ্যে আকর্ষণ করতে চান।

টোকিওতে যে ক'জন ভারতীয়র সঙ্গে আমার সাক্ষাত ঘটে তাদের মধ্যে প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, উমাশংকর যোশী এবং বাৎসায়ন আমার খুব নিকটের মানুষ হয়ে পড়েন। প্রভাকরকে আমি পূর্বেই জানতাম। ১৯৫৫ সালে সে প্রথম করাচীতে আসে সেখানেই তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। প্রভাকর ছিল একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার এশীয় ব্যুরোর পরিচালক। সেই সূত্রেই সে করাচীতে এসেছিল। করাচীতে তার যোগাযোগের সূত্র ছিল বিখ্যাত আইনবিদ এ কে ব্রোহী। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করবার জন্য 'কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম' নামক একটি প্রতিষ্ঠান প্যারিসে গড়ে উঠেছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত এবং মনীষীবৃন্দ যুক্ত ছিলেন। ভারতের জয়প্রকাশ নারায়ণ উক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানেরই পাকিস্তানী শাখা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রভাকর করাচী এসেছিল। যে বছর প্রভাকর করাচী আসে সে বছরই

www.pathagar.com

প্রভাকরের আগে কিংবা পরে বিখ্যাত ইংরেজ কবি স্টিফেন স্পেন্ডার করাচী এসেছিলেন। স্পেন্ডার প্যারিসের প্রধান কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। এ দুজনের পরিচিতি সূত্রে এবং প্রতিষ্ঠানের আদর্শের সমর্থনে আমি উক্ত প্রতিষ্ঠানের করাচী শাখায় সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হই। এ কে ব্রোহী সভাপতি নিযুক্ত হন। যাই হোক জাপানে প্রভাকরকে কাছে পেয়ে খুশী হয়েছি। সোগো বলে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার পিইএন-এর এশীয় প্রতিনিধিদের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। উক্ত সাক্ষাৎকারে প্রভাকর বলে, 'আমি জাপানে এসে ভারতবর্ষকে নতুন করে দেখছি। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার একটি অঙ্গীকার আমি জাপানে আবিষ্কার করেছি। যে বুদ্ধকে জাপানীরা গ্রহণ করেছেন তিনি ভারতেরই একজন মহাপুরুষ ছিলেন।' প্রভাকরের বক্তব্যে জাপানীরা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল এটা লক্ষ্য করে আমার পালা যখন এল তখন আমি বললাম, 'এখানে এসে আমি যা কিছু দেখছি সবই আমার চোখে নতুন। প্রতি পদক্ষেপেই আমি বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। এ বিস্ময়ের স্মৃতি নিয়ে আমি দেশে ফিরে যেতে পারব এটাই আমার আনন্দ। আমার বক্তৃতায় জাপানীরা খুবই খুশী হল। জাপানী চরিত্রের একটা দিক আমি লক্ষ্য করেছি যে তারা অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ী এবং গর্বিত জাতি। তাদের সংস্কৃতি এবং সভ্যতার বিশিষ্টতা অন্য কোন দেশের সাথে মিলবে এটা তারা ভাবতেই পারে না। তারা মনে করে যে তাদের সবকিছুই অনন্য এবং অসাধারণ। তাদের একপ্রকার অন্তর্মুখিতা আছে। আমি সেই অন্তর্মুখিতার কথা ভেবে আমি আমার বক্তব্য পেশ করেছিলাম। প্রভাকর ভারতীয়দের সংস্কৃতিগত ঔদ্ধত্যে অন্য দেশকে বড় করে তুলে ধরতে চেয়েছিল। এর ফলে প্রভাকরের বক্তব্য জাপানীরা মেনে নিতে পারে নি।

উমাশংকর যোশী ছিলেন পণ্ডিত এবং সংস্কৃতিবান পুরুষ। সর্বাংশে আসাম্প্রদায়িক এবং সকল মুহূর্তে যথার্থ আগ্রহ নিয়ে একটি নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। আবার বাৎসায়ন ছিলেন জীবনরসিক কবি। এদের সান্নিধ্যে জাপানে আমার সময় ভাল কেটেছিল। কনফারেন্সের মাঝে একদিন রাত্রির প্রথম যামে প্রভাকর, আমি, উমাশংকর এবং বাৎসায়ন 'গিনজা' এলাকায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। গিনজা এলাকাটি রাত্রিতে পর্যাপ্ত আলোকসজ্জায় দীপ্যমান থাকে। এখানে ঘুরতে ঘুরতে আমি এবং প্রভাকর, উমাশংকর এবং বাৎসায়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আমরা ব্যাকুল হয়ে ওদের দুজনকে অনুসন্ধান করছি। এমন সময় দু জন জাপানী পুলিশ আমাদের ধরে নিয়ে একটি থানায় উপস্থিত করেন। ঘটনাটি হয়েছিল এই– আমরা যেমন উমাশংকরদের অনুসন্ধান করছিলাম, উমাশংকরও তেমনি আমাদের অনুসন্ধান করতে গিয়ে এক পর্যায়ে বুদ্ধি করে থানায় খবর দেয় এবং তাই পুলিশ আমাদের থানায় ধরে নিয়ে আসে। এ ঘটনাটি নিয়ে আমরা পরে প্রচুর হাসাহাসি করেছি। বাৎসায়ন সে সময় রকফেলার ফাউন্ডেশনের একটি অনুদানে জাপানে অবস্থান করছিলেন। বাৎসায়ন পরে হিন্দী ভাষার একজন অনন্যসাধারণ কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তার কবিতার মূল বিষয় হচ্ছে সমুদ্র। সকল কিছুই সমুদ্র থেকে এসেছে এবং সকলেই সমুদ্রে প্রত্যাগমন করবে–এই হল তার কাব্যদর্শন। বাৎসায়ন সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন। প্রভাকর কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন। উমাশংকর এখনও জীবিত এবং ভারতবর্ষের একজন সম্মানিত ব্যক্তি।

www.pathagar.com

জাপানে পিইএন কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘটে কিয়েটো শহরে। কনফারেন্স শেষে সেখানকার একটি বাগানে আমাদের অভ্যর্থনা দেয়া হয়। উক্ত অভ্যর্থনায় বহু গীর্যা রমণী আমাদের আপ্যায়নের জন্য উপস্থিত ছিলেন। বাৎসায়ন দু/তিনজন রমণীকে সঙ্গে নিয়ে এক জায়গায় বসে গল্প করছিলেন। অন্য দিকে প্রভাকরের কাছে একজন রমণীও ছিলেন না। এ অবস্থা দেখে আলবার্তো মোরাভিয়া মন্তব্য করেছিলেন, 'এরা উভয়েই একই নৌকায় পা রেখেছে, প্রভাকর একাকী কিছুই করতে পারছে না। বাৎসায়নও দু তিনটি রমণীকে নিয়ে কিছুই করতে পারছিলেন না।' মোরাভিয়ার কথায় আমরা সবাই খুব হেসেছিলাম।

জাপানে 'ফুকোজাওয়া' নামক বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। ১৯৫৭ সালে যখন আমি তাকে দেখি তখন তার বয়স প্রায় সত্তর। শরীর দেখেই মনে হল যৌবনে খুব স্বাস্থ্যবান ছিলেন। দীর্ঘকায় এবং বলিষ্ঠ। গোলাকার মুখ, মাথায় চুল খুব কম। চোখে সোনার রীমের চশমা। ওষ্ঠ এবং চোখ দুটো হাস্যময়। বিমূর্ত চিত্রকলাকে জাপানের দৈনন্দিন জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নবভাবে, নতুন স্বাদ ও ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর ছবির একটি বৈশিষ্ট্য তাদের বর্ণাঢ্যতা। রঙের বিস্তার ও প্রলেপে কেমন এক প্রকার অপরিজ্ঞাত রহস্যময়তা।

আমি ফুকোজাওয়াকে জীবন রকিক হিসাবে দেখেছি। কোন প্রকার জটিলতার মধ্যে না গিয়ে সহজভাবে সকল কিছুকে গ্রহণ করতেন। এক প্রকার নিশ্চয়তা এবং আনন্দ তার কথা বলায়, পথ চলায়, বসবার ভঙ্গীতে, খাবার সময় ধরা পড়তো। বয়সের জীর্ণতা তাকে দুর্বল করেনি, বিনয় ও নবনীত করেছে।

টোকিওতে জাপানী খাবারের সঙ্গে আমার কেমন যেন অসদ্ভাব ঘটেছিল প্রথমে। অনভ্যস্ততার দরুন স্বাদ গ্রহণে অসুবিধা হয়েছে। ফুকোজাওয়া এটা জানতে পেরে আমাকে একদিন রাতে নিয়ে গেলেন আকাহানে রেস্তরাঁতে। রেস্তরাঁটি হিকাওয়া মন্দিরের কাছে, ফুকুয়ুশিকো এলাকায়। ফুকোজাওয়া বললেন, রেস্তরাঁটি আকাহানে পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং রাজপরিবারের সমর্থনপুষ্ট। জাপানে শিক্ষিত বাজপাখী দিয়ে বন্য পাহাড়ী এলাকা থেকে ছোট ছোট পাখি ধরবার কৌশল বহুদিন ধরে প্রচলিত আছে। প্রধানত শিনকু অঞ্চল থেকে এসব পাখি ধরা হয়। এ রেস্তরাঁয় বাজপাখীর সাহায্যে ধরা বুনোহাঁস এবং ছোট ছোট পাহাড়ী পাখি বিশিষ্ট প্রক্রিয়ায় রান্না করা হয়। তুমি অল্পক্ষণের মধ্যে এর স্বাদ পাবে।'

খাদ্য গ্রহণ এবং খাদ্য পরিবেশনকে জাপানীরা একপ্রকার সম্ভ্রান্ত অনুষ্ঠান এবং বিনয় নম্র উপাসনায় পরিণত করেছে। তারই একটি নিদর্শন আমি পেলাম। শিল্পী ফুকোজাওয়া জাপানী জীবনের একটি অনুরাগময় তৃপ্তির দিকের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে আমাকে চিরকৃতজ্ঞ রাখলেন।

জাপানী রান্নার মধ্যে 'টেমপুর' খুবই সহজ এবং জনপ্রিয়। 'টেমপুর'র বর্ণটি স্বরধ্বনিসহ উচ্চারিত হবে। ইংরেজীতে উচ্চারণটি বুঝিয়ে দেয়া যায় এভাবে টেম-পু-রো। সামুদ্রিক মাছ প্রধানত চিংড়ি এবং সবজির টুকরো, ময়দা এবং ডিমের তরল মণ্ডে মাখিয়ে পর্যাপ্ত তেলে ভেজে তুলতে হয়। এভাবে ভাজা মাছ এবং সবজি খাবার আগে শোয সসে ডুবিয়ে নিতে হয়। এ সসে মুলোর রস আছে, রসুন আছে, সরষে বাটা আছে। যে সব সবজি টেমপুরতে ব্যবহার হয় তা হচ্ছে কুমড়োর পাতা, বেগুন, মাশরুম, কাঁচামরিচ, গাজর, পদ্মগোটা। আলুও ব্যবহার

www.pathagar.com

করা যায়। টেমপুর মূলত জাপানী খাবার নয় জাপানী রান্নায় এর মধ্যে উপকরণগত বৈচিত্র্য এসেছে। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় পর্তুগীজরা জাপানে টেমপুর প্রচলন করে। টোকিওতে বিশেষ ধরনের টেমপুর রেস্তরাঁও আছে। আমি ফুকোদাওয়াকে টেমপুর কথা বলায় তিনি মন্তব্য করলেন, 'টেমপুর এমন কিছু রান্না নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই প্রচলিত আছে। তবে আমরা এ পরিবেশনায় কিছু বিশেষত্ব এনেছি।"

রেস্তরাঁ থেকে বেরুবার সময় খাদ্য পরিবেশনকারী মেয়েদের মধ্যে একজন উপহারস্বরূপ আমাকে দুটো 'সাকে' পাত্র দিল। ফুকোজওয়া বললেন, 'রেস্তরাঁটির স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে কাপ দুটো তোমাকে দেয়া হয়। জাপানী ভাষা, এ কাপের নাম সাকাজুকি।'

পরিবেশনকারী মেয়েদের ধন্যবাদ দিলাম। অবাস্তব হলেও তাদের কিমোনোর প্রশংসা করলাম। ফুকোজাওয়াকে বললাম, 'কিমোনো পরলে জাপানী মেয়েদের সুন্দর দেখায় কিন্তু টোকিওর পথেঘাটে হোটেল রেস্তরাঁর দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয় এর প্রচলন ক্রমশ উঠে যাচ্ছে।'

ফুকোজাওয়া হেসে বললেন, 'এখনকার দিনের তরুণীরা নিজেদেরকে দর্শনীয় করে তুলতে চায়। বিধাতা তাদের শরীর যেভাবে গড়েছেন তা ইউরোপীয় পোশাকে যতটা দর্শনীয় হয়, কিমোনোতে তেমন হয় না।'

আমি বললাম, 'মেয়েরা নিজেদেরকে দর্শনীয় করে পুরুষের জন্য। পুরুষের ইচ্ছা এবং সামর্থ্য নেই। মেয়েদের পোশাকের বিবর্তন ঘটেছে যুগে যুগে প্রত্যেক দেশে তাই না?

ফুকোজাওয়া নিম্নস্বরে কথা বলেন এবং তাও বলেন কোন তত্ত্ব বা ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা না এনে। সহজ ভঙ্গীতে বললেন, 'তাতো বটেই, বিশেষ করে গল্পকার ও ঔপন্যাসিকদের ইচ্ছার পরিবর্তন এসেছে খুব তাড়াতাড়ি।

'কিমোনোর কারণে মেয়েরা এত বেশী আবরিত থাকে যে প্রেমিকের চোখে পড়ে শুধু চোখ, কান, নাক এবং ঠোঁট। পিছনে ঘাড়ের কাছে কিমোনোর কলারটি একটু হেলে থাকে বলে সেখানকার কিছু অংশ চোখে পড়ে। এসবের বিবরণ আমাদের গল্প উপন্যাসে এত বেশী এসেছে যে এখন আর এগুলো ভাল লাগছে না। পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আমি বললাম 'আমি এখানে বসে একটিমাত্র জাপানী উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ পড়েছি। ইয়াসুনারী কাওয়াবাতার সেমবাজরা–ইংরেজীতে থওজান্ড ক্রেইন্স। জাপানের পুরনো প্রথাগত জীবনধারার পটভূমিতে একটি প্রেমের গল্প। উপন্যাসটিতে অনুষ্ঠানগত চা পরিবেশন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। পাত্র-পাত্রীরা পুরনো চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকছে। শিল্প সমৃদ্ধিতে জাপান এখন এত দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে যে এ ধরনের স্তব্ধতা আধুনিক কালের পরিপন্থী মনে হয়।

ফুকোজাওয়া বললেন, পরিবর্তন তো হবেই, পরিবর্তন অপরিহার্য, কিন্তু ট্রাডিশনাল বস্তুগুলো একে একে হারিয়ে যাবে এটা ভাবতেই যেন কেমন লাগে।

ফুকোজাওয়া আমাকে ইম্পিরিয়াল হোটেলের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। আমি করমর্দন করে বললাম–'আর্রিগাতো–ধন্যবাদ'।

www.pathagar.com

॥১৮॥

আমার সঙ্গে জাপানে গিয়েছিলেন কুররাতুল আইন হায়দার। ভদ্রমহিলা উর্দু ভাষার দক্ষ ঔপন্যাসিক। তাঁর 'আঁখ কি দরিয়া' বা 'অগ্নি সাগর' উপন্যাসটি ভারতের সাহিত্য আকাদেমীর পুরস্কার লাভ করে। এই উপন্যাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির অভ্যুদয় এবং প্রাণচৈতন্য সম্পর্কে আলোচনা আছে, আর্যদের আগমনের কথা আছে, গৌতম বুদ্ধের বিনয় এবং শুদ্ধতা সাধন সম্পর্কে মন্তব্য আছে। মুসলমানদের আগমনের কথা আছে। এক কথায় এই উপন্যাসটি ভারতবর্ষের বিচিত্র জাতি সম্মেলনের একটি প্রেক্ষাপট। উপন্যাসটি মহিলা লিখেছিলেন করাচীতে থাকার সময়। সে সময় পাকিস্তানে উর্দুভাষী অঞ্চলে এই উপন্যাসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ এবং ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছিল, যার ফলে মহিলা পাকিস্তান ত্যাগ করেন এবং স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে বসবাস আরম্ভ হয়। ১৯৫৭ সালে আমরা যখন যাই তখন তিনি এই উপন্যাস লেখেন নি, তখন তিনি পাকিস্তান চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মচারী ছিলেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। এবং পরিচয়টি নিতান্ত সাধারণ সাক্ষাৎকারেই আবদ্ধ ছিল। ভদ্রমহিলার দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ, প্রকৃতি ছিল চঞ্চল এবং গতিভঙ্গী ছিল সাবলীল। আমি করাচীতে প্রকাশনা দফতরের প্রধান আজিজ আহমদের কক্ষে একে দেখেছিলাম।

করাচী থেকে একসঙ্গে প্লেনে গেলেও আমরা পাশাপাশি বসি নি। যাত্রাপথে মাঝখানে একবার উঠে গিয়ে ভদ্রমহিলার সিটের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর কুশল জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাঁর পাশের সিট খালি ছিল। আমাকে দেখেই তিনি সেই সিটে তাঁর হাতব্যাগটা রাখলেন এবং তাঁর হাতে যে বইটি ছিল সে বইটিও উপুড় করে রাখলেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, তিনি ভালই আছেন তাঁর অসুবিধা নেই। আমি কিছুটা বিব্রত এবং তাঁর অসামাজিক আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে আমার সিটে ফিরে এলাম। আমার ধারণা হল পাছে আমি তাঁর পাশের সিটে বসে পড়ি এই আশংকায় মহিলা সেখানে বই এবং ব্যাগ রেখেছিলেন। ব্যাংককে আমাদের রাত্রিবাস করতে হয়েছিল।

সেখানে প্লেনের পক্ষ থেকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন হোটেলে ছিলাম। জাপানে অন্য সবার মত আমরা ছিলাম ইম্পিরিয়াল হোটেলে। কনফারেন্স চলাকালীন সময়ে মহিলা আমার পাশে বসতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু অন্য সব অনুষ্ঠানের সময় তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নি। পাকিস্তানী হিসাবে আমরা দু জন একসঙ্গেই থাকব–এটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু মহিলা কেন যেন আমার সঙ্গ পরিহার করছিলেন। তবে আমার এতে কোন অসুবিধা হয় নি। কেননা আমি সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলাম অন্নদাশংকর রায়, বাৎসায়ন, উমাশংকর যোশী এবং প্রভাকর পাধ্যায়। তবে কনফারেন্স শেষে ভদ্রমহিলা কেন যেন আমার সঙ্গ কামনা করলেন। আমি কনফারেন্সের শেষে আরও এক সপ্তাহ থাকব বলে ঠিক করেছিলাম আমার নিজের খরচে। ভদ্রমহিলাও অনুরূপভাবে টোকিও থাকবেন বলে ঠিক করলেন। আমি তখন উঠলাম ওয়াইএমসিএতে এবং মহিলা উঠলেন ওয়াইডব্লিউসিএতে। দুটো দালানই কাছাকাছি ছিল। এ সাতদিন আমরা একে অন্যের সঙ্গেই ছিলাম। আমরা এক সঙ্গে গিনজা এলাকায় ঘুরেছি, থিয়েটারে গিয়েছি, নো নাটক দেখেছি এবং বিপণী বিতানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেছি। এই

www.pathagar.com

সাতটা দিন ভদ্রমহিলার আচরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক, অমায়িক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। এর মধ্যে এক রাত্রে তিনি আমাকে নিয়ে 'মাইনিচি' পত্রিকায় কার্যরত একজন পাকিস্তানী ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। এই সাক্ষাতের ইতিহাসটি কৌতুকাবহ। ভদ্রলোককে আমরা পেলাম মাইনিচির বৈদেশিক ব্যুরোর কাছে একটি বার-এ।

সেখানে তিনি মদ্যপান করছিলেন। ভদ্রলোক ছিলেন ইংরেজীতে যাকে বলে প্লামবয়েন্ট অর্থাৎ দীপ্তিময় উচ্ছল। মিস হায়দারকে দেখে হৈ হৈ করে উঠলেন। এক হাতে তাকে টেনে এবং আরেক হাতে আমাকে টেনে নিয়ে একপাশে বসলেন। এবং ভদ্রমহিলাকে করাচী সম্পর্কে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি হৈচৈ করে উঠে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে আমাদের দুজনকে নিয়ে রাতের টোকিও দেখাতে বের হলেন। অনেক রাত পর্যন্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে আমরা আলোকোজ্জ্বল টোকিওর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখলাম। এসব দেখা শেষ হবার পর ভদ্রলোক প্রস্তাব করলেন যে তিনি ট্যাক্সি করে আমাদের রেখে আসবেন। আমার ওয়াইএমসিএ প্রথমে পরে কিন্তু মিস হায়দার আমাকে তখন নামতে দিলেন না। বললেন যে তাকে ওয়াইডব্লুসিএতে নামিয়ে ফিরত পথে আমি নেমে পড়তে পারব। ফিরতি পথে পাকিস্তানী ভদ্রলোক মিস হায়দার সম্পর্কে খুব অশোভন মন্তব্য করছিলেন। বলছিলেন, আইনী খুব সাধু সাজতে চায়, তোমাকে দেখাতে চায় সে কি রকম সম্ভ্রান্ত রুচির মহিলা। আমার সঙ্গে একা যেতে চায় না। আমি তার সব ইতিহাস জানি। আরও অনেক কিছু বলেছিলেন এখন সব মনে করতে পারছি না।

টোকিও থেকে আমরা ম্যানিলায় গেলাম। ম্যানিলায় আমার জন্য কিছু অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল এশিয়া ফাউন্ডেশন, আমি সেখানে তাদেরই অতিথি ছিলাম। মিস হায়দার নিজের ব্যবস্থায় ম্যানিলায় যাচ্ছিলেন। হ্যানেটা বিমান বন্দরে ম্যানিলাগামী প্লেনে উঠবার আগে কাউন্টার থেকে বোর্ডিং কার্ড নেবার সময় একটি ঘটনা ঘটলো। কার্ড যিনি দিচ্ছিলেন তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কি এক সঙ্গে যাচ্ছেন?—আর ইউ ট্রাভেলিং টুগেদার? আমি কিছু বলবার আগেই মিস হায়দার স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'না'। আমি হঠাৎ চমকে উঠলাম। কাউন্টারের লোকটি তখন আবার বলল, 'আমি তো তোমাদের একসঙ্গেই দেখছি অনেকক্ষণ ধরে। এবার আমি উত্তর করলাম, 'আমি ওকে চিনি না। এখানেই দেখা হল।' ম্যানিলার বিমান বন্দরে আমার জন্য এশিয়া ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি একটি গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। আমি ভদ্রমহিলাকে কিছু না বলে গাড়িতে উঠতে গেলাম। তখন ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও ভদ্রমহিলা কি যাবেন না?' আমি একটু জোরে উত্তর করলাম, 'ওকে জিজ্ঞাসা করুন। উনি তো আমার সঙ্গে আসেন নি।' অবশেষে আমরা ভদ্রমহিলাকে লিফট দিয়েছিলাম। এরপর তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তবে অবশেষের একটি কথা আছে বাংলাদেশ হওয়ার পর ১৯৭৫ সালে আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে বোম্বাই গিয়েছিলাম।

বোম্বাইতে অবস্থানকালে 'ধর্মযুগ' এর সম্পাদক ডঃ ধর্মবীর ভারতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। আর্মি অ্যান্ড নেভী বিল্ডিং এ কথাবার্তা চলছে, এর মধ্যে এক ফাঁকে ধর্মবীর ভারতী জিজ্ঞেস করলেন, কুররাতুল আইন হায়দার এখানে কাজ করেন। তিনি

www.pathagar.com

ইলাস্ট্রেট উইকলির সহসম্পাদক। তাকে আপনার কথা বলি, কেমন? আমি একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে রাজী হলাম। কিন্তু মিস হায়দার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন না, তিনি জানালেন যে তিনি ব্যস্ত আছেন। ভদ্রমহিলার সামগ্রিক আচরণের ব্যাখ্যা আজও আমি খুঁজে পাই নি।

ম্যানিলায় ফ্রান্সিসকো সিওনীল হোজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল করাচীতে। প্যারিস থেকে ফিরবার পথে ভদ্রলোক করাচীতে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তার ঠিকানা তখন আমি রেখেছিলাম। ম্যানিলায় পৌঁছে হোটেল ফিলিপিলেতে উঠেছিলাম। সেখানে পৌঁছে হোজেকে টেলিফোন করতেই সে হোটেলে এসে আমাকে তার বাসায় নিয়ে গেল। ম্যানিলায় যে কদিন ছিলাম সে কদিন হোজের বাসায় ছিলাম। সুমধুর আন্তরিকতায় আমার সময় কেটেছিল সেখানে।

ম্যানিলা একটি অসাধারণ শহর। সর্বসময় কর্মচঞ্চল, হাস্যোজ্জ্বল এবং কলরবমুখর। সেখানকার মানুষ অতি সহজেই বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে। এবং সে বন্ধুত্বকে দীর্ঘকালের জন্য বাঁচিয়ে রাখে। সেখানকার মানুষ সহজেই বিপর্যস্ত হয় না। সব কিছুকে মেনে নিয়ে চলাই তাদের অভ্যাস। তাদের প্রতিদিনের আচরণ এশীয়াবাসীদের মতই। কিন্তু কর্মধারায় এবং সংস্কৃতিতে তারা ইউরোপীয়। তাদের সঙ্গীত স্পেনীয় এবং ভাষা ইংরেজী। ম্যানিলা শহরে সাহিত্যে এবং কাব্যে যে ধারা বিদ্যমান, সে ধারা এশীয় সাহিত্য কিংবা কাব্যধারা নয়। অথচ এদের স্বভাব, বন্ধুত্ব বন্ধন এবং জীবন যাপনের মধ্যে এশীয় প্রবৃত্তি বিদ্যমান। আমি ম্যানিলায় বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেছি এবং ম্যানিলার বাইরেও গিয়েছি। ম্যানিলায় সব সময় গ্রীষ্মকাল কিন্তু সূর্যের তাপ সহনীয়। একমাত্র 'ব্যাগু' শহরটি এর ব্যতিক্রম। ব্যাগু হচ্ছে ফিলিপিনোর শৈলনিবাস। ব্যাগু শহর অত্যন্ত সুন্দর। বিশেষ করে ম্যানিলা থেকে ব্যাগুতে পৌঁছবার পথটি পাহাড়ী এলাকা দিয়ে ঘুরে ঘুরে গিয়েছে সে পথটি বড় মধুর।

ফ্রাঙ্কি আমাকে ফিলিপাইনের অনেক অঞ্চলে নিয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে আমি লিঙ্গায়েন ও ব্যাগু শহরে গিয়েছি। এবং সে সঙ্গে থাকার দরুন ফিলিপাইনের অনেক লেখকের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। ফিলিপাইনের লেখকরা অধিকাংশই অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে থাকে, তারা তাদের উৎস সন্ধানে তৎপর। এই উৎস কখনও স্পেনীয় কখনও দেশজ আদিম প্রকৃতির। দ্বিতীয়তঃ এদেশের ঔপন্যাসিকরা দেশের প্রকৃতির সাথে দেশের মানুষকে সমন্বিত করবার চেষ্টা করে। এদের ইতিহাসের একটি আদিমতা আছে, সে আদিমতার প্রকৃতি এরা অনুসন্ধান করছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অনেক ঔপন্যাসিক যেভাবে আপন পিতৃপুরুষের সন্ধান করছে, ফিলিপাইনের ঔপন্যাসিকরাও তাই করছেন। এদেশের লেখকদের ভাষা ইংরেজী, কিছুদিন আগে তাদের ভাষা স্পেনিস ছিল। সাম্প্রতিককালে চেষ্টা চলছে তাদের নিজস্ব ভাষা অনুসন্ধানের। এই ভাষা হচ্ছে তাগালোক। ফিলিপাইনের মূল ভূখণ্ডের আদিবাসীদের ভাষা এটা। বিভিন্ন দ্বীপে বিভিন্ন উপভাষা বিদ্যমান আছে। বর্তমানে তাগালোককে মূলভাষা ধরে সকল অঞ্চলে একে গ্রহণযোগ্য করবার চেষ্টা চলছে। তবে এখানেও ইংরেজীর প্রতাপটাই প্রবল। এবং সম্ভবত এই প্রতাপটি ভবিষ্যতেও

www.pathagar.com

বিদ্যমান থাকবে। তাগালোগ ভাষার লোককাহিনী সংগৃহীত হচ্ছে এবং বর্তমানে অনেক কবি এ ভাষায় গান রচনা করছে।

প্রথমবার ফিলিপাইনে গিয়ে আমি মুসলমানদের সন্ধান পাইনি। তবে জেনেছিলাম মিন্দানাও দ্বীপে মুসলমানরা বাস করে। এদের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং শরীরী গঠনও ফিলিপাইনের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষদের চেয়ে ভিন্ন রকমের। পরবর্তীতে আরো কয়েকবার আমি ফিলিপাইনে গিয়েছি এবং মুসলমানদের জানবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

এই ফিলিপাইনে এসে কয়েকজন হাঙ্গেরীয় লেখকের সঙ্গে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরীতে যে বিপ্লব সাধিত হয় সে বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত যে সব লেখক রুশ আগ্রসনের মুখে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন তাদের কয়েকজন জাপানে পিইএনএ কনফারেন্সে এসেছিলেন। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল হাঙ্গেরীর অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের জনগণকে অবহিত করা। এদের মধ্যে প্রধান পুরুষ যারা ছিলেন তারা হলেন পল ইগনোটাস, পলতাব্যেরি এবং জর্জ পালোঃসি হোরভাৎ। এঁরা টোকিওতে প্রেস কনফারেন্স করেছিলেন, ম্যানিলায়ও প্রেসক্লাবে একটি অনুষ্ঠান করেছিলেন। এদের মধ্যে পলতাবোরি এবং তার স্ত্রী কেইট পরবর্তীতে আমার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। এই দম্পতি করাচীতে এসেছিলেন, ফ্রাঙ্কফুর্টেও এদের সঙ্গ আমি পেয়েছি। ব্রাজিলের রায়ে ডি জেনিরো শহরে আমি এদের সঙ্গে ছিলাম। এক কথায় বলা যায় দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এদের সঙ্গ আমাকে আনন্দ দিয়েছে। পলতাবোরির শেষ জীবন খুব দুঃখজনক ছিল। তার স্ত্রী কেইট তাকে পরিত্যাগ করে চলে যান এবং সেও ক্লান্তিতে ও বিষণ্নতায় অবশেষে মৃত্যুতে ঢলে পড়ে। হোরভাতো জীবিত নেই। এই হাঙ্গেরীয় লেখকদের সবাই অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিল। তাদের প্রত্যেকেই অত্যন্ত উদ্যোগী, সাহসী, উচ্ছল ও প্রাণবন্ত বলে আমার মনে হয়েছে। এরা ইংরেজ লেখকদের ঠিক বিপরীত। ইংরেজ লেখকরা যেখানে আপন প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থাকেন এরা সেখানে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন। একে একপ্রকার বহির্মুখী চৈতন্য বলা যেতে পারে।

ফিলিপাইনে চিত্রকলায় একটি বিপ্লব ঘটেছে। এই বিপ্লবটি আমি জাপানেও লক্ষ্য করেছি। জাপানের নিজস্ব চিত্রাংকন পদ্ধতি সুরক্ষিত রেখে জাপানী চিত্রকর্মীরা নতুন নতুন বিমূর্ততার জন্ম দিয়েছে। জাপানের প্রথাগত যে চিত্রাংকন পদ্ধতি তার মধ্যে একটি তাৎপর্যবহ শৃংখলাবোধ লক্ষ্য করা যায়। রেখাংকনগুলো অত্যন্ত বলিষ্ঠ বা দৃপ্ত এবং তুলির আবৃত্তির মধ্যে সৌন্দর্য এবং অর্থময়তায় প্রকাশিত। হিরোশিগে, হকুসাই এর উতামারুর কাঠ খোদাইগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে রেখাংকনগুলো শৃংখলায় পর্যবসিত। এই পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে বিমূর্ত চিত্রকলার বিকাশ জাপানে ঘটেছে। জাপানী চিত্রকর্মীরা বিমূর্ত চিত্রকলাকে জাপানের দৈনন্দিন জীবনের বিস্তারের মধ্যে নবভাবে নতুন স্বাদ ও ব্যঞ্জনায় উপস্থিত করে খ্যাতি অর্জন করেছিল। এসব বিমূর্ত ছবির মধ্যে অনেক ছবির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের বর্ণাঢ্যতা, যেখানে রংএর বিস্তার ও প্রলেপে একপ্রকার অপরিজ্ঞাত রহস্যময়তা অনুভব করা যায়। ফিলিপাইনের চিত্রকলাও বর্তমানে বিমূর্ততা নিয়ে প্রকাশিত। তারা সমুদ্রের নিকটে থাকে বলে সমুদ্র তরঙ্গের বিভঙ্গ তাদের চিত্রকর্মে উপস্থিত। ফিলিপাইনের

www.pathagar.com

কোন চিত্রকর্মীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে নি। কিন্তু জাপানে ঘটেছিল তার কথা আমি আগেই বলেছি। তার নাম ইচিরো ফুকুজাওয়া।

ম্যানিলা থেকে ফিরবার পথে আমি হংকংএ কয়েকদিন ছিলাম। সেখানে হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রাইডের বাসভবনে ছিলাম। ডঃ রাইড এবং তার দ্বিতীয় পত্নী অত্যন্ত সজ্জন এবং অতিথিবৎসল ছিলেন। তাদের সান্নিধ্যে এবং সাহচর্যে আমার হংকং এর অবস্থানটি আনন্দদায়ক হয়েছিল। হংকংএ একজন চীনা প্রকাশকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তার নাম ছিল উইলিয়াম সু। হংকংএর বিভিন্ন এলাকায় আমাকে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়িয়েছে। তার সঙ্গে সমুদ্র সৈকতে অবস্থিত নৌকোয় নানাপ্রকার খাবার গ্রহণ করেছি। উইলিয়াম সু এখনো জীবিত আছে। এখনো তার সঙ্গে সংবাদ বিনিময় হয়।

১৯৫৭ সালে এই দেশ ভ্রমণটি আমার জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমি বিভিন্ন জাতের মানুষকে ন্যানা বৈচিত্র্যের মধ্যে দেখেছি। কিন্তু একটিমাত্র মানব স্বভাবে তাদের সকলকে সমার্থক পেয়েছি। সেই মানব স্বভাব হচ্ছে মমতা এবং বিনয়।

॥১৭॥

জাপান থেকে ফিরে আসার পর করাচীতে যখন প্রাত্যহিক জীবন যাপনে আবার অভ্যস্ত হয়েছি, তখন রকফেলার ফাউন্ডেশনের মানবিক শাখার ডেপুটি ডিরেক্টর গিলপ্যাট্রিক নামক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হল। রকফেলার ফাউন্ডেশন ভারতের পুনায় ভাষাতত্ত্ব ইনস্টিটিউট গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। গিলপ্যাট্রিক চাইছিলেন যে অনুরূপ একটি ইনস্টিটিউট পাকিস্তানেও গড়ে উঠুক। তিনি প্রশিক্ষণের জন্য আমাকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাবেন সাব্যস্ত করলেন। প্যালেস হোটেলে এক রাতে আমি এবং আমার ভাই সৈয়দ আলী আশরাফ গিলপ্যাট্রিকের সঙ্গে ডিনার খেলাম। গিলপ্যাট্রিক রসিক মানুষ, সদা হাস্যোজ্জ্বল এবং উদ্দীপনাপূর্ণ। কৌতূহলী দৃষ্টিতে করাচীর জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেছেন এবং সে সম্পর্কে নানান মন্তব্য করছিলেন। গিলপ্যাট্রিক আমেরিকায় ফিরে গিয়ে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমাকে আমেরিকায় নিয়ে যাবার জন্য এক প্রস্তাব দেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য হাশমী এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন এবং বলেন যে করাচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিভাগের কোন লোকের উচ্চতর কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য বিদেশে যাবার প্রয়োজন নেই। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উর্দু বিভাগের লোকই উচ্চতর শিক্ষার অধিকার রাখে। বিষয়টি সিন্ডিকেটে আলোচিত হয়েছিল। কিন্তু আমার সপক্ষে কেউ কোন বক্তব্য রাখেন নি। একমাত্র ডক্টর মাহমুদ হোসাইন এই বলে উপাচার্যের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন যে আমন্ত্রণটি একজন ব্যক্তি বিশেষের জন্য এসেছে এবং সে ব্যক্তি আমাদের অধ্যাপক। বিভাগ ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। যে ব্যক্তি প্রশিক্ষণ নিতে যাবেন তার শিক্ষাগত মানোন্নয়নের অধিকার আছে এবং সে অধিকারকে খর্ব করা আমাদের উচিত নয়। কিন্তু উপাচার্য মিঃ হাশমী অত্যন্ত ধূর্ত এবং সুস্পষ্টভাবে বঙ্গবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি কোন ক্রমেই আমাকে রকফেলারের বৃত্তি পেতে দিলেন না।

www.pathagar.com

অন্য একটি ঘটনাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বৃটিশ কাউন্সিলের যিনি প্রধান তার নাম ছিল ডঃ কিং। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার এবং আমার ভাই আলী আশরাফের খুবই হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। আমরা প্রায়ই তার বাড়িতে গিয়েছি এবং আপ্যায়িত হয়েছি ।ভদ্রলোক ইংরেজী সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন এবং উদার মানসিকতার লোক ছিলেন। সুন্দর গল্প করতে পারতেন এবং যে কোন দেশের আদিম ইতিহাস জানা সম্পর্কে তার একটি আগ্রহ ছিল। এই আগ্রহ আমারও ছিল। তাই সহজে তার সঙ্গে আলাপচারিতার ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যেত। তাঁকে বলে আমরা বাংলা বিভাগের মোস্তফা নুরুল ইসলামের জন্য একটি স্কলারশীপ যোগাড় করি, কিন্তু এই প্রস্তাবটি যখন উপাচার্য হাশমীর কাছে যায় তিনি তা আগের মতই বাতিল করে দেন। মোস্তফা তখন করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে ইস্তফা দেয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়। এ দুটি ঘটনায় করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালী অধ্যাপক যারা ছিলেন তাঁরা ক্ষুব্ধ এবং মনঃক্ষুণ্ন হন এক কথায় বলা যায় হাশমী আসার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালীর বিরুদ্ধে একটি বিমাতৃসুলভ আচরণ পরিলক্ষিত হতে থাকে। হাশমী ছিলেন পাঞ্জাবী। তিনি তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতায় ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, সেখান থেকে সরাসরি তাকে উপাচার্য পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি ছিলেন অসম্ভব আত্মম্ভরী এবং তাঁর নিজের সম্পর্কে তাঁর খুব উচ্চ ধারণা ছিল। প্রায় কথাতে তিনি বলতেন যে বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি ঢেলে সাজাবেন। বাংলা বিভাগের উন্নয়নের জন্য আমার সকল পরিকল্পনা এভাবে নষ্ট হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। হাশমীর কোন অধিকারই ছিল না উপাচার্য হওয়ার কিন্তু পাকিস্তানে পাঞ্জাবী প্রশাসনের প্রতাপে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন।

এ সময় করাচীতে আমার জীবনে একটা কৌতুককর ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খানের সঙ্গে আমার কি করে যেন পরিচয় ঘটে। তিনি করাচী এলেই কখনো কোন ফাঁকে আমাকে ডেকে পাঠাতেন। আমার ধারণা হয় করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফেসর মোহাম্মদ আসলামের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। প্রফেসর আসলাম ছিলেন কাদিয়ানী। চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান ছিলেন কাদিয়ানীদের নেতা। পরিচয়ের পর থেকে যখনই জাফরুল্লাহর সঙ্গে দেখা হয়েছে তখনই তিনি আমাকে কাদিয়ানী মতে 'ইমান' আনতে বলেছেন। তিনি আমাকে বলতেন, 'তোমার মধ্যে অসম্পূর্ণতা আছে। তুমি পুরোপুরি মুসলমান হতে পারো নি। তোমাকে পুরোপুরি মুসলমান হতে গেলে হযরত গোলাম আহম্মদকে মানতে হবে।' আমি জাফরুল্লাহর কথয় প্রতিবাদ করতাম না, চুপ করে শুনে যেতাম। জাফরুল্লাহ ছিলেন অসাধারণ বাকপটু ব্যক্তি এবং তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী। তাঁর সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ ছিল না। একবার করাচীতে মির্যা গোলাম আহম্মদের ছেলে মির্যা বশির আহম্মদ এলেন। বশির আহম্মদ ছিলেন কাদিয়ানীদের খলিফা। জাফরুল্লাহ খানের সঙ্গে আমি মির্যা বশির আহম্মদকে দেখতে গেলাম মঙ্গেপীড়ে। একটি বাংলোতে মির্যা সাহেব অবস্থান করছিলেন। মির্যা সাহেব একটি চৌকির ওপর বসেছিলেন এবং চৌকির সামনে মেঝের ওপর ফরাস পাতা ছিল। জাফরুল্লাহ খান এবং তার সঙ্গীরা মির্যা সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করে সবাই একে একে তাকে সিজদা করলেন। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখলাম, আমি হাত তুলে আদাব দিলাম এবং সকলে

www.pathagar.com

ফরাসে বসলে পর আমিও বসতে যাব এমন সময় মির্যা সাহেব ইশারায় আমাকে ডাকলেন এবং চৌকিতে তাঁর পাশে বসতে নির্দেশ দিলেন। মির্যা সাহেব কি কথা বলেছিলেন তার এক বর্ণ আমি বুঝতে পারি নি। ভদ্রলোকের বয়স ছিল প্রায় নব্বই বছর, লোলচর্ম বৃদ্ধ। তিনি জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছিলেন এবং তাঁর মুখ থেকে থুথু চতুর্দিকে ছিটিয়ে পড়ছিল।

তাঁর পাশে বসা আমার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছিল। তিনি যখনই মুখ খুলে কথা বলছিলেন তখনই থুথু ছড়িয়ে পড়ছিল এবং দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছিল। একজন লোক মির্যা সাহেবের বক্তব্য সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে মির্যা সাহেব আমাকে রাবওয়াতে যেতে আমন্ত্রণ জানালেন। রাবওয়া কাদিয়ানীদের একটি শহর। আমি অবশ্য রাবওয়াতে যাইনি, যাবার ইচ্ছাও হয় নি। প্রফেসর আসলামের জন্যই কাদিয়ানীদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছিল। কিন্তু ক্রমশ এ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আসলাম সাহেবের সঙ্গে আমার সদ্ভাব চিরকালই ছিল। প্রফেসর আসলামের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরে যেমন চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খানের সাথে পরিচয় ঘটে তেমনি আবার বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর সালামের সঙ্গেও পরিচয় ঘটে। তিনিও ছিলেন কাদিয়ানী।

কিন্তু জাফরুল্লাহর মত এগ্রেসিভ ছিলেন না। জাফরুল্লাহ ছিলেন প্রচারকের মনোভাবসম্পন্ন। অন্যদিকে প্রফেসর সালাম ছিলেন শান্ত এবং বিনয়ী। তিনি আমার সঙ্গে কাদিয়ানী মতামত সম্পর্কে কোন আলোচনা করেন নি। কিন্তু সাধারণভাবে ধর্মের কথা বলেছেন। এবং তাঁর সকল কথার মধ্যে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের একটি মনোভাব আমি লক্ষ্য করেছি। আমরা করাচীতে সের্জা রেস্টুরেন্টে বসে গল্প-গুজব করেছি, মনে আছে। পরে একবার লন্ডনে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বর্তমানে তিনি পৃথিবী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তার সকল চিন্তার মূলে একটি বিশ্বাস কাজ করেছে, তা হচ্ছে ঃ সকল শক্তির উৎস হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা এবং এই শক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে মানুষের কর্তব্য। এই কর্তব্য সাধন করেই মানুষ আল্লাহর প্রতি তার ঋণ শোধ করবার চেষ্টা করে। তাঁর বিশ্বাসের একনিষ্ঠতা এবং একাগ্রতা বিস্ময়কর মনে হয়েছিল আমার কাছে।

করাচীতে আমার জীবন একজনের সহায়তায় যথেষ্ট প্রাণবন্ত ছিল। যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে সে সময় আমার বাংলা বিভাগের পিয়ন একটি ১৮/১৯ বছরের বিহারী ছেলে আমার মনে একটি নির্ভরতা এবং প্রশান্তি এনে দিয়েছিল। এই ছেলেটির নাম মোহাম্মদ রফিক খান। ছেলেটি পাতলা, লম্বাটে এবং লাজুক ধরনের ছিল। চোখে চোখ রেখে কোনদিন কথা বলত না। অত্যন্ত ভদ্র এবং বিনয়ী ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই সে আমাদের ঘরের ছেলে হয়ে গেল। আমার স্ত্রীকে মা এবং আমাকে আব্বা বলা আরম্ভ করল। নাজিমাবাদে আমি যখন বাসা করলাম তখন আমার বাসায়ই সে থাকা আরম্ভ করল। আমরা যখনই কোথাও বেড়াতে যেতাম ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। এক কথায় বলা যায় করাচীতে অবাঙালীদের একটি রুদ্ধশ্বাস পরিবেশে রফিকের সান্নিধ্য আমার ভাল লাগত। বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনও কোন অবাঙালীদের বিরূপতার সম্মুখীন হলে রফিককে নিয়ে বেড়াতে চলে যেতাম এবং তার সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাতাম। পরে

www.pathagar.com

জেনেছিলাম ছেলেটি ভদ্রঘরের সন্তান এবং করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য প্রফেসর হালিমের দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

ছেলেটি ম্যাট্রিক পাস ছিল। বাঙলা বিভাগে থাকতে থাকতে সে ক্রমশ আইএ এবং বিএ পাস করল। অবশেষে বাংলা বিভাগেরই কেরানীর পদে যোগদান করল। আমি করাচী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পরও রফিকের সঙ্গে আমার যোগসূত্র ছিল। ঢাকায় থাকতে আমার বড় মেয়ের বিয়ের সময় তাকে করাচী থেকে ডেকে এনেছিলাম। বিবাহের সকল অনুষ্ঠানে সে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং বিবাহের পর আরও তিন মাস সে আমাদের সঙ্গে ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার আর সংবাদ পাইনি। সম্প্রতি শুনেছি যে অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে সে মারা গিয়েছে। এমন হৃদয়বান আন্তরিক এবং নির্ভরযোগ্য মানুষ আমি আমার জীবনে খুব কম দেখেছি। করাচীতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশবার সুযোগ আমার হয় নি, সুতরাং সাধারণ মানুষের মনোভঙ্গী সুস্পষ্টভাবে জানতেও পারি নি কিন্তু রফিকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের ঐশ্বর্যের পরিচয় পেয়েছিলাম। করাচীতে শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙালীদের প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করত।

তাদের এক ধরনের বুদ্ধিহীন আত্মম্ভরিতা ছিল এবং কেমন যেন আমাদের প্রতি বিদ্বেষও ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা করতে গিয়ে এমন সব পরিস্থিতির সম্মুখীন আমি হয়েছি যা একাডেমিক নয়। বাংলা বিভাগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কোন বই ছিল না। আমি ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে কয়েক হাজার বাংলা বই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আনিয়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এ সমস্ত বই আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণও করেছিলেন, কিন্তু এই ঘটনার পর অনেকে আমাকে ভারতীয় এজেন্ট বলে চিহ্নিত করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে পুলিশের একজন গুপ্তচরের অনবরত অনুসন্ধান এবং জিজ্ঞাসায় আমি ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। শেষ পর্যন্ত পুলিশের খাতায় নাম উঠল এই বলে যে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ হচ্ছে ভারতীয় দূতাবাসের তথ্য বিতরণ কেন্দ্র।

পরে জেনেছিলাম পুলিশকে এভাবে লাগিয়ে দেয়ার পিছনে আবুল লায়েস সিদ্দিকীর একটি সক্রিয় ভূমিকা ছিল। আবুল লায়েস ছিলেন উর্দু বিভাগের অধ্যক্ষ। এরই ষড়যন্ত্রে রকফেলারের বৃত্তি আমি পাই নি। এবং মোস্তফা নূর-উল ইসলাম বৃটিশ কাউন্সিলের বৃত্তি পায় নি। সিন্ধীরাও আবুল লায়েসের প্রতি বিরূপ ছিল। সে যেমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করত না তেমনি সিন্ধীভাষা ও সাহিত্য নিয়ে ব্যঙ্গ কৌতুক করত। সে জন্য সিন্ধীরা তার নামকরণ করেছিল আবুল ইবলিস অর্থাৎ শয়তানের বাবা। করাচীতে প্রতিষ্ঠিত সিন্ধী যাঁরা ছিলেন তাদের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে সিন্দ মুসলিম কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফার নাম বিশেষভাবে মনে পড়ছে। গোলাম মোস্তফা অত্যন্ত হাসিখুশি গোলগাল মানুষ ছিলেন। একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিংএ সিন্ধীর স্বার্থ রক্ষায় সব সময় তৎপর ছিলেন এবং আবুল লায়েসকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করতেন। এর কাছে থেকে এবং তৎকালীন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য ডক্টর দাউদ পেতার কাছ থেকে আমি সিন্ধী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছিলাম। মধ্যযুগের সিন্ধী কাব্যধারা সূফী আদর্শে রঞ্জিত। সিন্ধী কাব্যের প্রাণপুরুষ ছিলেন সূফী আবদুল লতিফ

www.pathagar.com

ভিটাই। আবদুল লতিফের কবিতার বিশিষ্টতা ছিল নিবেদনের মধ্যে। অপূর্ব আন্তরিকতায় নিবেদনের বাণীকে তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তার কবিতা গীত হয়ে সিন্ধু প্রদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আমাদের দেশের লালন শাহের গানে যে মাধুর্য এবং আত্মনিবেদনের ব্যঞ্জনা আমরা লক্ষ্য করি আবদুল লতিফের গানে ও কবিতায়ও একই ধরনের আত্মনিবেদন লক্ষ্য করা যায়। তাঁরও কবিতা ও গানের একটি ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন আল্লামা আই কাজী। তিনি কিছুকাল সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। এঁকে আমি কয়েকবার দেখেছি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আল্লামা কাজী অত্যন্ত সুন্দর পুরুষ ছিলেন। সুমধুর বাক্যালাপে দক্ষ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে সিন্ধু নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করেন। এ কে ব্রোহী বলতেন, 'মানুষ যে কত নিষ্পাপ, সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হতে পারে আল্লামা আই কাজীকে না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। তিনি ছিলেন আমাদের মন্ত্রগুরু। আমার যা কিছু উপলব্ধি তার সাহচর্য থেকেই আমি পেয়েছি।' মন্ত্রগুরু শব্দটি ব্রোহীর স্পিরিচুয়াল গাইড কথাটির বাংলা অনুবাদ হিসাবে লিখলাম।

করাচীতে দুই শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ বাঙালীদের বুঝতে চাইতেন না এবং বাঙালীদের সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করতেন। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে পাঞ্জাবী, আরেক শ্রেণী হচ্ছে মধ্যভারত এবং বিহার থেকে আগত মোহাজের সম্প্রদায়। পাঞ্জাবীরা ছিল বলশালী, অধিকারলিপ্সু এবং ক্ষমতাদর্পী। কিন্তু মোহাজেররা ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সুচারু নৈপুণ্যের অধিকারী এবং সে কারণে চতুর ও অভিমানী। উভয়ের দৃষ্টিতেই বাঙালীরা ছিল অবহেলার পাত্র। আমার আনন্দ এই যে এই অবহেলার পরিমণ্ডলের মধ্যে আমি নিজেকে আত্মগরিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। প্রত্যেক মানুষের বাইরের একটি আকৃতি আছে, দৃশ্যগত গুণাবলী আছে, যেমন গায়ের রং, গতিবিধি, শারীরিক অঙ্গসংস্থান। কিন্তু এই গুলোই তো সব নয়। যাদের কথা বললাম অর্থাৎ পাঞ্জাবী এবং মোহাজের এরা সকলেই দৃশ্যগত স্বরূপে বাঙালীদের তুলনায় অনেক বেশী আকর্ষণীয়। কিন্তু তাদের অন্তর্লোকের যে পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে আমার মনে হয়েছে এদের সঙ্গে সম্প্রীতির বন্ধন কখনো হবে না। সত্যই হয়নি। যেমন রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে হয়নি যেমন অর্থনীতির ক্ষেত্রে হয় নি, তেমনি সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও হয় নি। অবশ্য এদের মধ্যে কেউ কেউ যে ব্যতিক্রম ছিলেন না তা নয়। কবি ইকবালের ছেলে ডক্টর জাভেদ ইকবার একজন ব্যতিক্রম ছিলেন, পাকিস্তানের অর্থসচিব মোমতাজ হাসান একজন ব্যতিক্রম ছিলেন। এই ব্যতিক্রমটাকে যদি আমাদের জীবনে সত্য করা সম্ভব হত তাহলে হয়তো পাকিস্তানে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কলহ সৃষ্টি হত না। কিন্তু ব্যতিক্রমটা সত্য হল না। তারা আপন বৃত্তের মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান থেকে আমাদেরকেও বাধ্য করেছিল আমাদের নিজস্ব বৃত্ত নির্মাণ করতে। একটিমাত্র বৃহৎ বৃত্তের মধ্যে আমরা সমন্বিত হতে পারি নি।

www.pathagar.com

॥২০॥

ইরানের আলবুর্জ পর্বতমালা ইরানের ঐতিহ্যের সাথে নিগূঢ়ভাবে জড়িত। ইরানের প্রধান লোককাহিনী এবং কাব্যকাহিনীতে আলবুর্জের উল্লেখ আছে। কবি ফেরদৌসীর শাহনামায় আলবুর্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমার শৈশবে আমি যখন আমার পিতার কাছে থেকে শাহনামার কাহিনী শুনতাম তখন থেকে আলবুর্জের সঙ্গে এই পর্বতমালা একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে। কায়েকাউস ও কাইখসরুর বিভিন্ন অভিযানে আলবুর্জ অনিবার্যভাবে উপস্থিত হয়েছে। এক কথায় ইরানের জীবনসত্তার সঙ্গে এই পর্বতমালার অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে।

১৯৫৮ সালে আমি ব্যাপকভাবে মধ্যপ্রাচ্য সফর করি। এই সফরের প্রথম পর্যায়ে আমি ইরানের তেহরান শহরে যাই। তেহরান শহরটি আলবুর্জের সানুদেশে অবস্থিত। আমার জীবনে ইরানে প্রবেশ এই প্রথম। এখানে বিখ্যাত ইরানী কবি এবং সাহিত্যিক জয়নুল আবেদীন রাহনুমানের সঙ্গে পরিচিত হই। মূলতঃ সে বছর তেহরানে আমি তাঁরই অতিথি ছিলাম। জয়নুল আবেদীন 'পয়ম্বর' নামে একটি বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থটি রাসূলে খোদার জীবনী। সাধারণত জীবনী গ্রন্থ যে প্রকৃতির হয়ে থাকে এ গ্রন্থটি সে রকম নয়। এটি অনেকটা উপন্যাসের মত লেখা, বর্ণাঢ্য বর্ণনা এবং আবেগের মিশ্রণে গ্রন্থটি উপভোগ্য হয়েছে। রাসূলে খোদার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে লেখক নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। রাহনুমান এই বইটি আমাকে উপহারস্বরূপ দেন। আমি রাহনুমানের সঙ্গে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যাই।

সেখানকার দর্শন বিভাগের প্রধান ডঃ শাফাক-এর সঙ্গে পরিচিত হই। পরে ডঃ শাফাক আমার আমন্ত্রণক্রমে করাচীতে একটি সেমিনারে যোগ দিয়েছিলেন। তেহরানে আমি আলবুর্জ পর্বতমালা দেখতে যাই। সে সময় আলবুর্জ থেকে পানির একটা নহরের স্রোতধারা তেহরান শহরের প্রধান রাস্তার পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল। আলবুর্জের অনেকগুলো ঝর্ণা আছে, পাহাড়ী ঝর্ণা ঋজু ভঙ্গীতে উপর থেকে নিচের দিকে পড়ছে। পাহাড়ে উঠবার একটা পথ আছে, সে পথ দিয়ে গাড়ী চলে। পাহাড়ের মধ্যে টানেল আছে। সে সব টানেল দিয়ে গাড়ি চলে। আমি অবশ্য সে বছর এ পাহাড় অতিক্রম করে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে যাইনি, গিয়েছিলাম আরও কয় বছর পরে। তেহরানে যে জিনিস আমার লক্ষ্যগোচর হল, তা হচ্ছে একটি পারসিক সংস্কৃতি নির্মাণের চেষ্টা। সংস্কৃতি ইরানের অতীতকে অবলম্বন করে। জরথুস্ত্র ইরানের প্রাচীন আর্যকুলের প্রধান পুরুষ ছিলেন। তাঁকে অবলম্বন করেই এই অতীতের সূত্রপাত। জরথুস্ত্র মতবাদীদের প্রধান দেবতা হচ্ছে 'অহুরমাজদা'। এই দেবতার মূর্তি সরকারী ভবনের শিরোদেশে আমি দেখলাম। রাজকীয় সীলমোহরেও অহুরমাজদার মূর্তি ছিল। ফেরদৌসী তাঁর শাহনামায় ইরানের অতীত ইতিহাসকে উন্মোচন করেছেন। সে ইতিহাসের সমস্ত অংশ জুড়ে আছে ইসলাম আগমনের পূর্বেকার কাহিনী। ফেরদৌসীর শাহনামা ইরানের জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইরানে অবস্থানকালে সেখানকার লোকদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে আমি অনুভব করলাম যে সেখানকার মানুষ ইউরোপীয় সভ্যতার দিকে বর্তমানে তাকিয়ে থাকে। তাদের নিজস্ব সত্তার প্রেক্ষাপটে তারা ইউরোপকে

www.pathagar.com

স্বাগত জানায়, প্রাচ্যকে নয়। আলোচনাসূত্রে ডঃ সাফাক আমাকে বললেন, 'ইরান তার অতীতকে নিয়ে গর্বিত, সে অতীতের মূর্তি রক্ষিত রেখে তারা ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করছে। কেননা প্রকৌশল এবং বিজ্ঞানে ইউরোপ অনেক উন্নত। বর্তমান বিশ্বে একটি শক্তিধর জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে ইউরোপের দিকে দৃষ্টি রাখতেই হয় কিন্তু নিজের অতীতকে মুছে নয়।' আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম এদেশে ইসলামের অনুপ্রবেশ সংস্কৃতির মধ্যে কতটা ঘটেছে? ডঃ সাফাক উত্তর করলেন, ইসলাম এবং আরবী সমার্থক নয়, আমরা ইসলামকে গ্রহণ করেছি কিন্তু আরবকে গ্রহণ করি নি। আরবরা আমাদের স্বাধীন সত্তাকে হত্যা করে এদেশ দখল করেছিল। সুতরাং আমাদের ভাষায়, আমাদের সংস্কৃতিতে আমাদের জীবনযাপনে আরবীর কোন অধিকার আমরা স্বীকার করি না। আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমাদের ধর্মীয় চিন্তায় ইসলামের প্রতিষ্ঠা আছে এবং থাকবে'। আমি দেখলাম যে ডঃ সাফাক আমার প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর না দিয়ে একটু ঘুরিয়ে উত্তর দিলেন।

তেহরান থেকে আমি বৈরুতে আসি এবং সেখানকার আমেরিকান ইউনিভারসিটির এলুমনাই ক্লাবে অবস্থান করি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর নিকোলো জিয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হই আর দুজন অধ্যাপকের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তারা হচ্ছেন ডক্টর নবীহ্ আমীন ফারিস এবং ডক্টর কস্টিজোরারায়েক। এরা সকলেই মেরোপাইট খৃস্টান ডঃ জোরায়েক 'নাহনুওয়া তারিখ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থের মধ্যে তিনি ইতিহাসে আরব সত্তা কি, তা বিশ্লেষণ করেছেন। সে সময় আরব ভূখণ্ডগুলোকে আরব জাতীয়তাবাদ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। মিসরের বিপ্লবী নেতা নাসের আরব জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন। নাসের চেয়েছিলেন সমস্ত আরব দেশ একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করতে। যেহেতু আরব ভূখণ্ডগুলো বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত রয়েছে সে হেতু ইহুদী শক্তির মোকাবিলায় এরা সম্মিলিতভাবে কার্যকর কোন ভূমিকা পালন করতে পারছে না। নাসের চেয়েছিলেন, আরবী সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রেক্ষাপটে একটি রাজনৈতিক ঐক্য নির্মাণ করতে। ডঃ জোরায়েকের গ্রন্থটি এক্ষেত্রে একটি দিক দর্শনের ভূমিকা পালন করেছে। তিনি তাঁর গ্রন্থে আরব জাতির অতীত এবং বর্তমান নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এই জাতির সংস্কৃতির প্রধান প্রধান তাৎপর্য উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন।

ইরান থেকে বৈরুতে এসে আমি একটি ভিন্নধর্মী মানসিকতার সম্মুখীন হয়েছিলাম। ৈরান আধুনিক, বৈরুতও আধুনিক। কিন্তু ইরানের গর্ব তার পারসিকতায় এবং বৈরুত বা ানেের গর্ব তার আরবীয়তায়। এই দুয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। উভয় দেশের ভ্যাসের মধ্যেও বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করলাম। লেবাননে খাদ্যপ্রক্রিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য .খ পড়ে যা মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশেই নেই। যে কোন রেস্টুরেন্টে অথবা হোটেলে .তে বসলে মূল খাবার পরিবেশনের আগে ছোট ছোট তস্তরিতে প্রায় পনের-ষোল রকমের ্মুখরোচক খাবার এনে দেয়। এগুলোর কোনটাতে টক জলপাই, কোনটাতে ভাজা গোস্ত, কোনটাতে কোপ্তা, কোনটাতে পনির, কোনটাতে সেদ্ধ সবজী, কোনটাতে টাটকা সবজী, কোনটাতে ছোট আকারে সমুচা–এরকম আরও অনেক উপকরণ থাকে। অতিথিরা যতক্ষণ না মূল খাবার আসে ততক্ষণ এগুলোর স্বাদ গ্রহণ করেন। বৈরুতে গরুর গোস্তের একটা বিশেষ পদ্ধতির খাবার আছে সেটাকে তারা বলে কিব্বে। গোসত, গম, আদা, পেঁয়াজ এবং

www.pathagar.com

লবণ এক সঙ্গে হামালদিস্তাদে পিসে একটি মণ্ড তৈরী করে। এই মণ্ড থেকে ছোট ছোট রুটি তৈরি করে সেই রুটি পনিরসহ পরিবেশন করে। এই খাবারটি খুবই সুস্বাদু। লেবানন জলপাই-এর দেশ বলে বিখ্যাত। সকল খাদ্যের সঙ্গেই তারা জলপাই- তেল এবং জলপাই পরিবেশন করে। আরব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে লেবানন একটি নতুন মাত্রার সংযোজন করেছিল। করেছিল বললাম এজন্যে যে বর্তমানে সেই প্রক্রিয়া আর নেই। আরবী সাহিত্যের কেন্দ্রভূমি হচ্ছে মিসর। এবং আরবী সাহিত্যের একটি নতুন ধারার উদ্ভব ঘটেছিল লেবাননে। লেবাননের ধারাটি আজ নষ্ট হয়েছে। লেবাননের সাহিত্য ধারার মধ্যে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব ছিল। ফরাসী সাহিত্যের রহস্যময়তা, প্রেমের অভিনিবেশ লেবাননে আরবী সাহিত্যে নতুন করে রূপ নিয়েছিল। উপরন্তু লেবানন ছিল একটি বিস্তৃত ধর্ম সত্তার পটভূমি। এখানে শিয়া মুসলমান, সুন্নী মুসলমান মেরোনাইট খৃস্টানরা রাজনীতি এবং সংস্কৃতিতে সমান অংশীদার ছিল। খলিল জিব্রান এই লেবাননেরই কবি। খলিল জিব্রান খৃস্টান ছিলেন এবং খৃস্টান বিশ্বাস তার কাব্যের পটভূমিতে কাজ করেছে। কিন্তু তার কাব্যের মধ্যে কোরান শরীফের উদ্ধৃতি এবং হাদীসের উদ্ধতি বহুল পরিমাণে আছে। ধর্মবিশ্বাসে মুসলমান না হয়েও আরবী ভাষার অধিকারে খলিল জিব্রান কোরআন শরীফকে গ্রহণ করেছেন। এই গ্রহণের মধ্যে কোনপ্রকার কৃপণতা ছিল না।

বৈরুত থেকে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে যাই। বাগদাদে অধ্যাপক সালেহ আহম্মদ এল আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বাগদাদে মাত্র একদিন একরাত্রি ছিলাম। বাগদাদে হযরত বড়পীর সাহেবের মাজার জিয়ারত করি। আমার হোটেলটি বাগদাদের প্রধান সড়ক সারেহ রশীদের এক পাশে অবস্থিত ছিল। প্রাচীনকালে বিখ্যাত খলিফা হারুনুর রশীদের নামে এই রাস্তাটির নামকরণই হয়েছে। আরব্য উপন্যাসের রহস্য সমাকীর্ণ অঞ্চলে পুরনো রহস্যের কোন আভাসই আমি পাই নি। বাগদাদের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল একটি কারণে যে আমার পূর্বপুরুষ শাহ্ আলী বোগদাদী সেখান থেকে এসেছিলেন। বর্তমানে বাগদাদ সে সময়কার চাইতে নিশ্চয়ই অনেক বেশী আধুনিক এবং সমৃদ্ধশালী হয়েছে কিন্তু আমি যখন গিয়েছিলাম তখন বাগদাদ শহর অপরিচ্ছন্ন ছিল। রাত্রিবেলা কোন কোন অঞ্চলে বারবনিতাদের আনাগোনা ছিল, তাছাড়া অন্ধকার রাত্রেও সমাজবিরোধী লোকদের গোপন চলাফেরা ছিল।

আমি বাগদাদ থেকে তুরস্কের ইস্তাম্বুল এবং আংকারায় যাই। ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যাল অর্থনীতি বিভাগে ডঃ সাবরি উলগেনারের সঙ্গে পরিচিত হই। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের স সাক্ষাত করি। এখানে থাকতে খালেদা এদিব হানুম-এ সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করি। স সাক্ষাতকার ঘটে না, কিন্তু তিনি টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলেন। পাকিস্তান থে এসেছি শুনে তিনি বললেন, মুসলমানরা পাকিস্তান সৃষ্টি করে উপমহাদেশে নিজেদে অস্তিত্বকে খণ্ড-বিখণ্ড করে তুলেছে, যে ভারতকে আমি জানতাম সেই ভারতে মুসলমানরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না করে ভুল করেছে। তাঁর কণ্ঠে উষ্মা ছিল এবং তাঁর বক্তব্যে তাঁর নিজস্ব রাজনীতির প্রতিফলন ছিল। ইস্তাম্বুল একটি উঁচু-নিচু পাহাড়ী এলাকা। বসফোরাস প্রণালীর স্বচ্ছ রেখা বেয়ে ইস্তাম্বুল শহর বিচিত্র ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান রয়েছে। আমি হিল্টন হোটেলে ছিলাম। আমার ঘরটি যেদিকে ছিল, সেদিকের জানালা খুললে রাত্রিতে

www.pathagar.com

বসফোরাস প্রণালীর আলোকসজ্জা দেখা যেত। ইস্তাম্বুলে আমি কয়েকদিন ছিলাম। এখানে তকসিম স্কোয়ার বলে একটি সমতল এলাকা আছে যার মধ্যখানে কামাল আতাতুর্কের একটি মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। এই স্মৃতিস্তম্ভের সামনে আমি কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়েছিলাম।

তুরস্কের খাদ্যের সম্ভার বিচিত্র ধরনের। সে দেশের রন্ধন প্রণালী পৃথিবীর বহু দেশকে প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন ধরনের কাবাব এবং বিরিয়ানী পৃথিবীতে তুরস্কেরই দান। ইউরোপের যে সমস্ত দেশ তুরস্কের অধিকারে ছিল সে সমস্ত দেশ তো বটেই তাছাড়া রাশিয়াতে তুরস্কের খাবার প্রচলিত হয়েছে। ইস্তাম্বুল নিয়ে আমার দুটি কবিতা আছে। প্রথমবার যখন ইস্তাম্বুল যাই তখন একটি কবিতা লিখি এবং দ্বিতীয়বার যখন যাই তখন আর একটি। প্রথমবার ইস্তাম্বুল শহর আমার ততটা ভাল লাগে নি। আমি সে কবিতায় লিখেছিলাম যে আমি প্রান্তরের মানুষ উঁচু-নিচু অবিন্যস্ত পর্বতসংকুল অঞ্চল আমার ভাল লাগে না এবং আমার প্রান্তরের স্বভাব নিয়ে যে জীবনকে আমি চাই সে জীবন তুরস্কের ইস্তাম্বুল নয়। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন ইস্তাম্বুলে আসি তখন ইস্তাম্বুল আমার ভাল লেগেছিল। দ্বিতীয়বারের কবিতায় আমি লিখেছিলাম যে দ্বিতীয়বারের ইস্তাম্বুল আমার কাছে একটি নতুন পৃথিবী। নতুন স্বপ্নের মধ্যে আমার প্রাণে সে আশ্বাস সঞ্চয় করে। এখানকার অতীতে বহু যুদ্ধ এবং বহু মৃত্যু ছিল। তবু সমস্ত কিছু নিয়ে ইস্তাম্বুল একটি সম্ভ্রমে প্রকাশিত হয়েছে। ইস্তাম্বুল থেকে আমি আংকারায় যাই, ঝড় এবং বৃষ্টির মধ্যে আমি আংকারায় উপস্থিত হই। প্রথমবার আংকারা আমার ভাল লেগেছিল। আমার ভাললাগাকে আমি একটি কবিতায় প্রকাশ করেছিলাম। লিখেছিলাম যে আংকারা পৃথিবীর উদার বিস্তারে আমার হৃদয় আশ্বস্ত হয়েছে, বৃষ্টিবিধৌত আংকারাকে আমার কাছে মনে হয়েছিল বাংলাদেশের বৈশাখ-অপরাহ্ন।

আংকারা থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে কায়রোতে কয়েকদিন অবস্থান করি। কায়রোতে যে কদিন ছিলাম সে কদিন ঘুরে ঘুরে পুরাকীর্তিসমূহ দেখেছি। একদিন বিকালে গিজায় পিরামিড দেখতে গিয়েছিলাম। কায়রোর ওপর আমার একটি কবিতা আছে। সে কবিতায় আমি লিখেছিলাম যে মিসরের প্রাচীন ইতিহাসের বিপুলতায় আমি বিহ্বল ও স্তব্ধ হয়েছি। এখানে মানুষের অমরত্বের ইতিহাস অনেক দিনের। এবং আমি অনেক হাজার বছরের পর গিজায়, পিরামিডে এবং কায়রোর যাদুঘরের অনেক নিঃশেষ জীবনের শব্দ শুনতে এসেছি। কায়রোতে তখন আমার বন্ধু মোহাম্মদ হোসেন পাকিস্তান মিশনের ইনফরমেশন অফিসার ছিল। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বনিবনা ছিল না। সারেহ তুলুমবাতে তাঁদের বাসগৃহে আমার সামনেই তারা পরস্পরকে আক্রমণ করেছে। আক্রমণের ক্ষেত্রে মহিলার ভূমিকা ছিল অগ্রণী এবং মোহাম্মদ হোসেনকে একটু পরেই নিস্তেজ হয়ে সরে যেতে দেখেছি। এদের পরবর্তী ইতিহাস অত্যন্ত দুঃখজনক। মিসেস মোহাম্মদ হোসেন তালাক নিয়ে আলাদা জীবন-যাপন করতে থাকেন। পরে ঢাকার বিখ্যাত এটর্নী আবদুল আহাদকে বিয়ে করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর হাতে আহাদ নিহত হয় এবং তার স্ত্রী তখন থেকে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে থাকেন। এই নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের এক পর্যায়ে কে বা কারা যেন তার গৃহে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। মহিলা উচ্চ শিক্ষিতা ছিলেন এবং ইংরাজী ভাষার উপর প্রবল দখল ছিল। বিদেশে শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং বাক্যালাপে অত্যন্ত চতুর এবং মার্জিত ছিলেন।

মিসর থেকে ফিরে এসে আমি করাচীর জীবনে নিজেকে আবার অভ্যস্ত করে তুলি।

www.pathagar.com

মধ্যপ্রাচ্য সফর শেষে করাচীতে যখন ফিরলাম তখন পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে কোলাহল ছিল। ব্যক্তিগত এবং গোত্রগত স্বার্থ, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অবিশ্বাস রাজনীতির ভিত্তিভূমি হয়েছিল। পাকিস্তানের আদর্শ হিসাবে যে সমস্ত বাণী সর্বক্ষণ উচ্চারিত হত রাজনীতিবিদদের আচরণের মধ্যে সদা-সর্বদা তার বিপরীত প্রবৃত্তি প্রমাণিত হত। এর সুযোগে মূলত আইয়ুব খানের প্ররোচনায় এখন প্রকাশ্যে ইস্কান্দার মির্যার ঘোষণায় ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর সমগ্র দেশে সামরিক শাসন জারী করা হয়। জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল ঘোষণা করা হয় এবং শাসনতন্ত্র স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

সেদিনই দিনের বেলা ফিরোজ খান নুন রিপাবলিকান এবং আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নতুন কয়েকজন মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে প্রবল কলহ সৃষ্টি হয়, যার ফলে কোয়ালিশন থেকে সন্ধ্যার দিকে আওয়ামী লীগ বেরিয়ে আসে। সুতরাং বলা যায়, ফিরোজ খান নুনের কেন্দ্রীয় প্রশাসন ভেঙ্গে পড়েছিল এবং মার্শাল'ল জারী করার একটি অজুহাত সৃষ্টি হয়েছিল। আইয়ুব খান প্রধান সামরিক শাসক নিযুক্ত হন। আইয়ুব খানের আত্মজীবনীতে দেখা যায় যে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রধান হওয়ার পর থেকে দেশের ক্ষমতা দখল করার পরিকল্পনা তাঁর মনে দানা বাঁধতে থাকে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী হত্যার পর এই পরিকল্পনা ক্রমশঃ সুস্পষ্ট রূপ নিতে থাকে। বলা যেতে পারে লিয়াকত আলী হত্যার পর এবং মার্শাল'ল জারী করার আগে যে চারটি বছর সময় আইয়ুব খান পেয়েছিলেন তার মধ্যে তিনি তাঁর পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালে গোলাম মোহাম্মদ খাজা নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন। সে সময় পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের মধ্যে একজনমাত্র ব্যক্তি গণতন্ত্রের স্বপক্ষে সক্রিয় কার্যকর ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি মৌলভী তমিজুদ্দীন খান। তিনি কন্সটিটুয়েন্ট এসেম্বলী বা গঠনতন্ত্র পরিষদের যা একই সঙ্গে পার্লামেন্ট ছিল তার স্পিকার ছিলেন। নাজিমুদ্দীনকে বরখাস্ত করার কিছুদিন পরেই গোলাম মোহাম্মদ পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন।

যখন গোলাম মোহাম্মদ শেষ পর্যন্ত বিধান সভা বাতিল করলেন তখন মৌলভী তমিজুদ্দীন খান এটাকে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি তাঁর দিক থেকে বিধান সভা মুলতবী ঘোষণা করলেন এবং নতুন বৈঠকের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করলেন। বিধান সভা বাতিল হবার পরের দিনই করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের বৈঠক বসেছিল। সিনেটের কয়েক জন সদস্য বিধান সভার প্রতিনিধি ছিলেন। এদের উপস্থিতির কারণে সিনেটের অধিবেশন সম্পর্কে বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। সিন্ধু প্রদেশের জনাব গাজদার উত্তরে বলেন যে স্পিকার মৌলভী তমিজুদ্দীন খান বাতিল ঘোষণাকে মানেন নি এবং বিধান সভা মুলতবী ঘোষণা করেছেন। সুতরাং বিধান সভা যে বাতিল হয়েছে তা আমরা গ্রাহ্য করি না। মৌলভী তমিজুদ্দীন খান শেষ পর্যন্ত গভর্নর জেনারেলের বেআইনী ঘোষণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি আইনের সাহায্য চেয়েছিলেন এবং হাইকোর্টে রীট আবেদন করেছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি এই মোকদ্দমায় জয়লাভ করতে পারেন নি কিন্তু

www.pathagar.com

গণতন্ত্রের স্বপক্ষে তাঁর এই একক সংগ্রাম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সকলেই যখন গোলাম মোহাম্মদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিল, এমন কি সোহরাওয়াদীও; তখন এই মান্যতার বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল তমিজুদ্দীন খানের কাছে থেকে।

ক্রমশ আইয়ুব খান তাঁর পরিকল্পনা গুছিয়ে আনছিলেন এবং ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে সামরিক শাসন জারী করেন। সামরিক শাসনের প্রথম পর্যায়ে সাধারণ মানুষ খুব ব্যতিব্যস্ত হয়েছিল। আমার মনে আছে সামরিক কর্তৃপক্ষের পরিচ্ছন্নতা অভিযানে বিভিন্ন এলাকায় বাড়ির বাইরে রাস্তার ধারের বাগানগুলো ধ্বংস করা হয়েছিল। করাচী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে নাজিমাবাদের অধিবাসীবৃন্দও তাদের বাড়ির সামনে ফাঁকা জায়গায় বাগান করেছিলেন। আমাদের বাসার সামনেও সুন্দর একটি বাগান ছিল। একদিন দুপুরবেলা হৈ হৈ করে একদল লোক আমাদের বাগান কেটে সাফ করে ফেললো। বাধা দিতে গিয়ে শুনলাম সামরিক বিধি অনুসারে নগর পরিচ্ছন্নতা অভিযানের এক পর্বে এই বাগান ধ্বংস করা হয়েছে।

সামরিক শাসনের নামে আর একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটে যা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। জনাব ওয়াজিউল্লাহ্ নামে একজন বাঙ্গালী করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দফতরে কেরানীর কাজ করতেন। ভদ্রলোক বেঁটে এবং শীর্ণকায়। সদা-সর্বদা তাকে একই পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত দেখতাম। পায়ে পামপ সু, পরনে আলীগড়ী পায়জামা এবং গায়ে একটি কালো শেরোয়ানী। মাথায় আবার লাল রুমী টুপিও ছিল। এই শেরোয়ানীটি তিনি কোনদিন ধুয়েছিলেন কিনা সন্দেহ! ভদ্রলোকের একটি অভ্যেস ছিল রাস্তার কিনারা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটু থেমে আপন মনে কিছু বলে আবার অগ্রসর হওয়া। যখন থামতেন তখন কখনও কখনও তা টাইট করে বেঁধে নিতেন। একদিন বন্দর রোডে এভাবেই চলতে চলতে পায়জামার ফিতে খুলে নতুন করে যখন বাঁধছেন তখন একজন পুলিশ তাঁকে ধরে একটি মার্শাল'ল কোর্টের সামনে উপস্থিত করলেন। পুলিশের অভিযোগ তিনি ওখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করছিলেন। আমরা এ খবর শুনে বিখ্যাত আইনজীবী হাসান আলী এ রহমানকে গিয়ে ধরলাম। তিনি সব শুনে বললেন যে পুলিশ ওয়াজিউল্লাহ্কে ধরেছে তার পরিচয়টা ঠিকমত পাওয়া দরকার। আমরা দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করে অনেক কষ্টে পুলিশের পরিচয় পেলাম। পুলিশের নাম মোহাম্মদ খান। তার এক ছেলের নাম আযম খান। আযম খান করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে। হাসান আলী বললেন যে এতেই হবে। তিনি কোর্টে উপস্থিত হয়ে পুলিশকে জেরা করবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম মোহাম্মদ খান?' পুলিশ উত্তর করলো, 'জি হাঁ।' হাসান আলী তখন প্রশ্ন করলেন, 'তোমার ছেলের নাম আযম খান?' পুলিশ উত্তর করলো, 'জি হাঁ।' হাসান আলী তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ছেলে বিএ পরীক্ষা দিয়েছিল?' জবাবে পুলিশ বলল, 'জি হাঁ।' হাসান আলী জিজ্ঞেস করলেন 'তোমার ছেলে পরীক্ষায় ফেল করেছে?' জবাব এল, 'জি হাঁ।' তখন হাসান আলী কোর্টের দিকে ফিরে বললেন, 'মহামান্য আদালত, ওয়াজিউল্লাহ্ সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বিভাগে কাজ করেন। মোহাম্মদ খান তাকে ঘুষ দিতে চেয়েছিল তার ছেলেকে পাস করিয়ে দেবার

www.pathagar.com

জন্য। কিন্তু ঘুষ নিতে অস্বীকার করায় এবং অবশেষে তার ছেলে পরীক্ষায় ফেল করায় মোহাম্মদ খান প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছায় এই নিরীহ, ধর্মপ্রাণ ওয়াজিউল্লাহকে অন্যায়ভাবে ধরে এনেছে।' পুলিশ তখন তারস্বরে প্রতিবাদ করতে লাগলো–'নেহি, নেহি।' তখন মার্শাল'ল অফিসার প্রচণ্ড চিৎকার করে পুলিশকে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি এতক্ষণ পর্যন্ত শুধু জি হাঁ জি হাঁ করেছ, আবার এখন বলছ নেহি! আমি তোমাকে দেখে নেব।' এভাবে ওয়াজিউল্লাহ বেকসুর খালাস পেলেন। মিলিটারী কোর্টের এই কৌতুকবহ ঘটনা আমার এখনও যখন স্মরণ হয়, হাসি পায়।

মার্শাল'ল প্রবর্তনের কিছুদিন পরই ইস্কান্দার মির্জা বিতাড়িত হলেন এবং দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব আইয়ুব খান গ্রহণ করলেন। এ নিয়ে একটি গল্প করাচীতে অনেক দিন প্রচলিত ছিল। রাত্রিবেলা যখন ইস্কান্দার মির্জাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে পদত্যাগপত্র সই করতে দেয়া হয় তখন তাঁর বেগম নাকি প্রেসিডেন্ট ভবন ত্যাগ করতে রাজী হন নি। তিনি নাকি বলেছিলেন যে তিনি হচ্ছেন প্রেসিডেন্টের পত্নী। যিনিই প্রেসিডেন্ট হবেন তাঁর সঙ্গে তিনি থাকবেন। ইস্কান্দার মির্জার পরিণতি খুবই বেদনাদায়ক। তিনি লন্ডনে গিয়ে কীরস্বামী নামক একটি ভারতীয় রেস্তরাঁয় জেনারেল ম্যানেজার হয়েছিলেন। পরের বছর লন্ডনে গিয়ে কীরস্বামী হোটেলে ইস্কান্দার মির্জাকে আমি দেখেছিলাম একজন নির্জীব, হতাশাগ্রস্ত মাতালের মতো।

আইয়ুব ক্ষমতায় এসে কুদরতউল্লাহ শাহাবকে তাঁর তথ্য সচিব নিযুক্ত করলেন। আমার ঠিক মনে পড়ছে না, হয়তো আগে থেকেই কুদরতউল্লাহ সচিব ছিলেন। তিনি এক সময় প্রগতিবাদী লেখক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। উর্দু কথাসাহিত্যে তাঁর একটি প্রতিষ্ঠা আছে। কুদরতউল্লাহ সাহেব বুদ্ধিজীবী মহলে আইয়ুবের সমর্থন সৃষ্টির জন্য 'রাইটারস গিল্ড' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল আইয়ুব প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্র নামক তত্ত্বের স্বপক্ষে গল্প-কবিতা এবং নাটক রচনা করা এবং আইয়ুবের সকল প্রকার কর্মধারায় সমর্থন ঘোষণা করা। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসের শুরুতে শাহেদ আহম্মদ দেহলভী এবং রাজেকুল খায়রী নামক দু'জন প্রবীণ উর্দু লেখক নাজিমাবাদে আমার বাসায় এলেন। তারা আমাকে 'রাইটারস গিল্ড' প্রতিষ্ঠার কথা বললেন এবং আমাকে উক্ত গিল্ডের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হতে অনুরোধ জানালেন। আমি বিনয়ের সঙ্গে তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। আমি তাদের বললাম, 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীনতা অর্থাৎ সাহিত্য চর্চার স্বাধীনতা। আমি এমন কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকতে চাই না যে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারী কোন প্রচারণার দায়িত্ব গ্রহণ করা। তাছাড়া আমি আন্তর্জাতিক পিইএন-এর পাকিস্তান শাখার সেক্রেটারী জেনারেল। পিইএন-এর কর্মতৎপরতার মধ্যে গিল্ডকে আমি যুক্ত করতে চাই না।

করাচীতে ১৯৫৯ সালে ২৭শে জানুয়ারি থেকে ২রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করি। সেমিনারের বিষয় ছিল আধুনিক বিশ্বে ইসলাম-ইসলাম ইন দি মডার্ন ওয়ার্ল্ড। আন্তর্জাতিক কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রীডম এর পাকিস্তান শাখার উদ্যোগে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। আমি উক্ত শাখার সেক্রেটারী জেনারেল ছিলাম। সেমিনারের সভাপতি ছিলেন ডঃ মাহমুদ হোসাইন এবং প্রতিষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে

www.pathagar.com

বক্তব্য রেখেছিলেন এ কে ব্রোহী। পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী হাবিবুর রহমান সেমিনারটি উদ্বোধন করেন। সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয় করাচীর হোটেল মেট্রোপোলে। একই সময়ে হোটেল মেট্রোপোলে পাকিস্তান রাইটারস গিল্ডের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ডক্টর এনামুল হকের নেতৃত্বে সম্ভবত ৩০ সদস্যের একটি লেখক দল রাইটারস গিল্ডের সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন। আমাদের ইসলামিক সেমিনারে বিশ্বের অনেক প্রথিতযশা প্রাচ্যবিদ যোগ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে যাদের নাম উল্লেখ করা যায় তারা হচ্ছেন নবীহ্ আমিন ফারিস, কন্টি জোরায়েফ, নিকোলাজিয়াদে, ফন গ্রুনেবম, এ্যান ল্যামটন, কীথ কালারড এবং সাবরিহ্ উলগেনার। এই সেমিনারের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য চিন্তাধারার মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন। প্রাচ্যের পণ্ডিতগণ ইসলামকে যে দৃষ্টিতে দেখেন, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ সে দৃষ্টিতে দেখেন না। সংযোগ এবং সহানুভূতির অভাবে উভয়ের মধ্যে একটি বিরুদ্ধতা বিদ্যমান রয়েছে। এই বিরুদ্ধতা দূর করবার জন্য এই সেমিনারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এ বছরই জুলাই মাসে ফ্রাঙ্কফুর্টে ৩০তম পিইএন কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কংগ্রেসে আমি পাকিস্তানে অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করি। পাকিস্তান থেকে আরও দু'জন প্রতিনিধি ছিলেন একজন আজিজ আহমদ এবং অন্যজন জামিল জালিবি। আজিজ আহমদ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একজন ঔপন্যাসিক এবং গল্পলেখক ছিলেন। বর্তমানে তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। জামিল জালিবি বর্তমানে করাচীতে অবস্থান করছেন, অল্প দিন হল তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। আলবার্তো মোরাভিয়া এ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক পিইএন-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ভারতবর্ষ থেকে সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। স্বাগতিক দেশ জার্মানীর প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেছিলেন পশ্চিম জার্মানীর প্রেসিডেন্ট ডঃ হয়েস। ডঃ হয়েস, ডঃ রাধা কৃষ্ণণ এবং আমি 'ফ্রাঙ্কফুর্টার হফ' নামক হোটেলে অবস্থান করেছিলাম। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক টমাস মান এ হোটেলের কথা উল্লেখ করেছিলেন তাঁর 'বুডেন ব্রুকস' উপন্যাসে। সে কারণে হোটেলটির বিশ্বব্যাপী খ্যাতি আছে। এই সম্মেলনে জাপানী ঔপন্যাসিক ইওসুনারী কাওয়াবাতাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনে ডঃ রাধা কৃষ্ণণ একটি অনবদ্য ভাষণ দিয়েছিলেন ইংরেজী ভাষায়। সন্ধ্যায় হোটেল লাউঞ্জে ডঃ রাধাকৃষ্ণণকে দেখে আমি এগিয়ে গেলাম এবং তাঁর ভাষণের প্রশংসা করলাম। তিনি হেসে একটু এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'দেখ ভালো বক্তৃতা করা আমার অভ্যাস আর যাঁরা শ্রোতা ভাল বক্তৃতা শুনে আনন্দিত হওয়াও তাদের অভ্যাস। এরপরে আর কিছুই হয় না। বক্তব্যকে কেউ কখনও অনুসরণ করে না বরঞ্চ অতি নিশ্চিন্তে ভুলে যায়।' সেদিন সন্ধ্যায় ডাইনিং হলে একই টেবিলে বসেছিলাম আমি, ডঃ হয়েস, ঔপন্যাসিক টমস মান সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিলেন মনে পড়ে। একটি কথা তিনি বলেছিলেন টমাস মান জীবনকে একটি সময়ের অভিঘাতে চিহ্নিত করেননি, অনন্তকাল ধরে মানবচিত্তের যে অনুভূতি এবং বিকাশ ঘটে এসেছে তারই রহস্য তিনি উদঘাটনে প্রয়াস পেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

সম্মেলনে যোগ দেয়ার পথে আমি লন্ডনে কয়েকদিন অবস্থান করেছিলাম। সেখানে একাউন্টার অফিসে কবি স্টিফেন স্প্যান্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং আলবার্তো মোরাভিয়ার সঙ্গে লন্ডন থেকে ফ্রাঙ্কফোর্টে আসি।

সম্মেলন শেষে ড্যুসেলডর্ফে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বইমেলায় আমি অংশগ্রহণ করি। এখানে জার্মানীর একজন ঔপন্যাসিক সট হোল্ড গ্লোগার এবং তাঁর ভগ্নী রোজভিটা গ্লোজারের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। রোজভিটার আমন্ত্রণক্রমে আমি বুডিংগেনে তার গৃহে দুদিন অবস্থান করি।

বুডিংগেন অত্যন্ত সবুজ একটি বনাঞ্চল। এখানকার আকাশ আমার কাছে অত্যন্ত নীল মনে হয়েছিল। তখনই আমার কাছে কেন যেন মনে হয়েছিল কবিতার শব্দ হচ্ছে নীল পাখীর মত। নীল হচ্ছে শান্তি ও স্বস্তির বর্ণাঢ্যতা এবং পাখী হচ্ছে উচ্চারিত কল্লোলের বরাভয়। রোজভিটার সঙ্গে বুডিংগেনের একটি বনভূমিতে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। সেখানকার সু-দুর্লভ সবুজের বন্যা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমার মনে আছে আমি সেখানে ঘাসের মধ্যে শুয়ে পড়েছিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙ্গেছিল এক চরম নিঃসঙ্গতার অনুভূতিতে। মনে হয়েছিল একটি বিস্ময়কর ভারহীনতায় আমি শূন্যের মধ্যে ভাসমান যেখানে অজস্র তরঙ্গ দোলা আমাকে শুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। ভাসতে ভাসতে স্নিগ্ধ সবুজের তটপ্রান্তে যেন ধাক্কা খেলাম। তখন সম্পূর্ণ জেগে উঠলাম। দেখি একটি অঞ্চলে ঘাসের গন্ধের মধ্যে নিরাবরণ পরিচ্ছন্নতায় আমি শুয়ে আছি। ঘাসের মসৃণ স্পর্শ এবং বাতাসের সবুজ শিহরণ আমাকে একটি অদ্ভুত অস্তিত্বের মধ্যে উপস্থাপন করেছিল। সত্যি সে মুহূর্তে বাতাসকে সবুজ মনে হয়েছিল।

বুডিংগেনে একটি কিন্ডার হাইমেন্টে ছোট ছোট শিশুর মধ্যে একটি দিন সম্পূর্ণ অতিবাহিত করি। এরপর জার্মানীর সাংস্কৃতিক জীবন প্রত্যক্ষ করার জন্য রোজভিটার সঙ্গে নুরেনবার্গ, মিউনিখ, হাইডেলবার্গ, টুবিনগেন, হ্যানয় এবং আরও কিছু শহর ও গ্রামাঞ্চল ভ্রমণ করি। এ সমস্ত শহরে সঙ্গীত, চিত্রকলা এবং নাটক উপভোগ করি। জার্মানীর এ অভিজ্ঞতায় আমার সাহিত্য জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। আমি পরবর্তী কালে জার্মান সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ করি। আমি প্রাচীন এবং মধ্যযুগের জার্মান সাহিত্য এবং আধুনিক জার্মান সাহিত্যের দুটি নিদর্শন বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি। জার্মান সাহিত্য এবং সংস্কৃতি ধারার প্রতি আমার আকর্ষণের অংকুর উদ্গম ঘটেছিল এ সময়কালেই। এ সময়কালের অভিজ্ঞতার কিছু চিহ্ন 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় আছে, যেখানে আমি উত্তর ব্যাভেরিয়ার অরণ্যে বিস্তারের কথা বলেছি এবং বাতাস ও সূর্যের আলোকে সবুজ বলেছি। আমার 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' কাব্যগ্রন্থের দুটি কবিতায় এ সময়কার সৌভাগ্য এবং আনন্দের কিছু পরিচয় আছে। কবিতা দুটির একটি হচ্ছে 'তোমার হৃদয় আমার হৃদয়' এবং অন্যটি হচ্ছে 'তোমাকে দিলাম'।

জার্মানী থেকে প্যারিসে আসি এবং সেইজঁতে অবস্থান করি। সে সময় সেইজঁতে ভারতীয় লেখক উমাশংকর যোশী অবস্থান করছিলেন। পরবর্তীকালে উমাশংকর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন এবং ভারতের পার্লামেন্টের সদস্যও হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

প্যারিসে আমার অধিকাংশ সময় বিখ্যাত ফরাসী কবি ইভানগলের পত্নী ক্লেয়ার গলের সান্নিধ্যে কাটে। ক্লেয়ার গল তখন থাকতেন ৪৭ নং রুয় ভানুতে। প্যারিসে ফরাসী লেখিকা লুস ক্লদ মেইরের সঙ্গে বিভিন্ন চিত্রশালা এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিদর্শন করি। লুস বর্তমানে ইউনেস্কোতে কাজ করছেন। প্যারিসে আকস্মিকভাবে ভারতীয় লেখক রাজা রাওয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। রাজা রাও থাকতেন বুলভার্ড মুরাত অঞ্চলে। রাজা রাওয়ের খ্যাতি দি সারজেন্ট অ্যান্ড দি বে উপন্যাসের জন্য। উপন্যাসে লেখক বাস্তব এবং অবাস্তবে প্রতীকগত ব্যঞ্জনা নিয়ে একটি সফলকাম পরীক্ষা করেছেন।

আমি আমার পুরনো বন্ধু জাঁ দীয়ুব এবং আকাদেমী ফ্রাসের খ্যাতিমান সদস্য বিখ্যাত ফরাসী গল্প লেখক আঁদ্রে শাসেঁর সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করি। জার্মানী এবং পরে প্যারিসে অবস্থান আমার কাব্যজীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। এসব অঞ্চলের কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছি এবং তাদের মাধ্যমে বিদেশী কবিতার প্রকৃতি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি। এ সম্পর্কে আমি আমার কাব্য সমগ্রের ভূমিকায় লিখেছি, বিদেশে দেখেছি যে শব্দকে একমাত্র অন্বিষ্ট ভেবে কবিরা যথার্থ বক্তব্যকে শব্দে সমর্পণ করবার প্রয়াসী হয়েছেন, কি করে পরিচিত শব্দ নতুন অর্থ গ্রাহ্যতায় প্রসারিত হয়েছে তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আধুনিক চিত্রকলার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আধুনিক কবিতা কিভাবে বিষয়কে উপস্থাপন না করে বিষয়ের বিবেক এবং আত্মাকে উপস্থাপন করেছে তা জেনে আমি চমৎকৃত হয়েছি। তখন থেকেই আমার চিন্তা এসেছিল যে আমার একান্ত নিগূঢ় অনুভূতিকে পরিচিত শব্দের দাক্ষিণ্যেই প্রকাশ করব, কিন্তু নতুন স্বভাবের বিশেষণ এবং উপমা রূপক ব্যবহার করে তাকে নতুনভাবে অর্থবহ করবো।

॥২২॥

১৯৫৯ সালের ১৮ই মে ঢাকায় আমার পিতার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর সময় আমি তাঁর শয্যাপার্শ্বে ছিলাম। তিনি অনেক দিন ধরে অসুস্থ ছিলেন কিন্তু এ অসুস্থতার মধ্যেও তিনি নিয়মিত আমার কাছে চিঠি লিখতেন এবং চিঠিতে আমার কল্যাণ কামনা করতেন। নিজের শরীরের বিষয়ে বিশেষ লিখতেন না, আল্লাহ্ যেভাবে রাখেন তাতেই তিনি সন্তুষ্ট আছেন এ রকম একটা ইঙ্গিত তাঁর চিঠিতে সব সময় পাওয়া যেত। আমি করাচী থেকে তাই ধরে নিয়েছিলাম যে তিনি মোটামুটি ভালই আছেন। হঠাৎ মে মাসের এক কি দুই তারিখে তাঁর একটি চিঠি পাই। চিঠিতে নানাবিধ কথার পর তিনি লেখেন, 'তোমরা দুভাই করাচী থেকে যে টাকা পাঠাও সে টাকার পুরোটাই সংসারে ব্যয় হয়ে যায় আমার পথ্যের জন্য কিছুই থাকে না, যদি আলাদা করে আমার জন্য কিছু পাঠাও তা হলে ভালো হয়।'

এ চিঠিতেই আমার মনে হল বাবা হয়তো খুব অসুস্থ। এরপর ঢাকা থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলাম। টেলিগ্রামে আমার দুভাইকে সত্বর ঢাকায় আসতে বলা হয়েছে। আমি ১৬ তারিখে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঢাকায় এলাম। আমার ছোট ভাই আলী আশরাফ দুদিন পরে ঢাকায় আসবে ঠিক হয়। ঢাকায় এসে বাবার শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়ালাম যখন তখন তিনি আমাকে দেখে কেঁদে ফেললেন। বাবাকে জীবনে আমি কখনও ভাবাবেগে

www.pathagar.com

উদ্বেল হতে দেখি নি। তিনি চিরটাকাল আল্লাহর উপর নির্ভর করে এসেছেন। এ নির্ভরতা তাঁকে প্রশান্তি দিত। তিনি বলতেন– "আল্লাহ্ তায়ালা যা নির্ধারিত রেখেছেন তা অবশ্যই ঘটবে। সে জন্য দুঃখ করে কোন লাভ নেই।" কারও মৃত্যুতে তাকে শংকাকুল হতে দেখি নি। তিনি মৃতের সৎকারের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন এবং নিজে নিশ্চিন্তে থেকে সকলকে প্রবোধ দিয়েছেন। এতে কখনও কখনও আমার মনে হত, বাবা হয়ত নিষ্ঠুর, তাঁর মধ্যে বোধহয় মমতা নেই। কিন্তু তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে যখন তাকিয়েছি তখন তাঁর আকুল ক্রন্দন দেখে আমার মনে হল আমি এতকাল তাঁকে ভুল বুঝেছি। তিনি আমাদের সকলকে কাছে ডাকলেন এবং আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। আশরাফের আসতে দেরি হবে শুনে হতাশ হয়ে বললেন– "ওর সঙ্গে বোধহয় আর দেখা হবে না।"

বাবার মৃত্যু ঘটে আমি আসার দু'দিন পরে। ১৮ তারিখ রাত দশটায় তিনি সজ্ঞানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমরা, ছেলেমেয়েরা সবাই তাঁর শয্যাপাশে ছিলাম, নিকট এবং দূরের সব আত্মীয়-স্বজন কাছে ছিলেন। মৃত্যু মুহূর্তে শেষবারের মত চতুর্দিকে তাকিয়ে চোখ বুজলেন। হঠাৎ মনে হল একটি বিপুল আশ্রয় এবং নির্ভরতা থেকে আমি চিরকালের জন্য দূরে সরে গেলাম। আমার একটি ধারণা সব সময় ছিল, পিতামাতার জীবিত থাকাটাই সন্তানের জন্য বিরাট আশীর্বাদ এবং প্রবল নির্ভরতা। তারা প্রত্যূষে কিছু করেন না, করার সামর্থ্য হয়ত থাকে না অনেকের, কিন্তু তারা সব সময় সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন। এই কল্যাণ কামনাটাই সন্তানের জন্য বিরাট বরাভয় এবং আশ্রয়। তাদের আশীর্বাদটা হচ্ছে সন্তানের জন্য রক্ষাকবচের মত। কিন্তু পিতামাতা যখন থাকেন না তখন সন্তানকে একাকী সংকল্প নিতে হয় এবং একাকী সকল বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়। তখন আশীর্বাদ করার মত কেউ থাকে না। বাবার মৃত্যুর পর আমি আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম– "আমি কেমন যেন বন্ধনহারা হয়ে পড়েছি, আমার মনে হচ্ছে আমি মুক্ত হয়ে পড়েছি, কিন্তু এ মুক্তি আমি চাইনি।" আমার স্ত্রী অবাক হয়ে বলেছিলেন– "তুমি এ কি বলছ, তুমি মুক্ত হয়েছ তার অর্থ কি?" আমি তখন বলেছিলাম– "আমি একা হয়ে পড়লাম, আমার জন্য কোন নির্ভরতা এবং অবলম্বন রইল না, এখন আমাকে একাকী সকল দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এগিয়ে চলতে হবে।"

আমার পিতা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ উদার পুরুষ ছিলেন। তাঁর মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ছিল না। তিনি সুফী সাধনায় দীক্ষিত ছিলেন। কিন্তু কখনও পীর হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করেন নি। তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল কোরআন শরীফ এবং হাদিস। তাঁর ঔদার্যের সকল অবলম্বন এবং নীতিমালা তিনি পেয়েছিলেন কোরআন এবং হাদিস থেকে। তাঁর জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা আমার মনে পড়ছে ঃ ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যখন পাসপোর্ট এবং ভিসা প্রবর্তিত হয়নি, সে সময় বাংলাদেশ থেকে যেসব হিন্দু স্থায়ীভাবে ভারতে চলে যাচ্ছিলেন তাদের একটা অনুমোদনপত্র নিতে হত। একে বলা হত 'এক্সপেট্রিয়েশন সার্টিফিকেট'–রূঢ় ভাষায় যার অর্থ হয় 'নির্বাসন সনদ'। সে সময় একজন শিক্ষিতা বৌদ্ধ মহিলা আমাদের বাড়িতে এক মাস ছিলেন এবং আমরাই তাঁর দেশত্যাগ করার সকল ব্যবস্থা ঠিক করে দেই।

www.pathagar.com

ঘটনাটা ঘটে এভাবে ঃ হোসেনী দালানের যে বাসায় আমরা থাকতাম, সে বাসার ঘরগুলি রাস্তার সঙ্গে লাগোয়া। ঘরের দরজা খুললেই রাস্তা পড়ে। বাবা একদিন সকাল ১০টার দিকে বাইরের ঘরের রাস্তার দিকের দরজাটা যেই খুলেছেন তখন দেখেন যে সিঁড়ির উপর কে এক মহিলা বসে আছেন, দরজা খোলার শব্দ শুনে মহিলা তাড়াতাড়ি দাঁড়ালেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, "আমি বক্সীবাজারে একজনের খোঁজে গিয়েছিলাম, সেখানে তাকে না পেয়ে ফিরতি পথে ক্লান্ত হয়ে আপনাদের এ সিঁড়ির ওপর বসে পড়েছি।" ভদ্রমহিলার কথাবার্তা এবং উচ্চারণ অত্যন্ত মার্জিত এবং পরিশীলিত ছিল, ভদ্রমহিলা প্রৌঢ়া হলেও এককালে যে সুন্দরী ছিলেন, তা তার চোখের দীপ্তি দেখলে বোঝা যায়। বাবা তাকে ডেকে বাড়ির ভিতরে বসালেন। ভদ্রমহিলা বললেন যে, তিনি চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন এবং প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার আত্মীয়া। দেশ বিভাগের পর বাংলাদেশে তিনি একা পড়ে গেছেন। তাই তিনি ভারতে চলে যেতে চাচ্ছেন। ভারতে যেতে হলে যেসব কাগজপত্র যোগাড় করতে হয় সেগুলো তিনি যোগাড় করতে পারছেন না। তাকে সাহায্য করবার মত কেউ নেই। বাবা তখন ভদ্রমহিলাকে আমাদের বাসায় থাকতে অনুরোধ জানালেন এবং বললেন–'আপনি আমাদের এখানে নিশ্চিন্তে থাকুন, আমার ছেলেরা আপনার কাগজপত্র যোগাড় করে দেবে এবং আপনার কলকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে।"

ভদ্রমহিলার নাম জ্যোতির্মালা দেবী। দর্শনশাস্ত্রে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছিলেন। বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বাংলাতে একটি বই লিখেছিলেন "বিলেত দেশটা মাটির"। ভদ্রমহিলা একমাস আমাদের বাড়িতে ছিলেন। রাত্রিবেলা আমার মার সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করেছেন এবং আমাদের দেয়া সকল খাবার খেয়েছেন। প্রতিদিন বিকেলে বাবা যখন বাড়ির বারান্দায় বসে বিভিন্ন উপদেশমূলক কথা বলতেন এবং ধর্মগ্রন্থ থেকে উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য রাখতেন তখন এ মহিলা বাবার কথা তন্ময় হয়ে শুনতেন, মাঝে মাঝে বাবার কথার সমর্থনে তিনিও কিছু বলতেন। বৌদ্ধ জাতকের বহু গল্প এ মহিলার জানা ছিল। তিনি সময় পেলে গল্পগুলি বলতেন। আমাদের পরিবারের মধ্যে মহিলা পুরোপুরি মিশে গিয়েছিলেন। তিনি যে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এটা কারও মনে হত না। এই মহিলা একদিন বৌদ্ধ জাতকের মহামঙ্গল সূত্রের উপাখ্যান বর্ণনা করেছিলেন। মঙ্গল বলতে কি বোঝায় এই ব্যাখ্যা নিয়ে মহামঙ্গলসূত্রের উদ্ভব। কেউ মঙ্গল বলতে বোঝে যে কিছু শুভ পদার্থের দর্শনই মঙ্গল, আবার কেউ বলে, যে সমস্ত সুনিমিত্তের কথা শ্রবণ করা যায় সেটাই মঙ্গল। আবার কেউ বলে, কতকগুলো বিশেষ বস্তু স্পর্শ করার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত আছে। কিন্তু যথার্থ মঙ্গল কি তার ব্যাখ্যা বোধিসত্ত্বা দিয়েছিলেন। এবং সেই ব্যাখ্যার মধ্যে মৈত্রী, পরিতুষ্টি, বিদ্যা; শ্রদ্ধা এবং জ্ঞানের কথা আছে। মহিলা অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে মঙ্গল জাতককে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

মহিলার কলকাতা যাবার সকল ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু কলকাতা গিয়ে তিনি আর আমাদের কাছে কোন চিঠিপত্র লেখেন নি। পরে শুনেছিলাম যে তিনি সারনাথে গিয়ে বুদ্ধের ধ্যানে নিমগ্ন রয়েছেন। ভদ্রমহিলার কিছুটা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল এবং আপনজনের সঙ্গত্যাগ করে একাকিনী সারনাথে শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন। কয়েক জন বৌদ্ধ পণ্ডিতের কাছে এ মহিলার মস্তিষ্ক বিকৃতির কথা শুনেছিলাম। এক সময় এ মহিলার

www.pathagar.com

প্রভূত ঐশ্বর্য ছিল, সমাজে প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেমন যেন তিনি দিশাহারা হয়ে গিয়েছিলেন। ঢাকায় আমাদের বাসায় যখন ছিলেন তখন এই দিশাহারা ভাবটি আমাদের নজরে পড়ে নি।

বাবার জীবনে আরেকটি ঘটনা আমার বলতে ইচ্ছে করছে। আমাদের দেশের বাড়িতে ভোলা বলে আমাদের অনুগত একটি লোক ছিল। গ্রাম থেকে আমাদের চাল-ডাল তরিতরকারী সে নিয়ে আসত। ভোলা বিবাহিত ছিল এবং দেশে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে ছিল। একবার মা তাকে একটি কাজের মেয়েলোক এনে দিতে বললেন। কিছুদিন পর ভোলা গ্রাম থেকে একটি যুবতী মেয়েকে এনে আমাদের বাসায় দিয়ে যায়। ভোলা জানায়, মেয়েটিকে সে বিয়ে করেছে। কিন্তু কয়েকদিন কাজ করার পরেই বাবা-মার সন্দেহ হতে লাগল, মেয়েটি মুসলমান নয়, হিন্দু। বাবা তখন মেয়েটিকে জেরা করে তার সব খবর নিলেন। জানা গেল মেয়েটি আমাদের গ্রামেরই এক হিন্দু সুতার পরিবারের বউ। বাবা তখন গ্রামে লোক পাঠিয়ে সুতারদের বাড়ির লোকদের ডেকে আনলেন। তিনি তাদেরকে মেয়েটিকে নিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু গৃহত্যাগিনী এই রমণীকে তারা নিতে রাজী হল না। তাছাড়া মেয়েটিও ওদের সঙ্গে যাবে না বলল।

কিন্তু এরপর মেয়েটিকে বাবা বাড়িতে স্থান দিলেন না। ভোলা এসে মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেল। এক্ষেত্রে বাবার চরিত্রের একটা দৃঢ়তা আমি লক্ষ্য করেছিলাম এবং অন্যায়ের একটা প্রতিবাদ তাঁর মধ্যে দেখেছিলাম। মা অবশ্য মেয়েটিকে নিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না। এভাবে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বাবাকে আমি দেখেছি উদার এবং ন্যায়পরায়ণতার মধ্যে। তিনি কখনও অন্যায়ের সঙ্গে হাত মেলাননি এবং কখনও ধৈর্যের আদর্শ থেকে দূরে সরে যাননি। মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে যখন তিনি উপদেশ দিতেন তখন সেই উপদেশ নিছক উপদেশ থাকত না, একটি সান্ত্বনায় পরিণত হত। একবার এক ভদ্রলোক তার জীবনের দুঃখের কথা বাবাকে বলছিলেন, কথা শেষ করে ভদ্রলোক মন্তব্য করেছিলেন–'আল্লাহ নিশ্চয়ই আমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।'

বাবা উত্তরে বলেছিলেন–এমন কথা বলবেন না, কক্ষণো বলবেন না। আল্লাহ্ কখনও কারও কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন না, কখনোই না। বেঁচে থাকার অধিকার সবারই আছে, নাস্তিকেরও আছে। তিনি আরও বলেছিলেন– যখন প্রচণ্ড ঝড় ওঠে মানুষ তার বাড়ি ভেঙ্গে যাবে বলে ভয় পায়। কিন্তু বাড়িটা যখন ভেঙ্গেই যায় তখনও তো কিছু করবার থাকে ঝড়ের বিরুদ্ধে, সে কিছুই করতে পারে না, কিন্তু বাড়ি ভেঙ্গে গেলে আবার নতুন করে তৈরী করতে পারে।

বাবাকে দেখতাম তিনি শান্তভাবে কথা বলতেন। কেমন যেন উপমা-রূপক দিয়ে কথা বলতেন এবং আল্লাহর প্রতি অপরিসীম নির্ভরতায় একটি বিস্ময়কর নিশ্চিন্ততায় বাস করতেন। এরকম নিশ্চিন্ততা আমি আর কারও মধ্যে দেখে নি।

এ বছর আমার 'অনেক আকাশ' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশ করেছিলেন আমারই এক ছাত্র মহিউদ্দিন আহমদ। সে বার্ডস এ্যান্ড বুকস নামক একটি পুস্তক প্রকাশন সংস্থা গড়ে তুলেছিল। মহিউদ্দিন বর্তমানে জীবিত নেই। এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আমি

www.pathagar.com

প্রধানত মানুষের জীবনে যে প্রেম আসে সেই প্রেমের তাৎপর্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। শরীর এবং মন এই দুই-এর সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষায় প্রেমের যে অভিব্যক্তি ঘটে তার একটি পরিচয় আমি এই গ্রন্থের মধ্যে দেবার চেষ্টা করছি। তাছাড়া বিদেশের কিছু অভিজ্ঞতার কথা কয়েকটি কবিতায় আছে। কবিতাগুলোর মধ্যে শব্দকে অনুভব করবার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি শব্দের মধ্যে যে অর্থ দ্যোতনা ঘটে সে অর্থের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করবার চেষ্টা আমি করেছি। তাছাড়া একটি চিত্রকলায় যেভাবে রঙ ও রেখার সমন্বয়ে জীবনের একটি তাৎপর্য উদঘাটিত হয় আমি কবিতার মধ্যে শব্দের সাহায্যে তাই করতে চেয়েছি। আমি জানি না আমি সফলকাম হয়েছি কিনা।

কিন্তু এক্ষেত্রে আমার চেষ্টা ছিল আন্তরিক। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের ফলে এবং সে সব দেশের উল্লেখযোগ্য কবিদের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমি শব্দকে নতুন মাত্রায় অনুভব করেছি। বিদেশে দেখেছি যে তারা পরিচিত শব্দকেই ব্যবহার করেছেন কিন্তু তাঁকে নতুনভাবে অর্থবহ করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটি ইভান গলের একটি কবিতা অবলম্বন করে লেখা। কবিতাটির নাম 'তোমাকে ধরা যায় না'। ১৯৫৮ এবং ১৯৫৯ সালে প্যারিসে যখন কিছুদিন ছিলাম তখন ইভান গলের কাব্যকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই। তাঁর কবিতার মধ্যে প্রেমের একটি অন্তর্গূঢ় পরিচয় আছে, সে পরিচয়টি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি এ সময় ক্লেয়ার ও ইভাগ গলের প্রেমের কবিতার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করি। এ গ্রন্থের নামকরণ করেছিলাম 'প্রেমের কবিতা।' অনুবাদ বা ছাপার কাজ ১৯৫৮ সালেই শেষ হয়েছিল কিন্তু বইটি বাজারে আসে ১৯৫৯ সালে। করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে অনুবাদটি প্রকাশিত হয়। ইভানের কবিতাংশ আমিই অনুবাদ করেছিলাম। ক্লেয়ারের সম্ভাষণের অনুবাদ করেছিল আমার ভাই আলী আশরাফ। এই গ্রন্থের যুগ্ম প্রেম-সংলাপ, বিবিধ তাৎপর্য, রহস্য শংকা এবং আনন্দময়তাকে নিয়ে উদ্ভাসিত। মার্ক শাগাল এই কাব্যগ্রন্থটিকে চিত্রিত করেছিলেন। শাগালের অসাধারণ চিত্র ব্যঞ্জনায় কাব্যের পরাবাস্তবগত উপমা রূপক আনন্দঘন বোধগ্রহিতায় ধরা পড়েছে। প্রেমিক-প্রেমিকা ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে ভেসে চলেছে শূন্য পথে—পশ্চাদভূমিতে রাতের আকাশের রহস্যময় ঔজ্জ্বল্য, কোন ছবিতে নমনীয় কোমলতায় প্রেমিক প্রেমিকা, চুম্বনরত, প্রেমিকের পাদদেশ উর্ধ্বলোকে এবং প্রেমিকা নিম্নলোকে, কোথায়ও বা ভূমির আকর্ষণকে অতিক্রম করে বিবিধ অট্টালিকা শ্রেণীর উপর ভাসমান দেখছি প্রেমিক-প্রেমিকাকে প্রতিটি চিত্রই কাব্যের রহস্যময়তা এবং স্বপ্নের সম্পন্নতায় স্বাক্ষর বহন করে। যেমন ইভান এবং ক্লেয়ারের পরাবাস্তবগত ব্যঞ্জনা, তেমনি মার্ক শাগালের চিত্রকর্মের রহস্যময় অবাস্তব বর্ণময়তা।

ক্লেয়ারকে দেখি আমি তাঁর জীবনের অপরাহ্নে। কিন্তু তখনও সূর্যের অন্তরালের মত তাঁর দৃষ্টিতে এবং কথা বলয় সৌন্দর্যের সাড়া ছিল। ইভান লিখেছিলেন, ক্লেয়ারের হাসি আমার গোধুমচূর্ণ এবং তাঁর কাব্য আমার প্রতিদিনের রুটি। ক্লেয়ারের নীল চোখের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তাঁর যৌবন কালের উচ্ছলতার কথা কল্পনা করা যায়।

১৯৫৯ সালে প্যারিসে গিয়ে প্রথমেই বাংলা অনুবাদটি ক্লেয়ারের হাতে তুলে দেই। বইটি পেয়ে ক্লেয়ার আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। বলেছিলেন আমি খুব খুশী হয়েছি। ইভানও খুশী হয়েছে।

আমি বলেছিলাম ইভান খুশী হয়েছে একথা কি বলা যায়?

www.pathagar.com

ক্লেয়ার বলেছিলেন, কেন যাবে না? আমার মধ্যেই তো ইভান আছে। কবিতা অনুবাদ করলে আর এটুকু বুঝলে না? ইভান আমার ওষ্ঠে হেলান দিয়ে দেবতাদের স্বগত শুনেছে, আবার কখনো আমার চোখে হেলান দিয়ে পিছনে দেখেছে বাণীর উন্মেষ। আমাকে সে ভালবেসেছিল যখন পাহাড়ের নিচে দামী পাথরগুলো ছিল সকালবেলার কম্পমান আলো। এভাবেই আমরা একাত্ম হয়েছিলাম। আমার এবং ইভানের পদচিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো বিনিঃশেষ বিন্দুতে। এখন আমি ও ইভান অভিন্ন।

এ বছর করাচীতে অবস্থানকালে "কবি মধুসূদন" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করি। গ্রন্থটি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য সমিতির পক্ষ থেকে ঢাকার নওরোজ কিতাবিস্তান কর্তৃক পরিবেশিত হয়। গ্রন্থটি অবশ্য পুস্তক আকারে পাঠকের হাতে আসে অনেক পরে।

এ সময় আমি মালিক মোহাম্মদ জায়সীর "পদুমাবত এবং অন্যান্য অবধী" কাব্যগ্রন্থ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করি। এ গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ হয় বাংলা একাডেমীতে আমার অবস্থানকালে।

১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পাঠক্রমের মধ্যে আলাওলের 'পদ্মাবতী' সর্বপ্রথম তালিকাভুক্ত হয়। তখন 'পদ্মাবতী' পড়াতে গিয়ে জায়সীর 'পদুমাবতের' সঙ্গে পরিচিত হই এবং তখনই আংশিকভাবে আলাওলের নির্ভরতা ও ব্যতিক্রম আমার লক্ষ্যগোচর হয়। ১৯৫৩ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আমি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলাম। সে সময়কালে আমার অবসর ছিল প্রচুর। অবসরকালে সময়ক্ষেপণের উপকরণ হিসাবে হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যকে গ্রহণ করেছিলাম। বিশেষ করে প্রাচীন ও মধ্যযুগের হিন্দী-অবধি ভাষা ও সাহিত্য। বিস্মিত হয়েছিলাম কবীর-তুলসীদাস- জায়সীর পদলালিত্যে, 'যেন বচন সুনত মত মোহগত'। ক্রমাগত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে অনেক বিশ্লেষণ ও বিচারের পর হিন্দী অবধী সাহিত্যের আনন্দ ও সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করেছিলাম। প্রণয়ের প্রতিষ্ঠা হিসেবে সে সাহিত্যের কবিরা অভাবনীয়কে যেভাবে দীপান্বিত করেছিলেন, পাক ভারত উপমহাদেশের অন্য কোথাও সাহিত্যে তার তুলনা নেই। তখনই আমার ইচ্ছা জাগে যে এ অভাবনীয়ের কিছুটা স্বাদ বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করবো। সুযোগ এলো বাংলা একাডেমীর কর্ম-পরিচালনাকালে জায়সীর 'পদুমাবতে'র অনুবাদ আরম্ভ করি। এ সূত্রপাত থেকেও অবশেষে জায়সী ও আলাওলের কাব্যের ভাব, ভাষা ও অলংকারের তুলনামূলক আলোচনা ক্রমশঃ রূপ পেতে থাকে।

॥২৩॥

জয়প্রকাশ নারায়ণ ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে একজন প্রসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। বামপন্থী হিসেবে নিজের জীবনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা করলেও শেষ পর্যন্ত এ পথ তিনি ছেড়ে দেন এবং সমাজতান্ত্রিক হিসেবে একটি কর্মধারা নির্মাণ করে নেন। তার সমাজতান্ত্রিক কর্মধারায় রাজনৈতিক বিক্ষোভ বা বিতর্ক ছিল না, এটা ছিল তাঁর একটি জীবনদর্শন। কমিউনিজম থেকে ভিন্নতর একটি বিশেষ ধরনের সমাজতান্ত্রিক দর্শনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। এ দর্শনের মূলকথা ছিল মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা এবং

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমঅধিকারের দৃষ্টি। যে সময়ের কথা বলছি তখন তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পুরোপুরি পরিত্যাগ করেছেন এবং আচার্য বিনোবা ভাবে প্রবর্তিত 'ভূদান আন্দোলন'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই 'ভূদান আন্দোলন' ছিল বিনোবা ভাবের ব্রত উদযাপনের মত। যারা ভূমিহীন তাদের জন্য দানস্বরূপ ভূমি সংগ্রহ করাই ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য। আচার্য বিনোবা ভাবে ভারতের বিভিন্ন জমিদারের কাছ থেকে দরিদ্রদের জন্য ভূমি গ্রহণ করেছেন এবং সেই ভূমি বিতরণ করেছেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ এই আন্দোলনকে একটি দার্শনিক বিবেচনায় পরিণত করেন।

১৯৫৯ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর এই জীবনদর্শনের ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে ইউরোপের দেশসমূহ পরিভ্রমণ করেন। লন্ডনে বিখ্যাত দার্শনিক এবং সাহিত্যিক আর্থার কোয়েজলারের অতিথি ছিলেন। আর্থার কোয়েজলারের সঙ্গে তাঁর অনেক বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও জনকল্যাণের আদর্শের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে মিল ছিল। লন্ডন থেকে তিনি প্যারিসে যান। প্যারিস থেকে জার্মানী যান। অবশেষে সুইডেন ও ইসরাইল হয়ে পাকিস্তানের করাচীতে আসেন। করাচীতে তিনি এ কে ব্রোহীর অতিথি ছিলেন। এখানেই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। করাচীর হোটেল মেট্রোপলে তিনি একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল পার্টিসিপেটরী ডেমোক্র্যাসি অর্থাৎ 'অংশীদারী গণতন্ত্র'। এটি একটি নতুন তত্ত্ব প্রচার করছিলেন তিনি। এই তত্ত্বের মূললক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক দলবিহীন এক প্রকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। গ্রাম জীবন থেকে আরম্ভ করে ক্রমশঃ নগর জীবন অবশেষে দেশে বিভিন্ন মানুষ দেশ গড়ার কাজে মিলিত হবে। এর উপর জয়প্রকাশ নারায়ণ একটি গ্রন্থ রচনা করছিলেন। এই গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তার বেসিক ডেমোক্র্যাসির রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন। হোটেল মেট্রোপলে জয়প্রকাশ নারায়ণের বক্তৃতা আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনেছিলাম। তিনি একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন যেটি আদর্শের দিক থেকে খুব মূল্যবান কিন্তু তার কোন বাস্তব কার্যকারিতা সম্ভবপর কিনা তা নিয়ে আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব জয়প্রকাশ নারায়ণকে তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে মৌলিক গণতন্ত্র বিষয়ে মত বিনিময় করেছিলেন।

এ সময় পাকিস্তান সরকার এ কে ব্রোহীকে ভারতে পাকিস্তানের হাই কমিশনার নিযুক্ত করেন। ব্রোহীর বিদায় উপলক্ষে আমি হোটেল মেট্রোপলে একটি রিসিপশনের ব্যবস্থা করি। এই রিসিপশনে করাচী শহরের অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন, শহীদ সোহরাওয়ার্দীও ছিলেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে ব্রোহীর কিছুটা চাতুর্যপূর্ণ বাকবিনিময় হয়। সোহরাওয়ার্দী ব্রোহীকে বলেন–'আপনি তো ভারতে যাচ্ছেন পাকিস্তানের প্রতিনিধি হয়ে। সেখানকার লোকেরা তো আপনার কাছে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বেসিক ডেমোক্র্যাসির ব্যাখ্যা চাইবে, আপনি তার কি ব্যাখ্যা দেবেন? ব্রোহী হেসে বললেন, এর আবার ব্যাখ্যা কি? এ ব্যাখ্যা তো সকলেরই জানা। এই বলে ব্রোহী বেসিক ডেমোক্র্যাসির মৌলিক কাঠামো ব্যাখ্যা করা আরম্ভ করলেন। সোহরাওয়ার্দী তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনি ব্যাখ্যাটা জানেন না। আমি আপনাকে একটি ব্যাখ্যা দিচ্ছি, দেখুন মনঃপূত হয় কিনা। এই বলে সোহরাওয়ার্দী সাহেব ব্যাখ্যা সূত্রে বললেন, বেসিক

www.pathagar.com

ডেমোক্র্যাসি হচ্ছে ডেমোক্র্যাসি অ্যাট দ্য বেইস অর্থাৎ বেইস ডেমোক্র্যাসি। মূল কথাটা হচ্ছে যে বেসিক ডেমোক্র্যাসি হচ্ছে এক প্রকার কলঙ্কময় গণতন্ত্র। ইংরেজী বেইস শব্দের দুটি অর্থ আছে একটি অর্থ হচ্ছে মৌলিক উপাদান বা ভিত্তিভূমি, আরেকটি অর্থ হচ্ছে কলঙ্ককর। সোহরাওয়ার্দী দুটো অর্থকেই প্রয়োগ করে ব্যাখ্যাটি তৈরী করেছিলেন। ইংরেজীতে যাকে বলে 'পান' সোহরাওয়ার্দী সেই পান ব্যবহার করেছিলেন। অর্থাৎ একটি শব্দের দুটি বিপরীত ধর্মী ব্যঞ্জনা দিয়েছিলেন।

পরের বছর ১৯৬০ সালের জুন মাসে ষোল থেকে বাইশ তারিখ পর্যন্ত পশ্চিম বার্লিনে আমি আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করি। আমার সঙ্গে এ কে ব্রোহীও ছিলেন। প্রথমে আমি করাচী থেকে লন্ডনে আসি। লন্ডনে কয়েকদিন থেকে সেখান থেকে প্যারিসে যাই ৯ই জুন তারিখে। এবারও প্যারিসে আমি মেইজঁতে অবস্থান করেছিলাম। এখানে অবস্থানকালে ক্লেয়ার গলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি এবং তাঁর সঙ্গে যতটা সময় কাটানো যায় কাটিয়েছি। সে সময় প্যারিসে পালে-রয়ালে জেমস জয়েসের ইউলিসিস ইন নাইট টাউন বলে একটি নাটক প্রদর্শিত হচ্ছিলো। একটি আমেরিকান নাট্যগোষ্ঠী নাটকটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিল। ক্লেয়ারের সঙ্গে এই নাটকটি আমি দেখি। আমি সন্ধ্যায় সেই জঁ থেকে বেরিয়ে রু্য দ্য মঁৎপোঁসিয়রে পালে রয়ালের সামনে উপস্থিত ছিলাম। ক্লেয়ার সেখানে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হয় এবং আমরা দুজনে একসঙ্গে হলে প্রবেশ করি। এই নাটকটি জেমস জয়েসের ইউলেসিস উপন্যাসের একটি অধ্যায় অবলম্বন করে তৈরী হয়েছিল।

অনুষ্ঠান শেষে পথে বেরিয়ে ক্লেয়ার বললেন, তুমি প্যারিসে আর্ট মিউজিয়ামগুলো দেখবে শুধু লুভর দেখলে সব কিছু দেখা হয় না। আর্ট মিউজিয়ামগুলো কয়েকটি তোমার অবশ্যই দেখা দরকার। ইভানের এমন এক প্রকার মোহছিল রোঁদা মিউজিয়ামের প্রতি। সম্ভবত শিল্পকর্মে রোদাঁর সফল আত্মপ্রকাশ, বিশেষ করে প্রেমের স্ফূর্তির ক্ষেত্রে রোদাঁ দৃপ্ত এবং নিসংশয় ভঙ্গী ইভানকে মুগ্ধ করেছিল। ইভানের কথা মনে করে তুমি অবশ্যই মুজি রোদাঁতে যাবে। ফরাসীরা প্রেমের অভিব্যঞ্জনাকে মূর্ত দেখে যেমন প্রকৃতির মধ্যে তেমনি চিত্রকর্মে, ভাস্কর্যে এবং স্থাপত্যে। রোদাঁ তাঁর ভাস্কর্যে এই অভিব্যঞ্জনকে আশ্চর্য সুন্দর করে মূর্ত করেছিলেন।

চৌদ্দই জুন তারিখে আমি প্যারিস থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টে আসি। ফ্রাঙ্কফুর্টে রোজভিটা গ্লোবারের গৃহে একদিন থেকে পনের তারিখে বার্লিনে যাই। বার্লিন সম্মেলন কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রীডমের দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আহ্বান করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যারা এ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সেনেগালের লীওপোল্ড সেডার সেঙ্ঘর, ঘানার ডক্টর কৃফী বসিয়া, ইটালীর বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ইগনাৎসিও সীলোনে সার হারবার্ট রীড, স্টিফেন স্পেন্ডার, ডক্টর জর্জ ওপেহাইমার, এডওয়ার্স শীল্‌স, জর্জ কেনন, জয়প্রকাশ নারায়ণ, মীনু মাসানী, অশোক মেহতা। প্রফেসর ওপেনহাটমার এটম বোমার আবিষ্কারক হিসাবে পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁকে দেখেছিলাম অত্যন্ত বিনয়ী শান্ত এবং স্পর্শকাতর। ওপেন-হাটমার ছিলেন অত্যন্ত শীর্ণকায়

www.pathagar.com

পরিচয় ঘটে। তিনি ঘানার ডঃ কুফি বুসিয়া। তিনি সে সময় লাইডেনে আন্তর্জাতিক বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ঘানার প্রধানমন্ত্রী নক্রুমার সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল এবং সেই বিরোধের কারণে বুসিয়া ইউরোপে পলাতক জীবন যাপন করেছিলেন। নক্রুমার পতনের পর বুসিয়া দেশে ফিরে যান এবং ঘানায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু এই দায়িত্বে তিনি বেশী দিন থাকতে পারেন নি। ছ'মাসের মধ্যে তিনি সেনাবাহিনীর হাতে অপসারিত হন এবং আবার ইউরোপে ফিরে যান। আমরা বার্লিনে একই হোটেলে ছিলাম–হোটেল বার্লিন। প্রায়ই আমাদের দেখা হতো এবং বিভিন্ন বিষয়ে আমরা আলাপ-আলোচনা করতাম। কনফারেন্সের অবকাশে আমরা একত্রে বার্লিনের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি।

বার্লিনে তৎকালীন বার্লিনের মেয়র উইলি ব্রান্ড-এর বাসগৃহে আমাদের একটি রিসেপশন ছিল। অতিথিরা সব একে একে মেয়রের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলেন এবং দু একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক শব্দ উচ্চারণ করে সরে যাচ্ছিলেন। আমার পালা যখন এলো তখন আমি জার্মানীর বনভূমি প্রীতির প্রশংসা করলাম। আমি বললাম যে জার্মানীর প্রতিটি শহরই গার্ডেন সিটি। এমন কি বার্লিনও উইলি ব্রান্ড আমার কথার উত্তরে বললেন, আপনি জেনে অবাক হবেন যে হিটলারের মত নৃশংস লোকও এদেশের কোন বাগান ধ্বংস করতে দেয় নি। বরঞ্চ অনবরত বৃক্ষ রোপণের সাহায্যে এ দেশকে প্রাকৃতিক উদ্যান হিসাবে গড়ে তুলেছিলো। উইলি ব্রান্ডের স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গিনী এবং হাস্যমুখী। আমরা সকলেই এদের উভয়ের আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

ইতোমধ্যে একদিন ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে রোজভিটা এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তার ভাই গটহোল্ড গ্লোবার পূর্ব বার্লিনে থাকে রোজভিটা সেখানেই উঠেছিল। সে আমাকে পূর্ব বার্লিনে নিয়ে যেতে চাইল। আমি ভারতীয় ঔপন্যাসিক রাজা রাও যার পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত ধীর এবং মন্থর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন যখন প্রথম আণবিক বোমা আবিষ্কৃত হয় তখন পৃথিবী একটিমাত্র দেশ এর রহস্য জানতো যার ফলে পৃথিবীর সামনে একটি সংকট উপস্থিত হয়েছিল। আজ এ সংকট অনেকটা দূরীভূত হয়েছে কেননা পৃথিবীর অনেক দেশ এর রহস্য জানে। এখন কোন দেশ এককভাবে এই বোমা ব্যবহার করতে সাহসী হবে না এবং এগিয়ে আসবে না। সবচেয়ে ভাল বক্তৃতা করেছিলেন সেনেগালের লিওপোল্ড সেডার সেঙ্ঘর তখনও সেনেগাল স্বাধীন হয়নি এবং তখন সেঙ্ঘর ছিলেন ফরাসী সিনেটের সদস্য। সেঙ্ঘর বলেছিলেন 'অতীত মানুষের জীবনে একটি ক্রিয়াশীল অস্তিত্ব অতীতকে বর্তমানের মধ্যে অনুভব করতে হবে। যেহেতু বর্তমান অতীতের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে সুতরাং বর্তমান হচ্ছে অতীতেরই এক প্রকার অগ্রসরমানতা। স্মৃতি নির্ভর হিসেবে অতীতের গুণকীর্তন করা এক কথা আর অতীতকে বর্তমানের স্নায়ুতে অনুভব করা অন্য কথা। আমি মনে করি যে মানুষের জন্য মহত্তম সংবাদ হচ্ছে সে একটি অতীতের অধিকারী এবং অতীতের সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি নিগ্রোদের জীবনধারা থেকে কিছু উদাহরণ দিয়েছিলেন এবং পূর্বপুরুষসংক্রান্ত তাদের জীবনদর্শনকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ব্যাখ্যাটি আমার ভাল লেগেছিল। কিন্তু স্পষ্ট মনে নেই তিনি কি বলেছিলেন।

www.pathagar.com

বার্লিনে আর একজন খ্যাতনামা নিগ্রো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার প্রভাকর চট্টপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে রোজভিটার সঙ্গে পূর্ব বার্লিনে গেলাম। পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের মধ্যে 'ব্রান্ডেনবুর্গার গেইট' নামে একটি গেইট আছে। পূর্ব বার্লিনে এই গেইটের পাশে হিটলারের রাইসটাগ এখনও অবস্থান করছে। আমরা গেইট দিয়ে পূর্ব বার্লিনে প্রবেশ করতে সেনাবাহিনীর লোকেরা আমাদের ট্যাক্সি থামাল এবং প্রত্যেকের পাসপোর্ট চেক করল। স্ট্যালিন এলি দিয়ে কিছু দূর অগ্রসর হতেই ১৬/১৭ বছরের একটি তরুণ গাড়ি থামিয়ে জানতে চাইল আমরা কোথায় যাচ্ছি। সে আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠল এবং গন্তব্যস্থানে নেমে চলে গেল। গাটহোল্ড গ্রেস্নারের বাসায় সেদিন তার জন্মোৎসব ছিল। প্রচুর মদ্যপানের মধ্যে সঙ্গীত ও নৃত্যের পরিবেশনায় রাত্রি ১২টা পর্যন্ত উৎসব চলল। উৎসব শেষে আমরা আবার পশ্চিম বার্লিনে ফিরে এলাম।

রাজা রাওয়ের সঙ্গে আমার দেখা প্রথমে প্যারিসে, পরে বার্লিনে আবার আমরা মিলিত হই। প্যারিসে রাজা রাও থাকতেন বুলভার্ড মুরাত অঞ্চলে। রাজা রাওয়ের খ্যাতি তাঁর ইংরাজী উপন্যাস 'দি সারপেন্ট এন্ড দি রোপ' এর জন্য। উপন্যাসে লেখক বাস্তব এবং অবাস্তবের প্রতীকগত ব্যঞ্জনা নিয়ে একটি সফলকাম পরীক্ষা করেছেন। রাজা রাওয়ের সঙ্গে পরে আর আমার দেখা হয় নি। রাজা রাও ছিলেন শান্ত, গম্ভীর ও স্থিতধী।

বার্লিন থেকে আমি হাঙ্গেরীয়ান রাইটারর্স ইন একজাইল নামক দেশত্যাগী হাঙ্গেরীয় লেখকদের সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য ডুসেলডর্ফে আসি। সংক্ষিপ্ত বিমানযাত্রায় জয়প্রকাশ নারায়ণ আমার সফরসঙ্গী ছিলেন। সর্বক্ষণ তিনি ধীরে ধীরে অনেক কথা বলছিলেন এবং আমি শ্রোতা ছিলাম। তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে এম এন রায়ের স্থান নিয়ে আলোচনা করছিলেন মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন যে এম এন রায় এমন এক সময় ভারতীয় রাজনীতিতে এসেছিলেন যখন দেশ তাঁর জন্য প্রস্তুত ছিল না। যদি তিনি আরও পরে আসতেন তা হলে হয়ত কিছু হতে পারতো। একথা বলেই জয়প্রকাশ একটু থেমে বলেছিলেন, যে বিশেষ একটি জীবনদর্শনে যারা বিশ্বাসী তাদের তত্ত্বগত অভিপ্রায়কে গ্রহণ করবার লোক যদি না থাকে, তাহলে রাজনীতির কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হয়ে যায়। এম এন রায়েরও তাই হয়েছিল।

ডুসেলডর্ফে আমি দিন তিনেক ছিলাম। শহরটি সুন্দর। কিন্তু আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়নি। তার কারণ বোধহয় আমি এখানে বাইরে ঘুরবার বেশি সুযোগ পাই নি। স্থানীয় এক কনফারেন্স শেষে তার বাড়িতে আমাকে আপ্যায়ন করেছিলেন। মহিলা জার্মান কিন্তু তার স্বামী ছিলেন আমেরিকান। ডুসেলডর্ফ শহরের এক প্রান্তে একটি নিরিবিলি জায়গায় তার নিজস্ব একতলা একটি সুন্দর বাড়ি ছিল। ডুসেলডর্ফে হাঙ্গেরীয় লেখকদের সেই সম্মেলনে স্পেনের বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী ডন সালভাদার মাদারিয়েগা উপস্থিত ছিলেন। মাদারিয়েগা সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। মাদারিয়েগা স্পেন থেকে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন লন্ডনে। তিনি সেখানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পেনীয় ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ইংরেজীতে যাকে বলে সেলফ একজাইল, তিনি সেই জীবন যাপন করছিলেন। স্পেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে তিনি সে দেশে আর ফিরবেন না এই তার সিদ্ধান্ত ছিল। তিনি আর দেশে ফিরতে পারেন নি, লন্ডনেই তার মৃত্যু ঘটে। একবার এশীয়

www.pathagar.com

দেশ পরিক্রমায় তিনি পাকিস্তানে এসেছিলেন এবং আমার আমন্ত্রণক্রমে ঢাকায় বাংলা একাডেমীতে তিনি বক্তৃতা করেছিলেন। সে ঘটনাটি বোধহয় ১৯৬৩ সালে।

ডুসেলডর্ফের পর আমি আবার ফ্রাঙ্কফোর্টে ফিরে যাই। ফ্রাঙ্কফোর্টের বিমানবন্দরে রোজভিটা আমাকে নিতে এসেছিল। রোজভিটার সঙ্গে আমি বুডিংগেতে যাই এবং সেখানে আমি কয়েকটা দিন কাটাই। রোজভিটা আমাকে ক্রমশ আকর্ষণ করছিলেন, আমিও মানসিকভাবে কিছুটা বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে পড়ছিলাম। কিন্তু ক্রমশ একটি চিন্তা আমার মনে দানা বাঁধতে থাকে। আমি ভাবতে থাকি যে একটি পরিচয়কে সহজ বন্ধুত্বের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রাখাই কর্তব্য। বন্ধুত্বের সীমানা যদি সে সম্পর্ক অতিক্রম করতে চায়, তাহলে এমন একটি জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে যা থেকে মুক্তি পাওয়া হয়ত অসম্ভব হবে। আমি তখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নেই যে এই আকর্ষণ থেকে আমাকে বিমুক্ত হতেই হবে। রোজভিটার গৃহের পরিবেশ, তার জীবন যাপন পদ্ধতি এবং তার জীবনদর্শন আমার জন্য সাবলীল এবং সহজ ছিল না। রোজভিটার সঙ্গে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ হয় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে। তখন আমি জার্মান সরকারের আমন্ত্রণক্রমে জার্মানীর বিভিন্ন শহরে শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করছিলাম। আমি যখন হাইডেলবার্গে তখন সে আমার সঙ্গে কয়েকজন বান্ধবীসহ দেখা করতে আসে। তখন তার কাছে শুনি যে সে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে বসবাস করছে যে তার স্বামী নয়। রোজভিটার জীবন দর্শন ছিল যে মানুষ কি করে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিভাবে করে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমার শিক্ষা ছিল এর বিপরীত। আমার কাছে পাপ-পুণ্যের সীমা নির্দেশিত ছিল এবং আমি কি, সেটাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

॥২৪॥

বার্লিন কনফারেন্সের পর আমি লিসবন হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার রায়ো ডি জেনিরোতে যাই ২৯শে জুলাই ১৯৬০ সালে। রায়ো ডি জেনিরোতে স্টীফেন স্পেন্ডার, আলবার্তো মোরাভিয়া, পলতাবোরি এবং ইভান জেলিনিক এখানে আমার সঙ্গী ছিলেন।

আমি রিসিফে থেকে রায়ো ডি জেনিরোতে গিয়েছিলাম। যে হোটেলে উঠেছিলাম এতদিন পর সে হোটেলের নাম মনে নেই, শুধু এটুকু মনে আছে যে হোটেলটি আভেনিদা রায়ো বাঙ্কোতে অবস্থিত ছিল। আভেনিদা এ্যাভেনিও, রায়ো বাঙ্কোর পুরনো নাম ছিল আভেনিদা সেন্ট্রাল। এটি একটি বিরাট এলাকা এবং এ শহরে বিপণি কেন্দ্র সমুদ্রের কাছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য এলাকা আছে আভেনিদা বিরয়মার। এ শহরে অজস্র পার্ক, বহু আকাশচুম্বী অট্টালিকা, মিউনিসিপ্যাল থিয়েটার, মিউজিক হল এবং আর্ট গ্যালারি আছে। শুনেছি ১৯০৯ সাল থেকে এ শহর আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত হতে থাকে। ব্রাজিলিয়ানরা বলে থাকেন, রায়ো ডি জেনিরো পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর শহর। এখানে একটি পুরনো সরু রাস্তা আছে যার নাম রুয়া দো ওভিদোর। এখানে প্রচুর ভিড় হয়। কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক এঁরা নাকি এখানে ভিড় করেন।

এখানে প্রচুর কফির দোকান আছে। ব্রাজিলের কালো কফিকে স্থানীয় লোকেরা বলে শয়তানের মতো শক্তিমান, কালির মতো কালো, নরকের মত গরম এবং প্রেমের মতো

www.pathagar.com

মধুর। এখানে সবাই কফি পান করে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প বলে সময় কাটায়। ইংরেজীতে যাকে বলে এ্যানিমেটেড অর্থাৎ উত্তেজক আলোচনা, এখানে তার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানকার ছোট ছোট রেস্তরাঁয় কবিরা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কবিতা পাঠ করে শোনায়। যারা শোনে তারা প্রশংসা করে যেমন, আক্রমণও করে তেমন। একজন কবি মেয়েদের কালো চোখ নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন–কি আশ্চর্য কালো চোখ, সমুদ্রের মতো গভীর, আমাজানের অরণ্যের মতো অন্ধকার, মেঘের ঘনঘটার মতো রহস্যময়। তার এক বন্ধু প্রশ্ন করেছিল এই চোখ কোন বয়সের মেয়ের? বয়স অনুসারেই তো চোখের স্বভাব বিচার করবো? প্রশ্ন শুনে সকলে উল্লাসে ফেটে পড়লো। এভাবে কবিতা পাঠ এবং কবিতা সমালোচনা তাদের ওখানে প্রতিদিনই হচ্ছে। সেখানে লক্ষ্য করেছি বয়স্ক কবিরাই যৌবনবতী রমণী শরীরের কথা এত মাধুর্য ও রসাপ্লুত করে বলেন।

কনফারেন্সে আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন স্টিফেন স্পেন্ডর, আলবার্তো মোরাভিয়া, ইভান জেলেনিরা এবং আরো অনেকে। একজন ভারতীয় ছিলেন তার নাম রচি হিঙ্গুরানী। একদিন সকাল বেলা হোটেলের ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্টে বসেছি, পাশের একটি টেবিলে দেখলাম আলবার্তো মোরাভিয়া। আমার টেবিলে আমরা কয়েকজন ছিলাম। ফ্র্যাংক তোজী নামক একজন অস্ট্রেলীয় পল, তাবোরী নামক একজন ক্যারিবীয়ান এবং বারবারা বলে একটি স্বাস্থ্যবতী বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে। মোরাভিয়া আমাকে দেখে ইশারা করলেন। আমি তার টেবিলে যেতেই বললেন, তোমার বান্ধবীকে নিয়ে এখানে এসো না। আমি বললাম, 'আমার বান্ধবী নয়, এখানেই পরিচয় হয়েছে।' আমি বারবারাকে বলতেই সে সানন্দে স্বীকৃত হল। বারবারা বসতেই মোরাভিয়া তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ হোটেলেই থাকো? তোমার রুম নাম্বার কতো? বারবারা বললো, মিঃ মোরাভিয়া, আমি আমার বাপমার সঙ্গে থাকি এ শহরেই। প্রশ্ন করেই মোরাভিয়া মেয়েটিকে নিরীক্ষণ করছিলেন কিন্তু তার জবাব শোনেন নি। আবার বললেন, তুমি এখানে থাকো না, তাহলে কোথায় থাকো? মেয়েটি তখন উত্তেজিত হয়ে বললো, 'মিঃ মোরাভিয়া, আপনি আপনার উপন্যাসের নায়িকাদের যে রকম তৈরী করেছেন পৃথিবীর সব মেয়েকেই সে রকম ভাবেন।' মোরাভিয়ার একটি অভ্যাস হচ্ছে কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে অসতর্ক এবং উদাসীন হয়ে যাওয়া, অন্যের কথা তিনি কখনো শোনেন না। আমি বহুস্থানে বহুবার তার এ স্বভাব লক্ষ্য করেছি। সুতরাং মেয়েটি যে বিরক্ত হয়েছে তাতে তিনি মোটেই বিব্রত হলেন না।

এই ব্রাজিলেই মোরাভিয়াকে নিয়ে আর একটি ঘটনা আছে, সেটা আমি এখানে বলবো। কনফারেন্স শেষ হবার পর আমাদের আরও কয়েকদিন থাকার কথা ছিল। আমি এবং মোরাভিয়া সিদ্ধান্ত করলাম আমরা আগেই প্যারিসে ফিরে যাবো। সুতরাং প্যান এ্যাম দো ব্রাজিল বিমানের অফিসে টিকেট বদলাতে গেলাম, টিকিট কাউন্টারে একটি লোক হাসি হাসি মুখে ধীর কণ্ঠে কার সঙ্গে যেন টেলিফোনে কথা বলছে। ইশারায় আমাদের বসতে বলে সে টেলিফোনে কথাই বলতে লাগলো। আমি ক্রমশঃ বিরক্ত হতে লাগলাম কিন্তু মোরাভিয়া সেখানে অপেক্ষমাণ একটি মেয়েকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আমাকে বললেন, 'মেয়েটিকে দেখ, কেমন চিবুক এবং চোয়াল, যৌনতার একটি শাণিত নিদর্শন। দেখতে

www.pathagar.com

থাকো সময় ভালো কাটবে।' অবশেষে টেলিফোন শেষ করে লোকটি আমাদের ডাকলো। আমাদের সমস্যার কথা শুনে বললো, তোমরা তো প্যারিসে যাবে, তাই না? সুতরাং প্যারিস পৌঁছানোটাই তো আসল কথা। সুতরাং আগে পৌঁছলে কি পরে পৌঁছলে তাতে কি আসে যায়। আমি বুঝলাম লোকটি আমাদের টিকিটের তারিখ পরিবর্তনের শ্রমটুকু করতে চাচ্ছে না। অথচ টেলিফোনে তার বান্ধবীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ প্রেমালাপ করতে পারে, আমাদের সঙ্গে কথাবার্তার দীর্ঘ সময় কাটাতে তার আপত্তি নেই। এই চরিত্র রায়ো ডি জেনিরোতে অনেক মানুষের মধ্যেই দেখা যাবে এরা সংলাপে চতুর, তাতে কর্মে অবহেলা হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না।

বারবারা বলেছিলো যে ওদেশের সিরেস্তা হচ্ছে একটি বিস্ময়কর বিশ্রাম পদ্ধতি। দুপুরে আহার্য গ্রহণের পর তারা নির্বিঘ্নে অফিসের কাজকর্ম ফেলে ঘুমোতে যায়। অফিস ঘরের পাশের ঘরেই হয়তো একটি হ্যামাক ঝুলছে, সেখানেই শুয়ে পড়ে এবং কখন যে উঠবে তার স্থিরতা থাকে না। অর্থাৎ জীবনে এদের মতো নির্ভাবনাময় সময় যাপন পৃথিবীর আর কোন দেশে কেউ করে কিনা জানি না। সহজ উদাসীনতার ভঙ্গি দেখালেও ব্রাজিলের মানুষ উদাসীন নয়। তার নিদর্শন পাই রায়ো ডি জেনিরোর নতুন স্থাপত্য শিল্পে এবং ব্রাসিলিয়া শহরের সামগ্রিক নগর বিন্যাসে। রায়ো ডি জেনিরোতে ন্যাশনাল স্কুল অব ফাইন আর্টস আছে। সেখানে দুজন বিখ্যাত স্থপতির উপস্থিতিতে স্থাপত্য শিক্ষার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এ দুজন শিল্পী হচ্ছেন লুসিও কস্টা এবং লাকরবুসীয়র। এরা ফর্ম এবং ফাংশনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ব্রাজিলে আধুনিক স্থাপত্যের প্রবর্তন করেন। রায়ো ডি জেনেরোর কয়েকটি অট্টালিকা খুবই বিখ্যাত। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে ব্রাজিলিয়ার প্রেস এসোসিয়েশনের দালান আর একটি হচ্ছে মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টের দালান এবং তৃতীয়টি হচ্ছে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের বিরাট অট্টালিকা। এই অট্টালিকাটির প্রাথমিক পরিকল্পনা বা নক্‌শা কুরবুসীয়র করেছিলেন। নিচের স্থান সংকোচের মধ্যে ঊর্ধ্বমুখী অট্টালিকা বাইরের বাতাসের দিকে কি অপূর্বভাবে যে উন্মুক্ত হয়েছে তার নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। কিন্তু পৃথিবীকে বিস্মিত করেছে নতুন রাজধানী ব্রাসিলিয়ার নগর পরিকল্পনা এবং সেখানকার বিবিধ অট্টালিকা। ব্রাসিলিয়ার ক্যাথিড্রন একটি অসাধারণ দ্রষ্টব্য বস্তু। খৃস্টের কন্টক মুকুটকে গির্জার আকৃতিতে উপস্থিত করা হয়েছে। সমস্ত গির্জাটি কংক্রীট এবং কাঁচের তৈরী। ব্রাসিলিয়ার সিনেট এবং প্রতিনিধি সংসদের অট্টালিকা দুটিও দ্রষ্টব্য বস্তু। ব্রাসিলিয়ার স্থপতি ছিলেন ওস্কার নিমেয়ার।

এ শহরের খোলা মাঠ, উদ্যান, হ্রদ, পথঘাট সব কিছুই অট্টালিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নির্মিত হয়েছে। এ শহরটি আধুনিক সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের অভিব্যক্তি। ব্রাসিলিয়ার একটি সুবিধা ছিল এখানে কর্মধারা ও জীবনযাপনের কোন ট্রাডিশন ছিল না। তাই সেখানে নতুন একটি পরিচ্ছন্নতা গড়ে উঠেছে। কিন্তু রায়ো ডি জেনিরো অন্য ব্যক্তিত্ব এবং অন্য স্বভাবের শহর। সেখানে নতুন স্থাপত্যকর্ম প্রাচীনপন্থী অট্টালিকার পাশাপাশি হৃদ্যতার সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া যুগ যুগ ধরে এ শহরে পথের মধ্যে যানবাহন বন্ধ করে বাজার বসে যায়, প্রচণ্ড উল্লাসে এবং হট্টগোলে বিপণীপল্লী গড়ে ওঠে সেখানে গ্রাম থেকে এবং নগরের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বিচিত্র বিক্রয় সামগ্রী আসে। দোকানগুলো বসে রাতের বেলা। তাই

www.pathagar.com

মিউনিসিপ্যালিটি তার দায়িত্বে প্রচুর আলোর ব্যবস্থা করে। প্রধানত কোপাকাবানা এবং বোতাকোগোর এলাকায় বাজারগুলো বসে। রাতের আলোয় স্বল্পবসনা দেহপসারিণীরাও ঘুরে বেড়ায়। এদের চিনতে অসুবিধা হয় না, দিয়া দে ফেইরা' অর্থাৎ দিনের বাজার। দিন অর্থ 'বার' যেমন সোমবার, মঙ্গলবার ইতাদি। সপ্তাহ গণনায় দ্বিতীয় দিন বলে সোমবারের বাজার হচ্ছে সেগুন্ডা ফেইরা অর্থাৎ দ্বিতীয় বাজার। বাজার শেষ হলে তার সমস্ত আবর্জনা পড়ে থাকে, পথে গলিতে আবর্জনায় দুর্গন্ধ হয়। সহজে পরিষ্কারও হয় না।

রায়ো ডি জেনিরোর বিশেষ খ্যাতি সুগার লোফা পর্বতশ্রেণী এবং তার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোরকোভাদোর জন্য। কোপাকাবানা সমুদ্র সৈকত হর্সশুর মতো বাঁকা হয়ে যেখান থেকে ইপিনামা সৈকতের সূত্রপাত করেছে, তারই অদূরে সুগারলোফ। কোরকোভাদোর উপরে যীশুখৃষ্টের বিরাট উর্ধগ মূর্তি। মূর্তিটি বিরাট একজন মানুষ পাহাড়ের উপরে উঠে তার পায়ের পাতা ছুঁতে পারেমাত্র। লিফট দিয়ে পাহাড়ের শিরোদেশে উঠবার ব্যবস্থা আছে। ইভান জেলেনিকোর সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলাম যীশুর মাথায় স্কন্ধে এবং সমান্তরালে প্রসারিত বাহুতে পাখি উড়ে এসে বসেছে। কয়েকটি আমেরিকান ছেলে পাখি দেখে মন্তব্য করছিলো শুনলাম ক্রুডিফাইড হয়ে যীশুর কি দুরবস্থা দেখ পাখিগুলো [illegible] ড্রপিংস তার মাথায় ফেলে যাচ্ছে।

রায়ো ডি জেনিরোর পথে লোক চলাচল ও যানবাহনের প্রচণ্ড ভিড়। কোন ট্রাফিক নিয়মকানুন মেনে চলে মনে হয় না। ছুটছে যেমন প্রচণ্ড বেগে, মোড় ঘুরছেও তেমনি জোরে। এর ফলে এক্সিডেন্ট হচ্ছে খুব বেশী। ওখানে বিভিন্ন লোকের মুখে শুনলাম রায়োতে এক্সিডেন্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি অলিখিত আইন আছে। আপনি গাড়ির তলে চাপা পড়ে মারা গেলেন তো বাঁচলেন। যদি বেঁচে ওঠেন তাহলে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। কেন আপনি গাড়ির তলায় পড়তে গিয়েছিলেন। গাড়ির চালকের কোন শাস্তি নেই। এটি সত্যি আইন কিনা জানি না। যানবাহনের অতি দ্রুত চলমানতা দেখে এটাকে সত্য বলে মানতে ইচ্ছে হয়। একজন বিদেশী নাকি একবার তার এক নতুন ঝকঝকে গাড়ি নিয়ে রাস্তা চলছিলেন। পিছনে থেকে এক ট্রাকের ধাক্কায় তার গাড়ির দফা শেষ। তিনি অবশ্য অক্ষত অবস্থায় ছিলেন। ক্রুদ্ধ অবস্থায় গাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি দেখলেন যে ট্রাক তার গাড়িকে ধাক্কা দিয়েছে সে ট্রাকের ড্রাইভার তার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। ড্রাইভার বললেন, তুমিতো বেশ স্বচ্ছন্দে আছো, তোমার তো কোন অসুবিধা হয়নি দেখছি। তবে তোমার গাড়ির অবস্থাটা একটু খারাপ হয়েছে। এই বলে ড্রাইভার গাড়ির মালিকের সৌভাগ্য কীর্তন করে অন্তর্ধান হলো। গাড়ির মালিক অসহায় ব্যাকুল অবস্থায় সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। এসব গল্প থেকে একটি কথা সুস্পষ্ট হয় যে রায়োতে যানবাহনের কোন শৃংখলা নেই। এতদিনে কি হয়েছে, জানি না। হয়তো অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু আমি যখন গিয়েছিলাম তখন এই অবস্থাই দেখেছি।

সরকারী প্রচার পত্রিকায় রায়ো ডি জেনিরোর মনুমেন্টাল ট্রাফিক জ্যাম সম্পর্কে ট্যুরিস্টদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে। এক দিকে পাহাড় শ্রেণী অন্যদিকে সমুদ্র এ দুয়ের চাপে পড়ে যানবাহন শহরের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সহজে যেতে পারে না। প্রায়ই

www.pathagar.com

জমাট বাঁধা স্তব্ধতায় রূপান্তরিত হয়। আবার গাড়ির সংখ্যাও অনবরত বেড়ে চলেছে। লোকসংখ্যাও বাড়ছে। সুতরাং ট্রাফিক জ্যাম থেকে এ শহর কোন দিনই রেহাই পাবে বলে মনে হয় না। শহর থেকে কোপাকাবানা উপকূলবর্তী এলাকায় যে এভিনিদা দিয়ে যেতে হয় সেখানে যানবাহনের অধিকারটাই যেন প্রবল, মানুষের নয়। এখানকার রাস্তায় ভক্সওয়াগন গাড়ি মিনিকার হিসাবে চলে, তা ছাড়া পুরনো স্ট্রীট কারও আছে। আবার ইলেকট্রিক বাসও আছে। বড় বড় দোতলা তেতালা বাসের সংখ্যাও প্রচুর। এ ছাড়া প্রাইভেট কারতো আছেই। কিন্তু এসব গাড়ি সব সময় নিশ্চিন্তে পথ চলতে পারে না। প্রায়ই দেখা যায় নানা কারণে পথ খোঁড়া হচ্ছে, কখনও হয়তো পানির লাইন বসাবার জন্য, কখনো হয়তো পয়ঃপ্রণালীর জন্য, কখনো হয়তো অন্য কারণে। কারণ যাই থাকুক না কেন আমাদের দেশের মত পথ খোঁড়ার বিরাম নেই।

নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও এ শহরের লোকেরা কিন্তু অসম্ভব ধৈর্যশীল ও কৌতুকপ্রিয়। কনফারেন্সে একজন ব্রাজিলীয় লেখককে এর কারণ জিজ্ঞেস করায় বলেছিলেন 'একটি বড় শহরে প্রতিদিনের দুর্যোগের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বাস করতে গেলে সেন্স অব হিউমার দরকার, আমাদের দেশের লোকদের তাই বোধহয় কৌতুকপ্রিয়তা একটু বেশী। আমাদের ঢাকা শহরে যেমন স্থানীয় কুট্টিদের কৌতুকপ্রিয়তা মারাত্মক, রায়ো শহরের স্থানীয় অধিবাসীদেরও তেমনি।

কনফারেন্সের ফাঁকে একদিন বারবারাকে নিয়ে এক রেস্তরাঁয় খেতে ঢুকেছিলাম। ঢুকতেই পাশের টেবিলে আমার দৃষ্টি আটকে গেল। বলিষ্ঠ অথচ সুকুমার শরীর, বাহু দুটি যেন শক্তির নিরাপত্তা, উজ্জ্বল ললাট এবং সুন্দর চিবুক। আমি বিস্মিত হয়ে লোকটিকে দেখতে লাগলাম। আমার দিকে চোখ পড়তেই লোকটি আমাদের দুজনকে তার টেবিলে ডাকলো। আমরা বসতেই জিজ্ঞেস করলো, কি দেখছিলেন? আমি বললাম, তোমাকে। লোকটি উচ্চরোলে হাসলো, বললো, আমি সবাইকে বশীভূত করতে জানি। বারবারা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কোথা থেকে আসছো?' লোকটি বললো 'স্বর্গ থেকে' এই বলে আবার হাসতে লাগলো। একটু পরে বললো, 'এখানে' আছি অনেক দিন ধরে। একদিন কোপাকাবানা সমুদ্রোপকূলে বেড়াতে গেছি, দেখি অনেক মেয়ে বালুতে শুয়ে আছে, কেউ উপুড় হয়ে কেউবা চিৎ হয়ে। একটি মেয়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললাম। কি সুন্দর উন্নত বুক, কি সুন্দর অলৌকিক বাহু। ঘরে ফিরে হয় তো কোন কুৎসিত লোকের কণ্ঠলগ্না হবে আর আমি আমার বলিষ্ঠ শরীর নিয়ে একাকী ফিরে যাব। মেয়েটি আমার কথায় চোখ মেলে চাইলো এবং মুচকি হাসলো, তারপর আমার সঙ্গে চলে এলো আমার ঘরে। 'আমি বললাম, 'সর্বনাশ তুমি এমন কথা বলতে পারলে?'লোকটি উত্তরে বললো, 'আমি আরব্য উপন্যাসের দেশের লোক, এসব কথা তো আমিই বলতে পারি। কিন্তু মনে রেখো, ব্রাজিলের সিনোরিটাদেরকে একথা বলা যায়, পৃথিবীর অন্য কোন দেশের মেয়েদেরকে নয়। বারবারা হেসে বললো, 'আমি কিন্তু সিনোরিটা নই, আমি কিন্তু আমেরিকান মেয়ে।' লোকটি বললো, "সর্বনাশ! আমি কিন্তু তোমাকে লক্ষ্য করে এসব বলি নি।'

ব্রাজিলীয় সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি তার সূত্রপাত উনিশ শতকে। এবং এ সূত্রপাত রায়ো ডি জেনিরো শহরকে কেন্দ্র করে। ম্যানুয়েল আন্তোনিওদে আলমীদ সর্বপ্রথম

www.pathagar.com

ঔপন্যাসিক যিনি রায়ো ডি জেনিরোর চিত্র পৃথিবীর সামনে তুলে ধরলেন। বহুদিন পর্যন্ত লেখক প্রায় অজ্ঞাত ছিলেন, সম্প্রতি তাঁর পুনর্বাসন ঘটেছে। পর্তুগীজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ডি জেনিরোর অবস্থা কি ছিল, তা তাঁর উপন্যাসে পাওয়া যায়। বইটির নাম 'মেমোরিয়াল দেউম সার্জেন্টো দে মিলিসিয়াম'। বইটি অংশে অংশে প্রকাশিত হয় ১৮৫২ এবং ১৮৫৩ সালের মধ্যে। বইটির মধ্যে শহরের বস্তি এলাকায় বাসিন্দাদের কথা, বহিরাগত পর্তুগীজদের কথা, কাজের উদ্দেশে নগরে আগত সরল মানুষদের কথা এবং নিগ্রোদের কথা অপূর্ব দক্ষতার সাথে বর্ণিত হয়েছে। বর্তমানে আলমীদার স্বীকৃতি পৃথিবীর সর্বত্র। লেখকের কৌতুকপ্রিয়তা তাকে বর্তমান কালের পাঠকদের কাছেও প্রিয় করেছে। গ্রন্থটিতে লিওনার্দো বলে এক ব্যক্তির জীবনযাত্রা বর্ণিত হয়েছে, যে মানুষকে ঠকায় এবং রাজার জেলখানা থেকে পালিয়ে বেরিয়ে আসে। আমি স্থানীয় লোকদের মধ্যে এই গ্রন্থের অসম্ভব প্রশংসা শুনেছি। আধুনিককালে যে সমস্ত লেখক বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে তার মধ্যে জর্জ আমাদোর নাম করতে হয়। ইনি বর্তমানে ব্রাজিলে থাকেন না, কিন্তু তার উপন্যাসে ব্রাজিলের উত্তর পূর্বাঞ্চলের জীবনধারার অসাধারণ সুন্দর চিত্র আছে।

কনফারেন্সে দু জন কবির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিলো। দু জনই বয়স্ক। একজনের নাম ভিনিসিয়াম দে মোরায়েস এবং আর একজন কার্লোস ড্রামন্ড দে আন্তে দে। এঁদের দুজনকেই ব্রাজিলের সর্বোচ্চ সারির কবি হিসাবে গণ্য করা হয়। আমাদের স্বল্পকালীন উপস্থিতিতে সাহিত্যের সকল দিক আবিষ্কার করা কারো পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না। শুধু অনুভব করতে পেরেছি এখানকার মানুষ সাহিত্যকে ভালবাসে, তাদের স্বাধীন চিন্তার মধ্যে সাহিত্যই হচ্ছে তাদের প্রগতির স্বাক্ষর। জর্জ আমাদোর একটি উপন্যাসের নায়িকা ভাবছে, 'এখন তো বারে যাওয়ার সময়',এ সময় সেখানে অনেক পুরুষ মানুষ দেখা যাবে। জীবন সত্যিই মধুর তবে জীবনযাপন করতে জানতে হয়। রৌদ্রে শরীরকে গরম করতে হয়, ঠান্ডা পানিতে গোসল করতে হয়, আম ও পেয়ারা খেতে হয়, জনাকীর্ণ পথ দিয়ে হাঁটতে হয়, খুশীতে গান গেয়ে উঠতে হয় এবং একজন যুবকের সঙ্গে শয্যায় যেতে হয়। রাত্রে স্বপ্নে অন্য একজন যুবকের কল্পনা করতে হয়।'

ব্রাজিল মণিমুক্তার দেশ। প্রায় সব ধরনের দামী পাথর এদেশে পাওয়া যায়। ডায়মন্ড আছে, ক্যাটস আই আছে, টোপাজ আছে, এমারল্ড আছে, আকোয়ামরিন আছে, তুরমালিন আছে, এ্যামেথিস্ট আছে, ওপাল আছে, এম্বার আছে। অর্থাৎ কি নেই, তা কেউ বলতে পারে না। কেননা কি যে আছে তা এত প্রচুর যে সেগুলোর বর্ণনাই শেষ হয় না। আমি ফরাসী লেখক টয়ভারনিরকে সঙ্গে নিয়ে আভেনিদা বায়ো ব্রাংকোতে অবস্থিত স্টার্ন জুয়েলার্সের দোকানে গিয়েছিলাম। আমার জন্ম মার্চ মাস শুনে দোকানদার আমাকে আকোয়ামারিনের আংটি পরতে বললেন। আমি ওখানে দু পাথরের একটি আংটি কিনলাম। ট্যাভাননিওরের জন্মমাস অগাস্ট। সে গার্নেট কিনলো। দোকানের মালিক আমাদের ঠিকানা রেখে দিল। বহুদিন পর্যন্ত আমি এদের কাছ থেকে নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড পেয়েছি।

যখন ব্রাজিল থেকে ফেরার সময় হল তখন আমার বন্ধু ইভান জেলেনিক কোপাকাবানা সমুদ্র তীরে একটি হোটেলে সময় কাটাবে বললো। আমিও তার সঙ্গে গেলাম। আমরা মিরাসার হোটেলের নিকটেই একটি ছোট হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। হোটেলের

www.pathagar.com

জানালা থেকে আটলান্টিক সমুদ্র দেখা যেত, একেবারেই পায়ের কাছে। ঢেউগুলো শুভ্র কিরীট মাথায় পড়ে প্রচণ্ড বিক্ষোভে সৈকতে আছড়ে পড়তো। সমুদ্রের স্বাদ নিয়ে আমাদের দুটো দিন ভালোই কেটেছিল।

॥২৫॥

১৯৬০ সালে কিছুটা দীর্ঘ সময় আমি বিদেশে ছিলাম। জুন এবং জুলাই – এ দুই মাস দেশের বাইরে ছিলাম এবং আগস্টের প্রথম সপ্তাহে করাচী ফিরে আসি। ফিরবার পথে যে কয়দিন প্যারিসে অবস্থান করেছিলাম সে কয়দিনের মধ্যে পিয়ের ইমানুয়েলের সঙ্গে যে সময়টা কাটিয়েছিলাম সেটাই আমার কাছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে রয়েছে। ইমানুয়েল একজন অসাধারণ কবি, অনেকটা ইতিহাস বলার মত করে কবিতা লিখেছেন অর্থাৎ জীবনসংক্রান্ত কোন বক্তব্যকে একটি ইতিহাসের পটভূমিতে স্থাপন করে তাকে শব্দের মধ্যে নতুন করে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন। শব্দকে তিনিই অবলম্বন করেছেন কিন্তু শব্দগুলো বিশেষ সময় ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থবহ হয়েছে। এমনিতেই ভদ্রলোক অনেকটা বিনম্র প্রকৃতির এবং শান্ত। কিন্তু কবিতার মধ্যে তাকে অত্যন্ত দ্রুতগতি বলিষ্ঠ পথচারীর মত মনে হয়। আমি তার কাছে কবিতা সম্পর্কে এমন অনেক বিবেচনা শুনেছি যা আমার কাছে একেবারেই নতুন ছিলো। তিনি কথায় কথায় বলেছিলেন, আমরা যে প্রকৃতিকে আমাদের দেশে দেখি তার মধ্যে রুক্ষতা আছে, শীতলতা আছে এবং কঠোরতা আছে। পর্বত সমুদ্র এবং শীতের প্রতাপ নিয়ে আমরা বাস করি, একজন কবিকে এর মধ্য দিয়ে তার জীবনের অবলম্বনকে অনুসরণ করতে হয়। মানুষের জীবনে একটি সংগ্রাম হচ্ছে শক্তিমত্তার সঙ্গে মৃত্যুর সংগ্রাম। মানুষের জীবনে একটি 'ভাইটালিটি' আছে কিন্তু সে 'ভাইটালিটি'ও থাকে না যখন মৃত্যু এসে তাকে অতিক্রম করে। আমি এই সংগ্রামকে সেলিব্রেট করবার চেষ্টা করি। তিনি ইংরাজীতে যে শব্দ দুটি ব্যবহার করেছিলেন আমি তাই ব্যবহার করলাম। তিনি মৃত্যুর জয় ঘোষণা করেননি, জীবনেরও নয় কিন্তু মৃত্যু এবং জীবনের তাৎপর্যকে তুলে ধরেছিলেন। পিয়ের ইমানুয়েল আরো পরে ফরাসী একাডেমীর সদস্য হয়েছিলেন। তখনও তার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে অনেক পরের কথা।

প্যারিসে ক্লেয়ার গলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। ক্লেয়ার তখন থাকতেন র‍্যুভানুতে এ্যাপার্টমেন্টে। সেবার আমি অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম ক্লেয়ারের সঙ্গে। মাঝখানে ক্লেয়ার অভিযোগ করেছিলেন আমার বন্ধু-সঙ্গ নিয়ে। ঘটনাটি খুব সামান্য–তবে তাৎপর্যবহ। করাচীতে এক বন্ধু ছিলেন গোলাম আলী আল্লানা। তিনি প্যারিসে এসেছিলেন কয়েক মাস আগে। আমার পরিচিতিপত্র নিয়ে ক্লেয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ক্লেয়ার বললেন, সে এসেই দু এক কথার পর সরাসরি বলে বসলো, সে এখানে খুবই একা। যদি আমি তার সঙ্গে কোনও মেয়ের পরিচয় করিয়ে দেই ভালো হয়। আমি কথাটি খারাপ অর্থে নেই নি। ভেবেছিলাম, ভদ্রলোক প্যারিস দেখতে চান তাই তার একজন সঙ্গিনী দরকার। আমি তার হোটেলের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর রাখলাম। তুমি লিখেছিলে ভদ্রলোক মেয়র ছিলেন সুতরাং ধরে নিয়েছিলাম যে নিশ্চয়ই বিত্তশালী ও সম্ভ্রান্ত হবেন কিন্তু হোটেলের নাম শুনে মনে হল বিত্তশালী হলেও কৃপণ। হোটেলটি হচ্ছে প্ল্য দ, এটা একটি কমদামী ছোট হোটেল, শহরের দর্শনীয় স্থানগুলো থেকে বেশ দূরে। যাই হোক একটি মেয়েকে আল্লানার কথা

www.pathagar.com

বললাম। মেয়েটি আল্লানাকে সন্ধ্যার সময় টেলিফোন করলো। আল্লানা রাত্রে তার সঙ্গে খেতে বললো। এর পরের ঘটনা মেয়েটির মুখে শোনা। হোটেলের লাউঞ্জে এসে মেয়েটি আল্লানার ঘরে টেলিফোন করলো, আল্লানা নিচে না নেমে এসে মেয়েটিকে তার ঘরে আসতে বললো।

আমি বললাম, 'এবং মেয়েটি আল্লানার ঘরে এলো। তাই না? মেয়েটি ঘরে এলো কেন?'

ক্লেয়ার বললেন, 'এখানে বিনয়ের কথাটি আসে। বিদেশী লোক হয়তো ফরাসী কায়দা জানে না এ ভেবেই মেয়েটি ঘরে গিয়েছিলো। যাই হোক আল্লানা তাকে ডিনারে আপ্যায়ন করতে চাইলো এবং ডিনার ছিল টেবিলে সাজানো–রুটি, মাখন, পনীর, কেক এবং কিছু ফল। মেয়েটি এহেন সংক্ষিপ্ত উপকরণ দেখে মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে বললো 'মঁশিয়ে মনে হচ্ছে আপনার এখনো ব্রেকফাস্ট হয় নি। আপনি ব্রেকফাস্ট করুন, আমি চললাম।'

ঘটনাটি শুনে আমি প্রাণভরে হাসলাম। ক্লেয়ারও হাসলেন। বললেন, 'তোমার বন্ধুকে বলো প্রথম দর্শনেই হাত বাড়াতে নেই পরিচিত হতে হয়, ক্রমশঃ অন্তরঙ্গ হতে হয়, অবশেষে মেয়েটির ইচ্ছাকে যথাযথভাবে জেনেই নিজের ইচ্ছাকে ব্যক্ত করতে হয়।

আমি হেসে বললাম, 'যাই বল মেয়েটির রসিকতা মর্মান্তিক। আমি অল্পস্বল্প যা পরিচয় পেয়েছি তাতে ফরাসীরা রসিকতার পিছনে কোন গ্লানি রেখে যায় না। জাপানের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। ১৯৫৭ সালে আমি টোকিওতে লেখক সম্মেলনে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি বড় বাগানে অতিথিদের সংবর্ধনা জানানো হয়। অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য কিমানো পড়া বহু যুবতী ছিল। আমার এক ভারতীয় বন্ধু বাৎসায়ন পাঁচ-ছটি মেয়ে পরিবৃত্ত হয়ে গল্প করছিল, কাছেই প্রভাকর পাধ্যায় একা বসেছিল। হঠাৎ সেখানে জ্যঁ দ্য বীয়রের আবির্ভাব। সে প্রভাকরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো দুঃখ কর না। তুমি ও বাৎসায়ন একই নৌকার যাত্রী। তুমি একা এবং সেও অনেককে নিয়ে তাই তোমরা কেউ কিছু করতে পারছো না।'

গোলাম আলী আল্লানা করাচীতে আগা খানের সুপ্রীম কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন। তিনি এক সময় করাচীর মেয়রও হয়েছিলেন। বিত্তবান এবং রসিক আল্লানা ব্যবসায়ী মহলে প্রতিষ্ঠাবান ছিলেন কিন্তু তার সতত আগ্রহ ছিল সাহিত্যিক মহলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার। তিনি তাঁর বাড়িতে কবিতা পাঠের আসর বসাতেন এবং নিজে সেখানে তার লেখা ইংরাজী কবিতা পড়ে শোনাতেন। তার গৃহে আমি বহুবার গিয়েছি এবং আপ্যায়িত হয়েছি। তিনি এমন কিছু কবিতা লিখতেন না। আমার কাছে তাঁর অনেক কবিতা হাস্যকরই মনে হয়েছে। কিন্তু তাঁর সঙ্গ ভালো লাগতো। সেবার বিদেশ থেকে ফিরে আল্লানার সাথে তাঁর বাসায় দেখা করি এবং ক্লেয়ারের কাছে যে গল্পটা শুনেছিলাম সেটা বললাম। আল্লানা হাসতে লাগলেন।

পরে বললেন, আমার সেখানে মেয়ের কোন অভাব হয় নি। ক্লেয়ার গল যাকে পাঠিয়েছিলেন সে একটু উন্নাসিক স্বভাবের মেয়ে ছিল।' আমি বললাম 'প্যারিসে মেয়ে পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু কোন জাতের মেয়ে তাতো ভাবতে হবে। আল্লানার সঙ্গে সেদিন অনেকক্ষণ ছিলাম। কথায় কথায় এক পর্যায়ে আল্লানা বললেন, 'তুমি কী করাচীতেই সারা

www.pathagar.com

জীবন কাটাবে? তোমার বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের জন্য তোমার ক্ষেত্র তো ঢাকা, করাচী নয়। এখানে যতই তোমার প্রতিষ্ঠা ঘটুক কিন্তু একদিন বাংলা সাহিত্যের ধারা থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আমার মনে হয় একথাটি তোমার ভেবে দেখা দরকার।' আমি একটু চিন্তা করে বললাম, 'এ নিয়ে আমি যে ভাবছি না তা নয়। কিন্তু ঢাকায় কোন উপযুক্ত ক্ষেত্র না পেলে আমি কি করে সেখানে যাই। এখানে অবশ্য আমি জমি কিনেছি নর্থ নাজিমাবাদে, ছেলেমেয়েরা এখানকার স্কুলেই পড়াশুনা করছে, মোটামুটি এখানকার জীবনধারার সঙ্গে নিজকে মিলিয়ে নিয়েছি এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির সঙ্গে বাস করছি। কিন্তু তবুও এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ আমাকে দুঃখিত করে এবং আহত করে। নানাভাবে আমাকে অপদস্থ করবার চেষ্টা এখানে হয়েছে, এখনো হচ্ছে। তবুও আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি তোমাদের মত বন্ধুদের সাহচর্যের কারণে। তাছাড়া ব্রোহী সাহেব আছেন ডঃ মাহমুদ হোসাইন আছেন, শাহেদ সোহরাওয়ার্দী আছেন এরা সবাই আমাকে স্নেহ করেন এবং আমার সকল কর্মে সমর্থন দিয়ে থাকেন, এদের আন্তরিক সহায়তা না পেলে আমি ভেঙে পড়তাম।'

আগস্ট মাসের শেষে অথবা সেপ্টেম্বরের শুরুতে পাকিস্তানের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী হাবিবুর রহমান আমাকে তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। কোনরূপ ভূমিকা না করে তিনি বললেন 'তোমার ঢাকা যাওয়া আমি ঠিক করে ফেলেছি। তুমি প্রস্তুত হও।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আপনি কি বলছেন আমি বুঝে উঠতে পারছি না। ঢাকায় গিয়ে কি করব, কি দায়িত্ব নিতে হবে তাতো বলছেন না।' তিনি একটু বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বললেন, 'আহা ঐ যে বাংলা একাডেমী। সেখানকার ডিরেক্টর এনামূল হক রাজশাহী চলে গেছেন তার জায়গায় লোক দরকার। আমি চীফ সেক্রেটারী আজফালকে তোমার কথা বলেছি।' আমি বললাম, 'আমার কাছে এখনো সরকারীভাবে খবর আসে নি। এলে পর আপনার সঙ্গে পরামর্শ করব।'

তিনি অধৈর্য হয়ে বললেন, 'পরামর্শ করবার কি আছে? নিয়োগপত্র পেলেই তুমি যোগ দেবে।'

আমি বাসায় ফিরে আমার স্ত্রীকে এ সম্পর্কে কিছু বললাম না। ভাবলাম চিঠি আসুক, লেনদেনের ব্যাপারে কথা হোক তারপর একসময় বললেই হবে।

আমি এ কে ব্রোহীর সঙ্গে দেখা করি। করাচীতে ব্রোহীর নাম ছিল 'ইসলামাবাদ'। পরে এ নামটি পরিবর্তন করে মুসলিমাবাদ নাম রাখা হয়েছে। ব্রোহীকে সব কথা বলাতে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'দেখো, পাকিস্তান হওয়ার পর ক্রমশঃ লক্ষ্য করছি সর্ব পাকিস্তানী নেতৃত্বের অভাব হচ্ছে। এমন কেউ এখন আর নেই যিনি পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের নেতৃত্বের দাবী করতে পারেন। ক্রমশঃ আমরা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছি। পূর্ব পাকিস্তানে যে নেতৃত্ব গড়ে উঠছে তার স্বভাব এবং চরিত্র পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্বের চেয়ে ভিন্ন। আবার পশ্চিম পাকিস্তানে যে নেতৃত্ব গড়ে উঠছে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর তার কোন অধিকার আমি দেখি নি। পাকিস্তানের সংহতির জন্য এটি একটি বিপজ্জনক অবস্থা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পার্থক্যটি আরো প্রবল। উর্দু এবং বাংলার ব্যবধানের কারণে আমাদের উভয় অঞ্চলে ভাব প্রকাশের কোন লেনদেন নেই। আমি সে জন্য বলব ঢাকায় যাবার সুযোগ পেলে তোমার চলে যাওয়া উচিৎ।

www.pathagar.com

ব্রোহীর কথায় আমি আশ্বস্ত বোধ করলাম। এবং মনে মনে ঢাকায় যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলাম। কিছু দিনের মধ্যে আমার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের যোগাযোগ হল। জনাব শামসুল হক সাহেব তখন ঢাকায় ডিপিআই। তিনি চীফ সেক্রেটারীর নির্দেশে আমাকে জানালেন সরকার আমাকে বাংলা একাডেমীর ডিরেক্টর নিযুক্ত করতে চান। এ সম্পর্কে আমি যেন আমার অভিমত জানাই। বেতন ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে কিছু আলাপ আলোচনার পর আমাকে নিয়োগপত্র পাঠানো হলো।

প্রফেসর শাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আমাকে বিদায় উপলক্ষে একটি চাইনিজ রেস্তরাঁয় আমাকে আপ্যায়ন করলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর মাহমুদ হোসেন, প্রফেসর আহমদ দেহলভী, জামিল জালিবী, শানুল হক হক্কী, শাহেদ আহমদ দেহলভী, সলিমুল্লাহ ফাহমী এবং বেগম জেবুন্নেসা হামিদুল্লাহ। প্রফেসর সোহ্‌রাওয়ার্দী নানা ধরনের হাস্য রসিকতায় আমাদের সবাইকে মাতিয়ে রাখলেন। বিদায় নেবার সময় তিনি আমার হাত ধরে বললেন তোমার জীবন সুখের হোক–আমি এই কামনা করি।' তারপর একটু থেমে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি কিন্তু বড্ড একা হয়ে পড়ব।'

সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের এই কথাটা আমার মনে লাগলো। বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও আমরা একে অন্যের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ছিলাম। প্রায় প্রতিদিনই আমাদের সাক্ষাৎ হত। হয় আমি তাঁর বাসায় যেতাম, নয়তো তিনিই আমার ওখানে চলে আসতেন।

আমি সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে বললাম, 'আমি আমার ছাত্র সালেহ আহমদকে বলে যাচ্ছি যে নিয়মিত আপনার খোঁজ নেবে এবং ঢাকায় আমাকে খবর পাঠাবে। তাছাড়া আমি করাচী এলে আপনার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করব।'

করাচীতে আমার অবস্থানকালে যাদের সান্নিধ্য আমাকে পরিপূর্ণ রেখেছিলো তাদের মধ্যে সাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রধান। শিল্পতত্ত্বজ্ঞ, অসাধারণ পণ্ডিত, বহু ভাষাবিদ, উদার সংস্কৃতিমনা শাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন কোন লোক আমি কোথাও দেখি নি। এ উপমহাদেশের পটভূমিতে তিনি একজন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আন্তর্জাতিক পটভূমিকায়ও তাঁর ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ ঘটেছিল।

করাচীতে যে জীবনযাপন করতাম সে জীবনের সঙ্গে করাচীর সাধারণ মানুষের জীবনের সম্পর্ক ছিল না। অর্থাৎ সেখানকার চলমান জীবনের পথে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে নি। ঠেলাওয়ালা, রাস্তার ঝাড়ুদার, সিন্ধী সাধারণ কর্মব্যস্ত মানুষ এই সমস্ত নরনারী এরা যে সংসারের মানুষ সে সংসারকে আমি চিনতে পারি নি। শুধু দূর থেকে আমি এদের দেখেছি। কখনো কখনো এদের আনন্দ উৎসবের ছিটে-ফোঁটা আমার দৃষ্টিতে এসে পড়েছে। করাচী থাকতে ক্লিফটনের সমুদ্র তীরে প্রায়ই যেতাম। সেখানে রোববার দিন বিকেল বেলা সিন্ধি মেয়ে-পুরুষ বিচিত্র রংয়ের পোশাক পরে বেড়াতে আসতো। এরা ছিল ঠিকে মজুর। এদের কেউ কেউ ইট তৈরির কাজ করতো, কেউ রাস্তা পরিষ্কার করতো আবার কেউ কারখানায় কাজ করতো। বিচিত্র বর্ণের পোশাক পরে এরা ছুটির দিনে ক্লিফটনের সমুদ্র তীরকে কল্লোলিত রাখতো। যখনি ক্লিফটনে গিয়েছি তখনই এদের আনন্দ উৎসব চোখে পড়েছে। প্রতিদিন এরা জীবনের কর্মসম্পাদনে ব্যস্ত থাকে আর সপ্তাহের একটি দিন জীবন উপভোগে প্রস্তুত হয়। এদের জীবন-যাপন অত্যন্ত সরল এবং

www.pathagar.com

নিশ্চিন্ত, এদের উৎসব-মুখরতা দেখলে মনে হতো এদের জীবনে কোন জটিলতা নেই। সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ নবী বক্স বেলুচ আমার বন্ধু ছিলেন। তাঁর কাছে সিন্ধু প্রদেশের সাধারণ মানুষের জীবন কথা শুনতাম। এদের আয় সামান্য, এই সামান্য উপার্জনের জন্য দিনভর পরিশ্রম করে প্রচুর। এই কঠিন জীবনের মধ্যেও এরা উ ৎসবকে কামনা করে এবং সপ্তাহের একটি দিন রং-বেরংয়ের কাপড় পরে সবাইকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে এসে সময় কাটায়। এদের কণ্ঠে গান থাকে এবং সেসব গান সিন্ধু অঞ্চলের মরমী গান।

সাধারণ মানুষ কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় এক রকম সহজ সরল এবং পক্ষপাতশূন্য। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ আপন কর্মব্যস্ততার মধ্যে সারাদিন জড়িয়ে থাকে এবং এরই ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে গান গায়। এদের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে গানের একটি উপঢৌকন আছে। এরা ছাদপেটার সময় গান গায়, নদীতে নৌকো চালানোর সময় গান গায়, রাত্রিতে সকল কর্মের শেষে সুর করে পুঁথি পড়ে।

করাচী, ত্যাগের সময় আমার একটি দুঃখ ছিল সে অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের জানবার সুযোগ হল না। আমার এক পিয়নের কথা আগেই বলেছি সেই ছিল আমার কাছে এইসব সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। করাচী ছাড়ার পূর্বে সে তার ভাঙ্গা বাসায় আমাদের সবাইকে একসাথে ডেকে খাইয়েছিল। সম্ভবত তার বাসা ছিল মঙ্গোপীরে অথবা লালুক্ষেতে, আমার আজ ঠিক মনে পড়ছে না।

করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগ, ইংরেজী বিভাগ, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ এবং বাংলা বিভাগ আমাকে বিদায় সংবর্ধনা জানিয়েছিল। বাংলা বিভাগ তো স্বাভাবিকভাবেই জানাবে। কিন্তু অন্য বিভাগের প্রধানদের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা ছিল, সে জন্য তারাও সংবর্ধনা জানিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসার পূর্বে আমি তৎকালীন উপাচার্য হাসমীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নি। এর বিরুদ্ধে আমার ক্ষোভ ছিল প্রচণ্ড। এর প্রচণ্ড বাঙালী বিদ্বেষের জন্য একে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারি নি। করাচী ছেড়ে যাবার দিন তারিখ যখন ঠিক হয়েছে তখন একদিন ডঃ মাহমুদ হোসেন জানালেন যে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে যাচ্ছেন। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন আমরা যেন একসঙ্গে ঢাকায় যাই। আমি বললাম, 'ঢাকা বিমান বন্দরে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসবে অনেক লোক আর আমার জন্য কেউ আসবে না। এ অবস্থাটা আমার কেমন লাগবে? তিনি হেসে উত্তর করলেন, 'আমার জন্য তো চাটুকাররা আসবে কিন্তু তোমার জন্য তো থাকবে তোমার দেশ।' তার কথাটি ভালই লাগলো।

ঢাকায় বাংলা একাডেমীতে চাকরি পাবার খবর সিকান্দার আবু জাফর ও ফররুখ আহমদকে জানিয়ে ছিলাম। সিকান্দার উত্তরে লিখেছিল, 'তুমি আসবে শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি, কোলকাতার মত ঢাকায় আমরা আবার একটি মিলিত জীবন উদযাপনের চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু একটি কথা বলি, করাচীতে তুমি যে নিশ্চিন্তে ছিলে ঢাকায় কিন্তু তুমি তা পাবে না। তোমার বিরুদ্ধবাদী একটি দল ইতোমধ্যেই তৈরি হচ্ছে। সুতরাং মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে এসো। সিকান্দার ঠিকই লিখেছিল, তবে আমার কোন শংকা ছিল

www.pathagar.com

না। আমি কোন দিনই বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে ভয় পাই নি। বিরুদ্ধতা বরঞ্চ আমার কর্মসম্পাদনে আমাকে সাহায্য করে।

পাকিস্তান এয়ার লাইন্সের বিমানে প্রথম শ্রেণীতে ডঃ মাহমুদ হোসেন এবং আমি পাশাপাশি বসলাম। তাঁর হাতে পুষ্পগুচ্ছ ছিল। করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র বিমান বন্দরে এসে তাঁকে ফুলের মালা পরিয়েছিল এবং হাতে ফুলের তোড়া দিয়েছিল। তিনি এগুলো নিয়েই প্লেনে উঠেছিলেন। সিটে বসে একটি ফুলের তোড়া আমাকে দিয়ে বললেন, 'এটি তোমার।' আমি হাসিমুখে তোড়াটি গ্রহণ করলাম। বিমান যখন আকাশে উড়লো তখন কিন্তু এটা ভাবতে পারিনি যে সেদিন থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আমার বন্ধন ছিঁড়ে গেল। সমগ্র পাকিস্তানের একটি বিচিত্র সাংস্কৃতিক বৃত্তের মধ্যে থাকবো ভেবেছিলাম কিন্তু ভাগ্য আমাকে আমার নিজস্ব ইতিহাস, সমাজ এবং সাংস্কৃতিক বৃত্তের মধ্যে টেনে নিয়ে চললো।

॥২৬॥

বাংলা একাডেমীতে যেদিন যোগ দিলাম সেদিনকার কথা আমার খুব মনে পড়ে। সেদিন ছিল ১৫ই ডিসেম্বর শীতকাল। সকাল বেলাটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল। আমি ঠিক কখন আসব একাডেমীর লোকেরা জানতো না, হঠাৎ আমাকে দেখে বিচলিত হল। একাডেমীর কর্মকাণ্ড শুরু করলাম যে ফাইল দিয়ে সে ফাইলটি অভিনব প্রকৃতির ছিল। আমার পূর্বে একাডেমীর পরিচালক ছিলেন ডক্টর এনামুল হক। তাঁর একটি মোহ ছিল কঠিন শব্দের প্রতি। নানা শব্দ দিয়ে তিনি সন্ধি বানাতেন এবং তা ব্যবহার করতেন। এভাবে একাডেমীর কর্মকর্তাগণ সবাই হয়েছিলেন অধ্যক্ষ। যেমন প্রকাশনাধ্যক্ষ কর্মাধ্যক্ষ সংকলনাধ্যক্ষ ইত্যাদি। এগুলি উচ্চারণে যত কঠিনই হোক এগুলো লিখতে তিনি আনন্দ পেতেন। তিনি কোন মৌখিক নির্দেশ দিতে পছন্দ করতেন না মনে হয়, তাঁর সকল নির্দেশই ছিল লিখিত। এই লিখিত নির্দেশের মধ্যে যে ফাইলটা আমি প্রথম দিন পেলাম তার মলাটের উপর লেখা ছিল ইঁদুর বিষয়ক। একাডেমীর প্রবীণ কর্মচারী হাসান জামান সাহেব ফাইলটি আমার হাতে দিলেন, আমি ফাইলটি নিয়ে পড়তে লাগলাম। ফাইলের মধ্যে লিপিবদ্ধ জিজ্ঞাসা নির্দেশনাবলী এবং সিদ্ধান্ত কৌতুকাবহ। যতদূর মনে আছে এখানে তা আমি বলবার চেষ্টা করব।

প্রকাশনাধ্যক্ষ লিখছেন ঃ আমাদের বাঁধাই করা পুস্তকগুলি জমা করিয়া রাখিবার জন্য দোতলায় একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। ইহাতে অনেক আবর্জনা জমিয়াছে। সেদিন দরজা খুলতেই একটি ইঁদুর আমার পায়ের তলা দিয়া দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। আমি ভয় পাইয়াছিলাম, পরে সাহস করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সর্বনাশ হইতেছে। বাঁধাই করা পুস্তকগুলিকে ইঁদুর আহার্য হিসাবে বিবেচনা করিয়াছে। সর্বাপেক্ষা দুঃখের কথা পবিত্র তজরিদুল বোখারির উপরে ইঁদুর বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিয়াছে। এমতাবস্থায় অবিলম্বে ইঁদুর ধ্বংস করিতে না পারিলে সমূহ ক্ষতি হইবে। সুতরাং অবিলম্বে আমাকে কিছু পরিমাণ গাইমেসিন পাউডার দিলে আমি কক্ষের মধ্যে ছিটাইয়া দিতে পারি। ইহার ফলে ইঁদুরের প্রকোপ আর থাকিবে না বলিয়া মনে হয়।

www.pathagar.com

এনামুল হক সাহেবের ব্যবস্থা ছিল যে. সকল প্রস্তাব কর্মাধ্যক্ষ বা সচিবের মাধ্যমে তাঁর নিকট পেশ করতে হবে। এভাবে পেশকৃত প্রস্তাবের উপর তিনি তাঁর মন্তব্য লিখবেন। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। কর্মাধ্যক্ষ লিখলেন ঃ পরিচালকের সদয় বিবেচনার জন্য প্রেরিত হইল। এর উপর পরিচালক মন্তব্য করলেন ঃ প্রকাশনাধ্যক্ষ সামান্য ইঁদুর দেখিয়া কেন ভয় পাইলেন বুঝিতে পারিলাম না। ইঁদুর তো আর বাঘ নয় যে তাহাকে খাইয়া ফেলিবে। যাহাই হোক গাইম্যাক্সিনের কথা তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা একপ্রকার বিষ বলিয়া আমি জানি। নিঃশ্বাসে এই বিষ টানিয়া লইলে ক্ষতি হইতে পারে। অন্য কিছু বিকল্প আছে কিনা জানাইতে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে যাহা কিছু খরিদ করা হইবে, তাহা টেন্ডার মাধ্যমে খরিদ করিতে হইবে।

এর উপর প্রকাশনাধ্যক্ষ তার বিবেচনা পেশ করছেন ঃ গাইম্যাক্সিনের বিকল্প হিসেবে ইঁদুর মারার কল ক্রয় করা যাইতে পারে। ইহা এমন এক প্রকার কল খাদ্যের অন্বেষণে যাহার উপর ইঁদুর আসিয়া পড়িলে কলের দুই পাশে ধারালো মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে এবং ইঁদুর দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইবে। এইরকম তিনটি কল আমাকে কিনিয়া দিতে আজ্ঞা হয়।

এর উপর পরিচালকের মন্তব্য ঃ এই ধরনের নিষ্ঠুর যন্ত্র ক্রয় করা আমি সমর্থন করিতে পারি না। খোলা কলের উপর চতুর্থ শ্রেণীর কোন কর্মচারীর পা যদি আটকাইয়া যায় তাহা হইলে একাডেমীতে বিপ্লব বাধিয়া যাইবে। অবিলম্বে নতুন প্রস্তাব পেশ করুন।

এরপর প্রকাশনাধ্যক্ষ নতুন প্রস্তাব পেশ করছেন ঃ বাজারে ইঁদুর ধরিবার একপ্রকার কাঠের বাক্স পাওয়া যায়. রাত্রি বেলায় ইহার মধ্যে খাবার দিয়া রাখিতে হয়। খাবারের লোভে ইঁদুর ইহার মধ্যে প্রবেশ করে এবং ভিতরে প্রবেশ করামাত্র দরজাটি বন্ধ হইয়া যায়। পরের দিন সকালে খাঁচা হইতে বাহির করিয়া ইঁদুরটিকে মারিয়া ফেলিলেই হইবে। এর উপর পরিচালকের মন্তব্য লক্ষ্যযোগ্য ঃ প্রকাশনাধ্যক্ষের প্রস্তাবটি জটিল মনে হইতেছে। ইদুঁরের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিবার পরে ইদুঁরটিকে ধরিয়া হত্যা করিবার জন্য একজন পিয়ন নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। তিনি সকল দিক বিবেচনা করিয়া নতুন আর একটি প্রস্তাব করুন যাহার মধ্যে হত্যাকাণ্ড থাকিবে না এবং নতুন একজন কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন ঘটিবে না।

এভাবে ফাইলের মধ্যে উভয় পক্ষের নানাবিধ মন্তব্যের লিপিকরণ কয়েক মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। সর্বশেষ মন্তব্যটি প্রকাশনাধ্যক্ষ হাসান জামানের। তিনি লিখেছেন ঃ ইঁদুরের উপদ্রব দূর করিবার জন্য আমি যে সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছিলাম তাহার কোনটিরই আর প্রয়োজন হইবে না, কেননা দেখা যাইতেছে যে এতদিনের বিলম্বে গুদামঘরের সকল পুস্তকই ইঁদুর খাইয়া ফেলিয়াছে।

আমি ফাইল পড়ে একাই হাসতে লাগলাম। এমন সময় হাসান জামান সাহেব প্রবেশ করলেন। তিনিও লজ্জিতভাবে হাসতে লাগলেন। হাসি থামিয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই সাধারণ জিনিসের জন্য এত লিখিত আদেশ ও প্রস্তাবের কি প্রয়োজন ছিল? আপনারা কি বাংলাতে ফাইলপত্র কি করে লেখা যায় তা পরীক্ষা করছিলেন?'

হাসান জামান সাহেব বললেন, 'অনেকটা তাই। পরিচালক সাহেব বাংলাতে কি করে নথিপত্র লিখতে হয় সেগুলো আমাদের শিখিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে কয়দিন ক্লাসও

www.pathagar.com

নিয়েছিলেন। তাছাড়া সবকিছুই লিপিবদ্ধ থাকুক এটা তিনি চাইতেন। একবার আফতাবউদ্দীন সাহেব তার ঘরের দেয়ালে একটি পেরেক ঠুকেছিলেন কোর্ট ঝুলাবার জন্যে, সে জন্য লিখিতভাবে তাকে জবাবদিহি করতে হয়েছিল। সে ফাইলটা দেখলেও আপনি হাসতেন।

বাংলা একাডেমীতে আমার গৃহ প্রবেশের দিন ভালই কেটেছিল। বিকেলবেলা সবাইকে ডেকে আমি বলেছিলাম, 'বিভিন্ন বিভাগে আপনাদের যে সমস্ত সমস্যা আছে সরাসরি তা নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করবেন। এর জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। কর্মাধ্যক্ষ বা সচিবের নিজস্ব কাজ আছে, তাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নেই। আপনারা আমার সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করে সিদ্ধান্তগুলো ফাইলে লিখবেন এবং সেগুলো আমি সই করবো। তাতে সময় বাঁচবে, কাজও তাড়াতাড়ি হবে। এনামুল হক সাহেব পণ্ডিত লোক। তিনি আপনাদের হাতে-কলমে শিখিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সুতরাং তিনি একটা পদ্ধতি অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। সেই পদ্ধতি আমি অবলম্বন করব না।'

প্রথম দিন বিকেল বেলা অনেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ফররুখ ও সিকান্দার এসেছিল একসঙ্গে। ফররুখ তার স্বভাবসুলভ উচ্ছলতায় এবং হাস্যকৌতুকে আমাকে অভিসিক্ত করল এবং তার একটি বিরাট দাবি পেশ করল ; বলল, 'আলী, আমরা এখন সকলে মিলে আমাদের সাহিত্যের একটি নতুন ধারা নির্মাণ করতে পারি। এতদিন আমরা কিছুই করতে পারি নি। সাহিত্যের মূলে একটা বিশ্বাস কাজ করবে। এখানে আমাদের সাহিত্যে কোনও বিশ্বাসের অবলম্বন নেই, শুধু বিশৃংখলা চলছে। যে যার মত যা খুশী লিখে যাচ্ছে, কোথাও কোন নিয়ম-শৃংখলা নেই।'

সিকান্দার বললো 'যে যার মত লিখবে এটাই তো ঠিক। সাহিত্য কি কারো নির্দেশ মেনে চলে'?

মুনীর চৌধুরী এসেছিল। সে তার প্রাণপূর্ণ উচ্ছলতায় আমি বাংলা একাডেমীতে এসেছি তার জন্য আনন্দ ব্যক্ত করলো। মুনীরের মধ্যে একটি আবেগ এবং উচ্ছ্বাস সর্বদাই প্রকাশ্য ছিল। তাকে কখনো আমি বিমর্ষ দেখি নি। সে জোরে কথা বলতো, জোরে হাসতো এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিত। বাংলা একাডেমীতে আমি যতদিন ছিলাম সকল বিষয়েই মুনীরের সহযোগিতা পেয়েছি।

একাডেমীতে আমার যোগদান বিষয়ে বাংলা একাডেমী পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় নিম্নলিখিত উল্লেখ পাওয়া যায়–"প্রথম পরিচালক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাওয়ার পর প্রাদেশিক সরকার করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব সৈয়দ আলী আহসানকে একাডেমীর পরিচালক নিযুক্ত করেন। গত ১৫ই ডিসেম্বর নবনিযুক্ত পরিচালক কর্মভার গ্রহণ করেছেন। অর্ডিন্যান্সের অভাবে কর্মাধ্যক্ষ নিয়োগ না হওয়ায় এবং পাঁচ মাস কাল পরিচালক না থাকায় একাডেমীর নিত্যদিনের কামকাজ নিয়মিত চলা সম্ভব হয়নি, এতে শুধু সাধারণ লোকজনকেও অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। ক্রমান্বয়ে একাডেমীর কার্যাদি যথারীতি নিয়ম শৃংখলায় অতঃপর চলতে থাকবে আশা করা যায়।

www.pathagar.com

একাডেমীর দায়িত্বভার গ্রহণের পর আমি একাডেমীর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করবার জন্য চেষ্টা করি এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র প্রাদেশিক গবেষণা সংগঠন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করে। এই সময় প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন জেনারেল আযম খান। তাঁর উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ছিল প্রচুর। কার্যভার গ্রহণের পর তাঁর সঙ্গে যখন দেখা করি তখন তিনি আমাকে খুবই উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁর কথাবার্তায় একটা নিশ্চিন্ততা ছিল। তিনি যা ভাল বুঝতেন রেড টেইপ বা লালফিতা অগ্রাহ্য করে তাই করতে চাইতেন। আমাকে তিনি সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন বললেন এবং এ সাহায্য আমি পেয়েছিলাম। আমার কর্মকাণ্ডের অনেকক্ষেত্রে ডক্টর মাহমুদ হোসেনেরও সাহায্য পেয়েছি। আমি পাকিস্তান পিএনএ এর সেক্রেটারী জেনারেল ছিলাম এবং আরও কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার যোগসূত্র ছিল। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বাংলা একাডেমীতে বিভিন্ন সেমিনার এবং আলোচনা সভার আয়োজন করি। এ সম্পর্কে বাংলা একাডেমী পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়।

প্রতিবেদন থেকে অংশবিশেষ এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ এই সমস্ত আলোচনা সভায় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়, বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকের সাহিত্যালোচনা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চারুশিল্প বিষয়ে বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের বক্তৃতা, অন্যান্য দেশে সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি, সংস্কৃতির রূপ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলা একাডেমী এই সমস্ত আলোচনার মাধ্যমে বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীদের মধ্যে গভীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মহল বাংলা একাডেমীকে কেন্দ্র করে নতুন প্রাণ-চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। একাডেমী এই সমস্ত সেমিনার ও আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপ তুলে ধরতে পেরেছে। বাংলা একাডেমীর এই প্রচেষ্টার ফলে দেশের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সুসমৃদ্ধ হতে চলেছে।

১৯৬১ সালের শুরুতে দিল্লীতে পাক-ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর তারাচাঁদ নামক বিখ্যাত ইতিহাসবিদ এ সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন। পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে আলোচনাক্রমে তিনি এই সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান এবং ভারতের ঐতিহ্যগত ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করা এবং উভয় দেশ একে অন্যের উপর নির্ভর করে কিভাবে সমৃদ্ধ হতে পারে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা। ঢাকা থেকে প্রবীণ-নবীন মিলিয়ে মোট বত্রিশজন এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রবীণদের মধ্যে ছিলেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, কবি আবদুল কাদির, কবি গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, ডক্টর এনামুল হক, বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ। আরও ছিলেন ঃ শিল্পী জয়নুল আবেদীন, শফিউদ্দীন আহমদ, আবুল হুসেন, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিক এবং আমি। আরো অনেকেই ছিলেন, সবার নাম এখন মনে পড়ছে না।

আমাদের রওয়ানা হবার আগের দিন পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী হাবিবুর রহমান আমাদের সবাইকে উদ্দেশ করে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমরা দিল্লী গিয়েছিলাম ট্রেনে করে। ঢাকা থেকে গোয়ালন্দ হয়ে বেনাপোল পর্যন্ত, বেনাপোল থেকে শিয়ালদহ। কলকাতায় সারাদিন থেকে সন্ধ্যায় হাওড়ায় ট্রেন ধরে দিল্লী গিয়েছিলাম মনে আছে। সে সময় ব্রোহী

www.pathagar.com

সাহেব পাকিস্তানের হাই কমিশনার ছিলেন। মুখ্যতঃ তাঁরই চেষ্টায় পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে এই সরাসরি ট্রেনে যাতায়াত গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে এটা সম্ভবত নেই। এখন মনে পড়ছে কবি জসীমউদ্দীনও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠবার সময় আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভাগ হয়ে গেলাম। যে প্রকোষ্ঠে আমি ছিলাম সেখানে আরো ছিলেন বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, জয়নুল আবেদীন ও শফিউদ্দীন আহমদ। যতদূর মনে আছে হাওড়া থেকে দিল্লী পর্যন্ত যেতে একটি পুরো দিন এবং দুটি রাত লেগেছিল। দিল্লীতে আমরা অবস্থান করেছিলাম অশোকা হোটেলে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন পণ্ডিত নেহেরু। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেছিলেন অধ্যাপক হুমায়ূন কবীর, জনাব এ কে ব্রোহী এবং ডক্টর তারাচাঁদ। হুমায়ূন কবীর তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন যে একটি নদী পাহাড় থেকে যখন নির্গত হয় তখন একটি ধারা এসে নামে। তারপর অজস্র ধারা প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে আবার সকল ধারা একত্রিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়। সংস্কৃতিও তাই। এই উপমহাদেশে নানাবিধ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু মূলতঃ তারা একই সূত্র থেকে বিকশিত হয়েছে। এখন আমাদের লক্ষ্য হবে সংস্কৃতির বিচিত্র ধারাকে একত্রিত করে একটি মিলিত ক্ষেত্রে নিয়ে আসা। তিনি তাঁর বক্তৃতার এক পর্যায়ে দারা শিকোহর কথা বলেছিলেন।

ব্রোহী সাহেবের বক্তব্যে একেবারেই ভিন্ন সুর শোনা গেল। তিনি বললেন, বৈচিত্র্য আছে বলেই পৃথিবী সুন্দর। যেখানে সজীবতা থাকে সেখানে বৈচিত্র্য থাকে। পৃথিবীর সজীব এবং উর্বরা অঞ্চলে নানা প্রকার শস্য এবং ফলবান বৃক্ষ জন্মে। এক অঞ্চলের শস্য এবং বৃক্ষসম্ভারের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের শস্য এবং বৃক্ষসম্ভারের মিল থাকে না। অন্য দিকে পৃথিবীর সকল মরুভূমি কিন্তু একই রকম। মরুভূমিগুলোতে একই রকমের বালুকার বিস্তার, একই রকমের রৌদ্রের উত্তাপ, একই রকমের কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ। মরুভূমির জীবনযাপন প্রণালীও একই রকম। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা মরুভূমির শুষ্কতা কামনা করব না। সুতরাং একটি একীকরণের দিকে লক্ষ্য না রেখে আমরা বৈচিত্র্য এবং ভিন্নতার দিকে লক্ষ্য দেব। উর্বরা এবং সজীব ভূমির মত মানব সংস্কৃতিও বৈচিত্র্যময়। মানব সংস্কৃতি তাদের প্রকাশগত ভিন্নতা নিয়ে সমৃদ্ধ ও সুন্দর।

সভাপতির ভাষণে ডক্টর তারাচাঁদ সংস্কৃতির ভিন্নতাকে স্বীকার করে নিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাবের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ভারতের সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতি নয়, কিংবা ইসলামী সংস্কৃতিও নয়, বরঞ্চ উভয়ের মিলিত জীবন-যাপনে সৃষ্ট একটি নতুন সংস্কৃতি। ইসলামের প্রভাবে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য এসেছে এবং ভারতীয় প্রজ্ঞার সঙ্গে ইসলামী ঔদার্য এবং সৌন্দর্য এসে মিলিত হয়েছে।

সম্মেলনের শেষে আমরা পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে মিলিত হবার চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু তিনি ক্লান্ত ছিলেন বলে চায়ের আসরে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন নি। সম্মেলনের মধ্যে একদিন ডক্টর রাধাকৃষ্ণান এসেছিলেন। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরিচয় দিলাম, ফ্রাংকফোর্টে যে দেখা হয়েছিল সে কথা বললাম। কিন্তু তিনি পুরোপুরি স্মরণ করতে পারলেন না। তবুও দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বললেন।

www.pathagar.com

সম্মেলনে আরেক ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর নাম রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ। তিনি এক সময় বিরাট বিপ্লবী ছিলেন। বৃটিশ আমলে ভারত বিরোধী বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে এক সময় তাঁর একটি ভূমিকা ছিল। আমরা যখন তাঁকে দেখি তিনি একজন বুদ্ধিভ্রংশ বৃদ্ধ। তিনি তখন একটি বিশ্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছেন এবং সে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কি কি করতে হবে, তার একটা ফিরিস্তি কাগজে ছাপিয়ে কনফারেন্সে বিলি করেছিলেন।

কনফারেন্সের উদ্বোধনী দিনেই সম্বর্ধনা ছিল। সেখানে প্রখ্যাত অভিনেতা পৃথ্বীরাজ কাপুরের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। পৃথ্বীরাজ এক সময় কোলকাতা ছিলেন। তিনি বাংলা বলতে পারতেন। একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা হলেও ভালই বলতেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমরা যারা গিয়েছি তাদের পেয়ে তিনি মহা খুশী। হুমায়ুন কবীরকে তিনি ডেকে নিয়ে আমাদের সাথে গল্প জুড়ে দিলেন। কথা প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার কথা উঠলো। এক পর্যায়ে পৃথ্বীরাজ কাপুর হুমায়ূন কবীরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবির ছাহাব, আপনি বোলতে পারেন বাংলা ভাষা কোথা থেকে আসিছে?' এই বলে হুমায়ুন কবীরের মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে তিনি নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিলেন, 'হামি বোলতে পারে। বাংলা ভাষা সংস্কৃত থেকে আসিছে। কিন্তু আপনি কি বলিতে পারেন সংস্কৃত ভাষা কোথা থেকে আসিছে? হামি বলতে পারে। সংস্কৃত ভাষা পাঞ্জাবী থেকে আসিছে।' এই বলে পৃথ্বীরাজ কাপুর হো হো করে হেসে উঠলেন। পৃথ্বীরাজ কাপুর ছিলেন অসম্ভব মোটা, আবার লম্বাও ছিলেন। তাঁর হাতে একটা খাসির পুরো ঠ্যাং ছিল। রোস্ট করা খাসি থেকে পুরো ঠ্যাংটা তুলে নিয়ে তিনি খেতে খেতে আমাদের সঙ্গে গল্প করছিলেন। সে সময় দিল্লীতে মোগলে আযম বলে পৃথ্বীরাজ কাপুরের একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছিল। তিনি আমাদের সবাইকে এই সিনেমা দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে শ্রী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়ের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি ছিলেন কবি হারীন চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী। কিন্তু সে সময় তিনি হারীন চট্টোপাধ্যায় থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছিল। কমলা দেবী রাজনীতিতে চলে এসেছিলেন এবং হারীন চট্টোপাধ্যায় রয়ে গিয়েছিলেন কবিতা ও সঙ্গীতের ভুবনে। কমলা দেবীকে দেখে জসীমউদ্দীন মন্তব্য করেছিলেন, 'কি কারণে কবি হারীন চট্টোপাধ্যায় যে-একে ছেড়ে দিয়েছেন তা এখন বুঝতে পারছি।' কমলা দেবী ছিলেন স্থূলকায়া লাবণ্যহীনা মহিলা আর হারীন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ছিপছিপে, শানিত এবং দীপ্তিময়। আমি হারীন চট্টোপাধ্যায়কে বহু আগে দেখেছিলাম কোলকাতায়। তখন তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওর জন্য কয়েকটি গান রেকর্ড করেছিলেন।

অশোকা হোটেলে আমি এবং জয়নুল আবেদীন এক কক্ষেই ছিলাম। রাতে খাবারের পর শফিউদ্দিন আমাদের ঘরে এসে উঠতেন এবং অনেক রাত পর্যন্ত আমরা গল্প-গুজব করতাম। গল্পের মূলধারা ছিলেন জয়নুল আবেদীন। নানা ধরনের গল্প। তার মধ্যে আদিরসাত্মক গল্পও ছিল অনেক।

দিল্লীতে সম্মেলনে বাংলাদেশের অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিবেদন পেশ করি আমি। আর পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্য ধারা সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করেন তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়। সেবারেই তারাশংকরের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। তারাশংকরই প্রথম তাঁর প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য অজ্ঞতা

www.pathagar.com

প্রকাশ করেন। তদুপরি. আমাদের অঞ্চলের সাহিত্য সম্পর্কে যতটা জানেন তা নিয়ে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেন। আমি আমার প্রতিবেদন তারাশংকরের বক্তব্যে দুঃখ প্রকাশ করি এবং বলি যে যেখানে আমরা পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য সম্পর্কে সততই সংবাদ রাখতে আগ্রহী সেখানে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান লেখকরা আমাদের লেখার কোন সন্ধান রাখেন না. এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যেখানে আমরা পারস্পরিক নির্ভরতার কথা বলছি সেখানে এই নির্ভরতা উভয় পক্ষ থেকেই আসবে. এক পক্ষ থেকে নয়।

॥২৭॥

দিল্লীতে যদিও পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রতিনিধিগণ একত্রিত হয়েছিলেন কিন্তু দেখা গেল আমরা দুই অংশের লোক ভিন্ন ভিন্নভাবে গোত্রভুক্ত হয়ে চলতে লাগলাম। ভাষাগত বিভেদের কারণে তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিকতার অভাবের কারণেও উভয় অঞ্চলের লোকেরা বিদেশেও মিলিত থাকতে পারি নি। কনফারেন্সের অভ্যন্তরে এবং বাইরে, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত আচরণের মধ্যে কেমন যেন একটা পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। হোটেলে খাবার সময় বাঙ্গালীরা একদিকে বসতাম, পশ্চিম পাকিস্তানীরা অন্য দিকে বসতেন। ডাইনিং রুমে আমাদের টেবিল ঠিক করে দেয়া ছিল। বেয়ারাদের সার্ভিসের সুবিধার জন্যই হয়তো আমাদের প্রত্যেকের টেবিল চিহ্নিত ছিল। আমি, জয়নুল আবেদীন, শফিউদ্দিন এবং বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ–আমরা সবাই সব সময় একই টেবিলে বসতাম। ইব্রাহীম খাঁ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, গোলাম মোস্তফা, আবদুল কাদির এবং ডক্টর এনামুল হক এক টেবিলে বসতেন। এদের টেবিলটি একটি কারণে খুবই পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। এরা শব্দ করে খেতেন এবং সে শব্দ আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ত। চা খাবার সময় পিরিচে ঢেলে জোরে চুকচুক করে খেতেন অথবা চোঁ করে খেতেন। গরম স্যুপে মুখ দিয়ে একদিন আবদুল কাদির চীৎকার করে উঠেছিলেন, তার স্যুপের পেয়ালাও উল্টে গিয়েছিল।, বেয়ারা ছুটে এসেছিল এবং একটা হৈচৈ কাণ্ড বেধে গিয়েছিল। এ অবস্থা দেখে পশ্চিম পাকিস্তানের হাফিজ জালান্ধরী কবি জসীমউদ্দীনের কাছে মন্তব্য করেছিলেন, "এসব বড় হোটেলে ঢুকবার আগে বাঙ্গালী সাহেবানদের কিছু তরবিয়ত শিখে নেয়া উচিত।" জসীম উদ্দীন সাহেব এ কথায় মহাক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

কনফারেন্সে শিল্পসংক্রান্ত শাখায় পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পধারা সম্পর্কে বক্তব্য রাখার দায়িত্ব পড়েছিল শফিউদ্দীনের উপর। পশ্চিম পাকিস্তানের আমজাদ আলী পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পধারা সম্পর্কে বলবার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিলেন। আমজাদ আলী ছিলেন ইংরেজী ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ এবং শিল্পচৈতন্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। কিন্তু শফিউদ্দীন ছিলেন শুধুমাত্র শিল্পীই, লেখক বা বক্তা নন। শফিউদ্দীনের অসুবিধা দেখে মিসেস মোহাম্মদ হোসেন তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। মিসেস মোহাম্মদ হোসেন বাঙ্গালী কিন্তু তিনি করাচী থাকতেন বলে পশ্চিম পাকিস্তানী দলের সঙ্গে এসেছিলেন। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আমি এবং জয়নুল আবেদীন আমাদের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। এমন সময় শফিউদ্দিন এলেন। শফিউদ্দিনকে ভয়ানক চিন্তিত এবং বিব্রত দেখলাম। শফিউদ্দিন বললেন, "মিসেস মোহাম্মদ হোসেন রাত্রে তাঁর ঘরে যেতে বলেছেন লেখাটি তৈরী করে দেবেন বলে। আমি

www.pathagar.com

রাত্রিবেলা তার ঘরে একা যাই কি করে?" এই বলে তিনি আমাদের উভয়ের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকালেন। আবেদীন খুব গম্ভীর এবং নিশ্চিন্ত ভঙ্গীতে বললেন, "একজনের জায়গায় দুজন গেলে তো কাজ হবে না।" ভীষণ লজ্জিত হয়ে শফিউদ্দিন বললেন, "আপনি যে কি বলেন!" একটু থেকে আবেদীনের প্রতি অনুনয় করে বললেন, "আপনাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে।" আবেদীন অনেকক্ষণ পর্যন্ত টালবাহানা করলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য শফিউদ্দিনকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দিল্লীতে দুটি দেশের পুস্তক প্রদর্শনী হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক উর্দু বই এসেছিল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোন বই যায় নি। আমাদের নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল বই নিয়ে যেতে। এর কারণ আমরা বুঝি নি।

কনফারেন্সের মাঝখানে একদিন দিল্লীর বাঙালী কালীমন্দিরে আমি এবং আবুল হোসেন আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সম্ভবত শামসুর রাহমানও সেখানে ছিল। এই কালীমন্দিরটি একটি কমপ্লেক্সের মত। সেখানে স্কুল আছে, পাঠাগার আছে এবং সম্মেলন কক্ষ আছে। আমরা সম্মেলন কক্ষে গিয়ে বসলাম, সেখানে আলাপচারিতা হল, কবিতা পাঠও হল। হিন্দু বাঙ্গালী যারা ওখানে ছিলেন তাদের অধিকাংশই দেখলাম আমাদের অঞ্চলের কেউ বরিশালের, কেউ ঢাকার, কেউ বা চট্টগ্রামের।

একদিন সন্ধ্যার দিকে ডক্টর সমর সেন এসেছিলেন। তিনি তার গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে দিল্লীর কয়েকটি দর্শনীয় স্থানে গেলেন। এক পর্যায়ে ডক্টর লোকনাথ ভট্টাচার্যের বাসায় আমরা এসে বসেছিলাম এবং চা খেয়েছিলাম। লোকনাথ ভট্টাচার্য বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন সম্ভবত প্যারিসে। তার স্ত্রী ফরাসী মহিলা। তিনি সোরবোর্নের বাংলার অধ্যাপিকা। লোকনাথ আমাকে তাঁর একটি অনুবাদ গ্রন্থ উপহার দিলেন। 'নরকে এক ঋতু' সম্ভবত বইটির নাম। সে সময় লোকনাথ দিল্লীতে একটি সরকারী উচ্চ পদে ছিলেন। পরে তিনি ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের ডিরেক্টর হয়েছিলেন।

আমার বন্ধু প্রভাকর পাধ্যায় সে সময় দিল্লীতে থাকতেন। দিল্লীতে কিছু কেনাকাটা করবার জন্য আমার হাতে কোন টাকা পয়সা ছিল না দেখে প্রভাকর আমাকে কিছু সাহায্য করেছিলেন। প্রভাকর বর্তমানে পরলোকগত।

কনফারেন্স থেকে ফিরে এসে বাংলা একাডেমীর কর্মকাণ্ডে আবার নিজকে জড়িয়ে ফেললাম। ৫ই, ৬ই এবং ৭ই জুন তারিখে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে একটি সেমিনারের আয়োজন করি। সেমিনারে আলোচ্য বিষয় ছিল "লেখক ও তার সামাজিক দায়িত্ব।" জনাব হাবিবুর রহমান সেমিনারের উদ্বোধন করেন। তিনি তখন ছিলেন পাকিস্তানের বেতার ও জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার মন্ত্রী। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর শাহেদ সোহরাওয়ার্দী। সেমিনারে মূল বিষয়টিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগের জন্য স্বতন্ত্র অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। পাঁচটি বিষয় ছিল ঃ লেখকের স্বাধীনতা ও সামাজিক দায়িত্ব; সমস্যাটির ক্রমবিবর্তনের ধারা; একনায়ক শাসিত রাষ্ট্রে সামাজিক দায়িত্বের অর্থ; লেখকের সামাজিক দায়িত্ব বনাম আর্টের খাতিরে আর্ট এবং শিল্প বিজ্ঞানে উন্নত লেখকের ভূমিকা। বাংলা একাডেমীর পরিচালক হিসেবে আমি সেমিনারের প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করি।

www.pathagar.com

সেমিনারের পাঁচটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর ডব্লু এইচ এ সাদানী, অধ্যাপক আহমদ আলী, বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ, জনাব আবুল ফজল, ডক্টর এ বি এম হাবিবুল্লাহ।

বিভিন্ন অধিবেশনে জনাব কবির চৌধুরী, জনাব আবু রুশদ, মতিনউদ্দীন, জনাব আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আশরাফ, জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, জনাব মুনীর চৌধুরী, মিঃ জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, সৈয়দ মুজতবা আলী, জনাব এম শামীম, জনাব হাসান জামান, জনাব জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বেগম জেবুন্নিসা আহমদ, জামিলুদ্দীন আহমদ প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং অনেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষামন্ত্রী জনাব হাবিবুর রহমান সেমিনারের উদ্বোধনী ভাষণে এ জাতীয় আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশকে কেবল যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সুদৃঢ় করতে হবে তা নয়, সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের ক্ষেত্রেও আমাদের দেশকে এশিয়াতে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সাহিত্যিকদের উপর গভীর দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। সমাজ সংগঠনের ব্যাপারেও তাদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পিইএন-এর এই আলোচনা অনুষ্ঠানটি বিশেষ উচ্চমানের হয়। পিইএন-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি হয়েছিল এবং উক্ত সংস্থার সভাপতি হিসেবেই শাহেদ সোহরাওয়ার্দী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেছিলেন।

শাহেদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান এয়ারলাইনসের যে ফ্লাইটে ঢাকায় আসেন সে ফ্লাইটে হজ্জ প্রত্যাগত অনেক হাজী সাহেবান ছিলেন। বিমানবন্দরে আমি তাঁকে রিসিভ করতে গিয়েছিলাম। হাজী সাহেবানদের দেখে আমি কৌতুক করে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে বললাম, "পবিত্র লোকদের সান্নিধ্যে আপনার বিমান যাত্রা ভালোই কেটেছিল নিশ্চয়ই।"

সোহরাওয়ার্দী সাহেব হেসে উত্তর করলেন "পবিত্র বলছো তো। হাঁ হাঁ আমি তার গন্ধ পেয়েছিলাম।" তিনি ইংরেজী যে বাক্যটি ব্যবহার করেছিলেন তা আজো আমার মনে আছে, "ইয়েস, ইয়েস আই স্মেলট ইট।"

সেবারে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় ছিলেন। তিনি ধানমণ্ডিতে একটি বাড়ি তৈরি করছিলেন। বাড়িটি তখন সমাপ্তির পথে। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাহেদ সাহেবকে বাড়ি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি পরে এই বাড়ির কথা শাহেদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন, "শহীদ বললো সে নাকি আমার জন্য একটি বাড়ি তৈরি করেছে, আমি তাই বাড়িটি দেখতে গেলাম। একটি বড় ঘর দেখিয়ে আমাকে সে বললো–ভাইজান, এই ঘরটি আপনার। আমি তখন তাকে প্রশ্ন করলাম ঃ আমার কুকুর দুটো কোথায় থাকবে? শহীদ তখন পাশের একটি ছোট কামরা দেখিয়ে বললো–এখানে। আমি তখন বললাম ঃ তাহলে এ বাড়িতে আমি থাকবো না। শহীদ তখন বললো ঃ ঠিক আছে, আপনি তাহলে ছোট ঘরটায় থাকবেন এবং কুকুর দুটো বড় ঘরটায় থাকবে।"

শাহেদ সাহেবের কথার ভঙ্গীতে আমি হাসতে লাগলাম।

ঢাকায় অবস্থানকালে এক পর্যায়ে জয়নুল আবেদীন তাঁকে আর্ট স্কুল দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি অনেকক্ষণ ছিলেন এবং শিল্পীদের উদ্দেশে কিছু বলেছিলেন। শফিউদ্দিন নদী-ভিত্তিক কিছু এচিং তাঁকে দেখালে তিনি বললেন, "চিত্র হচ্ছে আকৃতি

www.pathagar.com

নির্মাণ. একটি চিত্রে কোন একটি আকৃতি এককভাবে থাকে না, অন্য নানাবিধ আকৃতির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে বিদ্যমান থাকে এর মধ্যে দূরের এবং নিকটের অবস্থানের কথাও গুরুত্ব পায়। এভাবে অবস্থাগত সামঞ্জস্য নির্ধারণ করবার জন্য কম্পোজিশনের প্রয়োজন হয়, হারমোনি ও ব্যালান্সের কথাও আসে। এসব দিক থেকে তোমার চিত্রগুলো নিখুঁত হয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে ডেকোরেশনের সুস্পষ্ট প্রয়াস আছে বলে এগুলো অনেকটা ডিজাইনের পর্যায়ে পড়েছে। সেই কারণে টেক্সটাইলের প্রিন্ট হিসেবে এগুলো অনবদ্য হবে বলে আমার মনে হয়।"

শাহেদ সোহরাওয়ার্দী যেভাবে অল্প কথায় শিল্পের নির্মাণ প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করছিলেন তা সত্যি অতুলনীয় ছিল। আমরা সবাই অভিভূত হয়ে শুনছিলাম। সেবারেই শাহেদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সর্বশেষ ঢাকায় আসা।

বাংলা একাডেমীতে প্রধান প্রবেশ দ্বারের পরই বাঁ দিকে একটা একতলা ঘর ছিল সেই ঘরটিতে লেখক সংঘ বা রাইটারস গিল্ডের অফিস ছিল। আমার পূর্ববর্তী পরিচালক গিল্ডকে এই ঘরটি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। আমি গিল্ডের কর্মকর্তাগণকে জানিয়ে দিলাম যে তাদের অন্য একটা অফিস খুঁজে নিতে হবে। এ ঘরটি একাডেমীর প্রয়োজনে লাগবে। এ জন্য ঢাকায় যারা গিল্ডের সদস্য ছিলেন তারা কোন প্রতিবাদ করেন নি বা আন্দোলন করেন নি। কিন্তু করাচী থেকে জামিলউদ্দিন আলী এ খবর পেয়ে বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমার বিরুদ্ধে একটা চিঠি লেখে এবং আমি পাকিস্তান বিরোধী কর্মে লিপ্ত এমন সব অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করে। কিছুদিন পর করাচী থেকে পাকিস্তানের তথ্য সচিব কুদরতুল্লাহ সাহেব ঢাকায় আসেন এবং আমার সঙ্গে গিল্ডের একটা মীমাংসা করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হয় যে রাইটারস গিল্ড অন্য একটি স্থান নির্বাচন করে সেখানেই উঠে যাবে তবে যতদিন না নতুন স্থান খুঁজে পাচ্ছে ততদিন একাডেমীর এলাকাতেই থাকবে। জামিলউদ্দিন আলী এতেও সন্তুষ্ট হয় নি। সে চেষ্টা করতে লাগল আমাকে বাংলা একাডেমী থেকে অপসারণের জন্য। জামিলউদ্দিন আলীর এ সমস্ত উত্তেজনাপ্রসূত কর্মকাণ্ডের খবর মুনীর চৌধুরীর মাধ্যমে পেতাম। যথাসময়ে এ খবরগুলো পাওয়ায় জামিলউদ্দিন আলীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল।

আবু জাফর শামসুদ্দিন রাইটারস গিল্ডের সম্ভবত অফিস সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর অবস্থার কথা বললেন এবং বাংলা একাডেমীতে তাঁকে নিযুক্তি দিতে অনুরোধ করলেন। আমি তাঁকে বাংলা একাডেমীর অনুবাদ শাখার প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করি। এই নিয়োগে বাংলা একাডেমী উপকৃত হয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বাংলা একাডেমীর অনুবাদের কার্যক্রম ব্যাপকভিত্তিক করে ফেললেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ অনুবাদের ব্যবস্থা করলেন এবং সে সময়কার বিপুল সংখ্যক গ্রন্থের অনুবাদের ফলে দেশ ও জাতি লাভবান হয়েছিল।

এ বছরই আমি প্রথমবারের মত আমেরিকায় যাই। করাচী থাকতে আমেরিকান মিশনের মরিস ডেম্বো আমাকে আমেরিকায় যাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেখানে থাকতেই "লিডারশিপ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে" আমার আমেরিকা যাওয়ার পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু কার্যকর হয় ঢাকায় আসার পর। আমি সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকায় যাই। করাচীতে একরাত এয়ারপোর্টে অবস্থান করেছিলাম। সেখানে করাচীর বন্ধু-বান্ধবরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। আমার আমেরিকা অনুষ্ঠানের সূচী ছিল ব্যাপক। দু'মাস আমি আমেরিকায় ছিলাম। সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর। নিউইয়র্কে সেপ্টেম্বরের এগার তারিখে রকফেলার সেন্টারে উক্ত সেন্টারের মানবিক শাখার ডিরেক্টর মিঃ গিলপ্যাট্রিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। দুপুরে ফ্রাঙ্কলিন প্রকাশন সংস্থার ডিরেক্টর মিঃ ডাটাস স্মিথের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজে মিলিত হই। অপরাহ্নে আমেরিকান পিইএন সেন্টার কর্তৃক "ওভারসিজ এসোসিয়েশনে"র একটি সংবর্ধনা সভায় যোগ দেই। সেখানে ঔপন্যাসিক হাওয়ার্ড ফাস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আগের রাত্রে ফাস্টের 'স্পার্টাকাস' নামক সিনেমা দেখেছিলাম। হাওয়ার্ড ফাস্টের সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়। ফাস্ট জানালেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন এবং কলকাতা রেডিওতেও গিয়েছিলেন। আমার তখন মনে পড়লো যে কলকাতা রেডিওতে থাকতে দু'তিন জন আমেরিকান সৈনিক রেডিও অফিসে এসেছিলেন তাদের মধ্যে হাওয়ার্ড ফাস্টও ছিলেন। পরে জেনেছি হাওয়ার্ড ফাস্ট সেবার বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর ঘুরেছিলেন, চট্টগ্রামেও এসেছিলেন। হাওয়ার্ড ফাস্টের সঙ্গে এখন পর্যন্ত আমি সম্পর্ক বজায় রেখেছি। ১৯৮৩ সালে যখন আমেরিকায় যাই তখন হাওয়ার্ড ফাস্টের সঙ্গে সর্বশেষ সাক্ষাৎ হয়।

পিইএন-এর অনুষ্ঠানে নাট্যকার এলমার রাইসও উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে আমি পূর্ব থেকেই চিনতাম। করাচীতে তিনি এসেছিলেন টোকিওতেও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। নিউইয়র্কে আমার কর্মসূচী ছিল ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে আমি বিভিন্ন মিউজিয়াম দেখেছি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি, থিয়েটার ও সিনেমা দেখেছি। এশিয়া সোসাইটির মিসেস বনিক্রাউনের সঙ্গে একটি দিন কাটিয়েছি। বনিক্রাউন তখন থাকতেন গ্রীনউইচ ভিলেজে। রিচার্ড ট্যাপলিঙ্গার নামক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ১৯৫৪ সালে ঢাকায়। নিউইয়র্কে তার সঙ্গে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছিলাম। রালফ এলিসন নামক একজন ঔপন্যাসিকের সঙ্গে এখানে পরিচয় হয়। এলিসন একজন নিগ্রো লেখক।

তার 'অদৃশ্য মানুষ' বা 'ইনভিজিবল ম্যান' উপন্যাসটি সে সময় আমেরিকায় খুব আলোড়ন তুলেছিল। উপন্যাসটিতে একজন সাধারণ নিগ্রোর জীবনে ধর্মীয় বিশ্বাসের তাৎপর্য আবিষ্কার করবার চেষ্টা করা হয়েছে। যে মানুষ কোন কিছু শেখেনি, পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য যে জানে না এবং যে মানুষ আপন পরিকল্পনায় একটি জীবনযাপনের ধারা নির্মাণ করে নেয় সে মানুষ কারও কাছে পরিচিত হয় না। সে এক প্রকার অদৃশ্য জীবনযাপনের মধ্যে যে সংকট এবং দ্বন্দ্ব থাকে তাকেই এলিসন তার উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এলিসন কৃষ্ণকায়দের লোক সংস্কৃতির মাধ্যমে আত্ম-আবিষ্কারের চৈতন্যকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। বইটির আরম্ভ এভাবে হয়েছে, "অনেক দিন পিছনে যেতে হয়, প্রায় বিশ বছর। সারা জীবনে আমি কোনও একটা কিছুর সন্ধানে ছিলাম কিন্তু যেখানেই গিয়েছি কেউ না কেউ আমাকে বলে দেবার চেষ্টা করেছে যে আমি কি চাই। তারা যা বলেছে আমি তা মেনে নিয়েছি। আমি আসলে নিজকেই অনুসন্ধান করেছিলাম।

www.pathagar.com

কিন্তু নিজের কাছে প্রশ্ন না করে অন্যের কাছে প্রশ্ন করছিলাম এবং তাদের উত্তর মেনে নিচ্ছিলাম। এভাবে আমি ক্রমশ আবিষ্কার করলাম যে আমি এক অদৃশ্য মানুষ।"

সেপ্টেম্বরের পনের তারিখে আমি ওয়াশিংটনে সেন্টার ফর এ্যাপলাইড লিঙ্গুইসটিক্সের ডক্টর ফার্গুসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। ওয়াশিংটনে স্মিথ সোনিয়ান কমপ্লেক্সে যে মিউজিয়ামগুলো আছে সেগুলো আমি দেখেছি। ওয়াশিংটনে লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে কিছুটা সময় কাটিয়েছিলাম। ওয়াশিংটনে তখন ডক্টর শহীদুল্লাহর এক ছেলে চিকিৎসাবিদ্যায় পিএইচডি করছিলেন। তার সঙ্গে ওয়াশিংটনের অনেক এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখেছি। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ছেলের স্ত্রী আমাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছে। মেয়েটি অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের ছিল। তার পিতাকে আমি চিনতাম। আমি যখন প্রথম জীবনে হুগলীতে চাকরি করতাম তখন তিনি সেখানকার কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তার নাম খান বাহাদুর আসাদ। এই মেয়েটি বর্তমানে জীবিত নেই। ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের সুরত আলী খান এডুকেশন কাউন্সিলর ছিলেন। তাঁর গৃহে তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে একদিন একটি অপরাহ্ন কাটিয়েছিলাম।

ওয়াশিংটন থেকে আমি যাই মিসিগানে। মিসিগানে দু'দিন ছিলাম। আঠার এবং উনিশ তারিখে। সেখানে ভাষা বিজ্ঞান বিভাগে কার্যক্রমের সঙ্গে পরিচিত হই। বিশে সেপ্টেম্বর ইন্ডিয়ানাতে যাই এবং ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ এবং লোকবিজ্ঞান বিভাগ পরিদর্শন করি। ইন্ডিয়ানা থেকে শিকাগোতে যাই। একুশে সেপ্টেম্বর থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর শিকাগোতে অবস্থান করি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগ এবং দক্ষিণ এশীয় ভাষা বিভাগ পরিদর্শন করি। এখানেই বাংলা বিভাগের অধ্যাপক দিমকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এখানকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'পোয়েট্রি' ম্যাগাজিনের সম্পাদক হেনী রাগোর সঙ্গে সাক্ষাৎ। রাগো আমাদের দেশে খুব বেশী পরিচিত নন। কিন্তু পাশ্চাত্য কাব্য জগতে বিশেষ করে ইংরেজী কাব্যজগতে তার একটি অধিকার আছে। তিনি টি এস এলিয়টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। রাগোর একান্ত চেষ্টায় 'পোয়েট্রি' ম্যাগাজিন স্থায়িত্ব পায়। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এবং কল্পনার প্রসার নিয়ে তিনি এই পত্রিকাটি সম্পাদন করেছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে তিনি তাঁর ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি একবার বলেছিলেন, "কবিতা হচ্ছে শব্দের সাহায্যে কিছু করবার প্রচেষ্টা, কিছু পরিবর্তন আনাবার কৌশল।" ১৯৬৯ সালে রাগোর মৃত্যু হয়। ১৯৬৯ সালের পোয়েট্রি ম্যাগাজিনের নভেম্বর সংখ্যা রাগোর স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। রাগোর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'শেষ গ্রীষ্মের একটি আকাশ'। ইংরেজী নাম হচ্ছে 'এ স্কাই অব লেইট সামার'।

শিকাগো থেকে আমি স্যানফ্রান্সিসকো যাই। এখানে একদিন ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক প্রফেসর হায়াকাওয়ার গৃহে অবস্থান করি। আটাশ তারিখে বিখ্যাত শিল্পী সালভাদর দালির স্বর্ণালংকার প্রদর্শনী দেখি। এই প্রদর্শনীর কথা আমার আজো মনে আছে। বিচিত্র ডিজাইনে মহার্ঘ্য মণিমানিক্য দিয়ে শিল্পী অলংকার তৈরি করেছিলেন। এ অলংকারের প্রদর্শনী দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম।

www.pathagar.com

॥২৮॥

পরাবাস্তববাদী শিল্পী হিসাবে সালভাদর দালি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রতীকের সাহায্যে, রং-এর বিশিষ্ট প্রয়োগের সাহায্যে এবং অনেকটা স্বপ্নগত দৃশ্যমানতার সাহায্যে তিনি তার চিত্রকর্মকে বিশিষ্ট রূপ দিয়েছেন। কিন্তু তার একটি চিত্র আবেগের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে যুক্তির সূক্ষ্ম নির্ভরতায় একটি ক্লাসিক্যাল ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে। সেই ছবিটি হচ্ছে 'দি লাস্ট সাফার'। ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল গ্যালারীতে আমি এই ছবিটি দেখেছি। এই ছবিটিতে জ্যামিতিক বিচার-বিবেচনার সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। কিন্তু তার অলংকারের প্রদর্শনীগুলো শিল্পজগতে একটি নতুন জিনিস।

প্রফেসর হায়াকাওয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল অনেকটা নাটকীয়ভাবে। আমার অনুষ্ঠানসূচীতে এই সাক্ষাৎকারটি ছিল না। আমি একদিন উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে একটি সু-সাইন দোকানে ঢুকে জুতো কালি করাচ্ছিলাম। আমার পাশে একজন আমেরিকান ভদ্রলোক ছিলেন, তিনিও তার জুতো পালিশ করাচ্ছিলেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করলাম। এই কথাবার্তার সূত্রে ভদ্রলোক অধ্যাপক হায়াকাওয়ার কথা বললেন এবং তার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আমি সানফ্রান্সিসকো স্টেট কলেজে হায়াকাওয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। সেখানে কিছু কথাবার্তা বলার পর হায়াকাওয়া আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি রাজী হলাম। এভাবেই হায়াকাওয়ার বাড়িতে একটি দিন আমি যাপন করি। রাত্রি বেলা খাবার পর তিনি আমাকে আমার হোটেলে পৌঁছে দিয়েছিলেন। পহেলা অক্টোবর থেকে ৫ই অক্টোবর আমি লসএঞ্জেলসে অবস্থান করি। এখানে আমি ডিজনিল্যান্ড দেখি এবং সমুদ্রের তীরে একটি ওশেনেরিয়াম দেখি। ওশেনেরিয়ামে সমুদ্রের বিবিধ প্রাণীর অবস্থান দেখে খুবই আনন্দ লেগেছিল; রাত্রিবেলা একটি স্পেনীয় নাইটক্লাবে জিপসিদের নৃত্য ও গীত পরিবেশিত হয়েছিল। সেটিও খুব উপভোগ্য হয়েছিল।

আমার এবারের ভ্রমণের মধ্যে গ্রান্ড কেনিয়ান দেখাটি একটি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানকার পাথরের মধ্যে সূর্যের আলো প্রতিফলনের ফলে নানা রকম রং-এর পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবীর এই আদিম অঞ্চলটি চিরকালের জন্য বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করে রেখেছে। কাব্যে, সঙ্গীত গাঁথায় এবং উপাখ্যানে এই কেনিয়ানে বহু বিচিত্র বর্ণনা আছে। গ্রান্ড কেনিয়ানটি উইলিয়ামস শহরের নিকটেই অবস্থিত। আমি লসএঞ্জেলসে একটি প্রদর্শনী দেখেছিলাম। প্রদর্শনীতে একটি দেয়ালে ন'টি বড় চিত্র ঝুলছিল। প্রতিটিতে নানাবিধ রং-এর টানা রেখা ছিল, কোন আকৃতি ছিল না। শিল্পী বুঝিয়ে দিলেন, যে বিভিন্ন ঋতুতে এবং দিবসের বিভিন্ন সময়ে কেনিয়ানে রং-এর যে পরিবর্তন ঘটে তাকে তিনি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

উইলিয়ামস থেকে আমি আল বুকার্কিতে যাই। আলবুকার্কিতে একটি নতুন অভিজ্ঞতা হয়। এখান থেকে আমি রেড ইন্ডিয়ানদের অবস্থানগুলো দেখি। বিশেষ করে সানটা ফে এবং সানটা ডোমিঙ্গো এলাকায় রেড ইন্ডিয়ানদের দেখি। আলবুকার্কি বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি রবার্ট ক্রিলির সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজে মিলিত হই। রাত্রি বেলায় এক লেখকের বাড়িতে খেতে গিয়েছিলাম, লেখকের নামটি এখন মনে নেই। মনে থাকবার কথাও নয়। তিনি বেইস বলের ওপর উপন্যাস লেখেন বলে শুনলাম। প্রায় একশটি

www.pathagar.com

উপান্যাস লিখেছেন। তার উপন্যাস লিখবার পদ্ধতিটাও ব্যবসায়িক এবং যান্ত্রিক। দশজনের মত তাঁর বেতনভোগী রাইটার আছে যাদের তিনি গল্পের কাঠামোগুলো দিয়ে দেন, সেই কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে রাইটাররা গল্প তৈরি করে থাকে। মূল লেখক সেগুলো সংশোধন করেন এবং মাঝে মাঝে সংলাপ সংযোজন করেন। এই ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে উপন্যাস লিখে তিনি প্রচুর বিত্তবান হয়েছেন।

নিউ অরলিনসে গিয়েছিলাম দশই অক্টোবর। এখানকার অবস্থানের কোন স্মৃতি আমি ধরে রাখতে পারি নি। তবে পরে এর পরবর্তী অবস্থান ক্ষেত্র বোস্টনের কথা আমার মনে আছে। সেখানে হারবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ডক্টর ইদিলসের সঙ্গে কিছুটা সময় আমি কাটাই। পরে আরবীর অধ্যাপক প্রফেসর হ্যামিল্টন গিভের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

দ্বিতীয়বার নিউইয়র্কে আসি ১৮ই অক্টোবর। ব্রাজিলে বারবারা লির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তার সঙ্গে পত্রালাপ রেখেছিলাম। ব্রাজিল থেকে সে চলে এসেছিল নিউইয়র্কে। আমেরিকায় আসার আগে তাকে আমার নিউইয়র্কে আসার তারিখ এবং সময় জানিয়ে ছিলাম। কিন্তু নিউইয়র্কে এসে তার ঠিকানায় তাকে আমি পাইনি। ফরওয়ার্ডিং এড্রেস পেয়ে সেখানেই চিঠি লিখেছিলাম। প্রত্যাবর্তনের পথে নিউইয়র্কে এসে সে চিঠির উত্তর পেলাম। বারবারা লিখেছে যে সে অনেকদিন পর্যন্ত আমার আগমনের অপেক্ষা করছিল, আমাকে নিয়ে কোথায় কোথায় যাবে তাও ঠিক করে ফেলেছিল। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল এই সম্পর্ক জটিল হয়ে পড়তে পারে, কেননা সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে আমাদের মধ্যে ব্যবধান আছে। সে তাই স্ট্রালজিক নামক একজন শিল্পীকে নিয়ে ভারমন্টে চলে গিয়েছে এবং তাকেই বিয়ে করবে বলে ভাবছে। আমি বারবারার চিঠি পেয়ে অবাক হলাম। কেননা আমাদের সম্পর্ক এমন কিছু ছিল না যাতে জটিলতার সম্ভাবনার দেখা দিতে পারে। নিউইয়র্কে দু'দিন থেকে প্যারিসের উদ্দেশে নিউইয়র্ক ত্যাগ করি।

২২শে অক্টোবর থেকে ২৭শে অক্টোবর পর্যন্ত আমি প্যারিসে ছিলাম। প্যারিসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সঙ্গে দেখা হল। প্যারিসে তিনি ছিলেন ১০৬ নম্বর ক্যুয়ে ব্লেরিওতে আট তলায়। সুন্দর পরিচ্ছন্ন ফ্লাট, নিখুঁতভাবে সাজানো এবং পর্যাপ্ত পরিসরের এক একটি কক্ষ। তাঁর স্ত্রী ফরাসী মহিলা, শিক্ষিতা, অত্যন্ত বুদ্ধিমতি এবং সুগৃহিণী। উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ ও বিচার বিবেচনা আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য ছিল। প্রতিদিনই ওয়ালীউল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। দুপুরে অথবা রাতে এক সঙ্গে খেয়েছি। ২৬শে অক্টোবর তারিখটা আমার বিশেষ করে মনে পড়ে। আমি ওয়ালীউল্লাহ এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বিধবা পত্নী রাজেশ্বরী দত্ত আমরা এক সঙ্গে লাঞ্চ করেছিলাম। খেতে বসে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কথাই বারবার বলছিলাম। রাজেশ্বরী দত্ত শুধু শুনছিলেন, কিছু বলছিলেন না। একবার শুধু বলছিলেন, 'সুধীন যে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে ভাবিনি।' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি প্যারিসে এলেন কেন? কলকাতাই তো থাকতে পারতেন।' রাজেশ্বরী দত্ত ধীরে ধীরে বলছিলেন, 'কলকাতায় সুধীনের স্মৃতি এত প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করত যে আমি অস্থির হয়ে পড়তাম। এডওয়ার্ড শীলসকে সে কথা বলাতে তিনি আমাকে প্যারিসে একটা চাকরি দিলেন। আপাতত সে চাকরি করছি।' সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বলিষ্ঠ প্রাণ সুস্থির, নির্বিকার এবং

www.pathagar.com

জ্ঞানরাজ্যের পরিশ্রমী সাধক। তাই আমার কাছে রাজেশ্বরী দত্তকে অত্যন্ত নিঃস্ব মনে হচ্ছিল। রাজেশ্বরী দত্ত বলেছিলেন, 'সুধীন ছিল নির্ভীক প্রবল মানস চৈতন্যের অধিকারী হিসেবে সে ছিল অহংকারী কিন্তু আবার সে ছিল প্রেমে উষ্ণ এবং মমতাময়। আপনারা ভাবতেই পারবেন না আমি এখন কি অপরিসীম শূন্যতায় বাস করছি।' সেদিন রাজেশ্বরী দত্তের সঙ্গে আলাপকালে আমরা তিনজনে সুধীন দত্তকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করেছিলাম।

প্যারিসে এলেই ক্লেয়ার গলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম। এবারেও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। যখনই দেখা হত ক্লেয়ার বলতেন, "প্যারিস শহরকে হৃদয়ের অন্তর্গত নয়ন দিয়ে দেখতে হবে, বহির্দৃষ্টিতে নয়। এ শহরের স্নায়ুমজ্জায় আমার এবং ইভানের আর্তস্বরগুলো চিরকালের জন্য কম্পমান রয়েছে। তুমি দেখবে অনবরত নতুন, নতুনভাবে এ শহর তোমাকে অভিনন্দিত করছে।"

প্লা দ্য লা কঁকর্দের ঠিক মধ্যবিন্দুতে মিসরের লুক্সর থেকে আনীত দ্বিতীয় রামেসিসের কীর্তিকাহিনী-উৎকীর্ণ ওবেলিসক স্থাপিত হয়েছে। উচ্চতায় পঁচাত্তর ফুট এই সূক্ষ্মশীর্ষ সূচিমুখ প্রস্তরের মিনার প্রাচীন মিসরের স্থাপত্য শিল্পের একটি আশ্চর্য নিদর্শন। এটাই প্যারিসের স্ট্যাচু অব লিবার্টি। আমি কতবার এর পাদদেশে এসে দাঁড়িয়েছি। ইতিহাসের সাক্ষ্যকে নিরীক্ষণ করেছি এবং বিস্মিত হয়েছি এর স্থাপনার কৌশল দেখে। সম্রাট দশম চার্লসকে মিনারটি উপহার দিয়েছিলেন মিসরের খেদিভ ১৮২৯ সালে। কিন্তু দু'শ টন ওজনের বিশাল স্তম্ভটি প্যারিসে এসে পৌঁছায় ১৮৩৩ সালে।

বর্তমান স্তম্ভটি একটি অবিস্মরণীয় সৌন্দর্যের নিদর্শন হিসাবে প্যারিসের শোভার সঙ্গে একাকার হয়ে রয়েছে। বিজয় তোরণ বা আর্ক দ্যা ত্রয়স্ফ থেকে আরম্ভ করে প্লা দ্য কঁকর্দের পৌঁছতে গেলে শাঁজালিজের সুবিন্যস্ত উদ্যান শোভা চোখে পড়ে। এ বাগানকে শিল্পসত্তায় অমর করে রেখেছেন এদুয়ার্দ মনে, তাঁর বিখ্যাত ডিজ্যুনর স্যুর হারব চিত্রের দ্বারা। ডিজ্যুনার মানে মধ্যাহ্নভোজ এবং হারব হচ্ছে ঘাস অর্থাৎ ঘাসের গালিচায় মধাহ্নভোজ। চিত্রটিতে একটি পূর্ণ নগ্নিকা রমণী কয়েকজন পুরুষের সঙ্গে বসে আছে। পুরুষরা কিন্তু শালীনভাবেই আচ্ছাদিত। রমণীর সুন্দর শরীর প্রকৃতির সবুজ ঔদার্যের মধ্যে আলোকসম্পাতে অত্যন্ত মনোরমভাবে উদ্ভাসিত। প্রেমের একটি আগ্রহ যা শরীর এবং হৃদয়কে নিয়ে একটি কলাব্যঞ্জনায় বিমূর্ত তাকেই ফরাসীরা বলে আমোর। মনে তার চিত্রে আমোরের একটি অভিব্যক্তিকে রূপ দিয়েছেন। সৌন্দর্যকে স্বাধীনভাবে গ্রহণ করবার প্রেরণা, প্রেমের অভিপ্রায়কে সজীবতায় প্রকাশিত করা এবং আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ততা ফরাসী জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফরাসী স্বভাবের এ পরিচয় আমি বহুবার পেয়েছি। ফরাসীরা বলে চতুর্দিকে সহস্র শব্দের জন্ম হচ্ছে কিন্তু তার মধ্যেই কেমন যেন এক বিমুগ্ধ নিস্তব্ধতা যেখানে হৃদয় একটি নিষ্পাপ সুরঝংকার শুনতে পায়। সুন্দর মেঘের মত রমণীরা ছায়া সরিয়ে প্রেমের সূর্যে উদভাসিত হয় এবং তাদের শরীরের ছবিতে দীঘির পানি কথা বলে ওঠে। ক্লেয়ার গল প্রায়ই বলতেন, 'প্রেম হচ্ছে আমাদের হৃদয়ের বিনয়, শরীরের উৎকণ্ঠা, বুদ্ধিমানের কৌতুকস্পর্শের অকুতোভয় এবং বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির শব্দ। কত কলাকৌশলে

www.pathagar.com

প্রেমিক তার প্রেমিকাকে গ্রহণ করে চুম্বনের লঘু কম্পনের মতো দুটি দেহের বিমুগ্ধ বিশ্রাম। ইভান তো আমাকে এভাবেই গ্রহণ করেছিল। নির্জন কক্ষে তাঁর প্রেমের কথকতা আমি এখনও শুনতে পাই।'

২৭শে অক্টোবর আমি করাচী ফিরে আসি। করাচীতে প্রফেসর শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে দিলীপকুমার রায়ের একটি চিঠি দেখালেন। দিলীপ রায় তখন পন্ডিচেরীতে থাকতেন না। তিনি একটু দূরে আলাদা আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। চিঠিতে তিনি সোহরাওয়ার্দীর কুশল জানতে চেয়েছেন এবং ভারতে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে যাবেন কিনা জিজ্ঞেস করেছিলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব চিঠির উত্তর পাঠিয়ে দিতে বললেন। আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের অপারগতা জানিয়ে একটি চিঠি দিলাম।

ঢাকায় ফিরে এসে নভেম্বর মাসে বাংলা একাডেমীতে ইউরোপের কবিতার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করি। বক্তৃতায় ইউরোপে কাব্যের গতি প্রকৃতি এবং সেখানকার মানুষের কাব্যপ্রিয়তা সম্পর্কে আলোচনা করি। এ বছরের শেষ তিন মাসে বাংলা একাডেমীতে কয়েকটি সাহিত্যালোচনার আয়োজন করি। প্রথম আলোচনাটা ছিল 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের উপর ঐতিহ্যগত প্রভাব বিষয়ে।' দ্বিতীয় আলোচনাটি ছিল 'আধুনিক নাটক ও মঞ্চের রীতি এবং গঠনপ্রকৃতি' নিয়ে, তৃতীয় আলোচনার বিষয় ছিল শিক্ষা বিজ্ঞানে সাহিত্যের স্থান, চতুর্থ আলোচনার বিষয় ছিল 'লেখক ও সমালোচক', পঞ্চম আলোচনাটি ছিল সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য বিষয়ে এবং সর্বশেষ আলোচনাটি ছিল সাম্প্রতিক কবিতার ধারার ওপর।

এ বছর বিভিন্ন সময়ে বাংলা একাডেমীতে আমি কয়েকটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করি। সে সময় তরুণ শিল্পীরা তাদের চিত্র প্রদর্শনীর জন্য কোন জায়গা পাচ্ছিলেন না, আর্ট স্কুলে প্রদর্শনীর কোন অনুমতি তারা পায়নি। ২২শে ডিসেম্বরে বাংলা একাডেমীর মিলনায়তনে তেরজন শিল্পীর একটি চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। আধুনিক চিত্রকলা সম্পর্কে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এটা সর্বপ্রথম প্রদর্শনী। এছাড়া আমি শিল্পী আমিনুল ইসলাম এবং হামিদুর রহমানের চিত্রপ্রদর্শনীরও আয়োজন করি।

ঢাকায় তখন কোন নাট্যমঞ্চ ছিল না এবং নাটকের কোন আন্দোলনও ছিল না। যে সমস্ত নাটক অভিনীত হত সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। হলগুলোতে এবং কলেজগুলোতে বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠান হত এই মাত্র। নাটকের জন্য একটা প্রেক্ষাপট নির্মাণের উদ্দেশে আমি একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করি। এ উৎসবে ইবনে শাইখ এর 'রক্তপদ্ম' ফররুখ আহমদের 'নওফেল ও হাতেম', আমার 'ইডিপাস' নাটকের বঙ্গানুবাদ, সিকেন্দার আবু জাফরের 'শকুন্ত উপাখ্যান' এবং মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' অভিনীত হয়। নাট্যোৎসবটি ঢাকায় নাট্যমহলে বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। নাটকগুলো বাংলা একাডেমীর ফরমায়েশে লিখিত হয়েছিল এবং মঞ্চায়নের জন্যও একাডেমী অর্থ সাহায্য করেছিল। একাডেমীর সঙ্গে সহাযোগিতা করে আমেরিকান কনস্যুলেট এবং বৃটিশ কাউন্সিল তাদের দেশ দুটি থেকে দুটি নাট্য দল এনেছিলেন।

www.pathagar.com

'ইডিপাস' নাটকটি লেখার পিছনে একটি ইতিহাস আছে। ঢাকায় বজলুল করিম 'ড্রামা সার্কেল' বলে একটি নাট্যসংস্থা গঠন করেছিলেন। বজলুল করিমের বিশেষ অনুরোধে আমি তাকে একটি বিদেশী নাটক অনুবাদ করে দিতে স্বীকৃত হই। তখন আমি গ্রীক সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করছিলাম এবং বাংলা একাডেমীর অনুবাদ পরিকল্পনার মধ্যে হোমারের ইলিয়াড এবং ওডিসি অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। গ্রীক ট্রাজেডিতে মানুষের অপরিসীম হতাশা এবং অসহায়তা চিত্রিত হয়েছে। পূর্ব নির্ধারিতা বিশ্ববিধানের সংকল্পাশ্রয়ী যে নিদারুণ যন্ত্রণা এবং অব্যক্ত চিত্তদাহন তার তুলনা পৃথিবীর কোন ভাষার সাহিত্যে নেই। একদিকে নির্মম অপরিবর্তনীয় বিশ্ববিধান, অন্যদিকে স্বাধীন ইচ্ছার পদক্ষেপ, এই দুই শক্তির মধ্যে মানুষের বিনিঃশেষ অবলুপ্তি গ্রীক ট্রাজেডিকে একই সঙ্গে নিষ্ঠুর ও মহিমান্বিত করেছে। বাঙ্গালী পাঠকের কাছে গ্রীক ট্রাজেডির স্বরূপকে উপস্থিত করবার ইচ্ছা নিয়েই 'ইডিপাস' নাটকের অনুবাদ করেছিলাম। ইঃ এফ ওয়াটলিঙ্গের ইংরেজী অনুবাদ অনুসরণ করেই বাংলা নাটকটি নির্মাণ করেছিলাম। এটি যথাযথ অনুবাদ ছিল না অথবা ইংরেজী অনুবাদের শব্দগত অনুসৃতিও ছিল না। আমার উদ্দেশ্য ছিল, সোফোক্লিসের ভাবানুষঙ্গে একটি পাঠযোগ্য গ্রীক নাটক নির্মাণ করা। যখন নাটকটি অনুবাদ করছিলাম তখন শ্রোতা ছিল কখনও ফররুখ আহমদ, কখনও মুনীর চৌধুরী। অনুবাদ করে এদের শোনাতাম এবং এরা উভয়েই আমাকে উৎসাহিত করত।

স্পেনের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সালভাদর মাদারিয়াগা এ বছরের শেষের দিকে পৃথিবী ভ্রমণে ছিলেন। এই ভ্রমণের এক পর্যায়ে তিনি যখন ফিলিপাইনে ছিলেন তখন আমি তাকে পাকিস্তানে আসার আমন্ত্রণ জানাই। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাকে ভিসা দিতে অস্বীকার করে। তখন ডক্টর মালিক ছিলেন ফিলিপাইনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। তাকে আমি এ ব্যাপারে চিঠি লিখি। মাদারিয়াগার মত বিশ্ববিখ্যাত মহান ব্যক্তি পাকিস্তানে আসার ভিসা পাবেন না এটা কি রকম কথা! তখন ডক্টর মালিক বিরাট ঝুঁকি নিয়ে তাকে ভিসা প্রদান করেন। মাদারিয়াগা প্রথম করাচী আসেন। আমি করাচীতে গিয়ে তার জন্য কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। করাচীর পর্ব শেষ করে তিনি ঢাকায় আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেন এবং বাংলা একাডেমীতে ১৯শে ডিসেম্বর 'আধুনিক মানব ও মানবিকতা' সম্পর্কে একটি ভাষণ দেন। ঢাকা শহরের বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক এবং অধ্যাপকগণ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিছু সংবাদপত্রের প্রতিনিধি শাহবাগ হোটেলে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। উক্ত সাক্ষাৎকারের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। নানা কথার মাঝখানে মাদারিয়াগা বলেছিলেন যে ইসলামী বিশ্ব যদি একত্রিত হতে পারে তবে বর্তমান পৃথিবীতে একটি শক্তিশালী তৃতীয় শক্তি হিসাবে পরিগণিত হতে পারবে। যেখানে বর্তমানে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী শক্তি এবং অন্য একটি সমাজতান্ত্রিক শক্তি বিদ্যমান সেখানে তৃতীয় শক্তি হিসাবে ইসলামী শক্তি একটি ভারসাম্য সৃষ্টি করবে এবং সমগ্র বিশ্বে একটি শান্তি আনয়নে সমর্থ হবে। মাদারিয়েগার এই বিশ্বাস এখনও কার্যকর হয়নি। মুসলমান বিশ্বের মধ্যে বিরোধ-বিসংবাদ সর্বদাই লেগে আছে এবং মুসলমান দেশগুলো পাশ্চাত্য শক্তিগুলির কোন না কোনটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেঁচে আছে। যদি মাদারিয়েগার বিশ্বাসটি কার্যে পরিণত হতে পারত তাহলে আমরা একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম

www.pathagar.com

দেখতাম। মাদারিয়েগার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। এর কয় বছর পর তাঁর মৃত্যু ঘটে। তিনি স্পেনেও ফিরে যেতে পারেন নি। তিনি এবং পিকাসো উভয়ই ফ্রাঙ্কোর পতনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং উভয়ই বিশেষ স্বেচ্ছা নির্বাসনে ছিলেন–মাদারিয়েগা ছিলেন অক্সফোর্ডে এবং পিকাসো ছিলেন প্যারিসে।

আমার জীবনে ১৯৬১ সালটি অত্যন্ত বেশী কর্মমুখর ছিল এবং আনন্দ উৎসবের মধ্যে ছিল। এই আনন্দ উৎসবের মধ্যে একটিমাত্র অস্বস্তি ও বেদনার ঘটনা ছিল আমার স্ত্রীর অসুস্থতা। তিনি নিদ্রাহীনতায় ভুগছিলেন এবং অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে সময় নির্বাহ করতেন। আমি তাঁর দিকে তখন বিশেষ লক্ষ্য দিতে পারি নি।

॥২৯॥

আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে আদরার গল্প বলতেন, কখনো কখনো বাগনানের। আদরা ছিল বিহারে আর বাগনান হাওড়ায়, পশ্চিমবঙ্গে; তিনি তাঁর শৈশবে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন বিহারের আদরায়। তাঁর মামা সেখানকার রেলওয়ের গার্ড ছিলেন। সেখানকার খেলাধুলার কথা, স্বাধীন স্ফূর্তির কথা এবং প্রকৃতির বদান্যতার কথা তাঁর স্মৃতিতে ভাস্বর ছিল। তখন তাঁর বয়স হবে ন' দশ বছর। তিনি মাহমুদ নামে একটি বিহারী ছেলের কথা বলতেন যে তাঁর খেলার সঙ্গী ছিল। ছেলেটি ছিল ছ' সাত বছরের এবং খুব আদুরে। আদুরে প্রকৃতির বর্ণনাও আমি আমার স্ত্রীর মুখে শুনেছি। সেখানে শীত নামে প্রচণ্ডভাবে, বরফ পড়ে না, কিন্তু কনকনে শীতে হাড় পর্যন্ত যেন জমে যায়। যে বাসায় তারা ছিলেন, সে বাসার নিকটে একটি শান্ত পুকুর ছিল যে পুকুরে অনেক হাঁস খেলা করতো। বর্ণনা এর বেশী নয়, কিন্তু আদরার এইটুকু বর্ণনার মধ্য দিয়ে একই বিষয় উন্মোচিত হতো তা হচ্ছে স্বাধীনতা। বাল্যকালে ছেলেমেয়েরা স্বাধীনভাবে খেলাধুলা করে আবার পুকুরে হাঁস স্বাধীনভাবে ভেসে বেড়ায়। বিবাহের পর একটি রমণীর যে বন্ধন দশা সে বন্ধন দশার মধ্যে শৈশবের স্বাধীনতার স্মৃতিটুকু খুবই মধুর। আমার স্ত্রী এই মধুর স্মৃতিটুকু বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন।

আদরার কথা আমার হঠাৎ মনে পড়লো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে। তিনি একজন বিহারী ব্যবসায়ী, বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। এক হোটেলে দেখা হয়েছিল কয়েক দিন আগে। পরিচয়সূত্রে জানতে পারলাম যে তিনিই মাহমুদ, অতি শৈশবে আমার স্ত্রীর খেলার সঙ্গী ছিলেন। কিভাবে কখনো পৃথিবীতে যে স্মৃতি বৃত্তটা সম্পূর্ণ হয় তা কেউ বলতে পারে না। মাহমুদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় আমি আমার স্ত্রীর স্মৃতির বৃত্তটাকে পূর্ণ হতে দেখলাম। মাহমুদ আদরার কথা বললেন, আমার মামা শ্বশুরের কথা বললেন যিনি তাকে স্নেহ করতেন। আমার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করলেন, যখন শুনলেন তিনি আর নেই তখন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তাঁর নাম মীনা ছিল না?' আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ'। এই একটি কথায় একটি অতীত হঠাৎ যেন সজীব হয়ে উঠলো।

আমার স্ত্রীর কাছে হাওড়া এলাকায় বাগনানের কথাও শুনেছি। তার বাবা অর্থাৎ আমার শ্বশুর বাগনান থানার ওসি ছিলেন। বাগনানে অবশ্য আমিও গিয়েছি। বাগনানের স্মৃতির মধ্যে পিকনিক করার কথাটা তিনি বারবার বলতেন। কি একটা নদীর কথা বলতেন যার তীরে

www.pathagar.com

তারা পিকনিক করতেন। নদীটির নাম বোধ হয় মহানন্দা। বাগনানে বাসন্তী বলে একটি হিন্দু মেয়ের কথাও বলতেন, যে তার সখী ছিল। বাগনানের গল্পের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে বসবাসের একটি ইঙ্গিত পেতাম। আমার স্ত্রী নানা রকমের রান্না জানতেন তার অনেকগুলোই ছিল হিন্দু গৃহের রান্না। বাগনানে অবস্থানকালে তিনি বাসন্তীদের বাড়িতে এসব রান্না শিখেছিলেন সেসব গল্প বলতেন। এভাবে হিন্দুদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সঙ্গে তার একটি ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। বাগনানে সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং জমিদার শ্রেণীর যারা ছিলেন তার শৈশব ও কৈশোরে হিন্দু? মাত্র মুসলমান অফিসার ছিলেন, একজন হলেন থানার ওসি এবং আরেকজন আবগারী অফিসার। এক কথায় বলা যায় আমার স্ত্রী তার শৈশব ও কৈশোরে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার কাছাকাছি থেকে মানুষ হয়ে উঠেছিলেন।

বিয়ের আগে তিনি সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। এই স্কুলের অনেক কাহিনী তার স্মৃতিতে ছিল। তার একটি ঘটনা হচ্ছে স্কুলের বার্ষিক নাট্যাভিনয়। ওমর খৈয়াম নামে একটি নৃত্যনাট্যে আমার স্ত্রী অংশ নিয়েছিলেন। তিনি সেজেছিলেন সাকী। মিস জ্যাকব নামক একজন শিক্ষয়িত্রী নাট্যাভিনয়ে মেয়েদের সাজসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর কথাও আমার স্ত্রী বলতেন। মিস জ্যাকব তাকে সাকী সাজিয়ে তার লাবণ্যময়ী রূপের প্রশংসা করেছিলেন। এই গল্প আমার স্ত্রীর মুখে বহুবার শুনেছি। স্কুল জীবনের যে কয়টি স্মৃতি তাঁর মনে স্পষ্ট ছিল তার মধ্যে নাট্যাভিনয়টি প্রধান। আমি বুঝতে পারতাম যে, এসব স্মৃতি লালন করে তিনি কিশোরী বয়সের আনন্দের মধ্যে বাস করতে চাচ্ছিলেন। বিবাহের পর শৈশব কৈশোরের আনন্দ ও স্বাধীনতা থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। এই বিচ্ছিন্নতার ব্যথা সর্বদাই তাঁর মনের মধ্যে ছিল।

বিয়ের পর তাঁকে নিয়ে যখন ঢাকায় আসি তখন তাঁর জিনিসপত্রের মধ্যে একটি হারমোনিয়াম ছিল। এই হারমোনিয়াম নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কোন আলোচনা হয় নি। তাঁকে আমি কখনও গান গাইতে বলি নি।

তিনি আমাদের বাড়িতে প্রথমে একটি নতুন পরিবেশে পড়লেন, যেখানে বাড়ির সকলে প্রতিদিন খুব সকালে উঠে ফজরের নামাজ পড়ে গৃহকর্মে হাত দিত। আবার বিকেল বেলা আছরের নামাজের পর বাবা সকলকে নিয়ে বসতেন ধর্মকথা শোনাতে। অবশ্য বাবা যেভাবে ধর্মের কথা বলতেন সেটা সবাই উপভোগ করতো। তিনি গল্প বলতেন, আবার কখনও কখনও ফার্সী কাব্য পাঠ করে শোনাতেন। বাবার বলা গল্পগুলো অনেকগুলোই ছিল কোরআন শরীফের উপাখ্যান অথবা ফারসী কাব্যকাহিনী। তাঁর বলার ভঙ্গীটা ছিল মধুর। তিনি হযরত ইব্রাহীমের বিশ্বাসের কথা বলতেন এবং যেভাবে তিনি তাঁর বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন তার বিবরণ তিনি কোরআন শরীফ থেকে দিতেন। ইব্রাহীম তাঁর পিতা আজরকে বলেছিলেন, 'আপনি কি মূর্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।' ইব্রাহিম আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা দেখে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হন। রাতের অন্ধকার যখন তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিলো তখন তিনি আকাশের একটি নক্ষত্র দেখে বলেছিলেন, 'ঐটি আমার

www.pathagar.com

প্রতিপালক।' কিন্তু যখন নক্ষত্রটি অস্তমিত হল তখন তিনি বললেন, যা অস্তমিত হয় তাতো আমার প্রতিপালক হতে পারে না।' অতঃপর যখন তিনি চন্দ্রকে উদিত হতে দেখলেন তখন বললেন, 'এটি আমার প্রতিপালক।' যখন চন্দ্র অস্তমিত হল তখন তিনি বললেন, 'এটি আমার প্রতিপালক কখনো হতে পারে না। আমার প্রতিপালক আমাকে স ৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি তো তাঁকে খুঁজে পাবো না।' অতঃপর যখন তিনি সূর্যকে উদিত হতে দেখলেন, তিনি বললেন, এটি নিশ্চয়ই আমার মহান প্রতিপালক, কেননা এটি বিরাট দীপ্ত এবং মহান।' কিন্তু যখন সূর্য অস্তমিত হলো তখন ইব্রাহীম বুঝতে পারলেন যে সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্র যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁর মহান প্রতিপালক। তখন ইব্রাহীম বললেন, যিনি আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমার প্রভু ঃ তাঁর নিকটে আমি প্রত্যাবর্তন করব।'

বাবা এভাবে মূলকাহিনী বর্ণনাকে অনুসরণ করে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করতেন এবং আমরা সবাই তন্ময় হয়ে তা শ্রবণ করতাম, আমার স্ত্রীর কাছে এই জীবনটা ছিল নতুন। কিন্তু ক্রমশঃ তিনি এই জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন। কিছুদিন পর হঠাৎ আমার চোখে পড়লো যে ঘরের জিনিসপত্রের মধ্যে হারমোনিয়ামটি নেই। আমি তাকে হারমোনিয়ামের কথা জিজ্ঞেস করলাম, তিনি একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তুমি তো আগে কখনই হারমোনিয়ামের কথা জিজ্ঞেস কর নি, আমি যে গান গাইতাম তাতো তুমি জানো না, এখন আবার হারমোনিয়ামের কথা কেন?'

আমি লজ্জিত হয়ে আমতা আমতাভাবে কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'যে জিনিসের প্রয়োজন নেই তা রেখে লাভ কি?' এভাবে আমার স্ত্রী ক্রমশঃ পিতামাতার সঙ্গে তাঁর যে জীবন গড়ে উঠেছিল সে জীবনটি ভুলবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কতকগুলো উৎসব যেগুলো তিনি তার পিতৃগৃহে পালন করতেন সে সব উৎসব তিনি আমাদের গৃহেও পালন করেছেন। সেগুলো কারো ভাল লাগলো কি লাগলো না তা নিয়ে তিনি চিন্তা করেন নি। তিনি ইংরেজী নববর্ষ পালন করতেন। নববর্ষের দিন ভাল রান্নাবান্না করে সকলকে ভাল করে খাওয়াতেন এবং কেক কেটে বিতরণ করতেন। আমাদের বাড়িতে ইংরেজী নববর্ষ কখনো উদযাপিত হতো না। বাবা বলতেন, 'এটা নাসারাদের প্রথা এটি উদযাপন করা ঠিক নয়। বলতেন বটে তবে আমার স্ত্রীর আনুষ্ঠানিকতায় বাধা দিতেন না। তিনি তাঁর প্রস্তুত খাবার খেতেন। তেমনি আবার আমাদের বাড়িতে কোন দিন কারো জন্মদিন উদযাপিত হতো না। শুধু আমার জন্মদিন ম্যাট্রিক পাস করার পর থেকে আমি বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে নিয়মিত উদযাপন করে আসছিলাম। আমার স্ত্রী আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠানটি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর জন্মদিন তিনি কোন দিন উদযাপন করতে দেন নি, বলতেন, 'তোমার জন্মদিনই আমার জন্মদিন, আলাদাভাবে পালন করার দরকার কি?'

আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম। প্রথমত এটা আমার স্ত্রীর মনঃপূত ছিল না, কিন্তু যখন আলাদা হলাম তখন তিনি আমার মাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করলেন। মা রাজী হলেন না। দু'এক রাত্রি কখনও কখনও থেকে গেছেন

www.pathagar.com

বটে, কিন্তু রাত্রিতে তার ভাল ঘুম হয় নি। বিশুদ্ধতার প্রতি তাঁর লক্ষ্য ছিল অসম্ভব বেশি। ন্যায় পথে উপার্জন করা অর্থের বাইরে অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করার কথা তিনি কল্পনাও করতে পারতেন না। তার ফলে স্বামীর গৃহের বাইরে অন্য কারো গৃহে অবস্থান তার জন্য অসম্ভব ছিল। আমার গৃহেও তিনি থাকতে চাইতেন না, কেননা আমার গৃহের আসবাবপত্র আমার শ্বশুরের দেয়া ছিল। তিনি পুলিশের চাকরি করতেন বলে আমার মা আমার শ্বশুরের দেয়া কোন জিনিসপত্র স্পর্শ করতে চাইতেন না। এর ফলে আমার স্ত্রীর মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। কিন্তু তিনি নিজেকে শাসন করে আমার মার সন্তুষ্টির জন্য তার পিতার দেয়া জিনিসপত্র বিলিয়ে দেন এবং আমার উপার্জনের টাকায় নতুনভাবে আসবাবপত্র তৈরি করেন। আমাদের পরিবারের সকলেই ছিলেন সুফী মতাদর্শে বিশ্বাসী–বাবা মা প্রত্যেকেই। আমার স্ত্রীও এই আদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করেন। আমাদের পরিবারের যিনি পীর ছিলেন তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার, ধর্মপ্রাণ এবং মমতাময় পুরুষ। মুরীদ হওয়ার পর তাঁর স্নেহস্পর্শে আমার স্ত্রী তার বেদনাকে ভুলবার চেষ্টা করেছিলেন। একদিন তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমার বাবা পুলিশে চাকরি করেন বলে তার দেয়া জিনিসপত্র আমার জন্য কি হারাম?' পীর সাহেব উত্তর করেছিলেন, 'মা, পিতামাতার মনে কখনও কষ্ট দিতে নেই, তুমি যা কিছু কর না কেন তোমার পিতামাতা কষ্ট পান এমন কাজ কখনও কর না।'

আমি যখন করাচী যাই তখন করাচীতে আমার স্ত্রী একটি সুন্দর সংসার গড়ে তোলেন। সেখানে তিনি তাঁর শৈশব এবং কৈশোরের স্বাধীনতাকে নতুন করে ফিরে পেয়েছিলেন। আমরা প্রায়ই ক্লিফটনের সমুদ্র তীরে যেতাম, নৌকো করে মনোরা দ্বীপে যেতাম এবং মাসে একবার কি দুবার বাড়ির বাইরে রেঁস্তরায় খেতাম। পরিমার্জিত এবং স্বচ্ছ স্বাধীনতার মধ্যে আমার স্ত্রীর করাচীর দিনগুলি কেটেছিল। তিনি নিজেও নাজিমাবাদে একটি মহিলা ক্লাবের সদস্যা হয়েছিলেন এবং সপ্তাহে এক দিন নিয়মিতভাবে ক্লাবে যেতেন। নাজিমাবাদ এলাকায় জাস্টিজ লারী নামক এক ভদ্রলোকের স্ত্রী একটি মহিলা ক্লাব গড়ে তুলেছিলেন। আমার স্ত্রী তার সদস্যা হয়েছিলেন। যে বাড়িতে ক্লাবটি বসতো সেখানে পুরুষদের ক্লাব ছিল। সেই পুরুষদের ক্লাব সপ্তাহে যেদিন বন্ধ থাকতো সেদিন সেখানে মহিলাদের ক্লাব বসতো। সদস্যাগণ নিজ নিজ বাড়ি থেকে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী তৈরি করে নিয়ে যেতেন। আমার স্ত্রীও মাঝেমাঝে নিয়ে যেতেন। করাচীতে অবস্থানকালে তিনি তার ধর্মের আচরণগুলি নিয়মিতভাবে পালন করতেন, কোরআন শরীফ পাঠ করতেন, আবার বাইরের উৎসব আনন্দতেও যোগ দিতেন। করাচীতে তার একটিমাত্র অভিযোগ ছিল আমার বিরুদ্ধে সেটি হচ্ছে আমার বিদেশ ভ্রমণ। এই বিদেশ ভ্রমণ নিয়ে তার সঙ্গে কখনো কখনো কথা কাটাকাটি হয়েছে। তিনি তার ক্লাবে অনেকের কাছে শুনতেন যে তাদের স্বামীরা একাকী বিদেশ যায় না, মাঝে মাঝে স্ত্রীদেরও সঙ্গে নিয়ে যায়। আমার স্ত্রী আশা করতেন আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। কিন্তু আমি তো নিজের টাকায় বিদেশ যেতাম না, তাছাড়া নিজের টাকা ছিলও না। সুতরাং স্ত্রীকে নিয়ে যেতে পারতাম না। কিন্তু তার মনে কোনও বিশ্বাস আমি উ ৎপাদন করতে পারি নি। এ ধারণা তার মনে বদ্ধমূল ছিল যে আমি ইচ্ছা করেই তাঁকে নিয়ে যাই না। এর মধ্যে একবার এক ভদ্রমহিলা এসে তাকে সাবধান করে দিয়ে গিয়েছিলেন যে

www.pathagar.com

বিদেশে সম্ভবত আমার রমণীর প্রতি আকর্ষণ আছে যে কারণে আমি ঘনঘন বিদেশে যাই। আমিও তার কাছে বিদেশের কোনও কথা লুকাই নি। যার ফলে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে আমার স্ত্রী ধরেই নিয়েছিলেন যে বিদেশে আমার কোন বান্ধবী আছে যার সাথে মিলিত হবার জন্য প্রতি বছর আমি বিদেশে গিয়ে থাকি।

করাচী থেকে ঢাকায় আসার পর আবার নতুন করে আমার স্ত্রী সংসার পাতলেন। তখন তিনি অনেকটা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। ঢাকায় বাংলা একাডেমীর কাজে যোগ দেবার অল্পদিন পরেই আমি আমেরিকায় যাই। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর আমি আমার স্ত্রীকে পূর্ণ সুস্থাবস্থায় আর কখনো পাই নি। প্রায় রাত্রি তার ঘুম হতো না। সারারাত জেগে জিনিসপত্র গোছাতেন, বই পড়তেন এবং গল্প লিখতেন। বিবাহের পূর্বে তার গল্প লেখার অভ্যাস ছিল। নতুন করে আবার রাত জাগাকালীন সময়ে তিনি গল্প লেখা আরম্ভ করলেন। তার এই সমস্ত গল্প নিয়ে দুটি গল্পের বই প্রকাশিত হয়েছে–একটির নাম 'পূর্বাপর' আরেকটির নাম 'অশান্ত মন শান্ত হলো'। প্রথম গ্রন্থটি বাংলা একাডেমীতে থাকা অবস্থায় নওরোজ কিতাবিস্তানের মাধ্যমে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করি। এ বইটি ছাপা হবার পর পর আমার স্ত্রীর কিছুটা স্থিতিশীলতা ফিরে এলো। এ সময় ডাঃ নন্দী নামক একজন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আমার স্ত্রী ছিলেন। ডাঃ নন্দীর চিকিৎসায় আমার স্ত্রী অনেকটা স্বস্তির মধ্যে ফিরে আসেন। ডাঃ নন্দী শুধু ওষুধই দিতেন না, আমাদের বাড়িতে এসে অনেকক্ষণ থাকতেন, গল্প-গুজব করতেন। এর ফলে একটি অন্তরঙ্গতার মধ্যে তিনি চলে আসেন। কিন্তু মানসিক স্বস্তি কিছুটা ফিরে এলেও অন্য একটি রোগ আমার স্ত্রীকে আক্রমণ করে যা থেকে আজীবন মুক্ত হতে পারেন নি, সেটা ছিল ডায়াবেটিস।

করাচীর জীবন ফেলে রেখে ঢাকার জীবন যখন নির্মাণ করছিলাম তখন আমার স্ত্রীর অসুস্থতা আমাদের জীবনে একটি বেদনার সৃষ্টি করেছিল। যার উপশমের জন্য সর্ব মুহূর্তেই চেষ্টা করেছি কিন্তু উপশম ঘটে নি। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ফলে আবার তাঁর রাত্রের নিদ্রা নষ্ট হতে লাগলো এবং রাত্রি জাগরণের ব্যাধি আবার নতুন করে দেখা দিল। নিজের শরীরের সকল গ্লানি নিয়ে কিন্তু তিনি সংসার চালিয়ে গেছেন এবং পরিবারের সকলকে সন্তুষ্ট রেখে আনন্দিত প্রহর নির্মাণের চেষ্টা করেছেন।

॥৩০॥

পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবধান ছিল মূলতঃ ভাষাগত এবং এই ভাষাকে উপলক্ষ করেই অন্য ব্যবধানগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই ব্যবধান দূর করার সরকারী যে পদ্ধতি ছিল তা ছিল ক্তিহীন বর্বরতামাত্র। আমি 'বর্বরতা' শব্দটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করলাম। কারণ তাদের ণকে অন্য কোনও শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। পাকিস্তানে ভাষাগত বৈচিত্র্য ছিল াগুলো নিজস্ব ঐতিহ্য নিয়ে এবং বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গী নিয়ে সুস্পষ্ট ছিল। এভাবে স্তানে তখন সিন্ধী, পশতু, উর্দু, এবং বাংলা– এই চারটি ভাষাকেই চেয়েছিলাম। হুই বলে আরো দুটি ভাষা ছিল। কিন্তু সে দুটি ছিল উচ্চারিত ভাষা, লিখিত ' কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই চেষ্টা করছিলেন সমগ্র দেশে ভাষাগত ব্যবধান দূর

www.pathagar.com

করে একটি একক ভাষাগত সিদ্ধান্তে চলে আসতে। এই অযৌক্তিক চিন্তার ফলে পাকিস্তানে ভাষাগত বিরোধ তৈরি হল এবং অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যবধান প্রবল হতে লাগলো। আইয়ুব খানের আমলে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল তাকে আমরা শরীফ কমিশন বলে থাকি। ভাষার ক্ষেত্রে এই শরীফ কমিশনের মন্তব্য ছিল যে পাকিস্তানে একটি মাত্র ভাষা গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে হবে। ভাষাক্ষেত্রে এবং আদর্শের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে একটি একক ভাষা রূপ লাভ করতে পারে। কমিশনের এই বিবেচনাটি কার্যগতভাবে অসম্ভব ভ্রান্ত ছিল। কেননা বহু ভাষার দেশকে সকল ভাষায় বিকাশের মাধ্যমেই সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা যায়। পাকিস্তানে যে কটি ভাষা ছিল সে কটি ভাষার একীকরণ করা ভাষাগত দিক থেকে অবাস্তব ছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালের ২৪শে থেকে ২৬শে মার্চ আমি বাংলা ও উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের একটি ব্যাপক আলোচনা সভার আয়োজন করি। এই সেমিনারটি বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে এবং প্রাদেশিক জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল আজম খান সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর মাহমুদ হোসেন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। আমি সম্মেলনের কার্যকরী সংসদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি এবং অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাই।

বাংলা এবং উর্দু সাহিত্যের মধ্যে বিষয়গত মৌল সাদৃশ্য এবং প্রকৃতিগত বিভিন্নতা সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্য এবং লেখকদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধির একটি ভিত্তি স্থাপন, সাহিত্যে বস্তুগত ও শৈলীগত প্রভাবের পারস্পরিক গুণ গ্রহণ, ভবিষ্যতে আরও গভীর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বৃদ্ধির পন্থা নির্ধারণ, সমসাময়িক সাহিত্যের অগ্রগতি, পাঠক ও শিল্প প্রসঙ্গে লেখকের স্থান ও পাশ্চাত্য ও ইসলামী সাহিত্যের ঐতিহ্যের প্রভাব, শিক্ষাক্ষেত্রে সাহিত্যের গুরুত্ব এবং অন্যান্য শিল্প প্রসঙ্গে সাহিত্যের মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা হয়। সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন ব্যতীতও ছয়টি অধিবেশনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, জনাব আবুল ফজল, ডক্টর আবুল লায়েস সিদ্দিকী, অধ্যক্ষ হামিদ আহমদ খান, ডক্টর ইবাদত ব্রেলভী, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, ডক্টর আহমদ হাসান দানী, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, ডক্টর এ বি এম হাবিবুল্লাহ, অধ্যক্ষ আবদুল হাই, জনাব গোলাম আব্বাস, জনাব সাহেদ আহমদ দেহলভী, জনাব রাজেকুল খায়েরী, অধ্যাপক হানীফ, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ, জনাব হাসান হাফিজুর রহমান, জনাব বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, জনাব জেড এ তামান্নাই, জনাব মেহেদী আলী সেলজুক, জনাব রফিকুল ইসলাম ও জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান অংশগ্রহণ করেন।

পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ৫ অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ এবং প্রবন্ধগুলিকে কেন্দ্র করে প্রাণবন্ত আলোচনা অনু গভর্নর আজম খান সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন যে, বাংলা এবং উর্দুর উন্নয়নের উপর পাকিস্তানের সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। তিনি দুটি ভাষাকে দেশের তুলনা করে বলেন, দুটি ভাষার যে কোন একটি পিছিয়ে পড়ে থাকলে দেশ

www.pathagar.com

বাধ্য। ডক্টর মাহমুদ হাসান সভাপতির ভাষণে দুটি ভাষার মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান ও ভাব বিনিময়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আমি প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বলি সাহিত্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য বাংলা এবং উর্দুর মধ্যে বিষয়গত যে মৌল সাদৃশ্য রয়েছে এবং প্রকৃতিগত যে সমস্ত বিভিন্নতা আছে তা আমাদের অনুধাবন করতে হবে এবং দুটি ভাষার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে পারলে আমাদের কাজ অনেক সহজ হবে। পাকিস্তানে এ জাতীয় সম্মেলন এই প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটি বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়।

ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় পিইএন-এর উদ্যোগে এশীয় লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান পিইএন-এর পক্ষে সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম আমি এবং ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন। ভারত থেকে এসেছিলেন আমার বন্ধু প্রভাকর পাধ্যায় এবং বিখ্যাত লেখক খশবন্ত সিং, জাপান থেকে এসেছিলেন আমার পুরনো পরিচিত বন্ধু জুন তাকামি, ইন্দোনেশিয়া থেকে এসেছিলেন তকদীর আলী জাবানা, সিংহল থেকে এসেছিলেন বিখ্যাত সিংহলী লেখক ডক্টর শরৎচন্দ্র; অন্যান্য যে সমস্ত দেশের প্রতিনিধি ছিলেন সেসব দেশ হচ্ছে–হংকং, কোরিয়া, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম। এখনো এঁদের কয়েকজন জীবিত আছেন। যেমন ইন্দোনেশিয়ার তকদীর, ভারতের খুশবন্ত সিং এবং সিংহলের শরৎচন্দ্র। ম্যানিলায় কনফারেন্সে যুক্তরাষ্ট্র থেকে একজন অজ্ঞাতনামা লেখক এসেছিলেন। সম্মেলনে তিনি একটি বক্তৃতা করেছিলেন। বক্তৃতার এক পর্যায়ে বলেছিলেন, "পৃথিবী হচ্ছে খেলার মাঠ, আমরা সবাই সেখানে খেলে চলেছি, আমরা প্রত্যেকেই একটি করে বল বহন করে চলেছি।"

খুশবন্ত সিং তখন উঠে দাঁড়িয়ে কৌতুক করে বলেছিলেন, "বক্তা ভুল বলেছেন, আমরা একটি করে বল বহন করি না, দুটি করে করি।" খুশবন্ত সিং এর কথায় সমস্ত সভা হাস্যরোলে ফেটে পড়েছিল এবং আমেরিকান ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে বসে পড়েছিলেন। সংবাদপত্রের লোকেরা খুশবন্ত সিংকে নানা প্রশ্নে বিব্রত করতে চেয়েছিল কিন্তু পারে নি। একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি কি কি খেয়ে থাকেন?" খুশবন্ত সিং পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, 'কি খাই না তাই জিজ্ঞাসা করুন।' সাংবাদিক তখন বললেন, 'আচ্ছা, কি খান না তাই বলুন।' তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি একমাত্র ক্যাথলিকদের খাই না, আর সব কিছুই খাই।' স্মরণে রাখতে হবে ফিলিপাইন ক্যাথলিকদের দেশ।

ম্যানিলায় খুবই আনন্দে সময় কেটেছিল। সিংহলের শরৎচন্দ্র, আমি এবং আমার বন্ধু ফ্রাংকী– আমরা তিনজন অবসর পেলেই ম্যানিলা শহরের বিভিন্ন এলাকা দেখতে বেরুতাম। ফ্রাংকী ছিল কনফারেন্সের উদ্যোক্তা। তার পুরো নাম ফ্রান্সিসকো সিওনীল হোজে। ফিলিপিনের আর একজন আমাদের সঙ্গ দিয়েছিল তার নাম ইওআন টুভেরা। টুভেরা এক রাতে আমাদের নিয়ে গিয়েছিল এক নাইটক্লাবে, যেখানে নৃত্যারতা একটি রমণী নৃত্য করতে করতে শেষ মুহূর্তে দর্শকদের সিশ এবং চীৎকার ধ্বনির মধ্যে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে নৃত্য শেষ করেছিল। প্যারিসে নাইটক্লাবে বস্ত্র উন্মোচনের ঘটনা অহরহই ঘটে থাকে। কিন্তু সেখানে অশ্লীল ভঙ্গী চোখে পড়ে না। কিন্তু ম্যানিলার দৃশ্যটি ছিল পুরোপুরিই অশ্লীল।

www.pathagar.com

ম্যানিলা শহরের জনগোষ্ঠীর সীমানার বাইরে নির্ধারিত স্থানে পতিতালয় ছিল। সে এলাকাতেও টুভেরার সঙ্গে আমরা ঘুরে এসেছিলাম। যে অর্থে পতিতালয়গুলো চিহ্নিত থাকার কথা ম্যানিলার পতিতালয় সেভাবে চিহ্নিত ছিল না। পরিষ্কার, ছিমছাম একই গঠনের অনেকগুলি বাড়ি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কোলাহল নেই, কিছুটা দূরে অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বুঝবার একেবারেই উপায় নেই যে এগুলো খারাপ জায়গা। আমরা শুধু পথ দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে এলাকাটি ঘুরে এসেছিলাম। টুভেরার কাছে শুনলাম যে অনেক বড় ঘরের মেয়ে কিছু কিছু সরকারী কার্মকর্তার স্ত্রী এবং কলেজের ছাত্রী এরাও মাঝে মাঝে এখানে ঘর ভাড়া নিয়ে উপার্জন করে। মুখতার লুবিসের একটি উপন্যাসে জাকার্তা শহরের এ ধরনের জীবনের উল্লেখ আছে। মুখতারের উপন্যাসের নাম 'জাকার্তায় গোধূলি, মূল নাম 'টোয়াই লাইট ইন জাকার্তা'। আমরা হোটেল ফিলিপিনোতে ছিলাম। সেখানে হোটেলের বয়রা এই সমস্ত মেয়ের দালালী করে বেড়ায়। বিদেশী অতিথি দেখলেই তাদেরকে প্রলুব্ধ করে এবং অস্থানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে।

দেশে ফিরে এসে আমি প্রফেসর শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর একটি ইংরেজী কবিতার বই নতুনভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করি। শাহেদ সোহরাওয়ার্দী ইংরেজী ভাষার একজন সফলকাম কবি ছিলেন। ইংরেজী ভাষা ছিল তাঁর কাছে মাতৃভাষার মত। ইংরেজী শব্দ ব্যবহারের কৌশল তিনি জানতেন এবং শব্দের অন্তর্গত বিভিন্ন ধ্বনির ন্যূনতম ঝংকারও তাঁর কান এড়াতো না। তাঁর কবিতার বই এর নাম ছিল 'এসেজ ইন ভার্স' অর্থাৎ 'পদ্যে রচিত প্রবন্ধ'। এই বইটির কবিতাগুলো কিন্তু ছোট ছোট ছিল। মূলতঃ ইংল্যান্ডে অবস্থানকালীন পরিমণ্ডলকে অবলম্বন করে তিনি তাঁর কবিতাগুলো লিখেছিলেন। আমি পিইএন-এর পক্ষ থেকে তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করি। লঘু হাস্যরস, চটুল কথোপকথনের ভঙ্গী এবং স্বচ্ছ দর্পণের মত প্রাচীনকালকে স্বপ্নের মত নির্মাণ করা শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর কবিতার বৈশিষ্ট্য। একটি কবিতায় শাহেদ সোহরাওয়ার্দী লিখেছেন, "অজস্র মানুষ আমাকে ঘিরে রেখেছে। রাত্রির মধ্য দিয়ে আমি তাদের যাত্রার শব্দ শুনি। পশুরা শব্দ করে, গাছের গভীরে হঠাৎ কখনো কখনো সাড়া পাওয়া যায়। এই সময় এই রাত্রির গভীরতায় বালুকায় পতিত হালকা বৃষ্টির শব্দের মতো তোমার হাত অল্প শব্দ করে আমার হাতের উপর নামে।"

এ বছর আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন আবদুল কাদির খান, নওরোজ কিতাবিস্তানের। প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন কামরুল হাসান। বাংলা প্রকাশের তারিখ দেয়া আছে শ্রাবণ ১৩৬৯। এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই বিদেশে অবস্থানকালে রচিত এবং তার প্রমাণ কবিতার মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে "নিরঙ্কুশ পাইনের বিস্তারের মধ্যে আচ্ছন্ন পৃথিবীকে পেলাম" অথবা "ঢেউ ঢেউ পাহাড়ের বাড়িঘর সীমানা ছাড়ায়ে" অথবা "পাথরের সম্মোহনে নিঃশেষ" অথবা "যে মুলারুজে সব গান ভেঙ্গে দিয়ে হৃদয় অসংগত", এ সমস্ত উপমায় বিদেশের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়।

এই কাব্যগ্রন্থে আমি দেহ এবং হৃদয়ের পারস্পরিক সংস্থিতি এবং নির্ভরতাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। আমার 'অনেক আকাশ' কাব্যগ্রন্থে দেহের আকর্ষণের কথাই ছিল প্রবল। সেখানে সকল অনুভূতির উৎস হিসাবে দেহকে আমি বিবেচনা করেছিলাম। কিন্তু

www.pathagar.com

'একক সন্ধ্যায় বসন্ত'-এ হৃদয়ের কথা এসেছে এবং হৃদয়কে দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত রেখেও তার একটি ভিন্ন স্বভাব নির্মাণের চেষ্টা করেছি। এই গ্রন্থের মধ্যে "আমার পূর্ব বাংলা" শীর্ষক তিনটি কবিতা আছে। এই তিনটি কবিতা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে রচিত।

যা কিছু আমি দেখেছি এবং দেখেছি বলেই যেগুলোর একটি বিশেষ চিত্রকল্প আমার স্মৃতিতে নির্মিত রয়েছে, সেসব স্মৃতিপটগুলো বিশেষ উপলব্ধির ব্যাখ্যার জন্য দৃশ্যগোচর তাৎপর্য নিয়ে শব্দের সাহায্য উন্মোচিত হয়েছে। "তার চোখ বিস্তারিত আকাশের নীল" অথবা আমার পূর্ব বাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের ৩ মাস"–এসব বক্তব্যে দৃশ্যগোচর তা ৎপর্যের স্বালয় এসেছে। প্রথম উপমায় 'চোখ', 'বিস্তার', 'আকাশ' এবং 'নীল' সবকটি শব্দই আমাদের প্রতিমুহূর্তের দৃষ্টির দ্বারা চিহ্নিত। 'চোখ' এখানে পরিচিত কোন রমণীর চোখ হঠাৎ কোনও মুহূর্তে যা আমার ভালো লেগেছিলো। এ ভালোলাগাকে উপলব্ধিতে উজ্জীবিত রাখতে চেয়েছি বলেই আমি নদীর বিস্তার অথবা প্রান্তরের বিস্তারের কথা বলেছি যা আমার দৃষ্টির সীমায় ধরা পড়েছে এবং দৃষ্টিকে সৌভাগ্য দিয়েছে। আকাশের কথা লিখেছি, সীমাহীন অতলতার প্রশান্তি যার মধ্যে এবং নীল বর্ণের কথা লিখেছি যার মধ্যে প্রগাঢ়তা এবং স্নিগ্ধ সম্মোহন আছে। এভাবে ব্যাখ্যা করলে দেখবো যে সম্পূর্ণ চরণটি একটি বর্ণনাকে উপস্থিত করেনি কিন্তু একটি হৃদয়ের নিভৃত উপলব্ধিকে উপস্থিত করেছে। ঠিক এভাবেই "আমার পূর্ব বাংলা এক গুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমাল" একটি বিশেষ চিত্রকল্পের স্মারক কিন্তু তার সঙ্গে মধ্যযুগের কাব্যের আনন্দ মিশ্রিত হয়েছে।

এ উপমাটির পশ্চাতে একটি ইতিহাস আছে। আমি দিনাজপুরের রাজবাড়ির সামনে হঠাৎ একগুচ্ছ জমাট স্নিগ্ধ অন্ধকারের অস্পষ্টতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাছ দেখি।' প্রশ্ন করে জানলাম গাছটি বৈষ্ণব কাব্যের পরিচিত তমাল–তরু। তখন দুপুরবেলা, তাই খর-রৌদ্রে তমালের ঘন বিন্যস্ত কালো পাতা এবং তলদেশের ছায়া অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। একটি অনিবার্য শান্তি এবং স্নিগ্ধতা যেন সেখানে রাজ্যপাট বিছিয়েছিলো। এখানেও দৃশ্যগোচর তাৎপর্যের সার্থকতায় শব্দগুলো এসেছে। আমি চেষ্টা করেছি আমার কবিতার মধ্য দিয়ে আমার একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে বিশেষ বিশেষ অনুভূতির উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে সত্য ও প্রয়োজনীয় করে তুলতে। এভাবেই দিনাজপুরের রাজবাড়ির সামনে দুপুরবেলা যে তমাল গাছটি আমার চোখে পড়েছিল সেই বিশেষ দেখাকে অবলম্বন করে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চেতনাকে শব্দে সমর্পণ করেছি।

পারিবারিক সূত্রে আমি আরবী এবং ফারসী কিছুটা জানতাম। আরবীটা তেমন না। তবে ফারসী ভালই জানতাম। এ বছর মওলানা আবদুর রহমান বেখুদের কাছে আমি কোরআন শরীফের অর্থ শেখা আরম্ভ করলাম। মওলানা বেখুদ অবাঙ্গালী ছিলেন। কিন্তু তার সমগ্র চাকরি-জীবন বঙ্গ ভূখণ্ডে কেটেছিল বলে তিনি ভালো বাংলা বলতে পারতেন। তাছাড়া তিনি তাঁর মেয়েদের বিয়ে দিয়েছিলেন বাঙ্গালী ছেলেদের কাছে। এভাবে তিনি বাংলাদেশের মানুষের সাথে একটি সম্প্রীতি গড়ে তুলেছিলেন। তিনি আমাকে আমপারার বাংলা অর্থ বুঝতে সাহায্য করেন। পরে আমি তাঁর সাহায্যে আমপারার পুরো অনুবাদ করি। এ সময় চট্টগ্রামের মওলবী আবদুর রহমান সাহেব তাঁর কৃত আমপাড়ার বঙ্গানুবাদ বাংলা

www.pathagar.com

একাডেমীকে ছাপতে দেন। আমি তখন আমার অনুবাদ এবং মওলবী আবদুর রহমান সাহেবের অনুবাদ পরীক্ষা করার জন্য একটি উপসংঘ গঠন করি। আমি এই উপসংঘের সভাপতি ছিলাম। উভয় অনুবাদের সমন্বয়ে একটি সংশোধিত অনুবাদ বাংলা একাডেমী পত্রিকার ১৩৬৯ সালের কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এখানে আমি সে অনুবাদের একটি নিদর্শন দিচ্ছি—"পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। আমরা কি তোমার জন্য তোমার হৃদয়কে পূর্ণ বিকশিত করি নাই? এবং তোমার গুরুভার অপসারণ করি নাই? যাহা তোমার পৃষ্ঠদেশকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে? এবং আমরা কি তোমার নাম গৌরবান্বিত করি নাই? সংকট এবং স্বাচ্ছন্দ্য একই সূত্রে গাঁথা—নিশ্চয়ই সংকটের সঙ্গেই স্বাচ্ছন্দ্য। অতএব, যখনই অবসর পাও তখনই আপনাকে নিয়োজিত কর এবং তোমার প্রভুর প্রতি অনুরক্ত হও।"

এই অনুবাদ কর্মে উৎসাহিত হয়ে সমগ্র কোরআন শরীফের অনুবাদে হাত দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শহীদুল্লাহ সাহেব আমাকে নিরস্ত করলেন। তিনি বললেন, "আল্লামা ইকবাল বলেছেন—সবচেয়ে জালেম সেই ব্যক্তি যে আরবী ভাষা না জেনে কোরআন শরীফের অনুবাদ কোরবার চেষ্টা করে।" শহীদুল্লাহ সাহেবের কথায় আমি লজ্জিত হলাম এবং তারপর এই দুরূহ কাজে হাত দিতে আমি সাহস করি নি। কিন্তু সবসময় আমার মনে একটি বিশ্বাস কাজ করেছিল তা হচ্ছে— কোরআন শরীফের উপমা রূপক এবং ভাষা শৈলীর সঙ্গে বাঙালী কবিদের পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন। এ পরিচয় থাকলে আমাদের কবিরা কোরআন শরীফের বর্ণনার নিপুণতাকে বাংলা ভাষায় টেনে আনতে পারবেন এবং তাতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এটা আজো সম্ভবপর হয়নি। বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদ ইংরেজী ভাষার কবিকুলকে সাহায্য করেছে। কিন্তু কোরআন শরীফের বাংলা অনুবাদ বাংলা ভাষার কবিদের সাহায্যে আসে নি। তার একমাত্র কারণ কাব্য বা সাহিত্য স্বভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে কোরআন শরীফের অনুবাদ হয় নি।

॥৩১॥

প্রাদেশিক গভর্নর হিসাবে আজম খান ছিলেন একজন যথার্থ দয়ার্দ্রচিত্ত আদর্শ পুরুষ। এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে তিনি ভালবেসেছেন এবং সে ভালোবাসা লোক দেখানো ভালোবাসা ছিল না। সরকারী ফাইলজাত বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে তিনি চাইতেন। যেখানে প্রয়োজন এ মুহূর্তের সেখানে প্রথামাফিক অগ্রসর হয়ে বিলম্ব করা ঠিক নয় এটা ছিল তার রীতি। আমি তাঁকে বাংলা একাডেমীতে আমন্ত্রণ জানালাম এবং তিনি সানন্দে রাজি হলেন এবং একাডেমীর জন্য কি কি করা দরকার তা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। একাডেমীতে আমি তাঁর জন্য সদস্যদের সঙ্গে একটি চা-চক্রের আয়োজন করলাম। চা-চক্রের আগে কাউন্সিল মেম্বারদের সঙ্গে গভর্নর ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হবেন এটা ঠিক হলো। চায়ের সময় দেয়া হয়েছিল বিকেল পাঁচটা। ঘরোয়া বৈঠকের সময় ছিল সাড়ে চারটে। ঘরোয়া বৈঠক শেষে তাঁকে নিয়ে আমি একাডেমীর খোলা চত্বরে এলাম যেখানে চায়ের আয়োজন করা হয়েছিল। তখনও সদস্যদের সবাই এসে পৌঁছোননি। তারা ক্রমশ আসছিলেন। পাঁচটা সাত মিনিটের দিকে গভর্নর সাহেব চলে গেলেন এবং তাঁর জায়গায় ডক্টর মাহমুদ হোসেনকে রেখে গেলেন। সোয়া পাঁচটার দিকে আবদুল কাদির,

www.pathagar.com

বেনজীর আহমদ এবং বন্দে আলী মিয়া এলেন। আবদুল কাদির গভর্নরকে না দেখে আমার উপর ক্ষিপ্ত হলেন। আমি বললাম, গভর্নর সাহেব জরুরী কাজে চলে গেছেন। তিনি পাঁচটা পাঁচ মিনিটে গেছেন, আপনারা একটু আগে এলে তাঁর দেখা পেতেন। আবদুল কাদির তবুও বললেন, 'সব দোষ আপনার। আপনার উচিত ছিল তাঁকে আটকিয়ে রাখা।' আমি এর উত্তর দিতে যাব এমন সময় আবদুল কাদির তাঁর হাতের দাওয়াত কার্ডে থুথু দিয়ে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে বললেন, 'আপনার নিমন্ত্রণে আমি থুথু দেই।' কথা না বলে ঠিক একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করলেন বেনজীর আহমদ এবং বন্দে আলী মিয়া। কিন্তু নিমন্ত্রণপত্রে থুথু দিলেও তারা আপ্যায়নের টেবিলে গিয়ে নাস্তার তস্তরী হাতে তুলে নিতে ভুললেন না।

বেগম সুফিয়া কামাল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এদের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসি গোপন করে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে গেলেন। যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন, 'আলী আহসান, তুমি সব দিক দেখেশুনে কাজ করবে।' মূলত আবদুল কাদির সাহেবদের শুনিয়ে তিনি একথা বলেছিলেন।

বাংলা একাডেমীর কর্মপরিচালনার ক্ষেত্রে একটি অরাজকতা বিরাজমান ছিল। কাউন্সিল সদস্যগণ নিজেদেরকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন। তারা একাডেমীর বিভিন্ন বিভাগে যেতেন এবং কর্মব্যবস্থা তদারকী করবার চেষ্টা করতেন। এ খবর শুনে আমি বিভাগীয় প্রধানদের ডেকে বললাম, একাডেমীর বিভিন্ন বিভাগের কর্মব্যবস্থার দায়িত্ব এবং অধিকার একমাত্র পরিচালকের। কাউন্সিল সদস্যগণ কাউন্সিল সভায় পরিচালককে সাহায্য করবেন এবং প্রয়োজনবোধে একাডেমীর কর্মব্যবস্থা পর্যালোচনা করবেন। কাউন্সিল সভার বাইরে বিভাগীয় কার্যবিধি তাদের হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নেই। এরপর তারা যদি আপনাদের কাজে কোনরূপ তদারকী করতে চায় তাহলে আপনারা বাধা দেবেন এবং প্রয়োজন হলে আমাকে বলবেন।' আমার এই নির্দেশে উপযুক্ত ফল হয়েছিল। কিছুটা গোলযোগের সম্ভাবনা হয়েছিল বটে কিন্তু শহীদুল্লাহ সাহেব এ গোলযোগ অংকুরেই বিনষ্ট করেছিলেন। কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যে যারা এ সমস্ত তদারকী করে বেড়াতেন তারা সকলেই ছিলেন শহীদুল্লাহ সাহেবের ছাত্র। তিনি তাদের ডেকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এ ধরনের তদারকীর কাজ করতে যাওয়া তাদের উচিত নয়। একাডেমীর কার্যধারা সম্পর্কে কোনকিছু জানতে হলে তারা যেন সরাসরি পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

শহীদুল্লাহ সাহেব আঞ্চলিক অভিধানাদি দেখতেন। তিনি ইসলামী বিশ্বকোষেরও সম্পাদক হিসাবে কাজ করছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, নীতিবাদী এবং কর্মতৎপর ছিলেন শহীদুল্লাহ সাহেব। তিনি প্রায়ই আমাকে বলতেন, 'আলী আহসান, আমি আমার ছাত্রের অধীনে কাজ করছি না, আমি আদর্শের অধীনে কাজ করছি। আমি লজ্জিত হয়ে উত্তর দিতাম, 'স্যার, আপনি যে আমার সঙ্গে কাজ করছেন এটা আমার গৌরব এবং সম্মান।' এ কথার পর তিনি হাসিমুখে আমার মাথায় হাত রেখে বলতেন, 'আল্লাহ তায়ালা তোমার মঙ্গল করবেন। অনেকে তোমার বিরুদ্ধে থাকবে কিন্তু তারা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।'

এ সময় মুসলিম বঙ্গের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ আবুল হাশেম সাহেব ইসলামিক একাডেমীর ডাইরেক্টর ছিলেন। তিনি দূর সম্পর্কে আমার আত্মীয় হতেন। একাডেমীতে

www.pathagar.com

থাকাকালে তিনি প্রায়ই আমার এখানে আসতেন শহীদুল্লাহ্ সাহেবের সাথে গল্প গুজব করবার জন্য। আমি প্রায়ই সেখানে উপস্থিত থাকতাম। একবার ঢাকায় সর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উৎসব হয়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক শিল্পী তখন ঢাকায় এসেছিলেন। ঢাকার শাহ্‌বাগ হোটেলে এদেরকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। সংবর্ধনা সভায় আবুল হাশেম সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি একটি বড় সোফার মাঝখানে বসেছিলেন। তার দু পাশে লাস্যময়ী তারকারা বসেছিলেন। খবরের কাগজওয়ালারা এই ছবিটি তুলে নেয় এবং প্রকাশ করে। আমরা সবাই ছবিটি দেখে কৌতুকবোধ করেছিলাম। আবুল হাশেম সাহেব এ ঘটনার পর যখন বাংলা একাডেমীতে এলেন তখন শহীদুল্লাহ্ সাহেব বললেন, 'আপনার একটুও লজ্জা হল না যুবতী মেয়েদের নিয়ে ওভাবে বসতে? আপনি তো চোখে দেখতে পান না, তাহলে কি দেখলেন?'

আবুল হাশেম সাহেব নির্বিকার ঔদাসীন্যে উত্তর করলেন, 'অন্ধরা কি করে দেখে জানেন না? আঙ্গুল দিয়ে দেখে।' শহীদুল্লাহ্ সাহেব তখন 'তওবা তওবা' করে সরে গেলেন।

বাংলা একাডেমীর একটি কাউন্সিলের মেয়াদ ১৯৬২ সালে শেষ হয়। দ্বিতীয় কাউন্সিল গঠন করার পূর্বে আমি সরকারের কাছ থেকে সরকার মনোনীত সদস্যদের নিযুক্তি ঠিক করে নিলাম এবং পদাধিকারবলে নিযুক্ত সদস্যদের ডেকে কাউন্সিলকে আংশিকভাবে তৈরি করলাম। এরপর নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হল। নির্বাচন অতীতেও দলগতভাবে হয়েছে, এবারেও তার ব্যতিক্রম হলো না। তথাকথিত ইসলামপন্থী একটি দল কাউন্সিল সভায় সব সময় বিরক্তি উৎপাদন করতো। এবারের ইলেকশনে এরা পাঁচটি সিটের মধ্যে দুটো সিট হারায়। তখন তারা নির্বাচনে কিছু ত্রুটি আছে বলে কোর্টে কেস করে এবং কাউন্সিলের উপর ইনজাংশন জারি করে। সে সময় পাকিস্তানের বিখ্যাত কৌঁসুলী এ কে ব্রোহী ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে আমি আমার প্রেডেকসেন্ট বা অসুবিধার কথা বললাম। ব্রোহী হাসতে হাসতে বললেন, 'ইনজাংশন তো কাউন্সিলের উপর, তোমার উপর নয়। তুমি নিশ্চিন্তে কাজ করতে থাকো, কাউন্সিলে তোমার কোন প্রয়োজন নেই।'

ব্রোহীর কথা মত আমি ইনজাংশন তুলবার জন্য মোকদ্দমা করলাম না। এককভাবে একাডেমীর কর্মচারীদের সহায়তায় একাডেমী পরিচালনা করতে লাগলাম। বাইরের কিছু লোককে দিয়ে কতকগুলো এক্সপার্ট কমিটি করলাম। তার সকলেই দেশের বরেণ্য সন্তান ছিলেন। এদের উপদেশে একাডেমীর কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে লাগল। যারা কেস করেছিলেন তারা কিছুদিন পর ব্যাকুল হয়ে একাডেমীর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু তখন একাডেমী প্রবল গতি পেয়েছে এবং তাই এদের জন্য আমার কিছু করবার ছিল না।

আমি এখানে ১৯৬৩ সালের কথা বলছি। এ বছর ছিল বাংলা একাডেমীর জন্য কর্মচাঞ্চল্যের। আমি 'কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডমের' সহযোগিতায় আধুনিক কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে এক সেমিনারের আয়োজন করি। দেশ বিভাগের পর ঢাকায় এই সর্বপ্রথম কাব্য সাহিত্যের উপর ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত হল। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল 'আধুনিক কাব্যে ঐতিহ্যের ব্যবহার,' 'আধুনিক কাব্যের আঙ্গিক', আধুনিক কবিতার জীবনদর্শন, যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য কবিতা নিঃসঙ্গবোধ ও আধুনিক বাংলা কবিতায় চিত্রকল্পের ব্যবহার, আধুনিক কবিতায় শিল্প যুগ চেতনা এবং আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দ ও আঙ্গিক।'

www.pathagar.com

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ উদযাপিত হয়। উক্ত সাহিত্য সপ্তাহের কর্মসূচীর মধ্যে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মধ্যযুগের উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করি আমি। আমি আমার প্রবন্ধের শেষে বলি, 'অনবরত সমাজ এবং চিন্তার এবং জ্ঞানের পরিবর্তনের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের একটি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। সাহিত্যের ইতিহাসে বর্তমানে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ক্রমান্বয়ে বিচিত্র অনুভূতি ও জ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সাহিত্যের স্বাদ ও আনন্দের জন্য এ অনুভূতি ও জ্ঞানের মূল্য কতটুকু তা বিচারসাপেক্ষ ব্যাপার কিন্তু সাহিত্যকে এ সকল কিছু থেকে যে বিচ্যুত করা যায় না, তা প্রবলভাবে সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এর পরিচয় দেখেছি। অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ক্রমান্বয়ে উনিশ শতকের আরও অনেকের মধ্যে জ্ঞান এবং বুদ্ধির সজীব সঞ্চরণ দেখেছি। এই জ্ঞান, বুদ্ধি এবং মগ্ন চৈতন্যে সর্বপ্রকার অতীতের স্মৃতি আধুনিক সাহিত্যকে ব্যাপক করেছে, জটিল করেছে কিন্তু তীক্ষ্ণ এবং নিঃসংশয়ও করেছে।

এ বছর তেহরানে অনুষ্ঠিত শিশুসাহিত্যসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের একটি সেমিনারে আমি যোগদান করি এবং বাংলা ভাষায় শিশুসাহিত্যের তৎকালীন অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রমসম্পর্কিত একটি রিপোর্ট পেশ করি। সেমিনার শেষে সনতী নামক এক ইরানী বন্ধুর আমন্ত্রণক্রমে কাস্পিয়ান সাগরের ধারে সপ্তাহান্ত উদযাপন করি। এ বছরই বাংলা একাডেমীতে অ-বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়। এতে চীনদেশ থেকে বেশ কয়েকজন ছাত্র ভর্তি হয়। এই কোর্সের জন্য মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীকে নিয়ে আমি কোলোকুয়াল বেঙ্গলী নামক পুস্তক রচনা ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করি।

জার্মানীর বিশিষ্ট দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ প্রফেসর বলফ ইটলিয়াভার আমার আমন্ত্রণক্রমে ঢাকায় আসেন এবং বাংলা একাডেমীতে একটি বক্তৃতা দেন। এর পরবর্তীকালে বলফ ইটালিয়াভারের উদ্যোগে জার্মানীতে পাকিস্তানী গল্পের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। উক্ত সংকলনে পূর্ব পাকিস্তানের অধ্যায়টি আমি সম্পাদনা করি।

বাংলা একাডেমীর পরিচালক থাকাকালীন আমি বাংলা বানান সংস্কারের জন্য একটি উপসংঘ গঠন করি। উপসংঘের সভাপতি ঃ আমি। সদস্যবৃন্দ ঃ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, জনাব আবুল হাসনাৎ, জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই, জনাব মুহম্মদ ওসমান গনি, জনাব মুহম্মদ ফেরদৌস খান, জনাব মুনীর চৌধুরী এবং জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী।

বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার সম্পর্কে যে সুপারিশসমূহ গৃহীত হয় নিম্নে তা উদ্ধৃত হলোঃ

ক. বাংলা বানান সাধারণত সংস্কৃত বানানের অনুসরণে লিখিত হয়, কিন্তু সংস্কৃতে যেসব ক্ষেত্রে শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিপিবদ্ধ করা হয় বাংলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃতের সেইসব উচ্চারণ অনুসৃত হয় না, অধিকন্তু বাংলা উচ্চারণও ধরা পড়ে না–যেমন সত্য বাহ্য, দুঃখ, অন্তঃপুর, ক্রমশঃ, শ্বাস, বিশ্ব, বাক্য, লক্ষ্মণ, স্মিত, মহাত্মা প্রভৃতি শব্দ। ইহা অবৈজ্ঞানিক ও ত্রুটিপূর্ণ।

www.pathagar.com

খ. বাংলা বর্ণমালায় ঙ ং ৎ ঞ জ য বর্গীয় ব অন্তঃস্থ ব ণ প্রভৃতির স্বল্প ব্যবহার অথচ বিকল্প বর্তমান গোটাকয়েক বর্ণ রহিয়াছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বর্ণ সংক্ষেপ করা বিধেয়।

গ. সংস্কৃত ষত্ব ও ণত্ব বিধান অনুসারে যে বানান লিখিত হয় বাংলায় তৎসম শব্দগুলিতে সেই বানান লিখিত হলেও তার যথাযথ উচ্চারণ করা হয় না। তবু শব্দের ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য করলে বাংলায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দগুলির বানানে ণ ও ষ র ব্যবহার করতে হয়। এর ফলে বাংলা ব্যাকরণেও ণত্ব ও ষত্ব বিধানের অধ্যায়টি না রেখে উপায় থাকে না।

এইসব স্থলে বাংলায় আমরা বানান সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেছি এবং বাংলায় ণ ও ষ ধ্বনি-মূল দুটিকে রেখে তাদের সহধ্বনি ণ ও ষ কে অপসারিত করে বানান ও বর্ণমালা যাতে সংক্ষেপিত ও সরলীকৃত হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখেছি। এর ফলে বাংলা ব্যাকরণে ণত্ব ও ষত্ব বিধানের জটিলতা রক্ষা করার প্রয়োজন আর অনুভূত হবে না।

ঘ. অনেকগুলি স্বরচিহ্ন অক্ষর এবং সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের রূপ পরিবর্তনের কারণে বাংলা বানানেও তাদেব চক্ষুগ্রাহ্যরূপে অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলা একাডেমীতে থাকাকালীন আমি বাংলার সঠিক সন নির্ধারণেরও প্রয়াস পাই। বাংলা তারিখের আবহমানকালের সমস্যাটির সমাধানকল্পে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে দেশের বিদগ্ধ পণ্ডিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রীদের সমন্বয়ে বাংলা মাসের তারিখ নির্ধারণ উপসংঘ গঠন করি। উক্ত উপসংঘ দীর্ঘ তিন বৎসর যাবৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা অন্তে ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে প্রতি বঙ্গাব্দের বৈশাখ হতে ভাদ্র পর্যন্ত প্রতি মাস ৩১ দিনে এবং আশ্বিন হতে চৈত্র পর্যন্ত প্রতিমাস ৩০ দিনে এবং অধিবর্ষক্ষেত্রে (অর্থাৎ ৪ দ্বারা বিভাজ্য বঙ্গাব্দে) চৈত্রমাস ৩১ দিনে হবে। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলা একাডেমী ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ হতে বাংলা বর্ষপঞ্জী বা ক্যালেন্ডার, ডায়রী ইত্যাদি প্রকাশ করতে থাকে–বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ। কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকারের অনুমোদন ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বাংলা একাডেমীর এই বৈপ্লবিক সংস্কার দেশের পঞ্জিকা প্রকাশকগণ গ্রহণ করেন না। বর্তমানে সরকার এ সংস্কারটি গ্রহণ করেছে।

এ বছর আমার অনূদিত গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের ইডিপাস নাটকের অনুবাদ বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের তারিখ ছিল পৌষ ১৩৬৯। নাটকটি প্রকাশের পরবর্তীকালে কয়েকটি খ্যাতনামা থিয়েটার গ্রুপ মঞ্চায়ন করেছে। গ্রন্থটি বাংলা অনার্স শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্য। বর্তমানে বইটির ষষ্ঠ মুদ্রণ চলছে।

এ বছর অক্টোবর মাসে আমি আন্তর্জতিক কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডমের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় যোগদানের উদ্দেশে প্যারিসে আসি। প্যারিসে মেইজঁতে অবস্থান করেছিলাম। কিন্তু আমার বন্ধু আইভান ক্যাটস আমাকে ভার্সাইয়ে তাঁর বাসায় নিয়ে যায় এবং সেখানেই আমি অবস্থান করতে থাকি। অক্টোবরের আঠারো তারিখে বুলভার্ড হোসমান-এ কংগ্রেসের অফিসে কবি পীয়ের ইমানুয়েল জন হান্ট এবং নিকোলাস নবোকভের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেই। উনিশ তারিখে ক্লেয়ার গলের সঙ্গে সারাদিন কাটাই। সন্ধ্যায় ক্যাটসের বাসায় চলে যাই এবং সপ্তাহান্তে প্যারিসে ফিরে আসি একুশ

www.pathagar.com

তারিখে। প্যারিসে র্যু দ্য লা সেন এলাকায় একটি পুরনো বইয়ের দোকানে ক্লেয়ার গলের সঙ্গে এসেছিলাম মনে পড়ে। দোকানের মালিক ছিলেন মাদাম গেইত ফ্রোজ। মহিলাটি ছিলেন বোহেমিয়ান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মমতাময়ী বন্ধু। আমরা যখন দোকানে এলাম তখন সেখানে বেচাকেনা দেখলাম না কিছু। কয়েকজন যুবক গল্পগুজব করছে এবং মাদাম ফ্রোজ চা পরিবেশন করছেন। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। ঘরের ভিতরে তামাকের ধোঁয়া। এই দুটো মিলে জানালার কাঁচে কুয়াশা সৃষ্টি করেছে।

॥৩২॥

প্যারিসে ওয়ালীউল্লাহ থাকতেন। যতবারই প্যারিসে গিয়েছি ওয়ালীউল্লাহর সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাবার চেষ্টা করেছি। তাঁর সঙ্গে সময় সত্যি আনন্দে কাটত। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, দীর্ঘকায়, দীপ্তিমান পুরুষ ছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘকালের পরিচয়। ১৯৬৩ সালে প্যারিসে শেষবারের মত সাক্ষাৎ, পরে তিনি চট্টগ্রামে এসেছিলেন, যখন আমি চট্টগ্রাম ছিলাম। মাদাম ওয়ালীউল্লাহও ছিলেন মমতাময়ী রমণী। তাঁদের আতিথেয়তা এবং সান্নিধ্যে ২২শে অক্টোবর ভালই কাটছিল। রাতের খাবার তাঁর সঙ্গে খেয়েছিলাম এবং ওয়ালীউল্লাহ আমাকে লন্ডনগামী ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছিলেন। রাত দশটায় ট্রেনে উঠলাম এবং পরদিন সকালে লন্ডনে পৌঁছলাম। প্যারিস থেকে লন্ডন এই ট্রেনযাত্রাটি আমার জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা। ইংলিশ চ্যানেল দিয়ে ফেরী পারাপার হওয়ার অভিজ্ঞতা আমার জন্য এই প্রথম। আমি ইচ্ছে করলে প্লেনে যেতে পারতাম, অনেকেই তাই যায়। কিন্তু প্যারিস থেকে লন্ডনের ট্রেন যাত্রার বিবরণ অনেক বইতে পড়েছিলাম। সে কারণেই ট্রেনে যাবার আগ্রহ হয়েছিল। লন্ডনে এসে হিউস্টন হোটেলে উঠেছিলাম। হোটেলটি দামে সস্তা, কিন্তু একটি স্টেশন নিকটে থাকায় সব সময় কোলাহলমুখর ছিল। সেদিনই আমি হে মার্কেটের কাছে এনকাউন্টার অফিসে কবি স্টীফেন স্পেন্ডরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। স্পেন্ডার আমাকে দেখে খুশি হলেন। কিছুক্ষণ আমরা কথাবার্তা বললাম। উঠে আসব যখন তখন তিনি তাঁর সদ্য প্রকাশিত দি স্ট্রাগল অব দি মডার্ন গ্রন্থটি উপহার দিলেন। বইটি এখনো আমি সযত্নে সংরক্ষণ করছি।

সন্ধ্যায় জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা হোটেলে দেখা করতে এলেন। জ্যোতির্ময় তখন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর বুলোর অধীনে গবেষণা করছিলেন। জ্যোতির্ময়ের লন্ডনে ভর্তি হবার ব্যাপারে আমার কিছুটা হাত ছিল। তিনি বিলেতে পড়াশুনা করবার জন্য সরকারী একটি বৃত্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু গভর্নর মোনেম খাঁ এই বৃত্তিটা কেটে দেন। এর ফলে লন্ডনে জ্যোতির্ময়ের ভর্তির সময় পার হয়ে যায়। তখন তার অনুরোধে আমি স্টীফেন স্পেন্ডারকে একটি চিঠি লিখি যেন তিনি প্রফেসর বুলোকে বলে তার ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন। তিনি বুলোকে যে চিঠিটা লিখেছিলেন তার ভাষা এ রকম ছিল, 'পত্রলেখক সৈয়দ আলী আহসান আমার সমধর্মী; অর্থাৎ একজন কবি। তার অনুরোধ যে আপনি যেন জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে আপনার অধীনে পিএইচডি গবেষণায় ভর্তি করে দেন। প্রফেসর আহসানের অনুরোধকে আমার অনুরোধ হিসেবে বিবেচনা করলে খুশি হব।' ইংল্যান্ডে একাডেমিক মহলে কবি-সাহিত্যিকদের সম্মান যে কত তা আমি বুঝতে পারলাম যখন স্পেন্ডারের চিঠি পেয়েই বুলো জ্যোতির্ময়কে ভর্তি করে নিলেন।

www.pathagar.com

যাই হোক, সেদিন সন্ধ্যার পর জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ লন্ডনের পথে ঘুরলাম। রাতের আহার একটি হাঙ্গেরিয়ান রেস্টুরেন্টে সারলাম। পরে জ্যোতির্ময় আমাকে আমার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। পরের দিন সারাদিন আমি জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে কাটিয়েছিলাম। লন্ডন জু'তে গিয়েছিলাম, মোহো এলাকায় ঘুরেছিলাম এবং সেখানকার একটি ভারতীয় রেস্তরাঁয় দুপুরের আহার সেরেছিলাম। রাতে আমরা দুজনে টমজোন্স নামক একটি চলচ্চিত্র দেখেছিলাম। জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে লন্ডনের এই সময়ের অতিবাহনটি আমার স্মৃতিতে এখনও ভাস্বর হয়ে আছে।

পরের দিন আমি কেমব্রিজে যাই এবং একটি পুরো দিন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ আলী আশরাফের সঙ্গে কাটাই। ছাব্বিশ তারিখে লন্ডনে চেক ঔপন্যাসিক ইভান জেলোনিকের সঙ্গে মধ্যাহ্ন আহারে মিলিত হই। ইভানের সঙ্গে আমি ব্রাজিলে একত্রে ছিলাম। ব্রাজিলের রায়ো ডি জেনিরো শহরের কিছু দূরে কোপাকাবানা সমুদ্র তীরের একটি হোটেলে ক'বছর আগে আমরা দুজন কয়েক দিন ছিলাম। তখন থেকেই ইভানের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ইভান কি ধরনের উপন্যাস লিখত জানি না। তার কোন বই ইংরেজীতে অনুবাদ হয় নি। তবে তার কিছু কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করে সে আমাকে পড়তে দিয়েছিল। সেসব কবিতার প্রধান বিষয় ছিল পাহাড় এবং পাহাড়ের অন্তর্গত গভীর গুহা। তার মূলবক্তব্য ছিল গুহার অন্ধকার থেকে বাইরের আলোতে বেরিয়ে আসা যেমন, সংকট থেকে উত্তীর্ণ হওয়াও মানুষের জন্য তেমনি। তার কবিতায় রাত্রির আকাশের তারা অনেকবার উপমাস্বরূপ ব্যবহার হয়েছে। দুপুরের আহারের পর ইভান আমাকে নিয়ে গেল ইস্ট এন্ড-এ তার বান্ধবীর ঘরে। বান্ধবীকে দেখে আমার মোটেই ভাল লাগল না। বেশ মোটাসোটা মহিলা, মুখটা চতুষ্কৌণিক অনেকটা চোখ দুটো আবার ছোট। কিন্তু ইভানের প্রতি তার আকর্ষণটা আন্তরিক মনে হল। ইভান থাকত ওকিং-এ। কিছুদিন হল তার স্ত্রী তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। ইভান তাই তার বান্ধবীকে নিয়ে নতুন করে সংসার বাঁধবার পরিকল্পনা করছে।

সন্ধ্যার সময় আমি আমার হাঙ্গেরীয়ান বন্ধু পলতাবোরীর বাসায় গেলাম। পলতাবোরীর জীবনটি অত্যন্ত আনন্দের ও সুন্দর হতে পারত কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা হয় নি। তার স্ত্রী কেইট ছিল বহুবল্লভা। পলের চোখের সামনে সে নিন্দনীয় জীবন যাপন করত। পরে সে পলকে ফেলে রেখে একটি কম বয়সী যুবকের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। কেইটের অন্তর্ধানের পর পল বেশিদিন আর বাঁচে নি। অনেক পরে ১৯৭২ সালে যখন আবার লন্ডনে আসি তখন পলের মৃত্যুসংবাদ শুনেছিলাম। পল এক সময় হলিউডের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং হলিউডের জন্য কিছু কাহিনীও সে লিখেছিল। জীবিত থাকতে প্রতি বছরই সে আমাকে ক্রিসমাসের কার্ড পাঠাতো। পলের কথা খুব মনে পড়ে।

ছাব্বিশ তারিখ রাতে ট্রেনে করে আবার প্যারিসে গেলাম। সাতাশ তারিখ দুপুরে আকাদেমী ফ্রাঁসের মেম্বার আঁদ্রে শাঁসোর সঙ্গে মধ্যাহ্ন আহার করি। অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যায় ক্লেয়ার গলের সঙ্গে সময় কাটাতাম। সন্ধ্যায় ক্লেয়ার গল আমাকে নিয়ে কিছুটা পথ হাঁটতেন। তিনি বলতেন দিনের বেলা প্যারিস দেখতে নেই, প্যারিস দেখতে হয় রাতে। রাতের প্যারিস হচ্ছে প্রেমিকের হৃদয়, নয়ন এবং ওষ্ঠ। মোহময় রাতের রং একটি

www.pathagar.com

অভিসারের আমন্ত্রণের মত। প্যারিসে প্রেমের একটি নামই আছে-আমোর। এর অর্থ অন্য কোন ভাষায় পাওয়া যাবে না। দেহ উপভোগ বা কামনাও নয়, এটি একটি বিস্ময়কর অনুভূতির উচ্চারণ। গভীর রাতে প্যারিসের পথে হাঁটলে এই উচ্চারণটি শুনতে পাওয়া যায়।' আমি থাকতাম সাঁজালিজের কাছে। ক্লেয়ার বলতেন যে সাঁজালিজে হচ্ছে বিদেশীদের জন্য যথার্থ, ফরাসীরা এই পথে ভ্রমণ করে না। এখানে দিনরাত সব সময় অজস্র পদশব্দ শোনা যায় এবং বিরাট অট্টালিকার আলোকিত আমন্ত্রণ অনুভব করা যায়। ফোয়ারার পানির বিন্দু বিন্দু শব্দ, কম্পমান আলোর বন্যা, রাতে গাছের স্তব্ধতা, প্রেমিকযুগলের কণ্ঠলগ্নতা, তুলিয়বের বাগানে মসৃণ পাথরের উদাসীনতা আমার কাছে কিন্তু ভাল লাগত। কিন্তু জাত ফরাসীরা এসবকে পছন্দ করতেন না। তাদের কাছে এগুলো ছিল বড় বেশি স্পষ্ট, বড় বেশি কলরবমুখর। তাদের বিবেচনায় যথার্থ প্রেম কখনো তার সঞ্চয়কে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয় না।

আমি যে রাস্তায় থাকতাম সেখানেই লা সেকসি বলে একটি নাইটক্লাব ছিল। আমার থাকবার জায়গা ছিল ৬৬ রু্য পিয়ের সরো, আর ক্লাবটি ছিল একই রাস্তার ৬৮ নম্বর বাড়িতে। প্রায় পাশাপাশি। রাতে আলো জ্বলে উঠত, ঝলমলে আলোয় ক্লাবের নামটি নড়াচড়া করত। আটাশ তারিখ রাতে একাই ক্লাবে গেলাম। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হল, মাটির তলায় প্রদর্শনী গৃহ। প্রথমেই বার, উঁচু কাউন্টারের পাশে উঁচু টুলে বসে অনেকেই বিয়ার খাচ্ছে। সামনেই শ' খানেক বসবার আসন, একেবারে সামনে মঞ্চ। মঞ্চের বাইরে একপাশে যন্ত্রীরা তীব্র ঝাঁঝালো ঝংকারে বাদ্য বাজাচ্ছে। এই ক্লাবটি পুরোপুরি ফরাসী। এখানকার মেয়েগুলোও সঙ্গদেহী রমণী। কয়েকটি অনুষ্ঠান ছিল নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে গাত্রাবরণ উন্মোচন করা। ক্লেয়ার গল বলতেন, 'গাত্রাবরণ অপসারণ করা অপরাধ নয়, কিভাবে অপসারিত হচ্ছে সেটাই দেখতে হবে।' তিনি বলেছিলেন শিল্পসঙ্গত অনাবৃতির কথা।

উনত্রিশ তারিখ সারাদিন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সঙ্গে কাটালাম এবং ত্রিশ তারিখে প্যারিস থেকে বৈরুতে গেলাম। বৈরুতে সেবার আমি হোটেল লর্ডসে অবস্থান করেছিলাম। আমার বন্ধু প্রফেসর নিকোলা জিয়াদে আমাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে এসেছিলেন। তার সঙ্গে ছিল সাইয়ী বলে এক যুবক। যুবকটি রেলওয়ে দফতরে চাকরি করে বলে শুনলাম। ত্রিশ তারিখে সাইয়ীর সঙ্গে দুপুরে খেলাম। এ খাওয়ার কথা আমার বিশেষভাবে মনে আছে কতকগুলো অসাধারণ ফলের জন্য যেসব ফল আমরা চোখেই দেখি না। একটি ফল ছিল সবুজ কাঁচা বাদাম। ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে ভেতরের নরম শাঁসটি খেতে হয়। আমরা এ বাদামটি শুকনো শক্ত অবস্থায় পাই। আমরা ওপরের আবরণটা ভেঙে ভেতরের শাঁসটি খাই। শুকনো বাদামের ভেতরের শাঁসটি শক্ত থাকে। আর একটি ফল ছিল টাটকা খেজুর। খেজুরটি প্রায় আড়াই ইঞ্চির মত লম্বা এবং দেড় ইঞ্চির মত ব্যাস। খুবই রসালো, কচকচে একটু কষও ছিল। আমরা এই খেজুর কখনও পাই না। আমরা যে খেজুর পাই তা হল পাকা এবং নরম। আর একটি ফল ছিল তরমুজ। ফুটবলের আকারের ছোট তরমুজ। ওপরটা মসৃণ এবং ঘন সবুজ ভেতরটা রক্তের মত লাল। খেতে অপূর্ব স্বাদ। আমি এই ফলগুলোর বর্ণনা দিলাম এজন্য যে ঠিক এই ধরনের টাটকা ফলের আস্বাদন আমি জীবনে আর কখনও করি নি।

www.pathagar.com

সাইয়ীর সঙ্গে সেদিন আমি অনেকক্ষণ কাটিয়েছিলাম। বিকেল বেলা সাইয়ী বলল, 'তোমাদের এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বৈরুতে আছেন তার সঙ্গে দেখা করবে না?' শহীদ সোহরাওয়ার্দী থাকতেন হোটেল এক্সেলসিয়াবে। সাইয়ীকে নিয়ে আমি সেখানে গেলাম। লাউঞ্জে উঠেছি যখন তখন দেখলাম স্পাইরাল সিঁড়ি বেয়ে একটি নার্সের কাঁধে হাত রেখে শহীদ সাহেব ধীরে ধীরে নামছেন। আমরা তাঁকে এগিয়ে আসতে দিলাম। কাছে আসতেই আমি সামনে গিয়ে তাঁকে সম্ভাষণ করলাম কিন্তু তিনি কিছু শুনলেন বলে মনে হল না। তার দৃষ্টি ঘোলাটে ছিল এবং সামনের দিকে প্রসারিত ছিল। আমি আবার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার পরিচয় দিলাম। তখন তিনি আমার দিকে তাকালেন কিন্তু মনে হল আমাকে চিনতে পারলেন না। আমি তখন তাঁর ভ্রাতার কথা বললাম। তখন তিনি চমকে উঠলেন; বললেন, 'অনুগ্রহ করে আমার ভাইয়ের দিকে লক্ষ্য রেখ।' তিনি ইংরেজীতে বলেছিলেন, 'কাইন্ডলি লুক আফটার মাই ব্রাদার।' তারপর আবার উদাসী ভঙ্গিতে সামনের দিকে এগোতে লাগলেন। এক সময়ের প্রতাপশালী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এই বিধ্বস্ত রূপ দেখে আমার দুঃখ লাগল।

বৈরুতে সকাল বেলা নাস্তার সময় 'কিব্বে' বলে এক রকম রুটি খেয়েছিলাম। এ রুটিটি খুবই সুস্বাদু। গরুর গোশত, পেঁয়াজ, আদা, গম এবং লবণ একসঙ্গে পিষে এক রকমের মণ্ড তৈরি করা হয়। সেই মণ্ড দিয়ে যে রুটি তৈরি হয় তারই নাম কিব্বে। অনেক সময় রুটিটা শুকনো তাওয়ায় ভাজে। আবার অনেক সময় জইতুনের তেলে ভাজে। জইতুনের তেল মাখান নরম একপ্রকার পনির দিয়ে এ রুটিটি খেতে খুব সুস্বাদু। অনেকে আবার কাঁচা কিব্বেই খায়। কাঁচা কিব্বে হয়তোবা একটু অন্যভাবে প্রস্তুত হয়। আমি খোঁজ করে দেখি নি। বৈরুত শহরের জন্য আমার দুঃখ লাগে। একটি অসাধারণ আকর্ষণীয় শহর ছিল, আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

বৈরুতে সেবার বাললম্বোদর নামক এক ভারতীয় হোটেল মালিকের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি ইউরোপ গিয়েছিলেন পাশ্চাত্য দেশের হোটেল পরিচালনা পদ্ধতি জানতে। ফিরতি পথে বৈরুতে নেমেছেন আনন্দ উপভোগের জন্য। আমাকে পেয়ে ভদ্রলোক খুব খুশি। আমাকে নিয়ে ক্যাসিনোতে রাতের খাবার খাবেন বললেন। ভদ্রলোকের একটা গুণ লক্ষ্য করলাম। একান্ত অপরিচিতকেও আপন করে টেনে নিতে পারেন। ভূমধ্যসাগরের তীরে বৈরুতে ক্যাসিনোটি এক সময় খুব বিখ্যাত ছিল। সেখানে নাচ-গান-জুয়া খেলা সবকিছুই চলত। আবার অনেকে শুধু ডিনার খেতেও এখানে আসত। ডিনারের সময় সামনে বাদ্য বাজত এবং বলড্যান্স হত। আমাদের সামনে দিয়ে একজন বিদেশীর কণ্ঠলগ্না হয়ে শাড়ি পরিহিতা একজন বাঙালী মেয়েকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। মেয়েটাকে আমি চিনলাম। সে এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রী ছিল। আমি লজ্জিত হয়ে মাথা নত করলাম। বাললম্বোদর আমার লজ্জিত ভাব দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি মেয়েটিকে চেন?' আমি একটু ঘুরিয়ে উত্তর দিলাম, 'শাড়ি পরা স্বদেশী মেয়েকে এই অবস্থায় দেখে আমার লজ্জা লেগেছে।' বাললম্বোদর মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে নিশ্চিন্তভাবে বললেন, 'এটা আর এমন কি। প্যারিসের নাইটক্লাবে ভারতীয় মেয়েকে কাপড় খুলে নাচতে দেখেছি।'

পরের দিন সকাল বেলা ব্রেকফাস্ট শেষে আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে যাব এমন সময় হোটেলের লাউঞ্জে ক্যাসিনোর মেয়েটির সঙ্গে দেখা হল। সে আমার কাছে এসে বলল,

www.pathagar.com

'স্যার, আপনি এখানে।' আমি বললাম, 'আমি কয়েক দিন এখানে আছি। আগামী কাল ফরাসী ফিরব।' একটু থেমে আবার বললাম, 'আমি তোমাকে কাল কোথায় যেন দেখলাম মনে হল।' মেয়েটি একটুও বিব্রত না হয়ে পাল্টা জবাব দিল, 'আপনাকেও তো আমি দেখলাম স্যার। এবার আমার লজ্জিত হওয়ার পালা। আমি তাড়াতাড়ি ওখান থেকে ইউনিভার্সিটির দিকে রওয়ানা দিলাম। ইউনিভার্সিটিতে এলুমনাই ক্লাবে উপস্থিত হলাম। সেখানে নিকালা জিয়াদে, নবীহ্ আমীর ফারিস, কস্টি জোরায়েক এবং সালেহ আহমদ এফ আলী আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দুপুরের আহার এলুমনাই ক্লাবে এদের সাথে করলাম। বৈরুতে এই আমার শেষবারের মত আসা। আর কখনো বৈরুতে আসি নি। এখন তো আর সে বৈরুত নেই। বিদায় নেবার সময় নিকোলা জিয়াদে আমার স্ত্রীর জন্য একটি রুপোর বালা উপহার দিলেন।

বৈরুত এক বিস্ময়কর শহর ছিল–পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিত এবং আধুনিক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকগণ সময় ক্ষেপণের জন্য বৈরুত আগমন করতেন। ফরাসী সভ্যতা এবং আরবী সভ্যতার সংমিশ্রণে এখানে একটি নতুন সংস্কৃতির জন্ম নিয়েছিল। এখানকার পথেঘাটে ফরাসী কথা, আরবী কথা এবং ইংরেজী কথা সব সময়ই শোনা যেত। ফিলিস্তিনিদের সমস্যা তখনো সেখানে দানা বেঁধে ওঠে নি। ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের জন্য কয়েকটি ক্যাম্প সেখানে ছিল। এই ক্যাম্পগুলো পরিচালনার দায়িত্ব ছিল জাতিসংঘের উদ্বাস্তু কমিশনের ওপর। মাঝে মাঝে কোলাহল ঘটত। কিন্তু তখন তা বর্তমানের মত ভয়াবহ আকার ধারণ করে নি। আন্তর্জাতিক বিমানগুলোর পথযাত্রায় বৈরুত বিমান বন্দর ছিল এক অবধারিত যাত্রাবিরতি।

২রা নভেম্বর আমি করাচী প্রত্যাবর্তন করি। লখম হাউজে শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি তখন অসুস্থ এবং শয্যাশায়ী ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, 'আমি সব সময় ইচ্ছা করেছি আমার মৃত্যু যেন আকস্মিকভাবে হয়। মৃত্যুর আগে অসুস্থতার কারণে কাউকে যেন বিব্রত না করি, কিন্তু তা আমার ভাগ্যে ঘটবে না মনে হচ্ছে।'

৫ই নভেম্বর আমি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করি।

॥৩৩॥

মানুষের সফলতার মাপকাঠি কি জনসমর্থন? এর উত্তর সহজে দেয়া যায় না। রাজনীতিবিদগণ জনসমর্থনকেই সাফল্যের মাপকাঠি বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু এটাও সবক্ষেত্রে সত্য নয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ প্রবল জনসমর্থন পেয়েছিলেন বাংলাদেশে একসময়। কিন্তু বর্তমানে সে সমর্থনের কোন মূল্য নেই। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক পাকিস্তান আন্দোলনের সময় জনসমর্থন হারিয়েছিলেন একবার। কিন্তু আবার তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এসব সমর্থন অথবা অসমর্থন তাৎক্ষণিক আবেগের কারণে ঘটে থাকে। যে মুহূর্তে সমর্থনটি প্রকাশমান সে মুহূর্তের জন্য তা সত্য। কিন্তু পরমুহূর্তে তা সত্য নাও থাকতে পারে। ব্রাউনিং-এর একটি কবিতায় আছে যে রাজনৈতিক নেতা যখন একবার পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর পথের উপর গোলাপের পাপড়ি বিছানো ছিল। কিন্তু পরে যখন তিনি ঐ পথ দিয়ে গেলেন তখন তার জন্য ছিল ঘৃণা এবং বিদ্রূপ।

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আযম খান যখন ঢাকা ছেড়ে যান তখন এখানকার জনসাধারণ প্রবল আবেগগত উচ্ছ্বাসে তাকে বিদায় জানিয়েছেন। এদেশের মানুষের কাছে বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা তিনি লাভ করেছিলেন। এদেশের সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁকে অভিনন্দিত করেছে এবং তাঁর বিদায়ে দুঃখ প্রকাশ করেছে। চলে যাবার কয়েক দিন আগে তিনি রাত্রে তাঁর সঙ্গে খেতে কয়েকজনকে ডেকেছিলেন। তাদের মধ্যে আবুল হাশিম এবং আমিও ছিলাম। খেতে বসে আযম খান তাঁর শৈশবের গল্পও বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন তিনি যখন কিশোর তখন কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব মিলে মাঝে মাঝে সীমান্তের পর্বতসংকুল এলাকায় বেড়াতে যেতেন। সঙ্গে দুম্বা নিয়ে যেতেন। দুম্বা জবাই করে উত্তপ্ত পাথরের উপর গোশত কেটে লবণ মেখে খেয়ে নিতেন। তারপর নিকটস্থ 'চনমা' বা ঝর্ণার পানি পান করে পাহাড়ের ছায়ায় শুয়ে পড়তেন। বিকেল বেলা ঘুম ভাংলে বাড়ী ফিরে যেতেন। গল্প বলতে বলতে আযম খান হাসছিলেন কিন্তু তাঁর চোখে পানি টলমল করছিল। বিদায়ের আগে আবুল হাশিম সাহেব আযম খানের সাথে করমর্দন করে বললেন, 'এদেশের মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা নিয়ে আপনি যাচ্ছেন এটাই আপনার জীবনে শান্তি আনবে। মানুষের দোয়া এবং শুভ কামনার চাইতে বড় আর কিছু নেই। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।' আযম খান শুধু বলেছিলেন, 'এদেশের মানুষ খাঁটি মুসলমান। তাই তাদের আমার ভাল লেগেছিল, তারাও আমাকে ভালবেসেছিল।'

আযম খান চলে যাওয়ার পর গভর্নর হয়ে এসেছিলেন গোলাম ফারুক। তিনি অল্প কিছুদিন ছিলেন। গোলাম ফারুক অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন এবং সূক্ষ্ম হিসাব করে কাজ করতেন। তাঁর সঙ্গেও আমার সম্পর্ক ভাল ছিল। 'তিনি প্রায়ই বলতেন, তাঁর মা বাঙালী ছিলেন, কিন্তু তাঁর দুঃখ যে তিনি বাংলা ভাষাটা শিখতে পারেন নি। গোলাম ফারুক বাংলা একাডেমীকে সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীল রাখতে চান নি। বিভিন্ন ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানের কাছে থেকে অনুদান নিয়ে একাডেমীর জন্য একটি স্থায়ী ফান্ড করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা তিনি করে যেতে পারেন নি। অল্পদিন পরেই তাঁকে বিদায় নিতে হল। আমি তাঁকে বাংলা একাডেমীর একটি বার্ষিক সভায় আনতে পেরেছিলাম।

গোলাম ফারুকের পর গভর্নর হয়ে এলেন আবদুল মোনেম খাঁ। মোনেম খাঁ গর্ব করে বলতেন যে তিনি হচ্ছেন তৃতীয় শ্রেণীর গ্রাজুয়েট কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরতে তিনি গভর্নর হয়েছেন। এ কথায় তিনি বুঝাতে চাইতেন যে উচ্চশিক্ষার কোন মূল্য নেই। মোনেম খাঁ ছিলেন ময়মনসিং-এর একটি স্কুলের নূরুল আমীনের সহপাঠী। তাঁর নাম ছিল কালে খাঁ। স্কুলের মৌলবী সাহেব তাকে এ নাম পাল্টিয়ে স্কুলে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু মোনেম খাঁ পরের দিন যখন ক্লাসে আসেন তখন মৌলবী সাহেব তাকে ক্লাস থেকে বের হয়ে যেতে বলেন। মোনেম খাঁ তখন নাকি বলেছিলেন, 'বাবা তো কোন ভাল নাম খুঁজে পাচ্ছেন না, তাই আপনাকে একটি নাম ঠিক করে দিতে বলেছেন।' তখন মৌলবী সাহেব কালে খাঁ নাম পাল্টিয়ে আবদুল মোনেম খাঁ রাখেন। এ গল্পটি কতটা সত্য জানি না। আতাউর রহমান সাহেব লিখেছেন যে এই গল্পটি তিনি নূরুল আমীনের কাছ থেকে শুনেছিলেন।

মোনেম খাঁ গভর্নর হয়েই বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষিত জনকে এলোপাথাড়ি আক্রমণ করা শুরু করলেন। এই আক্রমণের শিকার হলাম আমিও। এতদিন নিশ্চিন্তে

www.pathagar.com

একাডেমী পরিচালনা করছিলাম। হঠাৎ উৎপাত আরম্ভ হল। একদিন শিক্ষামন্ত্রী মফিজউদ্দীন সাহেব টেলিফোন করলেন। তিনি বললেন, 'আলী আহসান সাহেব, গভর্নর সাহেব বাংলা একাডেমীর কাজকর্মে খুব অসন্তুষ্ট। আমি তাঁকে আপনার পক্ষ হয়ে অনেক বুঝাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝবেন না। তিনি বারবার বলছেন, আপনি নাকি বাংলা ভাষাকে হিন্দু ভাষা বানিয়ে দিচ্ছেন। কি করা যায় বলুন তো!

আমি বললাম, 'আমি বাংলা একাডেমীর কাগজপত্র নিয়ে আপনার কাছে আসতে পারি, এবং আমরা কি করছি না করছি তা আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারি।' আপনি তারপর গভর্নর সাহেবের সাথে দেখা করে সব বুঝিয়ে বলবেন।'

মফিজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'আপনি কেন আমার কাছে আসবেন, আমিই আপনার কাছে যাব। আমি রাজনীতির লোক এবং সেই হিসেবেই একজন মন্ত্রী হয়েছি, আর আপনি তো শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। আপনাকে আমার কাছে ডেকে এনে আমি আপনাকে অসম্মান করতে চাই না।' মফিজউদ্দীন সাহেব একজন অসাধারণ সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। বিনয়ে, মাধুর্যে এবং শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রতি সমবেদনা ও সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর তুল্য ব্যক্তি খুব কমই দেখেছি। অহমিকাশূন্য এবং মার্জিত রুচির ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর। করাচীতে তিনি যু[illegible]াকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ছিলেন। তখন তাঁর সাথে প্রায়ই সাক্ষাৎ হত। ধর্মের আচর[illegible] তাঁর অটুট নিষ্ঠা ছিল। বাংলা একাডেমীর ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমি যখনি আলোচনা এবং ভা[illegible]চেয়েছি তখন তিনি নিজেই একাডেমীতে এসেছেন, সেক্রেটারিয়েটে তাঁর অফিসে আমরা পাকি[illegible]মাকে ডাকেন নি। এর বিপরীত ছিলেন মোনেম খাঁ। মোনেম খাঁ ছিলেন অত্যন্ত বেলুচ এবং বা[illegible]ভ্যন্তরী লোক। শিক্ষিতজনকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করাই ছিল তাঁর ব্যসন। তাঁর নয়। পাকিস্তানের বাংলা ভাষায় প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করে ভাষাকে অপবিত্র [illegible]বর্তে আরবী ফারসী শব্দ ঢুকিয়ে ভাষাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জীবনের শিলান্যাস–[illegible]মাবর্তন সভায় গভর্নর হিসেবে তাঁকে প্রধান অতিথিরূপে আহ্বান [illegible] সেক্রেটারী জানালেন যে গভর্নরের ভাষণের মুসাবিদা একাডেমীকে [illegible]মি আবু জাফর শামসুদ্দীনকে গভর্নরের ভাষণ তৈরী করে দিতে বললাম। ভাষণটি পাঠিয়ে দেয়ার পর মিলিটারী সেক্রেটারী আমাকে টেলিফোন করে জানালেন যে গভর্নর সাহেব ভাষণটি পড়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। ভাষণটির মধ্যে নাকি প্রচুর সংস্কৃত শব্দ আছে। আমি এবারও আবু জাফর শামসুদ্দীনকে ভাষণটি সহজ করে লিখে দিতে বললাম। শামসুদ্দীন সাহেব ছাত্রজীবনে মাদ্রাসায় পড়েছিলেন। সুতরাং আরবী জানতেন। তিনি নতুন করে লিখতে গিয়ে ভাষণটির মধ্যে প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ ঢুকিয়ে দিলেন। কিন্তু মোনেম খাঁর কাছে সংস্কৃত যা আরবীও তাই। তিনি দুটোর কোনটাই জানেন না। তিনি দ্বিতীয়বারের ভাষণটা পেয়ে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে পড়লেন, বললেন, আরও নতুন সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

পরবর্তীতে বাংলাভাষায় ব্যবহৃত একটি শব্দ নিয়ে মোনেম খাঁ ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। শব্দটি হচ্ছে 'স্নাতক'। গ্রাজুয়েটের প্রতিশব্দ হিসেবে স্নাতক তখন সর্বত্রই ব্যবহৃত হচ্ছে। তৎকালীন 'পয়গাম' পত্রিকার সম্পাদক মুজিবুর রহমান খাঁ তাকে বুঝিয়ে ছিলেন যে টোলে শিক্ষালাভের পর বিদ্যার্থীদের মস্তক মুণ্ডন করে স্নান করতে হয় এবং স্নান

www.pathagar.com

শেষে গুরুর পদধূলি গ্রহণ করতে হয়। এ ঘটনা থেকে স্নাতক শব্দটির সৃষ্টি। মোনেম খাঁ স্নাতক শব্দের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন। এক পর্যায়ে গভর্নর হাউসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রফেসরবৃন্দ এবং দেশের প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের ডেকে এক সভা করলেন। উক্ত সভায় কাজী মোতাহার হোসেনও ছিলেন। মোনেম খাঁ তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে স্নাতক শব্দটির ইতিহাস বর্ণনা করলেন এবং এক পর্যায়ে জিভ বের করে দেখালেন যে কি করে টোলের ছাত্ররা গুরুর পদধূলি গ্রহণ করে তা জিভে লাগায়। কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব সামনে চেয়ারে বসে দৃশ্যত সব কিছুই দেখছিলেন, কিন্তু কানের শ্রবণযন্ত্রটি খুলে রেখেছিলেন বলে বিশেষ কিছু শুনতে পাননি। মোনেম খাঁ সাহেব বক্তৃতা শেষ করে হঠাৎ কাজী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাজী সাহেব, আপনি কি বলেন?' কাজী সাহেবের কানে স্নান শব্দটাই কেবল গিয়েছিল আর কোন শব্দ তিনি শোনেন নি। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মাঝে মাঝে গোসল করা তো ভালই।' সভাস্থ সকলেই মাথা নিচু করে হাসতে লাগলেন। এরপর আর সভা জমলো না।

মোনেম খাঁকে নিয়ে এর পরের ঘটনা আরও কৌতুকাবহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' পাঠ্য ছিল। মুনীর চৌধুরী বাংলা একাডেমী মঞ্চে নাটকটির অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। নাটকটি খুব জমেছিল। নাটকটির মধ্যে কয়েকটি জায়গায় 'যবন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ব্যবহারটি ছিল জাতিগত অর্থে ঘৃণা বা হেয় অর্থে নয়। কি করে যেন এ খবরটি মোনেম খাঁর কানে যায়। এবারেও সংবাদদাতা ছিলেন মুজিবুর রহমান খাঁ। তিনি কৃষ্ণকুমারী নাটকের বিভিন্ন জায়গা লাল পেন্সিলে দাগিয়ে মোনেম খাঁকে দিয়েছিলেন। মোনেম খাঁ তো মহাক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। স্বাধীন পাকিস্তানে মুসলমানদের 'যবন' পরিচয় কি করে তিনি সহ্য করেন? তাছাড়া কি করেই বা বাংলা একাডেমীতে এ নাটক মঞ্চস্থ হতে পারল! মোনেম খাঁর নির্দেশে বইটি সিলেবাস থেকে বাদ দেয়া হল এবং বাংলা একাডেমীতে বইটি অভিনীত হওয়ায় আমাকে জবাবদিহি করতে হল। মোনেম খাঁ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, বইটা লিখেছে কে, তার বাড়ি কোথায়? আমি হাসি চেপে উত্তর করলাম, পূর্ব পাকিস্তানেই বাড়ি। মোনেম খাঁ বললেন, লোকটার সাহস তো কম না! পাকিস্তানে থাকে আর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কথা কয়। আমি তখন আর কৌতুক না করে বললাম, মধুসূদন অনেক আগের লোক। আর তিনি হিন্দু ছিলেন না, তিনি ছিলেন খৃস্টান। মোনেম খাঁ না দমে বললেন, হিন্দু জাতটা যে কি রকম খারাপ তার প্রমাণ দেখেন, লোকটা খৃস্টান হয়েও হিন্দু বইনা গেছিল।

আমি তখন আস্তে আস্তে বললাম, বাংলাদেশের তরুণ ছেলেরা পাকিস্তান আন্দোলন চোখে দেখে নি। তারা জানে না, কি কারণে পাকিস্তান হয়েছিল। হিন্দুরা মুসলমানদের 'যবন' বলে ঘৃণা করত, সেটাও পাকিস্তান হওয়ার একটি কারণ। সেজন্য আমাদের ছেলেদের 'কৃষ্ণ কুমারী নাটক'-এর মত বই পড়া উচিত। তাহলে তারা বুঝতে পারবে কেন পাকিস্তান আন্দোলন হয়েছিল।

আমার এই উত্তর মোনেম খাঁ কিন্তু ভাল অর্থেই গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, এই কথাডা কইছেন ভালাই।

www.pathagar.com

মোনেম খাঁর আমলে বাংলা একাডেমীর পরিচালক হিসেবে আমি খুবই আশান্বিত ছিলাম। একাডেমীকে তিনি সরকারের প্রচার মাধ্যম করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি কোন ক্রমেই তা করতে দেইনি। যতবার তিনি তাঁর নির্দেশ মত কাজ করতে বলেছেন ততবারই আমি সবিনয়ে বলেছি, আমার এ্যাক্ট আছে, অর্ডিন্যান্স আছে সে অনুসারে আমি একাডেমীর কার্য পরিচালনা করি। এর বাইরে কোন কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

বুদ্ধিজীবী এবং লেখকদের প্রতি মোনেম খাঁর প্রচণ্ড আক্রোশ ছিল এবং এদেরকে যেভাবে পারতেন অপমান করার চেষ্টা করতেন। সানাউল হকের মুখে শুনেছি ,একবার মোনেম খাঁ রাত দেড়টার সময় গভর্নর হাউসে সানাউল হককে ডেকে পাঠান। সানাউল হক উপস্থিত হলে তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা, সানাউল হক সাহেব,আপনি তো একজন বুদ্ধিজীবী, আপনি তো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, ভালো ছাত্রও ছিলেন কিন্তু, আপনি জীবনে কি করতে পেরেছেন? বড় জোর কমিশনার হয়েছেন। আর আমি মোনেম খাঁ থার্ডক্লাস গ্রাজুয়েট, আমি গভর্নর হয়েছি। আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে সাসপেন্ড করতে পারি, ট্রান্সফার করতে পারি, আরও অনেক কিছু করতে পারি। এ সম্পর্কে আপনার কি মত বলুন।" সানাউল হক উত্তরে নাকি বলেছিলেন, "স্যার, আমি তো একজন সাধারণ মানুষ, আমি নিজের চেষ্টায় যতটা হবার হয়েছি। আপনার সঙ্গে কি আমার তুলনা হয়, আপনাকে তো আল্লাহ তায়ালা বানিয়েছে।"

মোনেম খাঁর আমলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচনী প্রচারণা চরমে ওঠে। সে সময়ে মিস ফাতেমা জিন্নাহ আইয়ুবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কে যেন এ সময় মোনেম খাঁকে জানায় যে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত "তজরিদুল বোখারী"র অনুবাদের এক জায়গায় আছে যে রাসূলে খোদা বলেছেন, "যে জাতি তাদের শাসনভার কোন রমণীর উপর ন্যস্ত করে সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য।" মিলিটারী সেক্রেটারীর মাধ্যমে মোনেম খাঁ আমাকে নির্দেশ দিলেন আমি যেন তাজরিদের এই উক্তিটি লিপিবদ্ধ করে আমার নাম সই করে গভর্নর সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেই। আমি সবিনয়ে মিলিটারী সেক্রেটারীকে জানালাম যে এখানে আমার সই করার প্রশ্নই ওঠে না। আমি তখন লালবাগের মওলানা শামসুল হক সাহেবকে অনুরোধ জানালাম এই হাদীসটি উদ্ধৃত করে তিনি তাঁর নাম সই করবেন। তিনিও রাজী হলেন না। তখন মওলানা আবদুর রহমান বেখুদ তাঁর নিজের নাম সই করতে রাজী হলেন। বেখুদ সাহেব জানিয়েছেন বলে পরের দিন বিভিন্ন কাগজে তজরিদের এই উদ্ধৃতিটি ছাপা হল। মওলানা শামসুল হক সই করতে চাননি এ কারণে যে হাদীসের অনেক উক্তি সমকালীন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চারিত হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিত না জেনে স্বার্থসিদ্ধির জন্য হাদীসকে ব্যবহার করা অপরাধ।

মোনেম খাঁর জন্যই বাংলা একাডেমী আমার ছেড়ে যেতে হয়েছিল। সেখানেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। আমি ইউনেস্কোর একটি কাজ পেয়েছিলাম–তেহরানে ইউনেস্কোর পুস্তক রচনা ও বিপণন বিষয়ে টেকনিক্যাল ডাইরেক্টরের পদ। মোনেমা খাঁ এই পদটি আমাকে গ্রহণ করতে দেন নি। যাই হোক সেটা অন্য গল্প। মোট কথা মোনেম খাঁ আমার প্রতি বিমুখ ছিলেন এবং আমার ক্ষতিসাধন করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। আমার বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

ইনকোয়ারী কমিটি বসিয়েছিলেন কিন্তু কমিটির সিদ্ধান্ত যখন আমার বিপক্ষে গেল না, তখন প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের কাছে আমার বিরুদ্ধে পাকিস্তান বিরোধিতার অভিযোগ এনে নালিশ করলেন। সেখানেও তিনি কিছু করতে পারেন নি। অনুসন্ধানে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক। তিনি আমার বিপক্ষে কিছুই খুঁজে পান নি। কিন্তু তবু আমাকে বাংলা একাডেমী ছেড়ে চলে যেতে হল।

॥৩৪॥

জীবনে যারা আসে এবং জীবনে যারা যায় তারা সকলেই যে চিহ্নিত থাকে তা নয়। লোকালয়ে অজস্র মানুষ থাকে, সকলের মধ্য দিয়েই আমরা যাত্রা করি। কিন্তু সকলকেই ছুঁয়ে যাই একথা বলতে পারি না। জীবনে কারও সঙ্গে হয়ত বেশী সময় কাটিয়েছি আবার কারও সঙ্গে কম। কিন্তু যার সঙ্গে বেশী সময় কাটালাম সে হয়তো আমাকে একেবারেই প্রভাবিত করলো না, আবার যার সঙ্গে কম সময় কাটালাম সে হয়তো বেশীই প্রভাবিত করলো। স্মৃতি নিজস্ব প্রথায় তার নিজের কাজ করে যায়–যাকে ধরে রাখার ধরে রাখে, যাকে ভুলে যাবার তাকে হারিয়ে ফেলে। আমার জীবনে বহু লোক এসেছে, আমার স্মৃতি কিছু লোকের কথা ধারণ করে আছে। যাদের কথা ধারণ করে আছে তাদের কথাই আমি বলতে পারছি। আবার যাদের কথা স্মরণ করতে পারছি না, তাদের কথা হারিয়ে ফেলছি।

বাংলা একাডেমীতে এসে যে ব্যক্তিকে আমি প্রথমে বিবিধ আলোচনার সূত্রে নিকটে পেয়েছিলাম তিনি মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ। আমি যখন স্কুলে পড়ি, সম্ভবত দশম শ্রেণীতে, তখন বরকতুল্লাহ সাহেব ঢাকায় আমাদের এলাকাতেই থাকতেন। আমরা থাকতাম সাত রওজার কবরটা বাঁয়ে রেখে যে রাস্তাটি উত্তরের দিকে মোড় ঘুরেছে সেখানে। এ রাস্তাটি ক্রমশঃ গিয়ে পড়ে আগা সাদেক রোডে। আগা সাদেক রোডে পড়ার আগ পর্যন্ত রাস্তার সবটুকুই সাত রওজার অন্তর্ভুক্ত। আবার ঐ রাস্তাটি কবরটিকে ডাইনে রেখে সরাসরি পশ্চিমের দিকে গিয়ে জেলখানার কাছে থেমেছে। এই রাস্তার বাঁদিকে অনেক বড় বড় বাড়ি ছিল তার একটিতে বরকতুল্লাহ সাহেব থাকতেন। এ বাড়িটির কথা স্মরণ থাকার কারণ হল বাড়ির সামনে বাড়ির এলাকার মধ্যে একটি বস্তি গড়ে উঠেছিল। একদিন আমরা শুনলাম যে পুলিশ এসে বস্তিটা পুরো ভেঙে দিয়েছে এবং বস্তির মানুষগুলোকে দেয়ালের বাইরে বের করে দিয়ে গেটে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। সকালবেলা এ নিয়ে মহল্লায় খুব হৈচৈ হল। কৌতূহলবশত আমিও সেখানে গিয়েছিলাম। বস্তি উৎখাত করে এই বাড়িটাই বরকতুল্লাহ সাহেবের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। বস্তি উৎখাত করা হয়েছিল বলে বরকতুল্লাহ সাহেবকে খুব নিষ্ঠুর মানুষ বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তিনি যখন আমাদের বাসায় বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন তাকে শান্ত, ধীরস্থির এবং মার্জিত রুচির মানুষ বলে মনে হল। বাবার কাছে শুনলাম যে বরকতুল্লাহ সাহেব একজন লেখক এবং কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই লিখেছেন। ১৯৫০-এর দিকে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক তখন বরকতুল্লাহ সাহেবের 'মানুষের ধর্ম' বইটি বিএ পাস ক্লাসের পাঠ্য ছিল। এ বইটি পড়াবার দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর। বইটি আমার ভাল লেগেছিল একটি বিশেষ কারণে। যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের সাহায্যে লেখক মানুষের যথার্থ ধর্মকে সুনিশ্চয়ভাবে

www.pathagar.com

চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। বিভিন্ন ধর্মগত সীমাবন্ধনকে অতিক্রম করে মানুষ হিসাবে মানুষের যে একটি পরিচয় আছে সে পরিচয়ের প্রেক্ষাপটটি উদঘাটনের প্রয়াস এ গ্রন্থটির মধ্যে ছিল। মানুষের একটি ধর্ম আছে সে ধর্ম মানুষকে মানুষের সঙ্গে সমন্বিত করে, সে ধর্ম একে অপরের প্রতি বিবদমান করে না। সেই সত্যধর্মের সুনিশ্চয় একটি ব্যাখ্যা 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। বইটি পড়াতে গিয়ে লেখকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জাগলো এবং সে কথা আমি ক্লাসেও আলোচনা করি। বরকতুল্লাহ্ সাহেবের অন্য একটি গ্রন্থ 'পারস্য প্রতিভা'। এ গ্রন্থের মধ্যে পারস্যের প্রাচীন কবিকুলের পরিচয় দেয়া হয়েছে। ফারসী সাহিত্যের সঙ্গে এই গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে। লেখকের ভাষা মার্জিত, সুললিত এবং আবেগবহুল। এ দুইটি গ্রন্থের পর বরকতুল্লাহ্ সাহেব আরও কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন কিন্তু সেগুলো তেমন খ্যাতি পায় নি।

আমি যখন বাংলা একাডেমীতে তখন বরকতুল্লাহ্ সাহেব অবসর জীবন-যাপন করছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি বাংলা একাডেমীতে আসতেন এবং আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। তাঁর বিনম্র বিশ্লেষণ এবং যুক্তিবাদী আলোচনা আমার ভাল লাগতো। বয়সের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও ক্রমশঃ আমাদের মধ্যে একটি আন্তরিকতা গড়ে ওঠে। তিনি অনেক সময় তাঁর পারিবারিক সমস্যার কথা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন। একটি সমস্যা তাঁকে অনেক সময় পীড়া দিত তা হচ্ছে পরিবারের বন্ধন ভেঙে ছেলেমেয়েরা যদি বাইরে বেরিয়ে যায় তাহলে অভিভাবকরা কি করতে পারেন? তিনি বলেছিলেন, "ছেলেমেয়েরা অনেক সময় এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যা পিতামাতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। এখানেই পিতা-মাতার পরাজয়।" আমি বলেছিলাম, "পিতা-মাতার পরাজয় বোধ হয় মমতার কাছে, মমতাবন্ধনের কারণেই পিতা-মাতা সন্তানদের বিরুদ্ধে সক্ষমভাবে দাঁড়াতে পাড়েন না।"

পাকিস্তান থেকে দিল্লীতে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের একজন সদস্য হিসাবে বরকতুল্লাহ্ সাহেব যোগ দিয়েছিলেন মনে আছে। সম্মেলনে তিনি কোন বক্তব্য রাখেননি কিন্তু প্রতিটি আলোচনাসভায় উপস্থিত থেকেছেন এবং মনোযোগের সাথে সকলের মন্তব্য শুনেছেন। প্রজ্ঞাবান, ধীরস্থির মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র কথা আমার এখনও মনে পড়ে।

বাংলা একাডেমীর কর্মপরিষদের সদস্যা ছিলেন বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ। একাডেমীর কার্যপরিচালনায় আমি তাঁর পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি। যে সময় কাউন্সিল সদস্যগণ গোত্রভুক্তভাবে সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতেন সে সময় বেগম মাহমুদ একাডেমীর কল্যাণের কথা চিন্তা করে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করতেন। বিবাহসূত্রে আমি তাঁর আত্মীয় হয়েছিলাম। আমার স্ত্রীর ফুফু ছিলেন তাঁর ভ্রাতা হাবিবুল্লাহ্ বাহারের পত্নী। শালীনতাকে শব্দে ব্যাখ্যা করা যায় না। এটা মানুষের আচরণে, উচ্চারণে, দৃষ্টিপাতে এবং পদচারণায় প্রকাশ পায়। বেগম শামসুন্নাহার শালীনতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যে, ভাবভঙ্গীতে, কর্মধারায়, আচরণে এবং দৃষ্টিপাতের অহমিকাশূন্য বিনম্রতায় এই শালীনতা মূর্ত হত। তিনি যে খুব গম্ভীর ছিলেন তা নয়, কখনও কখনও মার্জিত ভঙ্গীতে ঠাট্টা-পরিহাসও করতেন। আমি তাঁকে প্রথম দেখি কলকাতায় পার্ক-সার্কাসে খান বাহাদুর আবদুর রহমানের বাড়িতে। তখন তিনি সবেমাত্র লেডি ব্রাবোর্ন কলেজের বাংলার

www.pathagar.com

অধ্যাপিকা নিযুক্তা হয়েছেন। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই বয়সেই তাঁকে অত্যন্ত শান্ত এবং অচঞ্চল মনে হয়েছিল। হাবিবুল্লাহ বাহার এবং বেগম মাহমুদের মধ্যে একটি বিষয়ে খুব মিল ছিল। এঁরা উভয়ই ছিলেন খুব হৃদয়বান এবং ন্যায়নিষ্ঠ। যা সত্য বলে জানতেন এবং ন্যায় বলে জানতেন তা তারা প্রকাশ করতে দ্বিধা করতেন না। কিন্তু এঁদের মধ্যে পার্থক্য ছিল প্রকাশভঙ্গীর। হাবিবুল্লাহ বাহার ছিলেন বহির্মুখীন এবং উচ্ছ্বাসপ্রবণ, বেগম মাহমুদ ছিলেন অন্তর্মুখীন এবং ধীর ও শান্ত। বেগম মাহমুদ সমাজহিতৈষণা এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। কিন্তু রাজনীতিতে তাঁর সফলতা ঘটে নি। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের মধ্যে এক প্রকার ধার্মিকতা আমি লক্ষ্য করেছি যা তাঁর জীবনে পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা এনেছিল।

বাংলা একাডেমীর কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন ইব্রাহীম খাঁ। তিনি একাডেমীর কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রভাব রাখবার চেষ্টা করতেন, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উপদেশ দেবার চেষ্টা করতেন এবং কখনও কোন বিষয়ে কারও সঙ্গে আমার বিরোধ সৃষ্টি হলে তখন সেখানে মধ্যস্থতা করবার চেষ্টা করতেন। এক সময় তিনি শিক্ষাবিদ হিসাবে খুবই খ্যাতি পেয়েছিলেন যখন তিনি করটিয়া সাদত কলেজের অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ে মুসলমান সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইব্রাহীম খাঁ অনেক পরিশ্রম করেছেন বলে শুনেছি। শিক্ষক হিসেবেও শুনেছি যে তিনি একজন সফলকাম শিক্ষক ছিলেন। মমতা ও প্রীতির বৃত্তে ছাত্রদেরকে নিয়ে আসতেন এবং ছাত্ররা তাঁকে পিতার মত ভক্তি করত এবং ভালবাসত। তাঁর এক ছেলে আমার সহপাঠী ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ অনার্সে। ছেলেটির নাম বোধ হয় শামসুজ্জামান, ডাক নাম ছিল তুলা। অনার্সের পাঠক্রম শেষ করার পর তাঁকে তিনি আলীগড়ে ভর্তি করে দিলেন। আলীগড়ে তুলার রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়। এ সংবাদ পেয়ে আমি দুঃখ পেয়েছিলাম। আরও দুঃখ পেয়েছিলাম যখন শুনলাম যে পুত্রের শেষকৃত্যে যোগ দেবার জন্য পিতা আলীগড়ে যান নি। তাঁর এই আচরণটি আমার কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলে মনে হয়েছিল। পরে ইব্রাহীম সাহেবের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় ঘটে তখন এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে আমার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু করি নি। মনের মধ্যে অভিযোগ সংরক্ষিত রেখেছিলাম। শিক্ষাবিদ হিসেবে তাঁর খ্যাতির কারণে সরকার তাঁকে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত থাকাকালে তিনি অনেক কবি-সাহিত্যিককে ম্যাট্রিকের বাংলার পরীক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। এতে কবি-সাহিত্যিকরা লাভবান হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু উত্তরপত্র যাচাইয়ের কাজে বিশৃংখলা এসেছিল। সৈয়দ মুজতবা আলী তখন বগুড়া আযিযুল হক কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁকেও তিনি উত্তরপত্র যাচাইয়ের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। মুজতবা আলী একটি খাতাও পরীক্ষা করেন নি, পরীক্ষা না করে একেকজনকে ষাট, সত্তর, আশি এ রকম নম্বর দিয়েছিলেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান ইব্রাহীম সাহেবকে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, "কাউকে বঞ্চিত করলুম না, সবাইকে কিছু কিছু দিলুম।" আহসান হাবীব ফররুখ আহমদ–এরাও পরীক্ষক হয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের অনেকে নিজেরা খাতা পরীক্ষা করেন নি এদের হয়ে খাতা দেখে দিয়েছিলেন আবুজ্জোহা নূর আহমদ। এ ভদ্রলোক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার-সহকারী। অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষার খাতা দেখে দেয়া তার একটি পেশা ছিল।

www.pathagar.com

বোর্ডে থাকাকালীন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মুদ্রণের জন্য ঢাকার একটি প্রেসকে দায়িত্ব দেয়া হয়। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য প্রেসের চতুর্দিকে উঁচু দেয়াল দেয়া হয় এবং রাতদিন প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ এই অর্থ ব্যয়ের মধ্যে অর্থ আত্মসাতের যোগসূত্র আবিষ্কার করে এবং বোর্ডের সেক্রেটারী আবদুস সামাদকে এজন্য দায়ী করে। আবদুস সামাদের বক্তব্য ছিল যে চেয়ারম্যানের অনুমতি ব্যতিরেকে তিনি একটি পয়সাও ব্যয় করেন নি। কিন্তু এই অর্থ আত্মসাতের ব্যাপারে পুলিশ চেয়ারম্যানকে জড়িত করে নি। তবে এর কিছুদিন পর ইব্রাহীম সাহেব বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে যান।

ইব্রাহীম সাহেব রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজনীতি তাকে কাম্য সফলতা এনে দিতে পারে নি। কাম্য সফলতা অর্থমন্ত্রী হওয়া। সেই মন্ত্রী হওয়া তাঁর ভাগ্যে ঘটে নি। তিনি সরকারী দলের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু সে সমর্থনের কারণে প্রত্যাশিত সুবিধা তিনি পান নি। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর যে পরিচয় ছিল এবং শিক্ষাবিদ হিসাবেও সেসব পরিচয়ই তাঁর জন্য যথেষ্ট ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি অন্য একটি পরিচয়ের সন্ধান করলেন যে পরিচয় তাঁক ক্লান্ত করল কিন্তু সান্ত্বনা দিল না।

ইব্রাহীম খাঁর রচনার মধ্যে একটি কথকথার ভঙ্গি লক্ষ্য করি। গ্রামের বিভিন্ন পেশার মানুষকে তিনি মমতার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং তার চরিত্র উদঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন। এভাবে তিনি কিছু চরিত্র নির্মাণ করেছেন যা বাংলা সাহিত্যে তাঁর সফলতার স্বাক্ষর হিসেবে বহুদিন বিদ্যমান থাকবে। এরকম একটি চরিত্র হচ্ছে নছর পেয়াদা। 'সোনার শিকল' বলে তাঁর একটি বই এক সময় আমার ভাল লেগেছিল। এই গ্রন্থটিতে নজরুল ইসলামের কাছে লেখা তাঁর একটি খোলা চিঠি আছে। চিঠিটিতে মুসলমান সমাজের দুর্দশার কথা বর্ণিত আছে এবং সেক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের করণীয় কি তা নিয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনা আছে। চিঠিটি এক সময় খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং এখনও চিঠিটির কথা প্রয়োজনবোধে উল্লিখিত হয়। নজরুল ইসলাম এই চিঠিটির উত্তর দিয়েছিলেন। ইব্রাহীম খাঁ তিনটি নাটক লিখেছিলেন–'কামাল পাশা', 'আনোয়ার পাশা' ও 'কাফেলা'। নাটকগুলি সংলাপনির্ভর, কিন্তু মঞ্চোপযোগী নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের জাগরণের যে ইতিহাস পৃথিবীতে রচিত হচ্ছিল তারই প্রেক্ষাপটে নাটকগুলো রচিত হয়। আধুনিক তুরস্কের নবজন্মের কথা এবং কল্যাণব্রতী কামাল পাশার জয় উচ্চারণ প্রথম দুটি নাটকের বিষয়বস্তু। তৎকালীন মুসলিম সমাজে নবজাগরণের প্রেরণা সৃষ্টির জন্য এ নাটকগুলি তিনি রচনা করেছিলেন। বস্তুত মুসলিম পুনর্জাগরণের আকাঙ্ক্ষার প্রচারই ইব্রাহীম খাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। 'কাফেলা' একটি সামাজিক নাটক। সামাজিক অবনতি, বৈসাদৃশ্য এবং দুর্নীতির স্বরূপ এই নাটকে প্রচারিত হয়েছে। শিল্পমূল্যের দিক থেকে নাটকটি অত্যন্ত দুর্বল।

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা এক সময় কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মুসলমান মহিলাদের মধ্যে কবি হিসাবে যারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা অন্যতমা। এক প্রকার নিশ্চিন্ত বর্ণনাভঙ্গি তাঁর কবিতার বিশেষত্ব। অনেকটা মানকুমারী বসুর মত বাংলা একাডেমীতে তিনি প্রায়ই আসতেন, এমনিতেই আসতেন গল্প-গুজব করতে। মাঝে মাঝে সঙ্গে নিয়ে আসতেন লেখিকা হবার আগ্রহী কিছু তরুণী বা

www.pathagar.com

যুবতীকে। তিনি বলতেন, "আমার কাছে এরা আসে এদের লেখা নিয়ে, আমি ওদের বলি তোমরা বাংলা একাডেমীতে যাও, সেখানে তোমাদের লেখা ছাপা হবে।" অল্প বয়সী লেখিকাদের সমস্যা এভাবে তিনি সমাধান করতেন, কিন্তু তা আমার জন্য বিব্রতকর হত। একদিন এক যুবতীকে নিয়ে এলেন, যার কিছু লেখা মেয়েদের পত্রিকায় বেরিয়েছে। ভদ্র মহিলা তার এক উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আমার হাতে দিলেন। আমি যতই তাকে বুঝাবার চেষ্টা করি, এগুলো পরীক্ষা করার ক্ষেত্র বাংলা একাডেমী নয়, ততই তিনি ভাবেন আমি এড়াবার চেষ্টা করছি। অবশেষে অনেক কৌশলে ভদ্রমহিলার কাছ থেকে ত্রাণ পেয়েছি। আর একজন মহিলা এসেছিলেন যার কথা আমি অনেক দিন মনে রেখেছিলাম। সুন্দর পাতলা একহারা চেহারা। বেশ চওড়া ফুলওয়ালা পাড়ের সাদা শাড়ি পরনে। মাথার অর্ধেকটা আঁচলে ঢাকা। নাকে হীরার একটি নাকছবি ছিল। মহিলা সাহিত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন এবং একাডেমী লাইব্রেরী থেকে বই পড়তে নিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝেই আসতেন। তার সাথে কথা বলতে আমার ভাল লাগত। একদিন কথা বলার এক পর্যায়ে তার পারিবারিক কিছু পরিচয় জানতে চেষ্টা করেছিলাম। ভদ্রমহিলা তখন বললেন, "আমার একটি পারিবারিক পরিচয় তো আছেই"। একথা বলে তিনি উঠে চলে গেলেন। এরপর আর কোনদিন আসেন নি।

বেগম সুফিয়া কামাল বাংলা একাডেমীর কর্মকাণ্ডে খুব আগ্রহী ছিলেন। একাডেমীর অনেক সভায় তিনি প্রধান অতিথি অথবা সভাপতি হয়েছেন, তা ছাড়াও আমরা তাঁকে যে কোন প্রয়োজনে ডেকে আনতাম। বেগম সুফিয়া কামাল স্নিগ্ধ তাপের কবিতা লিখে থাকেন, প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের অনুভূতিকে সম্পর্কিত করে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে তিনি অনেক বিরহের কবিতা লিখেছেন যেগুলো পাঠকের মনকে আকর্ষণ করে। সমসাময়িক জীবন সম্পর্কে তিনি সচেতন, বর্তমান সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ প্রবল। সমাজমনস্কতা তাঁর মধ্যে আছে আবার ধর্মীয় বিশ্বাসকে তিনি সযত্নে রক্ষা করেছেন। এক সময় কোলকাতায় যখন আমরা তরুণরা কবিযশপ্রার্থী সে সময় সুফিয়া কামালের সমর্থন আমরা পেয়েছিলাম।

মওলানা আকরম খাঁর জীবন থেকে আমি একটি সত্য অনুভব করেছি তা হচ্ছে ঃ মানুষের কর্ম করবার কোন সময়-অসময় নেই। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে ততদিনই পৃথিবীতে সে কিছু দিয়ে যেতে পারে। আশি বছরের উর্ধ্বে তাঁর বয়স ছিল সে সময় প্রত্যহ গবেষণার কাজে তিনি নিমগ্ন থাকতেন। বাংলা ভাষার ওপর তাঁর অধিকার ছিল প্রচণ্ড। তাঁর বিশ্লেষণ বোধ ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং সুনিপুণ বিন্যাসে তিনি তাঁর বক্তব্যকে উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত যুক্তিবাদী। 'মুস্তাফা রচিত' গ্রন্থের মধ্যে এই যুক্তির প্রয়োগ এমনভাবে করেছেন যাতে সরল বিশ্বাসীদের মনে অনেক সময় আঘাত লাগে। 'সমস্যা ও সমাধান' গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে ইসলাম বর্তমানকালের আধুনিক মানব চৈতন্যের সমর্থনকারী একটি ধর্ম। ইসলাম সঙ্গীতের বিরোধী নয় এবং চিত্রকলার বিরোধী নয়। উজ্জ্বল বিশ্লেষণে প্রতিষ্ঠিত তাঁর নিবন্ধগুলি এখনও আধুনিক। এক সময় 'মাসিক মোহাম্মদী'র সাহায্যে তিনি যথার্থ সাহিত্যকর্মে তরুণ মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করার পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। 'প্রবাসী' পত্রিকা হিন্দুত্বকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যেভাবে ব্যগ্র ছিল এবং নির্লজ্জভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিল তার বিপরীতে মওলানা

www.pathagar.com

আকরম খাঁ মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছিলেন। একটি সময়ে তাঁর প্রেরণায় সংক্ষুব্ধ মুসলমান ভাষা পেয়েছিল এবং আত্মস্থ হয়েছিল। আমি বাংলা একাডেমীর জন্য 'মাসিক মোহাম্মদী'র সব পুরনো সংখ্যা কিনে নিয়েছিলাম। তা ছাড়াও তিনি তাঁর নিজস্ব পাঠাগার থেকে কিছু বই বাংলা একাডেমীকে দিয়েছিলেন।

আবুল মনসুর আহমদের কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে। বাংলা একাডেমীতে তিনি আসতেন, কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতেন না। আমি নিচে নেমে এসে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতাম। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন শানিত বাকচাতুর্যের অধিকারী আবুল মনসুর আহমদের তুলনা করা যায় আমি এমন মানুষ চোখে দেখতে পাচ্ছি না। বাংলা একাডেমীতে বাঙালী সংস্কৃতি নিয়ে তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন আমার মনে আছে। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর বাসায় আমাকে ডেকে নিয়ে যেতেন। সেখানে বসে অনেকক্ষণ গল্প-গুজব করতাম। অত্যন্ত প্রাণপূর্ণ, হাস্যোজ্জ্বল পুরুষ তিনি ছিলেন। আমার একাডেমীর কর্মকাণ্ডে সবসময় আমি তাঁর সমর্থন ও সহানুভূতি পেয়েছি।

আরেকজন লোকের কথা মনে পড়ে। তিনি ভোলার কবি মোজাম্মেল হক। 'জাতীয় মঙ্গল'-এর কবি বলেই তিনি পরিচিত। বাংলা একাডেমীতে কয়েকবার এসেছেন। শহীদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি একসময় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য ছিল সমাজ হিতৈষণা এবং জাতীয় কল্যাণ। তিনি নিষ্ঠাবান সমাজকর্মী ছিলেন এবং তাঁর কবিতাও সেই আদর্শেরই ফলশ্রুতি। সুস্পষ্ট বক্তব্যে তিনি মুসলমানকে তাদের কর্তব্যের কথা বলেছিলেন। তিনি সদা প্রফুল্ল ছিলেন এবং যখনই তাঁকে দেখেছি প্রাণবন্ত বলে মনে হয়েছে।

ডক্টর গোবিন্দ দেব ছিলেন বাংলা একাডেমীতে আমার প্রতিবেশী। প্রায়ই সকাল বেলা একাডেমীতে প্রবেশের পথে ডক্টর দেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হত। তিনি প্রাতঃ ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে একাডেমীর ভিতর দিয়ে তাঁর বাসায় যাবার পথ করে নিয়েছিলেন। তিনি সপ্তাহে একদিন মৌনব্রত অবলম্বন করতেন। সেদিন বহু চেষ্টা করেও তাঁকে কথা বলাতে পারতাম না। তিনি অকৃতদার ছিলেন। তিনি উদার, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিহীন, মানবহিতৈষী, আদর্শবাদী পুরুষ ছিলেন। নিমন্ত্রিত হয়ে কয়েকবার তাঁর বাড়িতে আমি খেয়েছি। পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাদের জড়িয়ে ধরতেন। এই আলিঙ্গন করাটা তাঁর একটা মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছিল। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল বেশ মোটা। কথা যখন বলতেন তখন বেশ গমগম করত এবং প্রতিধ্বনি তৈরি হত। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সৈন্যরা তাঁকে হত্যা করে। আর নিঃস্বার্থ ডক্টর দেবের হাসিমুখ আজও চোখের সামনে ভাসে।

শামস-উল-উলামা বেলায়েত হোসেনের কথা মনে পড়ে। বাংলা একাডেমীতে ইসলামী বিশ্বকোষের যে পরিকল্পনা আমি গ্রহণ করেছিলাম তিনি তার একজন সদস্য ছিলেন। তিনি নিয়মিত সভায় আসতেন। তাঁর উপদেশে আমরা খুবই লাভবান হয়েছি। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তিনি গল্প করতে ভালবাসতেন। আরবী ভাষায় অসম্ভব পণ্ডিত এবং অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিও তিনি ছিলেন। যেদিন ইসলামী বিশ্বকোষের কাজ শেষ হয় সেদিন উপসংঘের সভায় আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন ঐ বলে যে আমি আমার পিতার ধর্মচেতনাকে বহন করে নিয়ে চলেছি এবং সেজন্য আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই আমার কল্যাণ করবেন।

www.pathagar.com

এভাবে আরও অনেকের কথা মনে পড়ে। আবদুল হাই ছিলেন, অজিত গুহ ছিলেন, খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ ছিলেন, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ছিলেন, জহুর হোসেন চৌধুরী ছিলেন। এঁদের কারো কারো কথা পরে আমার জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার উন্মোচনসূত্রে আসতে পারে। এঁরা সকলেই আমার জীবনকে মূল্যবান এবং কর্মদীপ্ত করেছিলেন।

॥৩৫॥

আগামসিহ্ লেনের যে বাসায় আমি থাকতাম তার দুটি ভাগ ছিল। দক্ষিণ ভাগে একটি দালান, উত্তর ভাগে আরেকটি, মাঝখানে খোলা চত্বর। উত্তরের দালান ঘেঁষে পশ্চিম কোণে একটি তালগাছ ছিল। তালগাছে কয়েকটি দাঁড়কাক বাসা বেঁধেছিল। প্রথম প্রথম এই দাঁড়কাকগুলি বিরক্তি উৎপাদন করতো, পরে ক্রমশঃ গা সহা হয়ে যায়। বিকেল বেলা খোলা চত্বরে যখন আমরা বসতাম তখন কাকগুলো নিকটে ঘোরাফেরা করতো। আমার অনেকগুলো কবিতায় কাকের উপমা এসেছে। সেগুলো সম্ভবত এসেছে এ বাড়িতে অবস্থানের কারণে। কাকের পাখার কথা আছে আমার কবিতায়, কাকের কণ্ঠস্বরের কথাও আছে। উপমাগুলোতে কোথায়ও বিরক্তির অধিকার নেই। একটি সহজ স্বাভাবিক চৈতন্যে আমার কবিতায় কাক এসেছে। আর একটি কথা এখানে বলি ঃ কাক দেখতে আমার ভাল লাগে, বিশেষ করে দাঁড়কাক। দাঁড়কাকের কালো রংটি আমার কাছে অত্যন্ত মসৃণ এবং চমৎকার মনে হয়।

কাক নিয়ে আমার কোন চিন্তা ভাবনা ছিল না। কিন্তু মাকে যখন আমি আমার বাসায় নিয়ে এলাম তখন তিনি তালগাছে কাকের অবস্থান দেখে অশুভ বলে ঘোষণা করলেন। মা কখনও কাক দেখতে পারতেন না। কাকের কোলাহল তাঁর বিরক্তি উৎপাদন করতো। কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধে ছিল তাঁর একটি ভাবনা যে কাক অকল্যাণ বহন করে নিয়ে আসে। বাবার মৃত্যুর পর মা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। আমরা আশেপাশে থাকলেও তাঁর নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারি নি। তিনি যেন নিজের অস্তিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। কথাবার্তা বেশি বলতেন না, সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। আমরা তখন ভাবলাম মাকে হোসেনী দালানের বাসা থেকে সরিয়ে নেয়া দরকার। কিন্তু মা কিছুতেই যাবেন না। মনে হল যে বাড়িতে বাবা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সে বাড়ি তিনি ছেড়ে যেতে চান নি। অনেক বলে-কয়ে আমার বাসায় তাঁকে আনলাম বটে কিন্তু বাসায় পা দিয়েই কাকের কোলাহল দেখে তিনি বিরক্ত হলেন। তাঁর ভাষায় কাক হল 'মনহুজ' বা অশুভ। আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে কাক তো সব জায়গায় আছে এবং তাল কিংবা নারকেল গাছ পেলে বাসা বাঁধে। কিন্তু মাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না যে কাকের বাসা বাঁধা অস্বাভাবিক কিছু নয়। দক্ষিণের দালানে পশ্চিমের ঘরটি মার জন্য নির্দিষ্ট করেছিলাম। কিন্তু সেখান থেকেও তালগাছটি দেখা যেত। আবার জানালা বন্ধ করলে ঘর অন্ধকার হয়ে যেত। যাই হোক, মা চুপ করে রইলেন কিন্তু বোঝা গেল কাকের উৎপাতটি তিনি মেনে নিতে পারছেন না। পরদিন সকাল বেলা তিনি জানালেন যে তার ঘুম হয় নি, বিছানায় বসে কাটিয়েছেন। আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন ডাক্তার নন্দী। তাঁকে ডেকে আনলাম।

www.pathagar.com

তিনি মাকে দেখে জানালেন যে মানসিক চিন্তায় তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন এবং ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। একটু ঘোরাফেরা এবং লোকজনের মধ্যে তাঁকে রাখলে ভাল হয়। কিন্তু তা সম্ভব হল না। তিনি মোট দু'দিন কি তিনদিন আমার বাসায় ছিলেন। শেষের দিন সকাল বেলা বললেন যে বাবাকে গত রাতে স্বপ্নে দেখেছেন, তিনি বিমর্ষমুখে ঘরের চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি আবার তাঁকে হোসেনী দালানে রেখে এলাম।

আমার বড় বোন তার সংসার নিয়ে থাকতেন নারায়ণগঞ্জে। তিনিও মাকে নিয়ে গিয়েছিলেন কয়েক দিনের জন্য। কিন্তু সেখানেও মা থাকতে পারেন নি। নারায়ণগঞ্জের বাসাটা ভাল ছিল। ঘরগুলো খোলামেলা, নদীর ঠাণ্ডা বাতাস আসতো। কিন্তু এখানেও মা থাকতে পারলেন না। আমরা তখন বুঝলাম হোসেনী দালানের বাসা ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। বাবা জীবিত থাকতে তিনি বিকাল বেলা মাকে ধর্মকথা শোনাতেন। ফারসী আরবী কেতাব থেকে পাঠ করতেন এবং অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। মা তন্ময় হয়ে শুনতেন, কখনও প্রশ্ন করতেন না। কখনও কখনও বাবা আবার ফারসী কবিতা পড়ে শোনাতেন।

এগুলো ছিল প্রতিদিনের অভ্যাস এবং সম্ভবত মার একান্ত চিন্তার জন্য নতুন সৃজনশীলতা। বাবা মরে যাওয়ার পর সে স্থানটি আমরা কেউ নিতে পারি নি। বিকেল হলেই মা অস্থির হয়ে পড়তেন। কিন্তু আমরা তখন কেউ থাকতাম না তাঁর কাছে। অসহায় অবস্থায় আমার মা একান্ত নির্জনে নিজেকে বন্দী করে রাখতে চাইতেন। এটাই ছিল তাঁর শরীর এবং মনের জন্য ক্ষতিকর। আমি প্রতিদিন সকাল বেলা অফিসে যাওয়ার পথে মাকে দেখে যেতাম। আবার সন্ধ্যেবেলা বাসায় ফিরবার পথে মার সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়ে যেতাম। কিন্তু যে সময়টুকুতে বাবার সান্নিধ্যের স্মৃতি তাঁকে ব্যাকুল করতো সে সময় আমরা কেউই তাঁর কাছে থাকতে পারতাম না। মানব জীবনের অসহায়তা এখানে যে মানুষ স্মৃতির বিড়ম্বনায় বাস করে। স্মৃতিকে সে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, স্পর্শ এবং অনুভবের আয়ত্তে আনতে পারে না। স্মৃতি শুধু চিন্তার বশংবদ হয়ে যাতনা দেয়। আমার মা স্মৃতির এই নিপীড়ন একান্তে সহ্য করতেন। আমরা তাঁকে এই নিপীড়ন থেকে মুক্ত করতে পারি নি।

মার জীবনে ধর্ম ছিল তাঁর বাঁচবার প্রধান উপকরণ। প্রত্যহ তিনি কোরআন শরীফ পাঠ করতেন এবং সদাসর্বদা নিজের শরীরকে পরিচ্ছন্ন রাখবার চেষ্টা করতেন। রোগের প্রতিষেধক হিসাবেও তিনি কোরআন শরীফকে ব্যবহার করতেন এবং আমার মনে হয় তিনি তখন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতেন। কোরআন শরীফের আয়াত পড়ে বুকে ফুঁ দিতেন, ডান হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে হাতটি মাথায় বুলিয়ে আনতেন। আমার মনে হয় তাঁর বিশ্বাস এবং নিষ্ঠা তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তিনি সুফীতত্ত্বে দীক্ষিত ছিলেন। অর্থাৎ তিনি মুরীদ হয়েছিলেন এবং মোরাকেবায় বা ধ্যানে প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর বসে থাকতেন দীর্ঘ সময়। তাঁর এই ধর্মের আচরণ কারও জন্য কোন অসুবিধার কারণ হয় নি। একটি হিন্দু ভদ্রঘরের বিধবা মার কাছে প্রায়ই আসতেন। ভদ্রমহিলা ছিলেন সিঙ্গার সেলাই কোম্পানীর চাকরিজীবী। একবার আমাদের বাড়িতে সেলাই কল বিক্রির সূত্রে তিনি পরিচিতা হয়েছিলেন। কিন্তু তারপর তার আনাগোনা দীর্ঘদিন বজায় ছিল। এ মহিলা এলেই মা উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন এবং তাকে বিছানায় নিজের পাশে বসিয়ে গল্প করতেন। মার কাছে

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলমান কোন ব্যবধান ছিল না। তাঁর কাছে মানববোধে হিন্দু-মুসলমান একটি ঐক্যতানে মিলিত হয়েছিল। এ মহিলা আমাদের বাসায় খাদ্যগ্রহণ করতেন। প্রথমদিকে করতেন না। কিন্তু শেষের দিকে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠায় পারস্পরিক ব্যবধানটি ঘুচে গিয়েছিল। কোনও কোনও দিন এ মহিলা পূজার প্রসাদী ফুল এনে মার হাতে দিতেন।

মার মৃত্যুর সময় আমি তাঁর কাছে ছিলাম। একদিন সকাল বেলা অফিসে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি– আমার ছোট ভাই আলী রেজা দৌড়ে এসে আমাকে জানালো যে মার হাতের পালস কমে আসছে। আমি তাড়াতাড়ি হোসেনি দালানে চলে এলাম। মা তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন। সে সময় ঢাকায় মিস ফাতেমা জিন্নাহ এবং আইয়ুবের নির্বাচনী প্রচারণা চলছে। হোসেনী দালানের রাস্তায় একদল ছেলে ফাতেমা জিন্নার পক্ষে শ্লোগান দিতে দিতে যাচ্ছিল। মা হঠাৎ চোখ মেলে চাইলেন এবং ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'কেন যে মেয়েরা রাজনীতিতে নামে, বুঝি না।' সে সময় কে যেন কোরামিন এনেছিল। মাকে কোরামিন খাইয়ে দেয়া হল। তিনি মুখ কিছুটা বিকৃত করলেন। কোরামিন পানের পর চৈতন্য কিছুটা ফিরে এল।

আমাদের সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর ধীরে ধীরে চোখ বুজলেন, আর তাকালেন না। এভাবে আমার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ অতীতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হল। প্রথমে বাবা গেলেন, পরে মা। আমিই আমার গুরুজন হয়ে পড়লাম। বাবার মুখে শুনতাম যে পিতামাতার উপস্থিতি সন্তানের জন্য বিরাট একটি আশ্রয় এবং সান্ত্বনা। তারা সন্তানের জন্য কিছু করতে পারুন বা না পারুন তাদের উপস্থিতিই সন্তানকে নিশ্চিন্ত রাখে। তারা সব সময় সন্তানের জন্য মঙ্গল কামনা করেন। এই মঙ্গল কামনা এমন একটি আশীর্বাদের মত যা একটি সহায়তার মত সন্তানকে রক্ষা করে। বাবা মা চলে যাবার পর মঙ্গল কামনা করবার জন্য কোন লোক থাকে না। সেজন্য পিতামাতার মৃত্যুর পর পিতামাতাকে উপলক্ষ করে দু রাকাত নফল নামাজ পড়ার বিধি আছে।

মা অসুস্থাবস্থায় ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যেন নানীর কবরের পাশে তাঁর কবর দেয়া হয়। তাঁর শেষ ইচ্ছার প্রতি সম্মান রক্ষা করে আমরা মৃতদেহ কফিনে করে একটি স্থানীয় নৌকা ভাড়া করে রাত্রেই আগলার দিকে রওয়ানা দিলাম। একদিন এই গ্রামে তাঁর শৈশব কেটেছিল, বিবাহের পর প্রথম বাসররাত্রি যাপন করেছিলেন এখানেই। অবশেষে জ্ঞাতিবিরোধে বিরক্ত হয়ে এই গ্রাম চিরকালের জন্য ত্যাগ করেছিলেন। আবার সেই গ্রামে শেষবারের মত এলেন চিরকালের অবস্থানের জন্য। যেদিন মা আমাদের নিয়ে এ গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন সেদিনের কথা সুস্পষ্ট মনে আছে। নদীর ঘাটে বহু লোক ছিল, অনেকে কাঁদছিল, মাকেও চোখ মুছতে দেখেছিলাম। আমরা একটি বজরা নৌকোয় উঠেছিলাম। বজরা নৌকাটি ছিল বাড়ির মত– কাঠের ঘর সমতল ছাদ। সমস্ত নৌকায় নীল রং-এর প্রলেপ, মাঝে মাঝে লাল এবং হলুদ রং-এর রেখা। সেদিন এই নৌকোয় উঠতে আমার ভাল লেগেছিল। ছোটকাল থেকে নদীর প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল, সে নদী দিয়ে বজরা করে শহরে যাব–এটা ভাবতেই আমার শিহরণ লাগছিল। আমাদের নৌকা যখন ধীরে ধীরে চলছিল, তখন কয়েকটি লম্বা ছিপে করে গ্রামের ছেলেরা আমাদেরকে বড় গাঙের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছিল। ঘাট থেকে একটু দূরে খালের সরু বাঁক। সেখানে দু পাশ থেকে

www.pathagar.com

জমাট বাঁধা গাছপালা পানির উপর ঝুঁকে পড়েছিল, দূর থেকে অন্ধকার ও রহস্যময় মনে হয়েছিল। নৌকো যখন চলেছিল তখন মনে আছে কতকগুলো ফড়িং উড়ে গিয়েছিল এবং কয়েকটি সবুজ পোকা নৌকার গলুইএ এসে বসেছিল। মনে আছে একটি নিস্তব্ধ সময়ের মধ্যে নদীর কলকল শব্দ মাঝে মাঝে বৈঠা টানার শব্দ সময়টাকে উদাস করে দিয়েছিল। আজ আবার সেই নদী বেয়ে মাকে নিয়ে শেষবারের মত গ্রামে যাচ্ছি। কিন্তু দুই যাত্রার মধ্যে কি তফাৎ। তখন ছিল নতুন জীবন উন্মোচনের ভাষা, আর এখন এসেছে শেষ জীবনের বিশ্রাম। সারারাত নৌকো চলেছিল। আমাদের মধ্যে কে একজন যেন কোরআন শরীফ পড়েছিল। সকাল বেলা মাঝিরা ভাত খেতে বসেছিল। কতকগুলো কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ, লবণ সরষের তেল দিয়ে শুকনো ভাতের সঙ্গে মেখে তারা খেতে বসেছিল।

খাওয়া শেষ করে তারা নৌকোয় জোরে বৈঠা ঠেললো এবং যদ্দুর মনে পড়ে সকাল ৮টা/৯টার দিকে বাড়ির ঘাটে আমাদের নৌকা ভিড়লো। গ্রামের লোকেরা আগেই খবর পেয়েছিল। তাদের অনেকে ঘাটের কাছে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের এক দূর সম্পর্কের মামা, ধলা মামা ঘাটে দাঁড়িয়েছিলেন। মা তাকে খুব স্নেহ করতেন। যেদিন শেষবারের মত আমরা আগলা ছেড়েছিলাম সেদিন ধলা মামা আমাদের সঙ্গে ঢাকা পর্যন্ত এসেছিলেন। আর আজ আগ বাড়িয়ে মাকে নিতে এসেছেন। আমি নৌকো থেকে মাটিতে পা রাখতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। মার লাশ প্রথমে বাড়ির ভিতর নেয়া হল, গ্রামের মেয়েরা একে একে তাঁকে শেষবারের মত দেখলো। দুপুরের আগেই জানাজা পড়ে আমার নানীর কবরের পাশে মাকে দাফন করা হল। যে জায়গায় মাকে কবর দেয়া হল সেখানে আমার নানা, আমার মামা, আমার নানী এবং নানীর মা সকলেই শুয়ে আছেন। মা এসে এদের সকলের সঙ্গে মিশলেন। মা প্রায়ই বলতেন যারা চলে গেছে তারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। আর তাদের সংখ্যাই তো বেশী।

যত তাড়াতাড়ি তাদের কাছে পৌঁছাতে পারি ততই তো মঙ্গল। সংসারের প্রতি মার কোন আকর্ষণ ছিল না। একটি বিরাগ এবং বিষণ্নতা তাঁর সমগ্র জীবনকে ঘিরে ছিল। কিন্তু জীবনের কর্তব্যে অবহেলা তিনি কখনো করেন নি। আমাদের শিক্ষার জন্য তিনি তাঁর সম্পত্তি এবং প্রতিপত্তি ফেলে দরিদ্র স্বামীর হাত ধরে শহরে চলে এসেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল একমাত্র আমাদের প্রতি। আমরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হই, উপযুক্ত হই এবং জীবনে সম্মানিত হই, এই তিনি চেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন আমরা প্রত্যেকেই যেন ধার্মিক হই। আল্লাহকে পাবার আগ্রহ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যেন থাকে। একটি শান্তশ্রীর সংসার তিনি গড়ে তুলেছিলেন। সেই সংসার চিরদিনের জন্য ভেঙ্গে গেল।

মার মৃত্যুসংবাদ করাচীতে আমার ছোট ভাই আলী আশরাফের কাছে দেয়া হয় নি। কেন না আশরাফ করাচীতে বাথরুমে পিছলে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে নীত হয়। আমি ঠিক করেছিলাম মার শেষকৃত্য করে আমি করাচীতে আশরাফকে দেখতে চাই। ঢাকায় ফিরে এসে করাচী গেলাম। আশরাফ তখনো হাসপাতালে, জ্ঞান ফিরে এসেছে, কিন্তু অসম্ভব দুর্বল। করাচীর বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার জুমা তাকে দেখছিলেন। আমি তিনদিন পর করাচী থেকে ফিরেছিলাম। কিন্তু আশরাফকে মার মৃত্যুর খবর দেই নি। আমি চলে আসার পর আশরাফ সম্পূর্ণ ভাল হলে তার স্ত্রী আছিয়া তাকে এ খবর দিয়েছিল।

www.pathagar.com

ঢাকায় ফিরে আসার পর বাংলা একাডেমীর একটি অনুষ্ঠানের কথা আমার মনে পড়ে। অনুষ্ঠানটি ছিল আফ্রিকার কিছু সঙ্গীতের রেকর্ড বাজানো এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু আফ্রিকার কবিতার ইংরাজী কবিতা পাঠ। একটি কবিতায় বলা হয়েছিল, 'আমরা বেঁচে আছি, কেননা যারা চলে গেছেন তাদের উপযুক্ত হব এবং একদিন তাদের সঙ্গে গিয়ে মিশব। তারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। বাতাসে তাদের সাড়া পাওয়া যায়, ঘাসে যখন শিশির পড়ে, তখন সেখানে তাদের পদশব্দ শোনা যায়। এবং বৃক্ষ শাখায় ও পুষ্পসম্ভারে তাদের দেহের সুগন্ধ পাওয়া যায়।' কবিতাটি সম্ভবত সেঙরের। আমার এখনও কবিতাটি মনে আছে তার কারণ হলো, আমার মাতার মৃত্যুর সঙ্গে কবিতাটির ভাবপ্রকল্প অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

আমি ১৯৬৪ সালের কথা বলছি। এ বছরই ১১ই নভেম্বর আমার মা পরলোকগমন করেন। এ বছর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-এর পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করে মুহম্মদ অহীদুল্লাহ, স্টুডেন্ট ওয়েজ বাংলাবাজার, ঢাকা। ভূমিকায় লিখিত হয়, ১৯৫৬ সালের জুন মাসের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। বৃটিশ আমলের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনার ইতিবৃত্তই প্রধানতঃ আমরা এ গ্রন্থে রচনা করেছিলাম। আমরা আশা করেছিলাম এ গ্রন্থ প্রকাশের ফলে বাংলা সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী ও ভবিষ্যত গবেষকদের কিছুটা সুবিধে হবে। আমাদের আশা নিরর্থক হয় নি। কিছু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এটি বাংলা সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও গবেষকদের কাছে এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য এ বিষয়ের উপর একমাত্র নির্ভরযোগ্য বই হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। গত চার বছর ধরে এই বই দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাওয়ায় তারা নানাভাবে অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছেন।

এ বছর আমার তত্ত্বাবধানে বাংলা শব্দের ব্যবহার বিষয়ে বাংলা একাডেমী কর্তৃক একটি সমীক্ষা চালানো হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিছিন্ন গদ্যগ্রন্থ থেকে শব্দ নির্বাচন করেছিলেন অজিত গুহ, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন। এভাবে সংগৃহীত শব্দগুলো পরীক্ষা করে জনাব এম ওবায়দুল্লাহ (আশকার ইবনে শাইখ) 'দি প্যাটার্ন অব বেঙ্গাল ভোক্যাবুলার–১৭৪০ থেকে ১৮৬৪' গ্রন্থটি রচনা করেন। অন্যান্য ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় গৃহীত শব্দ নিয়ে এটাই প্রথম সমীক্ষা এবং এ পর্যন্ত শেষ সমীক্ষা।

১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমীতে উর্দু ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধাবলী গ্রন্থাকারে এ বছর প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের লেখক তালিকায় ছিলেন ছিলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কবীর চৌধুরী, আবুল ফজল, মুনীর চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, গোলাম আব্বাস, এবাদত ব্রেলভি, আহমদ হাসান দানি প্রমুখ। এই গ্রন্থটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম উভয় ভাষার সাহিত্য স্বভাব নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা হয়। বাস্তব চেতনা কাকে বলে, কল্পনা কাকে বলে, সামাজিক অনুভূতি কাকে বলে উভয় ভাষার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার চেষ্টা এ গ্রন্থে করা হয়েছে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুগভীর আনন্দ-বেদনার সৃষ্টি করা। এ গ্রন্থের লেখকগণ উভয় ভাষার মধ্যে এই আনন্দ-বেদনার পরিচয় কতটুকু আছে তা পরীক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন।

www.pathagar.com

আমার জীবনে এক প্রকার নির্জনতা সততই ছিল। অনেক কোলাহলের মধ্যেও এই নির্জনতার স্বাদ আমি অনুভব করি। চতুর্দিকে কোলাহল তার মধ্যে একটি শান্ত নির্জনতা আমি কি করে যেন গড়ে তুলেছিলাম। এ বছর কিছু কবিতা লিখেছিলাম, যেগুলো এই নির্জনতায় সাক্ষ্য বহন করে।

॥৩৬॥

আমার জীবনে রমণী এসেছে অনেক। দূর থেকে কাউকে দেখে ভাল লেগেছে, কারও চোখের দৃষ্টি আকাঙ্ক্ষিত এবং মধুর মনে হয়েছে, কারও পিছনে ফিরে চলা আমাকে হয়তো উত্ত্যক্ত করেছে, কারও কথা বলা ভাল লেগেছে, কারও নাকের হীরার দ্যুতি এখনও আমার চোখে ভাসে। ভিন্ন ভিন্নভাবে এরা কেউ আমার একান্ত প্রেয়সী ছিল না। প্রেমের কথাটি এখানে গৌণ, ভাল লাগার কথাটাই এখন মুখ্য। সেজ্মর তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন, 'রমণী তোমার কম্পিত সুগন্ধ করতালু দিয়ে আমাকে আচ্ছাদন কর।' তখন সেজ্মর কোন একজন বিশেষ রমণীর কথা বলছেন এটা বলব না, তখন তিনি তাঁর জীবনের সঞ্চয় থেকে একটি অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করেছেন এরকম বলা যেতে পারে।

১৯৬৫ সালে আমি অনেকগুলো প্রেমের কবিতা লিখেছিলাম যেগুলো 'সহসা সচকিত' নামে গ্রন্থবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের উন্মোচনী কবিতাটি আমার মানসিকতাকে প্রকাশ করেছে। কবিতাটিতে আমি এমন একজন রমণীর কল্পনা করেছি যার উপস্থিতিতেই আগ্রহের প্লাবন ছড়িয়ে পড়ে। তার আগমন যেন শ্রাবণ মাসের বর্ষাভরা দিন, যেখানে একদা বিরহ ব্যাকুলতা ছিল, সে রমণী যেন সেখানে আকুলতার সমারোহ ঘটিয়েছে। সে রমণীর নয়ন আনন্দদীপ্ত প্রদীপের মত এবং সে নয়ন যেন উৎসবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এহেন রমণীর নয়ন এমন একটি সগিরের মত যেখানে কবি তার প্রহর হারিয়ে ফেলে। কবি এ রমণীর উপস্থিতিকে পলাশ ফুলের বর্ণাঢ্যতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ রমণীর ওষ্ঠ প্রহেলিকার মত এবং এ যখন কথা বলে তখন কৌতুকসহ কথায় ওষ্ঠকে বিগলিত করে। আমি আমার এই কবিতায় সেই রমণীর সঙ্গে কাল্পনিক ভুজবন্ধনের কথাও বলেছি যে ভুজবন্ধনে একটি মহাদেশের আঙ্গিনা যেন ধরা পড়েছে। এখানে সকলে সীমানা হারায় এবং একটি অনন্ততাকে প্রত্যক্ষ করে। মধ্যযুগের কবিরা লতার সঙ্গে রমণীর বাহুর তুলনা করেছেন, কেননা তারা একটি পেলব সৌকুমার্যকে কাম্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু আধুনিককালে মধ্যযুগের লতাকে রমণীর বাহুর সঙ্গে তুলনা করা সম্ভবপর হয় না। কেননা আমরা আমাদের চার দিকে দেখি আমলকির মাথা অথবা কোন বৃক্ষের ভগ্নাবশেষ কোনও প্রশাখা। কাঙ্ক্ষিত রমণীর বক্ষদেশ লীলার কমলের মত অথবা হৃদয়াকাশে দুটি কালো নয়নের মত। বৈষ্ণব কবিরা এখানে করাঙ্গুলির রেখা বিন্যাসের কথা বলেছেন। সর্বতোভাবে আদর্শ এই রমণীর কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ, এই কটিদেশ নিতম্বের একটি গুরুভারকে বহন করছে। প্রেমিক পুরুষ এহেন রমণীর সঙ্গে সংরাগে যখন মিলিত হয় তখন সে সূর্যের মত অসংশয়, অম্লানরূপে প্রকাশমান হয়। উভয়ের মিলনে একটি পরিত্যক্ত দুর্গ যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়েছে, পাখিরা লেবুর শাখায় যেন কাকলিহারা হয়েছে এবং পুকুরে অনবধান দর্শকের দৃষ্টিতে রাজহংস ভেসে উঠেছে। অনন্যা আগ্রহে এই রমণী আমার কাছে শ্রাবণ বন্যা মনে

www.pathagar.com

হয়েছে। তাই আমি বলেছি যে এ রমণীকে কল্পনা করে আমার হৃদয় সঙ্গীতে বিগলিত হয়েছিল। সকল প্রদীপকে প্রজ্বলিত করে একটি রাজ্য এ রমণীর জন্য উৎসর্গ করা যায়।

মোট ৩২টি কবিতার মধ্য দিয়ে আমি এ রমণীর পরিচয় ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছি। কোন কবিতায় উদ্ভিন্ন যৌবনা অনূঢ়া এসেছে, কোন কবিতায় মধ্যবয়সিনী কোন একাকিনী রমণী এসেছে, কোনও কবিতায় বিদেশিনী এসেছে, আবার কোনও কবিতায় গৃহের পরিমণ্ডলে কর্মব্যস্ত রমণী এসেছে। কবিতাগুলোর মধ্যে অনুরাগের বিভিন্ন ভঙ্গী প্রকাশ করা হয়েছে। কোথাও এ ভঙ্গী দেহকামনার, কোথাও পুলকিত দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করবার, কোথাও আবার চিত্ত শাসনের কথা এসেছে। সবকিছু মিলে এ কবিতাগুলো একটি রসাবেশকে প্রকাশ করে। দেহ কামনার অনেকগুলো ব্যাকুল চিত্র অনেকগুলো কবিতায় এসেছে, কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে কবিতাগুলোর শেষ সুর হচ্ছে কল্পনার সুর এবং হৃদয়ের অনুভূতির সুর। আমি এ কবিতাগুলো যখন লিখি তখন সেনেগালের কবি সেঙ্ঘরের কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলাম। সেঙ্ঘর চিরযৌবনা মহীয়সীর সুগন্ধিত করতালুর কৃষ্ণ রমণীর বন্দনা করেছেন, আমি সতের সংখ্যক কবিতায় এ ভাবটিকে অবলম্বন করেছিলাম। বলেছিলাম, 'হে রমণী, তুমি তোমার সুগন্ধ করতালু দিয়ে আমার কপালে যদি আবেশ রাখো এবং তখন রাতের বাতাস যদি প্রবাহিত হয় তখন তোমার কথা শুনতে আমি সকল পৃথিবী ভুলতে পারি। রাত্রিতে ক্লান্ত মানুষ শয্যায় নামে এবং তখন গল্প বলার কাহিনী হারিয়ে যায়, তোমার কথা যখন আমি শুনি তখন আমি চমকে উঠি এবং তখন আমার বক্ষ তড়িতাহত হয়। রাত্রিতে প্রহরগুলো হচ্ছে আকাশের তারার। সে সময় ঘুম আসে এবং ঘুমের মধ্যে অবচেতনায় মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎটি তোমাকে বাহুবন্ধনে রেখে যদি সম্ভব হতো তবে কতই না আনন্দ হত'

অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে এই কবিতাগুলো বিশেষ কোনও রমণীকে উদ্দেশ করে লেখা কি? এই প্রশ্নটি তাঁদের মনে উঠেছে তার কারণ একটি কবিতায় একজন মধ্য বয়সিনীর কথা আছে যিনি সুন্দরী এবং লাস্যময়ী অন্য একটি কবিতায় একজন প্রকৌশলীর কথা আছে যে হয়তো উক্ত রমণীর আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ। এই পুরুষের কাছে থেকে উক্ত রমণীকে সরিয়ে নিয়ে আসার কিছু ইঙ্গিতও কেউ কেউ কোন কোন কবিতায় পেয়েছেন। আমি পূর্বেই বলেছি এ কবিতাগুলো কোন একজন বিশেষ রমণীকে নিয়ে লেখা নয়। কিন্তু অনেক রমণীর স্মৃতি এই কবিতাগুলোতে বিভিন্নভাবে উত্থাপিত হয়েছে। মধ্যবয়সিনী অবশ্যই একজন আছেন, কিন্তু তিনিই সব নন। আমি মূলতঃ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং পরিচয়ের সূত্র ধরে একটি কাল্পনিক প্রণয় কাহিনী নির্মাণের চেষ্টা করেছি। সে কারণে 'সহসা সচকিত' কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে এমন একজনকে যে হচ্ছে সকল রমণীর অন্তঃসার। উৎসর্গ পত্রে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের চরণ তুলে দেয়া হয়েছে–'যে আমি আমার আমি।' আমার মনে হয় এই উৎসর্গপত্রের সাহায্যে কবিতাগুলোর ব্যাখ্যা আবিষ্কার করা সম্ভবপর এবং সহজ হবে।

এ বছর আমি ওয়াল্ট হুইটম্যানের কিছুসংখ্যক কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করি। আমেরিকান কালচারাল সেন্টারের উদ্যোগে কয়েকজন বিশ্ববরেণ্য আমেরিকান কবির

www.pathagar.com

কবিতার বাংলা অনুবাদ প্রকাশের পরিকল্পনার মধ্যে ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত পরিকল্পনায় রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা অনুবাদ করেন শামসুর রাহমান, লংফেলের কবিতার অনুবাদ করে ফজল শাহাবুদ্দীন এবং হুইটম্যানের কবিতার অনুবাদ করি আমি। আমার অনুবাদে আমি আমার নিজের লেখা একটি ভূমিকা সংযোজন করেছিলাম। ভূমিকাটিতে নজরুল ইসলামের সঙ্গে হুইটম্যানের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা আছে। প্রকাশের পরপরই এ গ্রন্থটি পাঠকসাধারণের কাছে বিপুলভাবে আদৃত হয়। গ্রন্থের প্রথমার্ধে ছিল বাংলা অনুবাদ এবং দ্বিতীয়ার্ধে কবিতাগুলোর ইংরেজী পাঠ ছিল। সেখানে আমার ভূমিকাটির ইংরেজী অনুবাদও ছিল। আমার ভূমিকার অনুবাদ করেছিলেন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ আলী আশরাফ। এই অনুবাদগুলোর মধ্যে 'নারী অপেক্ষমাণ' কবিতাটি আমার নিজের খুব ভালো লাগে। অনুবাদের এক জায়গায় আমি লিখেছি, 'আমি আকর্ষণ করছি তোমাকে আমার সান্নিধ্যে। তুমি রমণী। তোমাকে আমি মুক্তি দেব না, আমি তোমার জন্য কল্যাণ। আমি তোমার এবং তুমি আমার–শুধু আমাদের হিত সাধনের জন্য নয়, সকলেরই হিত সাধনের জন্য। তোমার তন্দ্রায় যারা সুসুপ্ত মহিমান্বিত নায়ক এবং কবি তারা জাগরিত হয় আর কারও স্পর্শে নয়, একমাত্র আমার স্পর্শে।' সম্প্রতি এ গ্রন্থটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

আমি ঐ বছর পাকিস্তান সরকার কর্তৃক দ্বিতীয় বার জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য মনোনীত হই। করাচীতে এই কেন্দ্রটি যখন প্রথম স্থাপিত হয় তখন এর পরিচালনার সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম। ঢাকায় যখন এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এই শাখার কর্মবিধি আমি প্রস্তুত করি এবং সরদার জয়েনউদ্দিনকে এর পরিচালক নিযুক্ত করি। ক্রমান্বয়ে কয়েকটি বছর আমি এই প্রতিষ্ঠানের কর্মধারার সঙ্গে জড়িত ছিলাম। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে বাঙালী পাঠকের পাঠাভ্যাসসংক্রান্ত একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপটি জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের উদযোগে বাংলা একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত হয়। এ বছরের এপ্রিল মাসে এই জরিপটি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়।

ঐ বছর বাংলা একাডেমীর পরিচালক হিসাবে আমি ২৫শে জুলাই তারিখে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অশীতিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে একটি সংবর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন করি। উক্ত সংবর্ধনা সভায় ডঃ শহীদুল্লাহকে যে মানপত্র দেয়া হয় সে মানপত্রটি আমার লেখা ছিল। উক্ত মানপত্র থেকে অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করছি ঃ

'উদ্দীপ্ত ধর্মবোধ ও ন্যায়ানুসরণ চিরদিন আপনার লক্ষ্য ছিল। আপনার জীবনে তা যেমন অনুসৃত হয়েছে অন্যের জীবনেও তা সংক্রমিত হয়েছে। আপনার ধর্মবোধ ও ন্যায়ানুশীলনতা চিরকাল মানুষের অবলম্বন হোক এই আমাদের প্রার্থনা। যথার্থ জ্ঞান যে মানুষকে স্পর্ধিত করে না, বিনয়ী করে, আপনি তার দৃষ্টান্তস্থল। অনবরত অনুসন্ধিৎসায় আপনার চিত্ত সকল মুহূর্তেই সচল এবং আনন্দিত। আপনার সাহচর্য লাভ করে আমরা সকলেই গৌরবান্বিত।

প্রার্থনা করি, সবল দেহ, সুস্থ মন ও আনন্দিত চিত্তের অধিকারী হিসাবে আরও দীর্ঘকাল ধরে আমাদের মধ্যে থেকে আপনি আমাদের অনুপ্রেরণা দান করতে থাকুন।'

বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানের পর ডক্টর শহীদুল্লাহকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

www.pathagar.com

ঐ বছর রকফেলার ফাউন্ডেশনের গিলপ্যাট্রিক ঢাকায় আসেন এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গিলপ্যাট্রিক একজন সজ্জন ব্যক্তি। তিনি একবার আমাকে আমেরিকায় ভাষাতত্ত্বের প্রশিক্ষণের জন্য পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে সময় আমাকে যেতে দেয়া হয় নি। এবার তিনি এলেন অন্য প্রস্তাব নিয়ে। বাংলাদেশে নাট্যচর্চার ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হয়ে তিনি সাব্যস্ত করলেন যে আমাদের ভাষার একজন নাট্যকারকে তিনি শ্রীলংকায় পাঠাবেন। নুরুল মোমেন এবং মুনীর চৌধুরী উভয়ের সঙ্গেই এ ব্যাপারে গিলপ্যাট্রিকের আলোচনা হয়। শ্রীলংকার ডক্টর শরৎচন্দ্র ছিলেন সে অঞ্চলের নাট্য আন্দোলনের পুরোধা। তিনি শ্রীলংকায় পরীক্ষামূলক অনেক নাটক লিখেছেন এবং সেগুলোর অভিনয়েরও ব্যবস্থা করেছেন। সেজন্যই শ্রীলংকাকে গিলপ্যাট্রিক বেছে নিলেন। পরে অবশ্য জাপানেও একজনকে পাঠানো ঠিক হয়। শ্রীলংকায় কারো যাওয়া হয় নি। কিন্তু মুনীর চৌধুরী ইউনেস্কোর একটি নাট্যসংক্রান্ত সেমিনারে টোকিও গিয়েছিলেন। গিল প্যাট্রিকের জন্য বাংলা একাডেমীতে একটি গানের আসর করেছিলাম। উক্ত আসরে ফাহমিদা খাতুন রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছিলেন। গিলপ্যাট্রিক একজন সঙ্গীত আগ্রহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রাচ্য সঙ্গীত নিয়ে কিছু চিন্তা ভাবনাও করেছিলেন। একবার টোকিওতে রকফেলার ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে একটি আন্তর্জাতিক সঙ্গীত সম্মেলন হয়েছিল। সম্মেলনের নাম ছিল 'সঙ্গীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'। এই সম্মেলনে ভারত থেকে উদয়শংকর গিয়েছিলেন। মূলতঃ নিকোলাস নবকোভের প্রেরণায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পেরেছিল। নবকোভ নিজে ছিলেন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের একজন প্রধান প্রবক্তা। তাঁর অনেকগুলো ব্যালে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে। নবকোভ সম্পর্কে অন্যত্র আমি বলেছি সুতরাং এখানে আর বিশেষ কিছু বলছি না। টোকিও সঙ্গীত সম্মেলনটি খুবই সফল হয়েছিল। সম্মেলনের মূললক্ষ্য ছিল প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন এবং উভয় সঙ্গীতের মিশ্রণ সম্পর্কে পরীক্ষা করা। জাপানী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এটা অনেকটা সফলকাম হয়েছে বলে শুনেছি। ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রবিশংকর এবং আলী আকবর খান এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন।

আমি ঐ বছর কবিতা নিয়ে খুব বেশী ব্যস্ত ছিলাম। প্রায় প্রতিদিনই কবিতা লিখেছি এবং লিখিত কবিতার অধিকাংশই পছন্দ না হওয়ায় ফেলে দিয়েছি। কবিতা লিখতে গিয়ে শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক নিয়ে ভেবেছি। রামচরিত মানসের কবি তুলসী দাস শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক সাগরের সঙ্গে তরঙ্গের সম্পর্ক বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সাগরের বিক্ষোভ অনবরত প্রবাহ উদ্বেগ, উচ্ছলতা আবার কখনও কখনও সহসা শান্তি তরঙ্গ-বৈচিত্র্যে ধরা পড়ে, শব্দের তাৎপর্য তেমনি তার বিন্যাস বৈচিত্র্যের কারণে নব নব অর্থবহতার মধ্যে ধরা পড়ে। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দও কতবার বিমুগ্ধ চিত্তের কলগান বহন করেছে কতবার মানুষের আর্তনাদকে উন্মোচিত করেছে, কতবার আনন্দের অর্থহীন কাকলিকে বাতাসে আকাশে ছড়িয়েছে এবং কতবার যে বাককুণ্ঠতার স্মারক হয়েছে তা কেউ জানে না। আমরা শুধু জানি যে শব্দ সর্বদাই অর্থের মধ্যেই পল্লবিত, সমুদ্র যেমন তরঙ্গের মধ্যে বিগলিত এবং প্রাণসঞ্চয় যেমন নিঃশ্বাসের মধ্যে সঞ্চারিত।

www.pathagar.com

আমি লক্ষ্য করেছি যে, কোন একটি বস্তুর নাম যখন আমার মনে জাগে তখন অনেকগুলো বিশেষণ নিয়ে নামটি উদ্ভাসিত হয়। এভাবে শব্দার্থের ব্যাপ্তি এবং পরিমাপ আমার মনের কাছে সর্বমুহূর্তেই ধরা পড়েছে। কোন এক ইংরেজ সমালোচক বলেছেন যে শব্দ হচ্ছে দাবা খেলার গুটি। একটি বিশেষ মুহূর্তে একজন কবির স্মৃতিতে যতগুলো শব্দ থাকে তা নিয়েই তার বহু বিচিত্র কথার খেলা। নতুন শব্দ যোগ করা চলে না, পুরাতন শব্দকে অস্বীকার করা যায় না। এভাবে একজন কবি আয়ত্তাগত শব্দের সামগ্রিকে নব নব বিন্যাসে নতুন নতুন উপলব্ধির স্মারক করে তোলে। শব্দের অর্থ কবিরা নির্মাণ করেন না, আবিষ্কার করেন। ভাষাকে একটি জাতির চৈতন্যোদয়ের কুশল সম্ভাষণ বলে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন আমাদের দেহের ত্বক শরীরের সঙ্গে স্বাস্থ্য, জীবন এবং স্পর্শের অনুভূতি নিয়ে সংলগ্ন, তেমনি আমাদের ভাষা জাতির অস্তিত্বের সঙ্গে বিজড়িত। আমি এক জায়গায় লিখেছি যে ভাষা হচ্ছে একটি জাতির ওষ্ঠ লালিত জীবনের কাকলি। শব্দ তার শিকড় নিয়ে, পারিপার্শ্বিক পরিচয় নিয়ে এবং সর্বযুগের ব্যবহারের স্মৃতি নিয়ে একজন কবির কাছে অনবরত আবিষ্কৃত হতে থাকে।

আমি একবার প্যারিসে কবি পিয়ের ইমানুয়েলকে শব্দের এই তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'শব্দ হচ্ছে একটি জাতির সংস্কৃতি বিকাশের পথ। শব্দের সাহায্যে একটি জাতি তার সংস্কৃতির রূপরেখা নির্ধারণ করে এবং মানুষ তার আত্মপরিচয় আবিষ্কার করে। সেজন্য একজন কবিকে তার নিজের ভাষার অধিকার অর্জন করতে হয়। একজন কবি তার ভাষার অতীত এবং বর্তমান উভয় অভিব্যক্তি নিয়ে চিন্তা করবেন। আমি আমার কবিতায় ফরাসী ভাষার প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যের লালিত্যকে অধিকার করবার চেষ্টা করেছি। তুমিও যদি তোমার ভাষার অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করো, তাহলে তোমার কবিতার জন্য নতুন সম্ভাবনা উন্মুক্ত করতে পারবে।'

॥৩৭॥

১৯৬৬ সালে ডাইরীর প্রথম পাতায় বৈষ্ণব পদাবলীর কতকগুলো চরণ লিখে রেখেছিলাম। চরণগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দ দাসের একটি চরণ হচ্ছে 'লেখক খোয়ায়লু দিবস লিখি লিখি।" এর অর্থ হচ্ছে পথের ধুলায় তার আগমনের অপেক্ষায় দিবস গণনার চিহ্ন রাখতে রাখতে করনখ ক্ষয় হল। অন্য একটি চরণ বিদ্যাপতির–"লোচন লোর তটিনী নির্মাণ।" এর অর্থ হল–নয়নের জলে নদী নির্মিত হল। আর একটি চরণ ছিল বিদ্যাপতির– "নিজভাব স্বভাবহি বিছুরল" – অর্থাৎ তন্ময়তার জন্য আপন ভাব ও স্বভাব বিস্মৃত হল। গোবিন্দ দাশের আর একটি চরণ ছিল– "শুভসূচক যত প্রাত অঙ্গে বেকত"–অর্থাৎ কল্যাণের অথবা উল্লাসের সমস্ত চিহ্নগুলি তাঁর অঙ্গরেখায় ব্যক্ত হয়েছে। এগুলো কেন লিখেছিলাম জানি না, কিন্তু একই দিনে একটি কবিতা লিখেছিলাম যাতে উদ্ধৃতিগুলোর তাৎপর্য বোঝা যাবে। কবিতাটির প্রথম লাইন হচ্ছে "তুমি আমার অনবরত কথা বলার আনন্দ"–কবিতাটিতে আমি একজন রমণীর উপস্থিতি এবং কলমুখরতার কারণে কবিচিত্তে যে আনন্দের সঞ্চার হয়েছে তার একটা বিবরণ দিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

বলেছিলাম যে প্রেমের কথাগুলো শিশিরের মত ঝরে ঝরে প্রথম রৌদ্রের দৃষ্টি ছুঁয়ে নিঃশেষ হয়।" এই কবিতাটি আমার "উচ্চারণ" গ্রন্থের প্রথম কবিতা।

এ বছর প্রায় প্রতিদিন একটি করে কবিতা লিখেছি। কবিতা লেখা শেষ হয়েছে শুক্রবার ২০শে মে তারিখে। তার কারণ বোধহয় ২১শে মে তারিখে আমি টোকিওতে রওয়ানা দেই একটি সেমিনারে যোগ দিতে। টোকিওতে ২৫শে মে থেকে ৩১শে মে পর্যন্ত ইউনেস্কোর একটি সেমিনারে ইউনেস্কো সেক্রেটারীয়েটের উপদেষ্টা হিসাবে যোগদান করি। উক্ত সেমিনারে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু আমি ইউনেস্কোর নিজস্ব কর্মকর্তা হিসেবে সেমিনার চলাকালীন সময়ে উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। ইউনেস্কোর নিয়ম অনুসারে উপদেষ্টা হচ্ছে যে কোন আন্তর্জাতিক সেমিনারে সর্বোচ্চ সম্মান। উক্ত সেমিনারে আমি ছাড়া ভারত, চেকোস্লোভাকিয়া এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরো তিনজন উপদেষ্টা ছিলেন। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল চারটি ঃ ক. এশিয়ার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে পুস্তকের ভূমিকা। খ. প্রতি দেশে জাতীয় ভিত্তিতে গ্রন্থ বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ। গ. এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে পুস্তকের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। ঘ. এশিয়ার দেশসমূহ থেকে ইউরোপে পুস্তক প্রেরণের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অবলম্বনের চেষ্টা। কনফারেন্স শেষে আমি দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে হংকং-এ কয়েকদিন অবস্থান করি।

জাপানে যাওয়ার বিবরণটি আমার ডায়রীতে যেভাবে লিখিত আছে পাঠকের কৌতূহলের জন্য তা অবিকল তুলে দিচ্ছি ঃ ডায়রীর এন্ট্রিটি হচ্ছে ২১শে মে, ১৯৬৬।

"সকালবেলা বাংলা একাডেমীতে অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যে কাটলো। দু'জন মান্যবর অতিথিকে সংবর্ধনা জানাতে হলো–সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি কর্নেলিউস এবং জাস্টিস এস এ রহমান। আমি জাস্টিস রহমানকে ডেকেছিলাম। প্রধান বিচারপতির সঙ্গে কোনও কথাই হয় নি। আমার গাড়ি যখন সার্কিট হাউজে গিয়েছে তখন জাস্টিস কর্নেলিউস বারান্দায়, কোথাও যাবেন, গাড়ির অপেক্ষায় ছিলেন। আমার গাড়ি দেখে উঠে বসলেন, ভাবলেন যে তাঁর জন্যই গাড়ি এসেছে। একাডেমীতে এসে ভুল বুঝলেন, কিন্তু প্রমাণ দিলেন না যে ভুল হয়েছে। তিনি ভাব দেখালেন যে তিনি ঠিক জায়গায় এসেছেন, আমিও ভাব দেখালাম আমি তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। জাস্টিস রহমানকে পরে গাড়ি পাঠিয়ে আনানো হয়। এঁরা বিদায় নিলেন সাড়ে বারোটায়। এরপর আরও কয়েকজন অভ্যাগত আসেন। সংক্ষেপে সংলাপ সেরে তাদের বিদায় দিয়ে বাসায় এলাম দেড়টায়। খেয়ে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করে বিমানবন্দরে এলাম ৩টা ৪০ মিনিটে। যাত্রা আমার ব্যাংকক হয়ে টোকিও। ইউনেস্কোর একটি সেমিনারে যোগ দিতে চলেছি– এশিয়ার পুস্তক প্রকাশনা ও প্রচার। আমি ইউনেস্কোর সেক্রেটারিয়েটের উপদেষ্টারূপে আমন্ত্রিত হয়েছি। অনেকদিন পর বাইরে বেরুতে পারলাম। এতেই আমার আনন্দ। আমি যোগ দিলাম বলে কনফারেন্সের কোনও উপকার হবে না নিশ্চয়ই, কেননা আমি যান্ত্রিক এবং ব্যক্তিগত অর্থে প্রকাশক নই। এ সেমিনারে আমার কি প্রয়োজন হবে, জানি না,; কিন্তু অল্প কিছুদিনের জন্য বাইরে বেরুতে পারলাম, এটাই আমার প্রচণ্ড লাভ।

www.pathagar.com

তাই ইন্টারন্যাশনাল বিমানটিতে আমার নতুন একটি প্লেনে চড়ার অভিজ্ঞতা হবে ভেবেছিলাম। কিন্তু জানা গেল যে এটি এসএএস-এর নামান্তরমাত্র। তাছাড়া বিমানটি ক্যারাবেল জেট। এসএএস একটি পরিচিত বিমান কোম্পানী, ক্যারাভেলও পরিচিত জাহাজ। নতুন শুধু আঞ্চলিক পোশাক পরিহিতা থাই এয়ার হোস্টেসগুলো। একজনের নাম রত্না, আর একজনের নাম করুণা। মেয়েগুলি অত্যন্ত কর্মপটু এবং কথাবার্তা ও আচরণে নিয়মগত দক্ষতার সঙ্গে একটি সহজ কুশলতা আছে। যতক্ষণ প্লেনে ছিলাম অনবরত খেতে দিয়েছে। আবার এদিকে যতই পূর্বে যাচ্ছি ঘড়ির সময় বাড়ছে এবং ঘড়ির কাটার হিসেবে লাঞ্চের পর ডিনারের ব্যবস্থা হচ্ছে। আসলে কিন্তু কালের পরিধিতে তিন ঘন্টা কম সময়ক্ষেপণ হল।

ব্যাংকক পৌঁছবার পূর্বে রেঙ্গুনে আধ ঘন্টার জন্য প্লেন নেমেছিল কিন্তু ট্রানজিট যাত্রীদের প্লেন থেকে নামার নিয়ম নেই। তাই তিরিশ মিনিট সময় গতিহীন অচল প্লেনের মধ্যে বসে রইলাম। ব্যাংকক বিমানবন্দরে প্লেন থামলো রাত সাড়ে দশটায়। এয়ার কোম্পানীর খরচায় যে হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল তার নাম কিং হোটেল। হোটেল বড় হলেও উল্লেখযোগ্য তেমন নয়। গোছলের জন্য শাওয়ারের ব্যবস্থা আছেমাত্র, সাবান নেই, টাওয়েল নেই। সবকিছু বারবার চেয়ে নিতে হয়। তাছাড়া এয়ার কন্ডিশনারটি সারারাত এমন শব্দ করছিল যে ভালো ঘুম হয় নি। হোটেলে পৌঁছেই আবুল হোসেনকে টেলিফোন করেছিলাম। সকালের দিকে আসতে বললাম। আবুল হোসেন এলো সাড়ে সাতটার দিকে। আবুল হোসেন একই রকম আছে। একসময় যখন কবিতার সূত্রপাত হয়েছিল আমাদের জীবনে ১৯৩৮-৩৯-এর দিকে তখন আবুল হোসেন আমার অনেক অগ্রসর। আধুনিক ইংরেজী কবিতার যা বিশিষ্টতা অর্থাৎ সংলাপের অব্যবধানগত সহজতা বুদ্ধদেব বসুর ধারায় আবুল হোসেন তার পরীক্ষা করেছিলেন।

কোথাও কোনও যাত্রা করলে আমার মনে মৃত্যুচিন্তা জাগে। কেন জাগে জানি না। অন্যদিকে সচ্ছলতার কারণে মানুষ যে মৃত্যুচিন্তা হারায়, তার মাঝে একটি বিরাট শূন্যতা আছে। পর্যাপ্ত ঐশ্বর্য মানুষকে মৃত্যুচিন্তা থেকে সরিয়ে নেয়, জীবন থেকেও। কোনও না কোনও বিষয়ে মানুষ যদি অসহায় বোধ না করে তাহলে অনুভূতির সঙ্গে তার স্বয়ম্বর হবে কি করে? চিত্তবৃত্তির ক্ষেত্রে আমি চিরকাল অসহায় বোধ করি। চিন্তা দিয়ে এ অবস্থা আমি গড়িনি, এ আমার স্বভাব। এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে যেখানে আমার বয়স হয় নি। তাই আমি প্রেমিক। আমি যেমন প্রেমের প্রার্থনা করি, তেমনি অন্যের প্রার্থনায়ও সাড়া দেই। যেখানে শরীরের জীর্ণতার সঙ্গে মানুষ প্রেমের বোধ হারায়, সেখানে চেতনা কিন্তু আমার বয়সে আমার প্রেম দেহ-ভিত্তিক একটি যৌন চেতনা কিন্তু আমার বয়সে আমার জন্য স্নায়ু-চর্চার অবসর নেই। তাই আমি নিভৃত হৃদয়ের কলরবকে বাঁচিয়ে রাখতে চাচ্ছি এবং এভাবে হৃদয়ের কলরবকে বাঁচাতে গিয়ে কখনও আর্তনাদকে, কখনও শংকাকে, কখনও তন্ময়তাকে এবং সকল প্রার্থনার অসম্পূর্ণ উত্তরের কথা ভেবে যে অসহায়তা তাকে মূল্য দিয়েছি। তাই আমি মৃত্যুর কথা ভাবি যেখানে সমস্ত পার্থিব সঞ্চয়ের শেষ। তাইতো

www.pathagar.com

প্রেমের উচ্ছলতায় আমার তোমার সকলের চোখে বাণীর প্রদীপ জ্বেলে একটি আকুলতার রাজ্য নির্মাণ করি যা চিরকাল বেঁচে থাকবে প্রতিদিনের সূর্যোদয়ে, প্রজাপতির ডানায়, পাখীর চোখে, হঠাৎ বৃষ্টির বর্ষণের আনন্দে এবং ওষ্ঠপুটে মমতার উচ্চারণে।

যেদিন আমার জন্য প্রেম থাকবে না, যেদিন চিত্ত পুরনো স্মৃতিকে নিয়েই শুধু অসচল জলাশয় হবে সেদিনই আমার অস্তিত্বের শেষ। সেদিনের সর্বনাশকে আজ আমি প্রত্যক্ষ করতে চাই না। আজ আমি তাপহীন শীতল অন্ধকারকে কাম্য ভাববো না, আজ মধুর উষ্ণতায় অনুভব করবো যে এখনও আমার অনেক কথা বলবার আছে, এখনও ভালবাসার একটি বিনয়াবর্তে দুটি বাহুকে ব্যবহার করতে পারি।

টোকিওতে এসে পৌঁছলাম ১৯৬৬ সালের মে'র ২২ তারিখ রাত সাড়ে দশটায়। তখন খুব বৃষ্টি পড়ছে, বাতাসও প্রবল। শীত লাগলো বেশ। এয়ারপোর্টে কেউ আসে নি কিন্তু নির্দেশ এসেছে যে এয়ারপোর্টে লিমোজিনে টোকিও প্রিন্স হোটেলে উপস্থিত হলেই হবে, আমার জন্য ব্যবস্থা আছে। গাড়ি করে আসছি যখন, তখন বাইরে দেখবার চেষ্টা করলাম কিন্তু গাড়ির জানালাগুলো এত ঘোলাটে হয়ে আছে যে কিছুই দেখা যায় না। পথের নিয়ন লাইটগুলো ছায়া-ছায়ার মতো কোন কিছুকে স্পষ্ট করছে না। একটি দীর্ঘ প্রশান্ত পথ দিয়ে চলছি। বৃষ্টির জন্য জনমানবশূন্য শুধু গাড়িগুলো শব্দ করে পানি ছিটিয়ে ছুটে যাচ্ছে। একটি বিরাট শহর, বিরাট কেন—পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ এভাবে যদি মুখ ঢেকে থাকে তাহলে পর্বতপ্রমাণ বিষণ্ণতায় হৃদয় মুহ্যমান হয়। প্রথমবার যখন এসেছিলাম ১৯৫৮ সালে তখন অসম্ভব আলোর বন্যায় পথের দুদিকের দৃশ্যগুলো এক সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো। কোনও একটি ছবিকে চোখে ধরে রাখতে পারি নি, বাড়িঘর, দোকান ছেলেমেয়েরা, ছুঁয়ে গিয়েছিল। সবকিছু হারিয়ে তাই চোখ বুজে সঙ্গে দেখতে দৃশ্যকে দৃষ্টিপাতের সবটুকুকে অক্ষয় করতে ইচ্ছে হয়। এবারে বৃষ্টির বিলাপে যে কুয়াশা সৃষ্টি হয়েছে তা আমাকে স্মৃতিনির্ভর করলো। আমার অন্তরঙ্গতার রাজ্য থেকে মনের দৃষ্টিতে প্রজাপতির মতো ভেসে এলো কখনও দুটি বাহু নিটোল কয়েকটি করাঙ্গুলী, ঘুমের অন্তরালের মতো দুটি চোখ এবং শব্দ উচ্চারণের চেষ্টায় কম্পমান দুটি ওষ্ঠ। বিদেশে একাকী পথযাত্রায় এভাবে স্মৃতির অবলম্বনটি একটি বিরাট আশ্রয়।

হোটেলে পৌঁছতে দেরী হল। এয়ারপোর্ট লিমোজিনে যাত্রী আমি একা নই, আরও অনেকেই ছিলেন। সকলেই আবার একই হোটেলে নামছিলেন না। আমার হোটেল টোকিও প্রিন্স হোটেল—গত অলিম্পিকের সময় যে কয়টি নতুন হোটেল তৈরি হয়েছে তার মধ্যে একটি। বিরাট হোটেল। প্রতিটি ঘর অসম্ভব প্রশস্ত। হাত-পা ছড়িয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়া চলে। অনেকে ছোট হোটেলে থাকা পছন্দ করে খরচ কম, মানুষের জটলা নেই। আমি কিন্তু বিদেশে এসেই একটি বিলাসকে প্রতিপাদ্য করি—বড় হোটেলে আরাম করে থাকা। বড় হোটেলের একটি বিশেষ আরাম হল বড় বাথটাবে গরম পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে শুয়ে থাকা। পানির উষ্ণতা ধীরে ধীরে স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে, সমস্ত শরীর একটি তরলতার মধ্যে ভারহীন অস্তিত্বের মত হয়। কেমন এক প্রকার লঘু স্পন্দনের মধ্যে আমার মন তখন প্রতিদিনকার চিন্তা হারিয়ে ফেলে। আমি শুধু পানির উষ্ণতাকে অনুভব করি। ধীরে

www.pathagar.com

ধীরে গা হাতের আঙুল দিয়ে শরীরকে জানবার চেষ্টা করি। এ ভালো লাগাকে আমি ঠিক বুঝাতে পারছি না। শীতকালে লেপের তলায় শুয়ে ঘুম আসছে বুঝতে পারি যখন তখন স্নায়ুর শিথিলতায় যে নির্বিবাদী আনন্দ বাথটাবে গরম পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে শুয়ে থেকে সে আনন্দই পাই।

আগেরবার ইমপিরিয়েল হোটেলে ছিলাম। দুটি মহাযুদ্ধ, একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্প টোকিও শহরকে নিশ্চিহ্ন করেছিল কিন্তু ইমপিরিয়েল হোটেলটি ভাঙেনি। সেজন্য টোকিওবাসীদের চোখে হোটেলটি জাপানের অক্ষয়তার যে কামনা তার প্রতীক। বহুবার হোটেলটি আরও বড় করে গড়বার কথা হয়েছে কিন্তু টোকিও জনসাধারণের প্রতিবাদে তা সম্ভব হয় নি। হোটেলের ভিতরকার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আধুনিক কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে পুরোনো দিনের স্মারকচিহ্ন মনে হয়।

বড় হোটেলে রুমের মধ্যে যখন থাকি তখন একাকিত্বের একটি বিরাট অবসরের নিশ্চিন্ততাকে পাই। কিন্তু খাবার ঘরে, লাউঞ্জে, কিংবা সামনের বারান্দায় নামলে একটি কলরবের মধ্যে হারিয়ে যাই। তখন আর বড় হোটেলকে ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে ভাবি যদি মানুষের চিত্ত প্রতিবাদহীন হত, তাহলে কলরব-কোলাহলের আয়ত্তে সে আসতো না। গ্রহণ ক্ষমতার অতীত যে কলরব তা আমরা কখনই শুনি না। যে প্রচণ্ড শব্দে পৃথিবীর নিত্য সূর্য-পরিক্রমা তা আমাদের শ্রবণ-ক্ষমতাকে নিঃশব্দ করে দেয়। কিন্তু যে শব্দ আমার বোধের পৃথিবীর প্রতি মুহূর্তের যন্ত্রণা তাকে আমি হারাতে চাইলেও সে আমাকে আক্রমণ করে। বড় হোটেলের রিসেপশন ঘরে, পোর্টিকোতে, ডাইনিং হলে অনবরত শব্দের আক্রমণ আমাকে অসম্ভব তাপিত করে। সে সময় চিন্তা করতে চাই, স্মরণকে প্রাধান্য দিতে চাই, একটি বঞ্চনার বেদনাকে নির্মাণ করতে চাই। উপস্থিতির বিস্মরণ তখনই সম্ভব যখন অতীতের স্মরণের একটি অনিবার্যতা থাকে। কিন্তু অনিবার্যতার জন্য আমাদের স্মৃতির বিশেষ বিশেষ ঘটনার যে আন্তরিক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন তা হয়তো সব সময় সকলের থাকে না। আমি সেজন্য বিশেষ বিশেষ স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখি এবং একটি বিমুগ্ধ সম্মোহনের মধ্যে তাকে লালন করি।

রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে জীবনকে বন্যার মতো দেখলাম। আমি যেন একটি অসহায় প্লাবন, তুমুল হট্টরোল তুলি প্রান্তরকে ভাসিয়ে দিই। আবার নির্জন কণ্ঠস্বরের মতো অস্পষ্টতায় হারিয়ে যাই। আমার শয্যা শূন্যে ভাসছে কখনও মেঘের মত, কখনও সমুদ্রের মতো। প্রতিরোধের চেষ্টায় দু-বাহু বাড়িয়ে কোনও কিছু অবলম্বন করতে যেয়ে হঠাৎ দেখলাম একটি জলপ্রপাতের শিখরদেশে দাঁড়িয়ে আছি। আমি কথা বললাম—আমার কথাগুলো প্রথমে বাষ্প হল, পরে রঙিন প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল।

পরদিন সকাল বেলা ঘুম ভেঙে পুবের জানালা দিয়ে ঘরে রোদ ঢুকেছে দেখলাম।

॥৩৮॥

সব পুরনো কথা শৃংখলাবদ্ধভাবে স্মৃতিতে জাগে না। অনেক সময় অনেক পুরনো ঘটনা পুরোপুরি সুপ্ত থাকে, সময়মত মনে পড়ে না এবং যখন মনে পড়ে বৃত্ত বর্ণনার ধারাক্রমের মধ্যে আসে না। তবুও কিছু কথা আছে যেগুলো বলা প্রয়োজন। আমি এরকম

www.pathagar.com

অনেক কথা বিস্মৃতিতে হারিয়ে ফেলেছি, জীবনবৃত্ত বর্ণনার ধারাক্রমের মধ্যে সেগুলোকে আনতে পারি নি। এখন সেগুলো নতুন করে মনে পড়ছে। সঙ্গতিতে না আসুক, তবুও যেহেতু এগুলো আমারই কথা এবং আমারই জীবনের পরিচিতি নির্মাণে একসময় কার্যকর ছিল তাই সেগুলোর কয়েকটি এখন বলব।

আমি একবার ঢাকা থেকে লৌহজং গিয়েছিলাম। আমার এক ছোট বোন সৈয়দা সিদ্দিকা বানু তার স্বামী এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতো। সেখানে তার স্বামী ছিল জাহাজ কোম্পানীর ঘাট সুপারভাইজার। লৌহজং-এ তার অফিস ছিল। তাদের আমন্ত্রণক্রমে আমি কিছুদিনের জন্য লৌহজং-এর গ্রামীণ পরিবেশে বেশ কয়েকটা দিন কাটিয়েছিলাম। ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জে আমার বড় বোনের বাড়িতে একরাত্রি কাটিয়ে রাত্রিশেষের দিকে লৌহজং-এর জাহাজে আমি উঠেছিলাম। আমি, আমার স্ত্রী এবং চার ছেলেমেয়ে আমরা প্রথম শ্রেণীর পুরো একটি প্রকোষ্ঠ ভাড়া নিয়েছিলাম। নদীতে ভাসমানতা আমার ভালো লাগে। চতুর্দিকে পানির বিস্তার এবং দুপার্শ্বে গ্রামের রেখাগুলো আমার মনে সবসময় ভাবালুতার সৃষ্টি করে। গ্রামের বাড়িঘর চোখে পড়ে না, কিন্তু সবুজ বৃক্ষরাজির আবরণ চোখে পড়ে। এত বিপুল বৃক্ষসম্ভার শহরে চোখে পড়ে না, বৃক্ষরাজির অন্তরালে বাড়িঘর থাকে সেগুলো কল্পনা করে নিতে হয়।

জাহাজে যাওয়ার পথে কেন যেন ক্ষুধা লাগে খুব। সেই ক্ষুধার্ত অবস্থায় জাহাজের খাবার খুবই তৃপ্তিদায়ক মনে হয়। আমার অভিজ্ঞতায় জাহাজের রান্না ভালো হয়, অন্তত পক্ষে আগে তো হত। আমার স্ত্রীও জাহাজের রান্না খুব পছন্দ করতেন। লৌহজং-এ যাওয়ার পথে দুপুরের খাবার জাহাজেই খেয়েছিলাম। সাদা চালের ভাত, একটি ভাজি, ঝাল করে রান্না মুরগীর গোশ্‌ত এবং ঘন ডাল। সবকিছুই অতীব সুস্বাদু ছিল। ডালটি আমার কাছে সবচেয়ে ভাল লেগেছিল। জিরার বাগার দেয়া ডালে সুগন্ধও হয়েছিল।

যদ্দুর মনে পড়ে বিকেলে লৌহজং এসে পৌঁছেছিলাম। আমার ভগ্নীপতি ঘাটেই উপস্থিত ছিলেন। বিরাট আমবাগানের আড়ালে আটচালা একটি ঘর তারা ভাড়া নিয়েছিলেন। ঘরের সামনে প্রশস্ত আঙ্গিনা এবং পশ্চিম পার্শ্বে বাড়ির মালিকের ঘর। বাড়ির মালিক ছিলেন এক বৃদ্ধা মহিলা। আমবাগান পার হলে আর একটি বড় বাড়ি। সে বাড়িটা ছিল আমার শিক্ষক শামসুদ্দীন সাহেবের ছোট ভাইয়ের। এই ভদ্রলোক খুবই সুজন ছিলেন। লৌহজং-এ কথা বলার লোক একমাত্র তাকেই পেয়েছিলাম। প্রায় প্রতিদিন বিকেল বেলা এ ভদ্রলোকের বাড়ির দহলিজে গিয়ে বসতাম এবং গল্পগুজব করতাম।

লৌহজং-এ মনে পড়ে বিশেষ করে সেখানকার মাছ এবং দুধের জন্য। শীতের শুরুতে গিয়েছিলাম, তখন প্রচুর পাবদা মাছ পাওয়া যেত। ১৬ থেকে ১৮ ইঞ্চি লম্বা হয় একেকটি মাছ। এত বড় মাছ শহরে আমরা পেতাম না। রান্নার জন্য গ্রামের একটি মেয়েলোককে কয়েকদিনের জন্য নিযুক্ত করেছিলাম। মেয়েলোকটি রান্না করতো ভাল। আর এক রকমের মাছ পাওয়া যেত সে হল তপসি মাছ। কলকাতায় তপসি মাছ খেয়েছি আর লৌহজংয়ে তপসি মাছ দেখলাম। তপসি মাছ ভাজা খেতে খুব সুস্বাদু। লৌহজংয়ে দুধ ছিল খুব সস্তা। তখন একসের দুধ চার আনায় পাওয়া যেত অর্থাৎ এখনকার দিনের পঁচিশ পয়সায়। দুধের রং জ্বাল দিলে হলুদ হয়ে যেত এবং অল্পতেই ঘন হত। আমার ছেলেমেয়েরা খুব স্বাদের সঙ্গে এখানকার দুধ খেতো। লৌহজং-এ অল্পদিনে ছেলেমেয়েদের শরীর পরিপুষ্ট হয়েছিল এবং আমিও খুব উৎফুল্ল ছিলাম। কিন্তু একটি ভয়ের

www.pathagar.com

কারণে সেখানে বেশিদিন থাকা গেল না। লৌহজং এলাকাটি সে সময় ডাকাতির জন্য বিখ্যাত ছিল। বহিরাগত কেউ এলেই ডাকাতরা তাদের খবর পেয়ে তাদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যেত। বাধা দিলে হত্যা করতেও দ্বিধা করতো না। আমাদের সঙ্গে কিছুই ছিল না, সুতরাং আমাদের ভয় পাবার কিছু ছিল না, কিন্তু ডাকাতরা তো সে খবর রাখতো না। সুতরাং বিপদ আসার সম্ভাবনা ছিল। দিন সাতেক থাকার পর বাড়িওয়ালী বুড়ি আমার ভগ্নীপতিকে ডাকাতদের সম্পর্কে সজাগ করে দিল। বুড়ি বললো যে ডাকাতরা আমরা যে এসেছি সে খবর পেয়েছে, সুতরাং যে কোন সময় হামলা করতে পারে। আমি শামসুদ্দীন সাহেবের ভাইকে এ খবর দিলাম। তিনি থানার দারোগাকে জানালেন। কিন্তু আমরা আর লৌহজংয়ে অবস্থান করলাম না। যেদিন ডাকাতের কথা শুনলাম তার পরের দিনই লৌহজং ছেড়ে ঢাকায় চলে এলাম।

লৌহজংয়ের কথা বললাম এজন্য যে আমার জীবনে গ্রামের প্রশ্রয়টা খুব কম। শৈশবে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছিলাম তারপর থেকেই আমি শহরের অধিবাসী। এই শহরে অবস্থানের জীবনে একবার কিছুদিন গ্রামে কাটাবার সুযোগ হয়েছিল এবং সেই গ্রাম হল লৌহজং।

লৌহজংয়ে আমি কি পেয়েছিলাম–এ প্রশ্ন কেউ কেউ আমাকে করতে পারেন। আমি সুস্পষ্ট কোন উত্তর দিতে পারব না, কিন্তু এটা বলতে পারব যে সে সময় গ্রামীণ পরিবেশটা আমার ভালই লেগেছিল। প্রতিদিন সকাল বেলা নদীতে সাঁতার কাটতাম, পানির স্রোত এবং শীতল প্রবাহ আমার শরীরকে স্পর্শ করত। আমার অদ্ভুত ভাল লাগতো, এক সময় শৈশবে উন্মাদের মত সাঁতার কাটতাম মনে আছে। পানি আমার খুব ভাল লাগতো, পানি থেকে উঠতে চাইতাম না। অনেকদিন পর নাগরিক জীবনযাপনের অবকাশে গ্রামে এসে নতুন করে পানি পেয়ে পুলকিত হয়েছিলাম। মাটিতে মাধ্যাকর্ষণ আমাদের ধরে রাখে, কিন্তু পানিতে সাঁতার জানলে মাধ্যাকর্ষণকে এড়ানো যায়। পানির অতলে তলিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে, কিন্তু সাঁতার জানলে ভাসমান থাকা যায়। এ অবস্থাটা খুবই আনন্দের। আরেকটি মজার কথা হচ্ছে এই পানির মধ্যে নামলে শিশুর মত হাত-পা নাড়তে হয়, সেটাও কম কৌতুক এবং আনন্দের নয়। বিকেল বেলা প্রতিদিন নদীর তীরে বেড়াতে বেরুতাম। তখন উপরে বাধাহীন দৃষ্টির আকাশকে পেতাম, ডাইনে উন্মুক্ত প্রান্তর পেতাম এবং প্রান্তরের সান্নিধ্যে বিশৃংখল অরণ্যের অন্ধকারকে পেতাম। এ সকলের সঙ্গে চিত্তের নিভৃতলোকের আর্তিকে পেতাম। নগরের পরিচয়হীন প্রতিদিনের দেখার মধ্যে যে সংযম, কর্মের দ্রুততার মধ্যে অন্তরের যে অনুদ্ঘাটন লৌহজংয়ের পল্লী-প্রকৃতিতে তা ছিল না, সেখানে মিলনে, বিরোধে অসম্ভ্রমে, যন্ত্রণায় এবং তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষার কোলাহলের মধ্যে মানুষের চিরায়ত স্বাক্ষর ছিল। তাই হঠাৎ সেবার লৌহজংয়ের পল্লীপথে চলতে চলতে আমি নতুন এক পৃথিবীর সৌরভকে পেয়েছিলাম। এ সৌরভ সিক্ত মাটিতে ঝরাপাতার মধ্যে ছড়িয়ে ছিল, কাশফুলের বন্যার মধ্যে আলোকিত হয়েছিল এবং শীতের প্রথম শীতলতায় অজানা পুষ্পগন্ধের মাদকতায় গ্রাহ্য হয়েছিল। এ সমস্ত কারণেই লৌহজংয়ের স্মৃতিটা আমার কাছে আজও মধুর হয়ে আছে। যখন সেখানে গিয়েছিলাম, তখন যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা আমার

www.pathagar.com

জীবনের জন্য খুব প্রাসঙ্গিক ছিল কিনা জানি না. তবে পরবর্তীতে তাকে মূল্যবান মনে হয়েছিল। এখন স্মৃতির সঞ্চয় আমার জন্য অসম্ভব আনন্দের।

একজন কবি অনন্ত সময় এবং কালের বিস্তারের মধ্যে বাস করে তাই তাকে বেদনার অনুকম্পন আবিষ্কার করতে হয়। এ বেদনা স্মৃতির মধ্যে যতটা বিকশিত, জীবনের বর্তমান বা ভবিষ্যতের মধ্যে ততটা প্রবাহিত নয়। প্রভাতের অরুণশ্রীর সুন্দরতার মত সমস্ত প্রাচীন বেদনা এবং ঘটনা কবির চিত্তে নতুন উপলব্ধির ব্যঞ্জনায় জাগ্রত হয়। যে উন্মুক্ত প্রকৃতিকে আমি বিশেষ পরিমণ্ডলে ভালবেসেছিলাম তাকে কখনও হারিয়ে ফেলতে চাই না। সেদিনের গ্রামীণ পরিমণ্ডলের চিহ্ন কোনক্রমেই মুছে ফেলা যায় না। আরও একটি কারণে লৌহজং-এর স্মৃতি আমার কাছে বেদনা মধুর এবং সমাদৃত হচ্ছে ঃ আমার বোনের স্মৃতি। সে আজ জীবিত নেই। লৌহজং-এর কথা ভাবতে গেলে তার কথা বারবার মনে পড়ে।

আমার এ বোনটিকে আমি খুব ভালবাসতাম। সে পড়াশুনায় খুব ভাল ছিল। ম্যাট্রিকে ভাল ফল করেছিল। আইএ পড়বে এমন সময় বিয়ে হয়ে গেল। স্বামীর দারিদ্র্যকে সে ভূষণ করেছিল এবং শত অসুবিধার মধ্যে থেকেও প্রফুল্ল ছিল। দুঃখ এই, তার সাংসারিক জীবনে সকল অসুবিধা দূর হবার পর যখন সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে তখনই সে পৃথিবী থেকে চলে গেল। এর বিয়ের সময় বিয়ের খরচ মেটানোর জন্য আমি আমার “আওয়ার হেরিটেজ” বইটির স্বত্ব পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিলাম। এই টাকা আমি সম্পূর্ণ বাবার হাতে তুলে দিয়েছিলাম। সে সময় আমার নিজের টাকাপয়সায় অসুবিধা ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ টাকাটা দিতে পেরে আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলাম।

বিয়ের অনেকদিন পর একবার আমার এই বোন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। মা ধরে নিয়েছিলেন যে সে আর বাঁচবেই না। অন্ত্রের কি একটা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল এবং কোনকিছুই হজম করতে পারতো না। দিনে দিনে শুকিয়ে শয্যাশায়ী হয়ে গিয়েছিল। এ সময় ডাক্তার ওয়াহেদ তাকে দেখতে আসেন। তিনি প্রথমে আমাদের সবাইকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন যে রোগীকে শেষ অবস্থায় এনে তাঁকে ডাকা হয়েছে। তিনি কোন ওষুধ দিলেন না, কিন্তু এমন একটা কিছু তৈরি করে খেতে বললেন, যা আজো আমাদের কাছে বিস্ময় হয়ে আছে। তিনি গরুর গোশত আদা দিয়ে বেটে ছোট ছোট বড়ি তৈরি করে রৌদ্রে শুকাতে বললেন। প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এই বড়ি একগ্লাস ঠাণ্ডা পানির সঙ্গে সেবন করতে দিলেন। প্রথম দিন একটা বড়ি, দ্বিতীয় দিন দুটো বড়ি এভাবে করে বড়ি বাড়িয়ে নিতে বললেন। তিনদিন না চারদিন পর্যন্ত এই বড়ি খাবার পর আমার বোন সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে গেল। ডাঃ ওয়াহেদ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে একজন দক্ষ চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে এই ধরনের টোটকা ওষুধ দিতেন যেসব ওষুধের বিস্ময়কর ফল পাওয়া যেত। তিনি ধর্মপ্রাণ, ন্যায়নিষ্ঠ এবং আদর্শবাদী পুরুষ ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং এ ঘনিষ্ঠতা সবসময় সমভাবে বিদ্যমান ছিল।

জীবনে সংসার যাপন করতে গিয়ে আমার এ বোনটি অভিযোগ করে নি। বাড়িতে যখন কিছুই থাকতো না তখনও সে হাসিমুখে মানুষের সঙ্গে কথা বলতো। তার স্বামীর পক্ষের

www.pathagar.com

আত্মীয়-স্বজনরা তাকে নানাভাবে বিব্রত রাখবার চেষ্টা করেছে এবং অসুবিধায় ফেলবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে কখনও বিব্রত হয় নি বা হতাশাগ্রস্ত হয় নি। আল্লাহর উপর বিস্ময়কর নির্ভরতা তাকে একটি আশ্চর্য শক্তি দিত। সেই শক্তির বলে সে সংকটের মুখোমুখি হতে পারতো।

জীবনে আনন্দও অবধারিত নয় বেদনাও নয়, উভয় অবস্থাই আমাদের বিশ্বাস এবং জিজ্ঞাসার প্রতিবর্ণীকরণমাত্র। অর্থাৎ আমরা চিত্তে যে অবস্থাকে লালন করতে চাই, আমাদের প্রতিদিনকার গতিবিধিতে তার চরিত্র প্রতিফলিত হয়। যদি এ সত্যকে স্বীকার করি যে আমাদের একান্ত নিভৃত ইচ্ছাতেই আমরা কখনও বেদনার্ত অথবা কখনও আনন্দিত, তাহলে বেদনা বিস্মৃতির জন্য সহানুভূতি যাচ্না করব না বা আনন্দের সামাজিক বিস্তারের জন্য উচ্চকিত হব না। উভয় অবস্থায়ই আমাদের নিভৃত ইচ্ছার ফলরূপে বিদ্যমান থাকে। আমার বোনের দিকে তাকিয়ে এটাই আমার মনে হত।

সময়ের গতিবিধিতে আমরা কখনও কোনও নির্দিষ্ট বিন্দুতে বাস করি না, কিন্তু একটি অচল স্তব্ধতার মধ্যে বাস করছি ভেবে আমাদের সৃষ্টিতে সংকীর্ণ করে তুলি। নিরবধি পৃথিবীতে যে বিপুল কালের মধ্যে আমাদের সর্বস্ব প্রবাহিত সে কালের কল্পনা কি একটি কাল্পনিক খণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে ধরা পড়ে? অনন্ত কালের অসম্ভব এবং অশেষ বিস্তারের মধ্যে মানুষ হিসেবে আমার সাড়া তখনই অতুলনীয়, যখন আমি সমস্ত সময়ের সঙ্গে মিশ্রিত–অতীত এবং আগামীর সঙ্গে। আমার চিন্তার বর্তমান বলে কোন বস্তু নেই। একটি স্তব্ধ নিশ্চলতা কল্পনা করতে পারলে বর্তমানকে কল্পনা করা সম্ভবপর হত। কিন্তু সেখানে অলস মধ্যাহ্নে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাও কর্মসাধনাহীন নিশ্চলতা নয় অথবা বিশ্রামের ইচ্ছায় অবসর-যাপনও কোনও সত্যিকার কর্মবিরতি নয়, সেখানে বর্তমান মুহূর্ত বলে কোনও কিছু থাকতে পারে কি?

লৌহজং-এর কথা মনে পড়ছে। আমার বোনের বাসায় কাজ করবার কোনও লোক ছিল না। সে নিজ হাতেই সব কাজ করতো। আমরা গিয়ে কিছুদিনের জন্য একটি মেয়েলোককে রান্নার কাজে নিযুক্ত করেছিলাম। মেয়েলোকটি ছিল দরিদ্র গৃহস্থ বধূ। সে রান্না করে পরিবেশন করে আমাদের খাওয়া শেষ হলে নিজের জন্য খাবার নিয়ে বাড়ি চলে যেত। তার চলাফেরার মধ্যে একটা শালীনতা এবং পরিচ্ছন্নতা ছিল। কথাবার্তা খুব কম বলতো এবং যা-ও বলতো তা ঘোমটার আড়াল থেকে খুব বেশি সুস্পষ্ট হতো না। আমরা যে ক'দিন লৌহজং-এ ছিলাম আমার বোন গৃহকর্ম থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছিল। আমার বোন প্রতিদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ পড়ে কোরআন শরীফ পড়তো। এটা অবশ্য তার চিরকালের অভ্যাস ছিল। তার স্বামীও ছিল অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, সরল এবং আন্তরিক আবেগপূর্ণ মানুষ। এদিক থেকে চিন্তা করতে গেলে এরা দারিদ্রের মধ্যে একটি সম্মিলিত আনন্দিত জীবনযাপন করতো। এরা উভয়েই কখনও আত্মীয়-স্বজন কারও কাছে প্রত্যাশার হাত বাড়ায় নি।

আমার মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে যে জীবনে স্বস্তি কি করে পাওয়া যায়। যারা প্রত্যাশার হাত বাড়ায় তাদের জীবনে কোন স্বস্তি নেই। কেননা প্রত্যাশা মানুষকে নিশ্চিন্ত

www.pathagar.com

থাকতে দেয় না। প্রত্যাশার কারণে মানুষ নিজের দারিদ্র্য সম্পর্কে সচেতন থাকে, অসুবিধার কথা ভাবে এবং এভাবে ক্রমশ একটি অশান্তিকে লালন করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আপন দারিদ্র্যকে নির্ভাবনায় মান্য করে এবং সে জন্য কোন অভিযোগ করে না, মানুষের কাছে তার কোন প্রত্যাশা নেই। আমার বোন এবং তার স্বামী শত অসুবিধার মধ্যেও একটা নির্ভাবনাময় স্বস্তি নির্মাণ করে নিয়েছিল।

আজ এতদিন পর পুরোনো স্মৃতিকে মন্থন করতে গিয়ে নিজের ব্যর্থতার কথাই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যে আমি তাদের জন্য কিছুই করতে পারি নি। বিশেষ কিছু করতে পারতাম কিনা জানি না, কিন্তু আজ মনে হয়, হয়তো বা তাদের সান্নিধ্য থেকে তাদের সময়ের কথকতায় নিয়মিত অংশ নিতে পারতাম। কিন্তু তা সম্ভব ছিল না।

॥৩৯॥

অজিত নিয়োগী বলে এক ভদ্রলোক আমার এখানে প্রায়ই আসতেন। নানা ধরনের কৌতুকপূর্ণ গল্প করতেন, মাঝে মাঝে হাত দেখতেন এবং ভাগ্য বলতেন। মানুষের ভাগ্য বলাটা তার একটা শখ ছিল এবং এক্ষেত্রে কিছুটা খ্যাতিও হয়েছিল তার। আমার ধারণা ভদ্রলোক তার চতুরতার সাহায্যে এমনভাবে মানুষের ভবিষ্যতের আভাস তৈরি করতেন, যা অনেক সময় সত্য হয়ে যেত। মোনেম খাঁর সঙ্গে যখন আমার গোলযোগ চলছে তখন আমি একদিন তাকে বললাম, "আমি তো আর এখানে থাকতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। বলুন তো এরপর আমি কোথায় যাব?" ভদ্রলোক আমার ডান হাতটা টেনে নিলেন এবং কিছুক্ষণ হাতের রেখার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আমাদের কবিতায় সমুদ্র তো বেশি আসে নি। বেশি আসে নি কেন, আসেইনি বলা যায়। আপনি যদি সমুদ্রের নিকটে যান তাহলে তো ভালই হয়। সমুদ্রের কাছেই আপনাকে যেতে হবে।" পরে যখন আমার চট্টগ্রামে যাওয়া ঠিক হয় তখন নিয়োগীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি আমার সমুদ্রের কাছে যাওয়াটা কিভাবে সাব্যস্ত করলেন বলুন তো? ছল-চাতুরী করবেন না, ঠিক কথাটি বলবেন।" নিয়োগী বললেন, "আপনি করাচীতে ছিলেন, করাচী সমুদ্র তীরবর্তী শহর। আপনি করাচী ফিরে যেতে পারেন, আবার চট্টগ্রামে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে সুতরাং আমি ভাবলাম এখানে থেকে গেলে এই দুই জায়গার এক জায়গায় তো নিশ্চয়ই যাবেন।" এই বলে নিয়োগী হাসতে লাগলেন। আমিও নিয়োগীর সঙ্গে হাসতে লাগলাম। নিয়োগী সম্পর্কে অনেকের কাছে আমি প্রশংসা শুনেছি। তাঁর ভবিষ্যৎ বলা নাকি অনেক সময় সত্য হত। এক মহিলার স্বামী বিমান দুর্ঘটনায় মারা যায়। সেই মহিলার সঙ্গে নিয়োগীর পরিচয় ছিল। মহিলা নিয়োগীকে হাত দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "বলুন তো আমার ভবিষ্যতে কি আছে?" নিয়োগী নাকি বলেছিলেন, "আজ থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে আপনি আপনার জীবনে নতুন পুরুষকে পাবেন এবং আরও পাঁচ বছর পর একে আবার হারাবেন।" নিয়োগীর কথা নাকি ঠিক হয়েছিল। ভদ্রমহিলা তার স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহের পাঁচ বছরের মধ্যে পরবর্তী স্বামী ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এই ঘটনা উক্ত মহিলার মুখেই আমি শুনেছি।

www.pathagar.com

ভবিষ্যৎ বলা আমি মান্য করি না। মানুষ বুদ্ধি-বিবেচনা করে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎকে অনেক সময় বলতে পারে, এটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু ভবিষ্যৎ বলার মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। আমার ধারণা নিয়োগী অত্যন্ত চতুর ছিলেন। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে সম্ভাবনা নির্ণয় করতে পারতেন এবং এভাবেই অনেক কথা তার ফলে যেত।

চট্টগ্রামে আমি যখন গেলাম তখন একাই গেলাম। বাসার সবাইকে ঢাকায় রেখে গেলাম। নতুন পরিমণ্ডলে অবস্থানের সুযোগ-সুবিধা ঠিক করে তারপর সবাইকে নিয়ে যাব, এটাই ঠিক করলাম। ট্রেনে করে চট্টগ্রামে এসেছিলাম। অনেক রাত পর্যন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারকে দেখেছিলাম। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছিলাম, এই যে আজকের রাত্রে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাত্রা, এটা কি আমার জন্য কোন মূল্য এনেছে? আজকের রাতে আমার জন্য কি কোন আনন্দ আছে? যদি থাকে তবে সে আনন্দ কি অন্ধকারে আকাশ দেখার? নিস্তব্ধ অন্ধকারে কোন শব্দ শুনবার না, একাকী স্মৃতির উপার্জন গণনা করবার? অনেক রাত পর্যন্ত বাইরের অন্ধকারকে দেখে দেখে নিজেকে রহস্যের নায়ক মনে হয়েছিল। নির্বিরোধ অন্ধকারে আমার অস্তিত্বকে আমি অনুভব করবার চেষ্টা করেছিলাম।

চট্টগ্রামে আমার পরিচিত অনেকেই ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আবদুর রহমান সাহেব। তিনি এক সময় বৃটিশ আমলে স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন স্বভাবের মানুষ, শান্তিপ্রিয় এবং নির্জনতা প্রত্যাশী। তিনি ধার্মিক ছিলেন। এবং কোথাও কোন বিরোধ ঘটলে সে বিরোধের মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসতেন। তিনি আমার চট্টগ্রাম আসাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বাংলা একাডেমী ছাড়বার কিছু আগে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন তখন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেছিলেন, "মোনেম খাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে, আমি একবার ভেবেছিলাম মোনেম খাঁকে বলে আপনাকে ঢাকায় রেখে দেবার ব্যবস্থা করি। পরে ভাবলাম আল্লাহ্ যা করেন তা তো ভালোর জন্যই করেন। নিশ্চয়ই আপনার কল্যাণ হবে বলেই তিনি আপনাকে চট্টগ্রামে পাঠাচ্ছেন। এই ভেবে আমি মোনেম খাঁকে কিছু বলি নি। শুধু আপনার জন্য দোয়া করেছি।" আবদুর রহমান সাহেব যখনই ঢাকায় আসতেন তখনই আমার ওখানে আসতেন এবং তাঁর সময়কালের গল্প বলতেন। চট্টগ্রামে মুসলিম শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর অনেক দান ছিল। তিনি প্রচুর পড়াশুনা করতেন। তাঁর বাড়িতে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থের সম্ভার ছিল। চট্টগ্রামে আরও পরিচিত লোক ছিল আমার। যেমন এ কে খান সাহেব। তিনি অত্যন্ত সুজন এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বিপুল বিত্তবান কিন্তু বিত্তের অহংকার আমি তাঁর মধ্যে দেখি নি। তিনি এক সময় পাকিস্তানের মন্ত্রী হয়েছিলেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আন্তরিক আগ্রহ ছিল। এই আগ্রহকে তিনি নানাভাবে কার্যকর করার প্রয়াস পেতেন।

আমি চট্টগ্রামে গিয়ে প্রথম উঠেছিলাম সৈয়দ মোহাম্মদ শফি নামক একজন প্রশাসকের ওখানে। আমার কিছু বই তিনি প্রকাশ করেছিলেন এবং প্রকাশনা শিল্পে অত্যন্ত রুচিবান এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। শহরের মধ্যেই তাঁর বাসা। পরে আমি ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাসে চলে যাই। ক্যাম্পাসে তখন ছোট ছোট কয়েকটি বাড়ি তৈরি হয়েছিল অবিবাহিত শিক্ষকদের জন্য। তার একটাতে গিয়ে আমি উঠেছিলাম। প্রথম দিন ক্যাম্পাসে পৌঁছে

www.pathagar.com

সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করলাম, বাংলা বিভাগের দায়িত্ব নিলাম এবং একটি ক্লাসও নিলাম মনে পড়ে। দ্বিতীয় দিন সকাল বেলা আমি বাসায় রয়েছি এমন সময় সেখানে এক ভদ্রলোকের আবির্ভাব ঘটলো। হিন্দু ভদ্রলোক, মাঝ বয়সী, পরনে খাটো ধুতি, গায়ে একটি শার্ট, মাথায় উস্কখুস্ক পর্যাপ্ত চুল এবং মুখে দাড়ি। আমাকে দেখেই বললেন, 'আমি দেবতার দর্শন পেতে এলাম।' আমি ভদ্রলোকের কথায় হাসব না কাঁদব, বুঝে উঠতে পারলাম না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কে?" ভদ্রলোক বললেন, "আপনি আমাকে ভট্টাচার্যি বলবেন, হাটহাজারীতে আমার বাড়ি, আমি সংস্কৃতের পণ্ডিত, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়াতে চাই। আপনি সেই ব্যবস্থা করে দেবেন। বিশ্ববিদ্যালয় হবার পর থেকে আমি এখানে ঘোরাফেরা করছি কিন্তু কেউ আমাকে পাত্তা দেয় না। যখন শুনলাম আপনি এসেছেন বাংলা বিভাগে যোগ দিতে, তখন ভাবলাম যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। যে গুণী সে গুণীকে সম্মান করতে জানে। তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, আপনি আমার একটি ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন।" আমি বুঝলাম ভদ্রলোকের মস্তিষ্কে কিছু অসুবিধা আছে, তবু কৌতূহলবশত তার সাথে কথা বলতে লাগলাম। বসতে যখন বললাম তখন আমার পায়ের কাছে মাটিতে তিনি বসে পড়লেন। আমি নিষেধ করতেও তিনি ওখানেই বসে রইলেন এবং অনর্গল কথা বলে যেতে লাগলেন। তিনি বললেন, 'আমার কাছে হিন্দু মুসলমান কোন ভেদ নেই, যিনি ব্রহ্মা, তিনি আল্লাহ, আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন, আদম হচ্ছে আদি দম অর্থাৎ আদি প্রাণবায়ু। সুতরাং মুসলমানদের যিনি আদম তিনিই হচ্ছেন সকল মানুষের জন্য আদি প্রাণবায়ু।' ভদ্রলোকের এহেন হাস্যকর বিশ্লেষণ শুনে আমি হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। কিন্তু ভদ্রলোক খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "আপনি আমার দেবতা, আপনি হাসবেন না, আমার কথা যে ঠিক তা আপনি ক্রমশঃ বুঝতে পারবেন।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ একটি গোপন কথা বলছেন, এমনভাবে বললেন, "এখানকার বৌদ্ধরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবে, ওদের কখনও প্রশ্রয় দেবেন না, ওরা নাস্তিক। নাস্তিককে প্রশ্রয় দিলে আপনিও দায়ী হবেন।" আমি হেসে বললাম, গৌতম বুদ্ধ একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মানুষকে বিনয় শিক্ষা দিয়েছেন এবং মানুষকে মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আপনার এই মনোভাব কেন? ভট্টাচার্য বললেন, "ভগবান মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন পৃথিবীতে কর্ম করবার জন্য। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ কর্তব্য ভুলে সংস্কার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হলেন। এটা কি ভাল কাজ?"

চট্টগ্রামে যতদিন ছিলাম ততদিন এই ভট্টাচার্য আমার এখানে মাঝে মাঝে এসে আমার সঙ্গে গল্প করতেন। একদিন দুপুরে আমি খেতে বসেছি এমন সময় তিনি এসে উপস্থিত। খাওয়ার সময় এসেছেন বলে ভদ্রলোকের কুণ্ঠা লক্ষ্য করলাম না। তিনি বরঞ্চ বললেন, 'ঠিক সময়ে এসেছি আমি এখন দেবতার প্রসাদ পাব।' আমি বললাম, আমার এখানে খাবার যা আছে তা হচ্ছে আপনার জন্য নিষিদ্ধ মাংস। আপনাকে এটা দেই কি করে?" ভট্টাচার্য বললেন, দেবতার প্রসাদ তো পবিত্র, আপনি যা দেবেন তাই আমি খাব। আমি ভদ্রলোককে খেতে দিলাম। তিনি খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে ঢেকুর তুলে বললেন, "আহা অমৃত খেলাম।" আমি দেখেছি খাদ্য বিষয়ে ভট্টাচার্যের কোন বাছ-বিচার ছিল না। এক দিন বহদ্দারহাট থেকে গরুর গোশত কিনতে গিয়েছি। পথে ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে

www.pathagar.com

গোশতের দোকানে দাঁড়িয়ে আমাকে গোশত বেছে দিলেন। একদিন ভট্টাচার্য বলেছিলেন, "গোমাংস খুব উপাদেয়, এক সময় আর্যরা খুব গোমাংস ভক্ষণ করতো, সে জন্যই তারা খুব শক্তিশালী ও বলবান হয়েছিল এবং ভারতবর্ষে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। কেন যে হিন্দুদের মধ্যে গোমাংস খাওয়া বন্ধ হল, বুঝি না।' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কোন খাদ্যাখাদ্য বিচার করেন না?' ভট্টাচার্য বলেছিলেন 'বিন্দুমাত্র না, আমি শূকর খাই, কচ্ছপ খাই, গরু খাই। বিধাতার দেওয়া এই উপঢৌকন থেকে কেন বঞ্চিত হব?

ভট্টাচার্যের জীবনে সংকট ছিল এবং গৃহে শান্তি ছিল না। তাঁর কোন উপার্জন ছিল না। স্ত্রীর উপর সংসারের দায়িত্ব ফেলে দিয়ে ভদ্রলোক পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন। বিভিন্ন গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করতেন। যখন কোথাও কিছু মিলতো না তখন মন্দিরে গিয়ে পড়ে থাকতেন এবং সেখানে যা পেতেন তাই খেতেন। রাত্রি বেলা গৃহে ফিরতেন শয়ন করবার জন্য। তার কাছ থেকেই তার জীবনের ইতিহাস বিভিন্ন সময়ে যা পেয়েছিলাম তা হচ্ছে ঃ তিনি এক সময় রেঙ্গুনে ছিলেন, সেখানে কাঠের ব্যবসা করতেন। যুদ্ধের সময় রেঙ্গুন ছেড়ে চলে আসেন এবং হাটহাজারীতে পৈতৃক জমিতে একটি ঘর তুলে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। তার এক কাকা ছিল, যার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ভট্টাচার্যকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করতো। এই প্রলোভন এড়াবার জন্য ভট্টাচার্য পথে নেমে আসেন। মাঝে মধ্যে ছোটখাট কাজ যে না পেয়েছেন, তা নয় কিন্তু কোন কাজেই টিকে থাকতে পারেন নি। আবার পথে নেমেছেন। তার স্ত্রী বিভিন্ন বাড়িতে কাজ করে সংসার চালানোর ব্যবস্থা করে নিতেন। আর ভট্টাচার্য সকল দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে ঘরের বাইরে শান্তি অন্বেষণ করতেন।

অনেক পরে ভট্টাচার্যকে আমি কিছু সাহায্য করবার চেষ্টা করেছিলাম। স্বাধীন বাংলাদেশে আমি যখন মন্ত্রিসভার সদস্য তখন ভট্টাচার্যকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে পাঁচ হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করেছিলাম। চেক ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকা তার হাতে দেওয়া হয়েছিল। এই টাকা পেয়ে ভট্টাচার্য আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেন নি। প্রায় দৌড়ে আমার অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এর পর ভট্টাচার্যের সঙ্গে আর আমার কখনও দেখা হয় নি।

চট্টগ্রামে অবস্থানের প্রথম বছরে সৈয়দ মুজতবা আলী চট্টগ্রাম এসেছিলেন। প্রথম বছর না বলে প্রথম কয়েকমাসের মধ্যে বলাই ভাল। সেদিন রোববার একটি জীপগাড়ি আমার বাসায় এল। এক ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে বললেন, মুজতবা সাহেব চট্টগ্রামে এসেছেন। তিনি আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে বললেন। তিনি গল্প বলার লোক খুঁজছেন। মুজতবা আলী অবস্থান করছিলেন দেবপাহাড়ের কাছে কার এক বাড়িতে। আমি গিয়ে দেখি তাঁর ঘরে স্কুল কলেজের অনেক মেয়ে স্বাক্ষর নেবার জন্য ভিড় করেছে। আমাকে দেখে মুজতবা আলী মেয়েগুলোকে তাড়িয়ে দিলেন। বললেন, তোরা এখন যা, আমি এখন এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছু অশ্লীল গল্প বলব।

সেদিন মুজতবা আলী গল্পের হাট খুলে দিয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে শ্লীল-অশ্লীল বহু ধরনের গল্প ছিল। একটি গল্প ছিল জনৈক শিখ সম্বন্ধে। বৃটিশ আমলে একজন শিখ সর্দার সন্ধ্যার

www.pathagar.com

সময় লাহোরে একটি হোটেলে উঠেছে। হোটেলের যে ঘরে উঠেছে সেই ঘরে একজন মৌলবী সাহেব অবস্থান করছিলেন। মৌলবী সাহেবের পরনে ছিল চোস্ত পায়জামা, কালো শেরোয়ানী এবং মাথায় লালটুপি। শিখ সর্দার হোটেলের বয়কে বলল, সকালে বেশ অন্ধকার থাকতে তাকে জাগিয়ে দিতে। সে ট্রেনে করে গুজরানওয়ালা যাবে। ঘরের মধ্যে কাপড় রাখবার একটিমাত্র আলনা ছিল, তার একদিকে মৌলবী সাহেব তার কাপড়-চোপড় রেখেছিলেন, অন্যদিকে শিখ তার কাপড়-চোপড় রেখে ঘুমিয়ে পড়লো। সকালের অন্ধকারে হাতড়িয়ে শিখ সরদার আলনার যে দিকে মৌলবী সাহেবের কাপড়চোপড় ছিল সেদিকে গিয়ে মৌলবী সাহেবের পায়জামা, শেরোয়ানী এবং মাথায় টুপি পড়ে রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে টিকেট কিনে ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে ঢুকল ট্রেন ছেড়ে দেবার পর কম্পার্টমেন্টের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেতো অবাক। এ কার চেহারা আয়নাতে দেখা যায়? সে ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগলো, 'আমি এত করে হোটেল বয়কে বলে দিলাম সকাল বেলা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতে আর সে কিনা মৌলবী সাহেবকে জাগিয়ে দিয়েছে। এখন আমি কি করি?'

মুজতবা আলীর গল্পের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে নানা ধরনের গল্প তিনি সংগ্রহ করেছিলেন এবং বলতেও পারতেন অনেক রসিয়ে রসিয়ে। সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন বিচিত্র সংলাপের সপ্রতিভ নায়ক। বক্তব্যের তাৎক্ষণিকতার, শব্দ-নির্মাণের ব্যস্ততায় নির্লিপ্ত রহস্য সংবেদনে প্রতিবাদীকে পরাভূত করার কূটকৌশলে তাঁর সমকক্ষ আমি কাউকে দেখি নি। আমি তাঁর সঙ্গে কখনও বিতর্কে নামি নি। জানতাম সত্য আমার পক্ষে থাকলেও জিতবো না। তিনিই জিতবেন–জয় তাঁর ব্যসন এবং আনন্দ।

প্রতিদিনের জীবনে লঘু সম্পর্কের যে শিহরণ আছে, ক্ষণকালীন যে কৌতুক আছে, সময় অপহরণের জন্য মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বরের যে কল্লোল আছে মুজতবা আলীর বলার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কোন রচনাতেই তিনি নিঃসঙ্গ নন। তিনি আসর জমিয়ে কথা বলতে ভালবাসতেন, তাঁর লেখাতেও সেই আসরের আমেজ এসেছে। তাঁর শব্দের প্রবাহের মধ্যে তিনি শুধু একাকী উপস্থিত নন, আমরা অনুভব করি যে আসরের অন্যান্য লোকও সেখানে উপস্থিত রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর রচনায় ব্যবহৃত শব্দ এবং তাদের বিন্যাস এমন স্বভাবের যে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মানুষের কলরব, সেখানে শোনা যায়। এই অসাধারণ দক্ষতার ফলেই মুজতবা আলী তাঁর রচনার মধ্যে একটি চতুর নাগরিক জীবনকে বাঙময় করতে সক্ষম হয়েছেন। কেউ কেউ অনুযোগ করেন যে, মুজতবা আলী ইচ্ছা করলে তাঁর বিচিত্র জ্ঞানের নির্যাস নিয়ে জীবন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধিগত কোনও কিছু আমাদেরকে দিয়ে যেতে পারতেন। হয়তো বা পারতেন কিন্তু তাহলে আমরা সদাহাস্যময় মুজতবা আলীকে প্রাত্যহিক জীবনের লঘু স্পর্শের আনন্দ কল্লোলের মধ্যে পেতাম না।

॥৪০॥

ঢাকা থেকে সবাইকে যখন চট্টগ্রামে নিয়ে এলাম তখন আমি বাসা নিলাম কাজেম আলী রোডে। কাজেম আলী রোড ঘাট ফরহাদ বেগের অন্তর্গত। এ অঞ্চলটি ঐতিহাসিক। এখানে মোঘল সৈন্যদের হাতে পর্তুগীজরা সর্বশেষ পরাজয় বরণ করে। এখানে প্রায়ই

www.pathagar.com

মাহ্‌বুব উল আলম আসতেন। একদিন রোববার ১৯৬৮র দিকে সকাল ১১টার সময় বাসায় একা বসে আছি, সম্ভবত হাতে কোন কবিতার বই ছিল, এমন সময় মাহ্‌বুব উল আলম এসে উপস্থিত হলেন। তিনি দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছেন এবং এটাই তাঁর অভ্যাস। সকালে নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন এবং হাঁটা পথে নগর পরিক্রমায় বিভিন্ন পরিচিত জনের বাড়িতে থেমেছেন এবং নিশ্চয় তারই একটি পর্যায়ে আমার এখানে উঠেছেন। আমি বসতে বললাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি যে এত হাঁটেন ক্লান্তি আসে না?' তিনি বললেন, 'গাড়ির উপর আমার ভরসা নেই, আমার ভরসা দু' পায়ের উপর। তাছাড়া পথ চলতে কত পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, একটু দাঁড়াই, কথা বলি, তার পর আবার চলি। এভাবে চলার মধ্যে যে কত আনন্দ তা আমি আপনাকে বুঝাতে পারব না।' আমি তাঁকে এক গ্লাস গরম দুধ খেতে দিলাম। ধীরে ধীরে ক' চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে তিনি বললেন, 'আমাকে এমনভাবে দুধ কিন্তু কেউ খেতে দেয় নি। আমার খুব ভাল লাগল।

ছোট বেলায় মা বড় কাঁসার বাটিতে দুধ ধরে আমাকে খেতে ডাকতেন। দুধের যতটা স্বাদ তার চেয়ে বেশী হচ্ছে দুধ দিয়ে আপ্যায়নের। আমি এর পরিবর্তে আপনাকে কি দিতে পারি? একটা গল্প উপহার দিই, কেমন? শুনুন তাহলে। দুই বন্ধু ছিল। একজন সদ্য বিবাহিত, আর একজন বিবাহের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। যে বিবাহিত সে প্রতিদিন তার অবিবাহিত বন্ধুকে রাত্রির বিবরণগুলি শোনায় আর অবিবাহিত বন্ধু আগ্রহভরে সেগুলি শোনে এবং বিয়ে হলে সে কি করবে, মনে মনে তার মহড়া দিতে থাকে। কিন্তু বিবাহিত বন্ধুর রাত্রিকালের বিচিত্র সাহসের খবর বেশী শুনতে শুনতে অবিবাহিত বন্ধু ভয় পেয়ে গেল। সে আর বিয়ে করতে চায় না; কোন পাত্রী কি রকম হবে এটা ভাবতেই তার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। অবশেষে তার বিয়ে হল। বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে সে বাসরশয্যায় গিয়েছে। পরদিন পূর্ববিবাহিত বন্ধু নববিবাহিত বন্ধুর খোঁজ নিতে এসে দেখে বাড়ির সামনের মাঠে বসে বিমর্ষ মুখে ঘাসের ডগা চিবোচ্ছে। জিজ্ঞেস করল 'হ্যাঁরে, তোর এমন দুরবস্থা দেখছি কেন?' নববিবাহিত বন্ধু বলল, 'তোর পরামর্শমত তো অগ্রসর হচ্ছিলাম, বউ ঝামটা দিয়ে সরিয়ে দিল আমাকে।' পূর্ব বিবাহিত বন্ধু বলল, 'চল ঘুরে আসি।

একটু পরামর্শ করা যাক।' পথ চলতে চলতে হঠাৎ পূর্ববিবাহিত বন্ধু বলল, 'ফয়সালা পেয়ে গেছি। সমুদ্রের বড় শিং মাছ কি করে ধরে জানিস। মাছের তলপেটে সুড়সুড়ি আছে। ওখানে হাত দিতে পারলেই মাছ অবশ হয়ে যায়।' এটুকু বলেই মাহ্‌বুব উল আলম বললেন, 'এর পরের ঘটনা তো আপনি অনুমান করতেই পারেন।' সদ্যবিবাহিত বন্ধু পূর্ববিবাহিতের উপদেশ মত ঠিকমত অগ্রসর হতে পেরেছেন বলেই এর পরদিন তার ঘুম ভাঙ্গতে বেলা একটা বেজে যায়। মাহ্‌বুব-উল আলমের গল্প বলার ভঙ্গী, চতুর এবং কুশলী বাক্যবিন্যাসে আমি হেসে ফেললাম। অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা কিন্তু সাধারণ জীবন থেকে উপমা নিয়ে তাকে উপভোগ্য ও রসময় করা হয়েছে। মাহ্‌বুব-উল আলমের লেখা তাঁর গল্প বলার মত। তিনি জীবনরসিক এবং প্রাণময়। তাঁর প্রতিটি গল্পেই অনুভব করা যায় যে তিনি মাটির অত্যন্ত কাছাকাছি। তাঁর গল্পে মাটির গন্ধ পাওয়া যায়, সকাল বেলা খালি পায়ে ঘাসের পর হাঁটার মত অনুভব জাগে। অতি সাধারণ মানুষগুলো তাঁর গল্পের মধ্যে আনাগোনা করে।

www.pathagar.com

আমার বাসস্থান থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল প্রায় ১২ মাইল দূরে। আমি আমার গাড়ি করে বিশ্ববিদ্যালয় যেতাম। ফেরার পথে প্রায় দিনই কোন না কোন হাটের কেনাবেচার মধ্য দিয়ে ফিরতে হত। একদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে আড়াইটা/তিনটার দিকে মাহবুব-উল আলমকে একটা ছোট গলি থেকে বেরোতে দেখলাম। আমি গাড়ি থামালাম, তিনিও এমনভাবে গাড়িতে উঠে বসলেন যেন তার জন্যই গাড়িটি পূর্ব থেকে এখানে থামাবার কথা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এদিকে কি জন্য এসেছিলেন? তিনি বললেন, 'প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে একটি গল্প শুনুন। মনে করুন পঞ্চান্ন বছর আগে ছেলেটির বয়স ছিল চৌদ্দ বছর আর মেয়েটির বয়স এগারো। মেয়েটি সব সময় ছেলেটিকে বিরক্ত করতো, ঠাট্টা করতো, আর ছেলেটিকে দেখলেই হেসে উঠত। ছেলেটি অনেকবার চেষ্টা করেছে মেয়েটিকে শাস্তি দিতে কিন্তু সুযোগ পেয়ে ওঠেনি। একদিন খেলার মাঠে সুযোগ পেয়ে মেয়েটিকে তাড়া করে ধরে ফেলল। কিন্তু কোনরকম শাস্তি বিধান না করে একটু পর ছেড়ে দিল। কিছুদিন পর মেয়েটির বিয়ে হল। বিয়েতে ছেলেটিও গিয়েছিল। অনেকদিন পর একটা প্রয়োজনে চৌধুরীর হাটে এসেছিলাম। এদিক ওদিক ঘুরতেই একটা বাড়ি পরিচিত মনে হল। বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় ভেতর থেকে শব্দ শুনলাম, একজন মহিলা তার নাতিকে বলছে, 'যাতো দাদু, ওই বীর পুরুষটাকে ধরে নিয়ে আয়।' একটি সাত আট বছরের ছেলে আমাকে ডেকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। একজন প্রৌঢ়া মাথায় ঘোমটা দিয়ে আমাকে সালাম করে বলল, 'একদিন শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন, শাস্তি তো দেননি। আজ আমি শাস্তি দেব। আমার এখানে খেয়ে যেতে হবে।' আমি সেখান থেকে খেয়ে যেই পথে বেরিয়েছি তখনই আপনার গাড়িটাকে পেলাম।'

এভাবেই মাহবুব-উল আলমকে সব সময় আমি দেখেছি অফুরন্ত প্রাণের উৎস হিসাবে। আমি যখন ছাত্র তখন মাসিক মোহাম্মদীতে তাঁর 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। মাসের শুরুতে এই অনবদ্য রচনাটি পাঠের আকর্ষণে আমি পত্রিকার অপেক্ষায় থাকতাম। সে এক আশ্চর্য লেখা–বিদ্যুৎ প্রবাহের মত তীব্র গতি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত এবং অসাধারণ মমতা এই রচনার সর্বাঙ্গ স্পর্শ করে আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সৈনিক হিসাবে যখন মেসোপটেমিয়া গিয়েছিলেন, তখন তাঁর দৃষ্টিতে যে জীবন ও কর্মধারা চিহ্নিত হয়েছিল তারই একটা মূল্যবান পরিচয় এই রচনায় তিনি রেখেছেন। যে অঞ্চলের কথা তিনি লিখেছেন সে অঞ্চলের আমূল পরিবর্তন হয়ত এখন হয়েছে, কিন্তু মাহবুব-উল আলমের রচনায় তার যে পরিচয়টি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তা কখনই হারিয়ে যাবার নয়। আমি এই রচনাটি সম্পর্কে মাহবুব-উল আলমকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'আপনি যখন মেসোপটেমিয়ায় তখন তো আপনি লেখক নন, তাহলে এই সুন্দর আকর্ষণীয় রচনাটি আপনি নির্মাণ করলেন কি করে? তিনি উত্তরে বললেন, 'আমার কৌতূহল অদম্য। আমি যেখানেই গিয়েছি, সেখানকার চলমান জীবনকে জানবার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া, আমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রবল। পুরনো ঘটনা আমার যেভাবে মনে থাকে, নতুন ঘটনা সে রকম মনে থাকে না। অর্থাৎ এখনকার ঘটনা ঠিক এখনই আমার মনে আসবে না। পুরনো হলেই তা নতুন করে স্মৃতিতে জেগে উঠবে। আমার স্বভাবের এই পরিস্থিতি আমার এই লেখার প্রেরণা।

www.pathagar.com

নজরুল ইসলাম লেখাটির অসম্ভব প্রশংসা করেছিলেন। আমি তার উৎফুল্ল অভিনন্দন কখনই ভুলব না।' আমি বললাম আপনার এই লেখাটি আমার ছাত্রজীবনে যেমন উপভোগ করেছি, এখনও তেমনি উপভোগ করি। আমার মনে হয়, আপনি যেভাবে অতি দ্রুত সাধারণ মানুষের কাছাকাছি চলে আসেন, সেভাবে সব লেখক পারেন না।

চট্টগ্রামে মাহবুব-উল আলমের সঙ্গে আমার যে খুব দেখা হত তা নয়। মাঝে মাঝে আমার বাসায় আসতেন, কখনও হয়তো হঠাৎ পথে দেখা হত। সভা সমিতিতে তিনি যেতেন না বললেই হয়। কিন্তু দেখা কম হলেও তাঁর সঙ্গে আমার একটি নিবিড় অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। চট্টগ্রামে বেশী দেখা হত আবুল ফজল সাহেবের সঙ্গে। সব সভা সমিতিতেই তিনি থাকতেন এবং আমরা যুগ্মভাবে অনেক সভায় সভাপতি এবং প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দিয়েছি। অথচ আমাদের মধ্যে তেমন নিবিড় সখ্য গড়ে ওঠেনি। মাহবুব-উল আলম ছিলেন প্রচারবিমুখ, আর আবুল ফজল ছিলেন প্রচারে উৎসুক। প্রতি বছর একটি বিশেষ ছাত্রদল আবুল ফজলের বাসগৃহে তাঁর জন্মদিন পালন করতো। সে রকম একটি জন্মদিনের উৎসবে আমি উপস্থিত ছিলাম। উৎসবের শেষে আবুল ফজল সাহেব উপস্থিত সবাইকে গুড় ও মুড়ি দিয়ে আপ্যায়িত করেছিলেন মনে আছে। যে ছেলেরা উৎসবের আয়োজন করেছিল তারা গুড় এবং মুড়িতে খুব বেশী খুশী হতে পারেনি বলে আমার মনে হয়েছিল। আবুল ফজল ছিলেন মাহবুব-উল আলমের জামাতা। তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার মাহবুব-উল আলমের কন্যাকে বিয়ে করেন। আবুল ফজল এবং মাহবুব-উল আলমের মধ্যে বয়সের খুব একটা ব্যবধান ছিল না। আবুল ফজল এককালে কথাশিল্পী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে তাৎক্ষণিক সমস্যা এবং বিষয় নিয়ে গদ্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। এ সমস্ত রচনার কারণে তাঁর তাৎক্ষণিক একটি খ্যাতি হয় এবং একজন বিবেকবান ব্যক্তি হিসাবে তিনি পরিচিত হন। মাহবুব-উল আলম ছিলেন নিঃসঙ্গ পথযাত্রী, আবুল ফজল ছিলেন সমসাময়িক কর্মপ্রবাহ নিয়ে উচ্ছল। উভয়ের পার্থক্যটা আমার চোখে খুব বেশী ধরা পড়ত।

অন্নদাশংকর রায়ের সঙ্গে যখনই আমার দেখা হয়েছে, তখনই তিনি মাহবুব-উল আলমের অপূর্ব রসবোধের কথা বলেছেন, 'ইংরেজীতে যাকে বলে ইনট্রোসপেকশন অর্থাৎ মর্মমূলে প্রবেশ করার ক্ষমতা ; মাহবুব-উল আলমের মধ্যে সেই ক্ষমতা আছে। তিনি বাইরের অবয়বকে স্পর্শ করেন না, হৃদয়কে নাড়া দেন। অন্নদাশংকরের সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে একমত। আমি মনে করি, মাহবুব-উল আলমের যথার্থ মূল্যায়ন আমাদের দেশে হয় নি। তিনি অনেকের মধ্যে একজন নন, তিনি একাই সম্পূর্ণ। তিনি কাউকে ঈর্ষা করেন নি, কিন্তু সমসাময়িক অনেকেই তাঁকে ঈর্ষা করেছে। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, 'একজন মানুষের জীবনে যখন সংকট আসে, সেই সংকটে মুহূর্তের জন্য যথার্থ সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করা একজন গল্প লেখকের কর্তব্য। আমি সেই কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করেছিমাত্র।'

তাঁর 'মফিজন' গল্পটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন গল্পটিকে অশ্লীল ও যৌননাবহ বলে অনেকে চিহ্নিত করেছিলেন। মাহবুব-উল আলমকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করাতে তিনি

www.pathagar.com

উত্তরে বলেছিলেন, যারা এ গল্পটিকে অশ্লীল বলে তারা এ গল্পটি পড়েন নি। জীবনকে স্পর্শ করেই মাহবুব-উল আলম জীবন্ত ছিলেন আর আবুল ফজল তাঁর সময়ের রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে ভেবেছেন বেশী। এক সময় আবুল ফজল উপন্যাস ও গল্প লিখতেন সেসব উপন্যাস এবং গল্পে মুসলমান সমাজের কিছু চিত্র ছিল। মুসলমানদের সমাজ জীবনে আধুনিকতা প্রবেশ করছে, তরুণ-তরুণীর অবাধ মেলামেশা ঘটছে এবং কিছু লোক শ্রমজীবীদের সহায়ক বন্ধু হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে– এমন সব চিত্র তাঁর কাহিনীগুলোতে ছিল। এগুলো কিছুটা যথার্থ, আবার অনেকগুলোই অবাস্তব। কিন্তু তবুও এসব চিত্রের মধ্য দিয়েই আবুল ফজল আধুনিক হিসাবে সংবর্ধিত হন। তাঁর 'নারী ও পুরুষ' উপন্যাস দিলীপকুমার রায়ের প্রশংসা অর্জন করে এবং একটি পত্রে তিনি তাঁর অভিমত জ্ঞাপন করেন। পরে এই উপন্যাস 'জীবন পথের যাত্রী' নামে মুদ্রিত হয়। শেষ জীবনে আবুল ফজল আর উপন্যাস-গল্প লেখেননি। তিনি সমসাময়িক জীবনের সমস্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি খ্যাত ও প্রশস্তিও পান। এ ধরনের সমসাময়িক ঘটনা উদঘাটনের জন্য। মাহবুব-উল আলমও সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে চিন্তা করেছেন। কিন্তু তাঁর চিন্তা রাজনৈতিক চিন্তা ছিল না। তিনি সমসাময়িক জীবনের মানবীয় বোধের দিকটা তুলে ধরেছেন। তিনি মানুষে মানুষে বিবাদ-বিসংবাদ এবং ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁর কিছু রচনায় এই মানসিক উদ্বিগ্নতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিনম্র আন্তরিক এবং অহংকারশূন্য মাহবুব-উল আলম চিরকাল আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

অনেক পরে আমি যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সে সময় একবার মাহবুব উল আলম আমার বাসায় ছিলেন। আমার নিজস্ব পারিবারিক পরিবেশে তিনি নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছিলেন। খেতে বসে কত কথা যে বলেছেন তার অবধি নেই – মানুষের কথা, পাখির কথা, গরুর কথা, গাছের কথা। তিনি বলেছেন, 'আমি পথ হেঁটে হেঁটে গাছ দেখি, গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেই। গরু-ছাগলকে দেখি নিষ্পাপ নির্বিরোধে ঘাস খেয়ে যাচ্ছে। পসারিণী পসরা মাথায় নিয়ে যাচ্ছে, তার চলার ছন্দ আমাকে মুগ্ধ করে। মনে মনে বলি, আমি তো তোমাদেরই–যেমন আমি গাছের, তেমনি আমি গরু-ছাগলের, তেমনি আমি সাধারণ মানুষের।'

১৯৬৮ সালে চট্টগ্রামে আমার দ্বিতীয় বছরে 'ইডিপাস' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মাহবুব-উল আলমকে নাটকটি পাঠ করতে দিয়েছিলাম। তিনি আমার ভাষার প্রশংসা করলেন। কিন্তু নাটকটির আবেগ মানসিকভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলেন না। তিনি বললেন, 'প্রাচীন গ্রীসের জীবনে পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যে সংকট ছিল তা খুবই ভয়ংকরভাবে এ নাটকে চিত্রিত হয়েছে। আমি এ ধরনের ভয়ংকরকে সহ্য করতে ভয় পাই।' তাঁর মত জীবনরসিক লেখক ভয়ংকরকে কেন ভয় পাবেন তা আজও আমি বুঝে উঠতে পারি নি। আমার মনে হয় পিতামাতার সম্পর্কের অবমূল্যায়ন তিনি সহ্য করতে পারেননি। তাঁর নীতিতে আঘাত লেগেছিল। ইডিপাস নাটকের ভূমিকায় আমি লিখেছিলাম, 'গ্রীক ট্রাজেডিতে মানুষের অপরিসীম হতাশা এবং অসহায়তা চিত্রিত হয়েছে। পূর্বনির্ধারিত বিশ্ববিধানের সংকল্পাশ্রয়ী যে নিদারুণ যন্ত্রণা এবং যে অব্যক্ত চিত্তদাহন তার তুলনা পৃথিবীর

www.pathagar.com

অন্য কোন ভাষার সাহিত্যে নেই। একদিকে নির্মম অপরিবর্তনীয় বিশ্ববিধান, অন্যদিকে স্বাধীন ইচ্ছার পদক্ষেপ এই দুই শক্তির মধ্যে মানুষের বিনিঃশেষ অবলুপ্তি গ্রীক ট্রাজেডিকে একই সঙ্গে নিষ্ঠুর এবং মহিমান্বিত করেছে। সফোক্লিসের ইডিপাস রেক্স নাটকে মানুষের এই অবলুপ্তি অশেষ শক্তিমানের ভাগ্যাহত চিত্তের আর্তনাদ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। ভাগ্যাহত নায়ক তার রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে জীবনকে যখন দেখেছেন, তখন সমগ্র অস্তিত্ব উন্মুখ হয়েছে বিপর্যয়ের মধ্যে এবং তিনি তার জীবনের বিধাতাকে আবিষ্কার করেছেন যে বিধাতা প্রলয়ংকর। ভাগ্যবিধাতার এমন বিস্ময়কর জীবন্ত অস্তিত্বের তরঙ্গায়িত বিক্ষোভের মধ্যে মানুষের জীবন বিপুল অনির্ভরতায় প্রবহমান তৃণখণ্ডের মতো।

॥৪১॥

১৯৬৮ সালে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন নাসিম বানু, বইঘর, চট্টগ্রাম। এ সংস্করণের মুখবন্ধে লিখিত হয়, "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের প্রথম সংস্করণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৫৬ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। বিলম্বে হলেও ঢাকার স্টুডেন্ট ওয়েজ এর পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। প্রথম সংস্করণের তুলনায় দ্বিতীয় সংস্করণে বহু গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে নতুন তথ্য সংযোজন করা হয়েছিল। প্রস্তুত সংস্করণেও পুরনো বিষয়বস্তুর বহু পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে এবং কোন কোন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে নতুন তথ্যও সংযোজন করা হয়েছে।

"দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব ও সম্ভাবনার ইংগিত দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছিলাম। এ সংস্করণে পাকিস্তানোত্তর যুগের পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের প্রথমবারের জন্য বিভিন্ন শাখার আলোচনা সংবলিত একটি অধ্যায় যোগ করা হল। তাতে আশা করি পূর্ববর্তী সংস্করণ দুইটির তুলনায় ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী গবেষক ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থীর নিকট পূর্বের সংস্করণ দুটির তুলনায় বর্তমান সংস্করণের ব্যবহারের যোগ্যতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

"পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের বেশ কয়টি ইতিহাস লিখিত হওয়া সত্ত্বেও পাঠক সম্প্রদায়ের নিকট আমাদের গ্রন্থটিই ছিল বহুলসমাদৃত ও নির্ভরযোগ্য। বহু তথ্যসংবলিত নতুন উপাদান সংযোজনের ফলে প্রস্তুত সংস্করণের চাহিদা ও মর্যাদা যে তাদের কাছে আরও বৃদ্ধি পাবে আশা করি আমাদের সে দাবী নিরর্থক নয়।"

এ বছর আমার গবেষণামূলক গ্রন্থ 'পদ্মাবতী' প্রকাশিত হয়। নামপত্রে লিখিত ছিল ঃ

'পদ্মাবতী'। মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবত' ও আলাওলের 'পদ্মাবতীর' পাঠ নির্ধারণ, তুলনামূলক পাঠ সমালোচনা, মূলের অনুবাদ, বিস্তৃত টীকা এবং উভয় কাব্যের কাব্যরস ও অলংকার পর্যালোচনা। স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা। গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৭৫৬। গ্রন্থটি নিম্নরূপে উৎসর্গ করা হয়েছিল–ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে ছাত্র জীবনে যিনি আমার প্রেরণাস্বরূপ এবং কর্মজীবনে সর্বমুহূর্তে শুভানুধ্যায়ী। গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে আমি লিখি, "১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পাঠক্রমের মধ্যে আলাওলের

www.pathagar.com

'পদ্মাবতী' সর্বপ্রথম 'পদুমাবত' এর সঙ্গে পরিচিত হই এবং তখনই আংশিকভাবে আলাওলের নির্ভরতা ও ব্যতিক্রম আমার লক্ষ্যগোচর হয়। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আমি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলাম। সে সময়কালে আমার অবসর ছিল প্রচুর। অবসরকালে সময় ক্ষেপণের উপকরণ হিসাবে হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যকে গ্রহণ করেছিলাম, বিশেষ করে প্রাচীন ও মধ্যযুগের হিন্দী অবধি ভাষা ও সাহিত্যে বিস্মিত হয়েছিলাম কবির তুলসী দাস জায়সীব পদলালিত্যে, যেন 'বচন সুনত মন মোহগত'। ক্রমাগত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে অনেক বিশ্লেষণ ও বিচারের পর হিন্দী অবধি সাহিত্যের আনন্দ ও সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করেছিলাম। প্রণয়ের প্রতিষ্ঠা হিসাবে সে সাহিত্যের কবিরা অভাবনীয়কে যেভাবে দীপান্বিত করেছিলেন পাক-ভারত উপমহাদেশের অন্য কোনও সাহিত্যে তার তুলনা নেই। তখনই আমার ইচ্ছা জাগে যে এ অভাবনীয়ের কিছুটা স্বাদ বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করবো। সুযোগ এলো বাংলা একাডেমীর কর্ম পরিচালনাকালে ১৯৬১ সালের দিকে। বিক্ষিপ্তভাবে জায়সীর পদুমাবতের অনুবাদ আরম্ভ করি। এ সূত্রপাত থেকেই অবশেষে জায়সী ও আলাওলের কাব্যের ভাব, ভাষা ও অলংকারের তুলনামূলক আলোচনা ক্রমশ রূপ পেতে থাকে।"

"গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে অনেক দিন হল। মুদ্রণের কাজও আরম্ভ হয়েছিলো যথাবিধি কিন্তু পাঠকের হাতে পৌঁছুচ্ছে বহু বিলম্বে। বিলম্বের জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।"

প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা এবং পাঠ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমি কয়েকটি রীতির প্রবর্তন করি যা বর্তমানে আদর্শ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। পাঠ নির্ধারণ সম্পর্কে আমি লিখি–"আলাওলের পাঠ নির্ধারণ দুরূহ কর্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ পুঁথিই আদ্যন্ত খণ্ডিত। অনেকগুলির পাঠ অসম্ভব রকম বিকৃত, কতকগুলিতে লিপিকরের সংযোজন পর্যন্ত আছে। বটতলার ছাপা পুঁথিগুলি এত প্রসাদে পূর্ণ যে পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব। পাঠ নির্ধারণের জন্য আমার অবলম্বন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পদ্মাবতীর পাণ্ডুলিপিগুলি প্রধানত ২৭৭, ২৮০, ২৮৫ ও ২৯৫ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, বাংলা একাডেমীতে রক্ষিত সবকয়টি পাণ্ডুলিপি, ১৩ ও ২৭ সালের হাবিবি ছাপাখানায় মুদ্রিত বটতলায় পুঁথি, ডক্টর শহীদুল্লাহ কর্তৃক সম্পাদিত 'পদ্মাবতী'র প্রথমার্ধ এবং মালিক মুহম্মদ জায়সীর মূল পদুমাবত। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসে রক্ষিত পদুমাবতের এস ২৪৭১, পি ১৮১৯, পি ১০১৮, পি ১৯৭৫, পি ৩১৩০ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে রক্ষিত একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি এবং বিহারের মাঝার শরীফ খানকায় রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি আমি পরীক্ষা করেছি। মুদ্রিত পদুমাবতের পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণও পরীক্ষা করেছি। সহায়ক গ্রন্থাদির তালিকায় এ সমস্ত পুস্তকের নামোল্লেখ করা হয়েছে। আলাওলের পাঠ নির্ধারণে আমি নিম্নরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করেছি ঃ

"ক. আলাওলের বিভিন্ন পাঠের মধ্যে যে পাঠটি মূলের সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতি রক্ষা করেছি সে পাঠ নিয়েছি।

খ. যে পাণ্ডুলিপির পাঠটি ব্যবহারের দিক থেকে প্রাচীন এবং অর্থের দিক থেকে সুস্পষ্ট আমি তা গ্রহণ করেছি।

www.pathagar.com

গ. যেখানে আলাওলের পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত পুঁথির পাঠ সম্পূর্ণ বিকৃত এবং অর্থহীন সেখানে মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে পাঠ সংশোধন করেছি।"

পদ্মাবতী গ্রন্থে আমার অনুসন্ধিৎসা এবং ভাষাজ্ঞানের প্রশংসা করে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাকে একটি পত্র দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন যে তিনি আমার গবেষণাকর্মে অভিভূত হয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশের পণ্ডিতগণের জন্য আমার গ্রন্থটি একটি শাখার বিষয়। পৃথিবীর যে কোন দেশে এ গ্রন্থটি সম্মানিত হতে বাধ্য। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ইংরেজীতে চিঠি লিখেছিলেন। আমি এখানে সে চিঠির অংশ বিশেষ ভাবানুবাদ করে ছিলাম। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের প্রশংসা আমাকে সম্মানিত করেছিল।

এ বছর আমার রূপান্তরিত সফোক্লিসের 'ইডিপাস' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন মহিউদ্দিন আহমদ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

একই বছর মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' সম্পাদনা করি। প্রহসন দুটি একত্রে একটি গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। উভয় গ্রন্থই প্রকাশ করেন নাসিম বানু, বইঘর, চট্টগ্রাম। 'মেঘনাদবধ কাব্য' বিস্তৃত ব্যাখ্যা সূত্রসহ প্রকাশিত হয়, গ্রন্থ শেষে প্রায় ১০০ পৃষ্ঠার মতো ব্যাখ্যা এবং টীকা টিপ্পনী যুক্ত হয়। প্রহসন দুটির ভূমিকায় আমি লিখি–'প্রহসন কাকে বলে? মানুষের কদর্যতায় ও পরাজয়ে আমাদের চিত্তে গ্লানি ও দুঃখ জাগে। কিন্তু প্রহসনে কদর্যতা ও পরাজয়কে তীব্র যন্ত্রণার সঙ্গী করা হয় না। সেখানে দর্শক ও শ্রোতার বিভিন্ন সামাজিক ও সাংসারিক জীবনের অপ্রকাশিত অবচেতন ইচ্ছাকে সংলাপের বিশেষ কৌশলে পরিস্ফুট করা হয়। বাস্তব জীবনে যাদের কার্যকারণে আমরা পীড়িত এবং বিরক্ত হই অথবা অস্বস্তি বোধ করি তাদের চিত্তকে মঞ্চে যখন বিকৃতরূপে দেখি আমাদের আনন্দ হয়। এ আনন্দ পরিবেশনে মধুসূদন চূড়ান্তভাবে সফলকাম হয়েছিলেন। তাই একথা বললে অন্যায় হবে না যে বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন প্রহসন রচনার পথ প্রদর্শকমাত্র নন, তিনি সে ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ আদর্শ হিসাবে চিরদিন বর্তমান থাকবেন।'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার প্রফেসর হিসাবে যোগ দেবার পর আমি 'সাহিত্য সমিতি' প্রতিষ্ঠা করি। উক্ত 'সাহিত্য সমিতি'র মুখপত্র হিসেবে 'পাণ্ডুলিপি' নামক অনিয়মিত সাহিত্য সংকলন প্রকাশের ব্যবস্থা করি। বাংলা 'সাহিত্য সমিতি'র প্রচার পত্রে লিখিত ছিল, "১৯৬৮ মার্চ মাসে বাংলা বিভাগের শিক্ষকদের এক সভায় বাংলা সাহিত্য সমিতি গঠনের এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাব অনুসারে আমাকে সভাপতি করে আনুষ্ঠানিকভাবে সাহিত্য সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়।

আমার সম্পাদিত 'পাণ্ডুলিপির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়, ১৩৭৬ সালে। নিম্নে এই সংকলনের সূচীপত্র দেওয়া গেল ঃ সৈয়দ আলী আহসান ঃ তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ঃ পাঠ ও পাঠ সমালোচনা। আবদুল করিম ঃ কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বর কে? অজিত কুমার গুহ ঃ মেঘদূত–প্রসঙ্গ। মাহবুব তালুকদার ঃ গরীবুল্লার ইউসুফ জোলেখা। দিলওয়ার হোসেন ঃ কবি কায়কোবাদ ও তাঁর যুগ চেতনা। মোহাম্মদ আবদুল

www.pathagar.com

আইয়াল ঃ নাট্যকার মীর মশাররফ ঃ বসন্ত কুমারী। মোহাম্মদ আবু জাফর ঃ বাংলা গদ্য ও প্যারীচাঁদ মিত্র। অধ্যাপক আবদুল হাই, আনিসুজ্জামান ঃ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

বাংলা সাহিত্য সমিতির পক্ষ থেকে আমি কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'কবিতা সংকলন', 'গল্প সংকলন' এবং 'প্রবন্ধ সংকলন'।

এ সময় কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন নাসিম বানু, বইঘর, চট্টগ্রাম। প্রথম প্রকাশের সময় দেওয়া আছে পৌষ ১৩৭৫। এর ভূমিকায় আমি লিখি, "বর্তমান সংগ্রহ– গ্রন্থে শুধুমাত্র আমার সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলো সন্নিবেশিত হল। 'কবিতার কথা', 'কবি মধুসূদন এবং 'নজরুল ইসলাম' পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসাবে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তিকালে রচনাকালে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। বিশেষ করে 'কবিতার কথা'র পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। অন্যান্য প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। দুটি রচনা– 'বিহারীলাল' এবং রবীন্দ্রনাথের 'সেঁজুতি' অনেক আগের লেখা। প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বের। গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্মরণে কথা কয়টি আছে। গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে কিছু সংখ্যক বিবেচনা অংশে 'মধ্যযুগের কাব্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্যে পূর্বসূরি', 'লোক সাহিত্য, 'ইকবালের কবিতার বাংলা অনুবাদ', 'ছোট গল্পের ভূমিকা', 'মলিয়ার', 'নীটশে', 'ওয়ালট হুইটম্যান' এবং 'হোমার' এ কটি প্রবন্ধ আছে। গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৩৭৪।

বাংলা একাডেমীতে থাকতে ১৯৬৬ সালে প্রতিদিন ডায়রীর পাতায় আমি আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতাম। সেগুলো ছিল বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমার অনুভূতি। কখনো এগুলি কবিতায় লিখেছি, কখনও গদ্য ভঙ্গিতে। কিন্তু মূলত এগুলোতে গদ্য ভঙ্গির পরীক্ষাটাই ছিল প্রবল। গদ্য আমরা প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করি বলে তার প্রকৃতি আমরা বিবেচনা করতে শিখি নি। আমাদের চিন্তা, বুদ্ধি, স্বপ্ন এবং প্রয়োজনের ভাষা বলেই গদ্য আমাদের চেতনার সঙ্গে এবং কর্মের সঙ্গে জড়িত এবং সে কারণে তার পরিচয়টি একটি নিশ্চিন্ত উপস্থিতির মত। অত্যন্ত নিকটের বলেই গদ্য আমাদের পরীক্ষার বাইরে থাকে। কবিতা যদিও গদ্য রচনার চেয়ে অনেক বেশি তীব্র অনুভূতির এবং যদিও কবিতার বক্তব্য আমাদের চেতনার সঙ্গে মিলিত হয়েই আবিষ্কৃত হয়, তবুও আমরা কবিতার ভালো মন্দ অথবা তাপ ও নিরীহতা সম্পর্কে মন্তব্য প্রায়ই করি অথচ আমাদের প্রতিদিনের সংলাপের কাজগুলো নিরীক্ষণের বাইরেই থেকে যায়। গদ্য অতিরিক্ত ব্যবহারের বলেই গদ্য সম্পর্কে আমাদের সজাগ হতে হবে। গদ্যের উচ্চারণ, ধ্বনিবিন্যাস, বিরতির মাত্রা প্রয়োজনীয় সামগ্রী এগুলো ভালো করে জানলে গদ্যের প্রকৃতি নির্ধারণের ইচ্ছা জাগবে। কেননা তখন গদ্য একটি সুন্দর শিল্পচর্চারূপে আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত হবে। গদ্যকে তখন অবহেলা করতে পারবো না।

লেখাগুলোকে একত্রিত করে 'উচ্চারণ' নামে প্রকাশ করি। প্রকাশ করেন মহিউদ্দিন আহমদ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা। প্রথম প্রকাশের সময় দেওয়া হয়েছে জুলাই ১৯৬৮। শাহেদ সোহরাওয়ার্দী স্মরণে গ্রন্থটি উৎসর্গীকৃত। ভূমিকায় গ্রন্থের তাৎপর্য এবং স্বভাব বর্ণিত আছে–'কখনও অসাধারণ হব এমন চিন্তা মনে স্থান দিই নি, চিরকাল বিবেচনা

www.pathagar.com

করেছি যে মোক্ষলাভের পরিকল্পনা যখন আমার নয় তখন প্রতিদিনের সূর্য এবং অন্ধকার নিয়েই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। আমার দৃষ্টির সীমায় হয়তো কখনও পর্বত, কখনও সাগর, কখনও প্রান্তর, কখনও অনেক যাত্রী। এসব কিছু কখনও আলোকিত, কখনও অনির্ণেয়। আমি সাধারণ মানুষের ইচ্ছার যন্ত্রণা নিয়ে দৃষ্টিকে শুধু সম্মুখে প্রসারিত করে প্রতিদিন কালক্ষয় করছি। যখন সকলে ঘুমিয়ে থাকে তখন পিঙ্গল মৃত্তিকায় কুয়াশা নেমে আসে। আমি জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকাই এবং নিস্তব্ধ প্রহরের কণ্ঠস্বর শুনবার চেষ্টা করি। এখানে প্রতিদিন এটুকুই আমার সম্বল।

"যারা আমাকে সহজে পাঠ করেছেন, ভাবেন, তাদের বিরুদ্ধে আমার কোনও ক্ষোভ নেই, তাঁদের কাছ থেকে আমার কোনও প্রত্যাশাও নেই। কারো কারো বিচার-বিবেচনার ইতিহাসে আমি যে ধরা পড়লাম, এখানেই আমার বেদনা। কেননা, যারা বিবেচনাকে জাগ্রত রাখেন সর্বদা, মনোহরণের অভিজ্ঞান তাদের নেই। তাঁদের অতাপিত চিত্ত প্রত্যহের ধূলিকণায় বিমর্ষ রথচক্রের মতো। একাকী বিষণ্ন মুহূর্তে দিন-গণনাকে অবলম্বন করতে চাই নি। সময়ের পদপাত শুনে মৃত্যুর অধীরতাকে কেন প্রশ্রয় দেব। আমি পৃথিবীর সকল সঞ্চয়কে ভালবেসেছি অসম্ভব তীব্রতার সঙ্গে। এ ভালবাসার স্বাক্ষর আমি রেখে যেতে চাই, আমার দৃষ্টির অভিসারে, আমার উচ্চারণের বন্যায়।"

উচ্চারণে গদ্যে ও পদ্যে মোট বিরাশিটি বক্তব্য আছে। এ সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে কবির ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা। রমণীসান্নিধ্য সম্পর্কে কবির প্রতিক্রিয়া, শৈশবে পিতা-মাতার সতর্ক প্রহর সম্পর্কে কবির স্মৃতিচর্চা, প্রকৃতির বিস্তার এবং ঔদার্য সম্পর্কে বিশিষ্টার্থক অনুভূতি এবং কবিতার ভাবলোক ও অন্বয় সম্পর্কে মন্তব্য উদ্ভাসিত হয়েছে। সমগ্র কাব্য গ্রন্থটি আধুনিক ফরাসী উপস্থাপনা পদ্ধতিতে কৃতসিদ্ধ এবং সফলকাম রচনা।

'উচ্চারণ' গ্রন্থে আমি শব্দের অর্থ আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছি। আমি মনে করি শব্দের অর্থ কবিরা নির্মাণ করেন না, আবিষ্কার করেন। ভাষাকে আমি আমার জাতির চৈতন্যোদয়ের কুশল সম্ভাষণ বলে মনে করি। যেমন আমাদের দেহের ত্বক শরীরের সঙ্গে স্বাস্থ্য, জীবন ও স্পর্শের অনুভূতি নিয়ে সংলগ্ন তেমনি আমাদের ভাষা আমাদের জাতির অস্তিত্বের সঙ্গে বিজড়িত। শব্দ তার শিকড় নিয়ে, পারিপার্শ্বিক পরিচয় নিয়ে এবং সর্বযুগের ব্যবহারের স্মৃতি নিয়ে একজন কবির কাছে অনবরত আবিষ্কৃত হতে থাকে। একটি বিশেষ মুহূর্তে জাতির স্মৃতিতে যতগুলো শব্দ আছে তা নিয়েই তার বহু বিচিত্র কথার খেলা। নতুন শব্দ নির্মাণ করা চলে না, পুরাতন শব্দকে অস্বীকার করা যায় না, আয়ত্তাগত শব্দের সামগ্রীকে অনবরত নব নব বিন্যাসে নতুন নতুন উপলব্ধির স্মারক করে তুলতে হয়।

॥৪২॥

অর্থনীতি আমার বিষয় নয় এবং এ নিয়ে আমি কখনও চর্চা করি নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে রাষ্ট্রনীতি ছিল, সেটাও খুব ভাল করে পড়ি নি। কিন্তু মানুষ পৃথিবীতে যেহেতু বাস করে সে কারণে অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি তাকে কিছুটা জানতেই হয়। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ডঃ মযহারুল হকের সঙ্গে আমি খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। তিনি আমার শিক্ষক হতে পারতেন। কিন্তু সরাসরি শিক্ষক না হলেও শিক্ষকের মতই

www.pathagar.com

ছিলেন। আবার আমার বন্ধুও ছিলেন। এক কথায় তাঁর সঙ্গে সকল বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করতে পারতাম, করতামও। পাকিস্তানের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশন পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিভাজন নিয়ে ইসলামাবাদে যে সভা ডাকে সেখানে ডঃ মযহারুল হক বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

সে সময় আমিও ইসলামাবাদে ছিলাম। আমিও পরিকল্পনা কমিশনের আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। আমার দায়িত্ব ছিল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ বরাদ্দ বিষয়ে বিশেষ কোন জটিলতা সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। সমগ্র পাকিস্তানে দু'টি অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার দাবী উঠেছিল এবং সে দাবীতে অর্থনীতিবিদগণ বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদগণ পূর্ব পাকিস্তানের একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যুক্তিস্বরূপ তারা বলেছিলেন গ্রেট বৃটেনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড যদি স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করতে পারে, তাহলে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান কেন পারবে না? স্কটল্যান্ডের ব্যাংকিং ব্যবস্থাও ভিন্ন, টাকাও ভিন্ন। এই ভিন্নতা সত্ত্বেও স্কটল্যান্ড গ্রেট বৃটেনের প্রশাসনিক বন্ধনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং স্কটল্যান্ডের যুক্তির দিকে লক্ষ্য রাখলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বিভাজন কোনক্রমেই অবাস্তব হবে না। আমরা ইসলামাবাদে সম্ভবত 'সিন্দ হাউজ' বা 'সিন্ধু ভবনে' উঠেছিলাম– এখন আমার ঠিক মনে নেই। রাত্রে খেতে বসে ডঃ মযহারুল হকের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল তিনি বলেছিলেন, "অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য মেনে নিলে পাকিস্তানকে রক্ষা করা সম্ভবপর হবে, কিন্তু মেনে না নিলে আমার ভয় হয়, পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে পড়বে। এই বিভক্তি আমাদের কাম্য নয়, কিন্তু চাপিয়ে দেয়া হলে আমাদের আর কিছু করবার থাকবে না।" ইসলামাবাদে থাকতে পাকিস্তানের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি এই স্বাতন্ত্র্যের দাবীকে গুরুত্বসহকারে দেখেন নি। তিনি এটাকে রাজনৈতিক দাবী হিসেবে ধরেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে স্বতন্ত্র অর্থনীতিতে পূর্ব পাকিস্তান টিকে থাকতে পারবে না। তাঁর বক্তব্য ছিল যে একমাত্র পাটের উপর নির্ভরশীলতা নিয়ে স্বতন্ত্র অর্থনীতির প্রেক্ষাপট রচনা করা যায় না।

পাটভিত্তিক অর্থনীতির উত্থান-পতন আছে এবং কোন এক সময় এর পতন ঘটবে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচবার আর কোন উপায় থাকবে না। মাহবুবুল হক আমাদের সামনে হেসে হেসে একথা বলছিলেন। সমগ্র বিষয়টাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। মাহবুবুল হকের স্ত্রী কিন্তু বাংলাদেশের মেয়ে। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্রী ছিল। মাহবুবুল হক পরে পাকিস্তানের মন্ত্রী হয়েছিলেন এবং মন্ত্রী হিসাবে স্বাধীন বাংলাদেশে একবার ঘুরেও গেছেন। ডঃ মযহারুল হক বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প কিছুকাল পরে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদদের এক সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন যে, যে লক্ষ্যে স্বতন্ত্র অর্থনীতির দাবী তিনি করেছিলেন সেই লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পথে দেশের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারকে ক্ষোভের সঙ্গে তীব্র

www.pathagar.com

সমালোচনা করেছিলেন এবং সাবধানবাণীও উচ্চারণ করেছিলেন যে তারা সজাগ হন। মরহুম ডঃ হক আমাদের দেশের বিপর্যস্ততা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাঁর ক্ষোভ এবং শাসন বাণী অত্যন্ত আন্তরিক ছিল। আমি কোনদিন ডঃ হকের মধ্যে কোন কাজ লঘুভাবে সম্পন্ন করার প্রবৃত্তি দেখি নি। ইংরেজীতে যাকে বলে 'সিরিয়াস', সব ব্যাপারেই তাঁর সিরিয়াসনেস বা 'গভীর অভিনিবেশ' ছিল। এক সময় আমরা যখন ঢাকায় সাহিত্য আন্দোলন করেছি তখন উপদেষ্টা হিসাবে মযহারুল হক আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। আমার এখনও মনে পড়ে আমি আমার 'চাহার দরবেশ' কবিতাটি লিখে একটি আসরে তা পড়েছিলাম। আসরটা বসেছিল মযহারুল হকের ঘরে। কবি বেনজীর আহমদ সে আসরে উপস্থিত ছিলেন। মযহারুল হক কবিতাটি বিশ্লেষণ করেন নি, কিন্তু তাঁর আন্তরিক ভালবাসার কথা বলেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রজীবনে মযহারুল হকের সমর্থন এবং আশ্বাস সর্বদাই পেয়েছি।

তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তিনি দেশের অর্থনীতি নিয়ে যেভাবে চিন্তা করতেন, সেভাবে এখন আর কাউকে চিন্তা করতে দেখি না।

পাকিস্তান আমলে যখন দেশের বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে "কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম" গঠিত হয় তখন তার পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি ছিলেন ডঃ মযহারুল হক এবং আহ্বায়ক ছিলেন ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। সে সময় তিনি শিল্পক্ষেত্রে সরকারী অনুদান এবং শাসন বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন। সে সেমিনারে বলা হয়েছিল যে, শিল্পক্ষেত্রে সরকারী অনুদানের প্রয়োজন কিন্তু সরকারী শাসন নয়। আমরা শিল্পচর্চায় পূর্ণভাবে স্বাধীন অভিব্যক্তি চাই। তিনি বরিস পস্টারনাকের উপরও একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন। অবশ্য এই আয়োজনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল জ্যোতির্ময়ের হাতে। এই সেমিনারে অংশ নিয়েছিলেন আবুল ফজল, কবীর চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী এবং মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। বরিস পস্টারনাকের 'ডক্টর জিভাগো' সমগ্র বিশ্বে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। রুশ বিপ্লবের সময়কার অবস্থা এবং পরবর্তী ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মানবিক অধিকার কিভাবে লঙ্ঘিত হয়েছিল তার বেদনাময় কাহিনী এই উপন্যাসে আছে। 'জিভাগো' এই গ্রন্থের এক অসাধারণ চরিত্র। বিভিন্ন অবস্থার শিকার সে হচ্ছে এবং কোন ক্ষেত্রে প্রতিবাদের অধিকার তার নেই। এই অসহায়তার মধ্যে নায়ক ডক্টর জিভাগো তার হৃদয়বৃত্তিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। উপন্যাসটি রুশীয় উপন্যাসের ধারার মধ্যে রচিত। যে বিরাট পরিপ্রেক্ষিত রুশ দেশের উপন্যাসের মধ্যে আছে সেই একই ধরনের পরিপ্রেক্ষিত এখানেও বিদ্যমান। যে সময় রুশ সাহিত্য সরকারী নির্দেশের চাপে মুমূর্ষু এবং অসহায় সে সময় ডক্টর জিভাগোর মত উপন্যাসের আত্মপ্রকাশ একটি বিস্ময়কর ঘটনা।

এ সময় একটি বই আমি নতুন করে পড়েছিলাম। এ সময় মানে চট্টগ্রামে অবস্থানের কালে। বইটি 'কাজানজাকিস' এর সেন্ট ফ্রান্সিস আসিসির জীবনী। ১৯৬৩ সালে বইটি আমি কিনেছিলাম। তখন একবার আমি বইটি পড়েছিলাম। চট্টগ্রামে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় বইটি আবার পড়লাম। আসিসির জীবনের ত্যাগ, আত্মসমর্পণ এবং

www.pathagar.com

ভালবাসা যে অসাধারণভাবে বিদ্যমান ছিল তার একটি পরিচয়লিপি এ গ্রন্থটিতে আছে। এটি একটি জীবনী উপন্যাস। উপন্যাসের পরিধিতে এবং গঠন পদ্ধতিতে একটি ত্যাগের এবং আত্মনিবেদনের অসাধারণ ব্যঞ্জনা গ্রন্থটিতে আছে। দ্বিতীয়বার পড়তে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, বিধাতাকে পেতে হলে সর্বস্ব ত্যাগের মধ্য দিয়ে তাঁকে পেতে হয়। জীবনে চাঞ্চল্য থাকে, নানাবিধ আকর্ষণ থাকে এবং নানাবিধ ইচ্ছার আহ্বান থাকে। এ সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য করে একটি নিবেদনের মধ্যে নিজেকে একাগ্র করা অত্যন্ত কঠিন। সেই নিবেদনের চিত্র এই গ্রন্থটিতে আছে।

ইসলামের মধ্যে আমরা এই বিনয় এবং বিনম্রচিত্ততার অনেক নিদর্শন পাই। আল্লাহ তায়ালা কোরান শরীফে বলেছেন, "মহান করুণা প্রবণের দাস তারাই, যারা মৃত্তিকার উপর বিনম্র চরণে হাঁটে।" যে ব্যক্তি আল্লাহকে অনুসন্ধান করে সে তার প্রতিটি পদক্ষেপের সময় চিন্তা করে যে তার এ পদক্ষেপ আল্লাহর সপক্ষে না বিপক্ষে। যদি এ পদক্ষেপ আল্লাহর বিপক্ষে হয়, অন্য পক্ষে পদক্ষেপ যদি আল্লাহর সপক্ষে হয়, তখন সে আনন্দের সঙ্গে সে পদক্ষেপ আরও দ্রুততর করে। সূফী দাউদ 'তাই' সম্পর্কে কথিত আছে যে তিনি একবার ওষুধ গ্রহণ করেছিলেন। চিকিৎসক তাঁকে বললেন, "আপনি এ ওষুধটা দ্রুত কার্যকর হওয়ার জন্য একটু হাঁটুন।" দাউদ উত্তর করলেন, "আমি এ ভেবে লজ্জিত হচ্ছি যে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ যখন আমাকে জিজ্ঞেস করবেন আমি কেন ব্যক্তিগত স্বার্থে পদচারণা করেছিলাম, তখন আমার উত্তর দেবার কিছু থাকবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।" যিনি সাধনা করেন, আল্লাহর প্রতি যার আকর্ষণ প্রবল এবং যিনি পার্থিব সম্পদের জন্য ব্যাকুল না তিনি পথ চলবেন ধীরে এবং বিনম্র পদক্ষেপে, তার শিরোদেশ আনত থাকবে এবং তিনি সম্মুখ ছাড়া অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। যদি কারও সঙ্গে পথে তার দেখা হয়, তিনি সরে যাবেন না। তিনি তার সঙ্গে কুশল জিজ্ঞাসায় মিলিত হবেন। আবার তিনি যদি অনেকের সঙ্গে হাঁটেন তাহলে অন্য সকলকে পিছনে ফেলে তিনি এগিয়ে যাবেন না। কেননা এতে অহমিকা প্রকাশ পায়। আবার অন্য সবার পেছনেও থাকবেন না, কেননা অতিরিক্ত বিনয়ও চিত্তের জন্য ক্ষতিকর। অতিরিক্ত বিনয়ও এক ধরনের স্পর্ধার মত। মানুষকে পথ হাঁটতে হবে শব্দহীন পদচারণায়, দ্রুতগতি কারও কাম্য হওয়া উচিত নয়। সেজন্যই সূফীরা বলেন, "আমাকে এমনভাবে পথ চলতে হবে যাতে কেউ আমাকে প্রশ্ন করলে আমি যেন উত্তর দিতে পারি যে আমি আল্লাহর পথে যাচ্ছি। আল্লাহই আমার পথনির্দেশ দেবেন। যথার্থ পদক্ষেপ যথার্থ চিন্তা থেকে আসে। আল্লাহকে নিকটে রেখে অর্থাৎ তার সান্নিধ্য অনুভবে রেখে আমাদের পথ চলতে হবে। তাছাড়া, পৃথিবীর মাটিও তো আল্লাহর সৃষ্টি এবং এ মাটিতে পা রাখতে হবে শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে এবং মহিমময় সানন্দ স্বীকৃতিতে। 'কাজানজাকিস'এর উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমি এ কথাগুলো বললাম। এ উপন্যাসের মধ্যে সানফ্রংসিসের ক্ষুধা সহ্য করবার বিবরণ আছে।

ক্ষুধা মানুষের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ন করে এবং তার মন এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। রসূলে খোদা বলেছেন, "তোমার উদরকে ক্ষুধার্ত রাখ এবং তুমি তৃষ্ণার্ত থাক এবং তোমার শরীরকে বস্তুশূন্য রাখ, যেন তোমার হৃদয় এ পৃথিবীতে আল্লাহর দর্শন লাভ করতে পারে।" এর অর্থ হচ্ছে প্রচুর আহার্য গ্রহণ করলে তৃপ্তিতে মানুষের ক্লান্তি আসে এবং তৃষ্ণা নিবারিত

www.pathagar.com

থাকলে মানুষ নিশ্চিন্ত থাকে, উজ্জ্বল বস্ত্র পরিধান করলে অহমিকা জাগে এবং তখন সে অবস্থায় আল্লাহর চিন্তা মানুষের চিত্তে স্থান পায় না। সুতরাং মানুষ যখন অহমিকাশূন্য হবে, বস্ত্রের অভিমান থাকবে না এবং আহার্যের পরিতৃপ্তি থাকবে না, তখন সে আল্লাহর কথা ভাববে। ক্ষুধা যদিও শরীরের জন্য ক্ষতিকর কিন্তু ক্ষুধা আত্মাকে পরিচ্ছন্ন করে এবং সেই পরিচ্ছন্ন আত্মা আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হয়। ইতর প্রাণীর স্বভাব হচ্ছে সর্বমুহূর্তে খাদ্য গ্রহণে ব্যস্ত থাকা। আমরা সর্বদাই লক্ষ্য করি প্রাণিকুল খাদ্য সন্ধানে ও খাদ্য গ্রহণে সদা ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু মানুষ তো ইতর প্রাণী নয়, সে সমৃদ্ধ মানসের অধিকারী, সুতরাং খাদ্যের জন্য ব্যাকুল সে সতত থাকবে এটা কাম্য নয়। যে ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণ করে শরীরকে সজীব রাখতে চায়, আবার যে ব্যক্তি ক্ষুধাকে লালন করে চিত্তবৃত্তির সমৃদ্ধি চায়, এ দুইয়ের মধ্যে বিপুল পার্থক্য রয়েছে। প্রাচীন আরবীতে একটি প্রবাদ আছে, "কোন মানুষ বাঁচবার জন্য খাদ্য গ্রহণ করে, আবার কোন মানুষ খাদ্য গ্রহণ করবার জন্য বাঁচে। প্রথম মানুষ আদম, স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন লোভের জন্য।"

সূফী তত্ত্বজ্ঞরা বলেন যে খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছাকে জাগ্রত রেখে খাদ্যগ্রহণ করছে না, এরকম ক্ষুধা তাৎপর্যহীন। খাদ্যগ্রহণের লোভ যখন থাকবে না, তখনই মানুষ ক্ষুধা-পিপাসায় কাতরতার ঊর্ধ্বে উঠবে। তারা আরও বলেন, "মানুষ তখনই ঘুমোতে যাবে যখন নিদ্রা তাকে জয় করবে এবং তখনই কথা বলবে যখন কথা না বলে সে পারবে না এবং তখনই আহার্য গ্রহণ করবে যখন অনশনে সে পীড়িত।" সূফী তত্ত্ববিদরা ক্ষুধার্ত হওয়াটাকে সাধনার অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করেছেন এবং সেজন্য এর একটি নীতিনির্ধারণ করেছেন। এভাবে সাধনার অঙ্গ হিসাবে যে অনশন, তাকে তাঁরা ফাঁকা বলেছেন। তাঁরা বলেন যে যিনি সাদিক অর্থাৎ যার সাধনায় আন্তরিকতা আছে, তিনি দু'দিন দু'রাত্রি খাদ্যগ্রহণ করবেন না। কেউ কেউ আরও নিষ্ঠুর অনুশাসন বেঁধে দিয়েছেন। তারা বলেছেন, "৪০ দিনে মাত্র একবার খাদ্য গ্রহণ করবেন। তারা অনশনের জন্য এ ব্যাখ্যা দেন যে অনশন হচ্ছে এক ধরনের ব্রত বা সাধনা। খাদ্য গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হয়ে আমরা আমাদের নিম্নস্তরের অনুভূতিগুলোকে লালন করি কিন্তু খাদ্য গ্রহণ না করে আমরা আমাদের উচ্চস্তরের অনুভূতিগুলোকে জাগ্রত করি।" মনে রাখতে হবে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে যে সাহায্যের জন্য হস্ত প্রসারণ করে সে কিন্তু সাধক নয়, সাধক হচ্ছেন তিনি খাদ্যের প্রতি যার কোনও মোহ নেই, যার কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই, যিনি তার দুর্বল প্রবৃত্তিগুলোকে শাসনে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আবুল আব্বাস বলেছেন, "আমার আনুগত্য এবং অনানুগত্য নির্ভর করে দুটো রুটির ওপর, যখন আমি রুটি গ্রহণ করি তখন আমি পাপকে নিকটে দেখি এবং যখন আমি রুটি গ্রহণ করি না, তখন আমি পুণ্যের স্বাদ পাই। আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া যাকে সূফীরা বলেছেন 'মুশাহাদাত' তা তখনই সম্ভব হবে, যখন আমরা মুশাহাদাতের মধ্য দিয়ে যাব। মুশহাদাতের অর্থ হচ্ছে কষ্ট সহ্য করা।

ক্ষুধার একটি তত্ত্বগত ব্যাখ্যা আছে। সাধনার জন্য কামনাকে শাসনে রেখে এবং চিত্তের প্রবৃত্তিগুলোকে অস্বীকার করে যে জীবন যাপন তার দিকে লক্ষ্য রেখেই সূফীরা ক্ষুধার কথা বলেছেন। শরীরকে সম্পূর্ণ লাঞ্ছিত করে ক্ষুধার্ত থাকলে সাধনার পথ সুগম হয় না। সুতরাং সূফীদের ক্ষুধা সম্পর্কে প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে।

www.pathagar.com

॥৪৩॥

আমি ইউনেস্কোর অনেক পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। বিশেষ করে পুস্তক প্রণয়ন এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে। বাংলা একাডেমীতে থাকতে কয়েকবার ইউনেস্কো পরিচালিত সেমিনার এবং ওয়ার্কশপে যোগদান করেছি। টোকিওতে ইউনেস্কো-উপদেষ্টা হিসাবেও যোগ দিয়েছি। চট্টগ্রামে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার অল্প কিছু দিনের মধ্যে ইরানে পুস্তকসংক্রান্ত একটি গবেষকমণ্ডলীর সম্মেলনে টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর হিসাবে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেলাম। এ পদে দায়িত্ব ছিল অনেক-কিছু প্রশ্নপত্র তৈরি করা, নীতিমালা প্রণয়ন করা, একটি প্রতিবেদন নির্মাণ করা এবং সেমিনার শেষে বিভিন্ন প্রস্তাবের খসড়া প্রণয়ন করা। কিছু কাজ আমি চট্টগ্রামে বসেই সম্পন্ন করলাম এবং তেহরানে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সেমিনারে আমাকে যোগ দিতে দেয়া হয় নি। সে ইতিহাসটাই আমি এখানে বলব।

আমি আমার আমন্ত্রণলিপি পেয়েছিলাম করাচীতে পাকিস্তান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। তারা আমার নিয়োগ অনুমোদন করেছিল। করাচীতে ইউনেস্কোর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে রিজওনাল অফিস ছিল তার পরিচালক মিঃ স্মিথ আমার কাছে সেমিনারে আমার করণীয় সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। আমি লিখিতভাবে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কে এ সম্পর্কে কিছু জানাই নি। ভেবেছিলাম যাত্রার আগে সিন্ডিকেটের কাছ থেকে ছুটি নিলেই চলবে। যেহেতু পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন রয়েছে সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি দিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। নিয়ম হচ্ছে সরকার অনুমোদন এবং নির্দেশ যদি থাকে তাহলে সিন্ডিকেট নির্বিঘ্নে ছুটি দিতে পারে। যেখানে সরকারী অনুমোদন থাকে না সেখানে সিন্ডিকেট ছুটির সমর্থন জানিয়ে সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করে। আমার ক্ষেত্রে এই সমস্যা ছিল না বলেই মনে করেছিলাম। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা ঘটে নি। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার ছুটির দরখাস্ত গভর্নর মোনেম খাঁর কাছে প্রেরণ করেন। আমার দরখাস্ত নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সিন্ডিকেটেই আসা উচিৎ ছিল, গভর্নরের কাছে যাবার কোন যুক্তি ছিল না। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ভাবলেন যেহেতু মোনেম খাঁ আমার প্রতি বিরূপ, সুতরাং তাঁকে না জানিয়ে আমার বিদেশ যাত্রার অনুমতি দেওয়া ঠিক হবে না। আমি এ খবর শুনে দুঃখিত হলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয় নিজের স্বাধীনতা খর্ব করে গভর্নরের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে সেজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করলাম। ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। আমি আমার প্রতিবাদ এবং ক্ষোভ মৌখিকভাবে তাঁর কাছেই জ্ঞাপন করেছিলাম। যাই হোক, যা হবার তাই হল। মোনেম খাঁ আমার ছুটি অনুমোদন করলেন না। তবে ইউনেস্কো আমার কাজের প্রতি সম্মান দেখিয়েছিল এবং আমি যে সমস্ত প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলাম সেগুলোর জন্য আমাকে দশ হাজারের মত টাকা দিয়েছিল। আমি পরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ নিয়ে পত্রালাপ করেছিলাম। তারা লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন থাকলে নতুন করে প্রাদেশিক সরকারের অনুমোদন নেয়ার প্রয়োজন পরে না। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের পত্রটি ডঃ মল্লিককে দেখালাম। তিনি অবশ্য কোন মন্তব্য করলেন না।

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে যোগ দেবার পর আমার প্রথম থেকেই চেষ্টা ছিল বাংলা বিভাগকে সমগ্র দেশের একটি মূল্যবান গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত করা। সেজন্য আমি উপযুক্ত শিক্ষকের সন্ধানে ছিলাম। অল্পদিনের মধ্যে বাংলা বিভাগে দেশের অনেক কৃতি সন্তান এসে যোগদেন এবং বিভাগটি সমৃদ্ধমান হয়ে ওঠে। আমার সবসময়ই লক্ষ্য ছিল এমন সব লোককে বিভাগে নিয়ে আসা যারা তাদের কর্মের প্রতি অনুগত হবেন, কিন্তু আমার প্রতি নয়। অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করি যে নিয়োগকর্তারা লোক নিয়োগের পূর্বে চিন্তা করেন যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের প্রতি অনুগত কিনা। আমি কোনদিন এভাবে ভাবি নি। আমি সর্বদাই গুণগত মানের ভিত্তিতে লোক নিযুক্ত করেছি। কিন্তু কখনও আমার লোকের অধিকারে কাউকে নিযুক্তি দেইনি। সিকানদার আবু জাফর এই নীতিটা জানতো। সে প্রায়ই আমাকে বলতো, 'পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখাই হচ্ছে মানুষের কর্তব্য। সুতরাং সে ক্ষেত্রে আশেপাশের লোকজন যাতে নিজের লোকজন হয় সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। তোমাকে তো পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হবে এবং অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। সুতরাং নিজের অবস্থানকে তুমি সুরক্ষিত করবে না কেন?' সিকানদারের কথায় যুক্তি ছিল এবং এই ধরনের যুক্তি মেনে সবাই চলেন। আমি কেন যেন প্রকৃতগতভাবে নিজের অবস্থানকে সুরক্ষিত করবার জন্য কখনও অনুগত শ্রেণী নির্মাণ করি নি। জীবনে যে সমস্ত কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত ছিলাম তাতে বশংবদ বা অনুগত শ্রেণী নির্মাণ করা আমার পক্ষে সহজ ছিল। কিন্তু আমার প্রবণতা ওদিকে ছিল না।

এ সময় মোনেম খাঁ একবার চট্টগ্রামে এলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করলেন। বাংলা বিভাগে তখন নজরুল ইসলামের হস্তলেখা, চিঠিপত্র এবং পাণ্ডুলিপির প্রদর্শনী চলছিল। মোনেম খাঁ সেই প্রদর্শনী দেখতে আসেন। মল্লিক সাহেব তখন আমাকে বলেছিলেন আমি যেন মোনেম খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার প্রতি তাঁর যে বিরুদ্ধ মনোভাব আছে তা দূর করবার চেষ্টা করি। আমি অবশ্য তাতে রাজী হই নি। মোনেম খাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল ভিড়ের মধ্যে কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোন বাক্য বিনিময় হয় নি।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চারুকলা বিভাগ ছিল না। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চারুকলার গুরুত্ব দেয়া হয়। ঢাকায় অবস্থানকালে অনেকবার চেষ্টা করেছিলাম 'ঢাকা আর্ট স্কুল'কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ত্তে নিয়ে আসতে। ডঃ মাহমুদ হোসেন যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন একবার এই চেষ্টা করি। এ ব্যাপারে মাহমুদ হোসেনের খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু তখন জয়নুল আবেদীন এবং শফিউদ্দীন আহমদ এতে রাজী হন নি। তাঁদের বিবেচ্য ছিল চাকরি ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থানটি কি হবে, তাই। যাই হোক চট্টগ্রামে আমাদের একটি সুবিধা ছিল এটি একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন একটা বিভাগ খোলা যত সহজ পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ততটা সহজ নয়। উপাচার্য ডঃ মল্লিক এ ব্যাপারে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলেন। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাতেই চারুকলা বিভাগটি খোলা সম্ভবপর হয়েছিল। শিল্পী রশীদ চৌধুরী এ বিভাগে প্রথম শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। রশীদ চৌধুরীকে আমি জানতাম অনেক দিন ধরেই। সে যখন প্যারিসে লেখাপড়া শিখছে তখন সেখানে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। প্যারিসে তাকে দেখেছি দীপ্তিমান, আত্মনির্ভরশীল শিল্পী হিসাবে। সে ফরাসী জীবনের সম্ভ্রম, শালীনতা এবং

www.pathagar.com

বুদ্ধিমত্তাকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। ফরাসীদের মধ্যে জ্ঞানের যে উৎফুল্ল বিকাশ থাকে রশীদ চৌধুরীর মধ্যে তা এসেছিল। পরে আমি যখন বাংলা একাডেমীতে কার্যরত তখন সে ঢাকায় ফিরে আসে। ঢাকায় ফিরে এসে আর্ট স্কুলে কিছুকাল কাজ করে, কিন্তু সেখানে স্থায়ী নিয়োগ পায় না। তখন আমি বাংলা একাডেমীতে তাকে পুস্তক প্রকাশনা বিভাগে খণ্ডকালীন নিয়োগ দিয়েছিলাম। সে পুস্তকের চিত্রাংশ এবং প্রচ্ছদ তৈরি করতো। সে সময় রশীদ চৌধুরীকে কিছুটা বিক্ষুব্ধ এবং অসহায় আমি দেখেছি। আমি যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ খোলার সাব্যস্ত হল তখন রশীদ চৌধুরীকে সেখানে নিয়ে এলাম। রশীদ চৌধুরীর নিয়োগের ব্যাপারে জয়নুল আবেদীন আমাদের বেশ সাহায্য করেছিলেন। তিনি নিজে রশীদ চৌধুরীকে ঢাকা আর্ট স্কুলে রাখতে পারেন নি সেজন্য তাঁর দুঃখ ও লজ্জা ছিল। চট্টগ্রামে রশীদ চৌধুরীর নিয়োগে তিনি তাই খুব খুশী হয়েছিলেন।

রশীদ চৌধুরী টেপেস্ট্রি তৈরি করতেন। টেপেস্ট্রি এক ধরনের বয়নশিল্প। সুতরাং তাঁকে চট্টগ্রামে একটি ছোটখাট কারখানা খুলতে হয়েছিল। সেখানে সে কিছু লোককে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছিল। তাঁর আঁকা ছবি তাঁরই নির্দেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা বুনে তুলতো। এই শিল্পটি ইউরোপে বিশেষ করে ফরাসী দেশে অত্যন্ত সম্মানিত। টেপেস্ট্রির মাধ্যমে ইতিহাসের বিভিন্ন কাহিনীকে বয়ন করে সংরক্ষণ করা হয়। নেপোলিয়নের যুগের অনেক ইতিহাস ফরাসী যাদুঘরগুলিতে টেপেস্ট্রির মাধ্যমে সংরক্ষিত আছে। টেপেস্ট্রি শিল্পী হিসাবে রশীদ চৌধুরী অনন্যসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছিল। টেপেস্ট্রিতে রংএর নির্বাচনটি বিশেষ গুরুত্ব পায়। উজ্জ্বল রংএর সাহায্যে ঘটনার অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা হয়ে থাকে। রশিদ চৌধুরী উজ্জ্বল রং ব্যবহার করতো। লাল-নীল-হলুদ এই প্রাথমিক রংগুলো তাঁর ছবিতে বহু বিভঙ্গের জন্ম দিয়েছিল।

রশীদ চৌধুরীকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নেওয়ার পিছনে ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশীর একটি প্রচ্ছন্ন ভূমিকা ছিল। মাহমুদ শাহ একসময় আমার ছাত্র ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে থেকে পাস করে ফরাসী সরকারের বৃত্তি পেয়ে সে প্যারিসে পড়াশুনা করতে যায়। সে সময় অর্থনীতিতে উচ্চতর গবেষণার জন্য প্যারিসে এসেছিল মোজাফফর আহমদ। এরা দুজন প্যারিসে প্রায় কাছাকাছি থাকতো। প্যারিসে কোরেশীর সঙ্গে রশীদ চৌধুরীর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। কোরেশীকে আমি বাংলা বিভাগে নিয়ে আসি ১৯৬৮ এর দিকে তখন চারুকলা বিভাগের জন্য আমরা উপযুক্ত লোক খুঁজছিলাম। কোরেশী তখন রশীদ চৌধুরীকে চিঠি লিখে এদিকে আগ্রহ করে তোলে এবং রশীদ প্রভাষক পদে যোগ দেবার জন্য দরখাস্ত দেয়।

আমি মূলত চারুকলা অনুষদ গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম যার অধীনে চারুকলা, নাটক এবং সঙ্গীত বিভাগ থাকবে। প্রাথমিক পর্যায়ে চারুকলাকে প্রধান বিষয় করা হয়েছিল এবং অন্যান্য বিষয় ছিল শাখা বিষয়। চারুকলায় অনার্স এবং এমএর ব্যবস্থা হয়েছিল এবং নাট্যকলা ছিল সাবসিডিয়ারী বিষয়। বিষয় হিসাবে সঙ্গীত তখন অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং এখনও হয়নি। চারুকলা বিষয়ে ক্লাস শুরু হবার পর থেকে আমি দুটো করে ক্লাস নিতাম, বাকী ক্লাসগুলো নিত রশীদ চৌধুরী। পরে দেবদাস চক্রবর্তী এসে যোগ দেয় এবং চারুকলা

www.pathagar.com

বিভাগটি একটি সুন্দর বিভাগ হিসাবে গড়ে ওঠে। আমি চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের ইতিহাস পড়াতাম। বহু পূর্বে প্রফেসর শাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাহচর্যে এসে আমি চিত্রকলা সম্পর্কে কৌতূহলী হয়েছিলাম। চিত্রকলার কলা নৈপুণ্য নিয়ে আমি বহুদিন চিন্তাভাবনা করেছি। তাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রকলা পড়াতে গিয়ে আমি খুশী হয়েছিলাম।

শিল্প সম্পর্কে আমরা অনেক সময় অনেক কথা শুনি, ছবিও আমরা দেখি, ছবির প্রশংসা বিভিন্ন লোকের মুখে শুনতে পাই, আবার ছবি বুঝতে পারি না এমন কথাও অনেকের মুখে উচ্চারিত হয়। কিন্তু শিল্পকর্ম যথার্থ যে কি, কোন কোন উপাদান দিয়ে চিত্র তৈরি হয় এবং শিল্পী কোন দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখেন এটা যারা শিল্প উপভোগ করতে চান তাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

শিল্পী যে দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখছেন, অবিকল সে দৃষ্টি আমার না থাকতে পারে কিন্তু আমি যদি অনুভব না করতে পারি শিল্পী কি দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখছেন, তাহলে শিল্পীর সৃষ্টিকে আমি প্রশংসা করতে পারব না। এটা সম্ভবপর নয়। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে তার দৃষ্টির বৈভব। আমাদের চোখ আছে, আমরা চেয়ে দেখি, কিন্তু আমরা জন্মসূত্রেই দৃষ্টিকে পাই না। যেমন আমরা জন্মসূত্রেই ভাষাকে পাই না। একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে তার ভাষার অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তেমনি সে দৃষ্টির অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ তার ভাষা প্রকাশের ক্ষমতা থাকে এবং দেখবার ক্ষমতা থাকে। কথা বলার ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং ক্রমান্বয়ে সে যখন বড় হয়, বিভিন্ন লোকের সংস্পর্শে আসে, মানুষের উচ্চারণ শোনে, সেগুলো সে অনুকরণ করে। ক্রমান্বয়ে বুদ্ধিবৃত্তি যখন তার সজীব হয় তখন সে যথার্থভাবে যুক্তিসঙ্গতভাবে কথা বলতে শেখে। তেমনি দৃষ্টির ক্ষেত্রেই একথা সত্য। অর্থাৎ প্রথমে শিশু যা দেখে সে দেখার অর্থ হচ্ছে–বস্তুকে চিহ্নিতকরণ। এটা ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করে। শিশু প্রথমে তার মাকে চিনতে শেখে যে একান্তভাবে তার ঘনিষ্ঠ, সে পিতাকে চিনতে শেখে এবং অবশেষে ক্রমান্বয়ে মাতার সঙ্গে অন্য মহিলার পার্থক্যও সে নির্ণয় করতে শেখে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে যে মাকে চিনে ফেলছে তা নয় কিন্তু ক্রমান্বয়ে ঐ দৃষ্টির অধিকারটা সে লাভ করতে থাকে। এভাবে দৃষ্টির অধিকার লাভ করে সে মানুষ দেখতে শেখে। অর্থাৎ পরবর্তী পর্যায়ে একজন যখন শিল্পী হবে তখন শিল্পীকে মনে রাখতে হবে যে শুধু দৃষ্টির অধিকার নিয়েই নয়, দেখার ক্ষমতা নিয়েই নয়, দেখবার বস্তু নির্ণয় করা এবং অবশেষে যথার্থ দৃষ্টি দিয়ে দেখা, এটাই হলো শিল্পীর প্রধান কর্ম।

শিল্প হচ্ছে দৃষ্টিগোচরতায় পৃথিবীকে অনুভব করার একটি আবেগময় কৌশল। এই বিষয়টার উপর গুরুত্ব দিয়েই আমি ক্লাসে আমার বক্তব্য বলতাম। শিক্ষক হয়েও রশীদ চৌধুরী অনেক সময় আমার ক্লাসে উপস্থিত থাকতো। প্রথমে খুবই আগ্রহ নিয়ে রশীদ চৌধুরী চট্টগ্রামে ছিল। কিন্তু পরে নিজেকে ঢাকা এবং চট্টগ্রামের মধ্যে একটি দোটানায় ফেলে দেয়। ঢাকার বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে টেপেস্ট্রি তৈরি করার ভার রশীদ চৌধুরী গ্রহণ করে যার ফলে তাকে প্রায়ই ঢাকায় আসতে হত। পরবর্তীতে সে তার টেপেস্ট্রির কারখানা ঢাকায় তুলে নিয়ে আসে এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীর্ঘকালীন ছুটি নিয়ে ঢাকায়

www.pathagar.com

অবস্থান করতে থাকে। এই ইতিহাসটি অনেক পরের। মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আমি যতদিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম ততদিন রশীদ চৌধুরী চট্টগ্রামে ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর সে স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করে। এটাই ছিল তার জীবনের চরমতম ভ্রান্তি। পারিবারিক জীবনেও সে জটিলতার সৃষ্টি করে। কিভাবে কি হয়েছিল জানি না এবং কেন হয়েছিল তাও জানি না, আমি শুনতে পেয়েছিলাম যে সে আবার বিয়ে করেছে। সে সময় থেকেই তার সাথে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সে আমার সঙ্গে কখনও দেখা করতো না। তার মৃত্যুতে আমি ব্যথিত হয়েছিলাম। একজন অসাধারণ শিল্পী এভাবে অল্প বয়সে নিঃশেষ হয়ে যাবে এ আমি কখনও কল্পনাও করি নি। মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাতে দুর্ভরতায় দিনে সে তার স্ত্রী এবং দুটি সন্তান নিয়ে চট্টগ্রামে আমার বাসায় কিছুদিন ছিল। সে সময়কার স্মৃতিটা আমার মনে এখনো ভাস্বর।

আমার ছোট মেয়ে নাসরিনের বিয়ের ব্যাপারে তার উৎসাহ ছিল প্রচুর এবং মাহমুদ শাহ কোরেশীর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব সেই করেছিল। ছেলের পক্ষ থেকে বিবাহের সমস্ত নিয়ম-কানুন সেই পালন করবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। খাঞ্চা চিত্রিত করে শিল্পসঙ্গতভাবে তাকে সাজিয়ে কনের বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা রশীদ চৌধুরীই করেছিল। মাহমুদ শাহ কোরেশীর সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ের পর রশীদ চৌধুরী আমার পরিবারে আরও বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। আমার পরিবারের একজন হিসাবেই আমি এবং আমার স্ত্রী তাকে গ্রহণ করি।

রশীদ চৌধুরীর মৃত্যুতে বাংলাদেশের শিল্প জগতে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে যা সহজে পূরণ হবার নয়। জয়নুল আবেদীনের পর আমাদের দেশের শিল্পের ব্যঞ্জনা একমাত্র রশীদ চৌধুরীরই ছিল। সে তার শিল্পকর্মের মাধ্যমে আমাদের জীবন এবং পৃথিবীকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিল এবং একটি বিশ্বাসের প্রতিবিম্ব নির্মাণে সফলকাম হয়েছিল।

॥৪৪॥

চট্টগ্রামে যতদিন ছিলাম, ততদিন একটি স্বস্তি এবং আনন্দের মধ্যে ছিলাম। স্থানীয় জনগণ আমাকে তাদের আগ্রহের বৃত্তের মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন। যেখানে গিয়েছি সেখানকার মানুষ আমার অত্যন্ত নিকটে এসেছে, আমিও তাদেরকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করেছি। প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায় যাবার আমন্ত্রণ পেতাম এবং আমি যেতামও। চট্টগ্রাম শহরে যে সমস্ত এলাকা রয়েছে সেসব জায়গায় আমি গিয়েছি, শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলেও গিয়েছি। এই রকম একটি জায়গা ছিল 'চুনতী'। চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার যাওয়ার প্রায় মাঝামাঝি বাঁ দিকে ফিরলে একটি পাহাড়ী এলাকা সেটাই চুনতী। এককালে প্রচুর গাছপালা ছিল, এখনও আছে, তবে বাড়িঘর তৈরির ফলে অনেক জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করতে হয়েছে। চট্টগ্রামবাসীদের কাছে 'চুনতী' এলাকার কথা খুব শুনতাম। চুনতী শাহ সাহেব নামে পরিচিত আল্লাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ একজন সাধু এখানে বাস করতেন। তিনি অল্প বয়সে রেঙ্গুন ছিলেন, রেঙ্গুনেই পড়াশুনা করেন এবং ধর্মীয় শিক্ষায় দক্ষতা লাভ করেন। যুবক বয়সে দেওবন্দে পড়াশুনা করেন এবং ধর্মশিক্ষার বিভিন্ন শাখায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি সূফীতত্ত্বে দীক্ষিত হন এবং তারই এক পর্যায়ে সংসার ছেড়ে জঙ্গলে যেয়ে বসবাস আরম্ভ করেন। দীর্ঘ দশ বছরের অধিককাল তিনি লোকালয়ের বাইরে ছিলেন।

www.pathagar.com

কখনও কখনও লোকালয়ে তাঁকে দেখা গেলেও বেশীক্ষণ তিনি লোকালয়ে থাকতেন না। অনেকে তাঁকে পাগল ভাবতো, কিন্তু ক্রমশঃ লোকেরা তাঁর নানাবিধ অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পায় এবং অবশেষে চুনতীতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়। এখানেই তিনি গৃহবাসী হন। আমি তাঁর সাথে পরিচিত হই এবং তাঁর সঙ্গে আমার একটি হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। তিনি কাউকে মুরীদ করতেন না। পীর-মুরীদের মধ্যে যে দীক্ষাদান পদ্ধতি আছে তিনি সেই পদ্ধতি মানতেন না। তিনি বেশী কথা বলতেন না এবং যখন বলতেন তখন খুব দ্রুত বলতেন। আমি তাঁর কাছে বসে শান্তি পেতাম। তিনি গৃহবাসী হলেও মূলত সংসারত্যাগী ছিলেন। সকল শ্রেণীর লোক তাঁর কাছে আসতো এবং তাঁকে ঘিরে বসে থাকতো দীর্ঘ সময় ধরে। তিনি হয়তো কিছু বলতেন অথবা বলতেন না। কিন্তু লোকেরা তাঁকে দর্শন করেই স্বস্তি পেত এবং উৎসাহিত হত। আমি এঁর কথা বলছি এ কারণে যে চট্টগ্রাম থেকে আরম্ভ করে জীবনের বিভিন্ন কর্মে আমার যে পদক্ষেপ সে সকল পদক্ষেপের সময় আমি তাঁর আশ্বাস এবং আশীর্বাদ পেয়েছি। তিনি ওরস করতেন না, কিন্তু বছরের রবিউল আউয়াল মাসে পক্ষকাল ধরে সীরাত মহফিল করতেন। এই সীরাত মহফিলে লক্ষাধিক লোক হত। মহফিলের শেষ দিন ফজরের নামাজের আগে থেকে মোনাজাত আরম্ভ হত। দীর্ঘ দুই ঘন্টাব্যাপী মোনাজাতের পর ফজরের নামাজ পড়া হত এবং তারপর মহফিল ভাঙতো। এই মোনাজাতে একবার আমি শরিক হয়েছিলাম। যে ভদ্রলোক এই মোনাজাত পরিচালনা করেছিলেন তিনি দীর্ঘ সময় ধরে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় আল্লাহর গুণকীর্তন করেন, রসূলের প্রশংসা করেন এবং মানুষের সকল পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। প্রার্থনার এই ক্ষমা ভিক্ষার পর্যায়ে মোনাজাতে অংশগ্রহণকারী অগণিত জনগণ ক্রন্দনে আপ্লুত হত। আমি এই মোনাজাতে অংশগ্রহণ করে অভিভূত হয়েছিলাম। আমার মনে হয় মানুষের জীবনে এই প্রার্থনার অসম্ভব গুরুত্ব আছে। চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রার্থনার তুল্য আর কিছুই নেই। উষালগ্নের এই প্রার্থনা মানুষের চিত্তকে পরিচ্ছন্ন করে এবং মানুষ সত্যিই তখন সকল পাপমুক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে নিবেদন করতে সক্ষম হয়। চুনতীতে এই সীরাত মহফিলের আখেরী মোনাজাতের কথা আমি কখনই ভুলব না। বহু দিন পর্যন্ত এর প্রভাব আমার মনের মধ্যে ছিল। চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে আসার পরও চুনতীর সঙ্গে যোগসূত্র আমার ছিল এবং চুনতীর শাহ সাহেব আমাকে তাঁর ওখানে যাবার প্রায়ই আমন্ত্রণ জানাতেন। আমি সব আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারি নি। কিন্তু আরও দু'একবার চুনতীতে গিয়েছি। চুনতীর শাহ সাহেবকে আমি আল্লাহর প্রতি একটি প্রেমের মধ্যে চিহ্নিত পেয়েছি।

মহব্বত বা প্রেমের তিনটি সংজ্ঞা সূফী তত্ত্বজ্ঞরা নির্দেশ করেছেন। প্রথমত প্রেম হচ্ছে প্রেমাস্পদের জন্য একপ্রকার অস্থির আকাঙ্ক্ষা, একটি আবেগ এবং আকর্ষণ। এ অর্থে প্রেম হচ্ছে সৃষ্ট জীবসমূহের পরস্পরের প্রতি আনুকূল্য এবং মমতা। দ্বিতীয়ত প্রেম হচ্ছে মানুষের উপর বর্ষিত আল্লাহর করুণা। যাকে আল্লাহ্ নির্বাচন করেন তাকে তিনি মমতা করেন এবং তাকে বৈশিষ্ট্য দান করেন। আল্লাহর বিবিধ ঐশ্বর্যেও তিনি বিভূষিত হন। তৃতীয়ত প্রেম হচ্ছে কোন কল্যাণকর্মের জন্য প্রশংসা। মানুষ যখন কোনও কল্যাণকর্ম সাধন করে, তখন আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারিত হয়।

www.pathagar.com

কোনও কোনও দার্শনিক বলেন যে আল্লাহর ভালবাসা আল্লাহর গুণাবলীর সঙ্গে যুক্ত। আল্লাহর যে সমস্ত গুণাবলী কোরান শরীফে বর্ণিত হয়েছে যার অজস্রতা থেকেই আল্লাহর ভালবাসার স্বরূপ প্রকাশ পায়। মানুষের প্রতি আল্লাহর ভালবাসা মানুষের প্রতি তাঁর শুভ কামনার মতো এবং করুণার মতো। আল্লাহর বিভিন্ন ইচ্ছার মধ্যে প্রেম হচ্ছে যাকে আরবীতে বলে ইবাদত। আল্লাহর ইচ্ছার ব্যাখ্যাসূত্রে আরও অনেক শব্দ আমরা ব্যবহার করি, যেমন 'সন্তুষ্টি', 'ক্রোধ', 'করুণা' ইত্যাদি। আল্লাহর ইচ্ছা হচ্ছে একটি অনন্তকালীন প্রজ্ঞা যার সাহায্যে তিনি তাঁর কর্মপ্রবাহ চালিত করেন। মানুষের প্রতি আল্লাহর ভালবাসার ফলে এ পৃথিবীতে মানুষের সন্তুষ্টি বিধান ঘটে এবং পরজগতে মানুষ শাস্তি থেকে মুক্ত হয়। আল্লাহর ভালবাসা থাকলে পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং এ ভালবাসার সাহায্যে সে সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হয়। 'সূফী' সাধক জুনায়েদ বলেছেন যে কোনও মানুষকে আল্লাহ যখন বিশেষত্ব দান করেন তখন সে বিশেষত্ব দানের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রেম প্রকাশ পায়। আল্লাহর ভালবাসা হচ্ছে আল্লাহর বাণীর সত্যতা এবং সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এ বাণীর প্রতি মানুষের যখন পূর্ণ আসক্তি দীপ্যমান হবে তখনই মানুষ আল্লাহর ভালবাসা পেয়েছে ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর ভালবাসা পেলে মানুষ পবিত্র হয় পরিচ্ছন্ন হয় এবং আনন্দে দীপ্ত হয়।

কিন্তু আল্লাহর প্রতি মানুষের ভালবাসা কি করে প্রকাশ পায়? এ ভালবাসার প্রকাশ ব্যাকুলতার মধ্যে, বিনয়ের মধ্যে, শ্রদ্ধার মধ্যে এবং সার্বক্ষণিক ধ্যাননিমগ্নতার মধ্যে। যে মানুষ আল্লাহকে ভালবেসেছে সে পরমকে লাভ করেছে, সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর প্রতি তার আকর্ষণ নেই। সে সমস্ত পার্থিব আকাঙ্ক্ষা এবং কামনাকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর গুণাবলীর দ্বারা গুণান্বিত হবার জন্য ব্যাকুল হয়। পৃথিবীতে যে মানুষ মানুষকে ভালবাসে সে ভালবাসার শেষ তো প্রাপ্তিতে। কিন্তু আল্লাহর প্রতি ভালবাসার শেষ নেই। কেননা সেখানে প্রাপ্তির সম্পূর্ণতা নেই সেখানে অনবরত প্রত্যাশা রয়েছে। সুতরাং একজন সূফী সাধক সর্বমুহূর্তে এ প্রার্থনা করেন, "হে আল্লাহ, আমাকে আরও দাও, আরও দাও, আমি অসম্পূর্ণতায় বিপর্যস্ত হচ্ছি। আমাকে তুমি প্রাণময়তায় সম্পূর্ণ কর।" যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসে সে আল্লাহকে কায়ফিয়াত বা স্বভাবকে আয়ত্ত করতে চায় এবং মৃত্যুচিন্তায় অধীর হয় না কিন্তু মৃত্যুকে একটি অনিবার্যতার মধ্যে আনন্দে গ্রহণ করে। এই মৃত্যু হচ্ছে পার্থিব আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু এবং পার্থিব ইচ্ছার মৃত্যু। এ মৃত্যুর কারণে মানুষ অনন্তের নিকটবর্তী হবার সাধনা করতে পারে। পার্থিব প্রেমে সমমনাদের মধ্যে আকর্ষণ প্রকাশিত হয় যেখানে দৈহিক পরিতৃপ্তি রয়েছে কিন্তু আল্লাহর প্রতি প্রেম হচ্ছে এমন একটি তাৎপর্যের উল্লাস যা আল্লাহর গুণাবলীর আসক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত সূফী সাধক সুমনুন আল মুহীব বলেছেন যে প্রেম হচ্ছে একটা ভিত্তি, যে ভিত্তি স্থাপিত করে মানুষ আল্লাহকে পাবার চেষ্টা করবে। মানুষের বিভিন্ন আশ্রয় আছে, অর্থাৎ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন আশ্রয়ে মানুষের প্রকাশ ঘটে। সকল আশ্রয়ই হচ্ছে ধ্বংসের, একমাত্র প্রেমের আশ্রয়ই হচ্ছে প্রশান্তির। প্রেমকে 'সাফওয়াত' নামেও অভিহিত করা যায়। সাফাওয়াতের অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা। সুতরাং সাফওয়াতের অবস্থা যিনি পেলেন তিনি সুফী। মনসুর হাল্লাজকে যখন

www.pathagar.com

ফাঁসিকাষ্ঠে চড়ানো হয়েছিল সে মুহূর্তে তিনি বলেছিলেন, "হাসব আল ওয়াজিদ ইফরাদ আল ওয়াহিদ" অর্থাৎ এটাই যথেষ্ট যে প্রেমিক একক সত্তার সঙ্গে মিলিত হবে অর্থাৎ প্রেমিকের আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না সে প্রেমাস্পদের অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হবে। এভাবে প্রেমের বিচিত্র অভিব্যঞ্জনা সূফী তত্ত্বজ্ঞরা দিয়েছেন।

প্রেমের যথার্থ স্বরূপ কি? যখন প্রেমিক আপন গুণাবলী সম্পূর্ণ মুছে ফেলে প্রেমাস্পদের গুণে গুণান্বিত হয়, তখন সে একটি নির্বিরোধী ঐক্যতত্ত্ব নির্মাণ করে। সে তখন একটি এককের সংজ্ঞায় বিলুপ্ত হয়। যেহেতু প্রেমাস্পদ হচ্ছে মৌল প্রজ্ঞা এবং একমাত্র অস্তিত্ব যাকে আরবীতে বলা হয় 'বাকি' এবং প্রেমিক হচ্ছে 'ফানি' অর্থাৎ নিঃশেষ, তাই প্রেমের সার্থকতা নির্ভর করবে মৌল অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে এবং আপন গুণাবলীর বিস্মরণের মধ্যে।

ব্যাকুলতা প্রেমের একটি অভিব্যঞ্জনা। আমি যে মহৎ প্রজ্ঞাকে চাই তার কোনও পরিমিতি নেই। সুতরাং তাকে কেউ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারে না কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত হিসেবে আয়ত্ত করবার কামনায় অধীর থাকে। এভাবে ব্যাকুলতা আমাদের সম্পদশালী করে কেননা ব্যাকুলতার কারণে ক্রমান্বয়ে আমরা আপনাকে অধিক থেকে অধিকতর পরিশুদ্ধ করি, পরিমার্জিত করি, পরিতৃপ্ত করি এবং পরিজ্ঞাত করি। প্রেম হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশের মান্যতা এবং অমান্যতার প্রতিকূলতা।

আরবীতে মহব্বত শব্দটি প্রেম অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি হিব্বত থেকে এসেছে। হিব্বত কথার অর্থ হচ্ছে বীজ, যা মরুভূমিতে পতিত হয়। এ সমস্ত মরুভূমির বীজকে হিজ বলা হয় এবং এ থেকেই হাব শব্দটি এসেছে। তাৎপর্য সম্ভবত এই যে যেমন বীজ সমস্ত বৃক্ষের উৎস, তেমনি প্রেম হচ্ছে প্রাণের উৎস। যখন মরুভূমিতে বীজগুলো ছড়িয়ে পড়ে তারা বালুর মধ্যে হারিয়ে যায়, তারপর তাদের ওপর বৃষ্টি পড়ে, সূর্যের আলো পড়ে, ঋতু পরিবর্তন হয়, কিন্তু বীজগুলো নষ্ট হয় না। তারা বৃক্ষরূপ উদগত হয়, তাদের ডালে ফুল এবং ক্রমান্বয়ে ফুলভারে তাদের শাখা আনত হয়। তেমনি প্রেম যখন মানবচিত্তে আশ্রয় পায় তখন প্রেমের পাত্র নিকটেই থাকুক বা অনুপস্থিত থাকুক, বিচ্ছেদ ঘটুক অথবা মিলনই ঘটুক যথার্থ প্রেম হৃদয় থেকে কখনই বিলীন হয় না। প্রেম যখন হৃদয়ে আশ্রয় নেয়, তখন অন্যসব চিন্তা হৃদয় থেকে বিদূরিত হয়। প্রেম হচ্ছে মানব হৃদয়ের কেন্দ্রবিন্দু। মানুষের শরীর যেমন আহার্য গ্রহণ করে সজীব থাকে, হৃদয় তেমনি প্রেমকে অবলম্বন করে দীপ্ত থাকে। একজন আরব কবি বলেছেন যে হৃদয় এবং চক্ষু হচ্ছে একে অন্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত, তিনি বলেছেন, "আমার হৃদয় আমার চক্ষুকে ঈর্ষা করে, কেননা আমার চক্ষু আমার প্রেমাস্পদকে দেখতে পায়। এবং আমার চক্ষু আমার হৃদয়কে ঈর্ষা করে, কেননা আমার হৃদয় আমার প্রেমাস্পদকে অনুভব করতে পারে।"

মানুষের প্রতি আল্লাহর ভালবাসা হচ্ছে মানুষের প্রতি তার শুভ কামনা এবং মানুষের প্রতি তার কল্যাণ এবং আশীর্বাদ। আল্লাহর ইচ্ছার একটি বিশেষ নাম হচ্ছে প্রেম, যাকে বলে ইবাদত। আল্লাহর ইচ্ছার আরও নাম আছে যেমন 'সন্তুষ্টি', 'ক্রোধ', 'করুণা' ইত্যাদি। আল্লাহর ইচ্ছা হচ্ছে একটি চিরকালীন গুণসম্পদ যার সাহায্যে তিনি তার বিভিন্ন

www.pathagar.com

কর্মে নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। মানুষের প্রতি আল্লাহর ভালবাসার প্রমাণ আমরা পাই পৃথিবীতে এবং পরলোকে মানুষের শান্তি এবং স্বস্তি প্রাপ্তির মধ্যে। আল্লাহ্ যাকে ভালবাসেন তাকে তিনি পাপ থেকে রক্ষা করেন এবং হীন প্রবৃত্তি থেকে দূরে সরিয়ে আনেন। যখন আল্লাহ্ কোনও ব্যক্তিকে সৎপথে উদ্বুদ্ধ করেন, তখন ভালবাসার বলেই তা করেন। বিভিন্ন সূফী সাধকগণ এভাবেই আল্লাহর ভালবাসাকে ব্যাখ্যা করেছেন। আল্লাহর প্রতি মানুষের ভালবাসা হচ্ছে মানুষের একটি গুণ এবং শক্তি যার সাহায্যে মানুষ ধীর-স্থির এবং বিনয়ী হয়, উদার হয়, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবার জন্য ব্যাকুল হয়, আল্লাহর দর্শন পাবার জন্য অধীর হয় এবং সর্বমুহূর্তে আল্লাহর নামে লিপ্ত থাকে। যথার্থ প্রেমিকের কোনও বিশ্রাম নেই, পার্থিব সকল অভ্যাস থেকে সে মুক্ত হয়, কামনা, বাসনা থেকে সে মুক্ত হয় এবং পরিপূর্ণতা লাভের জন্য আল্লাহর গুণাবলীর প্রতি ধাবিত হয়। পৃথিবীতে মানুষের প্রতি মানুষের যে ভালবাসা তার একটি দেহগত আবেশ প্রকাশ এবং বিচ্যুতি আছে কিন্তু আল্লাহকে ভালবাসা একটি অনন্ত প্রেমময়তাকে অনুভব করা। এটা হৃদয়ের সম্বল, দেহের নয়। যারা আল্লাহর প্রেমিক তারা মৃত্যু-মাহাত্ম্যে আল্লাহর নিকটস্থ হওয়ার সাধনা করেন। একেই সূফীরা বলেছেন যে মুস্তাহলিক হয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। পৃথিবীতে আমরা যে একে অন্যকে ভালবাসি, সে ভালবাসা হচ্ছে একই স্বভাবের দু'টি শক্তির পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ। কিন্তু আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হচ্ছে আল্লাহর গুণাবলীর প্রতি ভালবাসা, যে ভালবাসায় প্রকাশ্য দর্শন নেই, বাক্যালাপ নেই, কিন্তু অনুভব আছে।

॥৪৫॥

চট্টগ্রামে একদিন মওলানা আবদুর রহমান বেখুদ আমার বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি থাকেন ঢাকায়, চট্টগ্রামে আসার কোন উপলক্ষ নেই। সুতরাং তাঁকে দেখে আমি বিস্মিত হলাম। মওলানা বেখুদ ছিলেন ভারতের বিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং বিচারক শাহ্ মোহাম্মদ সুলায়মানের ভাগ্নে। তিনি তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেন কলকাতায় এবং দেশ বিভাগের পর চলে আসেন ঢাকায়। কলকাতায় হুগলী সরকারী স্কুলে হেডমৌলভী ছিলেন এবং ঢাকায় এসে আরমানীটোলায় নিউ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে হেডমৌলভীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘদেহী এই বলিষ্ঠ পুরুষটি আচার-আচরণে পুরোপুরি বাঙালী হয়ে গিয়েছিলেন। অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং বিশুদ্ধ বাংলা বলতেন। মেয়েদেরও বিয়ে দিয়েছিলেন বাঙালীর সঙ্গে। ঢাকা থাকতে বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও আমার সঙ্গে তাঁর নিগূঢ় সখ্য গড়ে উঠেছিল। এ সখ্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে আবদ্ধ থাকে নি, পারিবারিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল এবং তিনি প্রায়ই বেখুদ সাহেবের বাড়িতে যেতেন। বেখুদ সাহেব এবং আমি অনেক সময় ধর্মের বিষয়ে আলোচনা করতাম। ঢাকা থাকতে এক পর্যায়ে তাঁর কাছে থেকে আমি কোরআন শরীফের অর্থ শেখা আরম্ভ করেছিলাম। আমি তখন গোপীবাগ এলাকায় থাকতাম। তিনি সপ্তাহে একবার কি দু'বার আমার বাসায় আসতেন এবং কোরআন শরীফ নিয়ে আলোচনা করতেন। এজন্য তিনি কখনই পারিশ্রমিক নেন নি। তিনি বলতেন, "কোরআন শরীফ শেখানোর মধ্যে একটি আনন্দ আছে এবং পুণ্য আছে, সেই আনন্দ ও পুণ্যই তো আমার পারিশ্রমিক।" পাঠ গ্রহণ করবার একটি পদ্ধতি

www.pathagar.com

আমরা ঠিক করে নিয়েছিলাম। তিনি আরবী বাক্যবিন্যাসটি বিশ্লেষণ করে দিতেন, অন্বয়টি বুঝিয়ে দিতেন এবং তার পরে শব্দার্থসহ মূল ব্যাখ্যাটি উপস্থিত করতেন। মাঝখানে আমি করাচী চলে যাওয়ায় এই পাঠ গ্রহণে সমাপ্তি ঘটে, কিন্তু বেখুদ সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে যায় না।

চট্টগ্রামে বেখুদ সাহেবকে দেখে আমি অবাক হলাম, খুশীও হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "কি ব্যাপার, চট্টগ্রামে কেন?"

তিনি বললেন, "মওলানা এহতেশামুল হক তানভী এসেছেন করাচী থেকে। আমি তাঁর সঙ্গে এলাম। তিনি এলাহী বকস সাহেবদের বাসায় আছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

সেদিন সম্ভবত রোববার ছিল। আমার হাতেও কোন কাজ ছিল না। আমি বেখুদ সাহেবের সঙ্গে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজের কাছে এলাহী বকস সাহেবদের বাসায় গেলাম। সেখানে তিনি বারান্দায় বসেছিলেন। আমাকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এসে কোলাকুলি করলেন। করাচীর পর এই প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। কুশল বিনিময়ের পর আমি করাচীতে আমার পরিচিতজনের কথা জিজ্ঞেস করলাম। মওলানা সাহেব আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন এবং উর্দু সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ বললেন যে আমি করাচী ছেড়ে চলে আসায় করাচী অন্ধকার হয়ে গেছে। তাঁর এ কথায় আমি খুব হাসলাম। কিছুক্ষণ পর মওলানা সাহেব হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "দেশের অবস্থা কি রকম বুঝছেন?"

আমি বললাম, 'খুব ভালো নয়। কি যে হতে যাচ্ছে বলা কঠিন। আমরা এখন একটা অস্থিরতার মধ্যে বাস করছি।'

তিনি বললেন, 'হিন্দুস্থানের দিকে তাকিয়ে দেখুন যে কংগ্রেস স্বাধীনতা এনেছিল সে কংগ্রেস এখনও ক্ষমতায় রয়েছে। যার ফলে তাদের দেশে কোন বিশৃংখলা নেই। কিন্তু আমাদের দেশে মুসলিম লীগের পতনের কারণে আমাদের দুর্ভাগ্য এসেছে বলে আমার মনে হয়।'

আমি বললাম, 'মুসলিম লীগ যে আদর্শের ভিত্তিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিল পরবর্তীতে সেই আদর্শ নিয়েই সে চলতে চেয়েছিল। মুসলিম লীগ সংগ্রাম করেছিল দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে। হিন্দু ছিল তখন আমাদের প্রতিপক্ষ। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই একই দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধারণা এবং হিন্দু বিরোধকে অবলম্বন করেই সে বেঁচে থাকতে চাইলো, দেশ গড়ার কাজে সে মনোনিবেশ করতে চাইলো না। এর ফলে মুসলিম লীগ তার প্রতিষ্ঠা হারিয়ে ফেলল। তফাৎ একটু ছিল সেটা হল স্বাধীনতা সংগ্রামকালের হিন্দু বিরোধ এখন ভারত বিরোধিতায় রূপান্তরিত হয়েছে। একটি স্বাধীন দেশে এই আদর্শ টিকতে পারে না।'

মওলানা সাহেব বললেন, 'মুসলিম লীগের নেতৃত্বের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারলে বোধ হয় অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটবে।'

আমি হেসে বললাম, 'মওলানা সাহেব, পূর্ব পাকিস্তানে চিরকালের জন্য মুসলিম লীগের মৃত্যু ঘটেছে। এ পার্টিকে আর নতুন রূপ দেয়া সম্ভবপর নয়। নতুন রূপ দিলে এ পার্টিতে

www.pathagar.com

এখন আর কেউ আসবে না। মানুষ এখন ভোট দেবে পার্টিকে, ব্যক্তি বিশেষকে নয়। সুতরাং যত ভাল লোকই মুসলিম লীগের মধ্যে আনবার চেষ্টা করুন না কেন, যারা আসবেন তাদের অবস্থাই নাজুক হবে।'

সেদিন মওলানা সাহেবের সঙ্গে আরও কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। মওলানা সাহেবকে আমি বিমর্ষ এবং হতাশাগ্রস্ত দেখেছিলাম। আমি রাজনীতি করি না কিন্তু দেশের রাজনীতির সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বাস করি, সুতরাং রাজনীতি সম্পর্কে কিছু ধারণা রাখতেই হয়। মওলানা সাহেব যতদূর মনে হয় মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে চট্টগ্রামে এসেছিলেন। তাঁকে হতাশ হয়েই ফিরে যেতে হয়েছিল।

চট্টগ্রামে থাকতে স্থানীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার একটি ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। আমি তাদের বিভিন্ন সভায় গিয়েছি, মন্দিরেও গিয়েছি। চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় বৌদ্ধদের অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমাকে যেতে হয়েছে। রামু, কক্সবাজার, এসব অঞ্চলেও যেতে হয়েছে। বৌদ্ধদের কতকগুলো আদর্শ আমাদের ভাল লাগত। বৌদ্ধ আদর্শ বলে যে, যথার্থ মুক্তি পেতে হলে চিত্ত সমাহিত রাখতে হয়, পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত রাখতে হয়, চিত্তকে স্থিত এবং নিষ্কম্প অবস্থায় রাখতে হয় তা না হলে মানুষের মুক্তি হয় না। বৌদ্ধদের এই আদর্শ অতীতেও বিদ্যমান ছিল। তারা জীবনকে সুনিয়ন্ত্রণ করতেন আদর্শের ভিত্তিতে যাকে বলা হত সম্যক প্রতিপন্ন করা। মানুষের মধ্যে কলুষ আছে, শঠতা আছে, কূটতা আছে। এসব অন্যায় চরিত্র বিদ্যমান সত্ত্বেও মানুষ মুক্তি পেতে পারে যদি সত্য ও ত্যাগের মধ্যে শেষ পর্যন্ত নিজেকে ন্যস্ত করে। একজন বিশুদ্ধ বৌদ্ধকে বীর্যবান, প্রজ্ঞাবান এবং ধর্মানুদর্শী হতে হবে। বৌদ্ধ চিন্তার এই সমস্ত আদর্শ আমাকে সব সময় অভিভূত করতো। তাই চট্টগ্রামে থাকতে ভিক্ষুদের সান্নিধ্য পাবার আমি চেষ্টা করতাম। কিন্তু স্থানীয় বৌদ্ধদের মধ্যে এই সমস্ত আদর্শের মহিমা আমি দেখি নি। ভিক্ষুরা যেন একটি প্রথা অনুসরণ করে তাদের সময় কাটাচ্ছে। কিন্তু সমাজ এবং সময়ের প্রতি তারা কোন দায়-দায়িত্ব পালন করছেন না। চট্টগ্রামের ভিক্ষুসমাজ দেশের অন্য মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন। তাদের কোন প্রভাব সমাজের ওপর নেই, সর্বসাধারণের জীবনযাত্রার ওপরও নেই। অতীত এই বিচ্ছিন্নতার কারণেই বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভারতবর্ষ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র বঙ্গ অঞ্চলে বৌদ্ধরা বেঁচে ছিল, তান্ত্রিকতার মধ্যে। এতদ্দেশীয় তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতি এবং আচারকে অবলম্বন করে বৌদ্ধরা দুর্বলভাবে তাদের সত্তা বাঁচিয়ে রেখেছিল। এখানকার বৌদ্ধরা স্থানীয় সংস্কৃতি এবং আচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একটি ভিন্নধর্মী বৌদ্ধ মার্গ নির্মাণ করেছিল। এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম আসে অশোকের সময় থেকে এবং পাল রাজত্বের শেষ সময় পর্যন্ত এখানে বৌদ্ধধর্ম তার নিজস্ব স্বভাবে এবং প্রক্রিয়ার মধ্যে জীবন্ত ছিল। কিন্তু তার পরে ক্রমশ বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় হতে লাগল। স্থানীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম আত্মগোপন করে। অতীতে সংঘ, রাজা এবং জনতা বৌদ্ধ সাধনমার্গে একটি ত্রিভুজ-বন্দী ছিল। রাজা যখন আর রইল না তখন সংঘের সঙ্গে জনতার সম্পর্ক লঘু হয়ে পড়ল এবং ক্রমশ জনতার উপর সংঘের প্রভাব বিনষ্ট হয়ে গেল। চট্টগ্রামে দেখলাম বৌদ্ধসংঘ জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অস্তিত্ব। স্থানীয় সাধারণ বৌদ্ধরা সংঘের ভিক্ষুদের ভিক্ষা প্রদান করে নিজেদের

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালন করেন। সংঘের নির্দেশনা বৌদ্ধ জনসাধারণের ওপর নেই। সুতরাং সাধারণ বৌদ্ধ কর্তৃক সংঘকে মান্য করবার প্রশ্নই ওঠে না। আমি চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের বিভিন্ন সভায় একথা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছি এবং বৌদ্ধগণকে শক্তিমান ও জাগ্রত হতে বলেছি। কিন্তু দেখেছি এগুলো কিছুই হবার নয়। সমাজে ভিক্ষুরা সম্মানিত নয়। সুতরাং তাদের আদর্শ অবলম্বন করার প্রশ্নই ওঠে না। আমি শুধু রামুতে ব্রহ্মদেশীয় কিছু ভিক্ষুকে দেখেছিলাম যারা বর্মী হরফে লেখা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাঠে সর্বদাই নিমগ্ন থাকত। তাদের আচরণের মধ্যে গাম্ভীর্য, বিনয় এবং সহনশীলতা ছিল। তাদের আচরণ আমার মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিল, কিন্তু স্থানীয় বৌদ্ধরা সে রকম শ্রদ্ধার উদ্রেক করাতে পারেন নি।

চট্টগ্রাম থাকতে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগ খুলেছিলাম এবং রণধীর বড়ুয়াকে সেই বিভাগে নিযুক্তির ব্যবস্থা করেছিলাম। প্রথমে বাংলা বিভাগের অধীনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। পরে বিভাগটি একটি স্বাধীন বিভাগ হিসাবে গড়ে ওঠে। রণধীর বড়ুয়া এক সময় ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক ছিলেন। সেখান থেকেই তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল এবং বৌদ্ধধর্মের বিকাশ সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান রাখতেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার পর অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন এবং আমরা দীর্ঘ সময় ধরে বৌদ্ধ জীবন দর্শন নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। তিনি প্রায়ই বলতেন যে বৌদ্ধরা জীবনের সুখকে অগ্রাহ্য করতে পারে এবং এই অগ্রাহ্য করার মধ্যেই তাদের মুক্তির আনন্দ, এর মধ্যেই তাদের পৌরুষ। কিন্তু বর্তমান কালের বৌদ্ধরা সুখকে অগ্রাহ্য করবার তাৎপর্য বোঝে না। ভিক্ষুরা একটি প্রথা অবলম্বন করে মঠের মধ্যে নিজেদেরকে আবদ্ধ করে রাখে, বাইরের পৃথিবীর দিকে তারা দৃষ্টিপাত করে না। তিনি বলতেন যে এই ভিক্ষুরাই এককালে সাধারণ মানুষের জন্য আদর্শস্থানীয় ছিল। কিন্তু এখন আর তা নেই। তাদের জীবন একটা ব্যর্থ, বৃথা জীবনের মত মনে হয়। জীবনভাণ্ডারে তো দৈন্য নেই। কিন্তু ভিক্ষুরা কেমন যেন দীন এবং মুমূর্ষু। রণধীর বাবুর কাছে শুনতাম ভিক্ষুদের মধ্যেও পারস্পরিক বিরোধিতা আছে এবং বিভিন্ন সংঘের মধ্যে সংঘর্ষ আছে। এ সমস্ত বিরোধ এবং সংঘর্ষের কারণে ভিক্ষুদের প্রভাব বৌদ্ধ সমাজ থেকে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়েছে।

চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে পালি পাঠের ব্যবস্থা ছিল। সেখানে অধ্যাপক ছিলেন প্রমোদরঞ্জন বড়ুয়া। তার বিচার-বুদ্ধি এবং বিবেচনা ছিল রণধীর বাবুর বিপরীত। বৌদ্ধরা পালি পাঠের মধ্যে নিমগ্ন থাকুক তা তিনি চাইতেন না। তিনি চাইতেন যে তারা আধুনিক হোক এবং বর্তমান সময়ের উপযোগী হোক। অন্যান্য সম্প্রদায় যেভাবে ইংরেজী শিক্ষাকে গ্রহণ করে সম্পদশালী হচ্ছে বৌদ্ধরাও তাই হোক এটা তিনি চাইতেন। তাই কোন বৌদ্ধ ছাত্র পালি পড়তে চাইলে তিনি তাকে নিরুৎসাহিত করতেন। এজন্য রণধীর বাবুর সাথে তার বিরোধ বাধতো। রণধীর বাবু চাইতেন বৌদ্ধদেরকে নিজস্ব প্রজ্ঞার মধ্যে বড় হয়ে উঠতে আর প্রমোদ বাবু চাইতেন যেন বৌদ্ধরা তাদের প্রাচীন বৃত্ত ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে। এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এই সমন্বয়টা হতে পারে নি। আমি নিজে এই সমন্বয়ের বহু চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি এই সমন্বয় হবার নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধরা আপন বৌদ্ধসত্তা বজায় রেখে সময়ের উপযোগী

www.pathagar.com

হয়েছে–যেমন শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, কম্পুচিয়া ইত্যাদি। সে সব অঞ্চলের বৌদ্ধরা দেশের শিক্ষায়, রাজনীতিতে এবং সমাজ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করেছে। ব্রহ্মদেশেও তাই। কিন্তু আমাদের দেশে বৌদ্ধদের নির্জীবতার কারণ আমি খুঁজে পাই নি।

স্থানীয় বৌদ্ধদের আর একটি জিনিস আমাকে পীড়া দিত তা হচ্ছে বিভিন্ন সংঘের মধ্যে বিরোধ। ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সংঘের বিরোধ ছিল, তেমনি ছিল কুমিল্লার সঙ্গে। এই বিরোধটি অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। এই বিরোধটি তত্ত্বগত না সংঘের অধিকার নিয়ে–তা আমি জানি না। কিন্তু এটা আমি অনুভব করতাম যে বৌদ্ধদের প্রভাব ক্রমান্বয়ে এদেশের সমাজ থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে। ইংরেজীতে যাকে বলে 'লে' অর্থাৎ সাধারণ মানবসমাজ সেই সমাজের অস্তিত্ব আমাদের দেশে আছে কি নেই একেবারে বোঝা যায় না মূলতঃ বৌদ্ধ মতাদর্শী সাধারণ মানুষ হিন্দুসমাজের অংশ হিসাবেই এদেশে বিদ্যমান। অন্যদিকে মঠবাসী ভিক্ষুরা ব্রহ্মাচর্য এবং সাত্ত্বিক জীবন-যাপন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। অথচ বৌদ্ধধর্মে চিত্তশক্তি অর্জনের কথা বলা হয়েছে, উদ্যমের কথা বলা হয়েছে এবং চিত্তপ্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় বৌদ্ধ সাধনার মৌলিক আদর্শ একটি আচরণগত প্রথাতে পরিণত হয়েছে। নির্বাণ যে কি তা কি বৌদ্ধরা ভাল করে জানেনা গৌতমবুদ্ধ নিজেও নির্বাণ যে কি তা পরিষ্কার করে বলেননি। তার কারণ বোধ হয় নির্বাণের বিবৃতি দেওয়া যায় না। নির্বাণ কেবলমাত্র উপলব্ধির বিষয়। নির্বাণ মূলতঃ হচ্ছে তৃষ্ণার ক্ষয়–এটা একটি তত্ত্বের কথা। এই তত্ত্বকে সহজে বিশ্লেষণ করা যায় না কিন্তু বৌদ্ধদের কাছে এই নির্বাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বজাগতিক বিষয় বর্জন এবং তার বিরাগ ও বিরোধ এই বিষয় বর্জন মঠে থাকলেই সম্পন্ন হয়। সুতরাং আমাদের দেশের বৌদ্ধরা মঠে অবস্থান করে নির্বাণ লাভ করলেন এটা ভাবেন। রণধীর বাবু আমাকে বলতেন যে নির্বাণ হচ্ছে পুনর্জন্মনিঃশেষ অর্থাৎ সংসার আসক্তির মধ্যে যে যন্ত্রণা রয়েছে সেই যন্ত্রণা থেকে সর্বতোভাবে মুক্তিই হচ্ছে নির্বাণের উদ্দেশ্য। যারা সংসারের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত তাদের যে মুক্তি নেই তা নয় তারা প্রজ্ঞামার্গ গ্রহণ করে মুক্তিলাভ করবেন।

গৌতমবুদ্ধের প্রতি আমি অশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করি বলেই বৌদ্ধদের সম্পর্কে এত কথা লিখলাম।

॥৪৬॥

চট্টগ্রাম থাকতে ঘাটফরহাদবেগের যে বাসায় আমি ছিলাম সে বাসায় একদিন একটি মেয়ে তার ছোট ভাইকে নিয়ে এল। মেয়েটি শুনলাম এমএ পাস করেছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এবং ছেলেটি কলেজে পড়ে। তাদের বাড়ি যশোরে আমার বাড়ির কাছে। সেই সুবাদেই তারা আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। মেয়েটির মুখে শুনলাম সে তার বোনের বাসায় থাকে, বাসাটি খুব ছোট, তিন কামরার। এক ঘরে তার বোন ও স্বামী থাকেন, অন্য ঘরে বোনের তিনটি ছেলেমেয়ে এবং বসবার ঘরে রাত্রিবেলা এই মেয়েটি তার ভাইকে নিয়ে থাকে। মেয়েটি খুব সপ্রতিভ। সে বলল, "বাসায় কোন কাজকর্ম নেই আমার, তাই দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি যখন শুনলাম আপনি এখানে এসেছেন তখন ভাবলাম মাঝে মাঝে আপনার এখানে এসে সময় কাটিয়ে যাব। আপনি আমাকে উপদেশ দেবেন, আমি শুনব।"

www.pathagar.com

আমি হাসলাম, বললাম, "আমি তো কোন উপদেশ দেই না, তবে কোনও কোনও বিষয়ে তোমার যদি জিজ্ঞাসা থাকে তার উত্তর আমি দিতে পারি।"

মেয়েটি ফর্সা এবং মাঝারী গড়নের। কোন রকম সাজগোজ ছিল না। সাদামাটা পোশাকে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। ভাইটিও তেমনি, একটি শার্ট আর পায়জামা পরে এসেছিল। প্রথম দিনের পরিচয়ের পর এরা প্রায়ই মাঝে মাঝে আসত, কখনও মেয়েটি একাই আসত। মাঝে মাঝে আমার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করত। আমাদের বাসায় অবাধ গতি হয়ে পড়েছিল। রান্নাঘরে চলে যেত এবং সেখানে আমার স্ত্রীকে সাহায্য করত। এত বড় মেয়ে বিয়ে হয়নি বলে মনে হল। কৌতূহলবশতঃ একদিন তাকে তার বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করলাম। মেয়েটি সহজেই উত্তর দিল, "আমার বাবা একটি মেডিক্যাল ছাত্রের সঙ্গে আমার আক্দ করিয়ে রেখেছেন, কিন্তু ছেলেটি নানাভাবে যৌতুকের জন্য চাপ দিচ্ছে বলে আমি তার ওখানে যাব না বলে ঠিক করেছি। আমি কোথাও একটি চাকরি খুঁজে নেব এবং নির্ভেজাল জীবনযাপন করব।"

আমি শুনে বললাম, "দেখ, জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করে কোন লাভ নেই। ছেলেটির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে বুঝাবার চেষ্টা কর। তোমার সঙ্গে পরিচয় হলে হয়তো বা সে তার দাবীদাওয়া ছেড়েও দিতে পারে।"

মেয়েটি বলল, "এটা হবার নয়। সে টাকা-পয়সা চেয়ে আমার কাছে যে সমস্ত চিঠি লিখেছে তা অসম্মানজনক। যে ব্যক্তি এ ধরনের চিঠি লিখতে পারে তার সঙ্গে আমি সম্মানের সঙ্গে বাস করতে পারব না বলে ভয় হয়।"

মেয়েটি যখন আমাদের বাসায় আসত, কখনও খালি হাতে আসত না। কোনদিন কলা, কোনদিন কমলালেবু, কোনদিন পেঁপে নিয়ে আসত। আমাদের সংসারের মধ্যে মেয়েটির আসা-যাওয়া একটি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

আমাদের বাসায় কাজের লোকের অভাব ছিল। আমার স্ত্রী প্রায়ই এ অভিযোগ করতেন। একদিন মেয়েটি হঠাৎ আমাকে বলল, "আমি আপনাদের বাসায় থাকতে চাই, আপনাদের কাজকর্ম করব, কাপড় ধুয়ে দেব, রান্না করে দেব আর অবসর সময়ে আপনার কথা শুনব।" মেয়েটির প্রস্তাব এতই অদ্ভুত ছিল যে আমি হাসতে লাগলাম। বললাম, "তুমি এমএ পাস করা মেয়ে, তুমি চাকরানীর কাজ করবে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

মেয়েটি কিন্তু হাসল না, সে গম্ভীরভাবে বলল, "আপনার এখানে কাজ করা সে তো আমার গৌরবের।"

আমি আমার স্ত্রীকে ডেকে মেয়েটির পাগলামির কথা বললাম। আমার স্ত্রীও হাসতে লাগলেন। মেয়েটি আমাদের হাসি দেখে অপমানিত বোধ করল মনে হল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি এখন চলি। আমি আর আপনাদের বিরক্ত করব না।" মেয়েটি সেই যে চলে গেল আর কখনও আসে নি। আমার মাঝে মাঝে এখনও প্রশ্ন জাগে মেয়েটি কী চেয়েছিল? কোথায়ও কোন দুঃখ ছিল তার, সেই দুঃখকে ভুলবার জন্য সম্ভবত সে আমাদের এখানে আসত। কিন্তু আমরা তাকে সাহায্য করতে পারি নি।

www.pathagar.com

চট্টগ্রামের আর একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। একদিন এক বিধবা হিন্দু মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে আমাদের বাসায় উপস্থিত হলেন। মহিলা সঙ্গে করে একটি লাউ এবং কিছু করমচা এনেছিলেন। মহিলা এগুলো আমার পায়ের কাছে রেখে অনুরোধ জানালেন, আমি যেন তার ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কমার্স বিভাগে ভর্তি করাবার ব্যবস্থা করি। মহিলার কাছেই জানলাম যে তিনি পাঁচলাইশে তাঁর স্বামীর একটি ছোট্ট জমি আছে, সেখানে একটি টিনের ঘরে থাকেন এবং কাছেই একটি প্রাইমারী স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করেন। এটাই তার উপার্জনের একমাত্র সূত্র। ছেলেটি তার একমাত্র সন্তান। এ যদি মানুষ হয় তাহলে তার অভাব দূর হবে। আমি কথা দিলাম আমি তার ছেলেকে ভর্তি করবার ব্যবস্থা করব। আমি ছেলেটিকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলাম। এই মহিলা কখনও খালি হাতে আসতেন না, যখনই আসতেন কিছু তরিতরকারী নিয়ে আসতেন এবং এগুলো নিবেদন করে আমার কাছে বসে থাকতেন। আমি নিবেদন শব্দটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করলাম। এ সমস্ত উপঢৌকন দেবার মধ্যে একটি ভক্তি এবং নিবেদনের ভঙ্গী ছিল। মহিলা পায়ের কাছে বসে ধর্ম কথা শুনতে চাইতেন। এটা তিনি বুঝতে চাইতেন না যে আমি কি করে হিন্দু ধর্মের তত্ত্ব তাঁর কাছে উপস্থিত করব। কিন্তু তবু আমাকে কিছু বলতে হত এবং আমি বিভিন্ন বিশ্বাসের কাহিনী ও আত্মোৎসর্গের কাহিনী বলবার চেষ্টা করতাম। মহিলা মাঝে মাঝে আবার প্রশ্ন করতেন। একদিন প্রশ্ন করলেন, "ভীম বীর ছিলেন, হনুমানও বীর ছিলেন– এই দু'জনের মধ্যে কে অধিক বীর ছিলেন?" আমি একটু বিব্রত বোধ করলাম, পরে বললাম, "ভীমের বীরত্ব যুদ্ধক্ষেত্রে, কিন্তু হনুমানের বীরত্ব সর্বক্ষেত্রে। হনুমান লংকায় গিয়ে সীতার সন্ধান এনেছে, লক্ষ্মণ যখন শক্তিশেলে আহত তখন গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে এসেছে, আবার লংকা দাহন করেছে। হনুমান না হলে সীতা উদ্ধার হত না। আমার তো মনে হয়, সমস্ত দিক বিবেচনা করলে হনুমানকে অধিকতর মর্যাদা দিতে হয়।" আমার এ কথায় মহিলাটি খুব সন্তুষ্ট হলেন মনে হল। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন, হনুমান তো ছিলেন মহাবীর।"

এই মহিলা প্রায়ই আমার বাসায় আসতেন এবং নানা ধরনের ধর্মীয় তত্ত্বকথা শুনতে চাইতেন। আমিও যতটা জানি বলতাম। আমার একটি অভ্যাস আছে, আমি সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই কথা বলতে ভালবাসি। একেবারে লেখাপড়া জানে না এবং অতি সাধারণ নিরীহ যে মানুষ, সেও যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় আমি তার সঙ্গে কথা বলতে দ্বিধা করি না। বরঞ্চ এইসব সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে আমার বেশ ভালই লাগে। এদের শব্দকুশলতা নেই, কিন্তু বিশ্বাস এবং নির্ভরতার সহজতা আছে। আমি দেখেছি যে এদের কথায় সাড়া দিলে এরা তাদের মনকে উন্মুক্ত করে দেয় এবং কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই সব কথা খুলে বলে। এরা মানুষকে বিশ্বাস করে এবং এই বিশ্বাসের মধ্যে কোনরূপ ভেজাল নেই। হিন্দু এই বিধবা মহিলাটির কথা এজন্য একটু বিস্তৃত বললাম যে এই মহিলা ধর্মীয় এবং সামাজিক ব্যবধান সত্ত্বেও আমার কাছে মন খুলে কথা বলতে দ্বিধা করে নি। জীবনে অনেক মানুষকে দেখেছি যারা রাজনৈতিক সচেতনতার কথা বলেন এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে বাক্য উচ্চারণ করেন। কিন্তু বাস্তবে লক্ষ্য করেছি সাধারণ মানুষের সঙ্গে

www.pathagar.com

তাদের যোগসূত্র নেই। তাদের রাজনৈতিক কৌশল সাধারণ মানুষকে অবলম্বন করে কিন্তু মানবিক দিক দিয়ে তারা সাধারণ মানুষের নিকটবর্তী নন। অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনে সাধারণ মানুষকে তারা ব্যবহার করেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের সম্পর্ক থাকে না।

চট্টগ্রামে কবি মতিউল ইসলাম প্রায়ই আমার কাছে আসতেন এবং উচ্ছ্বসিত হাসি ও উল্লাসে আমার প্রহরগুলি ভরে তুলতেন। একদিন তিনি আমাকে গাড়ী নিয়ে আগ্রাবাদে তাঁর বাসায় আসতে বললেন। বললেন যে তিনি পতেঙ্গা বিমান বন্দরে একটি রেস্টুরেন্টে কাবাব-পরোটা খেতে চান। আমি গাড়ী নিয়ে তাঁর বাসায় গেলাম। গাড়ীতে উঠে তিনি বললেন যে বড় রাস্তার মোড়ে একটি বিস্কুটের দোকান আছে, সেখান থেকে একজনকে তুলে নিতে হবে। বিস্কুটের দোকানের সামনে হর্ন দিতেই একজন কুড়ি-বাইশ বছরের যুবতী বেরিয়ে এল। মেয়েটি ক্ষীণাঙ্গিনী, কিন্তু লাবণ্যময়ী ও সুন্দরী। মতিউল ইসলাম পরিচয় করিয়ে দিল যে সে একজন কাস্টমস অফিসারের স্ত্রী। এভাবে মহিলাকে তার বাড়ী থেকে না তুলে অন্য জায়গা থেকে তুলে নেয়ার মধ্যে একটি গোপনীয়তা আছে, যা আমার ভাল লাগল না। যাই হোক, আমরা পতেঙ্গা বিমান বন্দরের কাবাব ঘরের খোলা চত্বরে বসলাম এবং খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে গল্প-গুজব করতে লাগলাম। মেয়েটির ব্যবহারের মধ্যে এবং কথাবার্তার মধ্যে শালীনতা ছিল, মতিউল ইসলামের প্রতি সে শ্রদ্ধান্বিতা তা বোঝা গেল। কিন্তু বয়েসের প্রচণ্ড ব্যবধান সত্ত্বেও বন্ধুত্ব কি করে হল তা বোঝা গেল না। খাওয়া-দাওয়া শেষে যখন বিল এল তখন মেয়েটি হঠাৎ তার আঙ্গুল থেকে হীরার আংটি খুলে বিলটির উপর রাখল এবং বলল, "পয়সাটা আমি দিতে চাই, কিন্তু আমার সঙ্গে এই আংটি ছাড়া কিছু নেই, তাই এই আংটিটাই দিলাম।" মেয়েটির এই ভঙ্গিটি আমার বেশ ভাল লাগল। ভঙ্গিটি তাৎক্ষণিকভাবে নাটকীয় ছিল এবং মাধুর্যমণ্ডিত ছিল, অবশ্য আংটিটি আমরা রাখি নি, বিলের পয়সা আমি দিয়ে দিয়েছিলাম। মতিউল ইসলাম এই মেয়েকে নিয়ে কবিতা লিখেছে এবং কথাবার্তায় আমার কাছে সরল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। মেয়েটি মতিউল ইসলামের উচ্ছ্বাসের অমর্যাদা করেনি এবং কৌশলে সে তার পারিবারিক বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। মতিউল ইসলামের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীদের ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল এবং সম্পর্কটাকে সহজ এবং নিষ্পাপ করে তুলেছিল। মতিউল ইসলামের দুই স্ত্রী ছিল তাই 'স্ত্রীদের' শব্দটা ব্যবহার করলাম।

একবার মতিউল ইসলাম তাঁর আগ্রাবাদের বাসায় একটি ঘরোয়া সাহিত্যসভার আয়োজন করেন। সেখানেও মেয়েটি উপস্থিত ছিল এবং আপ্যায়নের সময় বাড়ীর ভিতর থেকে খাবার-দাবার নিয়ে আসছিল। আমি বুঝতে পারলাম যে মেয়েটি মতিউল ইসলামের আকর্ষণের অপব্যাখ্যা না করে তাকে একটি সহজ পরিচ্ছন্ন স্বীকৃতিতে পরিণত করেছে। কিছুদিন পর মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে এমএ ক্লাসে ভর্তি হয় এবং আমার ছাত্রী হয়। ছাত্রী হিসাবে তাকে লেখাপড়ায় খুবই আগ্রহী দেখেছি এবং তার চলাফেরা এবং কথাবার্তার মধ্যে একটি শৃংখলা এবং শান্তশ্রী লক্ষ্য করেছি। তখন আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে মেয়েটি বিশৃংখলা চায় না, অব্যবস্থা চায় না এবং কোন প্রকার অশালীন তাৎপর্যে জীবনকে অমর্যাদা করতে চায় না।

www.pathagar.com

মতিউল ইসলাম বলতেন যে তিনি কোনও চিন্তা না করে এবং কোনও সমস্যার কথা না ভেবে শুধুমাত্র মনের ইচ্ছায় অন্য এক অনুভূতিপ্রবণ মনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চান। তিনি বলতেন যে এতে তিনি কোন দোষ দেখেন না। হৃদয়কে শাসন করলে হৃদয় হারিয়ে যায়। আবেগের তীব্র স্রোতে শুকনো পাতার মত ভেসে যাওয়াতেই তো আনন্দ। আমি অবশ্য মতিউল ইসলামের সঙ্গে একমত ছিলাম না। এহেন আবেগকে লালন করতে গিয়ে তিনি তাঁর জীবনের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করেছিলেন অনেক। অবশ্য একটা কথা সত্য যে সমস্যা সৃষ্টি করলেও সমস্যাগুলো তাকে বিমর্ষ ও নির্যাতিত করতে পারে নি। তিনি চিরকাল হাসি এবং উচ্ছ্বলতায় জীবন কাটিয়ে গেছেন। কোনদিন অনুভব করা যায়নি তাঁর সংসারে অনেক অভাব এবং জটিলতা। প্রথাগত ধার্মিকতা তার মধ্যে ছিল না, কিন্তু ধর্মবিরোধীও তিনি ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুতে আমি একজন অকপট বন্ধুকে হারিয়েছি।

চট্টগ্রামে মহিলাদের বান্ধবী নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হিসাবে 'বান্ধবী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত। প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করতেন মুস্তারী শাফ নামক একজন কর্মপরায়ণা মহিলা। মহিলা আমার দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া। এই মহিলার কর্মতৎপরতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। বান্ধবী প্রতিষ্ঠানের একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানে আমি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলাম। আমার বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, "রমণীরা জীবনকে সৃষ্টি দেয় এবং জীবনের সূত্রপাতে জীবনকে লালন করে। সুতরাং পৃথিবীতে রমণীদের মর্যাদা সর্বাধিক হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক অপলাপে এবং অসঙ্গতিতে সে মর্যাদা আমাদের দেশে তারা হারিয়েছে। এই মর্যাদা তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে। যারা বিভিন্ন সামাজিক কর্মের মধ্য দিয়ে এই সামাজিক মর্যাদা ফিরে পাবার চেষ্টা করছেন তাদের সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য।" সেদিন আরও কি কি বলেছিলাম মনে নেই, কিছু কৌতুকও করেছিলাম মনে পড়ে। মহিলা গল্প লিখে থাকেন এবং তাঁর গল্পের মধ্যে নারীজীবনের সমস্যা বিশ্লেষণের প্রয়াস থাকে। মুশতারী শফি অত্যন্ত বিনয়ী, নিরহংকার এবং রুচিবান। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং দুর্যোগের সময় তাঁর স্বামী নিহত হয়েছিলেন। আমার চট্টগ্রাম বাসকালে এ মহিলার কাছ থেকে সম্মান, সমর্থন এবং আন্তরিক বিনয় পেয়েছি যা কখনও ভুলবার নয়।

॥৪৭॥

আমার বড় মেয়ে থাকত মোহাম্মদপুরে, তার একটি ছোট্ট বাড়ি ছিল। বাবর রোডের উপর বাড়িটি, বাড়ির আশেপাশে অধিকাংশ বাসিন্দারাই ছিল অবাঙালী। প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমার মেয়ের পরিবারের কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না, কোন বিরোধও ছিল না। কিন্তু ক্রমশঃ সে অনুভব করতে লাগল এই প্রতিবেশীরা এখন আর তাকে ভাল চোখে দেখছে না। ঢাকা শহরের সর্বত্র বাঙালীদের পাকিস্তান বিরোধী বিক্ষুব্ধতা যখন চলছে তখন মোহাম্মদপুরে ক্ষুদ্র আকারে বাঙালী বিরোধিতা গড়ে উঠছিল। ১৯৭০ এর ডিসেম্বরে আমি যখন ঢাকা আসছিলাম তখন এই এলাকায় বাঙালীদের জন্য অশান্তি লক্ষ্য করছিলাম। আমার মেয়ে তখনই আমার সঙ্গে চট্টগ্রাম চলে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তখন তাকে চট্টগ্রাম আনি নি। পরে অবশ্য তাকে নিয়ে আসতে হয়েছিল। দেশে সর্বত্র তখন ক্ষুব্ধতা, বিরোধ এবং

www.pathagar.com

অশান্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠক্রম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ছাত্ররা আন্দোলনে নেমে পড়েছিল, শিক্ষকরাও আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, এক কথায় বলা যেতে পারে তখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিরোধটা ছিল সর্বাত্মক।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তখন প্রফেসরদের জন্য বাড়ি তৈরি হয়েছে। আমি সেই বাড়িতে চলে এসেছিলাম ডিসেম্বরে। সে সময় আমি আমার পুরোনো গাড়িটা বিক্রি করে নতুন একটি টয়োটা কিনেছিলাম। পাহাড়ের উপর নতুন বাড়ি তাকে নানাভাবে সাজানো গোছানোর প্রয়োজন ছিল। আমি আমার পড়ার ঘরটি ঠিক করে নিয়েছিলাম। ঘরটি ছোট ছিল কিন্তু নির্জন। আমি ভেবেছিলাম এখানে নিরিবিলি পড়াশুনা করা যাবে। বাড়ীর পিছনে দক্ষিণ দিকে প্রচুর খোলা জায়গা ছিল, সেখানে বাগান করব ভাবলাম। অনেক দিন পর একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাড়ীতে থাকবার সৌভাগ্যে আমি উৎসাহিত ও আনন্দিত হয়েছিলাম। যে কোনও উঁচু জায়গায় একটি নির্জনতা থাকে। আশেপাশে কিছুই থাকে না, শুধু নিচুতে নেমে যাওয়া ঢালু জমি, উপরে শুধু আকাশ থাকে। নিজেদের শব্দ সেখানে নিজেরাই শুনি অন্যের কোলাহল কানে বাজে না। ভেবেছিলাম এই নির্জনতায় জীবনের কর্মের শেষ অধ্যায়টি কাটিয়ে দিতে পারব।

আমার জীবনে বিরাট প্রত্যাশা কখনও ছিল না, আমি চেয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে এটাকেই আমার প্রাপ্তি বলে ধরে নিয়েছিলাম। আমি একটি সান্ত্বনার আশ্বাস পেতে চেয়েছিলাম শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে। সান্ত্বনার একটি বরাভয় আছে। সেই বরাভয়ের মধ্যেই আমি জীবনের প্রহরগুলি কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সময় ছিল অশান্ত, কোন কিছুতেই সুস্থির থাকবার উপায় ছিল না।

বাড়ির সামনের মাঠে পশ্চিমের দেয়াল ঘেঁষে কবুতরের ঘর করে দিয়েছিলাম। আমার জীবনের সঙ্গে এই পাখিগুলো আশৈশব জড়িত। শৈশবে নানার বাড়িতে মানুষ হয়েছিলাম, সেখানে কবুতর ছিল। ঢাকায় স্কুল এবং কলেজ জীবনে বাবার সঙ্গে যেসব বাসায় থেকেছি সেখানেও কবুতর ছিল। বাবা কবুতর পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন যে কবুতর হচ্ছে পবিত্রতার প্রতীক। বড় হয়ে আমার নিজস্ব সংসার যখন হল তখন আমিও কবুতর পোষা আরম্ভ করলাম। যেখানেই গিয়েছি এক ঝাঁক শুভ্র কবুতরের আনন্দ নির্মাণ করেছি। ক্যাম্পাসের এই নতুন বাড়িতেও আমি আবার নতুন করে কবুতর নিয়ে এলাম আমার সঙ্গে বসবাস করবার জন্য। ঢাকায় যখন ছিলাম তখন ঢাকার বাসায় কবুতর ছিল। সেই কবুতরগুলো সম্পর্কে আমি এ সময় লিখেছিলাম–"আমার বাড়িতে কতগুলো পোষা কবুতর আছে। উঠোনের এক পাশে তাদের ঘর। সকালবেলা উঠোনে ধান-গম ছিটিয়ে দেওয়া হয়। একগুচ্ছ ফুলের মতো ওরা তখন খাবারের উপর ছড়িয়ে পড়ে। ওদের মধ্যে একটির গায়ের রং মেটে, অন্যগুলো ধবধবে সাদা। মেটে রং-এর কবুতরটি বেশ পরিপুষ্ট ও সবার চেয়ে দ্রুত খায় আবার পাশের কবুতরটিকে তাড়িয়ে দেয়। প্রথম কিছুদিন আমাকে ওরা ভয় পেত, এখন আর পায় না। এখন ওরা বারান্দায় উড়ে আসে। আমি দুমুঠোয় করে মুগ, মুশুরি, ছোলার ডাল যা পাই নিয়ে বারান্দায় বসি। কবুতরগুলো এদিক-ওদিক তাকায়, একবার হাতের কাছে এসে ঘুরে যায়, হাতের নিচে ঝরে পড়া দু'একটি দানা ঠোঁটে করে সরে যায়,

www.pathagar.com

অবশেষে হাতের উপর উঠে বসে। প্রথমে একটি তারপর আরও কয়েকটি। আমার হাতের উপর, বাহুর উপর কখনও কোলের উপর ওরা যখন হেঁটে বেড়ায় তখন আমার বেশ ভাল লাগে, আমার সকল স্নায়ুতে একটি সাড়া জাগে। মনে হয়, ক্রমশঃই মনে হয়, সূর্যের তাপ যেন আমি সঞ্চয় করছি। কোনও যৌবনাবতী রমণীর স্পর্শ পেলেও আমার বোধহয় এ আনন্দ হবে না। দু'মুঠোয় করে কবুতরকে যে খেতে দেই, এটা আমার একটি গোপন বিলাস। সকালবেলা ওদের মধ্যে যেয়ে আমি বসি, গম খেতে দেই, এদিক-ওদিক তাকিয়ে ডালও দু'মুঠো খেতে দেই, আর ওরা আমার হাতের তালুতে ঠোঁট লাগিয়ে কত খুশী যে ছড়ায়, তা কি করে বুঝাই! মানুষের সঙ্গে প্রতিদিন কত বিচিত্র সম্পর্কের জানালা খুলেছি কিন্তু আলো ও বাতাসে মন সম্পূর্ণ ছেয়ে যায়নি। কিন্তু এ কয়টি সুন্দর জ্যোস্নার মতো উজ্জ্বল উষ্ণ পাখি আমার মন থেকে পৃথিবীর ক্লান্তি ও বেদনা হরণ করে নেয়। সমস্ত সমস্যা হারিয়ে আমার মনে তখন একটি মুক্তির স্পন্দন জাগে।"

কবুতরগুলো সম্পর্কে এত বিস্তৃত বললাম তার কারণ সহজেই অনুমেয়। যে বিক্ষুব্ধ সময়ের মধ্যে বাস করছিলাম, তখন এই কবুতরগুলোই ছিল আমার বিশ্বাস এবং শান্তির কারুকার্য। কিন্তু এ কারুকার্য বেশি দিন রইলো না। সর্বত্র কোলাহল লক্ষ্য করছিলাম। সবকিছু যেন ভেঙেচুরে যাচ্ছে এ রকম মনে হচ্ছিল। বাড়ির বাইরে বেরুলে অনুশীলিত জীবনকে আর পাচ্ছিলাম না। চতুর্দিকে একটি ভিন্নবোধের রাজ্য নির্মিত হচ্ছিল। একটি বিপুল অস্বীকৃতি বাঙ্ময় হচ্ছিল। অনবরত প্রতিবাদ সভা, মিছিল, রোষ ও ক্ষোভের গুঞ্জন চলছিল। এর মধ্যে একদিন জার্মানীর একজন লেখক কি উপলক্ষে যেন চট্টগ্রামে এলেন। ভদ্রলোকের নাম হরসট আরডমান। কে যেন তাকে আমার ক্যাম্পাসের বাসায় নিয়ে এল। ভদ্রলোক ঢাকায় কয়েকদিন ছিলেন। ঢাকা থেকেই চট্টগ্রাম এসেছেন। তিনি অল্পকিছু কথাবার্তার পরেই বললেন, "তোমাদের দেশে সর্বত্র একটি ক্ষোভের প্রকাশ দেখছি। মনে হচ্ছে সম্মুখেই কোন বিপ্লবের সম্ভাবনা আছে। ঢাকার চাঞ্চল্য দেখে মনে হল সরকারী প্রশাসন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত কি হবে আমি বুঝতে পারছি না।" আমি তার কথার উত্তরে বললাম, "আমরাও ঠিক বুঝতে পারছি না, কি হতে যাচ্ছে। তবে আমাদের দেশের ক্ষোভটি স্বাভাবিক এবং সত্য এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের অঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি চিরস্থায়ী বিরোধ নির্মিত হবে।"

ভদ্রলোক বললেন, "বৃটিশরা যেভাবে আলোচনার মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্তে এসেছিল, পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে সে রকম কি আলোচনা হতে পারে না?"

আমি বললাম, 'এটা হবার নয়, দেশ বিভাগের পর থেকেই আমরা দেখে আসছি যে পাকিস্তানের উভয় অংশের সঙ্গে সংলাপ রচিত হয় নি। তারা যেভাবে কথা বলে আমরা সেভাবে বলি না। তাদের মানসিকতা এবং আমাদের বিস্ময়করভাবে ভিন্ন। আমরা স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী কিন্তু তারা এক ধরনের একত্বে বিশ্বাসী। তারা চায় যে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে একই সংস্কৃতি, একই শিক্ষা ব্যবস্থা এবং একই অর্থনীতির ধারাপ্রবাহ বিদ্যমান থাকুক। অন্যদিকে আমরা চাই পাকিস্তানের প্রতিটি অঞ্চল আপনাপন স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকাশ লাভ করুক এবং স্বতন্ত্র বিকাশের মধ্যে উভয়ে বন্ধু হিসাবে মিলিত হোক"।

www.pathagar.com

ভদ্রলোক বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল এখন মনে নেই। তিনি কিছু জার্মান গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশে আগ্রহী ছিলেন।

ক্যাম্পাসে একদিন পূর্ণেন্দু দস্তিদার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। পূর্ণেন্দু দস্তিদারের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের। তিনি এককালে বিপ্লবী ছিলেন, জেল খেটেছেন এবং দুর্ভর জীবনযাপন করেছেন। আমি যখন বাংলা একাডেমীতে তখন তাঁর একটি বই আমি ছেপে দেই। বইটি ছিল চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহের উপর। পরে তার অনুবাদ করা শেখভের গল্প বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে। চট্টগ্রামে আসার পর তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। তিনি বিপ্লবীদের স্মৃতি রক্ষার্থে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে স্মৃতিসভার আয়োজন করতেন এবং বিপ্লবের প্রেরণাটি বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করতেন। তার এসব স্মৃতিসভায় প্রায়ই আমাকে নিয়ে যেতেন। আমি লক্ষ্য করেছি যে, তিনি নতুন কোন বিপ্লবের কথা চিন্তা করতেন না, দেশের সাম্প্রতিক পরিপ্রেক্ষিতে তা যে সম্ভব নয় তাও তিনি জানতেন। কিন্তু যারা একবার ব্যর্থ বিপ্লবের আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছিল তাদের কথা তিনি ভুলতে পারতেন না।

চট্টগ্রামে আমার বাসায় তিনি প্রায়ই আসতেন। কিন্তু ক্যাম্পাসের বাসায় এই প্রথম এলেন। আমি তাকে বাসাটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালাম। বাসার দক্ষিণে খোলা জায়গাটি তার খুব ভাল লাগল। কবুতরগুলো দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি পায়রা পোষেন নাকি?'

আমি বললাম, 'আমার জীবনের প্রথমলগ্ন থেকেই কবুতরের সঙ্গে বসবাস।'

পূর্ণেন্দু দস্তিদার বললেন, 'এরা কিন্তু দুর্ঘটনার সংবাদ বহন করে। কোনও রকম দুর্যোগের সম্ভাবনা দেখা দিলে এরা উড়ে চলে যায়। আর থাকে না। আমি এর অনেক পরিচয় দেখেছি। আপনিও দেখবেন। এরা আপনাকে বিপদের ইঙ্গিত দেবে।'

আমি বললাম, 'আপনি বিপদে কথা বলছেন কেন?'

পূর্ণেন্দু দস্তিদার বললেন, "জীবনের অনেক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে চলেছি, আজকে আমাদের জীবনে কি যে ঘটতে যাচ্ছে জানি না, কিন্তু বিপদ এবং বিপর্যয় যে আসবে, এটা অবধারিত মনে হচ্ছে। আপনাকে সে জন্য আগে থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে।'

পূর্ণেন্দু দস্তিদার এক ঠোঙ্গা চিড়ে ভাজা নিয়ে এসেছিলেন। ভাজা চিড়ের মধ্যে নিমপাতা ছিল এবং চীনাবাদাম ছিল।

বললেন, 'আমি চিড়ে ভাজা খুব পছন্দ করি। আমার গিন্নী চিড়ের সঙ্গে নিমপাতা ভেজে দেন। তাতে ভাজা চিড়ায় একটি নতুন স্বাদ হয়।'

সেদিন তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার এখানে ছিলেন। সেই তা সঙ্গে আমার শেষ দেখা। মুক্তিযুদ্ধের সময় পরিবার পরিজনসহ একটি পাহাড়ী এলাকা দিয়ে পলায়নকালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। যুদ্ধকালীন সময়েই সে সংবাদ আমি পেয়েছিলাম। পূর্ণেন্দু দস্তিদারের সঙ্গে আমি কোন দিনই রাজনীতির বিতর্কে যাইনি। বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের মতপার্থক্য ছিল, কিন্তু এ নিয়ে কোনরূপ আলোচনা আমাদের মধ্যে হয় নি। সহজ একটি পরিচয়ের বৃত্তে আমরা মিলিত ছিলাম এবং সুন্দর, সুস্থ মানবতাবোধের প্রেক্ষিতে আমাদের পারস্পরিক সংলাপ গড়ে উঠেছিল। তিনি সব শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশতেন এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে

www.pathagar.com

সকল প্রকার মতাবলম্বীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এমন কি মুসলিম লীগের সঙ্গে। ফরিদ আহমদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, ফরিদ তাঁকে দাদা বলত। সকলেই তাঁকে বিশ্বাস করত। রাজনৈতিক ঘটনাগুলোর সঙ্গে তিনি নিজেকে জড়িয়ে না ফেলে অতীতের স্মৃতির তাপের মধ্যেই বাস করতেন।

প্রাচীনকালে বলা হত, যারা আজন্ম শুদ্ধ এবং ফলপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত যারা কর্মত্যাগ করেন না, সিংহাসন লাভের অধিকার তাদেরই। 'রঘুবংশ কাব্যের' সূত্রপাতে কালিদাস বলেছেন যে রঘুবংশজাত পুরুষেরা ধন্য। যশস্বী এবং সার্থক ছিলেন। তার কারণ তারা আজন্ম শুদ্ধ ছিলেন, সত্যের জন্য মিতভাষী ছিলেন, যশের জন্য বিজয়কামী ছিলেন, যথাকালে তারা প্রবোধিত ছিলেন এবং ফল প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তারা কর্মত্যাগ করতেন না। কিন্তু বর্তমানে তা আর নেই। বর্তমানে সুবিধা অনুসারে কার্যসাধনের ব্যবস্থা করা হয়। রাজনীতিতে সুযোগ এবং সুবিধা অন্বেষণ করা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সুযোগ এবং সুবিধার অন্বেষণ থেকে পূর্ণেন্দু দস্তিদার নিজেকে দূরে রেখেছিলেন।

১৯৭০-এর শেষে এবং ৭১-এর শুরুতে আমি ঢাকায় প্রায়ই আসতাম। তখনকার দিনে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটটি ঢাকায় খুব সুস্পষ্ট ছিল। ঢাকায় এলে সিকান্দার আবু জাফরের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটাতাম। ফররুখের সঙ্গেও দেখা হত। তখন ফররুখ কেমন যেন হতাশগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল। সে পাকিস্তানকে ইসলামের সঙ্গে সমার্থক ভেবেছিল, কিন্তু তার স্বপ্ন ভঙ্গ হচ্ছিল। এই স্বপ্নভঙ্গের কারণে সে তখন নিজের পথ ঠিক করে নিতে পারে নি। একবার আমার সঙ্গে দেখা হলে বলেছিল, 'আলী, আমাদের এখন চেষ্টা করতে হবে ইসলামকে রক্ষা করবার জন্য।'

আমি হেসে উত্তরে বলেছিলাম, 'একজন মুসলমান হিসাবে আমি বিশ্বাস করি যে ইসলাম কখনও বিপদগ্রস্ত হয় না। ইসলাম থেকে বিচ্যুতি ঘটলেই মুসলমানদের পতন ঘটে। মনে রাখতে হবে পাকিস্তান এবং ইসলাম এক নয়। পাকিস্তানে ইসলামকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু ইসলামকে কখনও অবলম্বন করা হয় নি।'

সেদিন ফররুখকে খুব ক্ষুব্ধ এবং হতাশাগ্রস্ত মনে হয়েছিল।

॥৪৮॥

পাকিস্তান আমলে কবি ইকবালকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার যে সমস্ত চেষ্টা ছিল, তার সবগুলোর মধ্যে ইকবালকে কবি হিসাবে বিচার করার প্রয়াস ছিল না। তাঁকে বলা হত পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং ইসলামী আদর্শবাদী কবি। অথচ আমাদের অঞ্চলে আমরা কিন্তু ইকবালকে সেভাবে গ্রহণ করি নি। দেশ বিভাগের পূর্ব থেকে বাঙালীদের কাছে ইকবাল পরিচিত ছিলেন সমাজমনস্ক বিপ্লবী কবি হিসাবে। আশরাফ আলী খান 'শেকওয়া'র অনুবাদ করেছিলেন। কলিমুল্লাহ বলে এক ভদ্রলোক তিনিও 'শেকওয়া'র অনুবাদ করেছিলেন। অমিয় চক্রবর্তী অনেকগুলো খণ্ড কবিতার অনুবাদ করেছিলেন, যেখানে দেশপ্রেমের কথা আছে এবং মৃত্তিকার সঙ্গে বন্ধনের কথা আছে। ইকবালের সঙ্গে আমাদের এই পরিচিতি পূর্ণাঙ্গ ছিল না এটা সত্য, কিন্তু যতটুকু পরিচয় ছিল তার মধ্যে স্বস্তি ছিল এবং আনন্দ ছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী মহল আমাদের কাছে ইকবালকে করতে চাইল বিশ্ব

www.pathagar.com

মুসলিম সৌভ্রাতৃত্বের নায়ক হিসাবে। আমি করাচীতে এবং লাহোরে ইকবাল দিবসের যে সমস্ত অনুষ্ঠানে গিয়েছি, সেসব অনুষ্ঠানে ইকবালকে ধর্মপ্রবক্তা, আদর্শবাদী মহাপুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করবার চেষ্টা হয়েছে। এই মানসিকতা বাঙালী মানসিকতার বিপরীত ছিল। মনে আছে একবার পাকিস্তানের জনৈক শিক্ষাসচিব ওয়াহিদ বখশ কাদরী আমাকে বলেছিলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানীরা ইকবালকে ঠিকমত জানে না, ইকবালের যে পরিচয় তাদের কাছে আছে, সে পরিচয় ঠিক পরিচয় নয়। ইকবালকে আসলে ধর্মপ্রাণ জ্ঞানতাপস হিসাবে চিনতে হবে।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, এটা কি করে সম্ভবপর?

তিনি বলেছিলেন, ইকবালের ইসলাম ধর্মভিত্তিক দার্শনিক কবিতাগুলো প্রচুর পরিমাণে বাংলায় অনুবাদ করে বাঙালীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। আর তাঁর বিপ্লবী ও সমাজতান্ত্রিক কবিতাগুলো যাতে চোখে না পড়ে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারীভাবে এটা করা দরকার।

এই উদ্ভট পরিকল্পনার কথা শুনে আমি মনে মনে হেসেছিলাম।

সরকারের পক্ষ থেকে আবার নজরুল ইসলামকে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে। সরকারী সাহায্যে নজরুল ইসলামের উপর অনুষ্ঠান হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। সেখানে নানাভাবে নজরুলকে 'ইসলামী কবি' হিসাবে চিহ্নিত করবার প্রয়াস হয়েছে। একটি বিভ্রান্তিকর মানসিকতা থেকেই এ সমস্ত তাৎপর্যহীন কর্মকাণ্ড আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে অপলাপ গড়ে তুলেছিল। এ ধরনের চিন্তা ফররুখকে খুব প্রভাবিত করেছিল, আমাকেও অংশতঃ যে না করেছিল তা নয়।

আবুল কালাম শামসুদ্দিন ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান 'রেনেসাঁ সোসাইটি' পুনর্জীবিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিল মোহাম্মদ ইদ্রিস। মোহাম্মদ মোদাব্বের, জহুর হোসেন চৌধুরী, আকবর উদ্দিন, মুজিবর রহমান খান এবং আরও অনেকে। পর পর কয়েকটি মিটিং হয়। মিটিংগুলো হয় আরমেনিয়ান স্ট্রীটে মোহাম্মদ কাসেমের বাসায় এবং একটি বড় মিটিং সম্ভবত হয় আগামসিহ লেনে শামসুদ্দিন সাহেবের বাসায়। মিটিংগুলোতে সিদ্ধান্ত হয় যে সোসাইটির দিকনির্দেশনাস্বরূপ একটি প্রবন্ধ আমাকে লিখতে হবে। আমি 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি। এই প্রবন্ধের এক জায়গায় আমি লিখি যে রাষ্ট্রের সংহতির প্রয়োজন হলে আমরা রবীন্দ্রনাথকেও ত্যাগ করব। আমার জীবনের পরবর্তীতে দেখা গেছে যে, ক্রমশঃ পাকিস্তানকে অস্বীকার করেছি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নয়। অথচ সেই সময় কোন উৎসাহে এবং বিবেচনায় এ কথা যে বলেছিলাম আজ সে কথা মনে করতে পারছি না। আমার মনে হয়, তখন একটি মানসিকতা কাজ করেছিল, তা হচ্ছে ঃ পাকিস্তান এমন একটি পবিত্র আদর্শ যাকে সংরক্ষণ করা আমাদের সকলের কর্তব্য। পবিত্রতার এই সম্মোহন আমাদের আচ্ছন্ন করেছিল, কিন্তু অল্প দিনের জন্যমাত্র।

১৯৫২ সালে এই সম্মোহন ভেঙ্গে যায়। আমার এই পুরোনো লেখাটি 'মাহে নও' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আমি আর ওটাকে কোনও গ্রন্থে স্থান দেই নি। অথচ এই

www.pathagar.com

লেখাটি অবলম্বন করে আমাকে হতচেতন করা এবং বিপর্যস্ত করার বহুবিধ চেষ্টা আজ পর্যন্ত চলছে। আমার জীবনে পাকিস্তানের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ স্তিমিত হয়েছে। অবশেষে পূর্ণভাবে স্খলিত হয়েছে। সে কথা নিয়ে কেউ কোন আলোচনা করেন না। আলোচনা করেন একটি অস্বীকৃত মনোভঙ্গি নিয়ে, যার তাৎপর্য অল্প দিনের মধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধিবৃত্তির শূন্যতা এবং অসহায় মানসিকতা থেকেই আমার প্রতি বিরূপতার সৃষ্টি। তবে কাল বিপুলা এবং পৃথ্বী নিরবধি। আমি বিপুলা কাল এবং নিরবধি পৃথ্বীর মধ্যে বাস করি। বর্তমান কাল আমার জন্য সর্বস্ব নয়। বর্তমানের মধ্যে আমার পদক্ষেপমাত্র। দীর্ঘ সময় যাত্রার মধ্যে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে অবলম্বন করে বেঁচে আছে।

আরও একটি বড় কথা হচ্ছে সত্যের কখনও মৃত্যু নেই। যে মানুষ শুধু বর্তমানের মধ্যে বাস করে তার কাছে সময় নেই বলেই তার এত ভয়, বিশ্বাস ও ঘৃণা। জীবনে এবং মৃত্যুতে পরিত্যক্ত হবে বলেই তারা সব ঈর্ষার মধ্যে বাস করে। আমি বিশ্বাস করি যে, জীবনের যাত্রা সুষম ও সুস্থ করতে হলে সম্পূর্ণ করতে হলে আমাদের সকলকে প্রেমে ও বৈরাগ্যে একত্রিত হয়ে পথ চলতে হবে। আমাদের জীবনে মমতার প্রয়োজন। মানুষের চরম অসহায়তা তখনই হয়, যখন সে অনুভব করে কেউ তাকে ভালবাসছে না। যে নিঃশ্বাসে আমাদের জীবন সচেতন, তা যদি প্রেমের নিঃশ্বাস না হয়, তাহলে প্রেমের অভিষেক হবে না। সর্বমুহূর্তের জন্য এ প্রেমকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। শূন্যতায় ভীত না হয়ে মমতাবোধে জীবনকে সম্পূর্ণ করতে হবে।

মানুষ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, এক অবস্থায় কখনও অক্ষয় থাকে না। গান্ধীজি একেই বলেছিলেন সত্যকে নিয়ে পরীক্ষা। সত্যকে আবিষ্কার করতে মানুষ জীবনে অনেক পর্যায় অতিক্রম করে। এক সময় সত্য যেভাবে প্রতিভাত হয় অন্য সময় সেভাবে নয়। আমার নিজের জীবনে এর পরিচয় আমি বহুবার পেয়েছি। পাকিস্তান আন্দোলনে এক সময় নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলাম। তখন আন্দোলনটা একটা স্বপ্ন এবং আদর্শের প্রশাখা ছিল। কি আশ্চর্য ছিল তার সম্মোহন– কল্পনা করা যায় না। বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মুসলমান পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষপাতিত্ব করেছে। একটি তীব্র সুনিশ্চয়তায় তারা এ আন্দোলনকে সফল করেছিল। আমার মনে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, রাজনীতিবিদ এবং সর্বসাধারণ সকলেই একই বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হয়েছিল। আন্দোলনের সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ এখনকার দিনে কল্পনা করাও অসম্ভব। সেই আন্দোলনে অর্থনৈতিক যুক্তি ছিল। আবেগের উচ্চারণ ছিল এবং আন্তরিক বিশ্বাসের সমর্থন ছিল। একটি অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য সকলেই মিলিত হয়েছিল। অসম্ভব সম্ভবও হয়েছিল। যা ছিল অকল্পনীয় তাই সম্ভব হয়েছিল। ভারত বিভক্তি ঘটেছিল এবং মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র দেশ সৃষ্টি হয়েছিল। আজকের দিনের তরুণ সমাজ সে সময়কার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বুঝতে পারে না। বর্তমানে এক প্রকার সরলীকরণ প্রথায় অনেকে সে সময়কার আন্দোলনকে ভ্রান্ত বলেও চিহ্নিত করছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সর্বভারতে মুসলমানদের মধ্যে যে বিস্ময়কর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা ছিল অতুলনীয়।

www.pathagar.com

এই ঐক্যকে শেষ পর্যন্ত আমরা রক্ষা করতে পারলাম না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের মধ্যে সম্প্রীতি এবং বিশ্বাস নির্মাণের সুযোগ না দিয়ে আমরা বিরুদ্ধতা এবং ক্ষুব্ধতার জন্ম দিলাম। পাকিস্তানের প্রশাসনের অধিকারটা চলে গেল পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। তারা তাদের ঔদ্ধত্য এবং অহমিকায় বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধকে ভুল বুঝল। যুগ যুগ ধরে বঙ্গ অঞ্চলের মানুষ আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় উদযোগী ছিলেন। এখানকার মানুষ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং আনন্দকে অন্য সংস্কৃতির প্রভাব বলয় থেকে দূরে রেখেছিল এবং সেজন্য তারা গর্বিত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ আমাদের এ গর্বের উপর আঘাত করেছিল। পাকিস্তানের সূত্রপাত থেকেই আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধের অবমূল্যায়ন হতে থাকে। এক সময় যে বিপুল অহংকারে পাকিস্তানের আন্দোলনে এদেশের মানুষ অংশ নিয়েছিল, সেই অহংকার আমাদের ভেঙ্গে যেতে লাগল। যে শক্তি পাকিস্তানের সপক্ষ শক্তি হিসাবে কাজ করতে প্রস্তুত ছিল সেই শক্তি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হল। এ অঞ্চলের মানুষ তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আপন স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হল। এই ইতিহাসও বিস্ময়কর এবং অনন্য সাধারণ।

একই স্বাতন্ত্র্যচেতনা তখনও কাজ করেছে পরেও কাজ করেছে। প্রথম স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল ভারতীয় সমাজে মুসলমানদের মধ্যে একটি স্বাতন্ত্র্যবোধ। পরের স্বাতন্ত্র্য চেতনা ছিল পাকিস্তানের সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে বাংলাদেশের মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধ।

ডক্টর কুফী বুসিয়া স্বাতন্ত্র্যকে ব্যাখ্যা করেছেন এক প্রকার নিজস্বতা বলে এবং এক প্রকার অন্তর্লীন প্রতিবাদ বলে। তিনি ছিলেন ঘানার 'অশান্তি' গোত্রের নেতা। নক্রুমার সঙ্গে তার বিরোধ বেধেছিল এই অশান্তি গোত্রের প্রত্যয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। নক্রুতা তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরে নক্রুতার পতন যখন ঘটে তখন তিনি ঘানায় ফিরে যান এবং ঘানার প্রধানমন্ত্রী হন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার পর আমি কুফী বুসিয়ার ঘানায় প্রত্যাবর্তনের খবর পাই। তখন তাঁকে আমি একটি চিঠি লিখি। তিনি উত্তর দেন, কিন্তু উত্তরের মধ্যে কোন উচ্ছ্বাস ছিল না। মনে হয়েছিল তিনি তাঁর দেশে সংকটের আবর্তে রয়েছেন। অল্পদিনের মধ্যে সেনাবাহিনী সেখানে ক্ষমতা দখল করে এবং কুফী বুসিয়া কেম্ব্রিজে ফিরে যান। নিরহংকার, আত্মসচেতন এই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মানুষটি আমাকে অভিভূত করেছিল। যদি ঘানা এই ব্যক্তির প্রজ্ঞা ব্যবহার করে দেশকে সমৃদ্ধ করতে পারত, তবে ঘানার জীবনে বিপর্যয় ঘটত না। আমি বাংলাদেশের আন্দোলনের সূত্রে এই ব্যক্তির নাম এজন্যই উল্লেখ করলাম এই ব্যক্তি একটি জাতির স্বাতন্ত্র্যবোধকে দর্শনের মর্যাদা দিয়েছিলেন। বুসিয়ার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি তবে পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত তাঁর খবর কখনও কখনও পেতাম। তারপর থেকে আর একেবারেই পাই না। হয়ত বা জীবিত নেই, জানি না।

চট্টগ্রামে থাকতে মাঝে মাঝে পিকনিকে যেতাম। বিভিন্ন চা বাগানে পিকনিক করতে গিয়েছি। শেষবারের মত পিকনিক করেছিলাম রামগড়ে। রামগড় অত্যন্ত সুন্দর জায়গা। এলাকাটিতে পাহাড়ী লোকজনের সংখ্যা কম। কেমন একটি নির্ভাবনাময় শান্ত পরিবেশ।

www.pathagar.com

রামগড়ের ওপাশে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাব্রুম এলাকা। মাঝখানে ব্যবধান মাত্র ৩০/৪০ ফিট। একটি ছোট খাল দু দেশকে ভাগ করেছে। রামগড় এলাকায় প্রচুর গাছ। একই বনভূমি সাব্রুমেও ছড়িয়েছে। পিকনিকে এসেছিল আমার পরিবারের সবাই, সঙ্গে ছিল আমার এক ছাত্র- আবদুল মান্নান। আমরা সারাটা দিন রামগড়ে কাটিয়ে ছিলাম। পরবর্তীতে এই পিকনিকের কথা আমার খুব বেশী মনে পড়েছে। তার একমাত্র কারণ এ পথ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। চট্টগ্রামের অন্য এলাকার সঙ্গে রামগড়ের তফাৎ আছে। এখানে বাড়িঘর কম, বিস্তীর্ণ এলাকা বেশী, বৃক্ষাদিও বেশী। পথ চলতে পাহাড়ী লোকের সাক্ষাৎ মেলে প্রায়ই। এখানে প্রকৃতির রং সবুজ এবং কোথাও কোথাও ধূসর! প্রকৃতির উদার বিস্তার এবং উপরে উন্মুক্ত আকাশ সেবার আমার খুব ভাল লেগেছিল। মান্নান বলেছিল যে নির্জন জায়গা কবিতা লিখবার জায়গা। আমার কিন্তু তা মনে হয় নি। আমার মনে হয়েছিল যে নির্জনতাকে একান্তে উপভোগ করতে হয়। সে সময় কোন কর্ম সম্পাদন করতে গেলে নির্জনতায় আঘাত লাগে। নির্জনতায় বিশ্বপ্রভুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তিনি যেন সর্বত্র আচ্ছন্ন করে আছেন, তিনি যেন নির্জনতার মধ্যে সবাইকে আহ্বান করে বলেন, 'তুমি নিজেকে খুঁজে পাবার চেষ্টা কর, নির্জনতার শান্তশ্রীর মধ্যেই তোমার বরাভয়। গাছের পাতা বাতাসে দোল খাচ্ছে, প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে, একটি কি দুটি পাখী ডেকে উঠছে। সব কিছুর মধ্যেই তো তোমার জন্য আশ্বাস। পৃথিবীতে বিমুগ্ধতার প্রহর তো খুব কম। এই নির্জনতায় তুমি তোমার বিমুগ্ধতা খুঁজে পাবে।'

চট্টগ্রামে থাকতে একটি পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটে। আমার বড় জামাই ছিল টেলিফোন বিভাগের ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার। অত্যন্ত দক্ষ এবং ন্যায়নিষ্ঠ কর্মচারী হিসাবে সে পরিচিত ছিল। কিন্তু তার অধীনস্থ কিছু কর্মচারীর অপরাধের দায়ভাগ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয় এবং সে চাকরি থেকে অপসারিত হয়। আমার বড় মেয়ে তখন চট্টগ্রামে আমার কাছে ছিল। সে কিন্তু বিষয়টাকে খুব গুরুতরভাবে নেয় নি, সহজভাবেই নিয়েছিল। তার ধারণা ছিল একজন দক্ষ প্রকৌশলীকে অসুবিধায় ফেলা কঠিন, সে নিজের পথ একদিন বেছে নেবেই। কার্যত হয়েছিলও তাই। আমার জামাই একটি বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এবং অবশেষে স্থায়ীভাবে বিদেশে চলে গিয়েছিল। কিন্তু আমার স্ত্রী খুব মুষড়ে পড়েছিলেন, অপরাধ নেই অথচ শাস্তি হবে-এমন অবস্থাকে তিনি কখনই মেনে নিতে পারছিলেন না। আমার স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। এটা তিনি বিশ্বাস করতেন, অন্যায়ের জয় কখনও হয় না এবং অন্যায়ভাবে শেষ পর্যন্ত কারও ক্ষতি সাধনও করা যায় না। কিন্তু তা ৎক্ষণিকভাবে তিনি বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়তেন, পরে অবশ্য ক্রমশ তার মধ্যে স্বস্তি নামত। মাঝে মাঝে তিনি অলৌকিক কিছুতেও বিশ্বাস করতেন। যেদিন আমার বড় জামাইয়ের বিপদের খবরটা আসে সেদিন একটি পাগলী সকালবেলা আমাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিল 'তোদের বিপদ আসছে, তোদের বিপদ আসছে'-এই কথা বলে। আমি বিরক্ত হয়ে পাগলীকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, পরে যখন আমার জামাইয়ের খবর এল, তখন আমার স্ত্রী আমাকে অভিযুক্ত করতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন, 'পাগলীকে না তাড়িয়ে তার কাছ থেকে স্বস্তয়্যনের ব্যবস্থা নেয়া যেত।' তার রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছিল এর অন্তরায়। তিনি

www.pathagar.com

ছিলেন মুসলিম লীগের লোক। তাই মুসলিম লীগের ভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি যে বাংলাদেশের মানুষের অন্তর জয় করতে পারবেন না এটা তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি।

এ সময় আমি খুবই চিন্তিত থাকতাম। একটা কিছু হতে যাচ্ছে আমি বুঝেছি, কিন্তু তা যে কত ভয়ংকর তা বুঝে উঠতে পারি নি। আমার স্ত্রী প্রায়ই বলতেন চাল, ডাল, তেল এগুলো কিনে রাখতে, প্রায়ই হরতাল হচ্ছে কখন এগুলো দুর্লভ হয়ে পড়ে ঠিক নেই, সুতরাং সংগ্রহ করে রাখা ভাল। কিন্তু আমি অধিক জিনিস সংগ্রহের পক্ষপাতি ছিলাম না। এক মাসের খাদ্য সরঞ্জাম আমাদের বাসায় সব সময় মওজুদ থাকতো, মাসের শুরুতেই সব কিনে রাখা হত। এ প্রথা আমাদের সংসারে চলে আসছে অনেক দিন ধরে, কিন্তু এর চেয়ে অধিক সংগ্রহ রাখার আমি পক্ষপাতি ছিলাম না। আমার স্ত্রী আরও বলতেন সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে থাকার কথা। দুর্যোগের দিনে তিনি কারও কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চাইতেন না। অতীতেও লক্ষ্য করেছি কখনও কোনও সংকট দেখা দিলে তিনি আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হয়ে থাকতে চাইতেন। ফেব্রুয়ারি মাসে আমার বড় মেয়ে ছিল ঢাকার মোহাম্মদপুরে তার নিজের বাসায়। সেখানে সে তার স্বামী এবং দুই সন্তান নিয়ে থাকতো। ছোট মেয়ে থাকতো চট্টগ্রামের দেব পাহাড়ে। সে প্রায়ই আমাদের বাসায় আসতো, কিন্তু বড় মেয়েকে নিয়েই আমাদের চিন্তা ছিল বেশী, বিশেষ করে আমার স্ত্রীর। সে প্রায়ই টেলিফোন করতো এবং ঢাকা শহরে যা ঘটছে তার খবর দিত। সে যে এলাকায় থাকতো সে এলাকায় ছিল বিহারীদের বাস।

বিহারী প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমার মেয়ের কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। কেন যেন বিহারীরা বাংলাদেশের আন্দোলনের প্রথম থেকেই বিরোধী ছিল। তারা এ দেশের মানুষের স্রোতধারায় মিশে যেতে পারে নি। পাকিস্তানের ক্রীড়নক হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বাঙালীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। অথচ এদের অনেকে বাংলা শিখেছিল, এ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল কিন্তু সাংস্কৃতিক চেতনায় তারা আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে নি। করাচীতে যখন ছিলাম তখনই দেখেছি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিহারী অধ্যাপকরা বাঙালীদের প্রতি কিরকম বিরূপ। বিহারে জন্মগ্রহণকারী যেসব অধ্যাপক করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন তারা উচ্চশিক্ষিত ছিলেন কিন্তু বাঙালীদের সঙ্গে তাদের একটি অপরিচয়ের ব্যবধান ছিল। এই ব্যবধান কোনক্রমেই দূর করা সম্ভব হয় নি। তারা ছিলেন শিক্ষিত। তাদের ক্ষেত্রেই যখন এই ব্যবধান, অশিক্ষিত লোকদের ক্ষেত্রে ব্যবধান তো তীব্রতর হবেই। এদের মধ্যে যে দু-একজন সজ্জন আগেই বলেছি। তিনি যথার্থ ছিলেন না তা নয়, মওলানা আবদুর রহমান বেখুদের কথা আমরা আগেই বলেছি। তিনি যথার্থ সজ্জন ছিলেন এবং বাঙালীদের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে আমি একবার ঢাকায় এসেছিলাম। মেয়ের বাসায় ছিলাম। তখন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তার বাসায় দাওয়াত করে আমাকে খাইয়েছিল। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী অত্যন্ত সজ্জন, বিনীত এবং আন্তরিক বন্ধু ছিল। আমার প্রতি তার শ্রদ্ধার মধ্যে কোন প্রকার খাদ ছিল না। সে প্রাইভেটে এমএ পরীক্ষা দেয় বাংলাতে।

www.pathagar.com

॥৪৯॥

বিক্ষুব্ধতা এবং দেশে অসন্তোষ চট্টগ্রামে বসেই অনুভব করা যাচ্ছিল। অসন্তোষের মুখরতা এবং প্রবল প্রকাশ ছিল ছাত্রদের মধ্যে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যেও অসন্তোষ দানা বাঁধছিল দেখছিলাম। নির্বাচনেই প্রমাণ হয়েছিল যে এদেশের মানুষ পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান করতে যাচ্ছে। যদিও নির্বাচনে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের বিজয়ই সূচিত হয়েছিল কিন্তু আন্দোলনটি ছিল সর্বব্যাপী এবং সকলের। এ সময় ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বিশিষ্ট শিল্পপতি এ কে খান সাহেবের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়। তিনি বলেছিলেন, "পাকিস্তান শাসন করছে পাঞ্জাবের সেনাবাহিনী এবং সরকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। এরা কোনক্রমেই ক্ষমতা আপন হস্তচ্যুত হতে দিতে চায় না। পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা ক্ষমতায় আসবে এটা তারা কখনই মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু ক্রমশঃ সময় যতই পার হচ্ছে সেনাবাহিনীতে বাঙালীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সিনিয়র প্রশাসনিক পদেও বাঙালীরা প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এগুলো সবই পাঞ্জাবীদের জন্য অসুবিধাজনক। তাই তারা নিজের স্বার্থেই একদিন চাইবে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক। ইতোমধ্যেই তারা শতকরা নব্বইটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। পশ্চিম পাকিস্তান উৎপন্ন পণ্যের বাজার সন্ধান করছে মধ্যপ্রাচ্য অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান না থাকলেও যাতে তাদের অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা থাকে সে চেষ্টা তারা করে যাচ্ছে। বর্তমানে আন্দোলন চলছে সে আন্দোলন না হলে একদিন পূর্ব পাকিস্তান সমগ্র পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবেই–এটা আমি দেখতে পাচ্ছি।'

এ কে খান সাহেব মুসলিম লীগ করতেন। কিন্তু মুসলিম লীগের আদর্শের প্রতি তাঁর কোন অন্ধ অনুরাগ ছিল না। তিনি প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত এবং যুক্তিবাদী ছিলেন। এক সময় আইয়ুব প্রশাসনে মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু শিল্পপতি এবং মন্ত্রী হিসাবেই তাঁর পরিচয় নয়, তিনি সম্ভ্রান্ত এবং সংস্কৃতিবান ছিলেন। দেশের অবস্থা তিনি পর্যবেক্ষণ করতেন এবং যথার্থ সিদ্ধান্তে আসতে পারতেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন আপন বিশ্বাসে এবং বিবেচনায়। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণের পিছনে তাঁর রাজনৈতিক দলের কোন নির্দেশনা এবং প্রেরণা ছিল না।

১৯৭১-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হয় একটি বিরাট বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে। চট্টগ্রামে মুসলিম ইনস্টিটিউটে একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে আওয়ামী লীগ। আমি সেখানে প্রধান অতিথি ছিলাম এবং সভাপতি ছিলেন এম আর সিদ্দিকী। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বাসায় চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের হান্নান নামে একজন কর্মী আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। সে আমাকে মুসলিম ইনস্টিটিউটে যেতে অনুরোধ করে। আমি রাজনৈতিক দলের সভায় যাই না, কিন্তু সেবার গিয়েছিলাম। আমি এই বিচারে গিয়েছিলাম যে শহীদ দিবসটি দেশের সকল মানুষের, দ্বিতীয়তঃ সে সময় দেশব্যাপী যে আন্দোলন চলছে তা কোন একটি রাজনৈতিক দলের নয়, তাও সকলের। সুতরাং প্রতিবাদী সভা যে কেউ আহ্বান করুক সেখানে আমি যেতে পারি। সন্ধ্যার পর অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছিল। আমি প্রধান অতিথির বক্তৃতায় দেশের সংকটের কথা বলেছিলাম

www.pathagar.com

এবং সংকট থেকে উত্তরণের জন্য জাতীয় ঐক্যের কথা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, পূর্ণ মানবিক অধিকার এবং সাংস্কৃতিক অধিকার নিয়ে পাকিস্তানে আমরা বেঁচে থাকতে চেয়েছি কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বারবার সে পথে প্রতিবন্ধকতা এসেছে। এই প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রমে আজ আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটাতে হবে। আমরা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর বিশ্বাসী এবং সে মূল্যবোধের ভিত্তিতে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হোক এই আমরা চাই। ১৯৫২ সালে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল সে আন্দোলনকে উৎস করেই বর্তমান আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছে। এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আন্দোলনকে যথার্থ রূপে ফলপ্রসূ করে তোলা।"

এই সময় জি আল্লানার একটি চিঠি পাই। আল্লানা শংকাকুল চিত্তে চিঠি লিখেছে যে চতুর্দিকে যে অবস্থা সে দেখতে পাচ্ছে তাতে তার মনে হচ্ছে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাবে। ব্যবসায়ী হিসেবে সে অনুভব করতে পারছে যে অর্থনৈতিক দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি বিচ্ছিন্নকরণ প্রক্রিয়া চলছে যার ফলে জাতীয় ঐক্য শেষ পর্যন্ত আর হয়তো থাকবে না। আল্লানার চিত্তে ক্ষোভ ও বেদনা ছিল। দেশের তৎকালীন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এ কে ব্রোহীও কি বলেন তা আমার জানবার আগ্রহ ছিল। ব্রোহীর কাছে আমি একটি চিঠিও লিখেছিলাম, কিন্তু তার উত্তর পাইনি। ব্রোহী এক সময় বলেছিলেন যে সমগ্র পাকিস্তানের জন্য একক নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সে নেতৃত্ব নেই, কোনদিন হবেও না। তিনি নিজে এই নেতৃত্বের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন। বাঙালীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং সেই যোগাযোগের ফলে ভেবেছিলেন যে সম্ভবত তাকে বাঙলার মানুষ পরীক্ষা করছেন।

সে ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন রুচির শান্ত পুরুষ। যখন আমি বাংলা একাডেমী থেকে চট্টগ্রামে যাই তখন সে আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে বাড়িতে আপ্যায়ন করেছিল। সেবার মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কোনরূপ আলোচনা হয় নি। সেবার কেন, কোনদিনই তার সঙ্গে রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক গড়ে ওঠে নি। সে শিক্ষা এবং সংস্কৃতিচর্চায় নিজেকে নিমগ্ন রাখতো এবং সেখানেই ছিল তার আনন্দ। আজ বিশেষ করে সেদিনের কথা মনে পড়ছে। কেননা সেবার ফেব্রুয়ারিতে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর সঙ্গে যে দেখা সেটাই ছিল আমার জন্য শেষ দেখা।

সেবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ দিয়ে যেতে ডঃ গোবিন্দ দেবের সঙ্গে দেখা হল। তিনি সম্ভবত রমনা থেকে তাঁর বাসায় ফিরছিলেন। আমি পিছন থেকে তাঁকে ডাকলাম। তিনি হাসি হাসি মুখে আমার দিকে ফিরে তাকালেন, কথা বললেন না এবং হেঁটেই চললেন। আমি অবাক হলাম কিন্তু তবু দ্রুত এগিয়ে তাঁর পাশে হাঁটতে লাগলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলাম। কিন্তু তিনি আগের মতই হাসি হাসি মুখে মাথা নাড়তে লাগলেন। তখন আমার খেয়াল হল যে ডঃ দেব সপ্তাহে একদিন নিয়মিতভাবে মৌনব্রত পালন করেন। সেদিন ছিল তাঁর মৌনব্রত পালনের দিন। আমি আরও কিছুক্ষণ তাঁর পাশে পাশে হেঁটে তাঁর কুশল কামনা করে হাতে হাত মিলিয়ে বিদায় নিলাম। ডঃ দেবের সঙ্গে এটাই আমার শেষ দেখা।

www.pathagar.com

গোপীবাগে দু'নম্বর লেনে আমার শ্বশুরের বাড়ি ছিল। তখন আমার শ্যালা বাবলু সে বাড়িতে থাকে। সে চাকরী করতো নৌ পরিবহন সংস্থায়। সে সেখানকার সচিব ছিল। বাবলু ছিল জীবনরসিক আনন্দময় পুরুষ। সে প্রতিদিন সকালবেলা পুকুরে সাঁতার কাটতো। আর শীতকাল এলে ছুটি নিয়ে বন্দুক হাতে নিয়ে চট্টগ্রামের দিকে চলে যেত শিকার করতে। তার অনেক শিকার খেয়েছি। সে প্রথমতঃ হরিণ শিকার করতো। আবার বনমোরগ ও পাখিও শিকার করতো। তার একটি স্বভাব ছিল সকল ব্যাপারে সরল সহজ সিদ্ধান্ত তৈরি করা। এই সরলীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে নিশ্চিন্ত থাকতো। আমি গিয়ে তার বাসায় উঠতেই সে আমাকে দোতলার খোলা বারান্দায় নিয়ে গেল। সেখানে একটা টিনের চৌবাচ্চার মধ্যে ছোটজাতের কয়েকটি হাঁসের বাচ্চা ছেড়ে দিয়েছে। হাঁসগুলো অল্প পরিসরের মধ্যে সাঁতার কাটছে এবং পানি ছিটাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'এগুলো কি শোভা বর্ধনের জন্য, নাকি নোংরা সৃষ্টির জন্য?' গম্ভীরভাবে বলল, 'আপনি জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে কিছু বোঝেন না, এরা যে মানুষকে কত আনন্দ দেয় তা বলে শেষ করা যায় না।' আমি বললাম, 'কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ আনন্দ তো দেয়ই, কিন্তু খাদ্য হিসেবে আনন্দ দেয়। তুমি শিকার করে পাখি মার, হরিণ মার, আবার এদিকে কয়েকটি হাঁস পালছো, এ হাঁসগুলোও কালক্রমে খেয়ে ফেলবে।'

বাবলুর ওখানে সেদিন অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে পরে মোহাম্মদপুরে মেয়ের ওখানে ফিরে গিয়েছিলাম।

দেশের রাজনীতি সম্পর্কে বাবলুর সমাধান ছিল খুব সহজ। সে আমাকে বলেছিল, "আমরাই পাকিস্তানকে শাসন করব দেখবেন। শেখ সাহেব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী পূর্ব পাকিস্তানের চীফ মিনিস্টার হবেন, আর পশ্চিম পাকিস্তানের কেউ হয়তো প্রেসিডেন্ট হবেন। এখন সমস্ত কথাবার্তা চলছে, সেগুলো মান-অভিমানের কথা, সুযোগ-সুবিধা আদায়ের কথা। দেখবেন শীগগীরই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আমি বিমর্ষ ও চিন্তিত কণ্ঠে উত্তর দিলাম, "বিষয়টি অত সহজ মনে কর না। চতুর্দিকে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে তাতে সমস্যা জটিল বলেই মনে হয়। সহজ পথের দিকে আমরা চলছি বলে মনে হয় না।" বাবলু হাসি হাসি মুখে বিজ্ঞজনোচিতভাবে বলল, "আপনি সবদিকেই শুধু জটিলতা দেখেন। আমি তো কোথাও কোন জটিলতা দেখি না। ক্ষমতা পেতে গেলে দর-দস্তুর করতেই হয়।"

ঢাকার আবহাওয়া চট্টগ্রামের মতই উত্তপ্ত ছিল, বরঞ্চ আরও বেশী। সবাই রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে ভাবছিল। সহজ সমাধান খুঁজছিল, সংকল্প গ্রহণ করছিল, আবার সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখছিল। সর্বত্রই একটি ব্যস্ততা আমি লক্ষ্য করছিলাম। সাধারণ মানুষ জটিল চিন্তার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। কিন্তু দেশব্যাপী আন্দোলনের সাড়া তাদেরকেও বিচলিত করেছিল। আমার মেয়ের বাসায় এক ফেরিওয়ালা কলা বিক্রি করতে এসেছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম দেশের অবস্থা নিয়ে সে কিছু ভাবছে কিনা। সে যা বলল তার সারমর্ম এই যে সে শুনতে পাচ্ছে যে শেখ মুজিব ক্ষমতায় এলে চাল-ডালের দাম কমবে, সবকিছু সস্তা হবে, যদি হয় তাহলে তো খুবই ভাল কথা। কিন্তু হবেই কিনা সে ব্যাপারে তার সংশয় আছে। আমি শুধু তাকে বললাম, 'তবে ভাল কিছু আশা করতে দোষ কি?'

www.pathagar.com

সময়ের প্রেক্ষাপটে বহু লাবণ্য উদ্ভাসিত হয়, আবার হারিয়ে যায়। আমি লাবণ্য এবং কল্যাণের সন্ধান করছিলাম। কিন্তু দেখা গেল সময় বিরূপ। সর্বত্র শুধু একটি শংকা জাগছে। সেবার ঢাকা থেকে খুব স্বচ্ছন্দ চিত্তে চট্টগ্রামে ফিরতে পারি নি। হস্তান্তরটি সময়ের অপেক্ষামাত্র। শেখ মুজিব অবশ্যই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। এখন দরদস্তুর চলছে। আমি মুনীরের কথার কোন প্রতিবাদ করি নি। মুনীর আমাকে তার বাসায় নিয়ে যেতে চাইল কিন্তু আমি রাজী হলাম না।

পরের দিন সকালে আমি আমার মেয়ে, জামাই এবং তাদের দুই সন্তান নিয়ে চট্টগ্রামের পথে রওয়ানা হলাম। তাদের সব জিনিসপত্র মোহাম্মপুরের বাসায় রইল। একটি বুড়ি তাদের বাড়িতে কাজ করত, প্রহরী হিসেবে সেই বুড়িটি এবং আমার জামাই মাসুদের পুরনো অফিসের একজন পিয়ন রইল। তাড়াতাড়ি রওয়ানা দিতে গিয়ে আমার মেয়ে তার স্বর্ণালংকারগুলো আলমারীতে রেখে এসেছিল, মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বাড়ির সর্বস্ব লুট হয়, কোন সম্বল আর অবশিষ্ট থাকে নি। যাই হোক গাড়ি নিয়ে মোহাম্মদপুরের বাসা থেকে বেরিয়ে নিউমার্কেটের পথ থেকে পূর্ব দিকে মোড় ঘুরে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের কাছে যখন এসেছি, তখন আমার শিক্ষক রাজ্জাক সাহেবকে পথ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলাম। আমি গাড়ি থামিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললাম।

তিনিও দেখলাম বেশ নিশ্চিন্ত রয়েছেন। পথে আর কোথাও থামি নি। ফেরত পথে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হই নি। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টও নির্বিঘ্নে পার হয়েছিলাম মনে আছে। আমার স্ত্রী মেয়েকে পেয়ে খুব খুশী হলেন। ২৬শে মার্চ আমার জন্ম দিন। জন্মদিনে সবাইকে তিনি একত্রে পাবেন জেনে খুব আনন্দিত হলেন। সন্ধ্যার সময় উপাচার্য ডঃ মল্লিকের বাসায় গেলাম। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকও ছিলেন। শুনলাম পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ও শিক্ষকরা শহরে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছে। সেখানে ডঃ মল্লিককে সভাপতি করে ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সভায় তারা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করবে। এ বিষয়টা নিয়ে তাকে এবং অন্য সবাইকে খুব চিন্তিত মনে হল। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই, পানির ব্যবস্থা নেই, হরতালের জন্য সব বন্ধ, ব্যাংকও বন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই ক্যান্টনমেন্ট। ক্যান্টনমেন্টে কিন্তু বিদ্যুৎ এবং পানির সরবরাহ বন্ধ হয় নি। কেননা তাদের নিজস্ব ব্যবস্থা ছিল। ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে প্রবেশের পথগুলো স্থানীয় লোকেরা গাছের কাণ্ড দিয়ে অথবা পুরনো ট্রাক দিয়ে বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিল। অবশ্য বন্ধ করতে পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তখন শহরের অনেকের আনাগোনা চলছিল। ডঃ মল্লিকের বাসায় ডাঃ জাফর বলে আওয়ামী লীগের একজন কর্মকর্তাকে সেদিন দেখলাম। মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ডঃ জাফর অত্যন্ত কর্মব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন এবং চট্টগ্রামে প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে তুলবার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। শিক্ষকরা যারা ছিলেন তারা পরের দিনের সভা সম্পর্কে একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। সেখানে কি আলোচনা করবেন সে সম্পর্কে তারা নিঃসংশয় হতে পারছিলেন না। যুক্তি প্রয়োগ করে কোনরূপ সিদ্ধান্তে আসা সে সময় সত্যিই অসম্ভব ছিল। আবেগ তখন এত প্রবল ছিল যে আবেগের সম্মুখে কোন যুক্তি স্থির থাকতে পারছিল না।

www.pathagar.com

ছাত্ররা তখন পূর্ণভাবে আবেগের দ্বারা পরিচালিত, জাতিও তখন পূর্ণভাবে সে আবেগকে মান্য করে চলছে।

দীর্ঘকালীন পুঞ্জিভূত ক্ষোভের পরিণতি হিসেবে যে আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল, সে আবেগের সম্মুখে কোন যুক্তি দাঁড়াতে পারছিল না। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় যেমন একটি প্রচণ্ড আবেগ সক্রিয় হয়েছিল, বাংলাদেশ আন্দোলনের সময়ও তেমনি একটি আবেগ সক্রিয় হয়েছিল। শিক্ষকদের অনেকে বলছিলেন যে আমাদের ভবিষ্যত কর্মপন্থার একটি ধারাক্রম নির্ধারণ করা দরকার। তা হলে আমরা ক্রমশ অগ্রসর হয়ে দেশের স্বাধীনতাকে কার্যকর করতে পারব। কিন্তু ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ছাড়া আকস্মিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা বিপর্যয় টেনে আনতে পারে।

॥৫০॥

প্রাণিকুল নাকি পূর্বাহ্নেই অশুভ সংবাদ সম্পর্কে অবহিত হয়। আমার নানার মৃত্যুর পূর্বে আস্তাবলের ঘোড়া নাকি খুব চিৎকার করেছিল। আমার নানী বলেছিলেন যে ঘোড়া দুটি ঠিক বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের মনিব চিরকালের জন্য চলে যাচ্ছে। তাই তারা বেদনাতুর কণ্ঠে আর্তনাদ তুলেছিল। ঘোড়া দুটি খুব সুন্দর ছিল, একটি কাল অপরটি লাল। কাল ঘোড়াটির কপালে সাদা তিলক ছিল। আমি আমার ছোট বেলায় এই ঘোড়া দুটিকে দেখেছিলাম। আমার নানাকে অবশ্য কখনও ঘোড়ায় চড়তে দেখি নি। বাবাকে কখনও কখনও চড়তে দেখেছি। তিনি যখন ঢাকা থেকে বাড়ী আসতেন তখন নদীর ঘাটে তাঁর জন্য একটি ঘোড়া থাকত, তিনি সেই ঘোড়ায় চড়ে বাড়ী আসতেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় কিছু ঘটনা ঘটেছিল, যাতে আমি অনুভব করেছিলাম যে পশু-পাখীরা দুর্ঘটনার সংবাদ আগে থেকেই জানতে পারে। তাদের শরীরী গঠনের মধ্যে এমন কোন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে যা তাদেরকে ভবিষ্যতের দুর্ঘটনা জানতে সাহায্য করে।

ঢাকায় আমার বড় মেয়ে মোহাম্মদপুরে থাকত এ কথা আগেই বলেছি। সে প্রায়ই আমাকে টেলিফোন করত ঢাকার অবস্থা জানিয়ে। কিন্তু ২১শে মার্চ রাত্রিতে তার টেলিফোন পেয়ে আমি শংকিত হলাম। সে জানাল যে রাত্রিবেলায় দলবল নিয়ে স্থানীয় বিহারী গুণ্ডারা বাড়ির আশপাশে ঘোরাফেরা করে বাড়ির দরজায় ধাক্কা দেয় এবং ঢিল ছোঁড়ে। মেয়ের টেলিফোন পেয়ে পরের দিন অর্থাৎ ২২শে মার্চ সকালে আমি আমার বড় ছেলেকে নিয়ে ঢাকার পথে রওয়ানা হই। পথে কোন বিপত্তি ঘটেনি। তবে শুভপুর ব্রীজের কাছে কিছুটা অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ব্রীজটা তখন চালু ছিল না, ব্রীজের নিচ দিয়ে ডানদিকে একটি অস্থায়ী ডাইভারসন রোড করা হয়েছিল, সে রাস্তায় একটির বেশি গাড়ি চলতে পারত না অর্থাৎ একদিন থেকে গাড়ি চললে বড় রাস্তার উপর অন্য গাড়িগুলোকে অপেক্ষা করতে হত। আমার ছেলে গাড়ি চালাচ্ছিল, আমি ছিলাম তার পাশে।

অন্যদিকে বড় রাস্তায় একটি মিলিটারী জীপ এমুখো আসছিল। আমার ছেলে বলল যে মিলিটারী জীপটি ডাইভারশন রোডে আসার আগে সে গাড়ি নিয়ে ওপাশে চলে যেতে পারবে। সে ওভাবে চিন্তা করেই ডাইভারশনের পথে চলল। ডাইভারশন পথের মাঝামাঝি

www.pathagar.com

আমাদের গাড়ি যখন গিয়েছে তখন অন্যদিক থেকে জীপটি নেমে এসে আমাদের গাড়ির মুখোমুখি হল। আমার ছেলে যখন আমাদের গাড়িটি পিছনে সরিয়ে নিতে লাগল তখন জীপটি এক অদ্ভুত আচরণ করল। জীপের ড্রাইভার সামনের দিকে না এগিয়ে পিছনে সরে যেতে লাগল এবং হাত নেড়ে আমাদের সামনে এগুতে বলল। কিন্তু আমরা যেই সামনে এগিয়েছি জীপটি আবার সামনে এগিয়ে আমাদের মুখোমুখি হল। তখন আমরা ভয় পেলাম। আমার ছেলে তখন গাড়ি পিছনে সরিয়ে বড় রাস্তার উপরে নিয়ে এল এবং অন্য গাড়ি পার হবার জন্য বিস্তর ব্যবধান রেখে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তখন মিলিটারী জীপটি এগিয়ে এসে আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। গাড়ির মধ্যে আর্মি অফিসারদের হাসির শব্দ শুনেছিলাম। জীপটি আমাদের গাড়ি পার হয়ে যাবার সময় এরা একটি খালি মদের বোতল ছুঁড়ে মেরেছিল। কিন্তু বোতলটি সৌভাগ্যক্রমে আমাদের গাড়ির গায়ে না লেগে রাস্তায় পড়ে চুরমার হয়ে যায়। যাই হোক কোনরূপ দুর্ঘটনা যে ঘটেনি, এটাই ছিল আমাদের সৌভাগ্য। সম্ভবত মাতাল আর্মি অফিসাররা আমাদের নিয়ে একটু খেলা করতে চেয়েছিল। এরপর পথে আর কোন অসুবিধার সম্মুখীন আমরা হই নি। কুমিল্লা একাডেমীতে থামবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু থামি নি।

ঢাকায় এসে মোহাম্মদপুরে বাবর রোডের মুখে একটি অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। দেখলাম একটি কাক রাস্তায় পড়ে আছে এবং বাঁদিকে ছাদের কার্নিশে অনেকগুলো কাক বসে আছে–কুড়ি-পঁচিশটির মত হবে। সবচেয়ে অদ্ভুত যেটা আমার চোখে পড়ল, তা হল কাকগুলো এক এক করে কা কা ডেকে রাস্তায় মরে পড়া কাকটির প্রায় গা ছুঁয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। আমি আমার ছেলেকে গাড়ি থামাতে বললাম এবং সমস্ত দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করলাম। একে একে সব কটি কাক মৃত কাকের গা ছুঁয়ে উড়ে চলে গেল। সম্ভবত এভাবেই তারা মৃতের প্রতি তাদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করল। কিন্তু আমার কাছে বিষয়টি একটি ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার ইঙ্গিত মনে হল। প্রতীকগতভাবে কাকগুলো যেন একটি সম্ভাব্য দুর্ঘটনার খবর আমাকে দিয়ে গেল। তখনই আমি সাব্যস্ত করলাম যে পরের দিন সকালে আমার মেয়েকে নিয়ে আমি চট্টগ্রামে ফিরে যাব। বাবর রোডে মেয়ের বাসায় যখন পৌঁছলাম, তখন আমাকে দেখে মেয়ে খুব আশ্বস্ত হল। মেয়ে আমাকে বলল, "বাবা, কয়েকদিন থেকে যান, ২৬ তারিখের পর এক সঙ্গে আমরা চট্টগ্রাম যাব।"

আমি তাকে বললাম, "আমরা কাল সকালেই চলে যাব, আর একদিনও দেরি করা চলবে না। আমার ভয় হচ্ছে যে কোন কিছু বিপদ ঘটতে যাচ্ছে। ঢাকায় অপেক্ষা করাটা ঠিক হবে না।" আমি তখন শুভপুর ব্রীজের কাছে আর্মি জীপের ঘটনাটি তাকে বললাম, এবং বাবর রোডের মুখে কাকগুলোর কাণ্ডকারখানাও তাকে বললাম। সে তখন আমার সিদ্ধান্তের কারণ বুঝল, রাত্রিবেলা মেয়ের বাসা থেকে ঢাকার বিভিন্ন জনকে টেলিফোন করলাম। এদের মধ্যে মুনীর চৌধুরীও ছিল। মুনীর চৌধুরী গাড়ি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। অনেকটা সময় আমরা এক সঙ্গে কাটালাম। মুনীর চৌধুরীর কথাবার্তায় মনে হল সে

www.pathagar.com

ভাবছে যে ক্ষমতা। ডঃ মল্লিক ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু যোগাযোগ করা সম্ভবপর হয়নি।

পরের দিন বিকেলবেলা আমরা চট্টগ্রাম শহরে কলেজের মাঠে সভায় যোগ দিলাম। ছাত্ররা এই সভা পরিচালনা করছিল। আওয়ামী লীগের জহুর আহমদ চৌধুরী এবং ডঃ জাফর সভায় উপস্থিত ছিলেন। জহুর আহমদ চৌধুরী শ্রমিক নেতা হিসাবে চট্টগ্রামে খুব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সাধারণ মানুষের উপর তার প্রভাব ছিল খুবই। তার সঙ্গে আমার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। আমি চট্টগ্রামে ঘাটফরহাদ রোডের যে বাসায় থাকতাম তার বিপরীত দিকের একটি বাসায় তার স্ত্রীর ভাই থাকতেন। এ বাসায় আমাদের যাতায়াত ছিল। তার স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় সেখানেই। তাছাড়া চট্টগ্রামের বিভিন্ন সভা সমিতিতে আমি জহুর আহমদকে প্রায়ই দেখতাম। ভদ্রলোক খুবই সাদাসিধে ধরনের ছিলেন, পোশাক-পরিচ্ছদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। কথাবার্তা এবং আচরণের মধ্যে একটি গ্রামীণ সহজতা এবং স্পষ্টতা ছিল। সে দিনকার সভায় তিনি একটি বক্তৃতা করেছিলেন। তার বক্তৃতা যখন চলছে, তখনই খবর এল যে চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের একটি খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে এবং তাতে অনেক হতাহত হয়েছে। জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামাতে গিয়ে পাকিস্তানী সেনারা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিল। যার ফলে সংঘর্ষ বাধে। জহুর আহমদ খবর পেয়ে বক্তৃতা তাড়াতাড়ি শেষ করে সভা ছেড়ে চলে যান। এরপর সভা তেমন জমে না। ছাত্ররা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে এবং ডঃ মল্লিক তাঁর সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন। তিনি তাঁর ভাষণে অতীতের বিভিন্ন যুগে বাঙালীরা যে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিল তার ইতিহাস বিবৃত করেছিলেন মনে পড়ে। সভা শেষে আমি ও মল্লিক সাহেব দেব পাহাড়ে আমার বাসায় যাই। সেখানে শিল্পী রশীদ চৌধুরী তাঁর ফরাসী স্ত্রী এবং দুই কন্যা নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তীও সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। সে বাসায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমরা সবাই সন্ধ্যার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে রওয়ানা দেই। আমার মেয়ে-জামাই, রশীদ চৌধুরী এবং দেবদাস আমরা সবাই ক্যাম্পাসের দিকে রওনা দেই। ক্যান্টনমেন্টের পাশ দিয়ে যে রাস্তা ছিল সে রাস্তা বন্ধ থাকায় আমরা পাঁচলাইশ হয়ে একটি ভাঙ্গাচোরা গ্রাম্য পথ অতিক্রম করতে দেড় ঘন্টা লেগেছিল। রশীদ চৌধুরী এবং দেবদাস আমার বাসায় থেকে গেল। আমার বড় মেয়ে ছিল এখানে, ছোট মেয়েও এসে উপস্থিত। আমার বাড়ি তখন জমজমাট। সবাইকে পেয়ে আমার স্ত্রী খুব খুশী হলেন। ছাব্বিশ তারিখে আমার জন্ম দিন। সেই জন্মদিনে সবাই যোগ দিতে পারবে ভেবে তিনি খুশী হয়েছিলেন।

সে রাত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক লোকের আনাগোনা চলছিল। শেষ রাতের দিকে রামগড় বর্ডার থেকে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বেশ কিছু সংখ্যক জোয়ান বর্ডার ছেড়ে ক্যাম্পাসে এসে আশ্রয় নিল। এদের থাকার ব্যবস্থা এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে ছাত্ররা সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এ সময় বিস্ময়কর সহযোগিতা আমরা পেয়েছিলাম

www.pathagar.com

হাটহাজারী গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে থেকে। তারা গ্রাম থেকে জোয়ানদের জন্য প্রচুর খাদ্যসামগ্রী নিয়ে এসেছিল। খবর পাওয়ামাত্র গ্রামের লোকেরা যেভাবে সাড়া দিয়েছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। গ্রামের মানুষের এই সাড়া থেকে আমার বিশ্বাস জন্মে ছিল যে আমাদের সংগ্রাম সফল হবেই।

চট্টগ্রামে শিল্পী সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটি প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয় মার্চ মাসের শুরুতে। উক্ত প্রতিরোধ কমিটির আমি ছিলাম চেয়ারম্যান উপদেষ্টা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে প্রতিরোধ কমিটির সদস্য নেয়া হয়েছিল। শিল্পী রশীদ চৌধুরী প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটের এলবাম তৈরি করেছিল। মমতাজউদ্দিন আহমদ প্রতিরোধ বিষয়ে একটি অভিনব স্কেচ করেছিল। ১৪ই কি ১৫ই মার্চ চট্টগ্রামে লালদীঘি ময়দানে বিপুল জনতার সামনে প্রতিরোধ কমিটির একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অত্যন্ত সফলকাম হয়েছিল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মমতাজউদ্দীনের লেখা একটি ছোট নাট্য রেখাচিত্র অভিনীত হয়েছিল। রেখাচিত্রটিতে পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের সম্পর্কে একটি বিদ্রূপাত্মক চিত্র ছিল। জনতা-এ রেখাচিত্রটি খুবই উপভোগ করে। জনতার বিপুল করতালির মধ্যে বক্তৃতা হয়েছিল দুটির-একটি আবুল ফজলের আর একটি আমার। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সফলতা দেখে আমাদের মনে হয়েছিল যে বিজয় আমাদের হাতের মুঠোয়। প্রতিবন্ধকতাহীন প্রতিবাদ আমাদের উল্লসিত করেছিল এবং উৎসাহিত করেছিল। মনে হয়েছিল অচিরেই শুভলগ্ন আসবে এবং দেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হবে। আমার জামাতা মাহমুদ শাহ কোরেশী প্রতিরোধ কমিটির কোষাধ্যক্ষ ছিল। আমরা লালদীঘির অনুষ্ঠানটি করেছিলাম স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে। খুব বেশি টাকা ওঠেনি। তবে যা উঠেছিল তা দিয়েই লালদীঘির অনুষ্ঠানটি করতে আমরা সক্ষম ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে পরামর্শ করি নি বলে এবং এই প্রতিরোধ কমিটির সঙ্গে তাদেরকে জড়িত করি নি বলে অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আমরা চট্টগ্রামে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে প্রতিনিধি নিয়েছিলাম। তার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ছিল ঃ যেমন আমি ছিলাম, কোরেশী ছিল, দেবদাস চক্রবর্তী ছিল এবং রশীদ চৌধুরী ছিল। ২৪ তারিখে যে প্রতিবাদ সভাটি হয় সে সভার আয়োজন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্ররা। সেখানে বাইরের কোন লোক ছিল না। শুধু আওয়ামী লীগের জহুর হোসেন চৌধুরীকে বক্তৃতার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আমরা যে কয়জন প্রতিরোধ কমিটিতে ছিলাম আমাদের কাউকেই চব্বিশের সভায় অংশ নিতে বলা হয় নি। বক্তা না হলেও আমরা সভায় গিয়েছিলাম এবং শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলাম।

চব্বিশ তারিখ দিনগত রাত্রে অনেক সময় পর্যন্ত জেগেছিলাম। বিছানায় শুয়েও ঘুম আসছিল না। ঘুম এল কখন জানি না, কিন্তু ঘুমের মধ্যে একটি স্বপ্ন ভেসে এল। দেখলাম একটি বিরাট অট্টালিকার মধ্যে প্রান্তের একটি ঘরে আমি আমার শোবার আয়োজন করছি।

www.pathagar.com

অট্টালিকার মধ্যে অগণিত মানুষ প্রবেশ করছে। অনবরত তারা আসছে। তাদের গায়ে বিভিন্ন রঙের পোশাক। তাদের আসার আর বিরাম নেই। হঠাৎ এক সময় আমার ঘরের জানালাগুলো খুলে গেল। জানালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের বিপুল জলোচ্ছ্বাসের শব্দ হল। তখন আবার বৃষ্টিও পড়ছিল প্রচণ্ড বেগে। বৃষ্টির ঝাপটা এসে ঘর ভিজিয়ে দিচ্ছিল। এক পর্যায়ে আমিও ভিজে গেলাম। হঠাৎ কোথায় যেন ঘণ্টা বেজে উঠল। তারপর আর কিছুই জানি না। এ স্বপ্নটি আজও আমার সুস্পষ্ট মনে আছে। সত্যিই আমাদের জীবনে বিপদ এসেছিল, বিপর্যয় নেমেছিল, শংকাকুল চিত্তে আমরা আশ্রয় সন্ধান করেছিলাম। একটি বিপুল প্রতাপী শক্তির বিরুদ্ধে আমরা দণ্ডায়মান হয়েছিলাম। সংকট আমাদের সবাইকে স্পর্শ করেছিল। কিন্তু অবশেষে আমরা কথা ভিন্নভাবে বলবার ইচ্ছে রইল।

(সমাপ্ত)
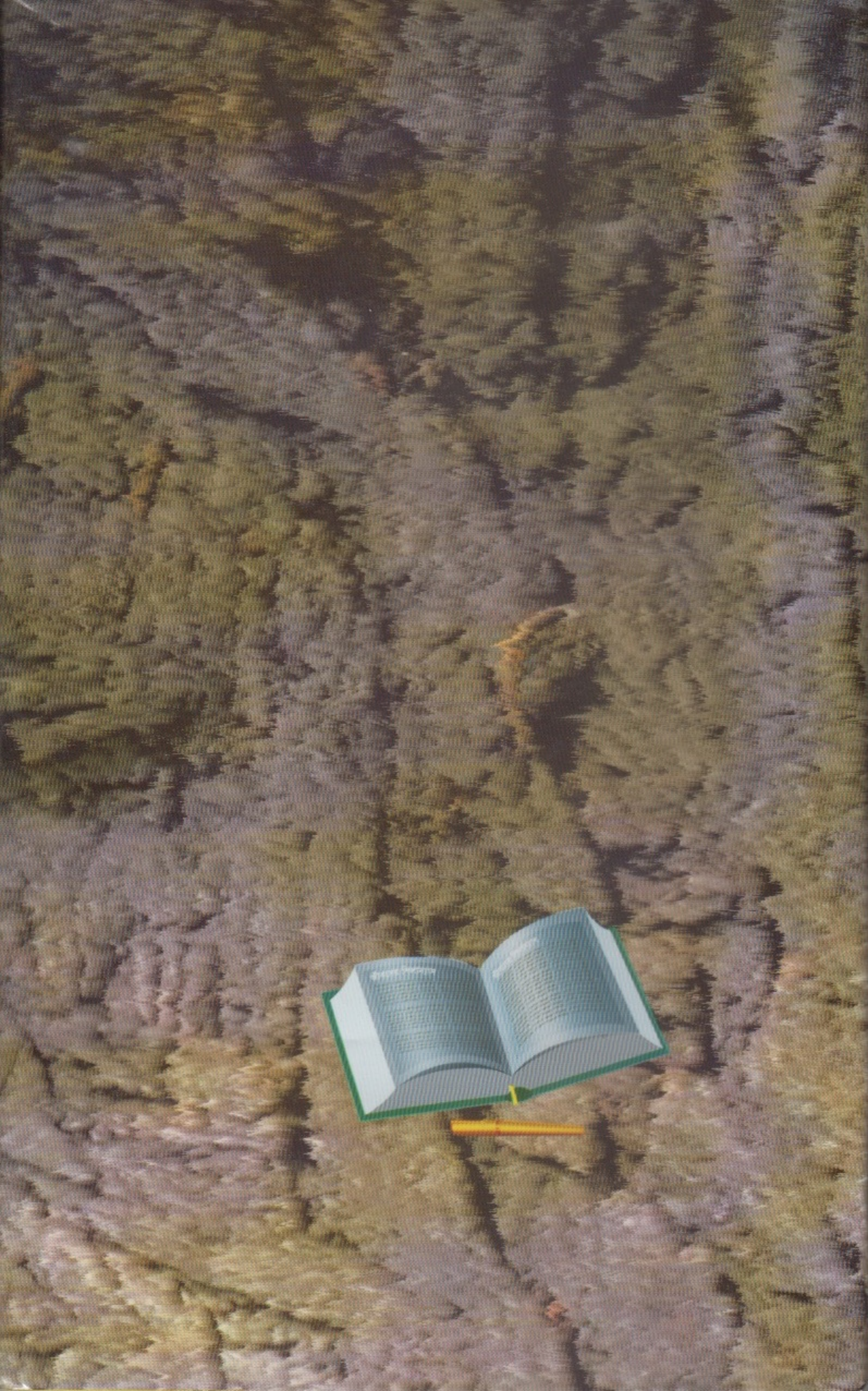
www.pathagar.com